অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র

১

গ্রন্থনা

তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার
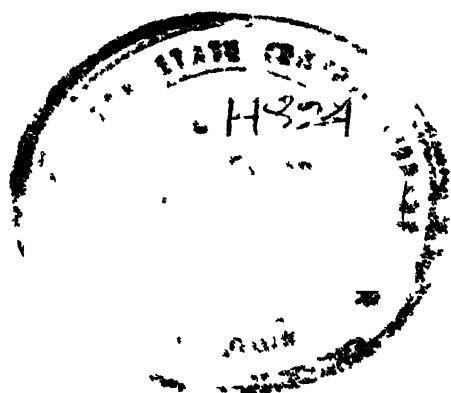
দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

নিবেদন

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' — এমন অধিকারে নয় ; বড় ভয়, বড় সংকোচে পড়া আর শোনার নিঃশঙ্ক ছোট আশ্রয় ছেড়ে গ্রন্থনার বড় ভুবনের চৌকাঠ ডিঙিয়েছি। গ্রন্থনাই — কেননা সম্পাদকের বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ, নিজেকে বিযুক্ত করার প্রজ্ঞাবঞ্চিত পাঠক-মন এই রচনাসমগ্রের সর্বস্ব অধিকার করেছে, আর, কে না-জানে পাঠ, পাঠ্যরীতি ব্যক্তিসাপেক্ষে নির্ধারিত আপেক্ষিক — কখনই 'আমার' মতো নয়। কিন্তু কথা এই, রচয়িতার কৃতির প্রবলতায় পাঠ থেকে পাঠান্তরে কি আরও আরও পাঠে রচয়িতারই সংবেদী অনুসন্ধিৎসু চিত্ত খুঁজে পাওয়া যায় যখন, যখন রচয়িতা নিজেই সজ্ঞান-সন্ধানী থাকেন তাঁর নিজস্ব পাঠকের তখন তো সম্পাদনায় নয়, গ্রন্থনাই বুঝি একমাত্র কাজ। এখনও-পর্যন্ত-তাঁর পাঠকেরা খুঁজে পেতে পারেন মিল-অমিল, বিন্যাসের দুর্বলতা, পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যক্তিমানসের ঝোঁক। আর, এখানে এসেই এই উদ্যোগ সার্থক মনে হয় যেহেতু গ্রন্থনার মধ্যেকাব ছক 'পাঠকের' যুক্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। অন্তত এতটুকু তো সপক্ষে আশা করাই যায়।

এই আশা থেকেই 'সমগ্রের' নিহিত লক্ষ্য অমিয়ভূষণ মজুমদারের রচনার সংগ্রহ — যা কিনা ইংরেজি কালেকটেড শব্দটির কাছাকাছি। এক প্রয়োজনীযতার বোধ থেকেই সংগ্রহের লক্ষ্য গড়ে ওঠে — শ্রেষ্ঠত্বের না-হলেও বিশিষ্টতার লক্ষ্য থাকে প্রত্যেকেরই। সেক্ষেত্রেও সংগ্রহের বিন্যাস রীতি থাকে। কিন্তু কোনও একজন সাহিত্যিকেব বচনারাজি কীভাবে বিন্যস্ত করব বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ-একটা মন দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে এমন নয়। অমিয়ভূষণের লেখক জীবনের দীর্ঘপথ বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মারক যেমন, সেভাবেই পাঠকের কাছে একে একে উন্মুক্ত হয় বেঁচে থাকার নানা অর্থ। হয়ত সেভাবেও বিন্যস্ত কবা যেত তাঁর রচনাসমগ্র, কিন্তু আমরাও চলতে চাইছি এগিয়ে-পিছিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই ১৯১৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত। বুঝে নিতে চাইছি সুস্থিতি, স্বচ্ছতার কোনও আশ্রয়ই যখন নিরর্থক এই দীর্ঘ তিরাশিটা বছরে, তখন এই অনাহার-অশিক্ষা-হতদরিদ্র অভাগাদের দেশে শহরেব সব উপেক্ষা করে কী করে বলতে পারেন 'মানুষকে কেউ এক্সপ্লেন করতে পারে না। সে একটা কাব্য'। এই একটিমাত্র যুক্তিই বিষয়ক্রমে নয, কালানুক্রমের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করে। কালানুক্রমে, কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের কাল অনুসারী নয় — সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ ধরে। এদেশে, বাংলাভাষার প্রকাশনার জগতে, কে কবে বরাত পেয়েছেন সরাসরি 'বই' লিখে দেওয়ার। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে ধরেই এখনও পর্যন্ত বাংলাভাষায় চর্চাকারীদের প্রথম ও একমাত্র আশ্রয় সাময়িকপত্র। অমিয়ভূষণও ব্যতিক্রমী হতে পারেন না সাংস্কৃতিক চেতনার এই পাকা বনিয়াদে।

ফলে 'ছোট'-র জগতে — সাময়িকপত্রে আমাদের আশ্রয়। শত আর্থিক অনটন, সংকটের মধ্যেও সেইসব পত্রিকাগোষ্ঠী যাঁরা অমিয়ভূষণের রচনা প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও অমার্জনীয় বলে মনে করি। তবুও এই শব্দই ব্যবহার করছি, কেননা অন্য কোনও শব্দও নিরর্থক। অগ্রজ-অনুজসহ আমাদের এই গ্রন্থনা-পথে অনেক সঙ্গী। অমিয়ভূষণের গ্রন্থপ্রকাশের বিবরণ শুনিয়েছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ, আশ্বাস দিয়েছেন ভবিষ্যতে, প্রয়োজনে, তাঁর সংগ্রহের 'পূর্বাশা'র কপি দেখে নেওয়ার জন্য। 'গড় শ্রীখণ্ড'-এর প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করার সুযোগ করে দেন তপস্যা ঘোষ। 'সান্যালদের কাহিনী' সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্বপন মজুমদার। বিন্যাস ও রচনাপ্রসঙ্গে নিয়ত সহায়তা করছেন সোমালী পাণ্ডা। গ্রন্থনা/সম্পাদনা প্রসঙ্গে মতামত ও বিতর্কের জন্য অজয় গুপ্ত ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। সন্দীপ দত্তের সাময়িকপত্রের ভাণ্ডার সবাইর জন্য উন্মুক্ত, বন্ধু হিসাবে খানিক বেশি সহায়তা পাই। শুভঙ্কর দে সম্পর্কে একটাই বলার যে, কনজুমার গুডসের এই সময়ে, এত ছোটবয়সে পারিবারিক প্রকাশনা-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের খোঁজখবর, পড়াশোনায় বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে।

এত গুনিজনের সাহায্যের পরেও ভুল থাকলই। তার সব দায়, সব দায়িত্ব শুধু আমাদের।

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র
প্রথম খণ্ড

সূচি

নিজের কথা

আমার জীবন সমতলের হাঁটুজলের নদী। পার আছে, পারে ঘরবাড়ি, ধানের আর তিলের ক্ষেত, মেয়েরা জল নিতে আসে, রাতে গুলবাঘাও হয়তো, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আছে, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ, ভুলে যাওয়ার মতো ঢেউ ওঠে না, মধুকর ডোবে না, জলদস্যুদের বছর চলে না। জন্ম ২২ মার্চ ১৯১৮ (৮ চৈত্র ১৩২৪) বাংলা মতে শুক্রবার, আর ইংরেজিতে শনি, বোধহয় ভোররাতে নতুন দিন হওযার আগে বলেই এই দ্বিধা। স্থান মামাবাড়ি, দেশীয় রাজ্যের রাজধানী কোচবিহার শহরে। পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। পিতৃভবন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার পদ্মাপারের গ্রাম পাকুড়িয়া, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে।

বাবার ঠাকুরদা মথুরাপ্রসাদমশায় কী করে-বা একটা নীলকুঠি এবং সংলগ্ন জমিজিরাত হস্তগত করেছিলেন। আমার শৈশবের চোখে নীলকুঠির সেই দুর্গাকার বিস্তৃতি ও গড়ন, আধ-ইঞ্চি-পুরু লোহার পাতের দশ-এগারো ফুট দরজাগুলো এক-বুক উঁচু বাঁধানো নীল চৌবাচ্চার দেয়ালগুলো যার উপরে আরো ফুট-পাঁচেক গেঁথে তুললেই অনায়াসে হলঘর, শোবারঘর ইত্যাদি করা যায়, আর তা না-করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খুঁড়ে বার করা পরিচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষের সাজানো-গোছানো এক্‌জিবিট, যার ফলে দুর্গর কল্পনাটাই বাড়ে ; পুরনো দু'একটা তরোয়াল, ঢাল ; ঢোলকাকার, ঢাকাকার, প্রকাণ্ড করবীফুলের আকার কাচের চিমনিগুলো, দু-তিন কেজি তেল ধরে এমন প্রকাণ্ড হিংকসের হারিকেন লণ্ঠন—এসবই অবাক হওয়ার মতো বোধ হতো। সেই বাড়িতে আমার সমবয়সী যারা ছিলো তাদের মনে এরকম হতো কিনা, তা বলতে পারছি না। তুলনায় মামাবাড়ি বেশ ছোটোখাটো ; বাড়ির মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার মতো বাগান, পুকুর এসব তো ছিলোই না, বাঁধানো সুরকির রাস্তার ধারে খোলামেলা আর আধুনিক। ১৯২৬ পর্যন্ত বছরে দু-তিনবার সেই গ্রাম আর সেই শহরের মধ্যে যাওয়া আসা চলতো। এই শহরের পথে ঘোড়াগাড়ি চলে, দু'একখানা মোটরগাড়ি চলে, প্রকাণ্ড সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে কোনো কোনো মানুষ, বীথিকাকার সড়ক দিয়ে হাতি চলে।

অবাক লাগা আর কল্পনা দিয়ে সেই অবাক লাগাকে বিশ্লেষণ করা এক নয়। কল্পনা পরে আসে। তফাৎগুলোও স্পষ্ট হয় না। তখনো আমার পৃথিবী মা'র মুখ, মা'র বুক, মা'র সুন্দর মার্বলহেন দু'খানা হাত।

১৯২৬-এ পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে, যেগুলোকে ঘটনা বলে কিনা সন্দেহ আছে। আমার এক ভায়ের চিকিৎসার জন্য পাকুড়িয়া থেকে পাবনায় যাচ্ছিলাম আমরা। পদ্মা বেয়ে স্টিমারে। সন্ধ্যায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। ঝড় উঠে পড়েছিলো; গোটা রাত এক আতঙ্কের আবহাওয়ায় কাটিয়ে ভোররাতে পাবনায় পৌঁছেছিলাম। সেই ঝড়ের ধাক্কা যা যেন স্টিমারটাকে শূন্যে তুলে ফেলবে, যা এক অদ্ভুত কারণে একইসঙ্গে রাগে গজরাচ্ছে আর আর্তনাদ করছে, সেই বৃষ্টিধারা যা পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা নীলচে

সাদা দেয়াল, সার্চলাইট যার এখানে-ওখানে পড়ে যেন পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে, স্টিমারের সেই ভাঙা-গলার আর্তনাদ। ভীত, ত্রস্ত যাত্রীদল যারা আতঙ্কে ছুটোছুটি করে স্টিমারের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিচ্ছে আরো, যাদের স্থির রাখতে মৃদু লাঠি চালনা করছে মাল্লারা, তারা নানা প্রার্থনা করছে। দোতলার ডেকে তখন মা বললেন, যদি সত্যি ডোবে! বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, আবার সাঁতরে পার হতে হবে পদ্মা। তখন সেই ডেকে একটা চাদর বিছিয়ে মাকে ধরে আমরা চার ভাইবোন শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙেছিলো ভোর হতে, পাবনার ঘাটে পৌঁছে। সেই ঝড়ের পদ্মায় কারো পক্ষেই চারটি শিশু ও তাদের মাকে নিয়ে সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব হতো কিনা জানি না। কিন্তু আমার একটা প্রত্যয় আছে পুরুষের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট একটাই যুক্তি আছে অস্তিত্বের সন্তানদের রক্ষা করা। প্রত্যয়টা সেই রাত থেকে উঠেছে।

দ্বিতীয় ঘটনা আমার সেই কঠিন অসুখ যার সূচনা পাবনা শহরের সেই সাময়িক প্রবাসে যার জন্য আমাকে মাস তিন-চার কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে পাইকপাড়া ওয়ার্ডে থাকতে হয়েছিলো। যেখানে কর্নেল নেপিয়ার ছিলেন কর্তা। সেখানে তখনই ভর্তি না-হতে পারলে বাঁচার আশা ছিলো না। অথচ কর্নেল নেপিয়ার একবার চোখ টেনে দেখে, বার দুয়েক পেট টিপে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। না, তার জন্য তাঁর চেম্বারে গিয়ে ভিজিট দিতে হয়নি, এমনকী তাঁর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টকে ধরেও তাঁর কাছে পৌঁছাতে হয়নি। সে-সময়ে এক রাতে, খুবই কষ্টের সে-রাত, মোহাচ্ছন্নই যেন ছিলাম। নার্সরা আসা-যাওয়া করছে এরকম অনুমান ছিলো। সেই হলে তো মাঝেমাঝেই মৃত্যু ঘটছিলো। সে রাতে কি আমারও মৃত্যু হবে? মৃত্যু কী? না-থাকা বুঝতে পারছি। স্ক্রিন দিয়ে বেডটাকে ঘিরে দেয়, পরে আর সেই রুগীকে দেখা যায় না। চোখে জল ছিলো বোধহয় : নিঃশব্দ কান্নার, উদাস ব্যথার, ভয়ের। সেই সময়ে সারারাতে এক মেম-নার্সকে বিছানার পাশে দেখেছিলাম। ধবধবে রং, হাসলে মুখ লাল হয়, নাকের ডগাটা একটু উল্টানো, নীলে-সবুজে মিশানো চোখ। এ সে নয় যার আটটায় ডিউটি শুরু হয়েছিলো। এর ডিউটি বরং আটটায় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। যাই হোক, আমি তখন থেকে সেই নার্সটিকে যাকে মনে-মনে এখনো 'দিদি' বলি এবং কর্নেল নেপিয়ারের কাছে কৃতজ্ঞ থেকে গিয়েছি। হয়তো সেজন্যই আমার ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি ভালোবাসা আছে। এরকম প্রত্যয় আছে আমার—শোষণ ব্যবস্থার অংশ হলেও, তার হিস্যাদার হলে—মানুষের ভ্যালুস এবং মর‍্যালিটিকে শোষণ ব্যবস্থার সৃষ্টি বলা যায় না সবক্ষেত্রে। তৃতীয় ঘটনাকেও গুরুত্ব না-দিয়ে পারছি না। ১৯২৬-এই বোধহয় ঠনঠনে কালীবাড়ি আক্রান্ত হয়েছিলো। ঢাকাতে দাঙ্গা হচ্ছিলো। আমাদের গ্রামে সেই দাঙ্গা এসে পড়তে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিলো। বড়দের ক্রোধ ও আশঙ্কার আলাপ শুনছিলাম। রামদা, তরোয়াল, সড়কিতে ধার পড়ছিলো। বাবা বন্দুক কিনে আনলেন, কয়েক বাকসো পিতলমোড়া বুলেট। অনেকদিন রাতে বাবা বন্দুক হাতে গ্রাম ঘুরতে বেরোতেন। শুনতাম ওরা হিন্দুদের কেটে ফেলে, হিন্দু মেয়েদের চুরি করে। মার মুখ শুকনো, বাবার মুখ গম্ভীর। কখনো নিজেদের টডের গল্পের রাজপুত মনে হতো। ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত এরকম একটা বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিলো মনে। ফলত সেই সব রাজনীতিক যারা দেশভাগের জন্য কংগ্রেস দলকে দোষ দিয়ে উদ্বাস্তু-ভোট টানবার প্রয়াস করে চলেছে তাদের চিন্তাকে মিথ্যাশ্রয়ী মনে হতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় মুক্তিফৌজের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য উপহার ইত্যাদি নিয়ে রংপুর জেলার খানিকটা গিয়েছিলাম, এপারে আশ্রয়-নেয়া মুক্তিফৌজের সঙ্গে সভা-সমিতি করেছি, কিন্তু এপার বাংলা-ওপার বাংলা বলার মতো বালসুলভ ইউফোবিয়া কখনো বোধ করিনি। ওরা ভাষার জন্য প্রাণ দিচ্ছে, নিজেদের স্বকীয়ত্ব বাঁচাতে লড়ছে, পৃথক হয়ে গেলেও আমাদের জ্ঞাতিগোত্রই, পদ্মা যদি প্রাণপ্রবাহ, তবে তাকে ধরে ওরা আর আমরা এক—এসব বোধ ছিলো, তাই বলে এক হয়ে গেলাম—এরকম সর্বনেশে কাব্যিক ভাব কখনো মাথায় ঢোকেনি। কখনো মনে হয়নি আবার ওপারে ফিরবো। বরং মনে করি অন্যায় যদি হয়ে থাকে এই ভাগাভাগি দিয়ে অন্যায় শোধ হলে কম্যুনাল রাজনীতির ধোঁয়াশায় পথ হাতড়াতে হবে না ; বোঝা যাবে আমরা এবং ওরা শুধু রবীন্দ্রনাথের

নয়, সেই কবে থেকে মনসামঙ্গলেরও শরিক।

কিন্তু এসবের পরপরই আমার জীবনের সবচাইতে বড়ো ঘটনাগুলোর একটা ঘটে গেলো কোচবিহার শহরে জেন্‌কিনস্ স্কুলে, ১৯২৭, সেভেন্থ ক্লাস (ক্লাস ফোর)-এ ভর্তি হলাম। আমার মামা আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে ভর্তি করে দিলেন। আমার পাবনা জেলা থেকে কোচবিহার রাজ্যে চলে আসার ব্যাপারে বাবা-মা এবং মামা নিশ্চয় পরামর্শ করেছিলেন তাদের সে-পরামর্শ জানার কথা নয়, আমি বুঝেছিলাম (আজকালকার বুলিতে যাকে মডেল স্কুল বলা যেতো) কোচবিহারের এই গুরুত্বপূর্ণ এবং মা'র প্ল্যান তা বুঝতে পারি। আমি চলে আসার বছর দুয়েক পরে বাবা সপরিবারে কোচবিহার চলে আসেন এবং বাবা প্রায় চল্লিশ বছরে চাকরিতে ঢুকে যান কোচবিহার শহরে। তখন অবশ্যই এসব খতিয়ে দেখার ইচ্ছা, চেষ্টা, বুদ্ধি কিছু ছিলো না। আমি যা অনুভব করতাম তা সুখ। তার কারণ (আমার কাছে তখন) দাদামশায়, দিদিমা এবং মামার ভালোবাসা, স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসা আর যেন চারিদিকের রঙিন আলো-আলো ভাব। এখন ভাষা দিতে পারি আমার সেই অব্যক্ত প্রীতির, তাই বলতে পারি এখন শহরের আধুনিকতা, আমার দাদামশায় আর মামা দুজনেই উকিল যা জমিজিরাত খাজনা আদায়ের তুলনায় আধুনিক, যাঁদের কাছে সময়ের দাম ছিলো, বাড়ির সকলের বই পড়া, কাগজের খবর রাখা, আদালত কোর্ট, সরকারি অফিস, রেলস্টেশন, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, ব্রাহ্মমন্দির, পথে ব্যস্তসমস্ত মানুষের যাতায়াত, ঘোড়াগাড়ি, ক্বচিৎ মোটরগাড়ি, বড়ো বড়ো সুন্দর ঘোড়া, হাওদাদার হাতি, রাজবাড়ির মারফত ১৯২৭-এই, ১৯২৭-এর, লন্ডনের হালচালের গল্প ছড়িয়ে পড়া, দিদিমার বই পড়া, বই লেখা, সভা-সমিতি করা, ব্রাহ্মমন্দিরে যাওয়া, তাবিজ-কবজ মানত-না-মানা ঈশ্বর আছেন কিংবা নেই, থাকলে তাঁর চেহারা আছে কিনা—এসব আলাপ, মামার সঙ্গে বসে সেই ১৯২৭-এই রবীন্দ্রনাথের গান শেখা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায়ের গানও, আর স্কুল, কলেজ, বেলা দশটায় ছাত্রছাত্রীতে পথঘাট ভরে যাওয়া, আর ক্রিকেট, টেনিস। আর, এইসব আধুনিকতার সঙ্গে যা চোখে লেগেছিলো তা সৌন্দর্য—রূপ। সোজা সোজা প্ল্যান করে পাতা লাল সুরকির পথ যার দুপাশে বড়ো বড়ো গাছ পথগুলোকে বীথি করে রেখেছে। সেই যে রূপের ফাঁদে পড়া তার থেকে আর মুক্তি নেই।

আমাদের এই জেন্‌কিনস স্কুলটা ভালো স্কুল ছিলো। ষাট বছর পরেও আমার শিক্ষকদের অনেকেই আমার অনুভূতিতে এখনো জীবিত। তাঁদের সম্বন্ধে এখনো আমার কৃতজ্ঞতা মেশানো ভালোবাসার ভাব মনে আছে। তাঁদের যে-মুখ আমরা দেখেছি তা আদর্শবাদীর। এখনকার নিরিখে তাঁরা দরিদ্র ছিলেন। এরকম এক মত থাকতে পারে, দারিদ্র্য মানুষকে কনজুমার গুডস থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে, তাদের আদর্শবাদী করে—আসলে আদর্শবাদ বঞ্চিত মানুষের self delusion। সে যাই হোক, এই আদর্শবাদীদের সংস্রবে আমার শৈশব কেটে গেলো, এই আদর্শবাদ বেশ কৌতুকের ব্যাপার। আমার এবং আমাকে অবলম্বন করে আমাদের পরিবারটারই কোচবিহারে চলে আসা আদর্শবাদের ফল। অনাধুনিক, জমিসংশ্লিষ্ট গ্রাম থেকে, বিদ্যাবিমুখ সামন্ততান্ত্রিক কালচার থেকে, আধুনিক বিদ্যামুখী সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হওয়ার আদর্শবাদ। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে, ষোলো-সতেরো বছর বয়স হতে-না-হতে, কলেজে ঢুকতে-না-ঢুকতে যা বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের কোচবিহারে আসার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য কারণও দেখানো সম্ভব। যেমন আমাদের শৈশবের সে-দুর্গাকার কুঠিবাড়ি তো প্রকৃতপক্ষে অনেক শরিকের হিস্যার দাবিযুক্ত পুরাতন এবং সংস্কার হয় না এমন একটা বাড়ি, সে-বাড়িকে ধরে রাখে যে-জোতদারি, অর্থের হিসাবে তাকে পাবনা জেলাতেও হয়তো প্রথম হাজারের মধ্যে স্থান দেয়া যেতো না, আমার বাবার এমন টাকা ছিলো না যাতে তিনি লন্ডনের রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে দূরে থাক, কলকাতার নাম করা স্কুলের হোস্টেলে রেখে পড়াতে পারতেন। অন্যদিকে মা'র এরকম ইচ্ছা ছিলো : অনর্জিত অর্থাৎ মদ, আলস্য ইত্যাদি থেকে সন্তানদের দূরে রাখা, লেখাপড়া এবং আধুনিক

সংস্কৃতিতে তাদের যুক্ত করা, নিজের দু'হাতের বেড়ের মধ্যে তাদের মানুষ করা। কাজেই দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া। কলেজে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত একরকমের আদর্শবাদ কনজুমার গুডস না-থাকার অভাববোধকে মনে জাগতে দেয়নি। অভ্যাস বড়ো খারাপ বিষয়, আর মনের অভ্যাস, যেমন শুনি, শৈশবে বাল্যে তৈরি হয়ে যায়, ফলত divine discontent অর্থাৎ অভাববোধ আর-কোনোদিনই তেমন করে হলো না। অল্পেই তৃপ্ত থেকে যাচ্ছি, উপরন্তু সেই যে অনেক শরিকের দাবিযুক্ত পুরাতন নীলকুঠি, তার লোহার দরজাগুলো এখনো কম বিপাকে ফেলে না। মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে তা কেউ টেনে বন্ধ করে দেয় not done বলে। ওপারে যাবতীয় র‍্যাটরেসের উপরে সেই দরজাগুলো চেপে বসে।

পড়ার কথা বলছিলাম। আমি পড়ুয়া ছিলাম, ভালো ছাত্র ছিলাম না। প্রত্যেক ক্লাসে প্রাইজ পেয়ে ওঠা যেমন অনায়াস ছিলো, সব বিষয় মিলিয়ে প্রথম দ্বিতীয় হওয়া ঘটে উঠতো না। কয়েকটা লেটার মার্কস নিয়ে first division-এ পাশ করা আদৌ চিন্তার বিষয় ছিলো না, কিন্তু তার বেশি কিছু করা ঘটে উঠতো না। বাবার কাছে বসে পড়া, পরীক্ষার পক্ষে কোনটা important তা তিনি জানতেন না, যে-কোনো বিষয় আগা-সে-গোড়া পড়া আমাদের প্রথা ছিলো। যা শিখতুম তার অধিকাংশই পরীক্ষায় লাগতো না। এইভাবে জেন্‌কিন্‌স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক আর কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ পাস করার পর ভাবনার বিষয় দেখা দিলো। বাবা লেখাপড়ার ব্যাপারে important ইত্যাদি ভাবতে আরম্ভ করলেন। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ তখন নিচের দিকে নামছে। ১৯৩৮-৩৯-এর সেই সর্বব্যাপী রিসেশন। খরচ কমাতে বি.এসসি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতের অধ্যাপককে দিয়ে বাংলা পড়ানো হচ্ছে, সব বিভাগে অধ্যাপকদের সংখ্যা কমছে। বাবার ইচ্ছা ছিলো ইংরেজি পড়ি এবং তখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছিলো পরীক্ষায় বিশেষ ভালো ফল করি, কারণ বিশেষ ভালো ফল না-হলে বিশেষ ভালো চাকরি হয় না। তাছাড়া ততদিনে, তিনি বোধহয় অনুভব করেছিলেন, তার সন্তানের প্রতিযোগিতার মাঠে দাঁড়ানোর বয়স হয়েছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে এই important পড়ার চেষ্টায় আমি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু ওটাকে ভাগ্য না-বললে accumulation of accidents বলতে হয়, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া আমার বাঁচার ব্যাপারে ধরে নিতে হয়। যেমন অসুখগুলো। আমার স্বাস্থ্য খারাপ নয়, ওষুধপত্র ধরে বাঁচি না, কিন্তু যেমন সেই শৈশবের ট্রপিক্যাল স্কুলে যাওয়া, তেমন ক্লাস এইটের থেকে আই.এ. পর্যন্ত প্রতি বছরে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভোগা—আর ওই সময়েই সে-পরীক্ষাগুলো, তাই নয়? কলকাতায় মাস তিন-চার পড়ার পর কী হলো—সানস্ট্রোক হতে পারে, মেনিনজাইটিস হতে পারে, মাথার কষ্টসমেত ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেই-বা কী দোষ, back to pavilion। কোচবিহারে কলেজে অনার্সে ভর্তি হলাম ফিরে। অধ্যাপকদের মধ্যে একজন স্পষ্ট বলেছিলেন, তাঁরা অনার্সের পেপার-সেটার নন, একজামিনার নন, পরীক্ষায় ভালো ফল করতে যে বাছকোছ করে পড়া দরকার, সে-বিষয়ে গাইড করতে পারবেন না। এইভাবে পড়া চললো। প্রফেসররা নোটস দেন না, পাস কোর্সে যেমন পড়ান অনার্সেও তেমন। বোধহয় ফোর্থ ইয়ারে তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল ও ইংরেজিরও প্রধান গুপ্তসাহেবের সঙ্গে তকরার হলো। তিনি বলেছিলেন রাস্কিন বা স্ট্র্যাচিকে নকল করে প্যাঁচালো সেনটেন্স লিখলে অনার্স পাবে না। আমিও রাগের মাথায় বললাম, যদি পরীক্ষা দিই এমন কেউ নেই যে অনার্স না-দিয়ে পারবেন। ইংরেজিতে এটাও একটা প্যাঁচালো সেনটেন্স হয়ে গেলো। তো, সেই প্রিন্সিপ্যাল একটা কাজ করলেন। লাইব্রেরি থেকে বেছে এক আলমারিতে সেই বাছা বইগুলো ভরে তার চাবিটা দিয়ে বললেন—পড়ো গে যাও। সেই অনার্স, যার বিষয় নাকি ইংরেজি সাহিত্য নামক সমুদ্র, তাতে বালতি ডোবাতে শুরু করলাম। যা হবার হলো, অনার্স পাওয়াটা কঠিন নয়। কিন্তু বাবার সেই লেখাপড়ার important বাছার ব্যাপারটা অবশ্যই হলো না। হলেই-বা কতদূর হতো?

তখন ফজলুল হক, আজিজুল হকের আমল ফিরে এসেছে। আমরা যেহেতু কাস্ট-হিন্দু, চাকরিতে ঢোকা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের চাকরি হয় দু-একটি করে। প্রাইভেট স্কুলে পনেরো টাকার

মাস্টারি অথবা প্রাইভেট কলেজে ৫০-৬০ টাকার লেকচারার হওয়া যায়। ওদিকে রিসেশনের ধাক্কা বাবার চাকরিতে লেগেছে। বেতন না-বেড়ে, কমবে এমন আশঙ্কা। পোস্টঅফিসে তখন কাস্ট-হিন্দুর ঢোকা একটু সহজ ছিলো। কম্যুনাল কোটায় বাদ দিয়ে দিয়েও বোধহয় শতকরা চল্লিশটা unreserved vacancy-র জন্য কমপিট করা যেতো। বি.এ. পড়া শেষ হওয়ার আগেই এই পৃথিবীকে বেশ চিনতে পারার চেষ্টা করছিলাম। পরে একটা কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছিলাম। বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে না বেরোতেই ডাকঘর থেকে ডাক এসে গেলো। আদৌ বেকার হতে হলো না। বি.এ. পরীক্ষায় লেখাপড়া শেষ করে, চাকরি। চাকরি করার একবছর হতে-না-হতে বিয়ে। আমাকে বেকার হতে হয়নি। বাইশে পৌঁছে ষোড়শী স্ত্রী পেয়ে স্ত্রীলোকের অভাব বোধ করতে হয়নি। মনস্তাত্ত্বিকরা বলতে পারেন, হয়তো এইজন্য আমার কবিতা লেখা হয়নি, এবং এইজন্যই প্রেমের গল্প লিখতে পারিনি। এই চাকরির ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার। খুব সামান্য চাকরি, পোস্টঅফিসের কেরানির, কিন্তু চাকরিতে পৌঁছে দিতে রাজশাহী জেলার সেই গ্রামে আমার সঙ্গে আমার মামা গিয়েছিলেন। এটা বলা দরকার অ্যাডভোকেট হিসাবে তখন তাঁর আয় আমার বেতনের চল্লিশ গুণ হবেই। এটা একটা প্রমাণ আমার মামার ভালোবাসার ও তৎকালীন আমাদের পাবিবারিক আদর্শের। মামা যেন এই ঘোষণা করেছিলেন আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে মানুষের বিচার হয় না, চাকরিটা করবে বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তোমার দাম কমছে না। তো, মামা সেই গ্রামের রাজামশাইকে ডাকাডাকি করে প্রাসাদের বাইরে এনে নিজের পরিচয় দিতেই আমরা সেই মার্বেলমেঝের রাজপ্রাসাদে অতিথি হলাম. বাজার কাছারিতে বসানো ডাকঘরে কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু মামা যেতেই, আমি তো রাজ-অতিথি থাকতে পারি না, তবে রাজার আদেশে তার এক কর্মচারীর অতিথি হলাম। আর তখনই প্রথম সূত্রপাত সেই অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতার, যা আমাকে অনেকদিন ঘিরে ছিলো। আকাশের পাখি ঘেরাটোপের খাঁচায়।

চাকরির গোড়ায় রাজশাহী আর পাবনা জেলায় ঘুরতাম। রবীন্দ্রনাথের শাহাজাদপুর আর নিজেদের গাঁয়ের রেলস্টেশন পাকসির রেল কলোনিতে সে-সময়কার বেশিরভাগ কেটেছে। শাহাজাদপুরে থাকার সময়ে 'রবীন্দ্রনাথ' এই শব্দটা দিনে দু-একবার করে মনে হতোই। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে তত চিনতাম না। রবীন্দ্রনাথের গান জানা ছিলো, পাঠ্য হিসাবে গল্পগুচ্ছ, দু-একটা প্রবন্ধ, কিছু কবিতা পড়া ছিলো, কিন্তু আর কিছু পড়া ছিলো না। তাঁর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, তাঁর উপন্যাস একটাও পড়িনি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ছাড়া তাদেরও চিনতাম না। আমার কষ্ট হতো শেক্সপীয়ার, ভিক্টোরিয়ান কবিকুল, ভিক্টোরিয়ান ঔপন্যাসিকদের থেকে সরে এসে, সেই সুন্দর কোচবিহারের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। সেই কমপিটিশনহীন পড়ার জগৎ।

ইতিমধ্যে বাবা পৈতৃকভবনে ফিরে আসা স্থির করে ফেলেছিলেন। আমাদের কাছে যাই হোক, কোচবিহার তাঁর কাছে বিদেশ। এখন বেশ বুঝতে পারি তাঁর কাছে কোচবিহারে থাকা কষ্টের ছিলো। তিনি বরং জমিজিরাত ফিউডাল ধাঁচের জীবনে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। আমার সবচাইতে ছোটো দুইভাই তখন বি.এ. পড়ছে, আর আমরা প্রথম তিনজন তখন কোচবিহারের বাইরে চাকরি করছি। ছেলেদের মানুষ করার ব্যাপারেও তাঁর কোচবিহারে থাকার দরকার আর ছিলো না। উপরন্তু তাঁর প্রাইভেট ব্যাংকের চাকরিতে রিসেশনের ধাক্কায় বেতন সংকোচ হতে হতে এমন যে, ১৯৪৩-এর ধাক্কায় তার উপর থেকে মোহ কেটে গিয়েছিলো। ১৯৪৩-৪৪ তিনি গ্রামে ফিরলে আমাদের পরিবারের centre of gravity আবার সেই নীলকুঠিতে ফিরে গিয়েছিলো। কিন্তু ততদিনে তাতে বাস্তবের তাপ লেগে তা একটা ধ্বংসস্তূপ হতে চলেছে।

বাবার কাছাকাছি থাকার জন্য এই সময়ে আমি পাকসি রেল কলোনির পোস্টাফিসে বদলি হয়ে যাই। ডাকঘরে চাকরি করি, রেলবাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা গালগল্প। ওদিকে আমার একটা বাসা আছে যার ভাড়া মাসে চার আনা। সেই সুন্দর সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে, খড়ের পুরো ছাদ, বাঁশের ধাড়ার দেয়াল, অফুরন্ত

কলের জল—আর বিশ টাকায় ঘি, দুধ, মাছে বাঙালির স্বর্গ। বাবা পাল্কি পাঠিয়ে মাঝে মাঝেই বেটা-বউকে নিয়ে যান। আমি দু-চারদিন একা একা থেকে এক বিকেলে অফিস শেষ করে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে থাকি। আমার পাকসির বাসা থেকে পাকুড়িয়া গ্রামের বাড়ি তিন মাইলের কম। কোনো কোনো বিকেলে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেই অভিসার। কোনো কোনো সময়ে মা বেটা-বউকে পাঠিয়ে দেন পাকসির বাসায়। তখনো কুড়িতে না-পৌঁছনো সেই স্ত্রী।

এসব সত্ত্বেও আমি সুখী হতে পারছিলাম না। কোচবিহারের কম্পিটিশনহীন লেখাপড়ার পৃথিবীর বাইরে একা তো ছিলামই, উপরন্তু আলোর বদলে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বদলে, এ কী কালো আর নিদাঘ কঠোরতা! এখানে কমিপিটিশনই সার কথা, এখানে টাকা দিয়ে মানুষ মাপা হয়, চাকরি বড়ো হলে টাকা বেশি, সুতরাং সে বড়ো এবং বেশি মানুষ। ফলে তখনকার মনের সেই নিঃসঙ্গতার পাশে-পাশে একটা দারুণ চাপ পড়ছিলো, তাকে একরকমের inferiority complex বলে বোধহয়। নিজের অভাববোধ নেই, চারিদিকের অভাববোধ উত্তাল ঢেউ হয়ে গ্রাস করতে চায়। এই রকম অবস্থায় ইতিপূর্বেই কাগজকলম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বসা অভ্যাস হচ্ছিলো। লেখা আত্মস্থ হওয়ার স্বাদ দেয়, একটা ভরশূন্য অবস্থায় অন্য রকমের আলোয় চোখ মেলা যায়, আমার সেই কোচবিহারের আমিত্বে থাকা যায়। এইভাবে টাকার অঙ্ক দিয়ে মানুষকে মাপার পৃথিবীকে অস্বীকার করতে আমার সেই অভাববোধহীন আমি দুটো কাজ করে বসেছিলো। কাগজকলম নিয়ে বসা আর ট্রেড ইউনিয়ন করা। আমার চাকরিজীবনে ট্রেড ইউনিয়ন অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। সেটা আদৌ বাড়তি জিনিস বাইরের ব্যাপার নয়। তবে ট্রেড ইউনিয়ন তো সব জায়গায় এক নয়। একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতার অনেকেই আমার সহকর্মী ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। অন্যদিকে তাদের সঙ্গে তফাতও ছিলো। ট্রেড ইউনিয়ন আমার জীবিকা ছিলো না, আমার মতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও শেখায়, নেতা সবচাইতে দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রমিক হবে। কারিগরের যেমন নিজের কাজে গর্ব থাকে শ্রমিকেরও তা থাকবে, কেননা শ্রম তো টাকা উপার্জনের উপায়ই নয়, জীবনও বটে, ট্রেড ইউনিয়ন এমন নয় যে বুড়ি ছুঁয়ে থেকে রাজনীতি করার সুযোগ। চাকরিজীবনে প্রথম দিক থেকেই শেষ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দিলেও সেজন্যই বোধহয় প্রদেশ বা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকিনি। এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে এইরকম ধারণা থাকার ফলে লেচ ওয়ালেসার কথা জানার আগেই এই কোচবিহার শহরে জনাপাঁচেক সহকর্মী নিয়ে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করেছিলাম, পুরনো সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতার শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে। এখনই সেই ট্রেড ইউনিয়ন কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই রাজনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও স্থান করে নিচ্ছে। আমার ট্রেড ইউনিয়নে ভালোবাসা ছিলো, প্রতিবাদ ছিলো, তেজ ছিলো, ক্রোধ ও বিদ্বেষ ছিলো না।

আবার পাবনা জেলার সেই নীলকুঠিতে ফিরে তখন তো বাস্তবের দৃষ্টিতে সব দেখছি। তখন তো তা মনের মধ্যে এক সিপিয়া রঙে আঁকা দুর্গ নয়, বরং অনেক শরিকের দাবি-পাল্টা দাবিতে যার ক্ষয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ ভিত কাঁপছে এমন এক স্বল্পবিত্ত গেঁয়ো জোতদারগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল। কিন্তু কৌতুকের এই, সেই বাড়ি যার উপরে ইঁটগুলো এখন কার কাজে লাগছে, তা কিন্তু শৈশবস্মৃতির ফলে এখনো মাঝে-মাঝে প্রভাবিত করে। যেমন কখনো-বা রাজা রাজবল্লভকে অথবা রাজা রামমোহনকে ভাইবেরাদরের মতো ভালো লাগে। যেমন সেই বাড়ির সেই লোহারপাতের দরজাগুলো যা হয়তো-বা নীল জ্বালের অতিকায় কড়াইগুলো থেকে বাবার ঠাকুরদাদামশায় তৈরি করিয়েছিলেন, সেগুলো এখনো মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়—সমাজের তৈরি অভাববোধ, ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনে তৈরি অভাববোধ, এবং যাবতীয় র‍্যাটরেসের মুখের উপরে।

তো, এই বাড়িটার কথা আর-একটু বলতে হবে। আমি জানতাম না। কিন্তু দেখছি নীল ভুঁইয়া, রাজনগর, গড় শ্রীখণ্ড ওই বাড়িটার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত। যেমন বাবা একবার মাকে

বলেছিলেন—'না-দেখে, না-শুনে আমি কী করে-বা বাবার ঠাকুরদাদাকে তাঁর পোশাক, চালচলন, কথা বলা, মনের ভঙ্গি, নীল ভুঁইয়ার দেওয়ালে একে ফেলেছি'।

কথার ফাঁকে বলা যায় এটা আমার বেশ তৃপ্তি যে আমার নীল ভুঁইয়া ও গড় শ্রীখণ্ড বই দুটো আমার মা, বাবা ও মামাকে বেশ তৃপ্তি দিয়েছিলো। আমার শ্বশুরমশায় বলেছিলেন, গড় শ্রীখণ্ড নীল ভুঁইয়ার চাইতেও সার্থক। এগুলোই আমার পুরস্কার।

চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে একাঙ্ক নাটক লিখতাম। ১৯৪৩-৪৪ হবে, বছরটা ঠিক মনে পড়ে না, এইসব নাটকের একটা 'মন্দিরা' নামে কলকাতার এক কাগজে প্রকাশ পায়। আমার ভাই বোধহয় সেটাকে মন্দিরার সম্পাদিকাকে দিয়ে থাকবে। এর কিছুদিন পরে, আমার সেই কুড়িতে না-পৌঁছানো স্ত্রী দেখতেন সন্ধ্যার পর লণ্ঠনের আলোয় কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসে থাকি। পরের দিন সকালে উনুন ধরানোর ছেঁড়া কাগজও পেতেন। হয়তো উনুনে গুঁজে দেয়ার আগে হাতের লেখাটা প্রিয় বলে উল্টেপাল্টে সেসব পড়তেন। একদিন সন্ধ্যায় বলে ফেললেন—'লেখো তো বটে, ছাপে না তো কেউ'। যোগাযোগের ফলে টেবিলের 'পরে একটা পত্রিকা ছিলো। আমার ছোটোভাই ট্রেনে পড়ার জন্য কলকাতায় কিনেছিলেন। পত্রিকাটি তখনকার দিনের প্রবাসী ভারতবর্ষ ইত্যাদি নয়, শনিবারের চিঠি বা দেশ পত্রিকাও নয়। পূর্বাশা নামক সেই পত্রিকা সেই প্রথম দেখলাম। কয়েকটা লেখায় নতুন ধরন ছিলো। সেদিন যেটা লিখছিলাম পরের দিন সেটাকে শেষ করে তার পরের দিন সেটাকে সম্পাদক, পূর্বাশার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। পনেরো দিন পরেই হবে, কার্তিক মাস পড়তে-না-পড়তে একদিন আমার ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে পনেরো টাকা আর এক কপি পূর্বাশা এসে উপস্থিত। অবাক কাণ্ড! শুধু ছাপায়নি গল্পটা, এত তাড়াতাড়ি, আবার তার জন্য টাকাও। এই 'প্রমীলার বিয়ে' প্রকাশ হওয়ার পরে আর ফিরতে হয়নি। পূর্বাশা আর তারপরে আত্তোয়ারের চাহিদায় চতুরঙ্গে লেখা শুরু হয়ে গেলো। পূর্বাশার অফিসেই বীরেনের (কবি বীরেন চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে আলাপ। আমার লেখা বেশি হতে থাকলে নীহাররঞ্জন রায়ের ক্রান্তিতে, আর, এস.পির কাগজ গণবার্তায় নিয়ে যান। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের কাগজেও ওই একই ব্যাপার। ১৩৫৫-৫৬ হবে, পূর্বাশা পত্রিকার অনিল চক্রবর্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুবের অনুরোধে আমাকে তার কাছে নিয়ে যান। আইয়ুবসাহেব তখন বেশ অসুস্থ কিন্তু লেখককে দেখার ইচ্ছা হয়েছিলো।

এরকম চলতে থাকাকালে আবার একটা আঘাত এলো। ৪৬ খৃস্টাব্দের সেই কলকাতার নরমেধ যার ধাক্কা আমাদের গ্রামেও। ৪৬-র শীতে মা এবং পরিবারের স্ত্রী এবং শিশুদের কোচবিহারের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ৪৭-এর মাঝামাঝি 'মার কঠিন অসুখ' মামাকে দিয়ে এই মিথ্যা টেলিগ্রাম করিয়ে বাবাকে দেশ থেকে বার করে পাঠানো হলো কোচবিহারে। ৪৭-এর ২রা-৩রা আগস্ট আমি কোচবিহারে বদলি হয়ে চলে এলাম। আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ। আবার যেন বাবার সেই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ঝড়ের পদ্মায় সাঁতার। তখন বাবার বয়স ষাটের কাছে। নতুন করে এক ব্যাংকে চাকরি শুরু করলেন। এবার স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।

১৩৬০-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পূর্বাশায় গড় শ্রীখণ্ড প্রকাশ পেতে শুরু করে। তার কিছু আগে থেকেই 'নয়নতারা' নামে নীল ভুঁইয়া উপন্যাসটি চতুরঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছিলো। নয়নতারা এবং গড় শ্রীখণ্ড লেখা সবে শুরু হয়েছে। ১৩৬১-র পৌষে নয়নতারা 'নীল ভুঁইয়া' নামে প্রকাশিত হয়। গড় শ্রীখণ্ড প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৬৩। আমার মনে আছে গড় শ্রীখণ্ড যখন প্রেসে, তখনো আমি বেজওয়াদা রেস্টরুমে এবং রেলগাড়ির কামরায় প্রুফ দেখছি, এবং শেষ চ্যাপ্টার কয়েকটি পুনর্মার্জনা করছি। কী হলো তা বলা দরকার। গড় শ্রীখণ্ড, নয়নতারা বই বাজারে পাওয়া যায় না। আদৌ না। গড় শ্রীখণ্ড কেন লিখেছিলাম? প্রচুর সাদা সুগন্ধী লিলি ফুটছে এখন আমার উঠোনে। দেখছি, রক্ষা করছি, স্ত্রীর পোরট্রেটের নিচে রাখছি। বলতে পারবে লিলি গাছটা কেন মাটি ভেদ করে উঠলো, আর কেন ফুল ফুটলো?

আমার কোন গল্পটা উল্লেখযোগ্য? প্রথম কথা গল্পটা উল্লেখযোগ্য না-হওয়া পর্যন্ত এবং আমার সই

পাওয়ার উপযুক্ত না-হলে তা আমার টেবিল থেকে সরে না আমার বিশ্বাস। কোন গল্পের কথা বলবো? চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের গল্প, না সত্তর-আশির দশকের গল্প? এদিকের কথাই ধরো, সেকালের চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, ক্রান্তি, গণবার্তা ইত্যাদির কথা ছেড়ে দিয়ে। পরিচয়ের 'উপন্যাস লেখা' 'মহিষকুড়া' 'তন্ত্রসিদ্ধি', বারোমাসের 'নেই কেন সেই পাখি' 'মৃন্ময়ী অপেরা' 'বেতাগ বাইতোড় সরশুনা', কলকাতার বাইরের পত্রিকা কৌরবের 'নির্মল সিংঘির অপমৃত্যু' 'অন্তরীক্ষ', সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত 'অর্পিতা সেন সাত একর', লাল নক্ষত্রে প্রকাশিত 'টাইগন লিটিগন', চতুরঙ্গে হালে প্রকাশিত 'মেওয়া ও কেতাব সকল', আজকালে প্রকাশিত আমার সব চাইতে আকারে ছোটো গল্প 'বক্সরুম'। এগুলো গল্পের লিস্টি নয়। আমার কাছে উল্লেখযোগ্য গল্পের সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটা তো বটেই, বেশিও হতে পারে। যেমন 'অ্যাভলনের সরাই', 'এপস অ্যান্ড পীকক' 'হনিড লার্ক' 'মিস্টার ফনটি 'রাজীবোপাখ্যান' 'মোহিত সেনের উপাখ্যান' 'শ্রীলতার দ্বীপ' 'অন্ধকার' 'পায়রার খোপ' 'স্বর্ণসীতা' 'ফ্রয়লাইন' 'মধু সাধু খাঁ' ইত্যাদি ইত্যাদি যা সব এখন পর্যন্ত কোনো বই আকারে বার হয়নি। এখন এই উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে একটা ঘটনা বলি। 'ক্যাসিয়া সাইমিয়া' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম গণবার্তার জন্যে। রাজনৈতিক কারণে গল্পটাকে গণবার্তার অপছন্দ হয়। সংবাদ পাওয়ামাত্র আমি তাঁদের অনুরোধ করি চতুরঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। চতুরঙ্গে অগৌণে ছাপা হয়। পরে, অনেকপরেও, দশ-পনেরো বছরের ব্যবধান ধরে এর-তার মুখে গল্পটার নির্মিতি, ভাষা, অনুকরণযোগ্যতা শুনতে থাকি। এক গল্প সঙ্কলনে গল্পটা রিপ্রিন্ট হয়। যাঁরা করেন, তাঁরাও বিশেষভাবে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী, পড়ান-টড়ান কলেজে। কেমন হলো না? আবার দ্যাখো 'নীল ভুঁইয়া' 'নয়নতারা', আমার বন্ধু বীরেন বললেন—'কী লেখ্সো, ক্ষয়িষ্ণু ফিউডাল জোতদারের কথা'। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক চিঠিতে শুধু উপন্যাসটার মনোহারিত্ব নয়, কলাকৌশল, চরিত্র চিত্রণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেন. শুনেছি তাঁর 'মনে এলো' বইটাতে প্রকাশকরা সবটুকু ছাপেননি। তবে ধূর্জটিপ্রসাদের এই ভালো লাগা যে আন্তরিক ছিলো, তার প্রমাণ অপারেশন করতে ইউরোপে যাওয়ার আগে তিনি আমাকে meet করতে চেয়েছিলেন। গিয়েছিলামও। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো। গায়ে হাত রেখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। অন্যদিকও আছে। আমার পেট্রন সম্প্রয়দা বইটার সমালোচনা লিখতে গিয়ে নয়নতারাকে বালবিধবা করেছিলেন। তাঁর কাছে ফিউডাল সমাজের চিত্র প্রশংসার মনে হয়নি। ভাগ্যে তিনি বলেননি লেখক রাজপরিবার সম্বন্ধে না-জেনে লিখেছে। ওদিকে কার্তিক লাহিড়ী এসব ঘটনার পনেরো-বিশ বছর পরে (কার্তিক লাহিড়ীমশায় লেখাপড়া জানেন এবং বামপন্থীও বটে) নয়নতারা নীল ভুঁইয়াকে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে অনেকটা উঁচুতে রাখলেন। গড় শ্রীখণ্ড সম্বন্ধেও এ রকম গল্প আছে। থাক সে কথা। প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো উপন্যাসে আমি নিজেকে উপস্থিত করেছি সক্রিয়ভাবে? এটার উত্তর : অমিয়ভূষণ? কোথায়ও না। আমার লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন আমি রাজা-রানী, জমিদার, জোতদার, মধ্যবিত্ত, প্রলেতারিয়েত, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত কারো কথাই অবহেলা করিনি। গোটা সমাজের সকলের কথাই বলেছি, সমান সহানুভূতি দিয়ে সকলের সমস্যা বলতে চেষ্টা করেছি, এমনকী তাদের কথাও বলতে চেষ্টা করেছি যারা ভাষার অভাবে নিজেদের অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করতে পারে না। এখন, এই সমস্যা বলতে শুধু খাওয়া-পরার সমস্যা বোঝায় না। রাজনৈতিক সমস্যামাত্র বোঝায় না। খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের সমস্যাই যদি একমাত্র সমস্যা হতো মানুষের জীবনে, তবে মানুষের সমস্যা আর গোরুর সমস্যা এক হয়ে যেতো। তাহলে সেকালে তন্ত্রযান, মন্ত্রযান একালে ফ্রয়েড, অ্যাডলার, ইয়ুং দরকার হতো কি? আমি লোকের কথা বলতে চেয়েছি, অঞ্চলের কথা নয়। মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়, মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়, আবহাওয়া, গাছ-গাছড়া দিতে হয়। এসব করতে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সেসবের কথা শুনে সে-আঁকা ততটা ভালো হয় না। সেজন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূ-ভাগ আমি বেশি এঁকেছি।

আমি কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করি? রাজনীতির কি আদর্শ থাকে? আমার ধারণা আদর্শ কথাটারই ব্যাখ্যা দরকার। রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের, ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা থাকে, আর একা তা পারা যায় না বলে দল করতে হয়। আর বলতে হয় দলের সকলের মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা, ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আদৌ নেই। আদর্শ শব্দটার সঙ্গে মিথ্যাচারণকে মেশাতে আমার আপত্তি আছে। মিথ্যাচারণ ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনো রাজনীতি হয়নি। মিথ্যাচারণ রাজনীতিতে চলবেই, যেমন গেরিলাযুদ্ধের কৌশল, যেমন সৈন্যবাহিনীর কামুফ্লেজ, সাবোটাজ। এই গেরিলাকৌশল, কামুফ্লেজ, সাবোটাজ সবই প্রতিপক্ষের ভ্রমোৎপাদন করতে, ধোঁকা দিতে। রাজনীতিতে যে সত্যবাদী সে বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

এসব থাক। পোলিট্রিক্যাল সায়েন্সই কি একমাত্র সায়েন্স? ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, সাইকোলজি, মেডিসিন কি নেই? যদি ফিজিসিস্ট, ফিজিসিয়ান, সাইকোঅ্যানালিস্ট, তবে সাহিত্যিক কি থাকতে পারে না? তাকে রানীজির দলে ঢুকতে হবে কেন? সাহিত্যিকের কি সমাজ সম্বন্ধে ভালোমন্দ বোধ নেই? নিশ্চয় আছে। অন্যের চাইতে সে মানুষকে বেশি ভালোবাসে বলেই মানুষ সম্বন্ধে, তার অনুভূতির সম্বন্ধে বলতে থাকে। কিন্তু তার বলাটা অন্য অনেকে যা বলেছে তার পুনর্বিন্যাস হবে কেন? সাহিত্যিককে সমাজের চাইতে আগে আগে চলতে হয় না? সাহিত্যিক একটি মাত্র ঘোষণা করতে পারে : সে জীবনের পক্ষে যা কিছু জীবনকে খর্ব করে, ক্ষুণ্ণ করে, শোষণ করে, বন্দি করে পদানত রাখতে চায় তার সঙ্গে সাহিত্যিকের সদ্ভাব হতে পারে না। কোনো পুস্তকের সামনে মানুষকে বলি দিতে চাওয়ার দলে সে নেই। সেজন্য সাহিত্যিক রাজনীতিক হয় না, ধার্মিকও হয় না।

কোনো বিশেষ লেখক সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা নেই। শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথকে সমান সমান ভালোবাসি। সফোক্লেস ভালো, হোমার ভালো, বাল্মীকি ও ব্যাস তার চাইতে ভালো। কিন্তু কী হবে আমার কাছে ভালো-লাগা-ভিনদেশি ঔপন্যাসিক ও কবির নামের তালিকা দিয়ে? আমার স্বদেশের নানা ভাষায় লেখা বইগুলো পড়ারই কি আমার সময় আছে? আসল কথা, কলেজের দিনেই তো মানুষ উপন্যাসাদি বেশি পড়ে। আমার সে-বয়েসে উপন্যাস লুকিয়ে পড়তে হয়। উপন্যাস পড়ার জন্য বিদ্রোহ করাকে দরকার মনে করিনি আর লুকিয়ে কাজ করতে সে-সময়ে অপমান বোধ হতো। ফলে পাঠ্য-সাহিত্য ছাড়া, যা সবই ইংরেজি, সেই যৌবনকালে কিছুই পড়িনি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়েছি চল্লিশে পৌঁছে, রবীন্দ্রনাথকে সত্যিকারের পড়া তখন শুরু হয়েছে। কোনো লেখককে আমার ভালো লাগে এই প্রশ্নের কারণ যদি আমার উপরে কোন কোন লেখকের প্রভাব পড়েছে তা নির্ধারণের চেষ্টা হয়, তবে বলি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়ার আগেই আমার নয়নতারা, গড় শ্রীখণ্ড বেরিয়ে গিয়েছে, অনেক গল্প লেখা হয়ে গিয়েছে। আর তখন সেই বয়সে কে-আর প্রভাবিত করবে! আসলে একসময়ে, কলেজ ছাড়ার পরে দর্শন এবং ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি বই ভালো লাগতো। চাকরি করা, ট্রেড ইউনিয়ন করা, স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানদের ভালোবাসার পর যে-সময়, তার অনেকটা নিতো লেখা ; সময় বাকি থাকলে দর্শন ও ইতিহাস।

কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না আমি আদতে অত্যন্ত আরামপ্রয়াসী, যাকে সোজাসুজি লেজি বলা যায়। মনে মনে গোটা উপন্যাস তৈরি করতে যত সুখ, লিখতে তত আগ্রহ বোধহয় ছিলো না। এখনো নেই। আমি সকালে উঠি, চা খাই আর পায়চারি করি, হাতের কাছে প্রবন্ধের বই পেলে পড়ি, যতদিন স্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতাম—বিয়ের চল্লিশ বছর পরেও ওটাই নেশা, বেলা আটটা হলে, গায়ে সকালে রোদ পড়লে বারান্দায় যেখানে আলো বেশ স্পষ্ট সেখানে বসে কিছু লেখার চেষ্টা। এখন তো অফিস যাওয়ার কথা নেই। স্ত্রী নেই যে বলবেন—'বাজারে যাও, আমি ততক্ষণ কী লিখেছো পড়ে নিই'। বেলা এগারোটা হলে স্নান ও খাওয়ার আয়োজন। খেতে বসার আগেই কী পড়ার বই আছে তার খোঁজ করি। খাওয়ার পরে ঘুম, পড়তে-পড়তে। রোজ ভাবি আজ বিকেলে সন্ধ্যায় কিছু লিখবো—তা আর হয় না। এর ফাঁকে-ফাঁকে, লেখার যখন কোনো তাগাদা থাকে না, রং-তুলি নিয়ে খেলা করি। তাও দেয়ার

ইজ নাথিং সিরিয়াস ইন ইট, খেলা খেলাই।

উত্তরবঙ্গের উত্তরখণ্ডে আমার বাস। কোচবিহার প্রীতির কথা আগেই জানিয়েছি। এই টেমপারেট জোন-এর সুন্দর শহর যাকে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ত্রিশ বছরে নোংরা আর ঘিঞ্জি করে ফেললেও যথেষ্ট খারাপ করতে পারিনি। এই টেমপারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা, আরাম, উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে আমি জানি আমার মা যে জেলের মেয়ে, তোমরা নিষাদ, শবর, পুলিন্দ বলবে কিনা ভেবে দেখো, বা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর বোন, তাকে রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্য কলকাতার এক হাঁটু কাদায় গৌড়িগুগলি তুলতে হয় বটে, কিন্তু তার কপালে সে-সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা হীরার মুকুট। ডায়মন্ডহারবারকে সুন্দরবনকেও নিশ্চয় ভালোবাসি। কিন্তু এই বয়সে সেখানকার রাগ-রাগ ক্লাইমেট আমার সহ্য হবে না। আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহব ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলবেড়ের উত্তর থেকে সিকিম সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো (কেন যে বলো? কোন সমাস এটা? কী কুৎসিত শব্দ!) যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদেব ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক বাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতাব চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদেব মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকে বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিআনা থেকে-দ্যাখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছে, ধোঁয়াব দমবন্ধ, কতদিন-আর অ্যাংলো-স্যাক্সনি মুখোসে থাকবে।

উপন্যাস

ও

গল্প

১
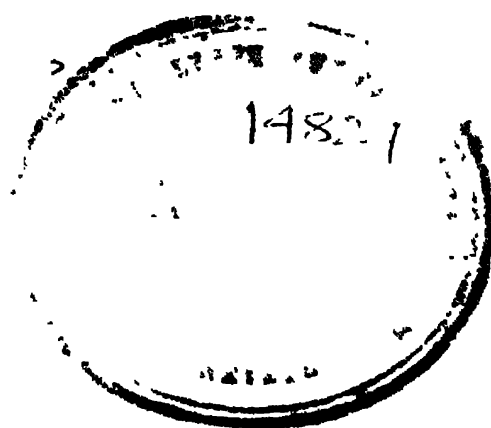
বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে, 'বিরিজ' বলে লোকভাষায়। দুর্ধর্ষা গণগামিনী গঙ্গাকে সে কোন তরুণ আদর করে পদুমা—পদ্মা—বলেছিলো এবং আপন করেছিলো তা কেউ বলতে পারে না ; সে ভালোবেসেছিলো কিন্তু বন্ধন করার চেষ্টা করেনি। তার সর্বনাশা কূলনাশিনী গতিকে শ্রদ্ধাও করেছিলো। এখন ভালোবাসা বংশধরদের রক্তে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়ের সমন্বয়ে সব চিন্তা সব ভাবনার পিছনে ধর্মের অদৃশ্য দৃঢ় ভিত্তি হয়ে আছে।

রেলের লোহার আলকাতরা-মাখানো বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে সুরো আকাশের দিকে চেয়েছিলো। তার মাথার উপরে একটি বিরলপত্র শিশু ছাতিমের শাখা, বাকিটুকু চৈত্রমাসের আকাশ। ইতিমধ্যে রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। দূরের দিকে বায়ুমণ্ডল ঝিলমিল করে কাঁপছে। চিলগুলো খুব উঁচু থেকে পাক খেতে-খেতে খানিকটা নেমে এসে উল্টোপাকে আবার উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। ডানদিকে আকাশের গায়ে লোহার ব্রিজ।

স্টেশনে লোকজন নেই। সুরো—সুরতুন্নেছা—প্রায় একা ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। প্ল্যাটফর্মের বিপরীত প্রান্তে একটা হাত-তিনেক উঁচু তাঁবু খাড়া রোদে পুড়ে যাচ্ছে। তাঁবুর কাছে রূপালী রং করা গুটিকয়েক টেলিগ্রাফের পোস্ট, পাকানো তারের বান্ডিল। সেগুলো এত উত্তপ্ত হয়েছে, মনে হয় চোখে লাগবে সেদিকে চাইলে। পেতলের বড়ো-বড়ো থালা মেজে নিয়ে কয়েকজন মজুর আধঘণ্টা আগে শেষবারের মতো তাঁবুতে ঢুকেছে। কোন দেশীয় এরা কে জানে। পশ্চিমের নয়, তা সুরো ওদের কথায় বুঝতে পেরেছে। কুচকুচে কালো, চুলগুলি ভেড়ার লোমের মতো, চোখগুলো লাল করমচা। পায়ে ভারি-ভারি জুতো, কালচে-সবুজ রঙের প্যান্ট পরনে।

ব্রিজটা অত্যন্ত উঁচু, তার ধরাছোঁয়া পাওয়ার জন্য গ্রামের জমি থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মও উঁচু। এত উঁচু যে বড়ো-বড়ো তালগাছগুলিও পায়ের নিচে থাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে। সেই তালগাছগুলির পায়ের কাছে পোড়োজমির মধ্য দিয়ে গ্রামে যাওয়ার পথ।

প্ল্যাটফর্ম থেকে ঢালু হয়ে জমি নেমে গেছে গ্রামের মাটির দিকে, সেই ঢালু বেয়ে পাকদণ্ডির মতো আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা উঠে এসেছে। সেই রাস্তার পাশে সোনালি-লতায়-ঢাকা আম গাছের আড়াল থেকে একটা ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। আগুন নাকি ? ভাবলো সুরো। নিচের দিকে ভালো করে তাকালো সে আবার। ধোঁয়ার পাকটা এগিয়ে আসছে। ধুলোর থাম—তাহলে বোধহয় পাল্কি আসছে, বেহারাদের পায়ে-পায়ে ধুলো উড়ছে, ঘূর্ণিপাকের মতো হচ্ছে এলোমেলো বাতাস লেগে—এই ভাবলো সুরো। সে ভালো করে চেয়ে দেখলো—একজন কে আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে।

ক্লান্ত অলস অবসর। সে সোজা হয়ে বসলো।

জল ও জঙ্গল নিয়ে জাঙ্গাল-বাঙ্গাল বাংলা দেশের এক গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো। ব্রাত্য 'সান্দার'-বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে। গাঁয়ের পরিসীমার সঙ্গে সম-আয়ত ছিলো তার মনের বিস্তার। গ্রামের মধ্যে গাঁ, বড়ো গ্রামের অংশ ছোটো গ্রাম। পদ্মার চরে বসানো গাঁয়ের একটির নাম বুধেডাঙা, তারই মেয়ে সে। বাউলপীরের গানে-গানে ছড়ানো, কথক-পাঠকের মুখে-মুখে রঙানো ধর্ম-দর্শন ন্যায়-নীতির প্রবেশ হয়নি তার মনের সীমায়।

ধান যখন নতুন বউ-এর মতো পাত্রে-অপাত্রে অকাতরে সলজ্জ হাসি বিলোচ্ছে তখন আহার করা,

এবং ধানের দিন সরে যেতে-যেতেই উপোস শুরু করার অভ্যাস ছিলো তার। কিন্তু বাঙাল নদীর দু-পাড়ে সে-বার এক দুর্ভিক্ষ এলো। তারপর গ্রামের বাইরের জীবন। র‍্যাল, হাউইজাহাজ, সোলজার। আঘাতে-আঘাতে তার মনের পরিসীমা বিস্তৃত হতে লাগলো। বাঙাল নদীর হংসপক্ষ-বিধৃত একটি দৃশ্যপটে সহসা যদি বনরাজির মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়াকলের চোং জেগে ওঠে, যদি চোং-এর ফাঁকে-ফাঁকে হাঙর রং-এর লোহার পাখি গর্জন করে উড়ে যায়, সুরোর মনের তুলনাটা দেওয়া যায় তাহলে।

ট্রেনের অপেক্ষা নয়, প্রতীক্ষা করছে সে। এ স্টেশনটায় মেল ট্রেন থামে না। কিন্তু ফুলটুসি তাকে বলেছে আজকাল বড়ো-বড়ো ট্রেনগুলিও আকস্মিকভাবে এ স্টেশনে থেমে যায়, সাহেব-সুবো নামে কখনো-কখনো, বেশিরভাগই নামে বুট-পরা, প্যান্ট-পরা মজুররা। এখানে সুবিধা এই, পুলিসের ভয় এখানে কম। দিঘার স্টেশনে চালের কারবারিদের পুঁটুলি নিয়ে পুলিসের লোকেরা বড়ো জুলুম করছে কিছুদিন ধরে। এখানে তাদের চোখের আড়ালে কিছু করা যায় কিনা এ-খোঁজ নেওয়াও তার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনো ট্রেন না-থামতেও পারে, কোন ট্রেনটা থামবে তারও নিশ্চয়তা কিছু নেই। সকাল থেকে দু-তিনখানা না-থেমে চলে গেছে, যে-কোনো একটা থামবেই এই আশা নিয়ে সুরো প্রতীক্ষা করছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলো সুরো এবং অনুভব করলো নিশ্চয়ই সে একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলো। চোখ মেলে যা সে দেখলো তাতে মুখে কথা সরলো না। চারহাত উঁচু নিরেট পুলিসের থাম। দিঘা থানার বড়োদারোগা ছাড়া আর কেউ নয়। সুরো পৃথিবীতে কোনো দারোগাকেই চিনতো না, কনক হোক কিংবা হিরণ। কিন্তু এমন প্রকাণ্ড, এমন সুন্দর কনক ছাড়া আর কে হবে। সান্দারদের মুখে গত দু-তিন বছর ধরে কথা। কিন্তু স্বজাতীয়দের আলাপ থেকে যা কল্পনা করেছিলো সুরো তার চাইতেও দৃঢ় এর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তার চাইতেও ফর্সা। খাকি রং-এর বুকখোলা সার্ট ; টুপির নিচে কৌশলে বসানো রুমাল দিয়ে দুটি কান, ঘাড়ের অনেকটা ও খানিকটা করে মুখ ঢাকা। সুরো চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকালো। চকচকে লাল চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু জুতো। জুতো নিয়েই জন্মেছিলো নাকি? নতুবা এ-জুতোয় পা যায় কী করে? কিন্তু পরক্ষণেই ধকধক করে উঠলো সুরোর বুক, আর কিছু দেখবার সাহস অবশিষ্ট রইলো না তার।

সান্দারদের জাতশত্রু পুলিস। শত্রুতা এখনকার দিনে আর সক্রিয় নয়। সরকারের কাগজপত্রে সান্দারদের নাম অপরাধপ্রবণ উপজাতি হিসাবে লেখা আছে। তারই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সান্দারপুরুষকে সপ্তাহে একদিন গিয়ে থানায় হাজিরা দিতে হয়। এটা সয়ে গিয়েছিলো। তবু জাতশত্রুতা এমনই জিনিস, থানা থেকে ফেরার পথে কখনো-কখনো কোনো-এক সান্দারের মেজাজ বিগড়ে যেতো, পুলিসকে উত্যক্ত করার জন্যই পথ চলতে কারো পকেট কাটতো, কিংবা দোকান থেকে দুটো টাকার মাল সরাতো। হৈ-হৈ—পুলিস আর সান্দারে দ্বন্দ্ব। কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে সেসব আন্তর্জাতীয় ফুটবল খেলা। কনকদারোগা দিঘায় আসার পর থেকেই ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছিলো। সান্দাররা এমন ভয় কোনো দারোগাকে কোনোদিন পায়নি। দুরন্ত ছাত্র যেন হঠাৎ এক কড়া মাস্টারমশাইয়ের সম্মুখে পড়ে কী করে তাকে ভালোবেসেও ফেলেছে। কনকের দৃষ্টি সান্দারদের অন্তস্তল দেখতে পায়। অন্য কোনো দারোগা হলে সুরো ব্যাপারটাকে নিছক দুর্ঘটনা মনে করতো। ভাবতো, ভাগ্যের বিরূপতায় দারোগার পরিক্রমায় সে পড়ে গেছে। বে-আইনি চালের কৌশলগুলি প্রয়োগ করে দারোগাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু কনকদারোগা, কনকদারোগাই। এ কথা না-ভেবে বলা যায়, ভাবলো সুরো, কনক তার খোঁজেই এই দুপুর-রোদ মাথায় করে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

কনকদারোগা বললো 'বাড়ি কোথায় তোর'? উত্তর পাওয়ার আগেই ধমক দিয়ে উঠলো, 'চোপরাও বেটি, মিথ্যে বলবি তো—'

'জে, বুধেডাঙা'।

স্ত্রীলোক না-হলে কনকদারোগা তার অনুশীলিত ইংরেজি গালির বাংলা তর্জমায় তাকে বিধ্বস্ত করে

দিতো। নিজেকে একটু সামলে সে বললো, 'সান্দার'?

কুণ্ঠা ও ভয়ের দলাটা গলা থেকে নামিয়ে সুরো বললো, 'জে, চালের কারবার করি। এখন চাল সঙ্গে নাই'।

কনক হো-হো করে হেসে উঠলো। প্ল্যাটফর্মে সুরো ছাড়া দ্বিতীয় শ্রোতা নেই, হাসিটা প্রতিধ্বনিত হয়ে নিজের কানে ফিরে আসতেই হাসিটার মাঝখানে কেটে একটা কথা বসিয়ে দিলো সে—'সুরো তুই'?

সুরো এবার উচ্ছ্রিত জানুতে মুখ গুঁজে বন্দুকের গুলির প্রতীক্ষা করে কাঁপতে লাগলো।

কনক বললো—'আমি সব খবর রাখি। তুই, ফতেমা, এসব কে-কে চালের চোরা কারবার করছিস খবর পেয়েছি। তা কর, কর। কী করবি আর'!

সুরো মুখ তুলে দেখলো কনকদারোগা প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্তে চলে গেছে। জুতোর চাপে গুঁড়ো পাথরগুলো সরসর করছে। কী-একটা যন্ত্র বার করে কনক একবার পরীক্ষা করলো। দারোগার কোমরে চামড়ার খাপে যখন ঝুলছে তখন বন্দুক ছাড়া আর কী! ছোটো বন্দুক, এই ভাবলো সে। এই দুপুরের নিস্তব্ধতায় কনক যদি একটা গুলি তার বুকে বসিয়ে দেয়, কেউ জানতেও আসবে না, খোঁজও করবে না। কিন্তু তবে আর দেরি কেন? সহসা তার মনে হলো : কার কাছে যেন সে শুনেছিলো কনক সান্দারদের একরকম ভালোবাসে। কনকের বোধহয় কষ্ট হচ্ছে, অপরাধের শাস্তি দিতে তার মন সরছে না। সুরোর মনে হলো সে কেঁদে ফেলবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কনক আবার তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'তুই তো সান্দারদের মেয়ে, চিকন্দির সান্যালবাড়িতে গিয়েছিস কখনো'?

'জে, গেছি'।

'সান্যালমশাই-এর ছেলেপুলে কটি জানিস? তাঁর বড়োছেলেকে দেখেছিস'?

'জে, না'।

'তুই দেখবি কী করে'! কনক আবার দূরে চলে গেলো।

অনেক নিচে স্টেশনবাড়ি। সেখানে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা পড়লো। গাড়িটা এখনই এসে পড়বে, তারই প্রস্তুতি। কিন্তু প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় তা নয়। টিকেট কাটার সোরগোল নেই, কুলিদের হাঁকাহাঁকি নেই। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে মাত্র দুজন লোক স্টেশন থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলো। তাদের মধ্যে একজনের হাতে নিশান, আর-একজন সম্ভবত কৌতুকপ্রিয় দর্শক। কনক একবার ঘড়ি দেখলো। তাহলে এ-গাড়ি আজ এখানে থামবে? উঠে দাঁড়ানোর মতো ক্ষণিক একটা তাগিদ সুরো অনুভব করলো, পরমুহূর্তে কনকের উপস্থিতি সেটাকে মিইয়ে দিলো।

গাড়ি থামলো। জানলা দিয়ে কৌতূহলী যাত্রীরা মুখ বাড়িয়ে দেখলো স্টেশনটাকে। কেউ-বা এই প্রথম পদ্মা দেখছে, বললো তার কথা। নিশানওয়ালা লোকটা গার্ডের সঙ্গে কী কথা বলে ছুটলো ড্রাইভারের কাছে আর-একটি কথা বলতে। কনক ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে টান দিয়ে উর্দিটা ঠিক করে নিলো, টুপিটা মাথায় আর-একটু কষে বসিয়ে দিলো, পাশে খাপে-ঢাকা রিভলবারে হাত দিয়ে একবার অনুভব করলো, তারপর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

গাড়ির একটি কামরা খুলে ঝাঁকা নিয়ে দুজন গ্রাম্য চাষী নামলো। ধুলোমাটির তৈরি সহিষ্ণু ক্লান্তির মুখোশ আঁটা তাদের মুখে, অন্য কোনো অনুভবের লেশ নেই তাতে। কনক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে দেখলো। ছ'ফুটের কাছাকাছি উঁচু বলে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে এ-দুটি চাষীর একটিও সে নয়।

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি উঁচুশ্রেণীর একটি কামরার দরজা খুলে একটি মহিলা নামলো। একটি সাধারণ মেয়ে, রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে, পরনে সাধারণ শাড়ি। নিজের হাতে ছোটো স্যুটকেসটি নামালো, গাড়ির ভিতর থেকে একজন সুবেশ য়ুরোপীয় তার ছোটো হোল্ডঅলটি নামিয়ে দিলো। স্যুটকেস-হোল্ডঅল স্টেশনে নামিয়ে মহিলাটি য়ুরোপীয়টিকে হাত তুলে নমস্কার করলো। কনক এগিয়ে গেলো মহিলাটির

দিকে, তাকে দেখতে নয়, য়ুরোপীয়টিকে লক্ষ্য করতে। তার ঋজুতা লক্ষণীয়। কনককে বুট ঠুকে স্যালুট করতে হলো। লোকটি পুলিসসাহেব স্বয়ং। কিন্তু একটা পা কাঠের বলে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেননি।

গাড়ি ছেড়ে দিলে কনক প্রথমে ভাবলো ফাইলটা যখন ওঁর সামনে যাবে তখন উনি নিশ্চয় বুঝবেন এ-স্টেশনে কী করছিলো কনকদারোগা ধড়াচূড়া এঁটে। খুশি হলো কনক, সেই খুশি মন নিয়ে সে মহিলাটির দিকে ফিরে চাইলো। ছোটো নাক, ছোটো কপাল; দেহ-বর্ণের অনুজ্জ্বলতাকে ছাপিয়ে উঠেছে ঠোঁট দুটির গড়ন। আর চোখ! কনক কৌশল করে দ্বিতীয়বার চোখ দুটি দেখে নিলো। যেন একটি মীনের ছায়া জলের তলায় স্থির হয়ে আছে, এখনই চঞ্চল হয়ে উঠবে। চোখের প্রান্ত দুটি রক্তাভ।

'আপনি চিকন্দি যাবেন'?

মহিলাটি একটা ক্ষীণ হাসি দিয়ে কনকের প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করলো, 'পুলিসদের সব খবরই রাখতে হয়। যাবো চিকন্দি, কিন্তু কেউ নিতে আসেনি। একটা গাড়ি-টাড়ি—'

'ওসব এদিকে পাওয়া যায় না। আপনি নিশ্চয়ই এই প্রথম আসছেন। সান্যালদের কারো বাড়িতে যাবেন'?

'আপনাব অনুমান ঠিক'।

'সান্যালমশাই-এর বড়োছেলেকে আপনি চেনেন'?

'আপনাদের বড়োসাহেব, ওই যে আমাকে নামতে সাহায্য কবলেন, তাঁর সঙ্গেও এই আলাপই হচ্ছিলো। খোঁজটা আমিও নেবো। এতদিন ধারণা ছিলো আমার, তিনি আপনাদেবই কাছে আছেন। দিন-পনেরো আগে কলকাতার পুলিস তাঁকে অ্যারেস্ট করেছে'।

'তিনি'?

'তিনি আমার স্বামী'।

কনক দৃশ্যত অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। রক্তবিন্দুলেশহীন কপাল ও সিঁথি থেকে চোখ নামিয়ে সে বললো, 'আচ্ছা, আমি একটা পাল্কি পাঠিয়ে দেবো'।

মহিলাটি আবার হাসলো, 'এ-জেলায় ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে পুলিসসুপার, তারপর আপনি, মোটামুটি পুলিসই আমাকে সাহায্য করছে। ধন্যবাদ'।

কনক মহিলাটির কাছে বিদায় নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে টুপি খুলে ঘাম মুছলো। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে তার। পিস্তল উঁচিয়ে একটা সাধারণ ডাকাত ধরতে যাওয়ার চাইতে অনেক বেশি ক্লান্ত হতে হয় এসব ব্যাপারে।

সুরো গাড়ির দিকে এক পা এগিয়েছিলো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করার জন্য কনক এগিয়ে এলো। সুরোর মনে হলো যথেষ্ট করুণা করেছে কনক, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে তারই সামনে গাড়িতে উঠে বসতে গেলে সে ক্ষমা করবে না।

কিন্তু বিস্ময়ের চাইতে বিস্ময়, উঁচু কেলাসের গাড়ি থেকে নামে যে-ভদ্রলোকের মেয়েছেলে সে-ও কি চালের কারবার করে! নতুবা দারোগা অমন খবরাখবর করে কেন? ওর বোধহয় বাক্স-বিছানা বোঝাই চাল। চাল, তুমি কত রঙ্গই দেখালে! কনক তাহলে ওর খবর পেয়েই এসেছিলো, তার নিজের মতো পাঁচ সের চালের কারবারিকে ধরতে দারোগার নিজের আসা একটু অস্বাভাবিকই বটে, এখন ভাবলো সুরো।

তবু কনকদারোগার ব্যবহার চিরকালই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ধরতেই যদি আসা, ধরলে না কেন?

সুরো উঠে দাঁড়ালো। আজ আর কোনো গাড়িই ধরবে না। তাহলে কোন দিকে যাবে সে? দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে গ্রামে যাওয়া যায়, কিন্তু কাল সকালেই আবার দেড় ক্রোশ পথ বেয়ে আসতে হবে স্টেশনে। নতুবা যাওয়া যেতে পারে দু ক্রোশের পথ বিধায়। সেখানে অনেক গাড়ি থামে উত্তরে যাওয়ার। না-ও যদি পাওয়া যায়, মাধাই বায়েনের ঘরে এক রাত বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

সে দিঘার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

সুমিতি নিস্তব্ধ স্টেশনটির চারিদিকে চেয়ে দেখলো। পুলিসের ছোটো-বড়োদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যা হয়নি এখন সেটা হলো, বিজন স্টেশনটায় বসে নির্জনতায় তার গা ছমছম করে উঠলো। ডানদিকের ব্রিজটাই বোধহয় সভ্য জগতের শেষ সীমা। এপারে গাড়ি পাওয়া যায় না এমন দেশ। গ্রাম সম্বন্ধে সুমিতির ধারণা একেবারেই নেই তা নয়। রাজনৈতিক কাজে সে গ্রামে গিয়েছে। সেসব গ্রাম ম্যালেরিয়াজীর্ণ ; ডোবা-জঙ্গল ও ক্ষয়িষ্ণু ভগ্নস্তূপে ভরা! কিন্তু সেসব গ্রামে গিয়েছে সে পার্টির মোটরে, সঙ্গে সমবয়সী ছাত্রছাত্রী। মোটর না-চলেছে তো গোরুগাড়ির বন্দোবস্ত আগেই করা থাকতো। চড়ুইভাতির উন্নততর সংস্করণ সেসব পরিক্রমা—এই ধারণা এখন সুমিতির। এখানে এমনি বসে থাকার চাইতে পুলিসের সাহচর্যও ভালো ছিলো। দারোগাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে, মনে হলো সুমিতির। লোকটি ভদ্র, সঙ্গে থাকলে কিছু-একটা ব্যবস্থা না-করে পারতো না। পাল্কি পাঠাবে বলে গেছে বটে, কিন্তু অনেক পুরুষের ক্ষেত্রেই সুমিতি দেখেছে, সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দিয়ে কাজ করানো যত সহজ, অলক্ষ্যে থেকে নির্দেশে ততটা করানো যায় না। সুমিতির সেক্সপীয়র-কর্ষিত মনে যে কথাটা কাঁটা দিয়ে উঠলো সেটা এই : সৌন্দর্য, সোনার চাইতেও কাউকে-কাউকে বেশি প্রলুব্ধ করে।

সান্যালরা জমিদার, কিন্তু তাদের সেই দুর্গ কত মাইল দূরে কে জানে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার কথা মনে পড়ে গেলো সুমিতির। তার মনে হলো চূড়ান্তভাবে—এতদিন যেসব প্রতিপক্ষের সম্মুখে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে বিখ্যাত হয়েছে তারা ডাকাতে রাজনৈতিক মত পোষণ করে, কিন্তু ডাকাত নয়।

সে চিন্তা করতে লাগলো, ওই মেয়েটির মতো নিরাভরণ এবং মলিন মোটা শাড়ি পরে এদেশে আসা উচিত ছিলো কিনা ; ঠিক এমন সময়ে হুই-হুই শব্দ করে চার-পাঁচজন বেঁটে শুঁটকো লোক আলকাতরা-রঙানো একটা কাঠের বাক্স নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বাক্সটির গায়ে লম্বা দাঁড়া লাগানো, আর সেই দাঁড়ায় কাঁধ দিয়ে বাক্সটিকে লোক ক'টি বয়ে আনছে দেখে সে বুঝলো পাল্কি সেটা। সে তার সজ্ঞান জীবনে এই প্রথম একটি পুলিসকে ধন্যবাদ দিলো এবং ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ইংলন্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে প্রশংসা করলো। মনে-মনে বললো : লোকটি ইংলন্ডের পুলিসদের মতো।

কিন্তু প্রথম কথা ঐ বাক্সে ঢোকা, দ্বিতীয় কথা বাক্সে ঢোকামাত্র লোক ক'টি তাকে ভূমি থেকে সংস্পর্শশূন্য করে কাঁধে তুলবে। তারপর তাদের খুশির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বেহারাদের আভূমি-আনত সেলাম সে দেখতে পায়নি, এবার তাদের সসম্ভ্রম আহ্বানে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে হাসতে হলো। হাসিই একমাত্র মনোভাব যেটা টেনে এনে অন্য মনোভাব ঢাকা যায়। সুমিতি ভয় ঢেকে ভয়ে-ভয়ে বললো, 'সান্যালদের বাড়ি চেনো'?

'জে, মা'ঠান, ভেনারা মুনিব'।

'তোমরা পথ চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো'?

'জে, আপনি উঠলিই গেলাম'।

'যদি দরকার হয় কাল তোমাদের দারোগাসাহেব খুঁজে পাবেন'?

'তা আর পাবেন না! তিনি তো আমাদের বাড়ির 'পরে ঘোড়া থামায়ে পাঠায়ে দিলেন'।

সুমিতি ওদের প্রদর্শিত উপায়ে পাল্কিতে উঠে বসলো। লোকগুলি অনাহারজীর্ণ কিন্তু অভ্যস্ত হাতে মোটগুলো পাল্কির ছাদে বেঁধে নিয়ে এক নিমেষে পাল্কিটা শূন্যে তুলে ফেললো। দু-হাতে পাল্কির দেয়াল আঁকড়ে ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে সুমিতি চিকন্দির দিকে রওনা হলো।

মাথার উপরে প্রখর সূর্য, মেঠো ধুলোর পথে পা পুড়ে যাচ্ছে। কাপড়ের পাড় দিয়ে বাঁধা জট-পড়া লালচে চুলের খোঁপাবাঁধা মাথাটা ক্লান্তিতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। রোদে উত্তপ্ত হয়ে তার কটা রং লালচে দেখাচ্ছে। হাঁটার তালে-তালে ডান হাতখানি দুলছে পুরুষালি ভঙ্গিতে। সে-হাতের উপরে নীল উল্কিতে আঁকা ডানা-মেলা-এক পক্ষী।

ডানা ম্যালেছে পক্ষী! স্বগতোক্তি করলো সুরো। কথাটা অন্যের মুখে শোনা। মাধাই বায়েনই বলেছিলো একদিন তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে।

মাধাই বায়েন (কখনো মাধব বাদ্যকর) আমার-তোমার চোখে নীল, কখনো-বা খাকি উর্দিপরা একটি রেলওয়ে পোর্টারমাত্র। বড়ো-বড়ো চুলে পাতাকাটা সিঁথি, পায়ের মাপের চাইতে বড়ো একজোড়া চপ্পল পায়ে শিশ দিতে-দিতে যে বন্দর দিঘার স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে এর-তার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরে বেড়ায়, সুরোর হাতে সে-ই নীলপক্ষী আঁকিয়ে দিয়েছে। সুরোর হাতে একজোড়া বাঁকা তোবড়ানো কালচে কাঁসার চুড়ি ছিলো এককালে। মাধাই একদিন চুড়িজোড়া খুলে ফেলে দিয়েছিলো তার অনুমতি না-নিয়ে, তার বদলে কিছুই আর পরতে দেয়নি। ব্যাপার দেখে সুরো সাবধান হয়ে গিয়েছিলো। ছোটোবেলা থেকেই দস্তার যে-চিকটা তার গলায় ছিলো সেটা নিজেই একদিন খুলে ফেলেছে।

এখন সুরো মাধাই বায়েনের ঘরের দিকেই চলেছে। মাধাই তাকে চালের ব্যবসায়ের হদিশ বলে দিয়ে রওনা করে দিয়েছিলো।

সে আর কী করেছে তার জন্য, ভাবতে গিয়ে কোথায় আরম্ভ করা যায় খুঁজে পায় না সুরো। মাধাইয়ের মুখে সে শুনেছে : পশ্চিমের মজুররা ইট তৈরি করছিলো দিঘা আর চিকন্দির মধ্যে এক মাঠে। অনাহারের প্লাবনের মধ্যে আহারের দ্বীপগুলির অন্যতম সেটি। আহারের আশায় না-হোক, জলের আশায় ইট তৈরির ভেজানো কাদার একটা তালের কাছে সুরোর দেহটা মুখ গুঁজে পড়ে ছিলো। মাধাই তাকে দিঘা বন্দরে তার নিজের ঘরে তুলে এনেছিলো। কী করে আনলো? মাধাই বলেছে—'তুই কী এমন ছিলি, হাড় কখানাই ছিলো। তাই সম্ভব, নতুবা মাধাইয়ের এমন-কিছু মজবুত পালোয়ানি দেহ নয়'।

সুরোর যখন খেয়াল করে দেখবার-শুনবার অবস্থা হলো সে দেখেছিলো, একটা স্বল্পপরিসর ইটের ঘরের মেঝেতে সে শুয়ে আছে, আর তার মুখের উপরে ঝুঁকে আছে একটি অপরিচিত পুরুষের মুখ। মাধাই তখন অপরিচিত ছিলো। অন্নের উত্তাপে দেহ আতপ্ত হয়েছে তখন, মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ফুটি-ফুটি করছে। পরিধেয়ের সন্ধান করতে গিয়ে সে দেখেছিলো, একটুকরো কোরাথান যেমন-তেমন করে তার গায়ে জড়ানো।

এবার পুরুষটি কথা বললো—'তোর কাপড়টা ফেলে দিলাম। যা ময়লা, আর পিঁপড়ে কত'!

একটু পরেই আর-একজন পুরুষ ঘরে এসেছিলো। তখন সুরো বুঝতে পারেনি, এখন তার মনে হয় সে ডাক্তার। কিন্তু মাধাই কী বলেছিলো মনে আছে—আমার বুন, গাঁয়ে ছিলো।

সুরতুন্নেছার পক্ষী-আঁকা হাতখানি ঘন-ঘন দুলতে লাগলো। তার মন কল্পনায় বহু সময় লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

একদিন তার প্রশ্নের উত্তরে মাধাই বলেছিলো—যে-কেউ চোখে পড়তো তাকেই আনতাম, তাকেই খাওয়াতাম।

পৃথিবীতে থাকার মধ্যে মাধাইয়ের এক বুড়ি মা ছিলো। যতদিন মাধাই গ্রামে ছিলো মায়ের সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিলো না। বুড়ি যদি ক্ষুধার মুখে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে না-পারতো মাধাই তাকে মারতো ধরে-ধরে। আলসের বেহদ্দ ছিলো সে। কিন্তু গ্রামে অনাহার এসেছে এই খবর পেয়ে সে গিয়েছিলো রেল-কোম্পানির-দেওয়া র‍্যাশানের চালডাল নিয়ে মায়ের জন্য। সংবাদটা কেউ তাকে দেয়নি। মায়ের

পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা থালাবাসন, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড় ঘটনাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছিলো। ধুলায় আচ্ছন্ন ক্লান্তমুখ চোখের জলে আবিল করে সে ফিরে আসছিলো। পথের ধারে পড়েছিলো সুরো। মায়ের বুভুক্ষু আত্মার তৃপ্তি হয়েছিলো কিনা কে জানে, মাধাইয়ের শূন্যীভূত আত্মা একটা অবলম্বন পেয়েছিলো।

কিন্তু এ-উত্তরটা মনে-মনে উচ্চারণ করে সুরো সুখী হতে পারে না। মাধাই তার দ্বিতীয়বারের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলো—একদিন তুই আমার হয়ে চোরের মার খেয়েছিলি, সেজন্যে।

সেই বিশ্বব্যাপী অনাহারের দিনের আগেও সুরোর মতো যারা তাদের অনাহারের দিন ধানের ঋতুগুলির মধ্যেও ইতস্তত ছড়ানো থাকতো। পৃথিবীতে সে একা। তার বাবা বেলাত আলির মৃত্যুর পরও সে কী করে খুঁটে খেয়ে বারো থেকে আঠারোতে সম্পূর্ণ একা-একা পৌঁছেছিলো, ভাববার বিষয়। তার পিতৃধনের মধ্যে ছিলো একখানি কুঁড়ে, একটি গাভী।

তখন একনাগাড়ে দু-দিন ধরে তার অনাহার চলছিলো। ছোটো নিচু খড়ের চালাটার নিচে সে আর তার গর্ভবতী গাভীটি। খালি পেটে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে ভোরবেলা সে উঠে বসলো। ভাবলো, ডাঁশ কামড়াচ্ছে বোধ হয়। গাভীটাকে কাল থেকে বাইরে বেঁধে রাখবে স্থির করলো। ওটা বিয়োলে একটা হিল্লে হয়।

ক্ষুধার ব্যাপারটা একবার যদি মনে পড়েছে ঝাড়া দু-ঘণ্টা লাগবে তোমার ভুলতে—এ-কথায় ও-কথায় ফিরে-ফিরে মনে পড়ে যাবে।

সান্যালবাড়ির ঢেঁকিশালের কাছে বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলে পেট ভরার মতো ভাত রোজই পাওয়া যায়। কিন্তু পথের প্রতিবন্ধক দেবীদাস আছে। বুধেডাঙা চিকন্দি যাওয়ার পথে তার বাড়ি। মাহিষ্য দাসদের দেবী সান্দার-ছেলেদের খেলার সঙ্গী ছিলো, সুরোর বাল্যপরিচিত। কিন্তু দেবীর গলা একদিন ভার হলো। মাথায় বেড়ে ওঠার চাইতেও স্বরের পরিবর্তনটাই বেশি লক্ষণীয়, সেটা যেন রাতারাতি হলো, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের দৃষ্টির। সুরোকে আগেও দেখেছে দেবী, কিন্তু এ-দেখা অন্যরকম। দেবীদাসের ভয়ে সুরোর এ-পথে চলা কঠিন।

ভয়ের মূলে আছে তার অল্পবয়সের একটি বেদনার ঘটনা। তার বাবা বেলাত আলি তখন জীবিত। তার ফিরবার পথের দিকে চেয়ে দশ-এগারো বছরের সুরতুন্নেছা ঘাটিয়ালের ঘাটের চালায় অপেক্ষা করছিলো। শুকনো খটখটে সন্ধ্যা—আবির ছড়ানো, ঝিঁঝি ডাকা, উদাস করা সেই সন্ধ্যায় ঘাটের অনতিদূরে ধর্ষিতা হয়েছিলো সে।

গোরুটিকে দড়ি ধরে বাইরে নিয়ে এসে ঘরের সম্মুখে বাবলার চারাটায় বেঁধে দিয়ে চারিদিকে তাকালো সে। তখন সম্ভবত পৌষ মাস। হালকা একটা কুয়াশার আবরণ মাটির আধ হাত উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে। রজব আলি সান্দারের বাড়ির দুখানা খড়ের ঘর আর খড়ের গাদাটি আসলগুলির ছায়ার মতো চোখে পড়ছে। রজব আলির বাইরের দিকের ঘরখানির সম্মুখে তার ছোটো ধানের মরাইটার পাশে বাঁশের খাঁচায় বসানো চারিতে মুখ দিয়ে তার দুটি বলদ, দু-তিনটি বকনা গাই হুস হুস করে খড়-ভেজানো জল খাচ্ছে, চপ চপ খস খস শব্দ হচ্ছে বলদগুলোর মুখে, সট সট করে বাবলার শুকনো বিচি চিবুচ্ছে গাইগোরুগুলো।

আগে রজব আলির মতোই ঘর ছিলো সুরতুনদের। গাই-বলদ ছিলো না তেমন, কিছু পাঁঠা-বকরি ছিলো। এখন মাত্র এক কাঠা জমির উপরে একখানা চালা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের পেছন দিকের বেড়া ঘেঁষেই আজকাল রজব আলির জমি। সামনের দিকের কয়েক পা গিয়েই সুরতুনের জমির সীমানা শেষ, তার পরই রজব আলির ভুঁই। বেলাত আলি নাকি জীবিতকালে রজব আলির কাছে ধান ধার করেছিলো, সেই ধানের মূল্য রূপে রজব আলি জমিগুলি দখল করেছে। পিতামহ আলতাপ জীবিত থেকেও রজব আলির কাজকে ধিক্কৃত করেনি, সেক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে সুরো কী করতে পারে?

কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। বাঁ-দিকের দু-তিনটি গোরুর রং স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর দেরি করা যায়

না। আল থেকে নরম মাঠে নেমে সোজাসুজি পাড়ি দিয়ে সুরতুন গিয়ে দাঁড়ালো লালচে রঙের বলদটার পাশে। সেটার আড়ালে হেঁট হয়ে পাশের ছোটো বকনাটার চারি থেকে পটু হাতে জাব্‌নার জল হাতড়ে কুচোনো খড় আর বাবলার বিচি তুলে নিলো কোঁচড়ে। তারপর আল ডিঙিয়ে অন্য আর-একটি খেত পার হয়ে নিজের ঘরের পেছন দিয়ে ঘোরাপথে এসে দাঁড়ালো নিজের গোরুটার সামনে।

—'খা, খা। কয় যে খাতি দিবি বাবলার দানা, দুধ হবি বটের আঠা'।

গোরুটির খাওয়া হলে তার দড়ি ধরে সুরো পথে বার হলো। আলের পথের শেষে জেলাবোর্ডের পথটা সে আড়াআড়ি পার হলো। পথের ওপারে কাশজাতীয় বুনোঘাস এক-কোমরের চাইতেও বেশি উঁচু হয়ে উঠেছে। কিন্তু জমিটা সেদিকে নিচু বলে ঘাসগুলোর মাথা জেলাবোর্ডের রাস্তার এপার থেকে বড়োজোর আধ-হাতটাক চোখে পড়ে। ঘাসবনের ভিতর দিয়ে গোরুটাকে টানতে-টানতে সুরতুন ওদিকের জমিটায় সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে সেটাকে বেঁধে দিলো।

গোরুকে সে একটু বেশি যত্ন করে দেখে লোকে তাকে ঠাট্টা করে, কিন্তু সে নিরুপায়। অন্য সময়ে গোরু ছেড়ে দেওয়া চলে। রাত-চরা-ধূর্ত গোরু সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু এখন বেচারার বড়ো কাহিল অবস্থা, মস্ত বড়োই বোধ হয় হবে বাছুরটা। কোথাও না-বাঁধলে চলে না। গোরু বাঁধতে বাঁধতে তার মনে হলো মেয়েমানুষেরও বোধ হয় এমনি কাহিল অবস্থা হয়, নড়তে-চড়তেও অসুবিধা। কিন্তু সেদিন অসময়ে রজব আলি মাঠ থেকে হন্তদন্ত ফিরে এলো। বাড়ির সামনের জমিটুকু পার হতেও যেন তার তর সয় না, সেখান থেকেই হাঁক দিতে দিতে সে বাড়ির দিকে দৌড়ে এলো—ইয়াকুব, ইয়াকুব!

ছেলে ইয়াকুব ছিলো বাড়িতে, বাপের উত্তেজনায় হাসিমুখে সে বললে—'চেঁচাও কেন্, আগুন লাগছে নাকি?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে রজব আলি বললো—বক্‌নাক্ খাবের দিছিলো কেডা?

—জাব তো আমিই মাখে দিছিলাম, কেন্ হ'লে কী?

—হলে কী? শালা গিধ্‌ধর, বক্‌নাডা মরে যে, ধলিড।

—কও কী?

মুহূর্তে পিতার উত্তেজনা ইয়াকুবে সংক্রামিত হয়ে গেলো—তাইলে অষুধ করছে বোধায়। হা রে খোদা!—বলে রজব আলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানেই বসে পড়লো।

ইয়াকুব বললো—বসলি কি হবি? বদ্যিক্ খবর দিতি হবি। চিকন্দির রাম মণ্ডলেক্ নাই পাই কেষ্টদাসেক্ আনবো। তুমি তৎক্ষণ উয়েক্ তেঁতুল-জল খাওয়াও, তামুক-জল খাওয়াও। হাওয়ায় ভেসে ইয়াকুব দৌড় দিলো মাঠের উপর দিয়ে আল টপকাতে টপকাতে।

রজব আলির উত্তেজিত স্বরে আকৃষ্ট হয়ে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে ছিলো ইয়াকুবের স্ত্রী ফতেমা। তার পরীর ভয় ছিলো। জিন পরী মানুষের কাছে ঘোরাফেরা করে তার এই ধারণার কথা পরিবারের সকলেই শুনেছে, তা নিয়ে হাসাহাসিও করেছে।

সে ঘোমটার আড়াল থেকে শাশুড়িকে বললে—আমি যে কই, রোজ সকালে একটা পরী ঘুরঘুর করে চারিগুলার কাছে।

কথাটা রজব আলির কানে গেলো। সে বললে—তুই দেখছিস্ পরী?

—আপনেক আগুনের বোঁদা দিয়ে গোয়াল সুরবের গেলাম, আপনে গেলেন বাড়ির ভিতর। তখন দেখলাম পরী আসে জাব্‌নার চারিতে হাত দিয়ে কী যেন করতিছে।

—ই আল্লা, ক'স কী! তারপরে করলে কী পরীডা?

—কী যেন তুলতিছে চারি থিকে আর চাবাতিছে মট্‌মট্ ক'রে।

রজব আলি তেঁতুলগোলা জল, তামাকপাতার জল, আগুন জ্বালার কাঠ নিয়ে মাঠের দিকে তেমনি হন্তদন্ত ছুটলো। একটা বড়ো মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার গা শিউরে উঠলো— পরী ঘোরে?

সর্বনাশ। চাবায়ে-চাবায়ে খায় কী পরী? জিন্দা গোরুর কলিজা নাকি?

বকনাটাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা হলো। চিকন্দির রামচন্দ্র এসেছিলো। ফতেমা কালীর কাছে মানত রেখেছিলো। কিছু করা গেলো না।

রজব আলি অপ্রতিভের মতো মুখ করে বললো—পরীর কাম ভাই, রোজা কী করবি? রামচন্দ্র ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী রোজা নয়, বৈদ্য। পরীর গল্পটা সে ধৈর্য ধরে শুনলো কিন্তু মাথা নেড়ে বললো—এ যদি কুকুরমারা বিষ না-হয় কী কইছি। চিকন্দিতে একমাসে পাঁচটা গোরু মরেছে।

সন্ধ্যায় দুঃখিত মনে অন্য গোরুগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে রজব আলি তামাকে হাত দিয়েছে, গোরুগুলি ছাড়া পেয়ে চারির দিকে ছুটেছে, এমন সময়ে সুরতুন এসে হাঁ-হাঁ করে তাড়ালো সেগুলোকে।

—কেন্ রে, তাড়ালি কেন্?

সুরতুন বলেছিলো—আমার মনে কয় উয়েতে বিষ আছে। কোন্ চারিতে আছে কিবা করে কবা।

—ঠিকই কইছিস্, জল বদলাতি হবি। সরায়ে বাঁধ রে, ইয়াকুব।

সুরতুন উসখুস করে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। দুঃসংবাদটা সে ঘরে বসেই পেয়েছে। রজব আলির যে-বাছুরটা আজ মারা গেছে সেটার চারি থেকেই খড় চুরি করে নিজের গোরুটাকে দিয়েছিলো কিনা, মাথা কুটলেও এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। বিষ এখনো ধরেনি, কিন্তু তাতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে বিষ ধরার সম্ভাবনা নেই।

শুকনো মুখে সুরো প্রশ্ন করেছিলো—চাচা, এক চারি পানিতে বিষ মেশালে কয়ডা গোরু মরে।

রজব আলির মাথায় তখন অন্য গোরুগুলির নিরাপত্তার কথা ঘুরছে, রাগ হচ্ছিলো গোরুগুলোর উপরে। শালার জেতের খাওয়ার কামাই নি। দুইপর রাতে কলার পাতে মুড়ে সামনে যা কেন দ্যাও, ভুঁস করে খায়ে ফেলাবি। আর তার উপরে আছে এই ভয়ংকর পাপের প্রতিবিধিৎসা। শিশুর মতো অবুঝ প্রাণী, তাকে কিনা খাবার নাম করে বিষ তুলে দেয়। সুরোর কথা সে শুনতে পেলো না।

ইয়াকুবের স্ত্রী ঘড়ায় জল এনে দিয়েছে হাত-পা ধোবার। সেই কাদায় ভারি ময়লাটে জলে হাত-পা ধুতে-ধুতে মনটা যখন রজব আলির একটু স্থির হয়েছে, তখন ইয়াকুবের স্ত্রী বললো—সুরো কচ্ছিলো অও নাকি পরী দ্যাখছে! ও কয় বেটা ছাওয়াল, আমি কই মিয়েমানুষ।

রজব আলির হাত-পা ধোয়া বন্ধ হয়ে গেলো, সে সাগ্রহে প্রশ্ন করলো—সুরো বেটা-ছোওয়াল দ্যাখছে?

পুরুষই যদি হয় তবে কাল্পনিক জিন বা পরী নয়। তাদের চাইতে শতগুণে বীভৎস দুশমন, মানুষ—যে বিষ দেয় গোরুকে।

ঘরে ফিরে সুরতুন তখন দু-তিনটে পাটকাঠি একত্র করে একটা মশাল বানিয়ে নিজের গোরুটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছে। যে-চারিটায় খাচ্ছিলো রজব আলির মৃতবৎসটি সেটা থেকেই নিজের গোরুটাকে খড় এনে দেয়নি এমন প্রমাণ নেই, বরং এনে দিয়েছিলো এ-কথাটাই আশঙ্কিত মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে। এমন সময় রজব আলি ডাকলো তাকে।

সেই পরীর কথা আবার। ফতেমা যখন চোখ বড়ো-বড়ো করে গল্প করেছিলো, সে এক পরীকে রোজ সকালে গোরুর চারির কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তখন সুরতুনের অন্তস্তল শুকিয়ে গিয়েছিলো। সে নিজে জিন পরী মানে না, কাজেই তার বিশ্বাস হলো ফতেমা যদি সত্যিই কাকেও দেখে থাকে তবে সে তাকেই দেখেছে। কী সর্বনাশ! সে তখন ফতেমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বললো—আমিও দেখছি পরী, খুব কাছে দাঁড়ায়ে দেখছি। ইয়া গালপাট্টা তার, একমাথা ঝাঁকড়মাকড় চুল'। ফতেমার তাক লেগে গিয়েছিলো।

কিন্তু রজব আলি যখন তার দরজায় এসে হাঁক দিয়ে দাঁড়ালো তখন ভয়ে হকচকিয়ে পুরুষ-জিনের কথা বলতে পারলো না সে। সে নিজেই সকালে চারির কাছে যায়, বলে ফেললো।

—গেছিলি কেন্, তাই ক'।

সুরতুন নির্বাক।

—কেন তাই ক'।

সহসা রজব আলির মনে হলো সত্যটার তলদেশও সে দেখতে পেয়েছে : এটা সুরতুনের অকারণ জ্ঞাতিবৈর সাধন। জ্ঞাতির মেয়ে কিনা তাই।

প্রথম চড়টা খেয়ে সুরতুন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলো, কিন্তু উপর্যুপরি চড় পড়তে লাগলো যখন, বোবা কান্নায় হাহাকার করতে লাগলো সে। পড়শির ভিড় জমে উঠলো রজব আলির উঠোনে। সুরতুনের গায়ের কাপড়টুকু দড়ির মতো পাকিয়ে তার গলা টেনে ধরেছে রজব আলি। অস্পষ্ট আলোয় সুরতুনের পিঠের ও পাঁজরার হাড়গুলো চোখে পড়ছে, তার ধূলিমলিন বুকের মেদহীন আকুঞ্চিত স্তন দুটি।

মাধাই বায়েন বিষ দিতো গোরুকে।

চামড়ার ব্যবসায়ী সানিকদিয়ারের কফিলুদ্দি সেখ। বারোখানা ছাল পৌঁছে দেবার বরাত নিয়ে মাধাই আষাঢ় মাসে পঁচিশ টাকা আগাম নিয়েছিলো তার কাছ থেকে। কিন্তু বরাত রাখা সহজ কথা নয়। সে ছাড়াও ছাল তুলবার লোক এ-অঞ্চলে আছে, কেউ-কেউ আবার কফিলুদ্দিব মাইনে-করা।

তিনখানা ছাল পৌঁছে দেবার পব বিপদে পড়লো মাধাই, আর গোরু মরছে না এ-অঞ্চলে। ওদিকে কফিলুদ্দির তাগাদা। তাগাদা শুধু মুখেই নয়, হাটফেরতা পথে গালমন্দও বটে। এই পথে নামলো মাধাই। দু-মাসে চারটি গোরুকে বিষ দিয়েছিলো সে ; কিন্তু সব ক'টির ছালই যে তার হাতে পৌঁছেছে এমন নয়, তিনটিই অন্যের হাতে পড়েছে। যত ঝুঁকিই সে নিয়ে থাক, যত কৌশলেই সে কাজটা করে থাক, তার দাবির যুক্তিটা প্রতিপক্ষকে বলা যায় না। নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে সে? কিন্তু কফিলুদ্দির কাছে সমব্যথা আশা করার চাইতে তার আত্মহত্যা আশা করা সহজ। সে ছাল চায়, যেমন চৈতন্য সাহা চায় দাদন-দেওয়া পাট। অন্য কোনো কথা বোঝার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্বোধ বলে মনে হয় তাদের দুজনকে।

চিকন্দিতে গোরু কম। যাদের আছে তারা হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। বুধেডাঙায় গোরুর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সান্দারদের ঘরে যেতে সাহস হয় না। সুরতুন যে মারটা খেয়েছিলো তাতেই মাধাই গুঁড়ো হয়ে যেতো। সবচাইতে মুশকিল করেছে রামচন্দ্র। যে-বিষ কফিলুদ্দি নিজে নারকেলডাঙা থেকে আনিযে দিয়েছিলো গো-বধের জন্য তার কাছে রামচন্দ্রর ওস্তাদি হার মেনেছে। কিন্তু রামচন্দ্রর মণ্ডলগিরির প্যাঁচে হার মানতে হলো কফিলুদ্দিকে। গোরু মরলে মাটিতে পুঁতে ফেলছে গ্রামবাসীরা।

কয়েকদিন ধরে নানারকম উল্টোপাল্টা ভেবে আবার প্রথম যে-রাতে মাধাই কলাপাতায় মুড়ে বিষ-মাখানো ভাত নিয়ে বেরিয়েছিল রামচন্দ্র মণ্ডলের হাতে ধরা পড়ে গেলো।

বুধেডাঙা আর চিকন্দির সীমায় হাঁক দিলো রামচন্দ্র—কে যায়? ছুটে পালাতে গিয়ে মাধাই বুধেডাঙার পথ ধরেছিলো ; কিন্তু বুধেডাঙায় রজবআলি সান্দার জেগে ছিলো। মনে হলো সে গলায় খাঁকরি দিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। সেও যেন হাঁক দিলো—কে যায়?

মাধাই আর পারলো না। দৌড়তে গিয়ে তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে। পিছন থেকে রামচন্দ্র তার বিষসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিলো। বৈদ্যের চোখে দেখামাত্রই ধরা পড়েছে। অপরিসীম ঘৃণায় তার হাত ছেড়ে দিয়ে রামচন্দ্র বললো—তুই না হিঁদু!

মাধাই কাঁদতে পারলো না। বুকের মধ্যে থেকে আইঢাইটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

—গাঁ ছাড়বি? মণ্ডলি গলায় বললো রামচন্দ্র।

—ছাড়ব, আজ্ঞা।

—যা!

সম্মুখের দিকে একটা ধাক্কা দিলো রামচন্দ্র। উল্টে পড়ে গিয়ে মাধাই সহসা উঠতে পারলো না। বুকের ভিতরে ছুরি বেঁধার মতো ব্যথা করছে। দম যেন নেওয়া যাবে না আর। খানিকটা সময় বসে থেকে কোনোরকমে উঠে মাধাই বুধেডাঙা ছাড়িয়ে দিঘার পথ ধরেছিলো।

সে বলেছিলো একদিন—প্রথমে হাসি-হাসি মুখে শুরু করে শেষের দিকে বাবরিচুলসমেত মাথা দুলিয়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে থুথু ফেলে। রামচন্দ্র মণ্ডল বলেই নাকি সেদিন তাব প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিলো। বিড়ালছানার মতো শূন্যের দিকে করে গ্রামের সীমার বাইরে তাকে ফেলে দিয়েছিলো রামচন্দ্র, ইচ্ছা করলে অনায়াসেই মাটিতে দু-চার বার আছড়ে সে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও করতে পারতো।

মাধাই বলে—আমার হয়ে তুই সেদিন মারটা খেয়েছিলি, আর তাতেই রজব আলির রাগ পড়ে গিয়েছিলো, নতুবা ঐ মারটা আমাকে মারলে আমি বাঁচতাম না।

এটা এক ধরনের কৃতজ্ঞতা হতে পারে, কিন্তু এরই জন্য একটি মানুষ আর-একজনকে পথ থেকে বুকে করে কুড়িয়ে আনে না। আর যদি এই সামান্যটুকুর জন্যই করে কেউ, তবে সে মহৎ মানুষটিই চামড়ার লোভে কখনো গোরুকে বিষ দিতে পারে না।

অন্তত এ-কাহিনীতে এমন কিছু নেই যাতে বোঝা যাবে সুরোকে চিকন্দির পথ থেকে কুড়িয়ে এনে শুধু তখনকার মতো প্রাণ বাঁচানোই নয়, তার ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও কেন সে করে দিয়েছে।

টেপির মাযের দলে ভর্তি হয়ে এক শহরের চাল পুলিসের চোখ আড়াল করে আর-এক শহরের বাজারে নেবার কাজ করে সুরো পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছে। এখন তাদের নিজেরই একটা দল আছে। যাদের মাধাই নেই তাদেরও কেউ কেউ অবশ্য এই পথ নিজেরাই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সুরোর মতো একটি গেঁয়ো-মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। আর শুধু কি তাই? চেকার বলো, পুলিস বলো, তাদের ভয়ে যখন প্রাণ শুকিয়ে আসে তখন দিঘার শত শত মাইল দূরে থেকেই গাড়ির কামরার জানলায় মুখ গলিয়ে দিঘা বন্দরের মাধাইয়ের জন্য সুরো চোখ মেলে রাখে। পুলিস থাক, চেকার থাক, গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে মাধাইকে কোথাও-না-কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে। হয় সে স্টেশনের কনেস্টবলদের সঙ্গে রসিকতার গর্‌রা তুলে দিয়েছে, কিংবা কোনো রেল-কর্মচারীর সঙ্গে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে গল্প করছে।

এমন যে মাধাই, ত্রাতা নয় শুধু রক্ষীও, ফতেমা বলে—সোনাভাই, তাকে কি সাহস করে জিজ্ঞাসা করা যায় তার কোনো কাজের কারণ? দেবতাকে কে কবে জিজ্ঞাসা করেছে খরা বা বর্ষার কারণ, বলো?

কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছে মাধাইয়ের। খরখর করে কথা বলতো, তড়বড় করে চলতো, এ যেন সে মাধাই নয়। গত কয়েক খেপ চাল নিয়ে ফিরে সুরো এটা লক্ষ্য করেছে। মাধাই এমন ধীরথির ছিলো না চিরকাল। বরং অসম্ভব ফুর্তিবাজ ছিলো। স্ফূর্তির কথায় ঘটনাটা সুরোর মনে পড়ে গেল।

সুরো জানতো, টেপির মা এবং অন্য দু'একজন গাঁজা খেতো। দু'একজন চালওয়ালি মদ ধরেছিলো। নেশার ঘোরে তারা অশ্লীল কথাবার্তা বলতো। এই তাদের স্ফূর্তি করা। মাধাই একদিন তাকে বলেছিলো—মাঝে মাঝে ফুর্তি করবি, নইলে কাজে জোর পাবি না। মাধাই একথা বলার আগে টেপির মা প্রভৃতি দু'একজন সুরোকে তার গম্ভীর চালচলনের জন্য পরিহাস করেছিলো। তখন মাধাই তার স্টেশনের ডিউটিতে যাচ্ছিলো। তাদের পরিহাস শুনে একটু থেমে মাধাই বলেছিলো কতকটা যেন একটি শিশুকে প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে—ওকে যে অত কও, ফুর্তি ও একদিন আমার সঙ্গে করবি।

মাধাই স্ফূর্তি করার প্রস্তাবটা যখন সোজাসুজি তার কাছে তুললো সুরো একটা বোবা ভয়ে ঘামতে লাগলো। কিন্তু অনাহারের বন্যায় তার ক্ষীণ মুঠি ধরে যে-পুরুষমানুষটা তাকে বাঁচিয়েছিলো, তার হাত হারিয়ে ফেলার ভয়ে সুরো মাধাইয়ের পিছন-পিছন বাজারে গিয়েছিলো। অবাক করলো মাধাই। বাজারে

ঢুকে মদ-গাঁজার দোকানের ধার-পাশ দিয়েও সে হাঁটলো না। সুরোর হাত ধরে, খুব সম্ভব সুরোই ভয়ে তার হাত চেপে ধরেছিলো, কেবল সে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তারা গিয়ে বসেছিলো উল্কিওয়ালার সামনে। সুরোর ডান হাতের মণিবন্ধের কিছু উপরে একটি নীলপক্ষী ফরমায়েস করে আঁকিয়ে নিলো মাধাই, একটা লাল জমির ঠেটি শাড়ি কিনলো সুরোর জন্য। অবশেষে মাধাই বলেছিলো—হলো স্ফূর্তি করা? অজ্ঞাত বিভীষিকায় তখনো সুরোর গলা কাঠ হয়ে আছে।

সুরো হাঁটতে-হাঁটতে তার নীলপক্ষীটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলো। কিন্তু এই দুপুর রৌদ্রের আকাশ, এ কি স্ফূর্তি করে উড়িয়ে দেয়ার বিষয়? সুরোর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে, ধুলো ও ঘামে মিশে কাদা জমে যাচ্ছে মুখের এখানে-সেখানে।

ফতেমার ব্যাপারে মাধাইকে স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে দিতে হয়নি। মাধাই নিজেই বলেছিলো—তোতে আর ফতেমাতে তফাত আছে। ভাবলো সুরতুন : ফতেমার সঙ্গে তার আগেও পার্থক্য ছিলো, এখনো আছে। রজব আলি সান্দারের বেটা-বউ, ইয়াকুবের স্ত্রী ফতেমা গোলগাল একটি একরোখা মুরগীর মতো কুঁদুলি ছিলো। জিন পরীর ভয়ে সে বা'র হতো না বড়ো একটা, কিন্তু যখন বা'র হতো পাড়ার মেয়েরা তাকে মেনে নিয়ে সরে পড়তো। কিন্তু এসব ঘটতো ধানহীন দিনে। ধানের দিনের ফতেমা, সে আর-একজন। কোথায়-বা জিনপরী, কোথায়-বা কোন্দল। মাঠের ধান কেটে দিয়ে পুবদেশী মজুররা চলে যেতেই গ্রামের মেয়েরা ভোর রাতের অন্ধকারে মাঠে-পড়ে-থাকা ধান কুড়োতে যেতো। ফতেমা আসতো অন্যান্য সান্দার-মেয়েদের দলে। সেই ভোর রাতে আলো ফোটার আগেই ধান খোঁটার কাজ শুরু করতো তারা। কত গল্প, কত রসিকতা ফতেমার ভাঁড়ারে আছে, শুনে সান্দারদের মেয়েদের তাক লেগে যেতো। পাছে কৃষক শুনে ফেলে তাড়া করে আসে, এই ভয়ে অন্য মেয়েরা যত তাকে হাসি চাপতে বলে তত তার আঁচল-চাপা মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে হাসি বার হয়।

এখন সে ফতেমা নেই। শিশুদের গালের অতিরিক্ত মেদের মতো তার গায়ের মেদও ঝরে গেছে। তেল-চুকচুকে কাজলমাখা গৃহিণী নয়, রুক্ষ ধূলিমলিন যাযাবরের মতো দেখায় তাকে। কিন্তু সে যেন অনেক লম্বা হয়েছে আগের চাইতে, চোয়াল দুটি গালে স্পষ্ট হয়ে উঠে তাকে পুরুষ-পুরুষ দেখায়। মনে হয়, সে যেন পুরুষের মতো দৈহিক শক্তিও অর্জন করেছে। ধরা পড়ে গেলে হাতজোড় করে পুলিস বা চেকারের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে যেমন, অপরিচিত শহরের তেলেভাজা জিলিপির দোকানের পাশে দল নিয়ে বসে হাসি-তামাশা করার বিষয়েও তেমনি সে অগ্রণী। কী করে সে দলের মাথা হয়ে উঠলো কে জানে। অথচ এই চালের ব্যবসায়ে সুরোই তাকে ডেকে এনেছিলো মাধাইয়ের অনুমতি নিয়ে।

বন্দর দিঘার এক গলিতে পৌঁছে সুরো পা দুখানিকে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো। একটি শুকনো চেহারার বুড়ি দোকানটা চালায়। পানের দোকানের পাশ ঘেঁষে একটা নোংরা গলি পুবদিকে চলে গেছে। গলিটার দুপাশে ভাঙাচোরা ছোটো ছোটো ইটের বাড়ি। সুরোর সম্মুখে উত্তরমুখী পাথর-ছড়ানো রাস্তাটায় আধ মাইলটাক হাঁটলে মাধাই বায়েনের ঘর।

পান নিয়ে সুরো উত্তরের পথ ধরবে এমন সময়ে কে তার কাঁধে হাত দিলো। চমকানো সুরোর অভ্যাসগত। এতদিনের চালের কারবারেও সে এ-বিষয়ে নিঃশঙ্ক হতে পারেনি। তার কাঁধে যে হাত দিয়েছিলো তাকে দেখে সুরো সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াচ্ছিলো, কিন্তু সে-ই আগ বাড়িয়ে কথা বললো, 'সুরো না'?

'হ্যাঁ'।

'তাহলে চমকালি কেন? আমি টেপি'।

টেপিই বটে। কিন্তু চেনা অসম্ভব। চালওয়ালি টেপির মায়ের টেপি নয়, এ যেন কোনো-এক ভাসান

পালাগানের বেহুলা সুন্দরী। তেমনি রঙিন শাড়ি পরনে, তেমনি একগা গহনা। চোখে কাজল, ঠোঁট পানের রসে টুকটুকে। মাস দু'এক আগে টেপি চালের মোকামে দলছাড়া হয়ে পড়েছিলো। এক চেকার তাকে বিনা টিকিটে চলার দায়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে রাখে। সুরোর ধারণা ছিলো টেপি জেলে আছে। কিন্তু দু-মাসেই মানুষের এত পরিবর্তন হয়?

'তুই এখন কনে থাকিস, কী করিস'? সুরো জিজ্ঞেস করলো।

'এইখানেই। ঐ গলিটার মধ্যে এক বাড়ি আছে আমার'।

'তোর বাড়ি? ওখানে তো পাকাবাড়ি সব, ভদ্দরলোকেরা সব থাকে'।

'না থাকলেও তারা আসে। কেন, চেকার কি ভদ্দরলোক না'?

'চেকারবাবুর বাড়িতে কাম কাজ করিস'?

'কাম কাজ করবো কেন লো, আমি কি চেকারবাবুর ঝি'?

সহযাত্রিণীর সৌভাগ্যে খুশি হলো সুরতুন, সে প্রশ্ন করলো, 'বিয়া করছে'?

টেপির মুখখানি ঈষৎ ম্লান হলো। সে বললো, 'না-করছে ক্ষেতি কী? বউ না যে বকাবকি করবি, অচ্ছেদা করবি। এখানে দাঁড়ায়ে দ্যাখ, তার আসার সময় হতিছে। কিন্তু ফতেমা বুন যা কয় তাই সত্যি। ঠারেঠোরে বোঝার বয়েস তোর কোনোকালেই হবিনে'।

টেপির কথার সুরে সুরো বুঝতে পারলো তাব প্রশ্নটিতে টেপি খুশি হয়নি, কিন্তু তার বিরক্তির কারণটাও সে ধরতে পারলো না।

টেপি বললো, 'সে কথা যাক, তুই একা যে'?

সুরতুন বললো, 'কী করি কও, সাহস পালেম না'।

এরপর সে যা বললো তার সারমর্ম এই রকম : পরশুদিন দিঘার স্টেশনে পুলিসরা গাড়ি ঘেরাও করে চালের কারবারিদের ধরার চেষ্টা করেছিলো। সেই ভয়ে সে গাড়ির কাছে আর ভিড়তে পারেনি। ফতেমা, ফুলটুসি প্রভৃতি কয়েকজন মরিয়া হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের কী হয়েছে কে জানে? এখন সুরতুন ছোটো ইস্টিশন থেকে আসছে। সেখানে পুলিস চেকার থাকে না এই শুনে সে গিয়েছিলো, কিন্তু কপাল যায় সঙ্গে। পুলিস বলতে দিঘা থানার কনকদারোগাই সেখানে ছিলো উপস্থিত। আশ্চর্য হবে তুমি, টেপি, উঁচু কেলাস থেকে যেসব মহিলা নামে তারাও চালের কারবার করে। এ অবস্থায় কী করতে পারে সুরতুন?

টেপি বললো, 'কিন্তু কোনো এক কিছু তো করা লাগবি'।

'কী করবো তা কতি পারো'?

টেপি কিছুকাল ভেবে বললো, 'আছে এক ব্যবসা'।

'কও'!

টেপি হেসে বললো, 'কাল দুইপরে আসিস, কবো'।

সুরো আবার হাঁটতে শুরু করলো।

আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে টেপির, শুধু বেশভূষায় নয় কথায়, ভঙ্গিতে। সব মিলে সে এক নতুন মানুষ। বয়সে টেপি তার চাইতে ছোটো কিন্তু সে-ও যেন বুদ্ধিতে তাকে ছাড়িয়ে গেলো। এখন সে ব্যবসায়ের ফিকির বলে দেয়।

অন্য কাউকে না-বললেও নতুন ব্যবসায়ে নামতে হলে মাধাইকে অবশ্যই বলতে হবে। তার অনুমতি নিয়ে, সুরো স্থির করলো, একদিন সে আসবে টেপির কাছে খোঁজ নিতে।

আর টেপির নিজের কথা। না, সেটা মাধাইকে বলা যাবে না। তাদের দলের অন্য অনেকে এসব ধরনের কথাবার্তা রসিয়ে-রসিয়ে বলে। সুরো স্তব্ধ হয়ে শোনে, শুনতে তার ভালো লাগে না। গা গুলিয়ে ওঠে, পালাতে ইচ্ছা করে তার। আর, তার যে এমন হয় এ-কথাটাও প্রকাশ করার উপায় নেই। একদিন

মন খুলে একটু বলতেই টেপির মা ও ফতেমা বলেছিলো—এ এক রকমের রোগ। শুধু ফুলটুসি নামে যে ছোটোখাটো অকালে সন্তান-ভরাক্রান্ত মেয়েটি আজকাল তাদের দলে আসছে সে একদিন বলেছিলো—বিশ্বাস করবা না ভাই পুরুষের জাতকে।

চেকারকে সে এতদিন কালোকাপড়ে-মোড়া-নৈর্ব্যক্তিক একটা আইন বলে মনে করেছে, যার চেহারা খানিকটা পুরুষের মতো। আজ টেপি চেকার জাতটিকেই চিনিয়ে দিয়েছে। কী বোকা সে নিজে! এতদিন চেকারদের থেকে আরো কেন সাবধান হয়ে থাকেনি, ভাবলো সুরতুন।

মাধাইয়ের ঘরের নিচু বারান্দাটায় পৌঁছে কিছুকাল একেবারে ঝিম হয়ে বসে রইলো সুরতুন। দুপুর রোদে দু-ক্রোশ পথ চলে সে যেন অন্তঃসারবিহীন হয়ে গেছে। চলার সময়ে এতটা বোঝা যায়নি।

শরীরটা একটু স্বাভাবিক হলে আবার দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে এলো। কী হবে তাহলে? চালের কারবার কি বন্ধ করতে হবে? অনাহারে মৃত্যু? ফতেমার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে, আবার মনে হলো তার। ফতেমার গ্রামে ফিরলেও চলবে। কষ্ট হবে, অনেকদিনই তাকে অনাহারে থাকতে হবে, তবু তার শ্বশুর এবং সে দুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় অর্ধাহারে দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু তার নিজের? এ ব্যবসা যত কষ্টের হোক, যত বিপজ্জনক হোক, এ ব্যবসায়ে নামার আগে আহার যে এমন নিয়মিত হতে পারে এ-ও সে জানতো না। পুলিসের ভয় ছিলো, চেকারের ভয় ছিলো। কিন্তু ছোটো স্টেশনটাতে কনকদারোগার উপস্থিতি পুলিসি ভয়কে সহ্যাতীত করেছে, এবং টেপির কথা শুনে এবং টেপিকে দেখার পর চেকার আজ এক নতুনতর বিভীষণ মূর্তি নিলো। হায়-হায়, সে কী করবে!

কিছু পরে সে অবশ্য স্থির করলো, মাধাই আসুক। যা করার সে-ই করুক। তার নিজের বুদ্ধি আর কতটুকু।

৩

অন্দরের আঙিনায় সকালের পায়চারি ও আলাপচারিতা শেষ করে সান্যালমশাই কাছারিবাড়িতে এসে বসেছেন। আমলারা আসেনি, কাছারিবাড়ির বুড়ো চাকরটি সান্যালমশাইয়ের ফুর্সির জল বদলে অন্যান্য হুঁকোগুলোর দিকে মন দিয়েছে।

সান্যালমশাই বসতেই সে নিবেদনের ভঙ্গিতে বললো, 'তামাক দি, কর্তা'?

'তামাক? না, থাক'।

সান্যালমশাই তামাকটা খুব বেশি খান। অনেকের চোখে তিনি ও তাঁর তামাক অবিচ্ছেদ্য। ভৃত্যটি হুঁকোয় জল বদলাতে-বদলাতে তাঁর মুখের ভাবটি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। অসুখ-বিসুখ করলে কিংবা খুব ক্রুদ্ধ হলে তামাকে তাঁর মন থাকে না। এটা এদের সকলেরই জানা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা কাছারিবাড়ির প্রথা নয়। অন্দরের কোনো ভৃত্য হলে হয়তো সাহস করে প্রশ্ন করতে পারতো।

ভৃত্য চলে গেলে সান্যালমশাই ভাবলেন, দ্যাখো অভ্যাসটা কী! তামাকের নাম শুনে তিনি প্রায় হাত বাড়িয়েছিলেন। অথচ কাল রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি চিন্তা করে স্থির করেছেন তামাক খাওয়া কমিয়ে দেবেন। স্বাস্থ্য? না। সংযম? দূর করো। এ বয়সে সংযম-অসংযমের প্রশ্ন আর ওঠে না। পঞ্চাশ পার হলো। শুধুমাত্র স্নায়ুগুলিকে আর-একটু থিতিয়ে দেওয়া, যাতে সেগুলি সহজেই উত্তেজিত না-হয়ে পড়ে। আর এ কথাগুলি চিন্তা করতে গিয়ে তিনি তাঁর আর এক সহগামীকে আবিষ্কার করেছেন এক মুহূর্তের জন্য যে কতগুলি অভ্যাসলব্ধ মুদ্রাদোষের সমষ্টি, কতগুলি বাঁধিবুলির রেকর্ড। এবং এই সহগামীর নাম খুঁজে না-পেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চাতের আমি' কথাটাই তার সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। তখন সেই 'পশ্চাতের আমি'র হাত থেকে আত্মোদ্ধার করার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিলো।

মামলাটা শেষ হবার আগে থেকেই এ সন্দেহটা হচ্ছিলো তাঁর, এটা না-করলেও চলতো। কিন্তু সেটা যত সময় নিচ্ছিলো ততই স্নায়ু উত্তেজিত হচ্ছিলো আর ততই জেদের ফন্দি-ফিকিরগুলো আসছিলো মাথায়।

যাক, হবার যা হয়ে গেছে।

কাল, রাত্রি তখন বারোটা, আইন-সেরেস্তার আমলা ব্রজকান্ত এসে খবর দিলো, মিটেছে। খবর দেওয়ার কথা ছিলো, সেজন্য সে নিজের বাড়িতে না-গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে অত রাত্রিতে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলো।

দোতলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে সান্যালমশাই নীরবে খবরটা উপভোগ করলেন, তারপর বললেন—'তুমি তাহলে এবার বিশ্রাম নাও, দারোয়ানদের কাউকে বরং নিয়ে যাও, এগিয়ে দেবে'।

সে চলে গেলে তামাক নিয়ে বসেছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন, আর নয়। মিহিরকে ডেকে একবার বলবেন—ব্যাপারটাকে বরং তুমি ভবিতব্য বলে মেনে নিও। তাহলে আর জ্বালা থাকবে না।

দিনের আলোয় এখন তিনি অনুভব করছেন, রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এটা সম্ভব বলে বোধ হলেও, এ কথাগুলির দৈনন্দিন অর্থ সান্ত্বনাপ্রদ নয়। বরং মিহিরের মনে হতে পারে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। সময় তার কাজ করুক।

কিন্তু মোকদ্দমার সংবাদ প্রত্যূষেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। রামচন্দ্র এলো, সঙ্গে আট-দশজন লোক।

রামচন্দ্রের হাতে একটা লাঠি, মাথায় গামছা বাঁধা। সে এসেই লাঠিসমেত সান্যালমশাইয়ের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। লাঠিটা রইলো তাঁর পায়ের তলায়।

সান্যালমশাই বললেন—'সকালেই খবর পেয়েছো বুঝি? কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, এ নিয়ে কোনো হৈ-চৈ আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা কোরো না'।

'আজ্ঞা না কর্তা, তা হবে না'।

তিনি বললেন, 'তোমাদের জেদ বজায় রইলো, কিন্তু আর টানাটানি কোরো না। এখন বরং মিহিরের কাছে যাও। আমি একটু কাজ করি'।

রামচন্দ্র উঠবার ভঙ্গি করলো। বারান্দা থেকে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপরে সঙ্গের লোকগুলোকে বললো, 'রাজার কাছে কথা, তোমরাই বলো না কেন কী কথা আছে তোমাদের'।

আর কেউ কথা বললো না, রামচন্দ্রকেই বলতে হলো।

'আজ্ঞা, মামলার সাথে সামিল'।

সান্যালমশাই একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন—'না-না। আর বোলো না'।

মামলাটার সূত্রপাত করেছিলো রামচন্দ্ররাই এমনি করে সাধারণ কথাবার্তা থেকে।

মিহিরও সান্যালবংশের ছেলে। শৈশবে তার পিতার মৃত্যু হয়। তার মা অনেক কষ্টে ও গ্রামের চোখে সান্যালদের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় এমন অনেক কাজ করে তবে মানুষ করতে পেরেছিলো তাকে। এখন সে নিজের ভার নিজে নিয়েছে, কিছু-কিছু সম্পত্তি বাড়িয়েছেও। উদ্যমশীল সে। কোনো-না-কোনো পরিকল্পনায় সে সবসময়েই লেগে আছে। ইতিমধ্যে সে নিজের বাড়ির চারিদিকে পড়ে-যাওয়া প্রাচীরের জায়গায় নতুন প্রাচীর তুলেছে।

কিন্তু মিহির নির্দয়।

তার বাড়ির প্রাচীরের নিচে দিয়ে পশ্চিমমুখী একটা রাস্তা ছিলো। সরকারি রাস্তা নয়। তবু বহুদিন থেকে সাধারণের ব্যবহার্য বেশ চওড়া একটা পথ। চিকন্দি ও সানিকদিয়ারের সংযোগকারী সরকারি সড়কের বড়ো বৃত্তাংশটির দুই প্রান্ত যুক্ত করতো। সান্যালদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা। মিহির একদিন বাঁশ আর কুলকাঁটা দিয়ে রাস্তার অনেকটা নিজের জমির সামিল করে ঘিরে নিলো।

রামচন্দ্ররা এসে এরই প্রতিবিধান চেয়ে নালিশ করেছিলো।

সান্যালমশাই একদিন মিহিরকে বলেছিলেন—পথটা বন্ধ করে দিলে? লোকের অসুবিধা হবে।

—জমিটা তো লোকের নয়, আমার।

তিনি হেসে বলেছিলেন—সব জমিই তো কারো-না-কারো। সব পথই তো কোনো-না-কোনো সান্যালের জমির উপর দিয়ে।

মিহির অগত্যা বলেছিলো—লোক চলে কোথায় ও-পথ দিয়ে?

কিন্তু পথ সে খুলে দেবে না এটা বোঝা গিয়েছিলো তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই মামলা লাগলো। সান্যালমশাই থমথমে মুখ নিয়ে কাছারির দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—নায়েবমশাই, মিহিরের বাড়ির নিচের রাস্তাটা আমার চাই। পুরনো কাগজ ঘেঁটে দ্যাখো একবার।

পুরনো কাগজ ঘাঁটা চললো। সারা গ্রামের কোথায় কতটুকু কোন সান্যালের, এর মোটামুটি হিসাব যত সহজ, সূক্ষ্ম হিসাব তত কঠিন। মোটা হিসাব নিয়ে রোজকার কাজ চলে, টাকা আদায় হয়, লাট দেওয়া চলে। সূক্ষ্ম হিসাব মামলা করে পেতে হয়, মামলা করে রাখতে হয়। সূক্ষ্ম হিসাবের মোট কথা এই : সব জমির হিসাব জট পাকিয়ে সব সান্যালের বলে বোধ হয়। পরচা, দানপত্র, কটকোবালায় দুরূহ দর্শনের পাণ্ডুলিপি।

মামলা মানে টাকা নিয়ে খেলা। নিচের কোর্টেই কাগজপত্রের সীমাহীন ফর্দ নিয়ে যখন দাঁড়ালো সান্যালমশাইয়ের নায়েব, তখন মিহির হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। টাকার অভাবে ঠিক নয়, টাকা আঁকড়ে থাকার সহজ প্রবৃত্তিতেই বরং। সহজ বুদ্ধির অঙ্কে সে হিসাব করে দেখলো মামলার শেষ পরিণতি হাইকোর্ট। একতরফা ডিক্রি পেলেন সান্যালমশাই।

মামলাটা তাঁর ভালো লাগেনি। জমিদারিবৃত্তিটাই মামলাসংকুল। মামলার ভয় না-থাকলে এক পয়সা খাজনা আদায় হয় না। কিন্তু সে সব মামলার প্রবক্তা নায়েবমশাই, সেগুলিতে এমন করে রক্ত গরম হয়ে ওঠে না, এমন করে পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হয় না স্নায়ু। শুধু সম্মান রাখার এই মামলায় মিহিরকে নত করাই সার্থকতা। এ সব আব ভালো লাগে না। যেন অন্য কেউ তাঁকে নিয়োগ করেছিলো এ ব্যাপারে।

সান্যালমশাই বললেন আবার— 'মিহিরের কাছেই বরং যাও একবার। সে-ই খুলে দেবে পথ'।

'তা নয়, আজ্ঞা। মিহিরবাবু সকাল থেকেই পথ খুলে দেওয়ার জন্য লোক লাগিয়েছেন'।

'তবে আর কী থাকতে পারে'?

রামচন্দ্র সঙ্গীদের নির্দেশ করে বললো—'কর্তা, এরা যে মরে। মরার বাড়া গাল নাই। তাই হইছে এদের। মিহিরবাবু এদের ভিটাছাড়া করবেন'।

ব্যাপারটা এই : মিহিরের বাড়ির অনতিদূরে শাঁখারিদের পাড়া। একসময়ে খুব বাড়বাড়ন্ত ছিলো এ পাড়ার। এমনকী দালানকোঠা তোলার মতো সচ্ছলতাও হয়েছিলো ওদের কারো কারো। এখন যারা আছে তারা শাঁখা তৈরি করা ভুলে গেছে। যারা পেরেছে শহরে পালিয়েছে, যারা পালায়নি তাদের একাংশ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে ধুঁকছে, অবশিষ্ট চাষী হচ্ছে। পাড়াটার সবটাই মিহিরকে খাজনা দেয়। যেসব ভিটায় অধিবাসী নেই সেগুলি সে বাকি খাজনার দায়ে খাস করে নিচ্ছে। খাস করে নেওয়াটার ভালোও আছে। জঙ্গলের বদলে সেগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে মিহিরের বাগান হয়েছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এ-পরিবর্তনটা বোধ হয় ভালো। কিন্তু খাস করতে শুরু করে সে থামতে পারছে না, বাকি খাজনার দায়ে অনবরত এর-ওর নামে ডিক্রি আনছে। শাঁখারিদের মাতব্বরস্থানীয় হরিশচন্দ্র একদিন মিহিরের স্নেহ পেয়েছে। কিন্তু এই মামলাটায় সান্যালমশাই-এর নায়েবের চক্রান্তে মিহিরের বিপক্ষে সে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। তাই মিহিরের লোক গেছে সদরে তার নামে মামলা করতে আজকেই রাত থাকতে উঠে।

কথাটা শুনে ভাবলেন সান্যালমশাই।

কিন্তু নীরবতায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লোক নয় রামচন্দ্র। একটু পরে সান্যালমশাই বললেন—'এতে আমার আর কী করার আছে রামচন্দ্র, তোমরা যা বোঝো করো গে'।

রামচন্দ্র তার গোঁফটিকে সূক্ষ্ম দু-ভাগে ভাগ করে নিলো। তারপরে বললো—'রাজা যদি প্রজাকে রক্ষা না করেন, সে তো অরাজক, আজ্ঞা'!

জুতসই কথা বলার সুখে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলো। সান্যালমশাই-এর বলতে ইচ্ছা হলো—আদালতে যাও তবে, রাজ্য চালানোর ভার আমার উপরে নেই। কিন্তু থামলেন তিনি। রামচন্দ্রর অবক্তব্য কিছু নেই। আদালতের কথায় হয়তো সে বলে বসবে—এই আদালত, ফিস দিবো, আজ্ঞা করেন। লোকটি হামেশা আসে না কাছারিতে। খাজনা বাকি ফেলার দলে নয় সে যে তলব-তাগাদায় হাজিরা দেবে। বরং তার উল্টো। খাজনা দেওয়ার সময় এমন ভাব দেখায়, যেন আরো বেশি খাজনা দিতে পারলেই সুখী হবে। তার কথাবার্তায় চালচলনে একটা নাটকীয়তা আছে। তার সরলতাকে কৃত্রিম বলে বোধ হয়।

রামচন্দ্র বললো, 'কর্তা, এ গাঁ গড়-চিকন্দি। রায়রা জমিদারি করেছে, সান্যালরাও। কিন্তুক কোনোদিন কোনো সান্যালকর্তা অত্যাচার করে নাই প্রজার উপর। লোকে কয়, কাছারি তো সান্যাল কাছারি, যাও, বিচার পাবাই। দোষ করো, পায়ের কাছে লাঠি রাখে দণ্ডবৎ হও, সাতখুন মাপ। কর্তা, সেই সান্যালের দুয়ারে আসছি আমরা'।

মামলাটার বিষয় নিয়ে যখন রামচন্দ্র এসেছিলো, সে দীর্ঘতর প্রশস্তি দিয়ে তার আবেদন শুরু করেছিলো। সেদিন সান্যালমশাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, এমনকী উভয় বংশের পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে তাঁর মনে পড়েছিলো সেকালের অত্যাচারী পুরুষদের কথা। তখন তাঁর মনে হয়েছিলো, সেকালের সেই মহাবাহু বীর্যবান পুরুষদের যেন অত্যাচার-প্রবৃত্তি মানাতো, যেমন কোনো মহৎ শিল্পীর সুরাপান। তখনি তাঁর মনে হয়েছিলো, মিহির তো সেসব পুরুষের মতো নয়, ডান হাতে তরোয়াল ধরে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন সামন্ত নয় সে। সান্যালমশাই স্থির করেছিলেন পারুষ্য মিহিরকে মানায় না।

কিন্তু তখন ছিলো মনের অভিমানমত্ত অবস্থা। বাস্তবের আলোয় বিষয়টিকে হাস্যকর বোধ হয়। হাসিমুখে সান্যালমশাই ভাবলেন, কাকে মানায় না বা মানায়—এ প্রশ্নই নয়। কলকাতা থেকে দূরে থাকার ফলে কিছুদিন আগেও মধ্যযুগীয় সেসব প্রথার কিছু কিছু এ অঞ্চলে বেঁচে ছিলো, ক্রমশ সে সবও গত হচ্ছে। এখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ হয় না, হয় আদালতে।

আর তাছাড়া এ ব্যাপারে অত্যাচারটা কোথায়? সান্যালমশাই ভাবলেন, সেকালে জমিদাররা অত্যাচার করতো, ভালোওবাসতো। এখন দুটির কোনোটিই নয়। বাইরের শাসনের চাপে দুই-ই এক হয়ে গেছে—প্রজা ও জমিদার। উপরে যে-সরকার সে কি ভালোবেসে লাটটা কম করে নেয় কেউ অশক্ত হলে? আগাগোড়া হক্ বুঝে নেওয়ার ব্যাপার। যদি খাসমহলের প্রজা হতো হরিশচন্দ্র, আদালতি পরোয়ানা ফিরতো যুক্তহস্তের মিনতিতে? কালেক্টর দয়া করতো না।

সান্যালমশাই বললেন—'শোনো রামচন্দ্র, আজকাল তো প্রজারা আকচার নালিশ করছে জমিদারের নামে আদালতে। প্রয়োজন হলে তোমরাও তাই করো। খাজনা আদায় করা আমার কাছে অন্যায় নয়'।

এদিকে রামচন্দ্রও দমবার নয়, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, 'আজ্ঞা, ন্যায়ের উপরেও ন্যায় আছে। আমরা অন্যায় করে স্বীকার কবুল করতেছি। আদালতে তাতে মাপ নাই, কিন্তুক বাপ আর ভগোমান মাপ করে, আজ্ঞা'।

রামচন্দ্রের বসার ভঙ্গিতে এটা অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠলো কিছু-একটা প্রতিকারের আশ্বাস না-নিয়ে সে উঠবে না। কথায় কথাই বেড়ে যাবে। সান্যালমশাই বললেন—'আচ্ছা তোমরা এখন যাও। আমি মিহিরের কাছে সব ব্যাপারটা আগে জেনে নিই'।

রামচন্দ্ররা চলে গেলে নায়েব এলো সুমার বই নিয়ে। এটা প্রাত্যহিক কর্ম। গতদিনের সুমারের অঙ্কগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে তলায় একটা সই করে দেন সান্যালমশাই।

নায়েবের কাছ থেকে সুমার-বই নিয়ে সান্যালমশাই বললেন—'আবার কী গোলমাল লাগালো এরা, একবার দেখো তো। খাজনা দেবে না অথচ মিহিরকে অনুরোধ করতে হবে যাতে উচ্ছেদ না করে। মিহিরই-বা শুনবে কেন'?

'আজ্ঞে, ধানটা উঠলে ওরা খাজনা শোধ করে দেবে হয়তো'।

'বলেছিলো নাকি? ধান উঠবার কত দেরি'?

'আর দু'একটা মাস যো-সো করে চালাতে পারলে আউস—'

'তবে তোমার মহালগুলোতেও এখন বাকি খাজনার চাপ পড়বে না বলো'?

'আজ্ঞে'। মাথা চুলকালো নায়েব।

'তবে'?

'লোকের বসতবাটি কিনা। চাষের জমিগুলো গেলে তবু সহ্য হয়, বাসের কুঁড়ে গেলে বুকে বড়ো লাগে'।

সুমার-বই সই হয়ে গিয়েছিলো, নায়েব আর দাঁড়ালো না। নায়েবমশাই তার মামার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে চাকরিটা পেয়েছিলো, তেমনি পেয়েছিলো দুটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তার প্রথমটা হচ্ছে : এ বংশের নায়েবি করে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, মনিবের পরিবারের প্রায় একজন হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বাজে টাকার লোভ রাখতে নেই। একদিন হয়তো সুমার-বইয়ের অঙ্কের নিচে কলম বাধিয়ে তাকান এঁরা, ভয়ংকর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে : জিজ্ঞাসিত না-হলে কোনো প্রস্তাব করতে নেই।

কিন্তু আজ সান্যালমশাই নিজেই ডাকলেন নায়েবকে।

'তামাক দিতে বলবো, হুজুর'।

'আচ্ছা, তা দিতে বলো'।

তামাক এলো। আজ সকালে এই প্রথম তামাক। খানিকটা সময় সেটা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন সান্যালমশাই, তারপরে বললেন—'ধান ওরা বুনেছে, কিন্তু চৈতন্য সাহার হাত এড়িয়ে তা ঘরে তুলতে পারবে'?

'কিছু হয়তো পারবে'।

'সে-কিছুটা কতটুকু? তাতে খাজনা শোধ হয়'?

'আজ্ঞে'! নায়েব থতমত খায়।

'বাসের কুঁড়ের কথা বলছিলে। বুধেডাঙায় তুমি কী করছো? সেখানেও তো সান্দারদের বাসের কুঁড়ে'।

এমন জেরায় পড়তে হবে জানলে নায়েব ওদের হয়ে কথা বলতো না। সে বিব্রতমুখে উত্তরের জন্য কাছারির দরজা আঙিনা ইত্যাদি অন্বেষণ করতে লাগলো।

'আজ্ঞে, তাহলে কিন্তু আমরা সান্দাররা ফিরলে জমি ফিরিয়েও দেবো। আমরা না-ধরলে চৈতন্য সা সব বেদখল করে নিতো'।

ধোঁয়া ছেড়ে সান্যালমশাই হেসে বললেন—'মামলাটার ঝোঁক তোমার এখনো কাটেনি। মিহিরের সঙ্গে আমার মামলা মিটে গেছে তুমি ভুলে গিয়েছিলে। আসলে মিহিরকে কিছু বলার কোনো যুক্তিই আমার নেই'।

নায়েবের বলতে ইচ্ছা হলো—হরিশচন্দ্র মিহিরবাবুর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়াতেই এই বিপদ তার।

সান্যালমশাই বললেন—'মিহিরের কাছে একবার যেও, অনুরোধ কোরো, যদি এ ক'মাস সে মাপ করতে পারে'।

নায়েব চলে গেলো।

সান্যালমশাই-এর মনে হলো, মিহির তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা দেখেই কি তিনি তাকে

বিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন? তার সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে যে-স্বাতন্ত্র্য ছিলো সেটা কি তাঁর মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছায়াপাত করেছিলো? নিজের মনের স্বরূপ দেখে যেন তিনি বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। এরকম কেন হয়? পরে যা খারাপ বলে বুঝতে পারেন আগেই কেন তা অনুমান করতে পারেন না। এই অনুশোচনা হলো তাঁর।

কাছারির সম্মুখে বিদেশী লাইম গাছটার পুরনো ডালে কালকের ঘুঘুজোড়া এসে বসেছে। বোধ হয় বাসা বাঁধবে। একটু পরেই দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ বিশ্রামের নিকেতন হবে। তখন চঞ্চুচুম্বনের অবসরে ওরা দীর্ঘ টানা সুরে এক এক বার ডেকে উঠবে।

ওদের কি মন আছে? চিন্তা করার মতো, স্মৃতি থেকে বিচারে পৌঁছবার মতো মন ওদের হয়তো নেই। সামান্যতম মস্তিষ্কও যখন আছে তখন স্মৃতি না-থাকার কী যুক্তি আছে বলো।

লাইম গাছটার পাতা নড়ে উঠতেই গাছটার গোড়ার কাছে রোদের সীমা এসে পৌঁছলো। বেলা তাহলে অনেকই হলো।

কাছারির সদর দরজার বাঁ-দিকে দুটি কাঠের খুঁটিতে একটি কাঠ আড় করে শোয়ানো, সেই শোয়ানো কাঠ থেকে ঝুলেছে পেতলের ঘড়ি। কিছুদিন আগেকার ব্যাপার, সান্যালমশাই দিনের বেলায় ঘড়ি পেটাবারণ করে দিয়েছেন। নতুবা সান্যালগিন্নি অনসূয়ার কাজের হাত থামতে চায় না। দুপুরের বিশ্রাম ফুঁড়ে তিনি বলে বসেন—'যাই, সময় হলো। আজ আবার ছানাটাও ওরা ভালো করে কাটতে পারেনি'। পেটা ঘড়ি বন্ধ হওয়াতে প্রথম যেদিন সান্যালগিন্নি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই দুপুরের কথাটা মনে হওয়াতে কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সান্যালের দৃষ্টি। মামলার কয়েকটি দিন এসব তেমন নজরে পড়েনি। কী অন্যায়!

স্নানের সময় হয়েছে। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চাকরকে দেখতে না-পেয়ে সান্যালমশাই ডাকে-আসা খবরের কাগজ আর চশমার খাপটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাকরও এলো।

দুপুরের ঘুম শেষ হয়েছে। শোবার-ঘরের সবচাইতে ছায়া-গাঢ় কোণে গভীর একটা সোফায় ডুবে বসে আছেন সান্যালমশাই, চোখের সামনে বিলেতি পত্রিকা। তামাকের মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে।

রূপনারায়ণ মায়ের পাশে বসে ছবি আঁকছে। সান্যালগিন্নি অনসূয়া কী একটা সেলাই করছেন।

রূপনারায়ণ বললো, 'আজ সকালে রামচন্দ্ররা এসেছিলো কেন, বাবা'?

পত্রিকার পৃষ্ঠা উলটিয়ে সান্যালমশাই বললেন—'তুমি রামচন্দ্রকেও চেনো'?

'হ্যাঁ, লোকটি একটা কীর্তনের দল খুলেছে। ওরা বলে নামকীর্তন করে বেড়ালে দেশের আধিব্যাধি দূর হবে। আমাদের বাড়িতে করতে চায় একদিন'।

'এতসব খবর তুমি কোথায় পেলে'? সান্যালমশাই মৃদু-মৃদু হাসলেন।

'একদিন ব্রজকান্তবাবুর কাছে বলছিলো ওদের একজন, শুনলাম। তোমার কাছে বলতে সাহস পায়নি'।

সান্যালমশাই পত্রিকা মুড়ে রেখে বললেন—'ছোটোবাবু, তুমি চাঁদ কাজির গল্প শুনেছো? চার-পাঁচশো বছর আগে একদল বাঙালি কীর্তন দিয়ে দেশের আধিব্যাধি দূর করতে চেষ্টা করেছিলো। তখন এ দেশের রাজা ছিলো কীর্তন শুনতে যাদের ঘোরতর আপত্তি। সেসব কীর্তনিয়া কিন্তু ভয় পায়নি'।

'তাহলে ওদের আসতে নিষেধ নেই তো'?

'ওরা তো কীর্তনের কথা আমাকে কিছু বললে না'।

'তাহলে তোমার আপত্তি নেই। আমি বলে আসি'।

রূপনারায়ণ নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেলো।

সান্যালমশাই ছেলের উৎসাহের দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসতে লাগলেন।

অনসূয়া বললেন—'হাসছো যে'?

সান্যালমশাই বললেন, 'ওদের কথায় একদিন রূপু বলেছিলো, ভালুকে চাষী। সেটা ঘৃণা করে বলেনি,

ওদের শক্তির যে-রূপটা চোখে পড়েছিলো তারই বর্ণনা করেছিলো ভালুকের সঙ্গে উপমা দিয়ে। তারা মৃদঙ্গ নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে গেলে কেমন হয়, তাই কল্পনা করছিলাম'।

'ওদের মধ্যেও ধর্মভাব আছে। ওরা তো মাঝে-মাঝে বারোয়ারি কালীপুজো করে। অসুখ-বিসুখ খুব লেগে উঠলেই ওরা একটা-না-একটা পুজো করে'।

'সেসব পুজো ওদের মানায়'।

'কীর্তন ওদের মানায় না এ তুমি কী করে বলো? সেটা তো এখানকারই জিনিস'।

গড়গড়ার নলটা দোলাতে-দোলাতে সান্যালমশাই বললেন, 'এমন এক দুর্ভিক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মহেন্দ্ররা কামান তৈরি করেছিলো, সত্যানন্দরা কীর্তনের বাড়বাগ্নি জ্বেলেছিলো ; এবার তোমার স্বামী পালিয়েছিলো শহরে। রাজপুরুষ শ্যালক ছিলো বলেই, নতুবা কী হতো বলা যায় না'।

'তোমার সব তাতেই হাসিঠাট্টা, ধর্ম নিয়েও তাই'।

'কে বলছে, কে বলছে? তোমার সঙ্গে হাসিমস্করা?' সান্যালমশাই মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন, 'আমি ওদের আজই খবর দেবো। কীর্তন শুনতে আমিও ভালোবাসি। ব্রজকান্ত এবার যেদিন শহরে যাবে রামগোঁসাই-এর দলকে নিয়ে ফিরবে'।

'আসলে তুমি বিশ্বাস করো না ওদের কোনোকালে ধর্মে মতি হতে পারে'।

সান্যালমশাই গম্ভীরমুখে বললেন—'ধর্মে মতি হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় বোধ হয়'।

অনসূয়া স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে গাম্ভীর্যটার কতটুকু কপট ঠাহর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু ধর্ম ও কীর্তন নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। কাছারিতে ঢুকবার আগেই রূপনারায়ণকে যেমন, দোতলার এ ঘরখানাতে সান্যালমশাইদেরও তেমনি বিস্মিত হতে হলো। বিষয়টা কৌতুকেরও বটে। পাল্কিতে চড়ে এমন হুম-হাম শব্দের মধ্যে অনেকদিন কেউ কাছারিবাড়ির সীমানা পার হয়ে অন্দরবাড়ির দরজায় এসে থামেনি।

পুলিসের লোকেরা আসে। শহরের রাজপুরুষরা বছরে এক-আধবার আসে ; আত্মীয়স্বজনরাও আসে। পুলিসের ঘোড়া ও সাইকেল। রাজপুরুষরা আসে সান্যালমশাই-এর ফিটনে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আজকাল যারা আসে তারা প্রায়ই গোরুগাড়ি করে আসে। অন্য সব যানবাহন থাকে কাছারির ফটকের বাইরে। কদাচিৎ অনসূয়া যাওয়া-আসা করেন। তাঁর পাল্কি অবশ্য অন্দরেই চলে আসে আট বেয়ারার কাঁধে। আর একজন আসে, সে মনসা। অপরিচিতি হাল্কা পাল্কির এমন সোরগোল!

হু হুম না, হু হুম না।

অনসূয়া কৌতূহলভরে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে এলেন। সান্যালমশাই জানলার কাছে উঠে দাঁড়ালেন। রূপনারায়ণ কাছারি আর অন্দরের দরজার পাশে পাল্কিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পাল্কি থেকে নিজের ছোটো হাতব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে সুমিতি নামলো। রূপনারায়ণের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলো। 'তুমি বড়োবাবুর ছোটোভাই, ছোটোবাবু রূপু'?

মহিলার সম্মুখে দাঁড়ানোর অভ্যাস রূপনারায়ণের একেবারেই নেই, তার উপরে যে এমন সপ্রতিভ তাকে কী উত্তর দেবে লাজুক রূপনারায়ণ।

সুমিতি রূপনারায়ণের হাত ধরে বললো—'চলো ভাই, বাবা-মায়ের কাছে'।

কনকদারোগা দিঘা থানার প্রবল প্রতাপান্বিত বড়োদারোগা। তার অধীনে আরো দুজন সব্-ইন্‌স্পেক্টর আছে, জন-চারেক অ্যাসিসট্যান্ট সব্-ইন্‌স্পেক্টর আছে।

কিন্তু এহেন কনকদারোগা থানায় বসে নিজের উপরে কখনো-কখনো বিরক্ত হয়ে ওঠে।

সসম্মানে সমাজবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে তাব না-হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, না-হলো কোনো ব্যবহারিক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাকরি। টাকার তাগিদে আসতে হলো দারোগাগিরির বাঁধা সড়কে। বাঁধানো হলেও দুপাশে ফুটপাতের সীমাসরহদ্দ নেই। সামনেব দিকে টাইম-স্কেলে মাইনে এগিয়ে যাচ্ছে, এপাশে-ওপাশে কুড়িয়ে-বাড়িয়েও চলা যায়।

লেখাপড়া হলো না বলে যে-খেদটা হয়, সবদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে সেটা থাকে না। একসময়ে তার বিবেক পীড়া দিতো। এখন কর্তব্যকর্মেব সঙ্গে তারও একটা সামঞ্জস্য হয়ে গেছে। তার চাকরির গোড়াতেই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ বাংলাদেশে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর এই থানায় গান্ধীপন্থীরাও নেই যে তাদের উপরে মাঝে-মাঝে হুমকি চালাতে হবে। '৪২-এর অত বড়ো সর্বভারতীয় ঘটনাটায় এ অঞ্চল উৎসুক ছিলো না। দু'একদিনমাত্র থানার চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো, এক-আধবার কনস্টেবলদের ফল্ ইন্ করানো মাত্র—তা-ও উপরওয়ালার হুক্‌মতে, প্রয়োজনে নয়। আর-একটিবার-মাত্র যেতে হয়েছিলো সান্যালমশাই-এর বড়োছেলে গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে নাকি খোঁজ করতে। ভাগ্য তাকে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছিলো। অন্তত ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় সে বলতে পারবে সরকারের শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সে কোনো দেশপ্রেমিকের নির্যাতনের নিমিত্তমাত্রও নয়।

কাজেই বেশ দিন যাচ্ছিলো তার। ছোটোখাটো সাধারণ চুরিচামারির ব্যাপারে তদন্ত করা ছাড়া তার একটিমাত্র কাজ ছিলো মাসে দু-দিন করে সান্দারদের হাজিরা নেওয়া। শেষের কাজটাতে সে রীতিমতো আনন্দ পেতো। মাঝে-মাঝে অপরাধ বিজ্ঞান চর্চা করাব যে-সখটা তার হয় তাতে যেন সান্দারদের অস্তিত্ব সাহায্য করে। স্বভাবদুর্বৃত্ত এরা—সবকার থেকে এমনি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষানুক্রমে এরা দুর্বৃত্তই থেকে যাবে। কৃষিকর্মে এরা যতই মগ্ন হয়ে থাকুক, ছোরা-গুপ্তি এদের লাঙলের আড়ালে লুকোনো না-ই থাক, এদের মনের মধ্যে নাকি সভ্যতাবিরোধী হিংস্রতা ধিকিধিকি জ্বলছে।

কনকদারোগার দৃষ্টিও কাজে-কাজেই সান্দারদের প্রতি সজাগ ছিলো। পাক্ষিক হাজিরার দিন আসবার আগেই সে তোড়জোড় করতো এই নৈমিত্তিক কাজটার জন্য। কে এলো, কে এলো না এদিকে তার কড়া নজর। কেউ না-এলে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে কোনোদিনই তার আলস্য ছিলো না।

কিন্তু আজকাল হাজিরাটা হয় না। সরকার তার নিয়ম শ্লথ করেছে তা নয়। গহরজান সান্দার এখনো মাঝে-মাঝে আসে। এক-বুক শাদা দাড়ি নিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সান্দার-সংখ্যা হাজিরায় কমতে-কমতে এখন দু-চারজনে দাঁড়িয়েছে।

এক হাজিরায় এসে ওরা বলেছিলো, বুড়ো আলতাপ খসে গেছে। আর কোনোদিনই সে থানায় আসবে না।

কনক ধমকে উঠে বলেছিলো—রসিকতা রাখ ; কোথায় গেলো তাই বল।

—জে, মরেছে সে।

—কী করে মরলো? মারপিট দাঙ্গার কথাটা নিজেই প্রায় বলে ফেলেছিলো কনক।

ওরা চলে গেলে খটকা লেগেছিলো কনকের। মৃত ও অসুস্থ ছাড়া কোনো সান্দার তার থানার এলাকায় বাস করে থানায় হাজিরা দেবে না, এ তার কল্পনারও বাইরে। একসময়ে এই অনুপস্থিতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। সে ভেবেছিলো অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে অনাহারজনিত দুর্বলতা লিখে রাখবে। কিন্তু

সেটা লিখতে গিয়েও কলম সরলো না। খবরের কাগজওয়ালারা দুর্ভিক্ষ বলে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে আর সরকার এখনো দুর্ভিক্ষকে মেনে নেয়নি, এ সময়ে যদি সে কাগজে-কলমে এতগুলি অনাহারের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখে তবে তো সরকারকেই বিপদে ফেলার সামিল হলো।

সে সময় কনকদারোগা একটা ভুল করে ফেলেছিলো, সে সত্যি তদন্তে বার হয়েছিলো। বুধেডাঙা অবধি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সে যদি থামতো তাহলেও হতো। বুধেডাঙা ছাড়িয়ে চিকন্দির সীমানায় পৌঁছে সে ব্যাপারটার মুখোমুখি হয়েছিলো।

—ও বাবা, বাবা, সোনা আমার—

ঘোড়া থামিয়েছিলো কনক, তার কানে গেলো—ঐ সোনার মুখে ভাত দিতে পারলাম না রে, বাবা।

থিয়েটারে দেখা সংহত শোক নয়, সিনেমায় শোনা মার্জিত বেদনার হেঁচকি নয়, অসংস্কৃত বেদনার বিকৃত উচ্চারণ।

কনকদারোগার বুকের গোড়াটা উল্টে-উল্টে যেতে লাগলো, অশ্রুগ্রন্থিগুলো ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। চোখের জল পুরোপুরি চাপতে পারলো না সে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে কনক পালিয়ে এসেছিলো।

আজ তার মন ভালো ছিলো। অনেক কারণ তার। দুপুর-রোদে স্টেশনে ঘোরাফেরা করা অনেক দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। কর্তব্যরত অবস্থায় উপরওয়ালার চোখে পড়া তার মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয়টি তার চাইতেও বড়ো : সান্যালমশাই-এর ছেলে সত্যি আসেনি তার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলতে। তৃতীয় একটিও আছে, তাকে কারণ বলা যায় না, কিন্তু তাহলেও উল্লেখযোগ্য: শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র মহিলার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য সব পুরুষের ভাগ্যে রোজ ঘটে না। আর পরম কৌতুকের বিষয়—তার উপরে নির্দেশ এসেছিলো সান্যালমশাই-এর ছেলে নৃপনারায়ণকে চোখে-চোখে রাখার, যখন সে লোকটি পুলিসের হেপাজতে, হয়তো-বা সেন্ট্রাল জেলেই।

থানার সামনে বড়ো অশ্বত্থ গাছটার পাতাগুলিকে আলোড়িত করে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে। বারান্দার টেবিলটার সম্মুখে বসে অস্ফুট শব্দে শিস দিতে-দিতে আঙুলের ডগা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিলটা ঠুকে কনক উঠে দাঁড়ালো। মুন্সিকে ডেকে বললো, 'আমি চললাম বিপিন, বাসাতে থাকবো। আজ আর ডাকাডাকি কোরো না'।

বাসায় ফিরে স্ত্রী শিপ্রার হাতের খানিকটা সেবা নিয়ে কনক শোবারঘরের টেবিলের সামনে বসলো। কালো রঙের মাঝারি চেহারার পুরনো ডায়েরিখানা খুলে পাতা উল্টে সে তার গবেষণার প্রচেষ্টা-স্বরূপ লেখাটা বার করে ফেললো। তার মনে হলো স্টেশনে দেখার পর সুরো তার মনের অনেকখানি জুড়ে আছে।

সান্দারদের নিয়ে সে আলোচনা শুরু করেছিলো। উচ্চাভিলাষী কিছু নয়। নিজের জানা কথাগুলির পাশে-পাশে নিজের চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে রাখা।

সান্দারদের উৎপত্তির ইতিহাসটা কনকের কল্পনাজাত। সেখানে সে লিখে রেখেছে নিজের মন্তব্য। এরা নাকি কোনোকালে বাঙালির নৌ-সৈন্য ছিলো। বাঙালির যেদিন নৌ-সৈন্য রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলো এদের একদল হয়েছিলো জলের ডাকাত আর একদল হলো যাযাবর। কিংবা যখন বাঙালির শানিত ইস্পাতের প্রয়োজন ছিলো তখন এরাই শানদার ছিলো।

আর যাই হোক, এরা যে যাযাবর সে-বিষয়ে কনক নিঃসন্দেহ হয়েছে। নিঃসন্দেহ হতে পারার কারণ বুড়ো আলতাপের সঙ্গে পরিচয়। বুধেডাঙার চরে সান্দারদের সে-ই নিয়ে আসে। এদিকের সান্দাররা তারই জ্ঞাতিগোত্র।

তারও আগে সান্দাররা দু-তিনটে জেলার ব্যবধানে জাত-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলো। জাত-ব্যবসায়টি যে ঠিক কী তা আন্দাজ করতে হবে। আলতাপের কথা ধরতে গেলে সেটা চুরি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। থানায় দাঁড়িয়ে দারোগার মুখের সামনেও বুড়ো আলতাপ বলতো, 'ট্রেনে উঠলেই পয়সা। একখান সুটকেস সরাত্তি পারো পনরোদিন অ-ভাবনা। বুধেডাঙায় আসবার আগে হয়তো সে-ও ট্রেনে

উঠে চুরি করতো যাত্রীদের মালপত্র। অন্তত তাদের ওস্তাদ মেরজান সর্দার করতো। মেরজানের মৃত্যুর ব্যাপারটাই তার প্রমাণ।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির পিছন দিকের জানলা গলিয়ে একটা সুটকেস নিয়ে পালালো মেরজান পুড়াদ' স্টেশনে। হৈ-হৈ রব উঠলো যাত্রীদের মধ্যে। ইতস্তত করার সময় ছিলো না। পাশে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, মেরজান চুপ করে একটা মালগাড়ির নিচে গিয়ে বসলো। বসে হয়তো মনে-মনে হেসেছিলো সে, কিন্তু হঠাৎ মালগাড়িটাই চলতে আরম্ভ করলো। তখন সেই চলন্ত চাকার ফাঁকে বেরিয়ে আসার জন্যে কত ফিকিরই না সে করেছিলো। প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি তখন মানুষ তার সেরা ওস্তাদি কাজে লাগায়, নাকি সব গুলিয়ে যায় তখন, মাথায় সাধারণ বুদ্ধিও আসে না।

মেরজানের বিবির কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলো আলতাপ।

—চাচী, আজ তুই ঘরে দুয়ার দে।

—কেন্ রে, সর্দার আসবি নে?

—না, সর্দার, মনে কয়, আজ আসবিনে।

দু-তিন দিনেও যখন মেরজান এলো না আলতাপ আব গোপন রাখতে পারলো না। মেরজান-বিবি হাহাকার করে উঠেছিলো।

তখন মাথাঘোরা রোগ ছিলো ফুরকুনির, শুধু অনাহারে নয়, সন্তান সম্ভাবনাতেও। একদিন আলতাপকে পথে চলতে দেখে তাকে থামিয়ে ফুরকুনি বললো—আমার কী হবি, কও?

আলতাপ চোখ মেলে দেখলো ফুরকুনিকে।

আলতাপের যাতায়াত এরপরে বেড়ে গিয়েছিলো। আহা, এ সময়ে সাহায্য না-পেলে কোনো মেয়েমানুষই বাঁচে না। আর যাই হোক সে মেরজানের বংশধর বহন করছে। একথাও উল্লেখযোগ্য, মেরজান, যার কাছে সান্দারদের যে-কোনো কন্যা সহজলভ্যা ছিলো, তাকে যে বেঁধে রাখে সেই ফুরকুনিবিবি এই।

কিন্তু আলতাপের যে-বয়স তাতে তার পক্ষে বিপন্নকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা যত সহজ সে-কাজে লেগে থাকা তত নয়। মাঝে-মাঝে ট্রেনে চেপে সে উধাও হয়ে যেতো দীর্ঘদিনের জন্য।

একদিন স্টেশনে বসে জুয়া খেলতে-খেলতে রোখ চাপলো মাথায়। রাত যখন মাঝামাঝি তখন আর সকলে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলো ঘর থেকে। পরাজয়ের বেদনার উপরে অপমানের জ্বালা। নিজের গ্রামের পথে ফিরতে-ফিরতে তার মনে হলো কার কাছে কত টাকা পায় সে, পায় কিনা কারো কাছে। এরকম গোলমাল মাথায় নিয়ে পথ চলতে-চলতে আলতাপের মনে হলো ফুরকুনি তাকে অনেক ঠকিয়েছে। কান্নার সুরে কথা বলে অনেক চাল, অনেক টুকিটাকি খরচ আদায় করে নিয়েছে সে। এ কী অন্যায়! তার অভিজ্ঞতা কম বলেই তাকে এরকম ঠকাতে পেরেছে সকলে। চূড়ান্ত আক্রোশের একটা গালিতে চরাচরকে অভিহিত করে সে পণ করলো, আজ সে হিংস্রতম প্রতিশোধ নেবে।

কানাকড়ি থাকার দিন ছিলো না ফুরকুনির, তা দিন বারোটাই হোক কিংবা রাত বারোটা। কিন্তু নেশার মাথায় আলতাপ স্থির করলো—সব মেয়েরাই, বিশেষ করে সান্দারনীরা চোরাই মালের এটা-ওটা সরিয়ে রাখে। ফুরকুনি মেরজানের সময়ের কিছু-কিছু কি আর রাখেনি?

ধাক্কা দিতে ঝাঁপ খুলে গেলো। আলতাপ দেখলো ঘরের একপাশে চটের বিছানায় দু-তিন মাসের শিশুকে পাশে নিয়ে ফুরকুনি ঘুমিয়ে আছে। কুপিটা বোধ হয় নেবাতে ভুলে গেছে, তারই আলো আর ধোঁয়ায় ঘরের ভিতরটা নজরের সামনে নাচছে।

হাত ধরে একটানে ঘুমন্ত লোকটাকে খাড়া করে দিলো আলতাপ। ভালো করে সে চোখ মেলবার আগেই, ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই আলতাপ চড় মারলো ফুরকুনির গালের উপরে। চড় খেয়ে

ফুরকুনি পড়ে গেলো। ঘুমন্ত গালে পুরুষালি চড়!

—কই দে, কী আছে তোর ট্যাকা পয়সা।

—কনে পাবো? সোনা আমার, মারিস নে আর, তুই খাবের দিছিলি তাই বাঁচে আছি।

মাথায় খুন চাপলে কোনো কথাই কানে ওঠে না মানুষের। ফুরকুনি আরো মার খেলো। কিন্তু কিছুতেই যেন আক্রোশ যাবার নয়, গায়ের চামড়া খুলে নিলেও রাগ যেন যায় না। পরিধেয় তার সামান্য পরিবর্ত।

মুশকিল হলো হঠাৎ। রাগের মাথায় সান্দারনীকে সে বিবস্ত্র করে ফেলেছে। রাত্রির ম্লান আলোয় নিরাবরণ নারীদেহ আলতাপের চোখের সম্মুখে। সহসা আলতাপের মন সীমাহীন করুণায় ভরে গেলো। জানু পেতে সে দেহটার পাশে বসে পড়লো।

রাত যখন ভোর হয় আলতাপ ঘুমের মধ্যে শীত-শীত বোধ করে সরে এলো ; ফুরকুনি জেগে ছিলো ; নিজের আঁচলের খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে আলতাপকে ঢাকতে পারলো না যখন, নিজেই একটু এগিয়ে গিয়েছিলো আলতাপের দিকে।

আলতাপই তার সমাজের ঐতিহাসিক। ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ নয় শুধু, তার প্রকাশভঙ্গিও অনন্য। সন-তারিখে কিছু গোলমাল হয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে যেন ইতিহাসের প্রাচীনত্ব গভীর হয়ে ওঠে।

বেলাতের যখন বছর পনেরো বয়স, রজব আলি উড়ুউড়ু করছে, তখন ফুরকুনির মৃত্যু হলো। সে এক হাঙ্গামা। পুলিস আলতাপকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলো। গোমুখ্খু পুলিস!—কনকদারোগার সম্মুখেই থুথু ফেলে মুখ বিকৃত করে বলেছিলো আলতাপ। অথচ কত না ভালোবাসা ছিলো দুজনের, এক-আধ দিনের চোখ-ঠারার ব্যাপার নয়, দুটি সন্তানের দুপাশে বসে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তাদের মানুষ করে তোলার সাহচর্য। অথচ পুলিসের দারোগা-উকিল বলেছিলো : ফুরকুনির বয়স হয়েছিলো, চুলে পাক ধরেছিলো, আর এদিকে আলতাপের জোয়ান বয়স। আরো লক্ষণীয়, এতদিন পরেও ধর্মের গ্রন্থি পড়েনি এদের জীবনে, এরা এখনো বিবাহিত নয়।

কনক নিজেই প্রশ্নটা করেছিলো—তোমাদের বিয়েসাদিটা কবে হলো।

আলতাপ প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলো তার সারমর্ম এই : অসুখ করলে নিজের সন্তানের মতো বুকে করে রাখতে পারে আর কোন সান্দারনী ফুরকুনি ছাড়া? আর এটা এত সত্য যে আলতাপ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বোধ করেনি। ফুরকুনির মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ সময় পৃথিবীর অন্য সব সান্দারনী থেকে সে মুখ ফিরিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। মেরজান-গরবিনী ফুরকুনিকে যে পায় সে কি তাকায় তোমার ফেলানি আর কুড়ানির দিকে।

এই ফুরকুনির তাগিদেই সান্দাররা বুধেডাঙায় এসেছিলো। বোধ করি মেরজানকে হারিয়ে সান্দারদের দুঃসাহসিকতার বৃত্তিকে তার ভয় হয়েছিলো। আলতাপকে পেয়ে তার হারানোর ইচ্ছা ছিলো না। পদ্মার চর তখনো খানিকটা সিকস্তি। বুধবারের দিন গোরুভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আলতাপের যাযাবর দল এসে দাঁড়িয়েছিলো চরটার উপরে। দুপুরে আহারের পর আলতাপ-ঘরনী ফুরকুনি নিজের বিড়ি থেকে আলতাপের বিড়িটা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলো—আলতাপ।

—ফরমাইয়ে।

—এখানে থাকলি কেমন হয়?

—যেখানে থাকি তোমার কাছেই থাকবো।

—তা লয়, এখানে চাষবাস করে ঘর-দরজা করে ছাওয়াল দু'ডে নিয়ে বসলি হয় না?

—চাষবাসের কাম আমি কী জানি?

সত্যি আলতাপ লাঙল ধরা কোনোদিনই শিখতে পারেনি। শুধু তাই নয়, লাঙল ধরা কাজটাকে সে ঘৃণা করে। সান্দারদের মধ্যে গহরজান কৃষিতে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে। মাটির কাজে হাত দিয়ে সান্দাররা মাটি হলো, আলতাপের এ প্রকল্প সে মানতে চায় না। আগেকার দিন হলে আলতাপ সর্দার

কী করতো বলা যায় না, এখন সে তার চিরাচরিত প্রথায় থুথু করে ওঠে।

ফুরকুনি তাকে দুটি সন্তান দিয়েছিলো : মেরজানের ছেলে রজব আলি আর তার নিজের ছেলে বেলাত হোসেন। ভাবতে গিয়ে তার অবাক লেগে যায়। রজব আলিকে সে খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে—সে মেরজান সর্দারের ছেলে। লোককে সে বলে—হবি নে কেন্, সদ্দারের ছাওয়াল, দিল-দেমাক উঁচুই হবি। বেলাত হোসেনের কথায় ফুরকুনি বলেছিলো—এটা তোমার নিজের, তা-ও আদর যত্ন করো না।

কিন্তু পিতার স্নেহ কম পেলেও পিতার প্রবৃত্তিগুলো পেয়েছিলো বেলাত হোসেন। তার নাকি আলতাপের মতো গায়ের রং ছিলো, তেমনি নাকচোখ। শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ছাতি সারানোর ব্যবসা করে বেড়াতো সে কিন্তু কখনো-কখনো এমন সব জিনিস নিয়ে ফিরে আসতো যা নাকি ছাতি-সারানোর মজুরি দিয়ে কেনা যায় না।

অন্য অনেকের জীবনের মতো আলতাপের জীবনে এটাই দুঃখবীজ যে তার আদর্শ ও অন্তরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিলো। রজব আলিকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। অথচ রজব আলি জমিজমা নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। বেলাত হোসেন তার যাযাবরত্বের আদর্শ মেনে নিয়েছে, কিন্তু সর্দার হবার মতো উদারতা তার নেই। পুলিসের সঙ্গে তার সদ্ভাব।

অনেক জেরার উত্তরে আলতাপ একদিন বলেছিলো—কোনো সান্দার কোনোদিন নিজের সদ্দার ছাড়া আর কাকে সেলাম দিছে? কন দারোগাসাহেব। আর এ কী হলো? জমিদার, তার আমলা, তার পাইক, তার সমনজারি!

কনক বুঝতে পেরেছিলো কৃষক-জীবনে আলতাপের আপত্তিটা কোথায়।

দুর্ভিক্ষের আগে রজব আলির বাড়ির সমুখে একটা মাচায় বসে থাকতো আলতাপ আর বিড়বিড় করতো। ঠাহর করে শুনলে বোঝা যেতো সে বলছে: এতটুকু নতুনত্ব নেই জমিতে যে নতুন কিছু আশা করবে। ঐ তো গহরজান বিশ পটি ধান তুলেছে গোলায়। দুই দু-খান গোরুর গাড়ি তার, পাঁচজোড়া লাঙল বিঁধে। কালো কোট পরে থানায় হাজিরা দেয় সে, লাল মোল্লাকি টুপি, তফনের চেকনাই চমকে ওঠে রোদ-ভরা মাঠ পার হতে গেলে। সাদি করেছে এ-সনেও একটা। আহাম্মুখ বোঝে না ষাট বছরে ওসব ঘরে আনা শুধু নিজের খাঁচায় পরের জন্য পাখি পোষা। কিন্তু তা যতই করো, দাঁড়াতে হয় না তোমাকে সান্যালদের পেয়াদার সামনে ভেড়া-ভেড়া মুখ করে?

থুথু ফেলে চারপাশ অগম্য করে তুলতো আলতাপ। এর কিছুদিন পরে সে বলতে আরম্ভ করেছিলো—অন্য কোথাও চলো, অন্য কোথাও চলো। এমন ধানও হয়নি কোনো সালে, এমন না-খেয়ে থাকাও আর কোনোদিন হবি নে।

লোকে ভাবতো ওটা বুড়োদের ধরতাই বুলি। প্রতিবারেই তারা বলে এবারের মতো কোনো ঋতু এত প্রবল হয়ে কখনো আসেনি।

কিন্তু আলতাপের শেষ কথা চূড়ান্ত হয়ে সত্য হলো।

কনকদারোগা কলম খুলে নিয়ে কিছু-একটা লিখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। সে লিখলো :

> সারা গায়ে মাটি মেখে ধূলিধুকড়ি হয়ে অকরুণ আকাশের দিকে ধানের বৃষ্টির জন্য চেয়ে থাকবে, সে-জাত এদের নয়। কোনো-একটা মেয়ের প্ররোচনায় এরা মাটিতে হাত দিয়েছিলো, এদের শ্রমে বুধেডাঙা শস্যময়ী হয়ে উঠেছিলো৭ আজ সুরোকে দেখে এলাম। আলতাপ সান্দারের পৌত্রী, বেলাত হোসেনের কন্যা। চোরাই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। যাযাবর হয়ে গেলো। মাটির বন্ধনে পড়ে সামাজিক প্রাণী হবার যে-সুযোগ এসেছিলো সেটা চলে গেছে।

কনকের স্ত্রী শিপ্রা ঘরে ঢুকলো। সদ্যস্নাতা একটি সামাজিক প্রাণী।

শিপ্রা বললে—'গবেষণা'?

'সময় কাটাচ্ছি'।

শিপ্রা ঝিলিক তুলে বললো—কেউ যদি বলে তোমাদের সকলেরই ঐটি আসল ব্যাপার, ঐ সময় কাটানো? ওদের বাঁচা-মরা তোমাদের নির্লিপ্ত সময় ক্ষেপণের সুযোগ দিয়েছে। এই তোমাদের পলিটিক্স'।

'তা যদি বলো'। কনক খাতা মুড়ে রাখলো—বললে, 'আলতাপ ফুরকুনির হাসি পাবার লোভে বুধেডাঙায় ঘর বেঁধেছিলো শিপ্রা। আমায় কী করতে হবে বলো'।

৫

মাধাই সন্ধ্যার পরে ফিরলো স্টেশন থেকে। অন্ধকারে ঠাহর করে সুরোকে দেখে সে একটু অবাক হলো—'সুরো না'?

'হয়'।

'কী মনে করে আলি, শহরে গেলি না চাল আনবের'?

'চাল আনবো? পুলিসের তাড়া খেয়ে পলাইছি'।

'পুলিস তাড়া করছে? কস কী, কনে'?

'ছোট ইস্টেশনে। মন কয়, দিঘার বড়ো দারোগা'।

'তাইলে'? মাধাই বারান্দার উপরে তার সবুট একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়ালো। সে জানে না তার এই দাঁড়ানোর কায়দাটা স্টেশনমাস্টার কোলম্যানসাহেবের। সে ভাবলো : রেল পুলিস ধড়পাকড় করার তোড়জোড় করে মাঝে-মাঝে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, বোঝানোর চেষ্টা করা যায়। দিঘা থানার দারোগাকে কী বলবে সে।

—'কিছু ক'লা'?

'কবনে। এখন খাওয়া-দাওয়া কর। রাত্তিরে তো টেরেন নাই'।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে মাধাই ঘরে ঢুকলো।

রেলের সবচাইতে ছোট পরিমাপের কোয়ার্টারগুলির একটি। সাত-আট হাত দৈর্ঘ্য ও প্রায় সমপরিমাণ প্রস্থের একখানা ঘর। ঘরের দুটিমাত্র জানলার একটার নিচে মাধাইয়ের খাটিয়া। দেয়ালের গায়ে পেরেক থেকে তার জামাকাপড়গুলো ঝুলছে। ঘরে ঢুকে একটা মাটির কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে বিছানায় বসে একটা বিড়ি ধরালো মাধাই।

সুরো দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

মাধাই লঘুস্বরে বললো, 'এখনো ভাবতেছিস চালের কথা'?

কথাটা মিথ্যা নয়। অপ্রতিভ হয়ে সুরতুন বললো, 'পুলিস ধরলি কবো—মাধাই বায়েনের লোক আমরা? র‍্যালের লোক ধরলি তা কই'।

'কইছিস একখান কথা। তোর মাধাই যেন্ র‍্যালের বড়োসাহেব'। মাধাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

হাসি থামলে মাধাই বললো, 'এখন খাওয়া-দাওয়া কর। কাল সকালে ফতেমারা আসবি বোধায়। তাদের সঙ্গে বুদ্ধি করিস। একটা কিছু ব্যবস্থা হবি'।

মাধাই যখন বলেছে কিছু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বৈকি। ছোটো স্টেশনের কনকদারোগা কিংবা দুপুর রোদের দু-ক্রোশ পথ স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু মাধাইয়ের হাসিও মিথ্যা নয়।

'এখন ঘুমাবা'?

'হয়, ডিব্‌টি দেওয়া লাগবে সারা রাত। স্পেশাল আসবি'। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাধাই

পোশাকপরা অবস্থাতেই খাটিয়ার উপরে শুয়ে পড়লো।

সুরো কিছুকাল বারান্দায় বসে থেকে আহার্য সংগ্রহের জন্য বাজারের দিকে গেলো।

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে মাধাই খানিকটা ভাবলো। তার ভাবনাচিন্তা একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনকে কেন্দ্র করে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার। এখন যে খুব পেয়েছে তা নয়। বরং ঘুমোবার সময়ই এটা নয়। কয়েকদিন আগে শুনেছে সে কথাটা, আজ সেই স্পেশ্যাল আসছে। তাকে সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য দেহ ও মন দুটিই সজাগ থাকা চাই। চোখে এতটুকু ঘুম থাকলে হবে না। আগে থেকে ঘুমিয়ে রাতজাগার জন্য প্রস্তুত হতে সে ঘরে এসেছে। কিন্তু ঘুম প্রয়োজনের সময়ে আসে না। মাধাই শুয়ে-শুয়ে বুটসুদ্ধ পা-জোড়া দোলাতে লাগলো।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিলো। মাধাই ধড়মড় করে উঠে বসলো।

'সুরো আসছিস'?

বারান্দা থেকে সুরো সাড়া দিলো।

'তুই ঘরে আসেও শুতে পারিস। আমি ডিব্‌টিতে চললাম'।

'ঘুমালে না'?

'না রে, ঘুম আসতেছে না'।

ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি মাধাইকে তার এই চাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করতো, সে উত্তর দিতো—এ কি তোমার মেলোয়ারি ভোগা আর খায়ে না-খায়ে থাকা। এর নাম চাকরি। রেলের কামই লোক পায় না, হলো তো হলো, শালা মেলেটারি। নীল প্যান্টকোট কজন পায়, তার উপরে পাওয়া গেলো খাকি প্যান্ট, কোট, টুপি। পুলিসের দারোগারাও তাকায়ে-তাকায়ে দ্যাখে।

খাকি, খাকিই হচ্ছে এই দুনিয়ার সেরা রঙ।

মাধাই যখন গ্রাম ছেড়েছিলো তখন তার বয়স কুড়ি ছাড়িয়েছে। মাধাই এক গণৎকারকে দিয়ে হাত দেখিয়েছে। পাঞ্জাবি গণৎকার পুরোপুরি একটা সিকি পেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই মাধাই বায়েনকে রাজা করে দিয়েছিলো প্রায়, পুরোপুরি পারেনি মঙ্গলের স্থানে কী একটা দুর্যোগ ছিলো বলে। মাধাই এখন নিজের হাতের রেখা দেখিয়ে বলে—তা দ্যাখো, ঠিক কুড়িতে যদি গাঁ ছাড়া না-হতাম, জুটতো এই চাকরি?

গ্রাম থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঠিক তিন মাসের মধ্যে মাধাইয়ের চাকরি জুটে গেলো স্টেশনে। তেরো টাকা মাসিক বেতনের চাকরিটা মাস্টারসাহেব তাকে ডেকে দিয়েছিলো। অবশ্য কফিলুদ্দি শেখের চামড়ার ব্যবসায়ে কোথায় মাস্টারসাহেবের সঙ্গে খাতির হওয়ার যোগাযোগ ছিলো।

স্টেশনের কনস্টেবল দোবেজি একদিন এক রাজপুরীর গল্প বলেছিলো। ত্রিশ হাত উঁচু তার প্রাচীর। ভেতরে বাগান। সারি-সারি ফুল-ফলের গাছের মধ্যে লাল আলোকোজ্জ্বল রাস্তা।

বাইরে কাঁটা-ভরা-রাক্ষুসে লতায় ঢাকা জলা। এক-একটা কাঁটা যেন এক-একটা বিষমুখো সাপ। কিছুদিন পরে মাধাই অনুভব করেছিলো তার চাকরিটাও একটা প্রাচীর।

কিন্তু সবটাই যেন এক পূর্বপরিকল্পিত কাহিনী। কোথায় কোন দুই দেশের রাজায় লেগে গেলো যুদ্ধ। দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ইঞ্জিনগুলো খাকি-পরা লোক নিয়ে ছুটতে লাগলো। ইয়া ইয়া ইঞ্জিন আর হাজার হাজার গাড়ি। হুস হুস ঝম ঝম। যেখানে পাঁচখানা চলতো এখন চলছে পঁচিশখানা। এক সকালে তেমনি কোথা থেকে রাশি-রাশি খাকির জামাকাপড় এলো। মাস্টারসাহেব থেকে শুরু করে মাধাই পর্যন্ত সবাই পরলো। প্রথম যেদিন পোশাক বিতরণ শুরু হয়েছিলো হাসাহাসির চূড়ান্ত হলো। কারো ভুঁড়ির বোতাম লাগতে আপত্তি করলো, কারো-বা পোশাক আলখিল্লার মতো ঝুলঝুলে হলো গায়ে। কিন্তু এক রাত পার না-হতেই হাসির জায়গায় এলো গাম্ভীর্য। আর মাইনা বেড়ে যে কত হলো লেখাজোখা নেই। তেরো বেড়ে তেষট্টি। ছ-মাসের কামাই একমাসে।

অফিসঘরগুলিতে কাজ হচ্ছে যেন ঝড়ের মতো। ফিরিওয়ালা যে এত কোথায় ছিলো কে জানতো!

স্টেশনের উপরেই প্রতি প্ল্যাটফর্মে একটি করে বিলিতি খানাঘর তৈরি হয়েছে। আর কোথায় ছিলো এরা, যারা যে-কোনো দামে যে-কোনো জিনিস কিনবার জন্য গাড়ি স্টেশনে আসবার আগে থেকেই জানলায় দাপাদাপি করতে থাকে। গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে মাথা ঘুরে যায়, পায়ের ঠোক্করে মানুষ ঠিকরে পড়ে, মানুষ চটকে যায় পায়ের নিচে। দৃশ্যটা এ বলেও বোঝানো যাবে না। যে না-দেখেছে সে বুঝবে না, ভাবে মাধাই, এ এক নৃত্য। কিছুদিন আগে এক বাজিকর পুতুলনাচ দেখিয়েছিলো। লাল একটা গোল শতরঞ্চির টুকরোর উপরে একটা পুতুলের চারদিকে অন্য কয়েকটি পুতুল নাচতে লাগলো। তাদের নাচের তালে তালে শতরঞ্চিটাও দুলে দুলে উঠতে লাগলো। তারপর নাচ যখন উদ্দাম হয়ে উঠলো তখন শতরঞ্চিটাও বনবন করে ঘুরতে শুরু করলো। সেই শতরঞ্চিই এই স্টেশন।

অন্ধকার পথটা দিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে মাধাই অন্ধকারের শূন্যতাকে বুট ঠুকে একটা স্যালুট কবে দিলো। ট্রেনটা এসে দাঁড়ালে শুধু সে নয়, স্টেশনে যে যেখানে আছে সবাই এমন করবে। সাধারণ ট্রেন এলেই কত করতে হয়, তার উপরে আসছে স্পেশ্যাল, ইস্‌পেশিয়াল যার নাম। পাঁচ-ছয় দিন আগেই তারে-তারে খবর পেয়েছে সারা দেশ। দক্ষিণের রাজা নাকি উত্তরের রাজাকে খুব হারিয়ে দিয়েছে। ফুল-পাতায় রঙিন কাগজে স্টেশন সাজানো হয়েছে। বড়ো বড়ো গেট। স্টেশনমাস্টারের ঘরে নাকি কয়েকজন বড়ো বড়ো যোদ্ধা চা খাবেন। তার আয়োজন করতে গিয়ে স্টেশনমাস্টার কোলম্যানসাহেবের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সেই স্পেশ্যাল!

স্টেশনের চৌহদ্দিতে পা দিতে না-দিতে মাধাই খবরটা পেলো। জয়হরি তারই মতো পোর্টার। সে-ই বললে—'একখানা নামে, আসলে দুখানা। সেই উত্তর থেকেই চারখানা ইঞ্জিনের পেছনে দুখানা স্পেশ্যাল আধ মাইল তফাতে থেকে চলছে। দ্যাখো মজা, এক লাইন ক্লেয়ারে দুখান গাড়ি চলে'।

মাধাই এমনটা কখনো শোনেনি। সে বললো, 'পেছনের ড্রাইভার কত ওস্তাদ দ্যাখো। একটু বে-মাপ চালাবা তো সামনের গাড়িতে ঠোক্কর'।

'সামনের ড্রাইভার-বা কম কী? ইঞ্জিন একটু কমালে চলবি নে'?

'সব ইষ্টিশনে থ্রু পাস'?

'না, এখানে থামবি'।

থামবে সেটা মাধাইও জানে। প্রশ্নটা উত্থাপন করে বন্দর দিঘার স্টেশন সম্বন্ধে গর্ববোধটি নতুন করে অনুভব করার চেষ্টা করলো সে।

'বাব্বা, দিঘায় না থামে কারো উপায় নাই'।

সামনের ভেন্ডারের ডালা থেকে একটা পান ছিনিয়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে মাধাই মালবাবুর ঘরের দিকে গেলো।

মালবাবু তাব ঘরেই ছিলো। মাধাই তার অত্যন্ত ভুল কায়দায় একটা স্যালুট দিয়ে বললো, 'দুই গাড়িতে নাকি এক ইস্‌পেশিয়াল'?

'গাড়ি দেখতে এলে বুঝি'?

'দেখতে আসি নাই। পাস্ করাবো আমি। আমি ঝাণ্ডাদার'।

'বেশ করেছো'।

মাধাই মালবাবুর চোখেমুখে একটু উত্তেজনা প্রত্যাশা করেছিলো। মালবাবু যেন কীরকম। অন্য বাবুদের থেকে আলাদা।

প্ল্যাটফর্মে ডাউন গাড়ির প্রবেশপথের কাছে কর্মচারীদের ভিড় বাড়ছে। মাধাই তাড়াতাড়ি সেদিকেই পা চালাতে লাগলো। সেখানে পৌঁছুতে না-পৌঁছুতে দিগন্তে স্পেশ্যালের ধোঁয়া দেখা দিলো। স্টেশনমাস্টার নিজেই ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে তিন-চারজন বাবু, জন দু-এক পোর্টার, পয়েন্টস্‌ম্যান। এই না-হলে জীবন? কেবিন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় মাধাই দাঁড়িয়ে পড়লো

ঝাণ্ডা নিয়ে। দাঁতে দাঁত লেগে চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো তার। দিগন্তবিস্তৃত রেল দুখানা যেন একটু একটু কাঁপছে। স্পেশ্যাল সে-দুটিকে অবলম্বন করে এগিয়ে আসছে। লাইন দুখানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাধাইয়ের অনুভব হলো সে-দুটি তার দেহে প্রবেশ করে শিরা-উপশিরার প্রধানতম দুটি হয়েছে, গাড়িখানা তার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করবে সন্দেহ কি।

কিন্তু স্পেশ্যাল এসেছিলো, চলেও গেলো। মাধাই মালবাবুর ঘরের দরজায় একটি প্যাকিং-বক্সের উপরে বসে পড়লো। একটু উসখুস করে মাধাই বললো, 'দেখলেন'?

'না, আমার যে অনেক কাজ'।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে সেটাকে আবার মুখে গুঁজে মালবাবু স্টেটমেন্টে মন দিলো। মাধাই মনিরুদ্দির খোঁজে গেলো।

যে-ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করেছে সেটা আর কারো নজরে পড়লো কিনা এটা জানা দরকার। স্পেশ্যাল যখন ইন করলো তখন মাধাই লক্ষ্য করেছিলো গাড়ি দুখানি ফুল-পাতা-পতাকায় সজ্জিত। ছোটোখাটো অনেক স্পেশ্যাল ট্রেন এর আগে উত্তরে গিয়েছে, অনেক ফিরেছে দক্ষিণে। কিন্তু এমনটা কখনো হয়নি। মাধাই ভেবেছিলো এবার সব সেরা কিছু দেখতে পাবে। আলোয় ঝলমল করতে করতে প্রথম গাড়িটা থামলো। গাড়ির আলোয় স্টেশনের আলোয় রাত দিন হয়ে গেলো। একসঙ্গে সবগুলো ভেন্ডার তাদের ডালা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো। সে-চিৎকারে মাটির ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু সেই আলোক-উদ্ভাসিত গাড়ি যেন ঘুমিয়েই রইলো। জানলায় যে-মুখগুলি দেখা গেলো তারাও এতটুকু উৎসুক হলো না। একটি দুটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ির দরজা খুলে গম্ভীর মুখে দু-একজন খুব বড়ো বড়ো অফিসার নামলো। তারপর তাদের নামা দেখে সাহস পেয়ে আরো দু-একজন করে সৈন্য নামলো। কিন্তু এরা যেন কোনো নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করছে। যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা স্টেশনটার চারিদিক দেখতে লাগলো। ভেন্ডাররা তাদের গাম্ভীর্য দেখে এগোতে সাহস করলো না। কিছুমাত্র সাড়া শব্দ নেই, একটা পয়সা বিক্রি করতে পারলো না ভেন্ডাররা। অবশ্য এটা হয়তো অত্যুক্তি। বিক্রি কি আর হলো না, কিন্তু তাকে বিক্রি বলে না। আগে দু'পয়সার জিনিস কিনতে যে হুংকার ঝনৎকার ছিলো, এখন হাজার টাকার লেনদেনেও তার সিকিটা হলো না। কেউ ডালা থেকে থাবড়া দিয়ে সবগুলি সিগারেট তুলে নিয়ে দশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিলো না। ভেন্ডারের টিকি ধরে টান দিয়ে কেউ হো-হো করে হেসে উঠলো না। এর আগে গাড়ি থামতে-না-থামতে যারা দুদ্দাড় করে ছুটতো ইঞ্জিনের জল নেওয়ার কলামের নিচে, এক-স্টেশন লোকের সামনে উলঙ্গ শিশুর মতো স্নান করতে পারতো, সেই লোকগুলিই-বা গেলো কোথায়! দ্বিতীয় গাড়ি প্রথম গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। একই কথা।

মাধাই মনিরুদ্দির সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'মুর্দা গাড়ি নাকি রে? মাস্টারসাহেব তো বলে খুব যুদ্ধ জিতছে ওরা'।

এ কী রকম জয়লাভ মাধাই বুঝে উঠতে পারে না। জয়লাভ করা মানে চোরের মতো মুখ করে ঘরে ফেরা নাকি?

একটা চায়ের দোকানে বসে পড়লো মাধাই। দোকানিকে চা দিতে বলে সে পাশের যাত্রীটিকে প্রশ্ন করলো—'দেখলেন'?

'দেখলাম'।

'যুদ্ধে জিতছে তবে আনন্দ করলো না কেন্'?

'এখানে করবে কেন? ওদের দেশে ওদের ছেলে মেয়ে বউ আছে, তাদের কাছে গিয়ে করবে'।

মাধাই শ্রদ্ধায় লোকটার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো। এতক্ষণে একটা কথা একজন বলেছে বটে। ঠিক তো। যুদ্ধজয়ের পর এখন বাড়ি ফেরার তাড়া। এখন কি আর হৈ-হৈ ভালো লাগে!

লোকটির ট্রেন ধরার তাড়া ছিলো। সে উঠে গেলো। মাধাই চুষে চুষে চা খেতে লাগলো। দোকানিকে সে কথাটা বললো, 'যুদ্ধে জিতলে কী হবি, নিজের ঘরে না-ফিরলে কি আর আনন্দ হয়'।

অথচ মজা দ্যাখো, এই এত বড়ো ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্য করলো না—না জয়হরি, না মনিরুদ্দি।

এটা যে আজই প্রথম হলো তা নয়। আজ চূড়ান্তভাবে বিষয়টি চোখে পড়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগে থেকেই মাধাইয়ের একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে? জয়হরি কথাটা শুনে ঠিক হেসে উড়িয়ে দেয়নি, বরং মাধাইয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলো। পর্যবেক্ষণটির মূল্য সম্বন্ধে সে কিছু বলেনি, মোটামুটি গভীরে চিন্তা করে সে এটাই তাদের বিস্মিত করেছিলো। তার কথাগুলো যেন কতকটা ভদ্রলোকের আলাপের মতো শোনায়।

জয়হরি বলেছিলো, 'মানুষ কি চিরকালই লাফায় নাকি? তুই চাকরির প্রথম দিকে ওভারব্রিজে দড়ি বেঁধে দোল খাতি, এখন তা করিস? বয়স বাড়লি ধীরথির হয়। এ-ও তেমনি। যুদ্ধের বয়েস হলো না'?

কৌশল করে একটা উপমা দিতে পেরেও সুখী হলো না জয়হরি। অপ্রতিভের মতো মুখ করে সে হাসলো। উপমাটার প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিলো।

এসব ধরনের কথাবার্তা শুনে মনিরুদ্দি আর-একদিন তাকে বলেছিলো—'এত মনমরা কেন্'?

মাধাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো, 'আমি কি একা? জেল্লা যেন সকলেরই কমে'।

'কমে, না বাড়ে'?

মাধাই একটু চিন্তা করে বললো—'ভাত ভাত লাগে'।

'ভাত, সে কি খারাপ? কয় হা অন্ন, যো অন্ন'।

এই কথাটা থেকে একটা তুলনা এসেছিলো মাধাইয়ের চিন্তায়। রেলের গ্রেইন-সপ থেকে একবার একরকম চাল দিয়েছিলো। সুন্দর ধবধবে ভাত হতো। কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে থু-থু করে ফেলে দিতে হতো। তেতো হলেও তবু স্বাদ থাকে। সে ভাত ছিলো সবরকমে স্বাদহীন। ঘটনাটা মনিরুদ্দিকে মনে করিয়ে দিয়ে মাধাই বলেছিলো—'সংসারটা সেই ভাতের মতো'। মনিরুদ্দি হো-হো কবে হেসে উঠে বলেছিলো—'তুমি ভদ্রলোক হলা, বাবুমানুষ হলা, কেন্'?

এসব ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে জয়হরি এবং মনিরুদ্দি দুজনেরই মনোভাব প্রায় এক। অন্তত একটি বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ একমত, দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও প্রয়োজনের বাইরে আলাপ-আলোচনা করাটা ভদ্রলোকদের ব্যাপাব।

মনিরুদ্দি বললো, 'মনমরা কেন্? ফুর্তি করো, হৈ-হৈ করো। মদ খাবা'?

'ধুর। এক্কেবারে বাজে। গা গুঁটায়'।

'কও কী, খাইছো'?

'খাইছিলাম একটু একদিন'।

'জয়হরির কাছে শুনো, সে কেমন জিনিস। ও তো রোজ খায়। সাহেবরাও খায়'।

ওদিক থেকে মনিরুদ্দিকে বাবুরা ডাকলো। সে চলে যেতে যেতে বলেছিলো—'তুই ভাবিস? কাম আর কাম। বাড়ি যায়েও তাই। এটা কাঁদে, ওটা চেঁচায়'।

আর-একটু চা খাবে নাকি ভাবলো মাধাই। চা না-খেয়ে সে একটা বিড়ি ধরালো। তার মনে পড়লো মনিরুদ্দির প্রস্তাবটা। সে বলেছিলো সাহেবরাও খায়। ও খেলে কী হয়? স্পেশ্যালে যে-সাহেবরা গেলো তারা তো খানাগাড়ির মধ্যে বসে মদ খেতে খেতেই গেলো। তবে অমন মুখের চেহারা কেন তাদের?

এতদিন তার যে-অনুভবটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অনির্দিষ্ট ছিলো। সেটা এত লঘুস্পর্শ যে কথা দিয়ে সেটাকে প্রকাশ করতে গেলে অত্যুক্তি হয়ে গেছে। মাধাইয়ের নিজের কাছেই পরে মনে হয়েছে যা সে বললো সেটা সত্য নয়। স্টেশনের এতগুলি লোকের আর কেউ যা নিয়ে আলোচনা করে না সেটা তার নিজের অনুভবের ভ্রান্তিও তো হতে পারে। আজকের স্পেশ্যাল ট্রেনটাকে সে তার ভ্রান্তির বড়ো একটা

প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলো। এত আলো, এত আয়োজন, তাহলে সংসার স্বাদহীন হবে কেন? কিন্তু স্পেশ্যাল ট্রেনটাই যেন তার অনুভবকে সত্য বলে প্রমাণ করে গেলো।

চায়ের দোকান থেকে উঠে মাধাই নিজের ঘরের দিকে রওনা হলো। অনেক লোক আছে ডিউটি করার এখন। একজন অনুপস্থিত থাকলেও কারো চোখে পড়বে না।

ডাক শুনে সুরতুন উঠে বসলো, তারপর মাধাইয়ের গলা চিনতে পেরে দরজা খুলে দিলো।

সুরতুন বললো—'ফিরে আলে এখনই? গাড়ি চলে গিছে'?

'হয়'।

'তাইলে আপনে ঘরে আসে শোও। আমি বারেন্দায় শুই'।

মাধাই ততক্ষণে বারান্দায় বসে পড়েছে। সে বললো, 'তুই এখানে আয়। গল্প করি'।

পরিস্থিতিটা অভিনব। মাধাইয়ের সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনেব হলো। এর আগেও মাধাইয়ের ঘরে সে অনেক রাত্রিযাপন করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফতেমা তার সঙ্গে ছিলো। অনেকক্ষেত্রে এমন হয়েছে সুরো একা বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। তখন ভরসা ছিলো মাধাই ঘরের মধ্যে আছে, ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে। অন্য দু'এক ক্ষেত্রে মাধাই স্টেশনের কাজে ব্যস্ত থেকেছে, দেখা হলে সুরোকে ঘরের চাবি দিয়েছে কিন্তু কখনো ঘুমের মাঝখানে রাত্রির অন্ধকারে এমন করে ফিরে এসে সে ডাকেনি। সুরো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

মাধাই বললো, 'বোস না, গল্প করি, তোর কি ঘুম পাতেছে, সুরো'?

ঘড়ির মাপে রাত্রির বয়স পরিমাপ করতে না-পারলেও আকাশের যেটুকু চোখে পড়লো তাতে সুরো বুঝতে পারলো তখনো এক প্রহর রাত বাকি আছে। সে যন্ত্রচালিতের মতো মাধাইয়ের অদূরে বসে পড়লো।

'কথা কস না যে'? মাধাই প্রশ্ন করলো।

'কী কবো'?

রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে কেউ যদি এমন সব কথা বলতে থাকে তবে সাধারণত তার মনের উদ্বিগ্ন অবস্থাটাই ধরা পড়ে যায়। ফতেমা যদি এখানে থাকতো হয়তো তার কাছেও মাধাইয়ের ভাবভঙ্গি অস্বাভাবিক বলে বোধ হতো। কিন্তু সে হয়তো-বা মাধাইযের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতো। তার থেকে আলাপের সূত্রপাত হতো। সুরোর মনে পড়ে না আর কবে মাধাই আহার্য এবং তার সংগ্রহের বিষয় ছাড়া তার সঙ্গে কথা বলেছে, সেই এক পক্ষী আঁকার দিনটির কথা ছেড়ে দিলে। হাসি-ঠাট্টা মাধাই যে একেবারেই করে না তা নয়, কিন্তু সে সবই ফতেমার সঙ্গে, সুরো শ্রোতামাত্র। প্রশ্নের উত্তর দিতে তবু সম্ভবত সুরো পারতো, কিন্তু নিজে থেকে প্রশ্ন করে আলাপের সূচনা করবে এমন শক্তি নিজের মধ্যে সে খুঁজে পেলো না।

'তোর ব্যবসার কথা ক। কতদিন তো ব্যবসা করলি, কত টাকা জমাইছিস। সে-ব্যবসা নাকি বন্ধ হয় হয়'? মাধাই বললো।

'পুলিস আর ব্যবসা করবের দিবিনে, মনে কয়। আর তাছাড়াও—'

'কী তাছাড়াও'?

'একদিন মোকামেও যদি চাল অ-পাওয়া হয়'?

'তা হতে পারে। তোরা কি ঠিক করছিস আর কোনোকালে গাঁয়ে ফিরবি না'!

'গাঁয়ে ফিরে আমার কী লাভ? সেখানে কেউ খাবের দেয় না। আর তাছাড়াও—'

'কী'?

'এখানে তবু আপনে ডাকে কথা কও। সেখানে না-খায়ে মরলেও কেউ কথা কয় না'।

'হুম। তোর এত ছুটাছুটি ভালো লাগে! আমার আর কাজ-কাম ভালো লাগে না। মনে কয় চাকরি

ছাড়ে দেই। তা যদি করি, আমাক তুই খাওয়াবের পারবি না? ক'লি না'?

'কী কবো? আপনে যদি কও, যা কও তাই করবো'। সুরতুন এত বিস্মিত হলো যে মাধাইয়ের বক্তব্যটাকে পরিহাস মনে করতেও পারলো না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাধাই প্রশ্ন করলো, 'সুরো, এ দুনিয়ার আমার কেউ নাই। তোর কে কে আছে?

সুরতন মাধাইয়ের কথাটা অনুভব করলো। সে বুঝে উঠতে পারলো না এ প্রশ্নের জবাব কী দিতে পারা যায়। আত্মীয়তার হিসাবে ফতেমা তার ভাই-বউ, রজব আলি তার জ্যাঠামশাই। গ্রামের বাইরে অনাত্মীয়ময় পৃথিবীতে তাদের নিকট বলে মনে হয়, গ্রামের ভিতরে তারা প্রতিবেশীর মতো। আর চালের কারবারে নেমে ফতেমার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এসবের চাইতে বড়ো মাধাই, নির্ভরযোগ্য কোনো সম্বন্ধই যার সঙ্গে নেই, অকারণে যে প্রাণ বাঁচায়, প্রয়োজনের সময়ে যে পরামর্শ দেয়। তাকে আজকাল সুরোর সব আত্মীয়ের সেরা আত্মীয় বলে বিশ্বাস হয়। তা যদি না-হতো তবে তার অনুমতি না-নিয়ে কী করে কনকদারোগার তাড়া খেয়ে তার বারান্দায় এসে বসতে পারতো সে! কিন্তু এসব কথা তো বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সুরতুনের কেউ-ই নেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

সুরো সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো।

মাধাই একটা বিড়ি ধরালো। লোহার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে সে বললো, 'ঘুম পালে ঘুমাতাম, এখন কী করি বুঝি না। আমার আর কিছুই করার নাই। তুই কথা কয়ে যা, আমি শুনে যাই'।

'আচ্ছা বায়েন, চাল যখন বেচা যাবিনে নুন বেচলি কি হয়? সে-ও তো দুর্মূল। নুনের মোকাম কনে'?

'তুই যাবি'?

'পথ দেখায়ে দেও'।

'সুমুদ্দুর চিনিস'?

'হয়, শুনছি পদ্মার চায়েও বড়ো নদী'।

'সেখানে তালগাছ পেরমান ঢেউ। মনে কর এক-এক ঢেউ উঠতিছে পদ্মার ব্রিজের গায়ে জল লাগতিছে। সেই জল থিকে নুন হয়'।

'নুন কি ফেনায় ভাসে আসে'?

'জল শুকায়ে নুন'।

'জল কি পয়সা দিয়ে কেনা লাগে'?

'তা লাগে না'।

'তবে'?

সুরতুন নিজেই চিন্তা করে প্রশ্নের উত্তর বার করলো। তার মতো হতভাগ্য আরো আছে। সকলেই তারা তাহলে নুনের মোকামে ছুটতো। সেখানেও নিশ্চয় পুলিস আছে। নতুন একটা হতাশায় তার মন ভরে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে সুরতুন আবার বললো, 'মনে কয় আবার না-খায়ে থাকার দিন আসতিছে'।

মাধাইয়ের মনে হলো, তার নিজের যদি আহারের উপরে এমন রুচি থাকতো! অন্তত এই মুহূর্তে আহারের কথা চিন্তা করতেও তার ইচ্ছা করছে না।

সুরতুন ভাবলো, পুলিস তাহলে এ কী করছে, বেড়াজাল দিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করছে? সহসা তার মধ্যে সান্দারনী ফুঁসে উঠলো। সম্ভবত মাধাইয়ের মতো নির্ভর করার উপযুক্ত পুরুষ কাছে ছিলো বলেই সে ক্রোধকে ভাষা দিতে সাহস পেলো।

সে বললো, 'জাত-সাপ পুলিস। আমাদের শত্তুর জন্ম-জন্মের। কেন্ শোনো নাই বায়েন, আমার নানা কী কতো? আমার নানা ছিলো আলতাপ, কতো—কোনোদিনই আর মিটবি না। আমার আম্মার আগের পক্ষের সোয়ামি ছিলো এক পুলিসের কনিস্টবল। সেকালে আমার বাপছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ এ কথা

জানতো না। বুধেডাঙার কাছে এক জাহাজ ডুবি হয় গাঙে। সান্দাররা ডুবে ডুবে সেই ডুবি-জাহাজ থিকে চালের বস্তা, লোহার পাত, কাপড়ের বান্ডিল বার করে আনলো। পুলিস ঘোরাফেরা করবের লাগলো। আম্মার সাথে আগে জানাশোনা ছিলো তার আগের সোয়ামির আমলে, এমন একজন কনিস্টবল কী করে না-জানি মালের লুকোনো জায়গার খবর পায় ; পুলিস বাঁধে নিয়ে গেলো সান্দারদের সব বেটাছাওয়ালকে। কও এই তো পুলিস। আগের সোয়ামির কাছে থাকে পুলিসি শিখছিলো। কী ঘেন্না তাই কও'।

গল্পটা বলে সুরো বেপরোয়াভাবে সোজা হয়ে বসলো। জাতিগত ঘৃণার আতিশয্য প্রকাশ করতে গিয়ে সে যে নিজের মাকেই হীন প্রতিপন্ন করলো তা যেন সে বুঝতে পারলো না। কিংবা ক্ষয়িতাবশিষ্ট সান্দারত্বের এইটুকুই বোধ হয় বৈশিষ্ট্য।

মাধাই বললো—'তাই বলে তুমিও পুলিসের শত্তুর হবা নাকি'?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো সুরতুনের।

মাধাই আবার একটা বিড়ি ধরালো। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে বললো, 'তার চায়ে ভালো এক সান্দার খুঁজে বার করে বিয়েসাদি কর। সে-ই খাওয়াবি পরাবি'।

কথাটা একেবারেই নতুন নয়। চালের কারবারের সঙ্গীদের মধ্যে বসে এ ধরনের কথা এর আগেও সুরতুন শুনেছে। প্রথম প্রথম উৎকণ্ঠার মতো অনুভব হলেও এখন সয়ে গেছে, কারণ সে সব রং-তামাশার কথা। কিন্তু মাধাইয়ের কথাকে হাসিঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার মনে হলো সে কেঁদে ফেলবে। বিবাহ ব্যাপারটাকেও পুলিসের বেড়াজালের মতো দিগন্তবিস্তৃত বলে মনে হলো। তার মনের মধ্যে যে আকুলতা অস্ফুট আবেগে ছটফট করতে লাগলো সেটার কোনো অংশে যেন এমন কথাও ছিলো : মাধাই, আপনে আমাক পুলিস আর বিয়েসাদি থেকে বাঁচাও।

রাত অনেক হয়েছে। অন্ধকার ঝিমঝিম করছে। বাঁদিকে রেল কলোনির শেষ। সেখানে একটি ছোটো জঙ্গল-ঢাকা ডোবা আছে। এখন কিছু বোঝার উপায় নেই। চাপা গলায় কোনো নিশাচর ক্ষুদ্র প্রাণী সেখানে তার ক্ষীণ হিংস্রতা প্রকাশ করলো।

মাধাই বললো—'রাত পেরায় শেষ হয়ে আলো। ঘুম পায় না তোর'?

'পায়। আপনে ঘুমাবে না, বায়েন'?

'হয়। ভাবনা দিনের বেলায় হবি'। মাধাই বিড়ি ফেলে আঙুল মটকে সোজা হযে বসলো।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'তুই বারান্দায় শুবি, আলো জ্বালায়ে দেবো? ভয় করবি না'?

'না। মাঝেসাজে শুই একা। ঘরে আপনে থাকবা'।

'তা শো। দুয়ার খোলাই থাকবি'।

মাধাই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

আঁচল বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ার আগে সুরতুন ভাবলো—আমি আর ভেবে কী করি। না-খেয়ে যখন মরতে বসেছিলাম তখন ভেবে কী করেছি।

কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুরতুনের ইচ্ছা হলো, সে উঠে গিয়ে দেখে মাধাই ঘুমিয়ে পড়লো কিনা। এতক্ষণে সহসা একটা অনুভব হলো তার : কী যেন একটা হয়েছে মাধাইয়ের, অসুখ করেনি তো?

একটা তুলনা দিয়ে মাধাইয়ের এই ব্যাপারটার কাছাকাছি যাওয়া যায়। বোধ হয় এই রকম মানসিক অবস্থাতেই পুরুষরা স্ত্রীকে খুঁজে বার করে নিছক কথা বলার জন্যে। কথা বলা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

শুধু পাল্কি করে আসার ব্যাপার নয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন সান্যালগিন্নি, সুমিতি যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো তখনো সে অনেকদিনের পরিচিতের মতো রূপনারায়ণের একখানা হাত নিজের হাতে ধরে রেখেছে, হাসছে। একটু বিব্রত হলেও সে-হাসিটা সুন্দর। প্রার্থীর মতো লজ্জার হাসি নয় যে কুণ্ঠিত হতে হবে।

সুমিতি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে অনসূয়া বললেন—'ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না'।

'আমিও পারছিলাম না। তবু আমার পড়ার টেবিলে আপনার একখানা ফটো আছে, আপনি আমাকে কোনোদিন দেখেননি'।

'কিন্তু চেনা চেনা লাগছেও বটে'।

'তা লাগবে। আমি আপনাদের ছোটোবউ সুকৃতির বোন'।

'সুকৃতি! সুকৃতির বোন'? সান্যালগিন্নি অনসূয়া হাত বাড়িয়ে ব্যানিস্টার চেপে ধরলেন।

এক মুহূর্ত পরে সুমিতির কাঁধে হাত রেখে বললেন—'এসো, ঘরে এসো। তোমাদের বংশ খুব উদার। তোমাদের পক্ষেই এমন করে আসা সম্ভব'। সান্যালগিন্নি দৃশ্যতই বিচলিত হয়েছেন।

সুমিতিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনসূয়া বললেন—'খবর না-দিয়ে এসে আমাকে খুশি করেছো কিন্তু নিজে কত কষ্ট পেলে'।

'না, কষ্ট হয়নি। একজন দারোগা আমাকে পাল্কি ঠিক করে দিয়েছিলো'।

'ওঁকে বললো খবর নিতে। লোকটি তাহলে ভদ্র'।

ঘরে এসে অনসূয়া সুমিতিকে প্রশ্নের মাধুর্যে ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু কুশল প্রশ্নের মধ্যেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'তুমি এখন বিশ্রাম করো। ট্রেনের ক্লান্তিটা আগে যাক, আলাপ করবো'।

অনসূয়া হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু কান্না তাঁর বুকের ভিতরে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো। সুমিতিকে নিজের শোবারঘরে বসিয়ে এসে নিজে কোথায় যাবেন খুঁজতে লাগলেন।

পনেরো-ষোলো বছর আগেকার ঘটনা।

দেবরকে বিবাহ দিলেন অনসূয়া, কলকাতার ব্যারিস্টার পাড়ায় আত্মীয়তা করলেন। অনসূয়ার বহুদিনের ব্যবধানে থেকেও সেসব কালের ছোটো ছোটো ঘটনা, ভুলে-যাওয়া কথাবার্তা মনে পড়তে লাগলো।

সম্বন্ধগুলির মধ্যে অনসূয়া যখন এটাকেই বেছে নিলেন, মাথায় উপরে শাশুড়ি ছিলো না, সান্যাল কপট বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেছিলেন—ঐ সাহেবিপাড়ায়? আমাকে কি এখন তামাক ছেড়ে চুরুট ধরতে হবে?

সান্যালগিন্নি অনসূয়া সুকণ্ঠে ঝংকার দিয়ে বলেছিলেন—আলো আসুক, একটা জানলা কাটো। প্রাগৈতিহাসিক মিনারে বাইরের আলো প্রবেশ করুক একটু।

শুধু বিলেত-ফেরত-পিতামাতার সন্তান বলেই নয়, সুকৃতি নানা দিক দিয়েই প্রশংসনীয়া ছিলো। গায়ের রঙটা বোধ হয় এই সুমিতি মেয়েটির চাইতে আর-একটু প্রকাশিত ছিলো। তার ভ্রূ দুটির কোনোটিতে যেন একটা কাটা দাগ ছিলো, ছোটোবেলার দুরন্তপনার চিহ্ন। আর সে বোধ হয় কথা বলার সময়ে ঠোঁট দুটিকে কেমন একটু উল্টে দিতো। অনভ্যস্ত চোখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিলো না, মেয়েটি কোনো ব্যাপারকেই খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

সমগ্র দেশের ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যহীন গড় শ্রীখণ্ডের গড়-অধিবাসীদের জীবনে একবারইমাত্র রাজনীতি প্রবেশ করলো। খবরের-কাগজে-পড়া রাজনীতির কাছাকাছি গিয়ে পৌছলো গ্রামটা। অনসূয়ার প্রার্থনার চাইতেও বেশি আলোক ফুটে উঠলো। কিন্তু সেটা বিদ্যুৎ-জ্বালা। মিনারের

খিলানে খিলানে আলোর উদ্ভাস এলো। মিনারটিও শতধা দীর্ণ হয়ে গেলো।

সান্যালমশাই কাছারিতে এসে বসেছেন। সম্মুখে প্রজাদের একটি ছোটোখাটো জনতা। তারা এসেছিলো পাটের দাদনের টাকা নিতে। লিভোয়াল-কুঠির সাহেবরা যে-দাদন প্রতি বৎসর দেয় এবার তারা তা নেবে না, অথচ না-খেয়ে মরতে হবে কোনো দাদন না-পেলে। সান্যালের পক্ষে ব্যাপারটা ছিলো অন্যরকম। পাটের সাহেবের দালালরা এবং তাদের টাকার জোয়ার-ভাঁটা যথাক্রমে সান্যালের প্রতিপত্তির ভাগ নিচ্ছিলো এবং খাজনার একমুখী সহজ স্রোতের বাধা হয়েছিলো।

এমন সময়ে পুলিস এলো। ঘোড়া ও সাইকেল চেপে বড়ো-ছোটো পুলিস অফিসারের একটি বাহিনী। অভূতপূর্ব দৃশ্য। কাহিনীতে শোনা, খবরের কাগজে পড়া একটা ব্যাপার তাঁর নিজের বাড়িতে ঘটছে।

লিভোয়াল কুঠির সাহেবের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের সদ্ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক, তবু পুলিসের নির্বোধ অভিযানে সান্যাল হাসতে পারলেন না, অপমানিত বোধ করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সারা বাড়িটা থমথম করছে।

কিন্তু যা ঘটে গেলো তার আশঙ্কা পুলিসরাও করেনি।

ছোটোবউয়ের বাক্স থেকে বেরুলো একখানা দুখানা নয়, পাঁচ-ছখানা চিঠি, যে-চিঠির হস্তাক্ষর পুলিসের নাকি পরিচিত। এতদিনে বোধ হয় সত্যিকারের নামটা ধরা পড়লো লোকটির।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে পুলিসের বড়োকর্তা সদরে এসে বসলেন। গম্ভীর মুখ করে বললেন—আপনাদের ছোটোবউরানীকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার।

সান্যাল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো হয়ে গেলেন।

—এই চিঠিগুলো পাওয়া গেছে ছোটো বউরানীর বাক্সে। এগুলোর লেখক আপনার ভাই নয়। ছোটোবউরানীর কোনো আত্মীয়ও নয় বোধ হয়।

চিঠিগুলো সত্যি কোথায় ছিলো, চিঠিতে কী লেখা আছে, আর জানার প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা তাতে আছে কিনা, যতটুকু আছে তাতে ছোটোবউরানী রাষ্ট্রদ্রোহীদের একজন বলে প্রমাণিত হয় কিনা এসব জানারও প্রয়োজন নেই। ছোটোবউরানীর বাক্স থেকে অপরিচিত একজন পুরুষের চিঠি বেরিয়েছে এ-ই যথেষ্ট। চারিদিকে আমলা-কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেউ কি খোঁজ করবে চিঠিতে কী লেখা আছে—অপরিচিত পুরুষের চিঠি এই কথাটা শোনার পর? সান্যালমশাই হাতের ইশারায় পুলিসের কর্তাকে নিরস্ত করলেন। তাঁর চোখের কানায় কানায় অশ্রুও দেখা গেলো।

কিন্তু সব উল্টেপাল্টে গেলো। কথাটা অন্দরেও রটেছিলো ইতিমধ্যে। নাকি ভাগ্যের দান হিসাবে এই আবিষ্কার করে রটিয়ে দেওয়াই ছিলো পুলিসের উদ্দেশ্য? পুলিস প্রশ্ন করবে এ বোধ হয় সুকৃতির ভয় হয়েছিলো। বোধ হয় তার মনেও কথাটা বার বার গুটিয়ে গুটিয়ে উঠছিলো—পরপুরুষের চিঠি।

খিড়কির পুকুরটার চারিদিকে এখন গভীর জঙ্গল। তারপর থেকেই ওটা অযত্নে পড়েছে। খিড়কির দরজায় যে-পুলিসটি পাহারায় ছিলো সে ছুটে এসে খবর দিলো।

—কী হয়েছে?

পুলিসের কর্তারা এবং সান্যাল নিজেও উঠে দাঁড়ালেন।

কে একজন জলে লাফিয়ে পড়লো। উঠলো না।

ঠিক দেখেছিলো সে। দামী শাড়ি ও অলঙ্কারের একটা ঝিলিক লেগেছিলো তার চোখে। সম্ভ্রমে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো সে। তারপরে ঠাহর করেছিলো বিষয়টি।

তারপরের দৃশ্যগুলি ভাবতে পারেন না সান্যালগিন্নি। অনুকম্পা ও বেদনার সঙ্গে ঘৃণাও মিশে যায় চিন্তায়। মন থেকে ভাবটাকে দূর করার জন্যই তিনি চেষ্টা করেন। মৃত্যুতে মৃত্যুতে বাড়িটা সেদিন ছেয়ে যেতে পারতো। রিভলবারসুদ্ধ সান্যালের হাত দুখানা তিনি প্রাণপণ বলে চেপে ধরেছিলেন। পুলিসদের সঙ্গে আর দেখা করতে দেননি।

রাজনীতি নয়, মিথ্যা একটা কলঙ্ক। তারই জন্য একটা প্রাণের অবসান হলো। সান্যাল লড়েছিলেন। কোর্টে নয়। তখনকার দিনে যতদূর হওয়া সম্ভব ছিলো, মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর অভিযোগে পুলিসের বড়োকর্তা তিরস্কৃত হয়েছিলেন তাঁর ওপরওয়ালাদের কাছে। কিন্তু শাস্তির কথা দূরে থাকুক, সান্যালের ক্রোধের উপশমও হয়নি তাতে। সেই ক্রোধ হয়তো-বা তাঁকে রাজনীতিগত প্রতিহিংসার পথে টেনে আনতো, ব্যাক্তিগত ক্রোধ জাতিগত বৈরে মিশে যেতে পারতো, কিন্তু সান্যালের ডান হাতখানাই ভেঙে দিলো তাঁর ছোটোভাই। সান্যালবংশের ছেলে কিনা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হলো।

কিছুক্ষণ সান্যালগিন্নি অস্থিরচিত্তে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগলেন। এটা গোছান, ওটা ঝাড়েন নিজের হাতে। অবশেষে সান্যালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে রূপু এসে খবর দিয়ে গেছে। খবরটা সারা বাড়িতে রাষ্ট্র করার ভার নিজের মাথায় নিয়ে রূপু ততক্ষণ এ-দরজায় ও-দরজায় খবর বিলোচ্ছে।

সান্যাল বললেন—'এসো'।

অনসূয়া বললেন—'ও সুমিতি, আমাদের সুকৃতির বোন'।

—'শুনলাম তাই'।

হোক একটা ছোটোমেয়ে, তবু মহামানী আত্মীয়। তাকে অভ্যর্থনা করা, তার আতিথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করা গুরুতর বিষয়। বেদনাটাও মনে পড়লো সান্যালমশাইয়েরও।

কিন্তু তিনি যা এইমাত্র বললেন তারপরে আর কী বলার থাকতে পারে? বিচলিত হয়ে সান্যালমশাই বললেন—'কাউকে একটু তামাক দিতে বলো'।

এদিকে অনসূয়া চলে যাওয়ার পরে বিপদ হলো সুমিতির। স্টেশনে নেমে কনকদারোগাকে যা সে বলে এসেছিলো সে-কথাটা মনে পড়লো। এখানে নেমে সে নিজের যে-পরিচয় দিয়েছে তার সঙ্গে কনকদারোগার কাছে দেওয়া আত্মপরিচয়ে পরস্পর বিরোধ না-থাকলেও পরিচয় দুটির পার্থক্য আছে। এ বাড়ির একটি স্ত্রী, আর এ বাড়ির একটি স্ত্রীর আত্মীয় হওয়া এক ব্যাপার নয়। আজকের দিনটা এক পরিচয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর কাল সকালে দ্বিতীয় পরিচয়টা সকলকে জানানো কী করে সম্ভব হবে? সুমিতির মনে হলো ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। এরপরে তার অন্য পরিচয়টি বলতে গেলে শ্রোতাদের চোখে যে বিস্ময় দেখা দেবে তার সঙ্গে অবিশ্বাসও থাকবে না কি? অবিশ্বাস যদি না-ও থাকে নানারকম সন্দেহ থাকবে তাদের গলায়।

কিন্তু একটা বাড়িতে ঢুকে কী করে বলা যায় আমি আপনাদের বউ। সঙ্গে এ বাড়ির ছেলেটি নেই তবু বলতে হবে আমি বেটা-বউ আপনাদের। প্রথম পরিচয়ে এই কথা বলা যেন উপন্যাসে পঠিত স্বামী-পরিত্যক্ত স্ত্রীদের আত্ম-অধিকারের দাবির মতো শোনাবে।

সুমিতির আবার মনে হলো এমন সমস্যাসঙ্কুল দেশে আসা ভালো হয়নি। সংসারে চলা রাজনীতির চাইতেও কঠিন এই মনে হলো তার। আসার উদ্যোগ করতে করতে নিজে সে এখানকার সকলকে কী করে গ্রহণ করবে এটাই ভেবেছিলো। তাকে এরা কীভাবে গ্রহণ করবে সে-কথাটা মনে হতেই স্বতঃসিদ্ধের মতো সে ধরে নিয়েছিলো একজন ভদ্রমহিলাকে একটি ভদ্র পরিবার যেভাবে গ্রহণ করে তাই হবে। কিন্তু ঠিক এখন তাকে চিন্তা করতে হলো—এরা তাকে কি গ্রহণ করবে?

দাসী এলো স্নানের ঘরে যাওয়ার তাগিদ দিতে।

স্নানের ঘর সুমিতিকে খানিকটা অন্যমনস্ক করে দিলো। রাজনীতির একটি পুরনো পাঠ মনে পড়ে গেলো তার। কলকাতা শহর নয় যে পাঁচতলায় জল উঠবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে। এই গ্রামের অধিবাসীদের যদি শয়নকক্ষের কাছাকাছি স্নানের ঘর দরকার হয় কী করে এরা তার ব্যবস্থা? উপায়টা জানা না-থাকলে সেই অত্যন্ত সহজ উপায়টাও চোখে পড়তে চায় না।

কালোপাথরের স্নানের ঘর। পাথরের চৌবাচ্চায় জল টলটল করছে। ঘরটা এমন ঠাণ্ডা, স্নানের ঘর না-বলে ঠাণ্ডীগারদ বলা যায়। দেওয়ালে সবুজ শ্যাওলা আছে বোধ হয় এই মনে করে সুমিতি চারদিকে

ফিরে দেখলো। কালো পাথরের উপর শাদা দেওয়াল উঠেছে ছাদ পর্যন্ত, দেয়ালগুলি শাদা পাথরের নয় কিন্তু পাথরের মতোই চিক্কণ। দাসদাসীর মাথায় এই জল উঠেছে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে।

সুমিতি গায়ে জল ঢালতে ঢালতে বললো নিজেকে : 'সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আর-একটা নিদর্শন'।

স্নান শেষ করে বেরিয়ে সুমিতি দেখলো শোবার ঘরের একপ্রান্ত ইতিমধ্যে বিলেতি হোটেলের এক টুকরো হয়ে উঠেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনসূয়া ঘরে ঢুকলেন।

'এসো। সেই সকালে বেরিয়েছো'।

'কিন্তু আমি তো থাকতে এসেছি'।

সান্যালগিন্নি চিরাচরিত ভাষায় বললেন, 'সে তো খুব আনন্দেরই হবে'। কিন্তু তিনি ভাবলেন: এ তো কখনো সম্ভব নয় সুমিতি তার সঙ্গে পরিহাস করবে, তবে এ কথাটা বলছে কেন? কী জানি আজকালকার মেয়ে, হয়তো-বা সম্বন্ধের সুবাদে পরিহাসই করছে।

'এসো। মুখে দাও কিছু'।

নতুন বউদের ব্রীড়ার কথা শুনেছে সুমিতি। হঠাৎ যেন তেমনি একটা জড়তা এলো তার। অনসূয়া অতিথিকে সহজ করার জন্য বললেন, 'তুমি বোসো, সুমিতি, খেতে খেতে গল্প করো, শুনি'।

সুমিতি টেবিলে বসে বললো, 'আমার এমন সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে, আমাকে এমন করে বসিয়ে খাওয়ালে নিন্দা হবে'।

'নিন্দা হয় না। পৃথিবীতে সবচাইতে আপন লোকগুলিকেই সামনে বসে খাওয়াতে হয়। সেও নাকি এক স্বার্থের ব্যাপার'।

'কিন্তু আমি তো আপনার বড়োছেলের স্ত্রী'।

'স্ত্রী? খোকার? খোকার বউ তুমি'?

চশমার আড়ালে অনসূয়ার চোখ দুটির কী কী পরিবর্তন হলো, তাঁর মুখের পেশীগুলো কী করে সংকুচিত হলো এসব দেখতে পেলো না সুমিতি। সে টেবিলের অপ্রয়োজনীয় কাঁটা-চামচগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো মুখ নিচু করে।

অনসূয়া বললেন, 'তোমার অসুবিধা হচ্ছে সুমিতি, আমি রূপুকে পাঠিয়ে দিই'।

তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

দাসী এলো।

সে বললে—'বামুনদিদি জানেন না আপনি চা কিংবা কফি খাবেন। তাই দুই-ই পাঠিয়ে দিয়েছেন'।

সুমিতি চেষ্টা করে দাসীকে একটা হাসি উপহার দিলো। দাসী চলে গেলে সুমিতি এক কাপ কফি ঢেলে নিলো। ঢেলে নেবার আগে সে চিন্তা করেছিলো : কিছুই যদি সে স্পর্শ না-করে সেটা লক্ষণীয় হয়ে উঠবে দাসদাসীদের চোখেও। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে ভেবেছিলো স্নায়ুগুলিকে সতেজ করা দরকার, সামনে যে-সময়টা তাতে একটু শক্ত হওয়ার প্রয়োজন হবে।

সুমিতি ভেবেছিলো, এরপরে বাড়ির ছেলেরা অন্তত দু'একজন আসবে, খবরটা রাষ্ট্র হবার পর মেয়েরাও আসবে।

সন্ধ্যার সময়ে দাসী এসে আলো দিয়ে গেলো। রূপনারায়ণ এলো একবার। হাতের বইগুলি সুমিতির সম্মুখে টেবিলে রেখে বললো—'মা পাঠিয়ে দিলেন আপনার জন্যে'।

দু-একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রূপনারায়ণ চলে গেলো। রাত্রি বাড়তে লাগলো। সুমিতি লক্ষ্য করলো দরজার বাইরে একজন দাসী ছোটোখাটো কী কাজ নিয়ে বসে আছে। দেখে বোঝা যায় কাজটা উদ্দেশ্য নয়, বসে থাকাই উদ্দেশ্য। সে যে সুমিতির আদেশেরই অপেক্ষা করছে তা বুঝতে বেগ পেতে

হয় না।

সুমিতি উঠে দাঁড়িয়ে শয্যার দিকে অগ্রসর হলো। আলোটাকে টেনে নিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে একখানা বই তুলে নিলো। সে যে বধূ হিসাবে সমাদৃত হলো না এতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

আশ্চর্য হওয়ার কী আছে, বইয়ের মলাটে চোখ রেখে ভাবলো সুমিতি, কপালে তার সিঁদুর পর্যন্ত নেই। সামন্ততান্ত্রিক কথাটা আবার তার মনে হলো। সে-পরিবেশে তার আকস্মিক প্রবেশটা একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার হয়েছে। বিবাহ বলতে বহু অর্থব্যয়ের বহু কোলাহলের শেষে ব্রীড়াবনতা একজনকে বরণ করার যে চিরাচরিত পদ্ধতির সঙ্গে এরা পরিচিত তার সঙ্গে আজকের বাহুল্যবিহীনতার বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রখরভাবে স্পষ্ট। আভিজাত্যের আত্মাভিমান না-থাকলে হয়তো-বা তার আশ্রয় পাওয়াই দুরূহ হতো, এরা অভিজাত বলেই নীরব উপেক্ষায় তাদের মতামতটা পরিস্ফুট করে দিয়েছে।

৭

ফুলটুসি শহরের মেয়ে আর সুরতুন গাঁয়ের।

যে গলিটায় টেপির জন্য চেকারবাবু বাসা করে দিয়েছে তারই অপর প্রান্তে ইসমাইল কসাইয়ের বাড়িতে ফুলটুসি থাকে। ইসমাইলের অনেক নাম ছিলো একসময়ে। এখন প্রধান হয়ে আছে ইসমাইল। তার কাছাকাছি খ্যাতিযুক্ত অন্য নাম বোঁচা।

এখন আর তার সেদিন নেই, বয়স হয়েছে। এখন সে বাজারে গিয়ে দোকান করে না। তার বাসার সামনের দিকের ঘরখানায় বসে দিনের বেলায় মাংস বিক্রি করে। সে-সময়ে তার দোকানের বিক্রিটায় ভিড় হয় না। গতরাত্রির রঙের দাগ মুখে আছে এমন সব শীর্ণদেহ জীর্ণরূপ মেয়েরাই বেশি আসে তার দোকানে। আর আসে দু-চারজন পুরুষমানুষ। এদের কী জীবিকা এ যেন পৃথিবীর কেউ জানে না। দিনের বেলায় এদের প্রায় সকলের পরনেই মলিন লুঙ্গি, পায়ে ছেঁড়া জুতো। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এদের দেখা যাবে গলিটার মোড়ে মোড়ে ঘুরে বেড়াতে, পরনে মলমলের পাঞ্জাবি, পায়জামা ; কারো কারো গলায় ফুলের মালা। রাত্রি গভীর হলে গলিটার বন্ধ দরজাগুলির বাইরে বাইরে এরা ঘুরে বেড়ায়। শেষরাত্রির কাছাকাছি এদের দেখতে পাওয়া যাবে কোনো একটি বারান্দায় মোমবাতির আলোয় গোল হয়ে বসে গুটি খেলছে।

সন্ধ্যার পর ইসমাইলের বাসার কাছে ভিড় জমে যায়। তখন রান্না করা মাংস বিক্রি হয় তার দোকানের সামনের দিকে। কিন্তু তার চাইতেও ভিড় বেশি হয় তার বাড়ির ভিতরে। দেশি দারু-তাড়ি তো পাওয়া যায়ই, প্রয়োজন হলে বিলেতি মদের ছোটোখাটো বেঁটে বোতলও দু'একটা সে ঘরের মেঝে খুঁড়ে বার করে দিতে পারে।

কিন্তু তার দোকানে মাঝেমাঝে পুলিস বড়ো জুলুম করে। গত বৎসর শ্রাবণ মাসে পুলিস এসে তাকে বললো—ইসমাইলমিঞা, এবার কিছুদিন ঘুরে আসতে হয়।

—জি?

—বড়ো বেশি গরম করে তুলেছো।

—জি।

—কাউকে বাকি দিতে আপত্তি করেছিলে নাকি? না, পাওনা টাকার জন্য গালমন্দ করেছো?

—জি, না। সেই নতুন কনেস্টবলবাবু বাসা ভুল করেছিলো। আমার বউকে মনে করেছিলো—

—বলো কী? তোমার নতুন বউ ফুলটুসি?

—জি। তবে নেশার মাথায় ওরকম গোলমাল হয়। আমি কিন্তুক ধরে নিয়ে গিয়ে যমুনার ঘরে দিয়ে

আসছি। সেই যমুনা গো, ঐ যে কলেজের মিয়ে সাজে বেড়ায়, নাকিসুরে গান করে।

—বেশ করেছো। এখন চলো। মাস চার-পাঁচ হবে।

—না-হলে হয় না?

—না বোধ হয়। কনেস্টবলবাবু কড়া রিপোর্ট করেছে। বি. এল. কেস। অনেক সাক্ষী।

বি. এল. কেস? ইসমাইল হাসলো।—তাও ভালো, পকেটকাটার দায় নয়।

ইসমাইল তার ব্যবসায়ের ট্যাক্স দিতে গেলো পুলিসের সঙ্গে গল্প করতে করতে, ফুলটুসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো।

এরপর চালের কারবারে নামতে হলো ফুলটুসিকে।

ইসমাইল চলে গেছে বলে দুঃখিত নয় সে, ইসমাইল ফিরে এসেছে বলেও সুখী নয়। ইসমাইল ফিরে এসে তার চালের কারবারের কথা জানতে পেরে বলেছিলো—এদিকে ভালো সরু চাল পাওয়া যায় না, মোকাম থেকে ভালো চাল আনবি। ফুলটুসি এখনো চালের ব্যবসা করে যাচ্ছে। চাল যত ভালো ইসমাইলের কৌশলে পচানি নাকি তত মালদার হয়ে ওঠে।

নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় নেই ফুলটুসির। আসন্ন বিপদ থেকে নিজেকে এবং সন্তান দুটিকে রক্ষা করার কৌশল খুঁজতেই তার দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তার মধ্যেও যেটুকু তার মনে পড়ে সেটা নিছক বর্তমান। অতীতের দিনগুলি খুব অস্পষ্ট নয়, কিন্তু বর্তমানের দিনগুলি এত গভীর রঙে রাঙানো যে তার পাশে নিকট অতীতকেও সুপ্রাচীন স্বপ্নের মতো মনে হয়। সে আশৈশব ইসমাইলের পরিচিত। তার যখন তিন-চার বছর বয়েস তখন ইসমাইল তাকে কবে যেন একটা রঙিন 'ফরক' এনে দিয়েছিলো। তারপর কিছুকাল ইসমাইল মাঝে মাঝেই জেলে গিয়ে দীর্ঘসময় কাটিয়ে আসতো। ইসমাইলের ছেলে ইয়াজ তার সমবয়সী প্রায়। তারা দুজনে পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। ইসমাইলের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তখনো তাদের কাছে মূল্যবান কিছু ছিলো না। এ সময়ে ইসমাইলের বাড়িতে একটি প্রৌঢ়া থাকতো। একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ তিনটি প্রাণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ কিছু থাকা না-থাকা যতটা মূল্যবান, ইসমাইলের সংসারে আবদ্ধ সেই প্রৌঢ়া, ইয়াজ ও ফুলটুসির সম্বন্ধও ততটা। এখন সেসব সম্বন্ধ ফুলটুসির কাছে শৈশবের বোকামি বলে মনে হয়।

ইসমাইলের কাছে ফুলটুসি কৃতজ্ঞ। আবাল্য সে এ-বাড়িতে বাস করতে পেয়েছে। অন্নের অভাব হয়নি। তারপর এখন থেকে পাঁচ-সাত বৎসর আগে সে ইসমাইলের স্ত্রী হলো। দুটি সন্তান, হাঁড়িকুঁড়ি, উনুন, ইসমাইলের শয্যা—দিবারাত্রি। প্রতিবেশী নেই, সঙ্গী নেই। শুধু ইয়াজ ধূমকেতুর মতো এসে উদিত হয় কখনো কখনো। কী আক্রোশ তার কে জানে! পাঁচ-সাত বৎসর ধরে এ আক্রোশ সে পুষে রেখেছে। অতীতের একটি দিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে ফুলটুসির। তার প্রথম সন্তান তখন হামা টানতে শিখেছে। সে রান্নাঘরের মেঝেতে জল ঢেলে কাদা করে সারা গায়ে কাদা মেখে হামা টেনে বেড়াচ্ছে। ইয়াজের ভাত গুছিয়ে দিতে দিতে সেদিকে নজর পড়লো ফুলটুসির। কাকে আর বলার আছে মায়ের এই প্রথম গর্বের কথা, প্রথম সন্তানের এই অপূর্ব বীরত্বের কথা! প্রৌঢ় ইসমাইলের কাছে এমন কথা তুলতে সাহস হয় না। প্রতিবেশী কেউ নেই যে তাকে বলা যাবে। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মায়ের পক্ষে সন্তান তথাপি গর্বের বিষয় তো বটে। ফুলটুসি বলেছিলো ইয়াজকে—কেন্, ভাই, ছাওয়াল আমার ইস্টিশনের বড়োমাস্টার হবি?

ইয়াজ গোঁজ হয়ে বসেছিলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে থু-থু করে ফুলটুসির মুখের উপরে থুথু ফেলে বাড়া ভাত না-খেয়ে বেরিয়ে গেলো।

রাগে অভিমানে ফুলটুসি খানিকটা কাঁদলো। একবার সে ভাবলো ইসমাইলকে বলেও দেবে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে খটকা লাগলো তার। ইয়াজ যে তাকে ঘৃণা করে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সহসা তার মনে হলো ঘৃণাই যুক্তিসংগত।

কিন্তু ইয়াজের যুক্তিসংগত ঘৃণার চাইতে বড়ো ভয় ইসমাইলের ছুরিকে, যে-ছুরি অনায়াসে পাঁঠা-বক্‌রি-দুম্বার গলায় বসছে দিনে বহুবার। ইসমাইল যদি তার প্রতি কোনো অন্যায় করেই থাকে তার প্রতিকার কোথায় পাওয়া যাবে? তার অন্নে সে বেড়ে উঠেছে, তার অন্ন এখনো তার জীবিকা। সে যদি রাত্রির অন্ধকারে তাকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে নদীর জলে ফেলে দিয়েও আসে কেউ খোঁজ নিতে আসবে না। আপন-পর সবকিছুই ইসমাইল। সে যদি বলে একদিন ফুলটুসিকে হাট থেকে কিনে এনেছিলো আর-একদিন হাটে বিক্রি করে আসবে, কিংবা একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলো তেমনি একদিন পথে ফেলে দিয়ে আসবে, ফুলটুসির কিছু বলার থাকবে না। ইসমাইলের বাড়ির মধ্যে খোঁয়াড়ে প্রতিপালিত অনেক ভেড়া-বক্‌রি থাকে। তাদের মধ্যে একটা ছাগী মৃত্যুর অনেক তিথি পার হয়েছিলো। এটা ফুলটুসি লক্ষ্য করেছে ইসমাইলের গায়ের গন্ধ পেলে খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রাণীগুলি ছটফট করে। ছাগীটা কিন্তু ইসমাইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতো আহার্যের লোভে। তার সন্তান-সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিলো। একদিন কী মনে করে ইসমাইল সেটাকে দু-হাতে চেপে ধরে তার গলাটা কেটে দিলো। ফুলটুসির প্রাণীহনন অভ্যস্ত প্রাণও আহা-আহা করে উঠেছিলো। ফুলটুসির মনে হয় ছাগীটাও ইসমাইলের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলো। নাকি ওভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হলে চোখের দৃষ্টিটা ওরকম হয়ে যায়?

সুরতুন ভীরু, ফুলটুসিও। শহরে থেকেও ফুলটুসি সাহসী হয়নি। এদের মধ্যে পার্থক্য এই : সুরতুন ভয় থেকে পালানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে, ফুলটুসি কোনো কোনো ভয়ের কারণকে মেনে নিয়েছে।

সন্তান দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফুলটুসি স্টেশনে এসে দেখলো টেপির মা শেষের দিকে একটি কামরার কাছে যাত্রীদের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ভিক্ষা করছে। এটা তার একটা কৌশল। গাড়ির দরজার কাছাকাছি ঘোরাই উদ্দেশ্য। তারপর গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে কোনো একটিতে উঠে পড়া। ফুলটুসি সেই কামরার কাছে গিয়ে দেখলো ভিড়ের মধ্যে ফতেমাও আছে। ফুলটুসি ছেলেদের নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। ছেলে দুটি কথা বলছিলো, ফতেমা আঙুল তুলে ইশারা করতেই থেমে গেলো। যাত্রা শুরু হলো।

কিন্তু ভয়ই মৃত্যুর কারণ হলো ফুলটুসির।

গাড়ি ছাড়তে ছাড়তেই একটি বুড়ো যাত্রী বললো, 'তোমরা বোধ হয় চালের কারবার করো, না'?

এরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাহলে তাদের চেহারা দেখলেই কি লোকে আজকাল চিনতে পারে?

'তা বেশ করো। কিন্তু আজকের এ গাড়িতে চেপে ভালো করোনি। সাহেব চেকার আছে। তাছাড়া আজ সকাল থেকে প্রতি জেলার সীমায় গাড়ি থামিয়ে পুলিসরাও গাড়িতে তোমাদের মতো কেউ আছে কিনা খুঁজে দেখছে'।

টেপির মা বললো, 'আমরা ভিক্ষে করে খাই বাবা, আমাদের পুলিস কী করবি, বাবা'।

ফতেমা বললো, 'আমাদের যা চাল তা-ও ভিক্ষে করা'।

ফুলটুসি সুরতুনকে ফিসফিস করে বললো, 'পুলিস কি সত্যি আসবি'?

'তাই হবি, হয়তো'।

কী হবে কে জানে। ফুলটুসি হাত বাড়িয়ে ছেলে দুটিকে কোলের কাছে টেনে নিলো। একটির বয়স সাত, অন্যটির পাঁচ। ধূলিমলিন রোগারোগা দুটি অযত্নলালিত শিশু, কিন্তু স্বভাবতাই ফুলটুসির দৃষ্টিতে তারা অনন্য। গতবার চালের মোকাম থেকে ফিরে সে একটা বড়ো রঙচঙে গামছা কিনে দু-টুকরো করে লুঙ্গির ঢঙে পরিয়ে দিয়েছে তাদের। ইসমাইল যে ইসমাইল সে-ও দেখে হাসি হাসি মুখেই বলেছিলো—বেশ হইছে, মোল্লাজিদের মতোই। ফুলটুসির মনে হলো এমন চকচকে লুঙ্গি পরিয়ে আনা ভালো হয়নি। এত লোকের মধ্যেও এদের উপরেই যেমন তার চোখ দুটি বারে বারে গিয়ে পড়ছে

চেকারদেরও তেমনি পড়বে। সুরতুন কতকটা বেপরোয়ার মতো এবার গাড়িতে উঠেছিলো। অবশ্য সঙ্গে ফতেমা এবং টেপির মা দু-পাশে আছে বলেই তার সাহস। তবু ফুলটুসির কথা শুনে তার গলা শুকিয়ে গেলো। সে ফতেমার হাত ছুঁয়ে বসে রইলো।

হঠাৎ দুটি স্টেশনের মধ্যে চিৎকার করতে করতে গাড়িটা থেমে গেলো। যাত্রীরা তখন ঘুমের নেশায় ঢুলছে। বুড়ো যাত্রীটি নিদ্রাহীন। সে বললো, 'এবার বোধ হয় চেক হবে'।

ফতেমারা সরে সরে বসলো। ফতেমা বললো, 'ভয় কী? সঙ্গে চাল নি। ট্যাকা কিন্তুক কেউ বার করবা না, বলবা ট্যাকা নাই'।

ফুলটুসি কিন্তু এদের কথায় যোগ দিলো না। এরা কিছু বলার আগেই পিছন দিকের দরজাটা খুলে বাইরের অন্ধকারে সে নেমে পড়লো। শুধু নেমে পড়া নয়, পাশের লাইনটা পার হয়ে, লাইনের ওপারের গাছগুলোর ছায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কিন্তু তেমনি একটা শব্দ করেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলো। ছুটন্ত গাড়ি ধরবার জন্য ফুলটুসি ছুটে এলো। হাতল হাতের নাগালের বাইরে, উপরের দিকের একটা পাদানি হাত দিয়ে ধরে উঠতে গেলো ফুলটুসি, পায়ের তলায় কোনো অবলম্বন পেলো না। একটা আতঙ্কময় শূন্যের মধ্যে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী একটা আঘাতের অনুভব পার হতে-না-হতে ফুলটুসির সব অনুভব মিলিয়ে গেলো।

খবরটা এরা তখন তখনই পেলো না। প্রথমে ভাবলো পেছন দিকের কোনো কামরায় উঠেছে সে। পর পর কয়েকটা স্টেশনে গাড়ি ধরলেও যখন সে এলো না তখন এরা স্থির করেছিলো সে উঠতে পারেনি গাড়িতে। ফিরবার পথে খবরটা এলো। সবাই পাথর হয়ে বসে রইলো। কান্নাকাটি করে ক্লান্ত হয়ে ছেলে দুটি ফতেমার পাশেই বসেছিলো। ফতেমা এতক্ষণ তাদের প্রবোধ দিয়েছে আর-একটু দূরে গেলেই পাওয়া যাবে মাকে। এবারও যখন স্টেশনটা থেকে গাড়ি ছেড়ে দিলো আর ফুলটুসির বড়োছেলে জয়নুল প্রশ্ন করলো তার মা এলো না কেন, ফতেমা উত্তর দিতে পারলো না। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে এদের দলটি দিঘার স্টেশনে নামলো। স্টেশনে নেমে সুরতুনের মনে হলো: অনেক বিপদের কথা তারা কল্পনা করেছে এই ব্যবসা সম্বন্ধে, এমন চূড়ান্ত বিপদের কথা মনে আসেনি কারো। প্রায় মাস চার-পাঁচ আগে টেপির মা যে-ঘটনাটা ঘটিয়েছিলো বিরামগঞ্জের স্টেশনে তারই সত্যিকারের রূপটা যে এত নির্মম তা সেদিন বোঝা যায়নি। স্টেশনের কর্তৃপক্ষ টেপির মায়ের চালের পুঁটুলিটা আটকে ফেলেছিলো। গাড়ি ছাড়তে বেশি দেরি নেই। টেপির মা আত্মহত্যাই যেন করবে এমনভাবে প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইনের উপর নেমে পড়লো দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দুখানা কামরার ফাঁক দিয়ে। রেলের কর্মচারীরা ভীত হয়ে তাকে তখনকার মতো চালের পুঁটুলি ফিরিয়ে দিয়েছিলো।

সুরতুন বললো ফতেমাকে—'ছাওয়াল দুড়ে'?

—'আর কোথায় যাবি, ওরে বাপ কনে থাকে তাও জানি নে'।

নিজের চালের পুঁটুলিটা সুরতুনের হাতে দিয়ে ফতেমা ছেলে দুটির হাত ধরলো।

৮

চিকন্দির শ্রীকৃষ্টদাস অধিকারীর বাড়িতেই গ্রামের সংকীর্তনের আখড়া।

গ্রামের এ দিকটায় একসময়ে কারো সখের বাগিচা ছিলো, কতগুলি বড়ো বড়ো গাছের সুবিন্যস্ত ভিড় দেখে বোঝা যায়। বাগিচার অবশ্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই। জায়গাটা প্রয়োজনের চাইতে বেশি ছায়া-সুশীতল।

বহুদিন পূর্বে, শোনা যায় সান্যালরাও নাকি তখন চিকন্দিতে আসেনি, বাগানটির একটা আম গাছের নিচে এক সর্বত্যাগী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আসন করে বসেছিলো। স্থানটি পছন্দ করার কারণ নাকি আম গাছটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে একটা মাধবীলতার ঝোপ ছিলো তখন। এই রকমই প্রবাদ।

রায়বাবুরা তখন গ্রামের একচ্ছত্র জমিদার। সেই রায়বাবুদের একটি ছোটো ছেলে বিপথে গিয়েছে এই অভিযোগে রায়কর্তা তাকে গ্রাম ছাড়বার হুকুম দিলেন। সন্ন্যাসী টললো না, 'রাধারানীর ইচ্ছা'—এই বলে সে রায়বাবুদের এক্তিয়ারের মধ্যেই স্থির হয়ে বসে রইলো। রায়কর্তার মৃত্যুর পরে রায়দের বিপথে যাওয়া ছেলেটিই নাকি বাগানখানি বৈষ্ণবদের দান করেছিলো। একটা আখড়া হয়েছিলো সেখানে।

কিন্তু আখড়ার কোনো চিহ্ন আর এখন চোখে পড়ে না। সেই সন্ন্যাসীর পর স-বৈষ্ণবী যেসব সংসারী গোঁসাই এসেছিলো তাদেরও চিহ্ন নেই। পরে একসময়ে আখড়ার জমিতে দাস উপাধিধারী একদল লোক এসে বাসা নেয়। কপালে গঙ্গামাটির বদলে পদ্মার মাটি দিয়েই একটা চিহ্ন আঁকতো তারা, আর গলায় পরতো কাঠের মালা। বাগানের এখানে যে যেটুকু পারলো দখল করে বাইরের একটু-আধটু জমি নিয়ে এটা-সেটা লাগিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করতে করতে কৃষকদের স্তরেই তারা নেমে এসেছিলো।

একটিমাত্র বিষয়ে এরা এদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, সেটা এদের বিবাহের ব্যাপার। বৈষ্ণবী আনে এরা কণ্ঠি বদল করে। একশোয় একজন বৈষ্ণবী হয়তো তরুণ বয়সী হয়, বাকি আর সব কটুভাষিণী, বিগতযৌবনা মুণ্ডিতশির। তারা যেন ধর্মপালনের জন্যই বেঁচে আছে।

এদের সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, এরা কখনো আত্মবিস্তার করতে পারেনি। লোকগুলি নিজেরা হ্রস্বজীবী, শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও বোধ হয় অন্যান্য পাড়ার চাইতে তুলনায় বেশি এদের মধ্যে। গ্রামে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা চালু আছে—আম গাছে মাধবীলতা দেখলে পরগাছাটা কেটে ফেলাই বিধেয়, পরগাছা যারা ভালোবাসে তারা ফল পাবে কোথায়? ডাক্তাররা যদি এ বিষয়ে কথা বলতো, তারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ছাড়াও যে-কারণ দেখাতো সেটা যৌনব্যাধি।

রায় এবং সান্যাল বংশে সব বিষয়ে শত মতভেদ থাকলেও এদের ধর্মমতটাকে কিছুটা অবহেলা, কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেননি বটে, নামকীর্তনের জন্য দোল-দুর্গোৎসবে হয়তো ডাকতেনও, কিন্তু সেটা এঁদের চোখে হীনজাতীয় চামার-ঢাকিদের ঢাক বাজানোর জন্য ডাকার মতো।

কিন্তু কোনো কোনো চামার যেমন জাতব্যবসা ছেড়ে জমিজমা নিয়ে চাষী হয়ে যায় তেমনি হয়েছিলো শ্রীকৃষ্টদাসের বাবা। তিন-চার বিঘা ধানীজমিও করেছিলো সে সানিকদিয়ারের মাঠে।

শ্রীকৃষ্টদাস পিতার ধানীজমিগুলো পেয়েছিলো, উপরন্তু তার দূরসম্পর্কের দুই পিসির দরুন দুখানা ভিটাও পেয়েছিলো। তা ভিটা দুখানা যোগ করলে এক বিঘারও ওপর হবে। লোকটি সম্পন্ন চাষী হয়ে উঠতে পারতো, হঠাৎ হলো ধর্মে মতি। হাতে কিছু নগদ টাকাও পড়েছিলো তার ; তীর্থ করতে বেরুলো সে অল্পবয়সে।

নবদ্বীপমুখো মন হলে খেতখামার থাকার কথা নয়। শ্রীকৃষ্টদাস একদিন অধিকারী পদবী নিয়ে গ্রামে ফিরে এলো। তার সঙ্গে এলো এক বৈষ্ণবী, ঝাঁকড়-ঝাঁকড়া একমাথা চুল, লাল চোখ, গাঁজার কল্কে, আর খুসখুসে কাশি। বৈষ্ণবীর সম্বল ছিলো পেতলের একটি ঘটি, আর একটি কন্থাঝুলি। শ্রীকৃষ্ট তার কাছে দুটি পদ গানও শিখেছিলো।

বৈষ্ণব মতে বিরহটা মিলনের চাইতেও মূল্যবান। সেই মূল্যবানের আস্বাদও শ্রীকৃষ্ট পেলো। অত বড়ো চেহারা যে বৈষ্ণবীর, যে নাকি শ্রীকৃষ্টর পক্ষ হয়ে একপাড়া লোককে কায়দা করতে পারতো সে হঠাৎ বিদায় নিলো। একটিমাত্র রোগা বিবর্ণ সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো তার। প্রায় বিশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

বিরহ কিন্তু শ্রীকৃষ্টকে প্রেমিক করে তুলেছিলো, পর্যায়ক্রমে সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈষ্ণবী ঘরে এনেছিলো।

শোনা যায় তৃতীয় বৈষ্ণবী যখন দিঘা স্টেশনের দিকে রাত করে পায়ে হেঁটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ট এসে বলেছিলো—রাধারানী, তুমি নাকি যাবা?

শ্রীকৃষ্ট অনেকদিন থেকে জ্বরে ভুগছিলো, হলদে মুখচোখ, চুলগুলো তামাটে। যে-বৈষ্ণবী পালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে অবাক হয়ে গেলো কৃষ্টদাসের কথার ভঙ্গিতে। রাধাবানী তার নামও নয়।

শ্রীকৃষ্টদাস বললো—রোসো, গাড়ি আনি।

শ্রীকৃষ্ট নিজে গাড়ি চালিয়ে তৃতীয় বৈষ্ণবীকে স্টেশনে তুলে দিয়ে এসেছিলো।

এই ঘটনার প্রায় বছর দশেক পরে শ্রীকৃষ্টর ঘরে চতুর্থ একজন এলো। সে নিজেই এসেছিলো। প্রথমা বৈষ্ণবীর সংসার-আশ্রমের কীরকম এক দূর-সম্পর্কের বোন সে। তার মাহিষ্য চাষী পিতা অল্পবয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এগারোতে পা দিয়েই সে স্বামীকে খেয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলো। পিতা তখনও বেঁচে, সংসারে আদরযত্নের অভাব হয়নি, কিন্তু ভাগ্য মানুষকে টানে। পাড়ার একপ্রান্তে কপালিদের বাসা ছিলো, তাদের এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেলো সে। সমাজে বাধলেও সংসার পেতেছিলো তারা; কিন্তু সংসার দু-বছর চলেই থেমে গেলো, আঠারোতে দ্বিতীয় স্বামীকে খেলো সে। ততদিনে পিতার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিক দিয়েও সংসারে ফেবা তাব পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না। নবদ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে সে সংবাদ পেলো তার সেই দিদির, যে নাকি শ্রীকৃষ্টদাসের প্রথমা বৈষ্ণবী। কিন্তু বিশ বছরের পুরনো খবর। প্রায় তার জন্মের আগেকাব ঘটনা।

দিদির খোঁজে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চিকন্দি এসে সে দেখতে পেলো দিদি গত হয়েছে, আরো দুটি বৈষ্ণবী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছে, গিয়েছে।

খবর পেয়ে বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্টর মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটি বললো—কী করবো তাই বলো, জামাইবাবু।

—'থাকো যতদিন উপায় না হয়। পায়ের ঘা সারুক'।

কিছুদিন পরে একদিন শ্রীকৃষ্ট বলেছিলো—'ছোটো বউ, এখন কী করবো'?

—'বউ কয়েন না। আমাকে যে বউ কয় সে বাঁচে না। পদ্ম মুখ নিচু করে বলেছিলো। শ্রীকৃষ্ট প্রত্যাহত হলো'।

খুব যখন দুঃখকষ্ট চলছে গ্রামে শ্রীকৃষ্টর দিকে লক্ষ্য করার মতো অবস্থা তখন কাবো ছিলো না। তাদের শতছিদ্র নৌকার মতো সংসার কী করে অত বড়ো দুর্যোগের সময়টা কাটালো এ-খোঁজও কেউ নেয়নি। দুর্যোগ কাটলেও দেখা গেলো শ্রীকৃষ্টরা আছে।

কিছুদিন থেকে রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্টর বাড়িতে আসছে পড়ন্তবেলায়। শ্রীকৃষ্ট তার দাওয়ায় জীর্ণ মাদুর বিছিয়ে মলাটছেঁড়া ময়লা কাগজের মহাভারতখানি নিয়ে বসে থাকে। রামচন্দ্রকে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে বলে—'আসেন মোগুল'।

শ্রীকৃষ্টর চৈতন্যমঙ্গল ছেড়ে মহাভারত ধরার একটু ইতিহাস আছে। বার বার বৈষ্ণবীদের কাছে আঘাত পেয়ে সে বুঝতে পেরেছে 'জয় রাধারানী' বলার যোগ্যতা তার নেই। নিজের নাম শ্রীকৃষ্ট না-বলে একসময়ে কেষ্টদাস বলতে সে শুরু করেছিলো, আর 'রাধারানী'র বদলে 'গুরুগোঁসাই'। তখন একদিন তার মনে হয়েছিলো—বিরহ-প্রেমের টানাপোড়েন আর নয়, বুকে যত জোর থাকলে বিরহের ঝড়-ঝাপটাতেও নিশ্বাস টানা যায় ততটা কেন, তার তুলনায় কিছুই নেই তার। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ না-পড়লেও তো নয়, তারই ফলে আসে মহাভারত।

সারাদিনে তার একমাত্র কাজ সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক ধরে মহাভারত পড়া। আহারাদির ব্যবস্থা কী করে হয় এ খবরটাও সে নেয় না। অনাহারে মৃত্যুর খবরগুলি যখন প্রথম কানে আসতে লাগলো সে উদ্‌ভ্রান্তের

মতো ঘুরে বেড়ালো, তারপর তার নিজের ভাষায়, তার দৃষ্টি এদিক থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভগবান পাঠালেন ব্যাধি। বুকভরা ব্যাধি নিয়ে বিনা চিকিৎসায় ঘরের মেঝেতে সে পড়ে থাকতো, কোথায় দিন, কোথায় রাত। ব্যাধি সারলো, একসময়ে সে উঠেও বসলো, কাশি তাকে ছাড়েনি, হাঁপানির রূপ নিয়েছে। কিন্তু সে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে, এ ব্যাধি ভগবানের আশীর্বাদ। যে নৌকা চালানোর ক্ষমতা তার ছিলো না, সেই নৌকার যাত্রী হিসাবে সে যদি ভয় পেয়ে ছটফট করতো, তবে তার ছটফটানিতে নৌকা ডোবা অসম্ভব ছিলো না। 'চোখ বেঁধে বৈতরণী পার করালে গুরুগোঁসাই'।

মহাভারতখানায় টোকা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ফেলে শ্রীকৃষ্টদাস মনে মনে বলে : আর না বাবা, এই কাশিতেই কাশী পাবো। ও ঝঞ্ঝাট যখন আপসে আপ খসে পড়লো, ব্যস আর নয়।

সম্মুখে রামচন্দ্রকে পেলে শ্রীকৃষ্ট বলে—'বুঝলেন ভাই, আমি পলাইছি এবার, সহজে আর ধরা দিতেছি না'।

সবসময়ে রামচন্দ্র উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু প্রায়ই বলে—'কিছুই যেন্ ভালো না, গোঁসাই, আমি কী করি বুঝি না'।

শ্রীকৃষ্ট মুহূর্তকাল সান্ত্বনা বাক্যের জন্য মনে হাতড়ায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে—'দ্দোর্ণোপর্ব পড়ি আজ, কি কন মোগুল'?

শ্রীকৃষ্ট দ্রোণপর্ব খুলে বসে। রামচন্দ্র একখান রৌদ্রদগ্ধ মেঘের মতো বসে থাকে, বর্ষণের তেমনি নিষ্ফল আগ্রহে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে তার।

মহাভারত থেকে একসময়ে কীর্তনের দিকে মন গেলো রামচন্দ্রদের। আকাশবাতাসভরা অপমৃত্যুর ক্লিন্নতা, দুর্ভিক্ষের প্লাবন নেমে গেছে কিন্তু সে প্লাবনে উৎক্ষিপ্ত আবর্জনার পূতিগন্ধ এখনো আছে। যেন শব্দ দিয়ে, ধ্বনি দিয়ে সে-বাতাসকে খানিকটা নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো করা যাবে। ভক্ত কামার নিজে থেকেই খোল নিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর থেকে শুরু হলো এদের কীর্তন।

কীর্তন বলতে সচরাচর যা বুঝি তা নয়। কতগুল প্রৌঢ় বয়সের চাষী, মিস্ত্রী, কুমোর প্রভৃতির বেসুরো গলায় প্রাণপণ চিৎকার আর তার সঙ্গে বেসুরো মৃদঙ্গের শব্দ। দাঁড়িয়ে শুনলে হাসি পায়। এই পুরুষগুলির কারো পক্ষেই সংগীত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদের কীর্তনের ব্যাপার নিয়ে শুধু সান্যালমশাই ঠাট্টা করেননি, সংগীত সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে সে-ই করবে।

রামচন্দ্রের কথা ধরা যাক। পৃথিবীতে চাষ ও মাটি ছাড়া আর কিছু সে বোঝে বা জানে, তার প্রিয়জনরাও এতখানি গুণপনা তাকে কোনোদিন বর্ষণ করেনি। মাটির রঙ দেখে, হাতের চেটোয় মাটির ডেলা গুঁড়ো করে, জিহ্বায় স্বাদ নিয়ে জমির প্রকৃত মূল্য সে বলে দিতে পারে ; কিংবা জমির উত্তাপ হাতের তেলোয় অনুভব করে সে অক্লেশে ঘোষণা করতে পারে বিনা বর্ষণে ধানের জমি তৈরি করার দুঃসাহস করা যায় কিনা। কিন্তু অন্য অনেকের পক্ষে অসম্ভব এই কথাগুলি বলতে পারলেও ধান, জমি, চাষ, এর বাইরে কথা বলতে তাকে ক্বচিৎ শোনা গেছে।

বাল্যকাল থেকে এই মাটির সঙ্গে কতরকম সম্বন্ধই স্থাপন করেছে সে। সুখের দিনে মনে মনে পূজা করেছে, দুঃখের দিনে অব্যক্ত আবেগ নিয়ে বসে থেকেছে মাটির পাশে। জমিদারকে সে সম্মান করে, খাজনা দিতে আপত্তি করা দূরের কথা, বরং তাগাদা আসবার আগেই মিটিয়ে দিতে গিয়েও কত বিনয়, কত ভঙ্গি। বাহুল্য দেখে একবার তার স্ত্রী বলেছিলো—'পাওনাদাররা যেন্ কুটুম, কত আদর, কত ছেন্দা'। রামচন্দ্র বলে ফেললো, 'কও কী? কুটুমের উপরে কুটুম। যার কাছে বউ পালাম, আর জমি, দুজনেই ধর যে একই সমান'।

রামচন্দ্রের স্ত্রী একদিন অনুভব করেছিলো, এ কথাটা সে বাড়িয়ে বলেনি। দুপুরের খাড়া রোদে সব কৃষক যখন গাছতলায় কিংবা ঘরে তখনো রামচন্দ্র মাঠে। বলদজোড়া খেতের একপাশে দাঁড়িয়ে অতি পরিশ্রমে ধুঁকছে আর তাদের মালিক খেতের মাঝখানে মই দিয়ে সমতল করা জমির লক্ষণীয় নয় এমন
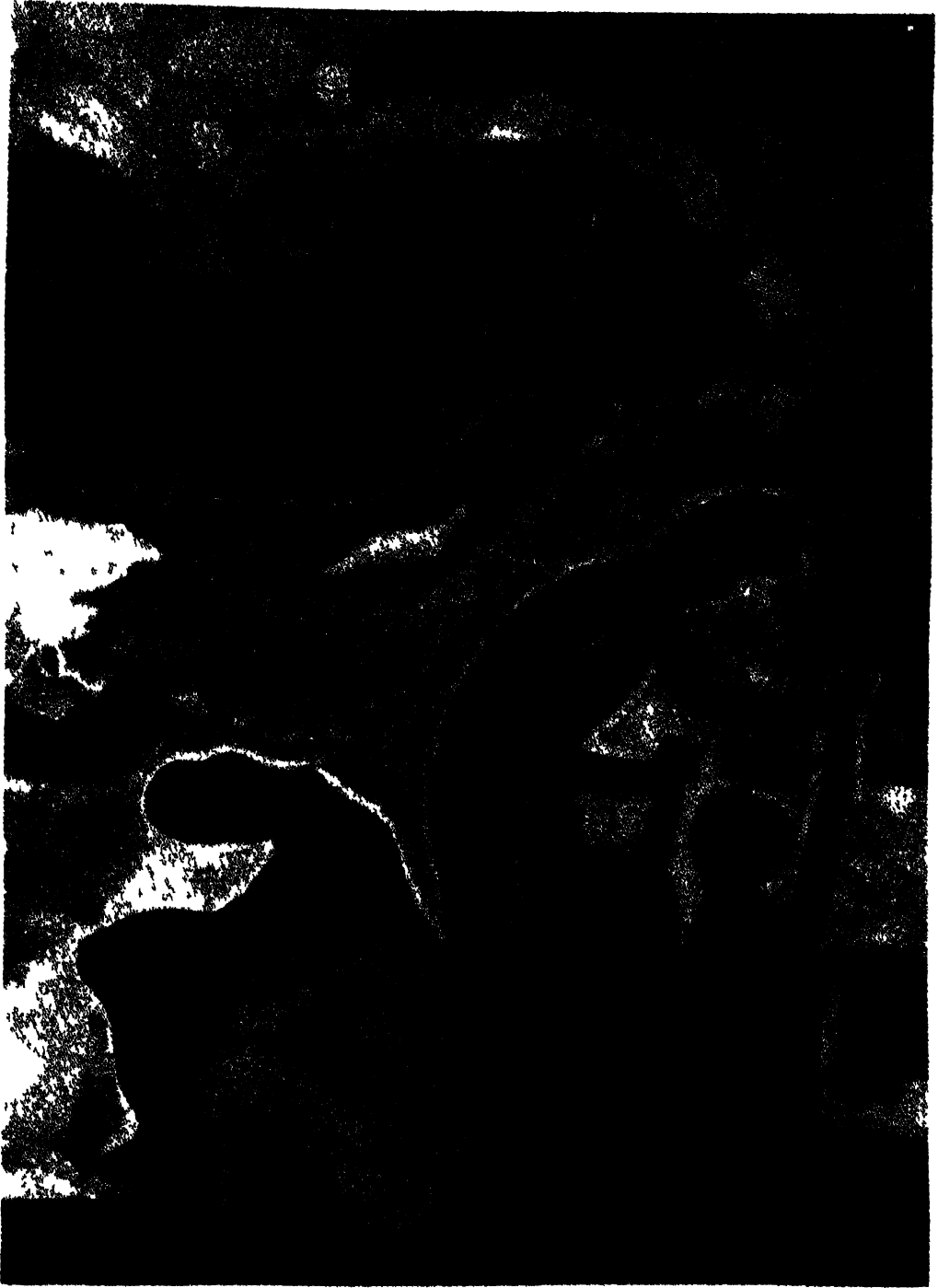
হোপ

খাঁজগুলি পাঁচন দিয়ে টেনে টেনে মিলিয়ে দিচ্ছে।

'পাগল হলা নাকি? মাথায় রক্ত উঠবি'।

রামচন্দ্র স্ত্রীর সাড়া পেয়ে গাছতলাটায় পৌঁছে খেতে বসে বলেছিলো—'একটুকু গায়ে হাত বুলায়ে দিলাম'।

'উয়েরই তো দিবা'।

স্ত্রীর মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে পুলকবিহ্বল গলায় ডাক ছেড়ে হেসে উঠে রামচন্দ্র বলেছিলো—'কও কী? কিস্তুক বাড়িতে মিয়ে জামাই যে'।

সেই রামচন্দ্র যখন কীর্তনিয়া হয়ে ওঠে, তখন চিন্তা না-করে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।

কিছুদিন আগে একজন প্রতিবেশী নির্লজ্জের মতো, কিংবা হয়তো অভ্যাসবশেই, চাষবাসের কথাটা তুলেছিলো, জোর দিয়ে নয়, মুদ্রাদোষের মতো মুখে এসে গিয়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই অন্য সকলের উদাস দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে মূঢ় মনে হয়েছিলো তার।

রামচন্দ্রই কি বলতে পারে চাষবাস করে কী হবে। অতি বিশ্বাসীর বিশ্বাস নড়ে গেলে যা হয়, তার চাইতেও তার বেশি হয়েছে। যেখানে ছিলো বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এখন এসেছে ভয়ের অন্ধকার। নিজের ঘরেব জীর্ণ দাওয়ায় বসে থাকা আর আকাশেব দিকে তাকানো ছাড়া কিছু করার নেই। তার চোখের সম্মুখে মাঠান জমি হলুদে আগাছায় ভরে আছে। ফাল্গুন গেছে, চৈত্র যায় যায়। সূর্যেব কাছে তেজ পাচ্ছে না মাটি, রোদে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। ভোর রাতের কুয়াশা-গলা-স্নিগ্ধতায় মাটি আর কোনোদিন উর্বরা হবে না।

'বলার কি মুখ আছে আমার'? এই ভাবে রামচন্দ্র। জমির জন্য, জমির লোভই তার মেয়েটির মৃত্যুর কারণ, এই তার বদ্ধমূল ধারণা।

দুর্ভিক্ষের প্রথম পদচারণে যখন জমির দাম নেমে যেতে লাগলো আর পাল্লার বিপরীত দিকের মতো চড়তে লাগলো ধানের দাম তখন চৈতন্য সাহার কাছে সে ধান বিক্রি করে জমি কেনার টাকা সংগ্রহ করেছিলো। তখন কাজটা অস্বাভাবিক বোধ হয়নি। এদিকের সুগন্ধি আমন ধান যায় শহরে, আর শহর থেকে আসে কৃষকদের খাবার মতো কম-দামী মোটা চাল। অনেক কৃষকই ধান বিক্রি করে দেয় সামান্য কিছু বীজধান রেখে। রামচন্দ্র বুদ্ধি করেছিলো খাবার ধান পরেও পাওয়া যাবে নগদ টাকা যদি থাকে, কিন্তু জমির দাম পড়েছে সেটা বাড়তে কতক্ষণ। তখন কেউ বুঝতে পারেনি ধানের দাম এমন সব মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সে-সময়ে যেটা সুযুক্তি ছিলো এখন সেটা চূড়ান্ত বুদ্ধিভ্রংশতা বলে বোধ হচ্ছে।

তার মেয়েটা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যেও নরম জাতের ছিলো। এতটুকু অনাদর তার সইলো না। অনাহারে নয়, কু-আহারে মুখ ফিরিয়ে সে চলে গেলো।

জমি! জমিকে কুলটা বলেছে অনেকে অনেক বেদনার সময়ে। রামচন্দ্রর অনুভবটি ঐ কথাটার সাহায্যে সোচ্চার হয় না, কিন্তু ব্যর্থ পাপ-প্রেমের অনুরূপ একটা অনুশোচনা ও আক্রোশ তার বুকে জমে ওঠে।

রোদ পড়ার আগেই রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্টদাসের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ট থেমে থেমে বটতলার ছাপা জীর্ণ মহাভারত পড়ে। রামচন্দ্র ভাবে রাজা হরিশচন্দ্র, রাজা শ্রীবৎস এদের কী হলো দেখো। রাজ্যে বিশ্বাস নেই, তার জমি!

কীর্তন করে রামচন্দ্র। প্রাণের উদ্বেলতা উৎক্রোশ কণ্ঠে ছড়িয়ে দিতে থাকে। কীর্তনের কথাগুলিতে এক চিরসুন্দরের স্নিগ্ধ রূপ আঁকার প্রয়াস আছে, কিন্তু উচ্চারণটা অভিযোগের মতো, ক্ষুব্ধ অভিমানে ফেটে পড়ে বিরাগ জানানোর মতো।

চৈত্র যায়-যায়।

এই এক দেশ, শাল-মহুয়ার নয়, ধানের এবং পাটের। ফাল্গুনে এখানে উদাসকরা লাল রঙ নেই,

এখানে গৈরিক অবান্তর। নিতান্ত মাটির দেশ। গাছ-গাছড়ার সবুজ রঙেও মাটির গাঢ়তা। বর্ষায় গাছপালাগুলি বাঁচবো-বাঁচবো বলে দেখ-দেখ করে বেড়ে ওঠে। তারপর আসে বর্ষণহীন অকরুণ দিন। ধু ধু নিষ্ফল মাঠের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে ফাট-ধরা কালচে মাটি, ইতস্তত দু-একটা বাবলাগাছ। গাছগুলোর পাতা নেই, আছে শুধু শুকনো কাঁটা। প্রাণ-শুকানো রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আরো দৃঢ় আরো কর্কশ হবার তপস্যা করছে কাঁটাগুলি। বাঁচবো, বাঁচবো—এই রুদ্ধশ্বাস আকুতি সেগুলির। উদাসীনতা নয়, অত্যন্ত গভীর মোহ।

চৈত্র যায় যায়, এমন সময়ে রামচন্দ্র কীর্তনে মন বসাতে পারছে না। তার জামাই মুঙলা গত বৎসর চাষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে যেন দেহাতিদের কোদাল দিয়ে জমি চষার মতো হাস্যকর একটা কিছু। কী করে পারবে বলো মুঙলা। বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলে অকরুণ পৃথিবীকে পুরুষ সোহাগে করুণাবতী করে তুলবে, এ সম্ভব নয়। তাকে সাহায্য করবে এমন চাষীও কাউকে চোখে পড়লো না।

কীর্তনের সুর বাড়তে বাড়তে, লয়ে দ্রুততর হতে হতে একটা নীরন্ধ্র শব্দদুর্গের সৃষ্টি করে, আর পরাজিত চাষীরা যেন তার আড়ালে মুখ লুকোনোর জন্য প্রাণপণ করতে তাকে।

কার ধান আছে, কে ছিটাবে ধান! ধান ছিটানোর চিত্রটিতে যে পুলকের আভাস আছে, সেটা যেন মনের এই ধূসরপটে মানায় না। বাঁ হাতে ধামাভরা বীজধান চেপে ধরে হাঁটার তালে তালে ডান হাতের মুঠি মুঠি ধান ধামার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষেতময় ধান ছিটানো!

কিন্তু এখানেই অশান্তির শেষ নয়। গ্রামের অশান্তির কিছু কিছু অংশও রামচন্দ্রের গায়ে এসে পড়ে।

সে গ্রামের চাষীদের মধ্যে খানিকটা বিশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যের কতখানি তার চরিত্রগত আর কতটুকু আকৃতিগত এটার বিচার করা কঠিন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও যাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাদের চালচলনে স্বভাবতই খানিকটা গাম্ভীর্য এসে যায়। এ গাম্ভীর্য রামচন্দ্রের ছিলো ; একটু অধিকন্তু ছিলো তার। বোধহয় তার দু পায়ের পেছনদিকের শিরা দুটি কোনো কারণে ছোটো হয়ে গিয়েছিলো, তার ফলে চলার সময়ে তার পায়ের গোড়ালি দুটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঠে উঠে যায়। হাট থেকে যখন সে তেলের দুর্মূল্যতার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছে, হঠাৎ অচেনা লোকের তখন মনে হতে পারে—যেন একজন মল্ল। আখড়ার ধুলো উড়িয়ে পাঁয়তারা কষার অভ্যাস সাধারণ পদক্ষেপেও সংক্রামিত হয়েছে।

এমন হতে পারে, লোকে তার পায়ের খুঁতটির দিকে লক্ষ্য করে করে তার মনে এ ধারণাটা এনে দিয়েছে, সে দর্শনীয় কিছু। এরই ফলে সম্ভবত তার কথাবার্তাও নাটকীয় হয়ে পড়েছে।

তার ঠোঁটজোড়া মস্ত গোঁফ নাকের নিচে সূক্ষ্মরেখায় দ্বি-বিভক্ত। গোঁফ চারিয়ে দেওয়া তার মুদ্রাদোষ। সময় নেই, অসময় নেই, পরম যত্নে সে গোঁফ চারিয়ে দেয়। যেহেতু গোঁফ চারা দেওয়ার সঙ্গে আমরা খানিকটা বলস্পর্ধা মিশিয়ে ফেলি, সেজন্য তাকে কখনো কখনো অপদস্থও হতে হয়েছে।

অনাহারে গ্রাম যখন উৎসন্নে যাচ্ছে, সদর থেকে সরকারি আমলারা এসেছিলো চালের পরিবর্ত হিসাবে মাথাপিছু পোয়াভর ছোলা বিলোতে। খবর পেয়ে রামচন্দ্রও গিয়েছিলো। কিন্তু তার অত বড়ো দেহের কাঠামোটা নিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াতে তার লজ্জা করছিলো। সে সব চাইতে পেছনে ছিলো। অবশেষে সে যখন আমলাদের মুখোমুখি হলো, তারা বলেছিলো—তোমার তো লাগাবে না বোধ হয়, কি বলো? রামচন্দ্র ছোলা না-নিয়ে গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে ফিরে এসেছিলো।

সে যাই হোক, রামচন্দ্রকে ওরা টেনে নিয়ে যায়। হরিশ শাঁখারির জন্য তদ্বির করতে তাকে যেতে হয় সান্যালমশাই-এর বাড়িতে। তার কীর্তনের আসরেও চাষবাসের কথা, জমিজমার কথা এসে পৌঁছয়।

হরিশচন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে যেদিন সে সান্যালমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলো সেই সন্ধ্যায় কীর্তনের মুখে ভক্ত কামার যখন তার খোল নিয়ে ঠুকবুক করছে, হরিশ শাঁখারি ধুয়ো ধরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এমন সময়ে আর-এক উপদ্রবের সূত্রপাত হলো।

রামচন্দ্ররা শুনতে পেলো আর একটি কীর্তনের দল যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এরকম হয়, ছোটোবেলায় এরকম সে দেখেছে : গ্রামের বিভিন্ন পাড়া থেকে, ছোটোখাটো গানের দল এসে গ্রামের মাঝখানে প্রায়ই রায়বাড়ির দোলমঞ্চের সম্মুখে, একত্র হতো। তারপর শুরু হতো অষ্টাহব্যাপী কীর্তনের উৎসব। বোঝো আর না-বোঝো, শোনো আর না-শোনো, খোলের বিরামহীন শব্দের সঙ্গে বহু কণ্ঠের কলশব্দ নেশায় আবিষ্ট করে দেবেই একসময়ে ; মাথা ঝিমঝিম করবে ; তারপর একসময়ে সেই দলে মিশে নাচতে শুরু করতো গ্রামবাসীরা।

রামচন্দ্র হেসে বললো—'বোধায় তোমার পাড়ার হবি, হরিশ। বোধায় সান্যালমশাই কিছু হিম্লে করেছে'।

শ্রীকৃষ্ট বললো—'আপনে যখন গিছলেন তখনই আমি মনে বল পাইছি'।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত গান!

গাইতে গাইতে যখন ছোটো দলটি কাছে এসে দাঁড়ালো তখন রামচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠলো। রামচন্দ্র চিনতে পারলো তার জামাই মুঙলা আর শ্রীকৃষ্টদাসের ছেলে ছিদামকে। গানটার একটি কলি গাইছে মুঙলা, ছিদাম তার ধুয়া ধরছে, পালটে নিচ্ছে মুখে থেকে সুর ছিদাম, আখর দিচ্ছে মুঙলা। ঢোলকের তালে তালে মুঙলা গাইলো—

চিতিসা চিত্তিরসাপ আমন খেতের বিষ
বিষের বায়ে সোনার দ্যাশে শুকায় ধানের শিষ।

ছিদাম আখর দিলো ঢোলকে চাঁটি দিয়ে—'হায় রে আমন ধানের শিষ'! মুঙলা তাল দিলো তার ঢোলকে, ছিদাম সুরে ধরলো—

চিতিসা খুললো মরি জাহাজী কারবার
বেলাতে চালান দিলো দ্যাশের ষণ্ড হাড়।

মুঙলা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে আখড় দিলো—'হায় হায় শিশুমানুষের হাড়'।

গানের দোলায় দোলায় শ্রীকৃষ্ট বলতে লাগলো—'ঠিক ঠিক'।

রামচন্দ্র বললে—'কও কী, অ্যাঁ, কও কী'?

মুঙলা ও ছিদাম তখন বলে চলেছে—'আকাশে ওড়ে হাউই জাহাজ, মহাজনী নৌকা লাগে ঘাটে। কোথা থেকে কী হয়ে গেলো, কোথায় গেলো ধান, কী হলো প্রাণীর! আর দেখো ঐ চিতিসাকে, কপালে তিলক এঁকে একটামাত্র দাঁত দিয়ে কী করে নরনারীর মৃতদেহগুলো খেলো, কী করে পৃথিবীর মাটি যা আগুনে পোড়ে না, বন্যাও ফিরিয়ে দেয়, তাই সে গ্রাস করলো'!

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ট স্তব্ধ হয়ে গেলো শুনতে শুনতে। ছিদাম বা মুঙলার এই প্রথম গান গাইবার প্রয়াস। সবসময়ে সুর লাগছে না। কিন্তু এই অদ্ভুত গান কোথায় শিখলো তারা? রামচন্দ্রের বুকের মধ্যে বাতাস পাওয়া আগুন হাঁ হাঁ করছে, শ্রীকৃষ্ট কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, বোকা-বোকা মুখ করে কেমন যেন ছটফট করছে।

চৈতন্য সাহা এ গ্রামের মহাজন। চিকন্দি ও সানিকদিয়ারের যুক্ত সীমান্তের কাছে তার দোকান। প্রতি বছর ধান ওঠার কিছুদিন পরেই হাজারমনী নৌকাগুলো এসে লাগে পদ্মার ঘাটে। নৌকার মাঝিরা চৈতন্য সাহার পুরনো খরিদ্দার। লোহার কড়াই থেকে আলকাতরার টিন, তেল থেকে আমসি এসবই তার দোকানে পাওয়া যায়, মাঝিরা কেনে। কিন্তু আকাশে অদৃষ্টপূর্ব হাওয়াই জাহাজের আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য সাহার কার্যকলাপ অভূতপূর্ব হয়ে উঠলো। অন্যান্য বার সে মাঝিদের হয়ে ধান কেনে, এবার সে নিজে থেকেই ধান কিনতে লাগলো। সানিকদিয়ার থেকে বুধেডাঙা থেকে চিকন্দি আড়াআড়ি পাড়ি দিতে লাগলো সে। পদ্মার ঘাটে নৌকার ভিড় বাড়তে লাগলো। মাঝিদের ও চৈতন্য সাহার একটা খেলা শুরু হলো। মাঝিরা বলে—'ছ'টাকায় উঠলো ধান'। চৈতন্য সাহা বলে, 'সাড়ে ছয়ে আমাকে দাও'। দশে

উঠলো দাম, দেড় টাকার ধান দশ ছাড়িয়ে বারো ধরলো, চৈতন্য সাহা তবু কিনছে।

একসময়ে ধান গেলো ফুরিয়ে, বীজধানও ধরে রাখলো না কোনো চাষী। হাতে নগদ টাকা নিয়ে চৈতন্য সাহার নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ করে হাসাহাসি করেছিলো তারা। কিন্তু শহর থেকে খাবার চাল আনতে গিয়ে তাদের হাসি শুকিয়ে গেলো। দু দিনেই যেন শহরের সব দোকানদার খবর পেয়ে গেছে, তাদের ঘরে খাবার নেই। দু'একজন দোকানদার তো মুখের সামনেই বলে দিলো—'বিক্রি করবো কি? কিনবো'।

এরপরই চাষীদের ছুটোছুটি শুরু হলো, হায়-হায়, চাল কোথায়। জমি ঘর যার যা সম্বল ছিলো দুর্ভিক্ষের মুখে গুঁজে দিতে লাগলো। আল ভেঙে গেলে চাষীরা যেমন দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ফাটলের মুখে নিজের বস্ত্রখণ্ড পুরে দিয়ে জল বাঁধবার চেষ্টা করে, তেমনি করে তারা চেষ্টা করলো। জমির দাম অকিঞ্চিৎ হয়ে গেলো। প্রথমে বড়োচাষীরা ছোটোচাষীদের জমি ধরার চেষ্টা করলো, তারপর তারাও প্লাবনে ভেসে গেলো। চৈতন্য সাহা এসে দাঁড়ালো ক্রেতা হয়ে ; এবার যেন সে সব কিনবে, পৃথিবী পায় তো তা-ও কিনবে। কোথায় ছিলো এত টাকা তার কে জানে! কিন্তু সে যেন পাগলও হয়েছে। এক বিঘা ধানের জমির দাম দশ টাকা বলে সে, শুনে প্রথম প্রথম চাষীরা না-হেসে পারেনি। দেড় টাকার ধান বারোতে কিনেছে, একশোর জমি দশে চায়। কিন্তু এদিক-ওদিক ঘুরে তার ঘরেই ফিরে এলো চাষীরা—'পনরো টাকা হয় না? এক বিঘা দো-ফলা জমি'?

'তা তুমি যখন বলছো, দশের উপরে আর আট আনা দিতে পারি'।

'তাই দাও, তাই দাও। ছাওয়াল মিয়ে খায় নাই'।

নিজের পাঁজরার একখানা হাড় খুলে রেখে দশ টাকা আর কতগুলি খুচরো নিয়ে চলে গেছে চাষীরা। বুড়ো সিন্ধুসিংহের মতো চাষীদের নাক বেয়ে চোখের জল নেমেছিলো ; অনাহারে কষ্টে কিংবা জমির শোকে তখন তারা তা বুঝতে পারেনি।

নগদ দামে, রেহানে, খাইখালাসি বন্দোবস্তে চৈতন্য সাহারা চাষীদের দশ আনা জমি গ্রাস করেছে। চৈতন্যর সঙ্গে সহযোগিতা করলো গ্রামের কয়েকজন জোতদার।

গান থামলে রামচন্দ্র বললো—'এ তোরা শিখলি কোথায়'?

'গুরুর নিষেধ, কবের পারবো না'।

'এ গান শুনলি লোকে কী কবি'?

ছিদাম কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু লোকে কী বলবে, তার মীমাংসা করে দিলো আর একজন লোক। এদের গানের সময়ে পথচলতি দু'চারজন লোক জড়ো হয়েছিলো, তাদের মধ্যে একজন বললো, 'কেন ভাই, গায়েন, আমাদের গাঁয়ে একদিন গান শুনাবা না'?

'কোন গাঁ তোমাদের'?

'চরণকাশির পর মাধবপুর'।

'তা যাবো একদিন'।

'যায়ো ভাই, যায়ো, আমার বাড়িতে যায়ো ; সেখানে জলসা হবি। আমার নাম যাদো ঘোষ'।

'তোমরাও কি চিতি সা-কে চেনো'?

'হয়। সে গোরুও কিনেছে আমাদের ঘোষেদের কাছে'।

'যাবো ভাই, যাবো'।

লোকটি চলে গেলে রামচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলো—'তোরা কি এখন গাঁয়ে গাঁয়ে এমন সব গান গায়ে বেড়াবি'?

'হয়। নীলের গাজন ইস্তক এই করবো আমরা। আপনেরাও ভগোমানের নাম করেন, আমরাও করি'।

'এ কি তোদের ভগোমানের নাম, চিতি সা কি তোদের ভগোমান'?

একটু থেমে কথাটা গুছিয়ে নিয়ে ছিদাম বললো, 'ও আমাদের সব খালো, আর আমরা বললিও দোষ'।

'কয়ে কী হয়? রাস্তার লোকেক মুখ ভ্যাংচায়ে কী হয়, নিজের মুখে ব্যথা'।

ছিদাম মাথা চুলকাতে লাগলো।

মুঙলা বললো—'এখনো গান বাঁধা শেষ হয় নাই, মিহির সান্যালের নামেও গান বাঁধা হবি'।

রামচন্দ্র বললো, 'সাবোধান। দ্যাশের মালিক, রাজা'।

'কীসের রাজা, আমরা তার জমি রাখি না'।

'কস কী! হাজার হলিও সান্যালবংশ, রাজবংশ। এর জমি না রাখো, তার রাখো। কোনো-না-কোনো সান্যালের জমি রাখো। তুমি কি মনে করছো মিহিববাবুর নামে গান বাঁধলি, নোসল্লা করলি সান্যালমশাই খুশি হলো। কি কও, শ্রীকৃষ্টভাই'?

'ঠিক কইছেন মণ্ডল,' বললো শ্রীকৃষ্ট, 'মিহিরবাবু কী ক্ষেতি করছে তোমাদের'?

'আমাদের গ্রাম ছাড়া করতিছে। সে সময়ে যারা আমাদের ঠকায়ে জমি নিছে সকলেই চিতি সাপ'।

'তোমাদের গাঁ ছাড়া করতিছে তোমাদের বাপরা জানলো না'?

'আমাদের না হউক, শাঁখারিদের'—বললো মুঙলা।

'শাঁখারি আর তোমরা এক হইছো'?

'এক হওয়া লাগবি। মরার সময়ে আগে তারা, পরে আমরা মরছি। মরে এক হইছি'—বললো ছিদাম।

রামচন্দ্র বললো—'আচ্ছা, এক যদি হওয়া লাগে, বাপরা এক হোক। তোমরা ছাওয়ালরা এসব করবা না'।

ছিদাম ও মুঙলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁইগুঁই করতে লাগলো। রামচন্দ্র মণ্ডল নিষেধ করলে ভাবতে হয়।

সে সন্ধ্যায় কীর্তন জমলো না। যারা এলো তারা এই গানের কথাই বলাবলি করলো। কেউ বললো, 'ঠিকই করেছে ছাওয়ালরা,' বেশির ভাগই বিষয়টির আকস্মিকতায় মুগ্ধ হলো। যারা গানের পদগুলি শোনেনি তারা পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে লাগলো।

অন্ধকার পথে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে গানের পদগুলি রামচন্দ্রর মনে পড়লো। ছেলেদের ছেলেমানুষির সম্মুখে হাসা উচিত নয়, হাসিকে দমন করার জন্য গোঁফ চারিয়ে দিয়েছিলো সে। কিন্তু হাসি নয় সবটুকু। আবার তার সেই অনুভব হলো। বুকের ভিতর চাপা আগুন হাঁ-হাঁ করে জ্বলে উঠলো। সেখানে আগুনলাগা বাড়ির মতো কী যেন একটা ভেঙে পড়বে। তার মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গেও কি গৌণভাবে চৈতন্য সাহাদের অদ্ভুত ব্যবসার যোগ নেই? গলার কাছে আটকে যাওয়া কান্নায় রামচন্দ্রর বুকপাট ফোঁপানোর মতো দুলে দুলে উঠলো।

এর আগেও চৈত্রসংক্রান্তির জন্য গ্রামে গান বাঁধা হতো। এই গ্রামে ছিলো নবীন, সে নিজের পরিচয় দিতো—'নবনে বুড়ো গাঁয়ের খুঁড়ো'। সে-ই বাঁধতো গান। দুর্ভিক্ষের প্রায় প্রথম গ্রাসে সে গিয়েছে। আর কেউ গান বাঁধেনি গত বছর। নবীন বুড়োর গানের বৈশিষ্ট্যও ছিলো, জমিতে স্ত্রীজাতির দোষগুণ, দুর্বলতা, সোহাগ-প্রিয়তা আরোপিত করার রীতি সে-ই প্রথম এই অঞ্চলে চালু করেছিলো।

কিন্তু এ কী গান! বাড়ির কাছাকাছি এসে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লো। কানের ভুল নয়। দাসপাড়ায় ছিদাম-মুঙলার গান শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে আখরগুলি কান্নার মতো শোনাচ্ছে। একটা রামশিঙাও জোগাড় হয়েছে। তার শব্দটা তীব্র হাহাকারের মতো ফেটে ফেটে পড়ছে। রামচন্দ্র ভাবলো, এমন গান বাঁধলো কে? কী করলো এরা, এ কীসের সূচনা করলো!

রবিশস্যের সময় এটা। ধানের সময় নয় যে প্রকৃতি নিজে থেকে ধান দেবার জন্য সাধাসাধি করবে। গত আমন-চাষ হয়নি এ অঞ্চলে। একেবারে কি হয়নি? যা হয়েছে তাকে চাষ বলে না। আর আউস?

কে বোনে আউস? পথ চলতে কোনো চাষীর যদি-বা ঘাসভরা আগাছা ঢাকা আউসের খেত চোখে পড়ে তবু তার দৃষ্টি চকচক করে না, মনে হয় না সে আউসের কথা ভাবছে। কানে আসছে চিকন্দির সীমায় সীমায় সান্যালদের খাসজমিতে, সানিকদিয়ারের খামারগুলিতে, চরণকাশির আলেফ সেখের জমিতে আউস চাষের জোগাড় হচ্ছে। রবিশস্যও উঠছে। এমন কথাও কানে আসে, সরষে এবার এ অঞ্চলে ভালো হয়েছে।

চিকন্দির গ্রামের ভিতরে আর বুধেডাঙার মাঠে দু'একটি নির্লজ্জ কৃষক মাঠে নেমেছে, কিন্তু সেসব চাষ নয়, খেলা—যেমন খেলতে পারে রামচন্দ্রর জামাই মুঙলা কিংবা শ্রীকৃষ্টদাসের ছেলে ছিদাম। আর রামচন্দ্রই একা একথা বলে না। চৈতন্য সাহাও বলে বেড়াচ্ছে। সে নাকি চাষীদের বাড়িতে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছে—'খেলা খেললে হয় না, কাজ করে খেতে হয়। গত সন টাকা দিছি কাজ করো নাই, খেতে নামে খেলা করলা ; যে খেতে দশ মন হবি, হলো চার। এবার টাকা পাবা না'।

এই বিস্ময়কর অথচ সত্য কথাগুলিই এই পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য। দু বছর আগে জমির মালিক ছিলো যে আজ সে মজুর সেই জমিতেই। সকলের মনে হয় কিনা কে জানে, রামচন্দ্রর মনে পড়ে যাত্রায় শোনা সেই হীরার কাহিনী। হীরাকে যখন চাষীর ঘর থেকে বাবু বের করে নিয়ে মোটরে চড়ালো, হীরার স্বামীকে নাকি সেই বাবু দয়া করে একটা চাকরি দিতে চেয়েছিলো, মোটরগাড়ির ধুলো ঝাড়ার কাজ। খাইখালাসিতে জমি আটকে চৈতন্য সাহাও নাকি তাই করছে। গত বছর খেতে না-পেয়ে কৃষকরা যখন তার কাছে ধারে ধান কিনতে গিয়েছিলো। তখন সে নতুন করে কাগজ লিখিয়ে নিয়েছে : ধান দিয়েছে চাকরান শর্তে ; এক বছর জমিতে খেটে দেবার শর্তের নিচে টিপসই দিয়ে ধান এনেছিলো চাষীরা। কিন্তু কেউ কি পারে হীরার স্বামীর মতো মোটরগাড়ি সাফ করতে? গত বছর চৈতন্য সাহার খেতগুলিতে যে চাষ পড়েছিলো তাকে সেই জন্যই চাষ বলা যায় না। অবশ্য চৈতন্য সাহার ধার ধারে না এমন চাষীও আছে। আছে গহরজান সান্দার, আছে আলেফ সেখ, আছে ঘোষপাড়ার বাপবেটা দুজন। কিন্তু দশ আনা জমিতে চৈতন্য সাহা বলে বেড়াচ্ছে—'গত বছর ঠকায়েছো। এবার আগাম টাকা পাবা না। দরকার হয় বাঙাল আনাবো, চাষ দিবো'।

ছিদাম-মুঙলার গান যেদিন প্রথম শোনা গিয়েছিলো তার কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্টদাসের আসরে ধানের কথা উঠে পড়লো কথায় কথায়। স্বর্ণবর্ণ সেই সব ধানের কথা যা সেকালে ছিলো বলে মনে হয়, সেই আমন ধানের শতেক নাম আওড়ানো।

সেদিন ছিদাম মুঙলা গান করতে পথে বার হয়নি। ছিদাম বললো—'কেন্, জেঠা, বোরো ধান কি সোনার মতন হয় না'?

রামচন্দ্র বললো—'হয়, সব ধানই সোনা'।

মুঙলা বললো—'ছিদামভাই, তোমার ধানের কথা কও নাই বাবাকে'?

কথাটা বলে ফেলেই মুঙলা লজ্জিত হয়েছিলো, নতুন বউ-এর কথা হঠাৎ গুরুজনের সামনে উচ্চারণ করে গ্রাম্য যুবারা যেমন হয়।

'ধান কস কি? হা-হা'।

হা-হা শব্দ দুটিতে রামচন্দ্র কী ইঙ্গিত করলো বোঝা গেলো না। চিকন্দি অঞ্চলে কেউ যদি কোনোকালে বোরো ধান লাগায় তবে সেটা সখ করে। দিঘা থেকে আসতে আসতে সড়কটা যেখানে পদ্মার পার ধরে চলতে শুরু করে সেই লকচরের সেখরা বোরো ধানের চাষ করে নিয়মিতভাবে। চিকন্দি অঞ্চলে জমি উঁচু, পদ্মার পলি প্রায়ই পড়ে না। এদিকে বোরোর আবাদ নেই।

ব্যাপারটা ছিদাম বললো। নতুন বিষয়ে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ নেওয়া ভালো। শ্রীকৃষ্টদাসের বাড়ির পিছন দিকে আখড়ার পুকুরটার এখন স্নান করার মতো জল নেই। সেটাকে এখন পুকুর না-বলে পচা গাড়ো বলে, পুকুর গাড়ায় অর্থাৎ খানায় পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্টর কাশির অসুখটা হবার আগে সে

পুকুরের ঢালু পাড়ে কচু, ওল প্রভৃতি লাগাতো। সেই পচা পুকুরের জলের ধারে ধারে, জলের মধ্যে নেমে গিয়েও চাষ দিয়েছে ছিদাম। প্রথম যখন সে চাষ দিতে শুরু করে তখন যে চেহারা ছিলো এখন তা নেই। লবচরের সেখদের কাছে চেয়ে-চিনতে বোরো ধানের কিছু বীজ সংগ্রহ করেছিলো সে। এখন পুকুরটা একটা নিচু জমির রূপ নিয়েছে।

মুঙলার চাষ-আবাদের চেষ্টাও এমনই হাস্যকর বৈকি। সে হয়তো ধানহীন দিনে ছিদামের মতো ধান-পাগলা হয়নি, কিন্তু সে তার শ্বশুরের পড়ে-থাকা খেতে মটর-মসুর লাগিয়েছে। সংসারও চালাচ্ছে। কিন্তু চাষ কি শুধু কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা? তাহলে তো রামচন্দ্রও চাষ করেছে। গত বৎসর সে-ও তো দু'একদিন মাঠে গিয়েছে, লাঙলের মুঠিটা কিছুকালের জন্য ধরে মুঙলাকে খেতে যাবার সুযোগ দিয়েছে।

রাবণের মৃত্যুর পর সদ্য-প্রসূত মহীরাবণও নাকি যুদ্ধে নেমেছিলো। রামচন্দ্র বোকা-বোকা মুখ করে বসে গোঁফ চোমরাতে লাগলো।

৯

অনসূয়া সান্যালমশাইয়ের পুঁথিঘরের দিকে যেতে যেতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতে সুকৃতি একবাব এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো, আর এতদিন পরে আর-একটির সৃষ্টি করেছে সুমিতি। অন্যের সমস্যা হলে আলোচনা করে বুদ্ধি বাৎলে দেওয়া যায়, কিন্তু যে কথাটা মনে করতে গিয়ে বুকটা মুচড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে কী করে তা আলোচনা করা যাবে।

তিনি মা, সহ্য করাই তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস কিন্তু ঐ লোকটির কেমন লাগবে? পুরাতনপন্থী লোক, হয়তো-বা খোকার বিয়েব ব্যাপারে কত উচ্চাশা পোষণ করেছেন, চাপা লোক তাই প্রকাশ করেন না। খোকা বিয়ে করলো, একটা সংবাদ দেওয়া পর্যন্ত দরকার বোধ কবলো না! তবু যা হোক, অশ্রু রোধ করে ভাবলেন সান্যালগিন্নি অনসূয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে করে এত বড়ো বংশটার মাথা হেঁট করে দেয়নি। কিন্তু এতে প্রবোধ হয় না, অভিমান অত সহজে ভুলবার নয়।

পুঁথিঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনসূয়া দেখতে পেলেন রূপু আলমারিতে বই খুঁজছে আর টেবিলের সামনে বসে সান্যালমশাই সদানন্দ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছেন।

সান্যালমশাই বললেন—'হরিশচন্দ্র ও লঙ দুজনেরই অভাব হলো, খানিকটা ছন্নছাড়া হয়ে গেলো আন্দোলনটা। তা হলেও এটা কিন্তু জাতীয়তার আন্দোলন ছিলো না। ইংরেজদের কাছে সুবিচার পাওয়ার চেষ্টাই ছিলো'।

সদানন্দ বললো—'তার চাইতেও বড়ো কথা এমন একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত উঠে বসার চেষ্টা চাষীদের মধ্যে সব সময়ে দেখা যায় না, যেমন হয়েছিলো নীল-আন্দোলনের সময়ে কিংবা তার চাইতে ছোটো সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহে'।

রূপু লাল খেরোয় বাঁধানো বড়ো একটা বই এনে টেবিলের উপরে রাখলো। পাতা উল্টোতে উল্টোতে সান্যালমশাই বললেন—'সে সময়ের খবরের কাগজের কতগুলি বাবার পুরনো কাগজপত্রের বাক্সে পেয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি। কতগুলি হাতে-লেখা কাগজও আছে। এই গ্রামে ও আশেপাশে যে-গান তৈরি হয়েছিলো, তার কিছু কিছু পাবে। পড়ে দেখো সদানন্দ'।

রূপু বললে—'বাবা, ওদের গান একদিন শুনলে হয় না'?

সান্যালমশাই বললেন—'ওদের গানে যদি তোমার বাবার নিন্দা থাকে'?

রূপু বললে—'থাকলেই হলো! আপনি কি কখনো কোনো অন্যায় কাজ করেছেন'?

সান্যালমশাই মৃদু-মৃদু হাসলেন। কিন্তু বললেন—'ওসব পথের গান, বাড়িতে ডেকে আনতে নেই'।

সদানন্দ বললো, 'এখন এসো, একটু ভূগোল পড়ে নিই'।

'হ্যাঁ, এবার পড়ো তোমরা'। সান্যালমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

অনসূয়া দরজার কাছ থেকে সরে প্যাসেজে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে পড়লো তাঁর বড়োছেলের লেখাপড়ার কথা। সবই যেন অতীত, কত সুদূরের অতীত। কিন্তু অতীত ভাবতে গিয়েই মায়ের মন ছটফট করে উঠলো—আহা, আহা, তা কেন, খোকা মারাত্মক একটা ভুলও যদি করে থাকে তা বলেই তার সবকিছু অতীত হবে কেন?

সান্যালমশাই তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—'ছেলের লেখাপড়ার খোঁজ করতে এসেছিলে? কিন্তু তোমাব বাডিতে তো আজ অতিথি আছে'।

অনসূয়া পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—'বড়োছেলের খবর অনেকদিন পাওয়া যায় না'।

'যে মহীরাবণ সেটা হয়েছে, ভূমিষ্ঠ হয়েই যুদ্ধ করতে চায়। খবর দেবার সময় কোথায় তার'।

'—তাহলেও নিজেব বাপ মাকে..'

'ওর ধর্ম-মায়ের কথা বুঝি শোনোনি'?

অনসূয়া নিজের বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য যে-সূত্রটা পেয়েছিলেন, সেটা হাতছাড়া হলো। অন্য আর-একটি সূত্র প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করলেন তিনি—'ধর্ম-মা? বিয়ে কবেছে, শাশুড়িদেব কাবো কথা বলছো? তোমাকে লিখেছে বুঝি'?

'না, খাঁটি ধর্ম-মা। তার চেহারার বর্ণনাও একদিন পড়লাম ওর চিঠিতে। বোধ হয় জেলের মেয়ে, জলে-জলেই দিন কাটে। দাঁতের বর্ণনা নেই, কিন্তু কপালের বর্ণনা আছে, আকাশছোঁয়া কপাল'।

অনসূয়ার সূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, তিনি বললেন—'বলো কী, সেই জেলের মেয়ে হলো আমার ছেলের মা? আর তার রূপ বর্ণনা করেছে ছেলে তোমার কাছে! চিঠিটা দিও তো'।

'তাছাড়া মেয়েটির রুচিও বোধ হয় ভালো নয়, ছেলেপুলে আছে, তবু নাকি সবজে রঙের শাড়ি পরে আঁচল উড়িয়ে বেড়ায়'।

'ধিক ধিক'!

সান্যালমশাই হেসে বললেন—'এতদিন পরে আমার রুচি তোমার অজানা নেই। বড়ো কপাল আমার কোনোদিনই পছন্দ নয়'।

অনসূয়া রাগ করে বললেন—'তোমার প্রশ্রয়েই ছেলে এমন বেড়ে উঠেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তুমি শাসন করো না। ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করো। তোমার এই সেকেলে পরিহাসও আমার ভালো লাগে না'।

'সেটা আমার দোষ নয়, অনসূয়া। বিলেতি কায়দায় ছেলে মানুষ করার ঝোঁক ছিলো তোমার। ছেলেদের স্কুল-কলেজে যেতে দিলে না। পাস দিলো না যে চাকরি পাবে। মধ্যের থেকে সদানন্দ বেচারার ভবিষ্যৎটা গেলো। কোনো কলেজে মাস্টারি করবে সে ক্ষমতাও ওর নেই। ভাবছি ওর মাসোহারাটা কিছু বাড়িয়ে দেবো। আর কিছু না-করুক ছেলেকে অন্তত বিলেত-ফেরতদের মতো জেল খাটা শিখিয়েছে'।

জেল খাটার কথায় অনসূয়ার মনে পড়লো কবিদের মধ্যে একজন দেশকে 'অম্বরচুম্বিতা-ভাল-হিমাচল' বলে বর্ণনা করেছেন বটে। জেলের মেয়ের পরিচয় বুঝতে পেরে তিনি হেসে ফেললেন, বলেন, 'খুব জেলেবউ-এর গল্প বলেছো'।

এবং তখন-তখনই তাঁর বক্তব্যের সূত্র আবার স্থাপন করলেন, 'কিন্তু এখন তুমি হাসছো তার দেশের কাজের কথায়, যদি সে সবদিক দিয়েই বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকে, সহ্য হবে তোমার? সমাজের বিধানগুলো, গৃহস্থজীবনের রীতিনীতিগুলোও যদি সে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে—তা কখনো তোমার

ভালো লাগবে না'।

'তার সেই গৃহ-বিপ্লবের কথা বলছো? সেই দুই হাত দিয়ে পৃথিবীকে সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া? মন্দ কী। ওটা এক ইংরেজ কবির ভাষা'।

'তোমার প্রশ্রয় যে ছেলেগুলিকে আর কতভাবে নষ্ট করবে আমি ভেবে পাইনে। জমিদারের ছেলে হয়েও সে যখন জমিদারী প্রথা ধ্বংস করতে চায় তখনো তুমি চুপ করে থাকো। তুমি কি বোঝো না ওদের হাতে পড়লে আমার এই শ্বশুরের ভিটের কী দুর্দশা হবে'?

'আমি তো দোষের কিছু দেখি না'। অন্দরের বসবার ঘরে নিজের আসনে বসে সান্যালমশাই বললেন, 'এ বংশের অনেক ছেলেই বহুদিন ধরে মিনমিন করে জীবন কাটিয়ে দিলো। বহুদিন পরে যদি দু-একটি ছেলে দুর্মদ হয়ে ওঠে ভালোই হবে বোধ হয়'।

'কিন্তু জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গেলে তোমার সঙ্গেই যে প্রথম বিবাদটা বাধবে না তার প্রমাণ কী'?

'কোনো প্রমাণই নেই। বরং বাধবেই, ধরে নিতে পারো। তবে তোমার বিপন্ন মুখ করার কোনো কারণ নেই। জমিদাররাও আটাশে ছেলে নয় যে হট বললেই হটে যাবে। আমার সঙ্গে তার বিবাদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। লোকে বলবে অমুক সান্যালের ছেলে জমিদারী প্রথার ধ্বংস কামনা করে অথচ নিজের পৈতৃক ব্যাপারে অতি ভালো ছেলে। ছেলের এ অপবাদ আমি কখনো সহ্য করতে পারি না, বড়োবউ। বাপ-বেটার বিবাদ, সেটা ঠিক ধর্মযুদ্ধ হবে না। এ যুগের কেউই কূটকৌশলের চেষ্টা না-করে ছাড়বে না। শুধু আইন বদলানোর আন্দোলন নয়, রক্তপাতও হতে পারে। বড়ো কাজের জন্য রক্তের মতো দামী জিনিসের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো। তোমার ঐ চরণকাশির চরের জন্যে নীলকরদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিলো সান্যালদের'।

অনসূয়া শঙ্কিত হলেন। এটা রহস্যের সুরে বলা একটা কথামাত্র। তথাপি তার আড়ালে কিছু কিছু দৃঢ়তা লুকিয়ে রইলো। পর পর কয়েকটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এ বাড়ির মা হয়েছিলো বলে বর্তমানে সান্যালমশাইয়ের চেহারায় বলবার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, কিন্তু কয়েকটি পুরুষ ডিঙিয়ে সাধারণ একটি মায়ের কোলে খড়্গনাসা একটি শিশু যদি আসতে পারে, এই শান্তিপ্রিয় প্রৌঢ়টির আটপৌরে স্বভাবের ভিতর থেকে সান্যালদের আক্রোশ বা রোষ প্রকাশ পাবে না, এ জোর করে বলা যায় না। বুদ্ধিমান সে-রোষকে আত্মঘাতী বলবে হয়তো, কিন্তু তার প্রতিহিংসা পৃথিবীর যে কোনো প্রতিহিংসার চাইতে কম নয়। হেস্টিংসের লাটগিরিকেও রেয়াত করে না সে-ক্রোধ।

যদি সত্যিই মতবাদ নিয়ে পিতাপুত্রে বিবাদ বেধে ওঠে তাহলে তিনি কী করবেন, এই দুশ্চিন্তা হলো অনসূয়ার। তার যে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তা থেকে কী করে তিনি পরিত্রাণ পাবেন? আর তেমনি একটি মত-পার্থক্যের সূচনা ইতিমধ্যে হয়েছে।

সান্যালমশাই হাসছেন, তিনি হেসে বললেন, 'কিন্তু আপাতত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ তোমার দেখছি না, প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। বরং সদানন্দকে একটু সমঝে দিও, চাষীদের কয়েকটা ছেলে কী গান করলো, সেটার সাথে নীল বিদ্রোহের তুলনা রূপুর মাথায় যেন ঢুকিয়ে না দেয়। এরকম চেষ্টা হচ্ছে'।

'সবতাতেই তোমার ঠাট্টা'।

'না, পরিহাস নয়। তোমার বড়োছেলের লেখাপড়ার জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারো না। তার যুক্তিগুলির গোড়ার কথা যে সদানন্দর, এমন সন্দেহ আজকাল আমার হচ্ছে'।

অনসূয়া সান্যালমশাইয়ের হাসি-মাখানো মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই মানুষটির সঙ্গে ত্রিশ বছর কাটিয়েও যেন এঁর সবটুকু পরিচয় পাওয়া গেলো না। কোনটি লঘু পরিহাস, কোনটি কঠোর সত্য, এটা এখনো তিনি বুঝতে পারেন না। অকস্মাৎ এঁর একটি মনোভঙ্গি এত নতুন, এত অপরিচিত বলে বোধ হয় যে, অনসূয়া বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক সেই দিনগুলির মতো কিছু অনুভব করেন।

সান্যালমশাই যখন ভৃত্যর হাত থেকে নিয়মমাফিক তামাক নিয়ে তাতে মন দিলেন, সেই অবসরে অনসূয়া ভাবলেন—আর যা-ই হোক, যে অপ্রত্যাশিত ও অপ্রিয় বিবাহ ব্যাপারটির কথা তিনি একই কালে স্বামীকে বলতেও চাচ্ছেন, গোপন করারও চেষ্টা করছেন, সেটা বলার সময় এখন নয়। সান্যালমশাইয়ের সম্ভাব্য সুপ্ত রোষ কিংবা তাঁর কথা বলার এই হাসিমাখা স্নিগ্ধ ভঙ্গি কোনোটিকে আঘাত করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো না।

কিন্তু রাত্রির অনেকটা সময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে চিন্তা করতে হলো অনসূয়াকে। তিনি ভাবলেন—তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় সান্যালমশাই নিজে মেনে নিলেন এই বিবাহ ; আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবান্ধব এরাও কি মানবে? তার চাইতে বড়ো কথা, গ্রামের লোকেরা কী বলবে। সাধারণ প্রজাদের মনে যদি প্রশ্ন জাগতে থাকে, যদি কুৎসা রটে। সহসা তাঁর চোখে এই প্রজারাই বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। প্রজারা ও দাসদাসীরা এবং আশ্রিতরা যারা মুখ তুলে চেয়ে আছে, এসব পরিবারের বিবাহের ব্যাপার যাদের কাছে বহুদিন ধরে আলাপ করার, আনন্দ করার বিষয় ; অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য, যাদের মতামতের খোঁজও কেউ করেনি, তাদের গ্রহণ করার ভঙ্গিটির উপরেই যেন বিষয়টি নির্ভর করছে।

তাঁর মনে হলো : ছেলেমেয়েরা একটা কথা বুঝতে চায় না ; মানুষ যত বৃদ্ধ হয়, মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকে, তার বাঁচার প্রবৃত্তি, মৃত্যুকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি হয় তত তীব্র। সে সন্তানেব মধ্যে নিজের আকৃতির প্রতিফলন নয় শুধু, মতামতের অনুসবণও খুঁজে পেতে চায় ; সে অন্য আধারে মৃত্যুকে অস্বীকার করে থেকে গেলো এই যেন বলে যেতে চায়।

তারপর তিনি ভাবলেন : বিবাহটা কি শুধু দুটি প্রাণীর? একটা কাহিনী মনে হলো তাঁর। এ-বংশের একটি স্ত্রী বিবাহের দু-বছর পবে স্বামীকে হারিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হয়নি, তিনি ইতর স্ত্রীদের নিযে ছন্নছাড়া হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমশ। প্রথমে স্বামীকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন বউটি, তারপর করলেন অস্বীকার। তাঁর মহলে স্বামীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। এতটা হলো যে জমিদারির মালিক হয়েও সে লোকটি স্ত্রীর মহলের দাসীদের মুখে 'যেতে পারবেন না আপনি' এই হুকুম শুনে ফিরে গেলেন। সে যেন এক মাতৃতন্ত্রের পুনঃস্থাপন। স্ত্রীর অধিকার শ্বশুরেব প্রতিষ্ঠাতেও, শুধু স্বামীতে নয় এই যেন প্রমাণ করেছিলেন বউটি। শ্বশুরবাড়ি স্বামীর চাইতে অনেক বড়ো। বিবাহটা শুধু দুজনের সম্বন্ধ নয়। দুজনের হৃদয়ের গভীবতায় সীমা পাওয়া যায না এমন বহু হৃদয়ের সঙ্গে জড়িত। নতুন বিবাহ আর বাঈজী-প্রণয়ে কি প্রভেদ?

প্রকাশ্যে বিয়ের মন্ত্র পড়ুক ওরা এখানে। সেটা যদি অভিনয় হয়, হোক না। প্রায়শ্চিত্তর মতো লাগছে শুনতে, তাহলে তাই। তোমাদের কাছে হয়তো প্রস্তাবটা হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু পিতামাতা যদি আঘাত সহ্য করতে পারে, পরিবর্তে তাদের মুখ রাখার জন্য একটা মিথ্যা অভিনয় করা কি খুব কঠিন হবে, সুমিতি?

মনে মনে এই কথাটি হুকুমের মতো করে বলে অনসূয়া একটু শান্ত হলেন।

সকালে স্নান সেরে ঘরে ঢুকে সুমিতি দেখলো আয়নার সামনে টেবিলটার উপরে একটি সিঁদুরের কৌটো। সেটা সেকেলে—সোনার, ভারি এবং অত্যন্ত বড়ো। এটা অতিথির জন্য সংরক্ষিত বস্তুগুলির একটি নয়, উপহার দেওয়ার জন্য কিনে আনাও নয়। হয়তো-বা সান্যালগিন্নির নিজের ব্যবহার্য, কিংবা হয়তো এই সেকেল পরিবারের প্রথার সঙ্গে যুক্ত একটি উত্তরাধিকারচালিত সামগ্রী।

আয়নার সম্মুখে বসে সুমিতির মনে হলো, সান্যালবাড়ির প্রথম শাসন কৌটো মারফত তার কাছে এসে পৌঁছেছে। সিঁদুরহীন কপালে এ-বাড়ির বউ হওয়া সম্ভব নয়, একটিমাত্র কথা ব্যয় না করেও সে কথাটি অনসূয়া তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বিবাহের চিরাচরিত প্রথা যদি না মেনে থাকে তারা, সেটার পিছনে পুরাতনকে অস্বীকার করার ইচ্ছাও যদি থেকে থাকে, তাকে সবসময়ে ঘোষণা করে বেড়াতে হবে এমন কথা নেই। প্রতিবাদ মানে পাহাড়ীদের মতো সর্বদা কোমরে কুকরি বেঁধে বেড়ানো নয়।

গোল করে কপালে টিপ আঁকতে আঁকতে সুমিতি ভাবলো সিঁথিতেও দিতে হবে নাকি ? সামান্য একটু চেষ্টাতেই চুলগুলো চিরে সোজা সিঁথি করে সিঁদুর পরতে পারলো সে।

সিঁদুর পরে আয়নার দিকে চেয়ে সে লজ্জিত হলো। তার সে লজ্জাটি অন্য যে কোনো নববিবাহিতা অনুভব করে। এটা বুঝতে না পারলেও তার মনে হলো কেউ-বা তাকে দেখে ফেলেছে।

চায়ের অভাব বোধ করছিলো সুমিতি, চায়ের সম্ভার নিয়ে ঝি এলো না, এলেন সান্যালগিন্নি খালি হাতে।

'এসো তো'।

সুমিতিকে পিছনে নিয়ে ঘর থেকে বার হলেন অনসূয়া। ঠাকুবঘরে প্রণাম করে বেরিয়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সুমিতি দেখলো একটা ছোটোখাটো জনতা তার জন্য অপেক্ষা কবছ। অনসূয়ার সঙ্গে সুমিতিকে দেখতে পেয়ে হুলু দিয়ে উঠলো তারা। কে একজন শাঁখও বাজালো। সভা করে অনেক সাবাস বাহবা পেয়েছে সে কিন্তু সহসা এই স্ত্রীমগুলেব সমবেত কণ্ঠে 'বেশ বউ, বেশ বউ' শুনে সুমিতিকে মাথা নত করতে হলো।

শুধু একজন এদের কথায় সায় দিলেন না। অনেক বয়স হয়েছে তাঁব। কথা বলতে গেলে গলা কোথাও কোথাও কেঁপে যায়, কিন্তু এখনো তাঁর দেহবর্ণ বয়সের নিষ্প্রভতাকে কাটিয়ে দর্শনীয়। তিনি বললেন, 'আমি ভাবি মেমসাহেব বুঝি। অনসূয়া বলে আমাবই মতো, তা তোরাই বিচার কর। এ যে আফ্রিকার বুয়ার'।

একটা চাপা হাসি কানে এলো সুমিতির।

প্রসন্ন হাসিতে অনসূয়া বললেন, 'উনি তোমার ঠানদিদি, সুমিতি, প্রথমে ওঁকেই প্রণাম করতে হয়'।

প্রণাম পর্ব শেষ করে সুমিতি ঘরে এসে দাঁড়ালো। স্নানের ঘর দেখে সুমিতির যে-মন সামন্ততান্ত্রিকতা লক্ষ্য করে সচেতন হয়ে উঠেছিলো সেই মন কাজ করতে লাগলো। বিবাহযজ্ঞের ধোঁয়া শুধু নিশ্বাস ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, মনকেও করে। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় অকাব্যকে কাব্য বলে ভ্রম হয়, নিছক কতগুলি বস্তুতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞা এবং কতগুলি কষ্টবোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ রম্য হয়ে ওঠে। তেমনি একটি মোহই যেন এরা বিকিরণ করছে। কিছুক্ষণ আগে প্রভাত হয়েছে। এরই মধ্যে আয়োজনেব এতখানি যারা করেছে, রাত্রিতে পৌঁছবার আগে দিনটাকে তারা কীভাবে অনুপ্রাণিত করবে বলা কঠিন।

কাল রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত একটা সন্দেহ হয়েছিলো সুমিতির—এরা আদৌ তাকে বধূ হিসাবে গ্রহণ করবে কিনা, এখন আর সে সন্দেহ নেই ; গ্রহণ নয় শুধু, বিপুল আয়োজন করে চিরাচরিত কোলাহলের মধ্যে গ্রহণ করছে।

পদশব্দে চোখ তুলে দেখলো সুমিতি, ঘরের ঠিক মাঝখানে অনসূয়া এবং একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়িয়েছেন। সুমিতির মনে হলো হাত তুলে নমস্কার জানানো উচিত, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে নতজানু হয়ে প্রণাম করলো।

'তোমার শ্বশুর, সুমিতি'। অনসূয়া বললেন।

কী বলা উচিত—এই ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে সুমিতি সান্যালমশাইয়ের মুখ দেখতে পেলো। অতি সাধারণ একজন মানুষ, অথচ এ-অঞ্চলে এত বড়োমানুষ নাকি কেউ নেই।

সান্যালমশাই বললেন, 'কল্যাণ হোক'। তারপর একটু যেন দ্রুতপদে তিনি চলে গেলেন। সুমিতির মনে হলো, সান্যালমশাইয়ের চোখ দুটি টলটল করছিলো।

দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যাপারটা সেদিন সহজ হলো না। ডালিমফুলি বেনারসি শাড়ি, ফিরোজা ওড়না,

সদ্য-কেনা ঝকঝকে অলংকারে সজ্জিত হয়ে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের আহারের সম্মুখে দাঁড়াতে হলো তাকে একবার।

খেতে-খেতে কে একজন বললো, 'দাদা, আপনি যে এত চাপা তা আমি জানতাম না। বড়োছেলের বিয়ে, দশ গাঁয়ের লোক জানবে ; জানাজানি হবার আগেও কানাকানি চলবে ; তা নয়—'

সদানন্দ সান্যালমশাইয়ের হয়ে উত্তর দিলো, 'চারদিকে অশান্তি, প্রজাদের ঘরে হা অন্ন, এখন কি হৈ-হল্লোড়ের বিয়ে ভালো দেখায়'।

প্রথম লোকটি হাসতে-হাসতে বললো, 'মাস্টারমশাই নিজে যেমন, ঠিক তেমনি মানানসই কথাই বলেছেন। তিনি যে গ্রামে আছেন, এটা খোঁজ নিয়েও জানা যায় না বটে'।

কয়েকজন মোসাহেবিব ভঙ্গিতে হেসে উঠলো।

সান্যালমশাই বললেন, 'মিহিব, তুমি সদানন্দের ব্যাপারে হাসছো, কিন্তু আসল ব্যাপারটা সে গোপন করে যাচ্ছে, তা ধরতে পারোনি'।

'না-না, গোপন করবো কেন'?

'জেল খাটা যাদের উপজীব্য, লোকালয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাদের চলে না, তাদের প্রকাশ্যে বিবাহ করারও মুখ নেই, এ কথাটাই সদানন্দ গোপন করছে'।

দু'একজন হাসলো।

মিহির বললো, 'মাস্টার যে আমাদেরসুদ্ধ জেলে পাঠাননি, এটাই আশ্চর্য'!

ঘরে ফিরে সুমিতি শাড়ি, ওড়না, অলংকার খুলে ফেলতে ফেলতে চিন্তা করলো। শাড়ির রং ও অলংকারের গঠনের কথা গণনীয় নয়। অন্যের রুচিমতো সাজসজ্জা করা জ্ঞান হওয়াব পরে তার এই প্রথম। তা হোক, একটা অভিনয় বলে সেটাকে মেনে নেওয়া যায়। এদের হাসি ও লঘু আলাপের পিছনে একটি প্রয়াস ছিলো, সেটা অতি সহজেই ধরা পড়ে। একজনকে মাঝে মাঝে নিজের মতামত প্রকাশ কবার জন্য জেলে যেতে হয়, সেজন্যই যে তাকে বিবাহ ব্যাপাবটা গোপনে সমাধা করতে হবে, এটা নিশ্চয়ই এরা বিশ্বাস করে না।

কিন্তু চিন্তার অবসর আজ এরা দেবে না। প্রায় তার সমবয়সী কয়েকটি স্ত্রীলোক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। বেশভূষা ও আকৃতিতে লক্ষণীয় আর্থিক আভিজাত্য নেই তাদের, কিন্তু সুমিতি বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলো, তাদের এই কোলাহলে কিছুমাত্র অভিনয় নেই। বিশেষ করে একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ছাপ রাখলো। তাব বেশভূষা সবচাইতে কম সোচ্চার, কিন্তু তার বড়ো বড়ো চোখ দুটির ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সে সম্পূর্ণ সজ্ঞান তার পরিচয় তার চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজলের রেখায়। সুমিতি কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচয় পেলো মেয়েটি সম্বন্ধে তার ননদ।

মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো, সুমিতির এই ননদ বললো, 'এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের ঘর, জোরে হাসাহাসি করলে ওঁর কানে যাবে। বউকে গিরিফ্‌তার করে নিয়ে চলো'। সুমিতির ননদ পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, আর অন্যান্যদের মাঝখানে সুমিতিকে যেতে হলো অন্দরমহলের দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণী একটা ঘরে।

সুমিতির ননদের নামটা একটু অদ্ভুত—মনসা। অবশ্য তাতে মাধুর্যের হানি হয়নি। তার স্বামী তাকে মণি, মণিমালা ইত্যাদি বলে থাকে। এসব একমুহূর্তে জানতে পারলো সুমিতি। কথাগুলো বলেই মনসা বললে, 'হ্যাঁ বউ, তোমাকে দাদা কী বলেন'?

সুমিতি সুন্দর একটা উত্তর ভেবে নেওয়ার আগেই মনসা হেসে বললো, 'হ্যাঁ গো, দাদার সঙ্গে তোমার কোনোদিন সত্যি দেখা হয়েছিলো তো? তুমি তাঁর বউ তো, নাকি ঠকাতে এসেছো'?

সুমিত্তির মুখে একটা ছায়া পড়ছিলো ; সে হেসে, হোক একটু চেষ্টা করে, বললো—'মণিদিদি, তোমার জিভে বিষ আছে। কিন্তু তা হোক, তোমাকে আমি শিগগির শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে দিচ্ছি না'।

মনসা তার চোখ দুটি ব্যবহার করলো।

সুমিত্তির মনে হলো কথাটা সে শুনতে ভালো শোনাবে বলেই বলেনি, সমস্ত মন দিয়েই বলেছে। মণি ভালোবাসার মতো।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সুমিত্তির ঘরে শোফাটায় শুয়ে গল্প করতে করতে মনসা রৌদ্রের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমিত্তি মনসার নিঃসংকোচ শোবার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করলো। তারপর সে লক্ষ্য করলো অনসূয়া ক্লান্ত শ্লথ পায়ে ছাদটা পার হয়ে নিজের বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছেন। সুমিত্তি শুনতে পেলো মাটি-উঠোনের বাঁধানো চত্বর থেকে যে থামগুলো দোতলার ছাদ পর্যন্ত উঠেছে, তারই একটা কার্নিশে বসে একজোড়া ঘুঘু ডাকছে। অনসূয়া কার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন। মাঝে মাঝে রান্নামহলের চত্বর থেকে ক্ষীণ একটা কোলাহল কানে আসছে।

মনসার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করতে পেরেছে সুমিত্তি। মনসা সরাসরি প্রশ্ন করেছিলো, 'বিয়েটা কি গন্ধর্ব মতে হয়েছে, ভাই বউদি'? সুমিত্তি একটু চিন্তা করে, একটু সময় নিয়ে বলেছিলো, 'না, ইংরেজি মতে'। মনসা উত্তরটায় হাসির কী পেলো কে জানে। হাসতে হাসতে সহসা গম্ভীর হয়ে সে বিষ ঢাললো, বললো, 'ভাই বউদি, যে ইংরেজের সঙ্গে আমার দাদার আকৈশোর বিবাদ, নিজের জীবনে সেই ইংরেজের আদর্শ ছায়া ফেললো! তার এ হার স্বীকারের জন্য কি তুমি দায়ী, না তোমার চোখজোড়া'?

সুমিত্তি নিজের দৃষ্টি আনত করে দেখলো মনসার চোখ দুটিতে টলটল করছে আশ্বাস। সে বললে, 'গন্ধর্ব মতে হলে কি আমাকে গ্রহণ করতে'?

'আমাদের গ্রহণ করার মূল্য কী তা আমি নিজে জানি না ; নিশ্চয় আছে, নতুবা জ্যাঠাইমা তার জন্যে এত আয়োজন করতেন না। তবু তোমাদের কাছে যতটা সাহস আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে তার পরিচয় নেই। অবশ্য এও নব গন্ধর্বমত, শুধু বয়স্য কিংবা বনস্পতিকে সাক্ষী না রেখে সরকারের দু'একজন কর্মচারীকে রেখেছো কিন্তু সাক্ষীর কী প্রয়োজন হলো'?

সুমিত্তি আবার চিন্তা করলো। এখানে আসবার প্রস্তাবটা তার নিজের। কারো সঙ্গে সে আলোচনা করেনি, কিন্তু অন্তরঙ্গ যারা তাদের সকলেই যে এই প্রস্তাবে সমস্বরে না না করে উঠতো তাতে সন্দেহ নেই। এমনকী এই বাড়ির বড়োছেলেকে একদিন প্রস্তাব করায় সে বলেছিলো, 'সম্মানের যদি হানি হয়'?

সুমিত্তি বললো, 'মণি, সাক্ষ্য থাকা না-থাকায় আমার নিজের কিছু এসে যায় না। তোমার দাদার হাতে কেউ আমাকে সম্প্রদান করলো কি না তারও খুব বড়ো দাম নেই, কিন্তু গন্ধর্ব মতকে আমরা গ্রহণ করিনি, কারণ—'

সুমিত্তির গাল দুটি লাল হলো। মনসা তার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'কারণ বিয়ে শুধু দুজনে শেষ হবে মনে করোনি'।

মনসা উঠে এসে সুমিত্তির পাশে বসে তার একখানা হাত নিজের হাতে নিলো কিন্তু এই ভঙ্গির বিপরীত সুরে কথা বললো, 'তুমি তো তাহলে আমাদের মতোই সাবধান। প্রেমের জন্য সবকিছু দিতে বসেও হিসেবের নাড়িতে টান লাগছে তোমার'। খিলখিল করে হেসে বললো মনসা, 'দেন মোহর ব্যবস্থা করোনি তো'?

কিন্তু, মনসা পরক্ষণেই গভীর সুরে বললো, 'আমার আর একটা ধারণা পরিচ্ছন্ন হলো আজ। বহুদিন ধারণা ছিলো তোমরা যারা ভালোবাসো তারা বিদ্রোহী, এখন মনে হচ্ছে প্রেমের সে বিদ্রোহ রংদার রাংতা'।

কিন্তু তাহলেও সুমিতি নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে স্বেচ্ছায় এসেছে, একথা কেউ কি বিশ্বাস করবে? নিজের বাড়িতে সুমিতি প্রমীলার মতো স্বাধীনা। তার এই যেচে আসা এবং এদের এই গ্রহণ করবার পদ্ধতি সুমিতির চরিত্রে খড় ও বাঁশ ছাড়া আর কিছু কি অবশিষ্ট রাখলো? তার সঙ্গে বিপন্ন আর একটি আশ্রয়কামীর কী পার্থক্য রইলো? সুমিতি অন্তর্বত্নী একথা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি লোকে বলবে না বেকায়দায় পড়ে এসেছে সে? এদের চোখে মন্ত্রপড়া বিবাহ ছাড়া আর সববিবাহই কি অসংযমের গ্লানিমাত্র নয়? বিবাহের যে কোনো প্রথাই একটি সমাজিক স্বীকৃতিমাত্র। সেই স্বীকৃতি যদি না থাকে কী মূল্য রইলো প্রথার, কী প্রভেদ রইলো এই বিবাহের প্রথাহীন মিলনের সঙ্গে।

তখন কেউ সুমিতিকে দেখলে ভাবতো রৌদ্রের ভয়ংকর উত্তাপে মেয়েটির অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।

মনসা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমিতি ভাবলো—আর যা-ই হোক, নিজের চরিত্র কী সেটা প্রকাশ করার জন্য সে এখানে আসেনি, যেমন আসেনি এদের প্রথাগুলিকে আঘাত করে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যদি কেউ বলে—সে আশ্রয় চায়? উত্তরে সুমিতি হাসলো মনে মনে।

অনসূয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘরে এলেন। প্রায় বিশ বছর বাদে তিনি আজ কোমরে কাপড় বেঁধে রান্নার মহলে নেমেছিলেন। বিবাহের পরে এমনি আর একটা ঘটনা ঘটেছিলো, সেটা তাঁর দিদিশাশুড়ির শ্রাদ্ধের সময়ে। তবু সেদিন ছিলো একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম। ব্যাপারটির মর্যাদা রক্ষা করাই ছিলো তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু আজ সকালে যখন আলাদীনের মতো ইচ্ছা কিন্তু তার প্রদীপ না নিয়েই মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ালেন তখন হুকুম নির্দেশ দেবার অবসর ছিলো না। মুখরক্ষা করতে হবে এই দৃঢ় সংকল্প ছিলো।

এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ ছিলো সান্যালমশাইকে খবরটা দেওয়া। কাল বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে যা একান্ত অসম্ভব বলে বোধ হয়েছে, এখন সকালের দু'পাঁচ মিনিটে সেই খবরটা দিতে হবে ; এবং খবর দেওয়াই শেষ নয়, তাঁকে অভিমান করার অবসর দেওয়া যাবে না, বরং সহায়তার জন্য ডাকতে হবে।

সান্যালমশাই তখন শয্যা ত্যাগ করেননি। অনসূয়া তাঁর ঘরে এসে বিছানার একপাশে বসে বলেছিলেন, 'একটা বউভাতের ব্যবস্থা করে দিতে হয়'।

'বউভাত! কার? এখনো রাজ্যে বউভাত হচ্ছে নাকি'?

'খোকার'।

'খোকার? মানে তোমার বড়োছেলের'?

অনসূয়ার ঠোঁট দুটি এই জায়গাটায় কাঁপছিলো। সান্যালমশাই লক্ষ্য করলেন সেটা।

তিনি বলেছিলেন, 'তোমার বড়োছেলে বিয়ে করেছে? সুমিতি কি সেই বউ? তবে তো বউভাত করতেই হবে'।

সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও একটি হাসি আনতে পারলেন সান্যালমশাই, বললেন হাসতে হাসতে, 'ছেলেটা এতেও বিপ্লব আনলো'।

অনসূয়া উঠে দাঁড়ালেন, দ্বিতীয়বার কথা বলার আগে পিছন ফিরে হাতের তেলোয় চোখ দুটি মুছে নিলেন, বললেন, 'বস্ত্র, আভরণ...'

'নিশ্চয়, সদানন্দ এখনো ঘোড়ায় চড়তে পারে কিনা খোঁজ করি'।

সান্যালমশাইয়ের মুখাবয়ব রক্তহীন, যেন একটা মুখোশের আড়ালে ঢাকা রইলো সবসময়ে।

কাজকর্ম মিটিয়ে অনসূয়া ঘরে এসে মনে মনে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, বড়োছেলের একটিও নতুন তোলা ফটো নেই ঘরে। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শেষবার তাকে তিনি দেখেছেন। মাঝে মাঝে ভাইদের চিঠিতে তার খবর পান। কিন্তু আজ যেমন করে তার ফটোর অভাব বোধ করলেন এমন অনেকদিন হয়নি।

পদশব্দে চোখ তুলে তাঁর নিজস্ব দাসীকে দেখতে পেলেন অনসূয়া।

'এই শরবতটুকু পাঠিয়ে দিলেন বুড়িদিদি'।

'আহা, তাঁর খাওয়া হয়েছে তো? সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার হলো আজ। তোমরা খেয়েছো'?

'আমরা এবার বসবো, কিন্তু আপনি এটুকু নিন'।

'বড্ড খাটলে আজ তোমরা'।

'বুড়িদিদি বলছিলেন—বাড়িতে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে, কিন্তু পাঁচ ঘণ্টায় এমন বউভাত সাজাতে আর কেউ সাহস করেনি'।

দাসী চলে গেলো।

দাসপাড়া, সেনপাড়ার লোকেরা জোকার দিয়ে অন্দরের উঠোনে প্রবেশ করছে, খবর পাওয়া গেলো। এবং এ জোকারের স্বীকৃতিটুকু এ-উদ্যমের সার্থকতা।

১০

একদিন রামচন্দ্র আলেফ সেখের বাড়িতে যাচ্ছিলো। আলেফ সেখের বাড়ি চরণকাশিতে। আলেফ সেখের তিনজোড়া বলদই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নতুন একজোড়া সে কিনেছে গত সপ্তাহে অরনকোলার হাট থেকে, তাদের থেকেই রোগটা ছড়াচ্ছে। বুধেডাঙার প্রান্ত পর্যন্ত এসে রামচন্দ্র মাঠের পথ ধরলো। মাঠ পেরিয়ে সে সোজা পাড়ি দেবে চবণকাশির জোলা পর্যন্ত, জোলা পার হলেই আলেফ সেখের বাড়ি।

হঠাৎ রামচন্দ্র থেমে দাঁড়ালো। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। ভরুই পাখি! ধানের সঙ্গে তাদের যাওয়া-আসা, ঝাঁক বেঁধে তারা আসে, ধোঁয়ার মতো ধানেব শিষগুলির উপরে ভেসে বেড়ায়। তেমনি আসে এদেশে দক্ষিণের চাষীরা। মাথায় টোকা, হাতে ছোট ছোট লাঠি, কাঁধে একটি করে ঝোলা, তাতেই তাদের সর্বস্ব। ধানের দিনে তারা আসতো, তখন তাদের আসাটাই ছিল স্বাভাবিক। তাদের আসা সূচনা করতো ধান, তাদের হাসিতামাশা, কথাবার্তা গ্রামের পথে গ্রামের চাষীদের আত্মতৃপ্তির নিশানা দিয়ে বেড়াতো।

রামচন্দ্র অবাক হয়ে দেখলো ঠিক তাদের মতো চেহারার কয়েকজন লোক দল বেঁধে আসছে। ছিদামের ধান কাটতে এলো নাকি এরা? কথাটা মনে হতেই বামচন্দ্র শূন্য মাঠের মধ্যে একা একা হেসে ফেললো।

কাছাকাছি এসে ওরা বললো—'চৈতন্য সা-র বাড়ি কোন দিকে যামু'?

'যাও এই পথেই'।

ওরা চলে গেলে রামচন্দ্র পথ চলতে লাগলো আবার। তাহলে এরা চৈতন্য সাহার খোঁজে এসেছে, তার সেই কুখ্যাত হাড়-চালান-দেওয়ার ধানীনৌকার দাঁড়িমাল্লা হবে বোধ হয়। চৈতন্য সাহার জমি হয়েছে, কিন্তু ধান কোথায় যে কাটবে এরা? রামচন্দ্র ঠিক করলো ফিরবার সময়ে বাড়ি যাবার পথে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্টকে কৌতুকের খবরটা দিয়ে যাবে।

কিন্তু চৈতন্য সাহা নাবালক নয় যে ছিদামের ধান কাটার খবর পাঠিয়ে দাঁড়িমাল্লা ডেকে আনবে। বাঙালরা—এ অঞ্চলে ধান কাটার জন্য যারা দক্ষিণ থেকে আসে তাদের প্রচলিত নাম—কেন এসেছে বোঝা গেলো। রটলো—এ বছর চৈতন্য সাহা এ গ্রামের চাষীদের আগাম টাকা দিয়ে চাষ করতে ডাকবে না। যারা প্রাণের দায়ে তার কাছে গিয়েছিলো কথাবার্তা বলতে তারা ফিরে এসেছে। সে তাদের বুঝিয়ে

দিয়েছে—এবার সে অন্য দেশ থেকে চাষী এনে তার খাইখালাসি জমি চাষ করাবে। চাষীরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলো। তারা গত ফসলের সময়ে যে অপমান বোধ করেছিলো ভয়ে তাদের সে-অপমান বোধও আর রইলো না।

কথাটা তার কাছে দু'একজন উত্থাপিত করলে রামচন্দ্র একদিন ভক্ত কামারের কাছে বললো, 'এমন তো হয়ই, খাইখালাসিতে জমি বাঁধা পড়লে চাষীর তো এই হালই হবি'।

'কিন্তুক ধরো যে নিজের জমিতে মজুর খাটে গত সনে প্রাণ বাঁচছে, এবার কী হবি? এবার যে মজুর খাটেও দিন চলার উপায় নি। এ সনও না, তার পর সনও না, তারপর জমি ফিরে পাবা। ততদিন কোন ধানে বাঁচবা'?

ব্যাপারটা দেখতে দেখতে অন্যতর পরিণতি নিলো।

শ্রীকৃষ্ট সেদিন অসুস্থ, মহাভারত পড়ার শক্তি নেই। রামচন্দ্র তার দাওয়ায় বসে বললো, 'শুনছেন না, গোঁসাই'?

শ্রীকৃষ্ট সবই শুনেছে, খানিকটা সময় চুপ করে থেকে সে ধীরে ধীরে বললো, 'আপনাকে নিয়ে আমি একবার সান্যালমশাইয়ের কাছে যাবো। কবো, এখন আমরা মরে গেলে যদি দেশে শান্তি হয়, হউক'।

রামচন্দ্র বললো, 'দেশে আর শান্তি হবি নে'।

গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তার।

ঘরের মধ্যে থেকে আর একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেলো। সে শ্রীকৃষ্টর শেষ বৈষ্ণবী পদ্ম।

শ্রীকৃষ্ট বললো, 'কেন্, পদ্মা, তুমি কী কও'?

পদ্ম বললো, 'আমাদের দেশে লাঙলের পূজা হয়, তাতে শান্তি আসে'।

'সে কী পূজা'?

পদ্ম বললো, 'দেখছি—নতুন কাঠ দিয়ে এক লাঙল তৈরি করে পাটবাণের পূজার দিনে পূজা হয় তার, তারপর সেই লাঙলে খানিক মাটি তোলা হয়, গাঙের জল তুলে কাদা করা হয়, সেই কাদায় গড়ায়ে, সারা গায়ে কাদা মাখে আমার দাদারা খেতে নামতো চাষ দিতে'।

'খেত? না, কন্যে। এদেশে আর খেত নাই'। রামচন্দ্র বললো।

আলোচনাটা আর এগোলো না। প্রায় অন্ধকার পথ বেয়ে দশ-পনেরো জন লোক এসে দাঁড়ালো শ্রীকৃষ্টর ঘরের সম্মুখে।

'তুমি এখানে আছেন মোণ্ডল, আমরা খুঁজতেছিলাম'। ওদের মধ্যে একজন বললো।

'কেন্ ভাই, আমাক কেন্'?

তারা বললো ভক্ত কামারের দুই ছেলে অনেকদিন থেকে ওপারের মিলে কাজ করে। বড়োছেলে আজ ভক্তকে নিতে এসেছে। তার কাছে শোনা গেছে ওপারের ধানের কলে এখন অনেক মজুর নেবে। ভক্তর কাছে গিয়েছিলো গ্রামের অনেকে, সে বলেছে, রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করো, সে বললেই—যাওয়া।

রামচন্দ্র কথা বলার ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসলো, কিন্তু কথা খুঁজে না-পেয়ে গোঁফে হাত রাখলো।

তার বক্তব্য ছিলো—আমি কী বলবো, এমন করে তো আগে তোমরা আমাক কও নাই, আমি কী পরামর্শ দেবো? আমি কি কোনোকালে পরামর্শ দিবের শিখছি?

এদের মধ্যে একটি বোকা-বোকা লোক ছিলো, কথা বলতে তার 'র' ও 'ন' দুটিই 'ল' হয়ে যেতো ; সে বললো, 'মলডল্ বুঝি গাঁ ছাল্বা লা? যখন আমলা লা খায়ে মলাম তখন জমিদালও গাঁ ছালে পলাইছিলো'।

রামচন্দ্র বললে, 'কোথায় যাবো'?

তার বক্তব্য ছিলো : কোথায় যাবো, সর্বত্রই তো একই পৃথিবী।

প্রশ্নটা সকলেই করতে পারে, উত্তর দেবে এমন কে আছে?

রামচন্দ্র বললো, এবার তার গলাটা আবেগে কেঁপে গেলো, 'কোথায় যাবো কও, তোমরাই কও। ভক্ত আসে নাই কেন্'?

তাদের মধ্যে ভক্তর ছেলেও ছিলো, সে বললো, 'বাবা কলো মুখ দেখাতে লজ্জা করে। আমি কই, না-খায়ে মরার চায়েও কি লজ্জা বড়ো'?

এখন হয় কি, পুনঃপুনঃ এই নাটক অভিনীত হচ্ছে। যারা মঞ্চে থাকে তারা ঠিক ঠাহর করতে পারে না, কী রকমটা তারা চলবে। তারপর এ ওকে কথা যুগিয়ে দেয়, এর কাজের থেকে ওর কাজের সৃষ্টি হয়। একটা সামান্য কথা, এতটুকু ইঙ্গিতবিভঙ্গ থেকে জনসমুদ্র উদ্বেল হওয়ার গতিবীজ পায়। মেয়েরা যতই উহ্য থাক পুরুষদের আলাপ আলোচনায়, মাঝে মাঝে তাদেরও দু'একটি কথা ছিটকে বাইরে এসে পৌঁছায়। তার গুরুত্ব কম নয়, বরং দেখা যায় পুরুষদের সম্মিলিত যুক্তির আধখানা সৃষ্টি করেছে সেই স্বল্পোচ্চারিত কথা কয়টি।

এতগুলো লোক শ্বশুরকে খুঁজছে কেন এ জানবার আগ্রহে আগন্তুকদের সঙ্গে মুঙলাও এসেছিলো। ঘরের ভিতর থেকে তাকে ডেকে পদ্ম বললো, 'বাবাক একটা কথা কবা, আপনেরা যেন যাবেন, মিয়েছেলের কী হবি? তাদের সেখানে আব্রু থাকে না'।

মুঙলা ফিরে এসে কথাগুলি বললো, সেগুলি অবশ্য ইতিপূর্বেই এদের অনেকে শুনতে পেয়েছে।

'তুই কী কস'? ওদের একজন প্রশ্ন করলো।

'মনে কয়, আমার মাকে নিয়ে আমরা যাবো না'।

কয়েকজন প্রায় সমস্বরে বললো, 'তোমরা শ্বশুর জামাই রোজগার করে সেখানে খাওয়াবের পাববা না? তোমরা থাকতে আব্রুর কী ভয়'?

মুঙলা বললে, 'অচেনা জায়গায় কী কাম যায়ে, পাবি তো এখানেও খাওয়াতে পাবরো। কি কও ছিদামসখা'?

'নেচ্চায়'!

যারা চলে যেতে কৃতসংকল্প হয়েছিলো তারা বললো, 'কিন্তুক চৈতন্য জমির খাজনা দেয় নাই, জমিদার জমি জব্দ করবি। চৈতন্য খাজনা দিবি নে ; খাইখালাসি সব খাস হবি, কোনোদিনই আর আমাদের হাতে ফিরবি নে'।

মুঙলা বললে, 'তা হউক, জমিদার জমি বাক্সে পুরবি নে ; খাস করে, বরগা চায়ে নেবা'।

'বাকি খাজনা না-দিলে কোনো জমিদার বর্গা দেয় না'।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো অনেকে।

একজন বয়স্ক চাষী হাসিটা কথায় প্রকাশ করলো, 'যেমন ছিদামের বোবো ধান লাগান' বরগা চষা কি গানের পালা বাঁধা নাকি'?

অতি দুঃখে কয়েকজন হো-হো করে হেসে উঠলো। 'রামচন্দ্রদাদার সব জমি যে খাইখালাসি হয় নাই তাই এমন কয়—' সে হাসির মধ্যে এমন কথাও শোনা গেলো।

হাসি থামলে হরিশ শাঁখারি কথা বললো, 'রাম রে, আমি কী করি তাই কও'।

'কেন্ ভাই, হরিশ'?

'আমার খাইখালাসি যে জমিদারের কাছেই। মিহির সান্যালকে চাপ দিবি কে? মুঙলা, আমি যে বরগাতেও জমি ফিরে পাবো না'।

রামচন্দ্রর মনে হলো এবার সে কেঁদে ফেলবে। বললো, 'তোমরা যদি থাকো, আমি তোমাদের ছাড়ে যাবো না'।

আগন্তুকরা ধীরে ধীরে চলে গেলো। কিন্তু তাদের চলবার কায়দায় মনে হলো রামচন্দ্রর কথায় তারা কিছুমাত্র আশ্বাস পায়নি।

কী করা উচিত রামচন্দ্র কিছুতেই ঠাহর করতে পারছে না। ভাবতে-না-ভাবতে একদিন সে একটা অনুচিত কাজই করে ফেললো।

ছিদামের বোরো ধান আগুই হয়েছে, এই কৌতুকের খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। এক সকালে বন্ধু মুণ্ডলার সাহায্যে ধান কাটার জন্য ছিদাম প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময়ে তারা দেখতে পেলো পুকুরটার অন্যদিকে চৈতন্য সাহার পেয়াদারা এসে দাঁড়িয়েছে।

মুণ্ডলা বললে, 'কেন্ ভাই, তোমরা আসছো কেন্'?

ওদের একজন বললে, 'এ পুকুর কার'?

'কেন্, সান্যালবাবুর প্রজা শ্রীকৃষ্টদাসের'।

'খাজনা দেও না কয় বছর'?

'খাজনা দিবার কী আছে কও? মাছ হয় না, জলকর দিবো ; ফসল হয় না, খাজনা শোধবো'। মুণ্ডলা বললে যুক্তি দিয়ে।

'তাইলে খাইখালাসি বন্দোবস্ত করছিলা কেন্ চৈতন সা-র সাথে'?

'তা করছি, কিন্তু খাইখালাসির মধ্যে কি এই ধানের কথা ছিলো? এ মুল্লুকে এই ধান কোন কালে হয়? যে ফসল এ জমিতে সচরাচর হয় তার উপরই মহাজনের দখল। কিন্তুক যে ফসলের কথা কেউ ভাবে নাই, তার উপর তার দখল হয় কী করে? জমি তো তাক চিরকালের জন্যি বেচি নাই। সে খাউক না যে ফসল মনে মনে জানা ছিলো কাগজ করার সময় । এ ফসলের কথা কাগজের সময় তারও মনে ছিলো না, আমারও না। এর 'পর তার হক্ কী, কও'। ছিদাম যুক্তি দিলো।

'জমি তো তার, তোমার দখল নাই ; সে খালাস না-দিলে তুমি ইয়েত লাঙল ছোঁয়াবা কেন্? ধান কাটবের আমরা দিমু না। জমিদারের খাজনা দেও, আর চৈতন সা-র ট্যাকা, তারপর কাটো ধান'।

মুণ্ডলার মনে হলো এদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করা বৃথা। এরা যুক্তির কথা শুনতে আসেনি, গায়ের জোর দেখিয়ে এ ধানটুকুও নিয়ে যেতে চায়। সে বললে, 'ছিদামসখা, ধান তুমি কাটো'।

'কিয়ের ধান কাটবা'! ওরা পাঁচ-ছজন একসঙ্গে গর্জে উঠলো।

ছিদাম বললো, 'ধান কাটাই লাগবি, মেএাভাইরা, এ ধান আমার সখের ধান। ধান কাটে বেচবো। বেচে যে টাকা হয় দিব চৈতন্য সা-কে। এক বিশ ধান আর তিন টাকা নিয়ে বন্দোবস্ত করছিলাম পুকুরের ডাঙা। এক বিশ ধান আর তিন টাকা আমি তাক্ ফিরায়ে দিব। পুকুরের জল তাক্ দিই নাই, জলের ধান আমার'।

লোকগুলির পিছন দিকে একটা ছোটো ঝোপের আড়াল থেকে চৈতন্য সাহার মুখ দেখা দিলো, 'আর সুদ, সুদ দিবি কে'?

ছিদাম বললে, 'সুদ? সুদের কথা তখন কও নাই, মহাজন, মিছা কয়ো না। খাইখালাসিতে সুদের কথা নাই'।

চৈতন্য সাহা ঝোপের পিছনে ডুব দিলো।

মুণ্ডলা বললে, 'আমাদের যা বলার তা শুনছো, এই ধান আমরা কাটে নিবো। তারপর সে জমি খাক'।

মুণ্ডলা নিচু হয়ে বসে একগোছা ধানের গোড়ায় কাস্তে দিলো। চৈতন্য সাহার পেয়াদাদের একজন এগিয়ে এসে মুণ্ডলার একখানা হাত চেপে ধরলো।

'হাত ছাড়ো, অন্যাই কোরো না'। বললো ছিদাম।

মুণ্ডলা নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিলো, কিন্তু ধানের গোছা ছাড়লো না। পেয়াদাদের আর একজন এগিয়ে এসে মুণ্ডলার হাতের উপরে তার লাঠিটা দিয়ে একটা গুঁতো মারলো।

মুঙলা ধান ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে এ গ্রামের জামাই। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলোর সময়ে চড়চাপড় দেওয়া নেওয়া সে করেছে, কিন্তু, এমন তিরস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে এত বড়ো অপমান তাকে কেউ করেনি। কী একটা তীব্র কথা সে বলতে গেলো, কিন্তু তার আগে তার দু চোখ থেকে অশ্রু নেমে এলো।

ছিদাম বললো, 'সখা, চলো, ধান আমরা কাটবো না, আমার জন্যি তোমার অপমান সয় না'।

মুঙলা বললো, 'না তুমি থাকো ; খেতে দাঁড়ায়ে মরে যাও সখা, খেত ছাড়বা না। আমি সান্যালমশাইয়ের কাছে যাবো, গাঁয়ের লোকের কাছে যাবো, খাইখালাসি মানে কী তা বোঝাবো। তারপর আমিও মরবো'।

ছিদামকে খেতের পাহারায় রেখে মুঙলাকে বেশিদূর যেতে হলো না। সে তেমাথার মোড়টায় পৌঁছে দেখলো সেখানে একটা জটলা হচ্ছে। রামচন্দ্র বোঝাচ্ছে আর তার চারপাশে দাঁড়িয়ে দশ-পনেরোজন চাষী একসঙ্গে তীব্র কণ্ঠে তর্ক করছে। এমনকী বুধেডাঙার রজবআলি সান্দারও এসে জুটেছে। সে কথা বলছে না, পাগলের মতো দলটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তর্কের সমর্থনে।

প্রত্যহ এমন ব্যাপার ঘটে না। ভক্ত কামারের ছেলেরা আজ ভক্তকে নিয়ে গেলো। নদীর ঘাটে তাকে নৌকোয় তুলে দিতে যে দু-একজন গিয়েছিলো তারা লক্ষ্য করেছিলো, শুধু তারা দু'একজন নয়, আরো অনেকে এসেছে ভক্ত কামারের চলে যাওয়া দেখতে। রেল এঞ্জিনের মতো শব্দ করে নয়, ভিজেমাটিতে লগির বাঁশের কিছুমাত্র শব্দ হলো না যখন ভক্ত কামারের নৌকো চিরদিনের জন্য এ গ্রামের মাটি ছেড়ে নদীতে ভেসে গেলো।

স্তব্ধ হয়ে খানিকটা পথ চলার পর কথাটা উঠে পড়েছিলো এর-তার মুখে।

চাষীদের মধ্যে একজন শেষ কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, 'গত সন যা হইছে তা হইছে, এ সন আর নয়। খাইখালাসি দিছি তার দলিল কই'?

'তোমরা তার কাগজে টিপ দেও নাই'? রামচন্দ্র প্রশ্ন করলো।

'সই টিপ দিছি, কিন্তুক রেজিস্টারি হয় নাই, সব ভুয়া। লাগে লাগুক মামলা'।

রামচন্দ্র বললো, 'বুকের ভেতর হাতড়ায়ে দেখ তার কাছে টাকা খাইছো কি না খাইছো'।

'তখন যে না খায়ে মরি, তা দেখে কে'? আর-একজন চাষী বললো।

'সেই তো বড়ো কথা, তার টাকায় প্রাণ বাঁচছে তখন'।

অন্য একজন অল্পবয়সী চাষী তেড়ে উঠে বললো, 'মানি না ওসব দলিল। টাকায় নিছি টাকায় দিবো। চিতি সাপ! দলিল সাপের খোলস'।

'দলিলের দোষ কী ভাই? সব জমিরই কোনো না কোনো দলিল আছে। চৈতন্যর দোষ কী কও, সে খাইখালাসি না করলি আর একজন করতো। নিয়ম আছে তাই সে করছে, না থাকলি সে করতো না। নিয়মেক যদি তাড়াতে পারো তাড়াও'!

এমন সময়ে জনতার মধ্যে থেকে রামচন্দ্রর দৃষ্টি পড়লো মুঙলার মুখের উপরে। তখনো মুঙলা আবেগ ও অবমাননায় আকুঞ্চিত হচ্ছে।

'কী হইছে রে'?

'ও পাড়ার থিকে মার খায়ে আলাম'।

'মার খায়ে'?

রামচন্দ্রর ডান হাতখানা বারবার গোঁফের কাছে উঠে পড়তে লাগলো। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় সে বিচলিত হয়ে পড়েছে, বুদ্ধিতে কিছু ঠাওর হচ্ছে না ; কিন্তু দর্শকদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় সে প্রতিবিধিৎসায় মনস্থির করে ফেলেছে।

'কার হাতে মার খালে, মুঙলা'?

মুঙলা ছিদামের ধান কাটার কথা ব্যক্ত করলো।

রামচন্দ্রর চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের একজনের হাতে একটা বড়ো লাঠি ছিলো। হঠাৎ সেটা হাতে নিয়ে রামচন্দ্র হাঁটতে লাগলো ; মাঝে মাঝে তার হাত উঠে যেতে লাগলো গোঁফে। ভারি দেহে দ্রুত হাঁটার ফলে তাকে দেখে মনে হতে লাগলো যেন একটা রাস্তা সমান করার এঞ্জিন ধ্বস্ ধ্বস্ শব্দ করে ছুটছে, যত তাড়াতাড়ি যন্ত্র চলছে ততটা পথ অতিক্রম করছে না। গ্রামবাসীদের ছোটো দলটি রামচন্দ্রর পিছনে পিছনে চলছে।

ছিদামের ধানক্ষেতের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র দেখলো দুজন বাঙাল ছিদামের দু-পাশে পাহারায় দাঁড়িয়েছে আর জন তিন-চার বাঙাল বিপরীত দিক থেকে ধান কাটছে। রামচন্দ্রর মনে হলো সে হো-হো করে হেসে ফেলবে—এই ধানের এত হাঁকডাক।

কিন্তু হাসিটা ফুটবার আগেই তার মনে পড়লো মুঙলাকে অপমান করেছে এরা।

রামচন্দ্র বললো, 'মুঙলাক মারছে কে? অন্যাই করে সে, আমাকে ক'লেও হতো'।

ছিদাম বললো, 'অন্যাই কেন্? অন্যাই আমার। আমি ধান দিছি খেতে, চিতি সাপের থুথু লাগা খেতে ; সেই মহাপাতক'।

রামচন্দ্রর রাগটা অকস্মাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রচণ্ড স্বরে বললো, 'তফাৎ'।

ওপাশের জঙ্গলটা নড়ে উঠলো, বোধহয় চৈতন্য সাহা স্থান পরিবর্তন করলো। খেতের বাঙালচাষীরা ধানের গোড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'ধান কাটো কোন সম্মুন্দি, কোন চিতিসার বাপের খেত এটা'?

একজন বাঙালচাষী বললো, 'গালমন্দ করেন না ভাই'।

'ভাই! শালা আমার চোদ্দপুরুষের'।

ক্রুদ্ধ বাঙালরা একসারি হয়ে দাঁড়ালো, কাস্তে মাটিতে ফেলে রেখে তারাও হাতে লাঠি নিলো। ছিদাম আর মুঙলা রামচন্দ্রকে বাধা দেওয়ার জন্য কী বলতে গেলো ; কিন্তু তার আগে রামচন্দ্র খেতের মাঝখানে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে, হিংস্রতায় তার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, ক্রোধে তার পিঠ, বুক ও পাশের পেশীগুলি ছিঁড়ে যাবার মতো টানটান।

পিছন থেকে রজব আলি ফিসফিস করে বলে দিলো-'রাগ কমান মোগুল, গা ঢিল দেন ; লাঠি চলবি নে না হয়'।

ওপাশের জঙ্গলের পিছন থেকে চৈতন্য সাহা কী যেন বললো। একজন বাঙাল কান পেতে শুনলো, তারপর সব বাঙাল পুকুরের পারে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে হুলাহুলি করে বললো—'আমরা ধান কাটার নাইগা আসছি, মারপিট আমরাও জানি, আজ তা কয়ে গেলাম'।

বাঙালরা চলে গেলে রামচন্দ্রর দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সে জলকাদায় মেশানো ধানের মধ্যে বসে পড়লো। তার বুকপাট তখনো সাপের ফণার মতো বারংবার আকুঞ্চিত ও বিস্ফারিত হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা ঘিরে দাঁড়ালো রামচন্দ্রকে, ছিদাম আর মুঙলা রামচন্দ্রর সম্মুখে কাদার উপরে বসে পড়লো। একজন স্ত্রীলোকও এসে দাঁড়িয়েছিলো ভিড়ের মধ্যে। খাটো হলদে শাড়ি পরা, আঁটসাঁট দেহ, চুলগুলো খুব টেনে বাঁধা, বড়ো বড়ো চোখ। চাষীদের যদি ভাষাজ্ঞান থাকতো, বলতো, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি উপাসনার মতো কতকটা। সে শ্রীকৃষ্টর বৈষ্ণবী পদ্ম।

রজব আলি এতক্ষণ একবার খেতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, একবার পিছিয়ে যাচ্ছিলো, এবার সে রামচন্দ্রর পাশে বসে দুই হাঁটুর উপর দিয়ে হাত দুটি ধানের দিকে অগ্রসর করে দিয়ে খুঁতখুঁত করে হাসতে লাগলো।

ছিদাম বললো, 'কেন্ জেঠা, ধান কাটি'?

রামচন্দ্রর হয়ে মুঙলা বললো, 'এবেলা না হয়, ওবেলা কাটাবো। ভাইসব, তোমরা সকলে আসবা। আমার সখার এই ধানে ভোজ হবি, আকাশে ছিটায়ে ছড়ায়ে দেবো'।

কিন্তু রামচন্দ্র মাথা দোলালো। গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে মনটাকে স্ববশে এনে সে কথা বললো, 'ধানে হাত দিবা না, ও ধান তোমার না'।

'তবে'?

'আগে বিচার করো, রাজার কাছে যাও, তার কথা শোনো। যদি রাজা বলে, ধান তুলবা'।

'রাজা তো এখন শহরে। উকিল দিয়ে মামলা করে তার কথা শুনতে চারমাস ; ততদিনে ধান মাটিতে পড়ে নতুন করে গাছ হবি'। হরিশ বললো কথাটা।

'গাঁয়ের রাজা সান্যাল আছে, তাদের কাছে যাও'।

'তোমার সে রাজা মহাজনের পক্ষ, মিহির সান্যাল খাইখালাসি কারবার করে'।

রামচন্দ্র একটু থামলো, তারপর কথাটা বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বললো, 'যে খাজনা খায় তাকে রাজার কাজও করতে হবি। রাজা মহাজন এদের তো কওয়া হয় নাই আমরা দেনা খাজনার দায়িক হবো না। না কয়ে-বলে দেনা খাজনা বন্ধ করবের পারবো না ভাই। যা করবো জানায়ে শুনায়ে'।

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। মুঙলা ছিদাম ও অন্যান্য সকলকে বিস্মিত করে সে বললো, 'আমি এই কাদা গায়ে সান্যালমোশাইয়ের কাছে যাতেছি, তিনি মহাজনের বিপক্ষে আছুয় দেয় কিনা দেখবো'।

রামচন্দ্র খেত পার হয়ে সান্যালবাড়ির পথ ধরলো।

পদ্মর মনে হলো, কী ভীরু, কী ভীরু।

কিন্তু সেটা শেষ কথা নয়। আদর্শটা কী করে তৈরি হয় বলা শক্ত। মেয়েদের বেলায় বোধ হয় নিজের বাবাই আদর্শবীজ। বাবাব মতো এমন শক্তিশালী কেউ নেই, বাল্যের এই বোধ পুরুষদের আদর্শের মূলে চিরকালের জন্য থেকে যায়। নিজের ভাইরা, নিকট পুরুষ-আত্মীয়রা এই আদর্শের পুষ্টি করে, এবং পরবর্তী জীবনে অপরিচিত যে পুরুষকে মেয়েটি গ্রহণ করে প্রথম ভাবালুতা কেটে যাওয়ার পর সেই পুরুষ তত বেশি নিকটে আসে যতখানি মেয়েটির পূর্ব-পরিচিত আত্মীয়পুরুষগুলির সঙ্গে তার চরিত্রগত ঐক্য আছে। পদ্মর কল্পনায় এমন একটি পুরুষ কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এটা সে এর আগে কোনোদিন অনুভব করেনি, এখনো তার চিন্তায় এ কথাগুলি ভেসে উঠলো না। এমন কালো তেল-চুঁইয়ে-পড়া রং, এমন পেশীবহুলতা, এমন ভারভারিক্কি গোঁফ, এমন পাকাকাঁচায় মেশানো একরাশ চুল মাথায়—পদ্মর অনুভবে অপূর্ব একটি একাত্মবোধ ফুটে উঠলো। নিজের মনের সঙ্গে সে সওয়াল জবাবে নামলো—না, ভীরু নয়, ভীরু নয়। পাঁচ-ছ'জন বাঙাল চাষীর সম্মুখে—তারাও নিরস্ত্র নয়, লাঠি হেঁসো ছিলো—যে হাঁক দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় সে ভীরু নয়।

সংবাদটা গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেলো। খাইখালাসি আর বন্ধকী, বর্গাদারী, কিংবা পত্তনি হঠাৎ যেন তার প্রতি দুর্ভিক্ষের আগেকার দিনগুলির মতো মমত্ব বোধ করলো চাষীরা।

সন্ধ্যার পরে চাষীরা শুনলো রামশিঙা বাজছে, খোলে ঘা পড়ছে, ঢোলকে আখর ফুটছে—

চিতিসাপ চাঁদ শাহে লাগলো বিসম্বাদ
শোনো শোনো দেশবাসী তাহার সম্বাদ
—চাঁদ হেন্তাল হাতে নিলো।

তখন দুপুরবেলা, মানুষের স্নান-আহাবের সময় ; কাদা মাখা, অস্নাত, অভুক্ত একটি লোক আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখা করতে, এই সংবাদ পেয়েছিলেন সান্যালমশাই। শহরে যাদের দবোয়ান থাকে তাদের তুলনায় দরোয়ান বরকন্দাজের সংখ্যা তাঁর বাড়িতে বেশি, কিন্তু দরোয়ানের মুখে কথা দিয়ে লোককে ফিবিয়ে দেওয়ার অভ্যাস তাঁর নেই ; কেন নেই, সেটা অন্য কথা। সরাসরি অন্দরেব আঙিনায় আসবাব জন্য রামচন্দ্রর উপর সান্যালমশাই যৎপরোনাস্তি বিবক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তবু তাঁকে সামনে গিয়ে দাঁড়তে হয়েছিলো।

সান্যালমশাই সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই রামচন্দ্র নিচু হয়ে বসে সেকালের কায়দায় তার হাতের লাঠিটা তাঁর পাযের কাছে রাখলো।

'আছুয় চাই, আজ্ঞা'।

'কী করেছো'?

'অন্যাই কবছি, আছুয় দেন, কবুল আপনার কাছে'।

'কী আশ্চর্য, বামচন্দ্র! তুমি অন্যায় কববে, আর তাব প্রশ্রয় আমি দেবো, এমন আশা তুমি কোরো না ; মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা কবে থাকো তার ব্যবস্থা আদালতে হবে। তুমি কি আমাকে ফৌজদাবিতেও জড়াতে চাও'! সান্যালমশাই বিরক্ত হলেন।

'না, আজ্ঞা। গড় ছিরিখণ্ড এটা, তাব জমিতে দাঁড়ায়ে আপনার কাছে কথা কতেছি। নীলকব সাহেব আমাদের জেরবার করছিলো, আজ্ঞা ; আমাদের বাপ সান্যাল গুলি করে মারলো নীলকর সাহেবেক। ফৌজদারিতে কি হয়? পুলিস ক'লে ডাকাতি। আমবা জানি, হুজুর, দু-বিঘে জমির জন্যে অমন রাগ হয় না সান্যালদের। অনেক অপমান ছিরিখণ্ডের লোকরা সহ্য করছিলো, সেই সকলের রাগ ফাটে পড়লো ঐ দু বিঘে জমির ছুতা করে। লিন্ডোলসাহেব পাটের মহাজন ছিলো, তাক উচ্ছেদ করছিলেন স্বয়ং, আজ্ঞা'।

রামচন্দ্র যাই বলুক, কথা বলার সময়ে তার চোখ দুটির যে পরিবর্তন হতে থাকে সেটা চোখে পড়লে তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কিছু থাকে না।

রামচন্দ্র ব্যাপারটা বর্ণনা করলো। চৈতন্য সাহার খাইখালাসি বন্দোবস্ত, চাষীদের বিপদ, ছিদামের ছেলেমানুষি ইত্যাদি বর্ণনা করে অবশেষে সে বললে, 'ও জমিও আমার না, ও ধান বোনার একপয়সা দামও আমি দিই না, আজ্ঞা। কিন্তুক ছাওয়ালদের কৌশলে জড়ায়ে পড়লাম'।

রামচন্দ্র বিস্মিত হলো, সান্যালমশাইও আশ্চর্য হয়ে পাশের দিকে চাইলেন। রূপনারায়ণ কখন এসে দাঁড়িয়েছে এরা কেউ লক্ষ্য করেনি, শুধু রূপু নয়, রূপুর পাশে সুমিতি।

রূপু বললে, 'তুমি কিছু অন্যায় করোনি রামচন্দ্র, লোকের দুর্বলতাব সুযোগ নিয়ে যারা তাদের আরো বিপদে জডাতে চায় তারা সভ্য সমাজে বাস করাব উপযুক্ত নয়। তুমি কিছুমাত্র অন্যায় করোনি, এটাই বুঝবার চেষ্টা করো'।

রূপু থেমে গেলো। বোধ হয় আর কথা খুঁজে পেলো না। সে আর দাঁড়ালো না। একটা মৃদু সুঘ্রাণ ও সুমিতির অলংকারের মৃদু শিঞ্জন রইলো।

রামচন্দ্রকে যা বলবেন ভেবেছিলেন সেটা ঠিক হবে না রূপুর কথার পরে, রূপুকে যেন তাতে হীনমান করা হবে—এই মনে হলো সান্যালমশাইয়ের। তিনি বললেন, 'আচ্ছা বামচন্দ্র, তুমি যাও, খবর নিচ্ছি'।

দ্বিপ্রহরের নিদ্রার পরে সান্যালমশাইয়ের মনে পড়লো এই কথাগুলি। রামচন্দ্র কথা বলার সময়ে ছিরিখণ্ড কথাটা বলেছিলো। কথাটা শ্রীখণ্ড, এখন ভাষার বিবর্তনে চিকন্দি, জমিদারির কাগজপত্রে চিকনডিহি। আশপাশের আর দশখানি গ্রামের সঙ্গে চিকন্দির কী পার্থক্য আছে এটা এখন খুঁজে-খুঁজে বার করতে হয়। রায়দের বাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপরে যে-জঙ্গল সেদিকে অতিপ্রয়োজনেও কেউ যায়

না ; আর আছে সান্যালদের এই বাড়ি ; কিন্তু এ বাড়ির ঐতিহাসিকতা বড়ো জোর দেড়শ বছরের এবং সে-ইতিহাসের সঙ্গে কোনো গড়েরই কোনো সম্বন্ধ নেই।

তবু কারো কারো মনে চিকন্দি এখনো গড় শ্রীখণ্ড। রামচন্দ্র যেন সেটাই এইমাত্র প্রমাণ করে গেলো।

আর লক্ষ্য করো কী কৌতুকের বিষয় এটা হতে পারে। রামচন্দ্র তাঁকেও যেন অতীতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। এরকম লোকের সাক্ষাৎ মাঝে-মাঝে পাওয়া যায় যারা বর্তমান পৃথিবীতে বাস করে কিন্তু অতীতের অদৃশ্য এক আবরণও যেন থাকে তাদের। কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। সদানন্দ বলেছিলো : তাদের কলেজের এক অধ্যাপক সারাজীবন ছেলেদের ক্রিকেট খেলতে অনুপ্রাণিত করে পেন্সান নিয়ে কাশীতে যান। সহসা একদিন তিনি পেনশন নেওয়া বন্ধ করে দিলেন, কাশীতে এখন তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসী হয়ে আছেন। ভিক্ষালব্ধ খুদই তাঁর আহার্য। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নৈমিষারণ্যের আবহাওয়া সর্বাঙ্গে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন যে ব্যাপারটাকে লঘু করে ভাবতেও সংকোচ হয়। এমনি অতীতপ্রয়াসী মন রামচন্দ্রর, এবং তার প্রয়াসেও যেন একটুকু ছলনা নেই।

সে যাই হোক, মূল ব্যাপারটার সঙ্গে ছেলেমানুষির যোগ আছে, এবং সেটা রামচন্দ্রও বলে গেছে। চৈতন্য সাহাকে বিষয়টির এদিকটাতেই নজর দিতে বলবেন, এবং ছেলেমানুষি ব্যাপারটাকে মামলা-মোকদ্দমার পর্যায়ে নেবার চেষ্টা করার জন্য রামচন্দ্র চৈতন্য উভয়কেই তিরস্কার করবেন, এই স্থির করলেন তিনি।

এমন সময়ে নায়েব এলো।

'কী সমাচার'? প্রফুল্লমুখে আলাপের সূত্রপাত করলেন সান্যালমশাই।

'আজ্ঞে, আপনাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। চৈতন্য সাহার খাজনার হিসাব নিচ্ছি'।

'তার খাজনা কি খুব বেশি বাকি? তেমন তো মনে হয় না'।

'আজ্ঞে না, সে নাকি এ অঞ্চলের বহু প্রজার জমি খাইখালাসি বন্দোবস্ত নিয়েছে, যার খবর আমরা পাইনি। খবর নিতে হচ্ছে সেটা গত অষ্টমের আগেও বহাল ছিলো কিনা'।

'এমন গর-ঠিকানা ব্যাপার তো তোমার কাছারিতে হয় না'।

'ঠিক তা তো নয়। দুর্ভিক্ষের জন্য নিজ গ্রামের প্রজাদের খাজনা আদায়ে একটু ঢিলে দেওয়া হয়েছিলো। এখন যেন মনে হচ্ছে চৈতন্য ঠকিয়েছে। সে যদি খাইখালাসি বন্দোবস্ত কবে থাকে তবে খাজনাটাও তারই দিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। ছোটোবাবু এই কথাই বলেছেন। সে তো দুর্ভিক্ষের ফৌত প্রজা নয়'।

'ছোটোবাবু আজকাল দপ্তরে আসছেন নাকি'?

নায়েব পুলকিত হয়ে বললো, 'কোনোদিনই আসেন না। আজ দুপুরে প্রথম এসেই দপ্তরের এই গাফিলতি ধরে ফেলেছেন'।

রূপনারায়ণ কাছাকাছি ছিলো। হুকুমটা এই প্রথম দিয়েছে সে। সান্যালমশাই ডাকলেন, 'এসো ছোটোবাবু, এসো। নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিলো'।

'নায়েবমশাইকে আমি একটা কাজের কথা বলেছি, শুনেছেন'?

'শুনলাম, কিন্তু হঠাৎ এমন কড়া হলে কেন'?

'দুষ্ট প্রজাকে শাসন করা দরকার'।

সান্যালমশাই কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, 'তা ভালো, হঠাৎ কিনা'।

'হঠাৎই হলো। রামচন্দ্র চলে যাওয়ার পরে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে শুনলাম সব। চৈতন্য সাহাকে শাসন করা দরকার। সে যে-ব্যবস্থা করেছে তাতে খাইখালাসি বলুন কিংবা বন্ধকী বলুন, চাষীরা কোনোদিনই আর তাদের জমি ফিরে পাবে না'।

সান্যালমশাইয়ের হতে গড়গড়ার নলটা দুলতে লাগলো। রূপু বললো, 'এর আর-একটা দিক আছে। বেশির ভাগ চাষী চৈতন্য সাহার কাছে বন্ধক দেওয়া জমিতে চাষ দিতে অনিচ্ছুক। চৈতন্য সাহার এমন ক্ষমতা নেই নিজে সে জমি চাষ করে, তার ফলে সারা গ্রামের আধখানা খেতে ফসল উঠবে না। আহার্য দুর্মূল্য হবে, চাষী সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বউদি বলছিলেন'।

'কিন্তু তাহলেও চৈতন্য সাহাকে খাজনার তাগিদ দিয়ে কী হবে'?

ফলটা ঠিক কী হতে পারে তা ভেবে দেখেনি রূপনারায়ণ, ফ্রেজার সাহেবের কাহিনী শুনে তার স্থলভূত চৈতন্য সাহাকে তাগিদ দেওয়ার কথা মনে হয়েছিলো। সে কথাটাই বললো সে।

'ফ্রেজারকে একবার তাগিদ দেওয়া হয়েছিলো, মাস্টারমশাই বলছিলেন কয়েকদিন আগে'।

'কাকে, ফ্রেজারকে? তার কথা তুমি কী জানো'?

সান্যালমশাই বিস্মিত হলেন, যত না ফ্রেজারের নাম শুনে তার চাইতে বেশি ফ্রেজারের সঙ্গে চৈতন্য সাহার তুলনায়। ছেলের মনে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে; শুধু বইয়ের পাতায় লেখা ঘটনা নয়, শুধুমাত্র আলাপ আলোচনার ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত জীবনে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যার মূলে থাকে বিদ্বেষ। তেমনি একটি ঘটনা ফ্রেজার নীলকরের। রামচন্দ্রও বলেছিলো বটে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে নীলকর ফ্রেজার সান্যালদের প্রজাদের অনেক জমি দখল করেছিলো, তারপর লাগে ছোটোখাটো বিবাদ। ফ্রেজারকে অবশেষে একদিন তার বাংলোয় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিলো, তখনো নাকি তার হাতে বন্দুক ধরা ছিলো। কিন্তু এই বিদ্বেষ প্রকাশের বয়স নয় রূপুর। অন্তত ছেলে মানুষ করার যে বিশিষ্ট পরিকল্পনা তাঁর আছে, তার সঙ্গে রূপুর এই বিদ্বেষপরায়ণতা মেলে না। কথাটা সদানন্দকেও বলা দরকার। তিনি ঠিক করলেন, বলবেন . লেখাপড়া শেষ হওয়ার আগে এমন সব কাজে যেন হাত না-দেয় রূপু।

কিন্তু আর-একটি দিকও আছে। রূপুর এই ব্যাপারটায় খুশি হওয়ার মতো কিছু-কিছু যেন পেলেন তিনি। এই তো সেদিনও রূপু সবগুলো যুক্তবর্ণের পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ করতে পারতো না। তার আজকের কথাগুলো শুধু পরিচ্ছন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে তা নয়, চিন্তা করে ধীরে ধীরে বিশিষ্ট একটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য বলেছে সে কথাগুলি। তার গলার স্বরে তার মায়ের কণ্ঠের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখনো তত নিটোল এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি, একটু যেন খনখন করে ওঠে, কিন্তু স্বরটি যে মায়ের তা বোঝা যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে আজই অনুভব করলেন সান্যালমশাই এবং উপভোগও করলেন। গভীরতার দিক দিয়ে এ উপলব্ধিটা যেন দৈনন্দিন লিপিকায় আন্ডারলাইন করা কিছু।

সন্ধ্যার পর অনসূয়া বললেন, 'শরীর বা মনের কিছু একটা তোমার খারাপ হয়েছে'।

'অশান্তি বোধ করছি। গ্রামের চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ, সেটাকে তোমার ছেলে টেনে আনছে বাড়িতে। ছোটোছেলে রূপুও'।

সান্যালমশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে অনসূয়া বিব্রত বোধ করলেন। নিজেকেই অশান্তির মূলস্বরূপ বলে মনে হলো। সান্যালমশাই বড়োছেলের দেওয়া আঘাতটা সহ্য করেছেন বলেই আরো বেশি তাঁকে সহ্য করতে বলা যায় না।

সমস্যার সমাধান হিসাবে অনসূয়ার মনে হলো রূপুকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও যাওয়া যায়, কিন্তু তিনি তাঁর কোনো কাজকেই সমস্যার সমাধান হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন। রূপুকে যদি কিছুদিনের জন্য গ্রামের বাইরে রাখতে হয়, তাহলে তাকে বুঝতে দেওয়া চলবে না সে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে বলেই তাকে অন্যত্র যেতে হলো। এই কুণ্ঠা থেকে তিনি সমাধানটা চিন্তা করে রাখলেন কিন্তু স্বামীর সম্মুখেও প্রকাশ করলেন না। বরং বললেন, 'রূপুকে বোলো ব্যাপারটা তুমিই হাতে নিয়েছো, তাহলে ও নিশ্চয়ই নিরস্ত হবে'।

কিন্তু সান্যালমশাইয়ের চোখের প্রান্তে-প্রান্তে ত্বক কুঞ্চিত হলো। কঠিনতম ব্যাপারগুলি নিয়ে

আলোচনা করতে-করতেও এমন হয়। তখন তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর মুখের কথার অর্থ বোঝা কঠিন হয় ; রহস্যের সুর লাগে কথায়, রহস্য হিসাবে গ্রহণ করাও যায় না।

সান্যালমশাই বললেন, 'এমনি ভাগ্য বটে আমার। ছেলের কাঁচাহাতে জমিদারির যে-প্যাঁচগুলো খেলছে না, সেগুলো আমার হাতে দেখতে চাও'?

অনসূয়া সান্যালমশাইয়ের মুখের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন, কাজেই তাঁর কানে এই কথাগুলি খানিকটা রহস্যের আভাস দিলো। সহসা উত্তর দিলেন না তিনি। এই অবসরে খাসভৃত্য এসে তামাক দিয়ে গেলো ; একগোছা বিলেতি কাগজের সাপ্তাহিক সঞ্চয় সে সঙ্গে এনেছিলো। এগুলি সদানন্দ মাস্টারের হাত ঘুরে এসেছে। পড়ার মতো খবর ও আলোচনাগুলি সে চিহ্নিত করে দিয়েছে। তার একান্ত-সচিবত্বের এইটুকুই বর্তমানে কর্তব্য বলে নির্ণীত আছে।

ভৃত্য চলে গেলে অনসূয়া বললেন, 'অনেকদিন পরে একটা কথা মনে পড়ে গেলো'।

একসময় ছিলো যখন অনসূয়া তাঁর এবং সান্যালের মধ্যে একটা ব্যবধান লক্ষ্য করতেন এবং কল্পনায় সেটাকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হতো। সে সব দিন এখন নেই, এই সাপ্তাহিক খবর ও আলোচনার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই এখন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মতো মূল্যবান নয়। সেজন্য এই সাপ্তাহিক কাগজের গোছা দেখলে অনেকসময়ে অনসূয়ার পুরনো কথা মনে পড়ে।

অনসূয়া বললেন, 'এককালে তোমার যখন গুরুদেব ছিলো, তখন আমারই হয়েছিল সবচাইতে বেশি বিপদ'।

'কালু খাঁ সরোদিয়ার কথা বলছো'?

'বোধ হয়, ঐরকমই নাম ছিলো'।

'কেন বলো তো? তিনি কি আবার চিঠি দিয়েছেন? তাঁর মাসোহারাটা কি ঠিকমতো যাচ্ছে না'?

'না, আমার কষ্টটাই বৃথা গেলো'।

'তা বটে, তা বটে। একদিন আবার দেখতে হয়'।

সংগীতকলা সম্বন্ধে কিছুকাল স্মৃতি আলোচনা করে অনসূয়া সংসারের তদারক করতে বার হলেন। সান্যালমশাই কালু খাঁর কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

একটা সমস্যার চারিদিকে সমাধানের আবরণ দিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাই যদি হয় এটা অনসূয়ার, তবে তিনি খানিকটা সফল হলেন বলতে হবে।

১২

চৈতন্য সাহা বিপদ দেখতে পেলো। তার পথেঘাটে চলা কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু নিজের গ্রামে নয়, আশেপাশের দু'পাঁচখানা গ্রামেও তাকে দেখলে ছেলেরা হো-হো করে করে হাসে, বড়োরাও সে-হাসিতে পরোক্ষে যোগ দেয়, দু'এক জায়গায় অভিযোগ করতে গিয়ে ফল উল্টো হয়েছে।

সকালে উঠে রামচন্দ্রর সঙ্গে জড়িত বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেলো। তার প্রথম ইচ্ছা হয়েছিলো দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে যে-ঘরে দলিল আছে, আর দুষ্প্রাপ্য পণ্যগুলি। ভয় কমলে নিজের পাড়ার দু'একজনের সঙ্গে কথাও হয়েছিলো, তাদের একজন পুলিসকে খবর দিতে বলেছিলো। এ প্রস্তাবে সহসা সে রাজী হতে পারেনি। তার বাবার সময়ে জমি-জিরাতের ব্যাপার নিয়ে এমন লাঠি ধরেছে কেউ-কেউ, তাদের দরুন পুলিসে খবর দেয়নি মহাজনপক্ষ। আছে, অস্ত্র আছে, যাকে মহাজনি চাল বলে।

চৈতন্য সাহার একজন কর্মচারী দা দিয়ে কুচনো তামাকে চিটেগুড় মিশিয়ে বিষ্ণুপুর বালাখানা লেখা একটি টিনে তুলেছিলো, তার উপর লক্ষ্য রাখতে রাখতে চৈতন্য সাহা চিন্তা করছিলো এমন সময়ে সে

তহসিলদারের মুখ দেখতে পেলো। বয়স্ক কোনো তহসিলদার নয়, কাল পর্যন্ত মুণ্ডলাদের দলে খেলেছে এমন এক ছোকরা। তবু সঙ্গে তার তক্‌মা-আঁটা পাইক দেখে সসম্ভ্রমে তাকে বসতে দিয়ে সে বললো, 'দ্যাখেন ভাই, সবই আমার লোকসান। খাজনা দিবো কি, এক পয়সা লাভ হয় নাই। যখন ওরা না-খায়ে মরে তখন খাবার জন্যি টাকা দিলাম, তার শোধ নিলো ভগোবান। এমন নিমকহারাম ভগোবান, জমি চষলো না ওরা'।

'খাইখালাসি জমি চষবি এমন বাধ্যবাধকতা নাই'।

'তাও গত সন আগাম মজুরি নিয়ে চাষ করলিও করছিলো, এ সন জমি ছুঁলো না'।

'গত সনে ওরা ঠক্‌ছিলো'।

চৈতন্য সাহা মাথা নেড়ে বললো, 'ইছ্‌-ইছ্‌। আমাক ঠকালো। যে-জমিতে দশ মণ আমন উঠতো, উঠলো ওঁকরা। বেলা ডোবার দিকে চায়ে-চায়ে দিন কাটাইছে'।

'কিন্তুক, লাভ হোক, লোকসান হোক, খাজনা দেওয়ার দায় আপনার। আপনার খাইখালাসির লিস্টি আনেন, আমার জমার বই রেডি। টাকা এখন না-দেন, হিসাব হোক ; বৈকালে আসে টাকা নেবোনে। আর না-হয় দলিল দেখান, চাষীরা খাজনার দায়িক কিনা দেখি'।

'অস্‌-অস্‌, দু'এক মাস সবুর করলি হয় না'। চৈতন্য সাহার মুখের সম্মুখভাগে একটামাত্র হলুদ রঙের দাঁত অবশিষ্ট ছিলো। সেটাকে সে ঘন ঘন চুষতে লাগলো।

তহসিলদারের সম্ভবত ব্যক্তিগত কিছু অপ্রীতি ছিলো, সে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েই বললো, 'লিস্টি ধরেন, লিস্টি। কত বিঘে জমি রাখছেন খাইখালাসিতে'?

'একশো কি পাঁচশো। সে যৎসামাইন্ন'।

'তাহলি বছরে আড়াই হাজার নিরিখে কম করেও পাঁচ হাজার। কী ভয়ঙ্কর, আমার চাকরিটাই যাবি। আর নজর, নজরের কী ব্যবস্থা? আমাদের তহুরির'?

'আজ্ঞে, খাইখালাসিতে নজর তহুরি কীসের'?

'সাজিমশাই, মরা জিনিসের কারবার করেন, তাজা জিনিসের মর্ম কী বুঝবেন। জমি হতেছে তরতাজা। তহুরির ব্যবস্থা না করলি আমরা শোনবো কেন? এ মরা জিনিসের কারবার না'।

'বার বার মরা জিনিস কী কন? আপনি কি চাষীদের মতন মনে করেন আমি হাড় চালান দেই'?

তহসিলদারের হাসি পেলো। মুণ্ডলার গান সেও শুনেছে, কিন্তু আদায় তহসিল করতে এসে হাসাহাসি করা যায় না। সে বললো, 'তা ধরেন যে, আলকাতরাও তো মরা জিনিস। আর দেরি করেন না'।

'একটুক চিন্তা করার সময় দেন'।

'সময় সময় করে আর সময় কাটায়েন না। ছোটোবাবুর কড়া হুকুম : তিনদিনের মাথায় সব খাজনা শোধ, না হলি কোর্ট কাছারি হবি'।

'ছোটোবাবু? ঐটুক গ্যাদা ছাওয়াল'?

'তোমার আমার ছাওয়াল না, সাজিমশাই। খোদ নায়েবেক হুকুম করছেন—প্রজা হয়ে দেখা করে না, কত বড়ো সে মহাজন, আমি দেখবো। অবশ্য খাজনা না দেন লোকসান নাই, লাভ আছে'।

তহসিলদার চলে গেলে চৈতন্য সাহা শূন্য দেখলো পৃথিবী। তহসিলদার নতুন কিছু বলেনি ভাবা যেতো, যদি সে খাজনা আদায়ের উপরেই জোর দিতো। কিন্তু সে বলে গেছে, খাজনা না দিলেই সুবিধা, আসলে ওরা মামলা করতেই চায়।

চিন্তা করতে গিয়ে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তার সবটুকু রাগ গিয়ে পড়লো রামচন্দ্র, তার জামাই মুণ্ডলা আর তার সঙ্গীদের উপরে। না-খাওয়ার দিনে ধান দিলাম, টাকা দিলাম, তার এই শোধ, না? অন্য দেশ থেকে কৃষক এনেছি তাদের উপরেও জুলুমবাজি। বেআইনি কাজ করে তার উপরে লাঠিবাজি। ঐ রামচন্দ্র বেটাকে পুলিসে দেবো। একটা গারদে গেলে আর সব কটা শায়েস্তা হয়।

রাগের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে সে কনকদারোগার থানার দিকে ছুটলো।

থানায় এজাহার দিয়ে সে গ্রামের দিকে ফিরছিলো। সকাল থেকে, এখন প্রায় সন্ধ্যা পার হলো, একই ব্যাপার নিয়ে নানা রকম ভেবেছে সে। এখন রাগটা পড়ে আসছে, থানায় এজাহার দেওয়ার পরিণতিও যে একটা মামলা তা সে বুঝতে পারছে। সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন। তাদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হলো ভালো মজবুত সাক্ষী দিতে হবে। নিজ গ্রামের লোকদের দিয়ে ভরসা নেই। গ্রামের বাইরে তার টাকা লেনদেনের ব্যাপারে যাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তারা হচ্ছে চরণকাশির আলেফ সেখ ও সানিকদিয়ারের হাজিসাহেবের ছেলে। এদের বলে রাখা দরকার। ধানের কারবারে সে বছর এরা সহায়তা করেছিলো।

কখন চরণকাশিতে এসে পড়েছে তা সে খেয়াল করেনি। একসময়ে সে দেখলে সে মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর পরই আলো হয়েছে। সেই আলোতে শুকনো খটখটে বন্ধ্যা মাঠ চারিদিকে ছড়ানো। তার মনে হলো এগুলিও তার কাছে বন্ধক রাখা জমি, নতুবা চাষের জমি কেন এমন পড়ে থাকবে। আর এরই জন্য কিনা জমিদার খাজনা চায়! লোকসান, লোকসান, কী আহাম্মুখি হয়েছে এই জমি রেখে! নিজেকে বিদ্রূপ করে সে বললো, 'দিগরের সব ধান ঘরে উঠবি, ধানের রাজা হবা? হবা না'?

সম্মুখে কে যেন ছাতি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, সন্ধ্যার পর তার ছাতি মাথায় দেওয়ার মতো বিশিষ্ট ব্যাপারটাও লক্ষ্যে আনতে পারলো না চৈতন্য। সে বললো, 'এও বুঝি, এ সবই বুঝি চৈতন্য সার খাইখালাসি'?

ছাতিমাথায়, সবজে রঙের আচকান জাতীয় পোশাক পবা লোকটির মুখ দেখা গেলো না; এক বুক শাদা দাড়ি দেখা গেলো, 'কী কন! চৈতন্য সার খাইখালাসি'?

লোকটি চৈতন্য সাহার চারিপাশে একটি অদৃশ্য বৃত্ত রচনা করে ঘুরে এলো ধীরে ধীরে।

'কী কলেন? এর নাম চরণকাশি। কে জাগে?—না, আলেফ সেখ। আপনে? তা বেশ গান বাঁধেছে ওরা। চিতিসা—চিত্তিসাপ, আমন ধানের বিষ'।

লোকটি সুর করে গান ধরলো। যেন ঘুরে ঘুরে নাচবেও।

চৈতন্য সাহা আর দাঁড়ালো না। এই তার সাক্ষী, এই তার সম্ভাব্য সহায়! রাগ করতে গিয়ে কান্না পেলো তার। ছুটো পালানোর ভঙ্গিতে সে চরণকাশির আলেফ সেখকে ছাড়িয়ে এলো।

আলেফ সেখ গদগদ করে হেসে উঠলো।

দু দিন গুম মেরে থেকে আর এক সন্ধ্যার পর সে বেরুলো তখন সে অন্য মানুষ। রামচন্দ্রর পাড়ায় যেতে তার সাহস হলো না। নিজের বাড়ির কাছাকাছি যেসব চাষী ছিলো, তাদের দু'একজনের কাছে গেলো।

'শুনছ না? তোমরাও গেলে, আমিও গেলাম। জমিদার বাকি খাজনার নালিশ করবি। জমি তো সবই খাস হবি'।

'কন কী'?

'তাই হলো। তোমরা চাষ করলা না। কত কলাম, বাবা সোনা, মজুরি নেও, জমিতে চাষ দেও। যদি বা দিলা চাষ, সে ঠুগবুগ। ফসল উঠলো উনা। কিন্তু এখন, এখন আমি খাজনা শোধবো কেন্'?

'আমরা খাজনা দিবো আর আপনি জমি খাতে থাকবেন, এমন কাগজ করা হয় নাই'।

'আমি খাজনা দিবার পারি কনে? খেতের ফসল উঠবের চায় না ঘরে, রামচন্দ্র লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে। টাকা আমার অমনি গেছে—মিছামিছা আর জমিদারের খাজনা শুধি কেন। দুই সনে জমিদারের পাওনা—পাঁচ হাজার'।

কথাটা কানাঘুষো চলছিলোই, এবার সত্যের রূপ নিয়ে রাষ্ট্র হলো। জমিদার লোক পাঠাচ্ছে সদরে চৈতন্যের নামে বাকি খাজনার মামলা দায়ের করতে। কিছু লোক চৈতন্য সাহার কাছে গেলো, কিছু গেলো

রামচন্দ্রর কাছে। যারা ব্যাপারটির গুরুত্ব বোঝে তারা দিশেহারা হয়ে গেলো। কিন্তু বিশেষ করে ছেলেছোকরার দল তাদের পুরনো যুক্তি আবাব তুললো, 'চৈতন্য সা জমি খাবি? তা খাক না, কত খাবি ঐ একটা দাঁত দিয়ে। জমি খাস হয়, বরগা চায়ে চষবো'।

কিন্তু রামচন্দ্র জানে খাজনা বন্দোবস্ত জমি ও বরগার জমি এক নয়। অনেকক্ষেত্রেরই পিতৃপুরুষের সঞ্চিত পরিশ্রমের ফলে খাজনায় বন্দোবস্ত হয়েছিলো, সে জমি চলে গেলে ভূমিহীন হয়ে বর্গা বন্দোবস্তের জমি নেওয়া এই মাঝবয়সে শৈশবে ফিরে যাওয়া নয় শুধু, পিতৃপিতামহের পরিশ্রমকেও মূল্যহীন করে দেওয়া।

একদিন সকালে রামচন্দ্র ক্লিষ্টমুখে দাওযায় উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। গত সন্ধ্যার কথাগুলি মনে অনেকটা থিতিয়ে গেলেও সমস্যার মতো হয়ে আছে। প্রভাতটা আজ তাকে স্নিগ্ধ করেনি। এখনই হয়তো লোকজন কেউ এসে পড়বে আর সঙ্গে করে আনবে তাদের সমস্যা। কাল সন্ধ্যায় কথাটা জানা গেছে, হালদারপাড়ার আরও ছ'ঘর লোক চলে যাবে। তা প্রায পঞ্চাশটি প্রাণী হবে, ছেলে-বুড়ো ধরে। এদের সঙ্গে রামচন্দ্রর প্রত্যক্ষ জানাশোনা ছিলো না। তাহলেও গ্রামেব লোক, চিকন্দিরই লোক তো বটে। ভক্ত কামার কী পথই দেখালো! রামচন্দ্র জানে হালদার অর্থাৎ জেলেবা একবকমের যাযাবর। পদ্মার মাছেব সঙ্গে তাদের চলাফেরা। পদ্মা যখন চিকন্দির দিকে মাটি ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগলো তখন—এখন থেকে প্রায় দু পুরুষ আগে—জমিতে মন দেয এরা। কিন্তু জাত-চাষী হয়ে উঠতে পারেনি। খেতে খামাবে এমন কিছু বাডবাডন্ত হয়নি। আমসি আর ভাত খেয়ে ঝোড়ো বাদলায় দিনরাত জলে স্যাঁতসেঁতে হাতপা নিয়ে মাছ ধরে টাকা উপায় করে ঘরে ফিরে এসে দু'দিনে সে টাকা ফুরিয়ে হা অন্ন হা অন্ন করতে কবতে জলের দিকে ছোটা এদের রক্তে। খেত-খামাব করার সময়েও তাই কবেছে। কিন্তু শত হলেও গ্রামের লোক, তাদের চলে যাবার কথায় বেদনা বোধ হয়।

কিন্তু যে লোকটি তখনই এলো তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বামচন্দ্র প্রস্তুত ছিলো না। পরিচ্ছন্ন কাপড়জামা পবা একজন প্রৌঢ়।

'আপনে রামচন্দ্র'?

'জে। আপনে'?

'আমি চরণকাশিব আলেফ সেখের ভাই এরফান সেখ'।

রামচন্দ্রর বুকটা ধকধক করছিলো, হযতো-বা থানার লোক ভদ্রবেশে এসেছে। ভয়টা কেটে যেতে সে আগন্তুককে উপলক্ষ্য করে অজস্র হেসে ফেললো। কথা বলার আগে সুচারুরূপে গোঁফের কোণদুটি পাকিয়ে সে বললো, 'আসেন মিঞাসাহেব, এমন সৌভাগ্যি কেন্'!

এরফান বললো, 'বড়োভাই কলে যে, যা এরফান একবার চিকন্দি, সেখানে চাষীরা নাকি জমি-জিরাত ছিটায়ে-ছড়ায়ে দিতেছে'।

'কেন্, তা দেয় কেন্'?

'তারা বলে চলে যাতেছে'?

'আপনেরাও তাই শুনেছেন'?

'হয়, ভাবলাম, খানটুক জমি যদি ধরা যায়'।

রামচন্দ্রর মনে হলো সে বিদ্রূপ করে বলবে—জমি কি পদ্মার ভাসা কাঠ, ধরলিই তোমার হলো। কিন্তু আগন্তুকের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানো হয় বলে সে সংযত হলো, বললো, 'শুনছি ওরা কে-কে যাবি। তা খোঁজ নেন, কিন্তুক সেসব জমি খাইখালাসি-বাঁধা, জব্দ-সামিল'।

এরফান ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বললে, 'খাইখালাসি ছাড়াও তো কিছু কিছু আছে, তাইলে আর আপনার কাছে আসছি কেন'?

ইঙ্গিতটা ধরি-ধরি করেও ধরতে পারলো না রামচন্দ্র, কিন্তু কথাটি যে ইঙ্গিত-প্রাণ তা বুঝতে পেরে

মণ্ডলী কায়দায় বললে, 'আচ্ছা সেরকম যদি খোঁজ পাই কব আপনেক'।

এরফান সেখ কুমোরপাড়ার দিকে চলে গেলো। তখন ইঙ্গিতটার অর্থ ধরা দিলো রামচন্দ্রর কাছে। সে স্বগতোক্তি করলো, 'কেন বে, আমার জমি বুঝি ধরতে আসছিলো'? একটা অপমান বোধ হলো তার।

কোনো কোনো দিন মানুষের জীবনে অভূতপূর্ব বেদনা নিয়ে আসে। সারাদিন ধরে রামচন্দ্র যে ক্লেশটা অনুভব করলো সেটা কোনোভাবেই নির্দিষ্ট করা গেলো না।

দুপুরের ঠিক পরেই হালদারপাড়ার লোকরা চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো। মলিন শীর্ণ কতকগুলি নরনারী শিশু। তাদের যাবতীয় পার্থিব সম্পদ ছোটো ছোটো মলিন কাঁথা ও কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধা। তাদের যাওয়ার পথ রামচন্দ্রর বাড়ির পাশ দিয়ে। একটা কান্নার মতো শব্দ হচ্ছিলো। খবর পেয়ে রামচন্দ্র দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যারা চলে যাচ্ছিলো তারা সকলেই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিলো, যেন সম্মুখের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল।

রামচন্দ্র ছটফট করে ঘর-বার করতে লাগলো। কারণে-অকারণে অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্যগুলিতে তার চোখ গিয়ে পড়লো। আকাশের সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তার বাড়ির সম্মুখে গাছগুলির মাথা দিয়ে ঘেরা আকাশটুকুকে সীমা-সরহদ্দযুক্ত জমির মতোই আপনার বলে বোধ হতে লাগলো।

সন্ধ্যায় আর একজন লোক এলো তার কাছে। এ লোকটি তার পরিচিত। সানিকদিয়ারের হাজিসাহেবের ছেলে ছমির মুন্সি। লোকটির সঙ্গে রামচন্দ্রর আবাল্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে—পাঠশালা থেকে চাষীজীবন পর্যন্ত। দিনকাল যখন এ দেশের ভালো ছিলো, রামচন্দ্র তাই সানিকদিয়ারের কোল ঘেঁষে জমি নেবার চেষ্টা করতো আর ছমির চেষ্টা করতো চিকন্দি অনুপ্রবেশের। এ ব্যাপারটা নিজেদের অজ্ঞাতেই হতো মাঝে মাঝে।

ছমির হাঁক দিয়ে বললো, 'কেন্, রামচন্দ্র আছে'?

'কে, ছমিরভাই না'?

'হয়। বাবাও দেখি'।

'কী মনে করে'?

রামচন্দ্র বারান্দায় এসে ছমিরকে বসতে দিলো।

ছমির রামচন্দ্রর দেওয়া তামাকের কলকেটি নিঃশেষ করে বললো, 'ওপারে কবে যাবা'?

'যাবো একদিন, সেদিন খবর পাবা ; হরিধ্বনি দিবে'।

'আরে, সে পার না ; মিলে কবে যাবা'?

'মিলে? তুমি বুঝি জমির খোঁজে আসছো'?

'তা দ্যাখো, তোমাক কওয়া থাকলো ভাই, যে যা-ই দিক, তার উপর বিঘায় পাঁচ টাকা দাম ধাইর্য থাকলো আমার। তোমার জমিগুলে সোনা। আর কেউ না জানুক আমি জানি'।

জমির প্রশংসায় রামচন্দ্রর মন নরম হলো। ছমিরের জমি কেনার কথায় যে জ্বালা শুরু হয়েছিলো তার কিছুটা প্রশমিত হলো।

রামচন্দ্র বললো, 'তামুক দি'?

ছমির চলে গেলে জমির প্রশংসাসূচক কথা কয়টি খানিকটা সময় রামচন্দ্রর মন জুড়ে রইলো। অনেকদিন জমির দিকে এমন অনুভবটা হয়নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্দম্য ক্ষোভ এলো তার মনে। মুঙলা পাটের সুতলি পাকাচ্ছিলো, তাকে লক্ষ্য করে রামচন্দ্র বললো, 'কেন্ রে, এ কি ভাগাড়, শকুন উড়ে'?

কথাটা বুঝতে না-পেরে মুঙলা মুখ তুললো, ততক্ষণ রামচন্দ্র সরে গেছে।

রাত্রিতে রামচন্দ্রর স্ত্রী বললো, 'কথা কই তোমাক'।

'কও'।

'তুমি কি যাবাই'?

'কী করি কও, বুঝি না। থাকে কী করি, যায়ে কী করি'?

'বৈষ্ণবী আসছিলো কাল, কয় যে তুমি চলে গেলে কার ভরসায় গাঁয়ে থাকবো'।

'হুম'।

'আর কয়, সেখানে মিয়েছেলের লজ্জা-হায়া থাকে না। পচ্ছিমাদের তাড়ি খাওয়া আছে। সেখানে নাকি তুলসী বোনার জায়গা নি। জলে কাদায় থিকথিকে'।

রাত্রিতে ঘুম হলো না রামচন্দ্রর। ওরা যখন প্রস্তাব করেছিলো তখন সে বলিষ্ঠভাবে কিছু বলতে পারেনি—নিজের এই দুর্বলতাকে এখন অতলস্পর্শী বলে মনে হলো তার, আর এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার জন্যে তার মন অর্ধজাগ্রত অবস্থায় আঁকুপাঁকু করতে লাগলো।

এরফান সেখ এবং ছমির মুন্সির কথা মনে হলো। জমি, জমি। বুকের হাড় ভেঙে নিতে চায় ওরা। হায় ভগোমান, হায় ভগোমান! এখন হয়েছে কি, চাষবাস রামচন্দ্রর কাছে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের হেতুমাত্র নয়। জীবনের উদ্দেশ্যও বটে। রোজ তার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আজ হলো।

ধান উঠেছে, নতুন গোলা একটা বাঁধা হয়েছে। তার মেয়ের আবদার রাখার জন্যে সে গোলাটাকে বেতের কারুকার্য দিয়ে সাজিয়েছে। একদিন হাট থেকে ফিরে দেখলো জামাই মুঙলা রং গুলে রাঙাচ্ছে গোলার গায়ের বেতের বাঁধনগুলো। হুকুমটা দিয়েছে এ বাড়ির মেয়ে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

সে কাছেই ছিলো, ছুটে এসে বলেছিলো—কেন্ বাবা, লক্ষ্মীর ঝাঁপির মতন হয় নাই?

—হইছে।

একদিন এই গোলার পাশে বসেই কথা হচ্ছিলো।

মেয়ে বললো—এত ধান দিয়ে কী হবি, বাবা?

—বেচব। রামচন্দ্র বললো।

—বেচলা যেন, তারপর?

—জমি কিনব।

—তারপর কী হবি?

—আরো ধান।

—আরো ধান? তাও যেন বেচবা, তারপর কী করবা?

—আরো জমি নিবো।

মেয়ে হেসে বললো—সব জমি নেওয়া হলি, তারপব?

এবার রামচন্দ্র ভাবলো। একটু ভেবে বললো—মনে কয় চরে খানটুক জমি নিবো। মুঙলা দড়ি পাকাচ্ছিলো লাটাইয়ে, সে বললো হাসিহাসি মুখে—তারপর আবার ধান। রামচন্দ্র কলকেতে তামাক ভরতে ভরতে বলেছিলো—সে ধান তুমি তুলবা, বাপ। আমি তখন কাশী যাবো।

চাষের কথায় এমন দৃশ্য মনে পড়ে যায়। মেয়েটা মনের অন্ধকারে একলা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। যেন সেই নিঃসঙ্গতায় ভয় পেয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চাপা গলায় বাবা বাবা বলে ডাকে। রামচন্দ্রর মনের আধখানা সব সময়েই তাকে সঙ্গ দিতে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রাত্যহিক দিনের চাষবাস করতে নামলে যেন তাকে অশ্রদ্ধা করা হবে।

রামচন্দ্রর দু চোখে উষ্ণ জল লবণাক্ত হয়ে উঠলো।

'—অহহ, কী করবো। কী করি'।

পরদিন সকালে দেখা গেলো রামচন্দ্র লাঙল কাঁধে নিয়ে বার হয়েছে ; একটা বলদ ও একটা বুড়ি গাইকে মুঙলা বাঁচিয়ে রেখেছিলো, সে-দুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে সে খেতের দিকে যাচ্ছে।

কিছুদূর যাবার পর লজ্জায় যেন তার মাথাটা নুয়ে আসতে লাগলো। কী বলবে লোকে? গ্রামের সব মাঠ যখন আগাছায় ঢেকে আছে, তখন ভাঙা নড়বড়ে লাঙল নিয়ে সে বেরিয়েছে বেহালের গোরু-

বলদে ভুঁই চাষ করতে! এত বড়ো শোকটাও কি তবে তার লাগেনি? ম্লান প্রাণে আকাশের দিকে মুখ তুলে সে অনুচ্চারিত সুতীব্র কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'কী উপায় আছে কও, যাবের পারবো না যে'।

কিন্তু জমির উপরে লাঙল নামিয়ে গোরু-বলদকে জোয়ালে জুড়তে জুড়তে হঠাৎ তার শিরা-উপশিরাগুলো বিস্ফারিত হয়ে গেলো আরো গভীর রক্তপ্রবাহের পথ করে দিতে। মুঠি দিয়ে দৃঢ়ভাবে লাঙলটা চেপে ধরা নয় শুধু, আরও কঠিন করে ভূমিকে পীড়িত করতে লাঙলের পিছন দিকের বাঁকা অংশটিতে পায়ের চাপ দিতে লাগলো রামচন্দ্র। তার মনোভাবটাকে রুদ্ধ আক্রোশের কাছাকাছি বলা যায়, কিন্তু যত না আক্রোশ তার চাইতে বেশি অভিমান। এই মাটি তার মা না-হয়ে জারমুখী হয়েছে।

একটু বেলা হতেই রামচন্দ্রব পাড়ার লোকরা দেখলো, রামচন্দ্রর একটা জমির আধাআধি লতাঘাসের জঙ্গল উপড়ে গিয়ে কালো কালচে জমি বেরিয়ে পড়েছে। 'হোক নাবলা, মণ্ডল চাষ দিছে'—বৈশাখের বাতাসের মতো খবরটা হাল্কা হয়ে উড়তে লাগলো।

মুঙলা সকালেই বেরিয়েছিলো, আজকাল প্রায়ই তার সঙ্গে একটি ছোটো সমবয়সী মানুষের দল থাকে। সেই দলটি নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো ক্ষেতের ধারে। দৃশ্যটার বিস্ময় কাটলে মুঙলা বললো, 'শুনছ না বাবা, চৈতন সা পুলিসে খবর দিছিলো, পুলিস আসে না। জমিদার সদরে লোক পাঠাইছে নালিশের জন্যি। জমি খাস, ট্যাকা জব্দ'।

'তারপর'?

'কয় চৈতন সা—বাপ-সকল এই এক বছর তোমরা খাইখালাসিগুলা নিজের জমি মনে করে চষে দাও ; এক বছরের ফসল শুধু আমি নিবো, তোমাদের সব দেনা ওয়াসিল ; জমিদারের খাজনা শোধ করব'।

'আমরা যে খাটব তার দাম? হেদি। তারপব'?

'কলাম, লেখো নতুন দলিল। তিরিশ টাকায় তিন বছর খাইখালাসি, বিশ টাকা ওয়াসিল পাইছো লেখো। নতুন দলিলে শুধু দশ টাকার কথা থাকবি'।

'সে তো অমনি ফিরবি। ডানি ডানি। এক বছর পর তো জমি আপনি ফিরবি। তারপর কী হলো কও'।

'কলাম। ছিদামও কলে ; এক সন তোমার জমিতে খাটব-খাটব, খাবার ধান দিবা'।

'কস কী? হেদি ভোর'।

'কলে—রাজী, রাজী। কলে—বাপ—সকল, আর-এক কথা—গান করবা না'।

রামচন্দ্র গাঁক গাঁক করে হেসে উঠলো।

মুঙলা যথাসাধ্য গম্ভীর মুখে তার বিজয়কাহিনী বর্ণনা করলো—'কলাম, কিন্তুক সাজিমশাই, ঢোল তোলা থাকবি ঘরে, রামশিঙা গোঁজা থাকবি বাতায়। কয় যে—হবি, সব হবি। বাপ-সকল, গান থামাও। আলেফমিঞাও দাড়ি ভাসায়ে নাচে নাচে গান শুনায়। কয়, আমাক হাড় চুষে খাতে দেখেছে'।

রামচন্দ্র বজ্রের মতো ফেটে পড়লো হাসিতে, যেমনভাবে আকাশ ফেটে বৈশাখী ধারাবর্ষণ শুরু হয়।

কিন্তু। দুপুরে বাড়িতে ফিরে খেতে বসেছিলো রামচন্দ্র। মুঙলা পাশে বসেছে। আর দুদিন পরে নীলের গাজন। মুঙলা সেই উৎসবের কথা বলছিলো। বর্ষশেষের এই উৎসবে দুঃখদুর্দশা শেষ করতে সে বদ্ধপরিকর। সে নিজে বুঝতে পারছে না কেন, কিন্তু অনুভব করছে চৈতন্য সাহা অতঃপর কৃষকদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে। সে কথাও আলোচনায় আসছিলো। সহসা ভাতের দলাটা মুখে তুলতে গিয়ে রামচন্দ্রর হাত অসাড় হয়ে গেলো। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে পরমুহূর্তে কান্না থামানোর চেষ্টায় সে আহার্য ফেলে উঠে গেলো।

রাত্রিতে স্ত্রীকে কথায় কথায় সে বললো—'অমন কান্নাকাটি করে লাভ নাই। কিন্তুক আমার মনে হলো আমার মিয়ে কনে। সে খায় নাই'।

সাপ্তাহিক খোঁজখবর নেবার দিনে চৈতন্য সাহার এজাহারটা আবার কনকদারোগার নজরে পড়লো। এর আগে পড়ে সে ছোটো দারোগা ছলিমুল্লার সঙ্গে একমত হয়েছিলো। এজাহারটাই উল্টোপাল্টা কথায় তৈরি। যে মারবে বলে লাঠি নিয়ে যায়, সে আবার ধর্মকথা শুনিয়ে বলে—'খবরদার ধান কাটবে না'। আর এই মূল আসামীর সঙ্গে আর একদল যোগ রাখছে গানের সূত্রে। ছলিমুল্লা বলেছিলো, 'গানের বিরুদ্ধে এজাহার থানার দারোগা কী করবে? এ কি জাতীয় সংগীত? জমিদারও নাকি রামচন্দ্রর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রমাণ কী? জমিদার বাকি খাজনার জন্য মামলা করবে বলেছে। জমিদারের খাজনা আদায় যে ধারার অপরাধ সে ধারা পিনালকোডে নেই'। কনক হেসে কিছু মন্তব্য করে ডায়েরি রেখে দিয়েছিলো।

আজ দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে কনক চুরুট ধরালো। এজাহারে অন্তত একটি বিষয় আছে—মহাজনের বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূলতা। আপাতদৃষ্টিতে খাজনার জন্য মহাজনের উপরে চাপ দেওয়া জমিদারের পক্ষে স্বাভাবিক, সেটির সঙ্গে চাষীদের প্রতিকূলতার কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কনক যোগাযোগের সূত্রটি কল্পনা করে নিলো—সান্যালমশাইয়ের সে ছেলেটি তবে গ্রামে ফিরেছে। অন্তরীণ অবস্থা থেকে ইচ্ছামতো বেরিয়ে আসা তার রীতি। এজন্য সে দুবার জেলও খেটেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে কনক ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো চিকন্দির দিকে। চিকন্দির গাছগাছড়া-ঢাকা পথে তখনো রোদ কড়া হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এতখানি পথ জোরে ছুটে এসে দুপুরের রোদে-পোড়া ঘর্মাক্ত একজন দারোগার মতো দেখাচ্ছে তাকে। এবকম চেহারা নিয়ে সান্যালবাড়ি যাওয়া চলে না। ঘোড়া থামিয়ে কনক তাব প্রকাণ্ড রুমালখানি বার করে ঘাম মুছলো, সিগারেট ধরালো, খানিকটা সময় স্থির হয়ে রইলো ; তার ও তার ঘোড়ার নিশ্বাসে সমতা এলে আবার সে চলতে আরম্ভ করলো।

আর খানিকটা যাবার পর কনক দেখতে পেলো, একজন স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ আসছে। স্ত্রীলোকটির পরনের শাড়িটি দামী নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল রঙের। উভয়ে পরস্পরের কোমরে হাত রেখে চলেছে। এ বয়সে এরকম চলা প্রথম প্রণয়ী সাঁওতালদের পক্ষে হয়তো সম্ভব। এই ভাবলো কনক এবং জিজ্ঞাসা করলো, 'দ্যাখো, তোমরা এই গ্রামে থাকো'?

'হ্যাঁ'। পুরুষটির চাইতে স্ত্রীলোকটি সপ্রতিভ ; সে ই এগিয়ে দাঁড়ালো।

'তোমরা বলতে পারো, এ গ্রামের লোকদের সঙ্গে চৈতন্য সাহার বিবাদ লাগলো কেন'?

'বিবাদ লাগেনি, লাগলে ভালো ছিলো'। স্ত্রীলোকটি বললো।

'তুমি তো এ দেশের লোক নও বাপু, তোমার কথাগুলো তার প্রমাণ'।

'গোলমাল একটু আছে আমার কথায়'।

'তুমি বলতে পারো, রামচন্দ্র কেন চৈতন্য সাহাকে মারলো'?

'কখন মারলো? এই শুনলাম সব মিটে গেছে। কখন মারলো রে মুঙলা'?

'তা তো জানিনে'। মুঙলা বললো।

'যখন দরকার তখন পলায়ে থাকলো, আর এখন মারলো'?

'তোমার যেন খুব ভালো লাগলো সংবাদটা,' কনক বললো, 'রামচন্দ্র চৈতন্য সাহাকে মারপিট করলে তুমি খুশি হও, কেমন'?

'এখন আর তার দরকার নেই। নীলের গাজন গেছে, আউসের চাষ হয় নাই , বৈশাখ যায়, কিছু একটা করতে হবে। এখন তো সকলকেই খাটতে হবে'। পদ্ম হাসলো।

'তাহলে মারপিট হলে তুমি খুশি হতে'?

'শুধু আমি কেন, ভগোমানও হতো'।

কনক স্থির করলো এ গ্রামে যদি কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়, এই মেয়েটিকে আগে খুঁজে বার করতে হবে। কনক ঘোড়া ছেড়ে দিলো, কিন্তু আবার তাকে থামতে হলো। শহরের কোনো মেয়ে নয় তো, পুলিসের চোখের আড়ালে বেড়াচ্ছে।

'অ্যাই, শোন'!

'আজ্ঞে'।

পদ্ম কাছে এলে কনক এবার পুলিসি দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলো। শহরের পলাতক যে কয়টি মেয়ের ছবি তার কাগজপত্রে আছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করলো। বৈষ্ণবী ঈষৎ সংকুচিত হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। 'আচ্ছা যাও'। কনক চিন্তা করতে করতে লাগাম আলগা করে দিলো।

কনক চলে গেলে মুঙলা বললো, 'শ্বশুরকে ধরতে আইছে, কেন পদ্মমণি'?

পদ্ম বললো, 'তুই বাড়ি যা'।

'কী করবো'?

'সাহস দেবা, আমি একটু সান্যালবাড়ি যাবো। ছোটোবাবুকে খুঁজে বার করবো'।

'কোনোদিন সে বাড়ি গিছ? সারাদিন ধরে খুঁজলিও তাক খুঁজে পাবা না। আর পালেও কী কবা'?

'তোক যা কলাম, কর'।

মুঙলা চলে গেলো। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো সেটা সান্যালদের বাগিচার সীমা। সেখান থেকে ঘোড়ার পথে সদর দরজায় যেতে অন্তত দশ-বারো মিনিট, কিন্তু বাগিচার আড়াআড়ি আম গাছগুলোর তলা দিয়ে ছুটতে পারলে খিড়কির পুকুরের জঙ্গলকে অগ্রাহ্য করতে পারলে পাঁচ-সাত মিনিটে অন্দরে পৌঁছানো যাবে । নিচু হয়ে কাঁটাতাবের বেড়া গলে পদ্ম সান্যালবাড়ির দিকে ছুটলো।

কনক সান্যালদের কাছারি-ঘরে ঢুকে দেখলো, দশ-বারোজন চাষী বসেছে মেঝেতে গোল হয়ে। একজন জরাজীর্ণ প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। ফরাশের উপবে বৃদ্ধ নায়েব, তার চারিপাশে গুটিকয়েক আমলা। তারা খাতাপত্র, কাগজ-কলম নিয়ে ব্যস্ত।

'নমস্কার, নায়েবমশাই'।

'নমস্কার। আসুন, বসুন'।

'পঞ্চায়েত নাকি'? কনক হাসিমুখে জিজ্ঞসা করলো।

'তা একরকম। চৈতন্য কৃষকদের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলছেন। ইনি চৈতন্য সাহা, চেনেন বোধ হয়'?

'ইনি-ই'?

কনকের পুলিসি দৃষ্টি ও নায়েবমশাইয়ের পদোপযুক্ত হাসির সম্মুখে চৈতন্য সাহা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

'এখানে রামচন্দ্রও আছে নাকি'? কনক জিজ্ঞাসা করলো।

কৃষকদের মধ্যে স্থূলকায় একজন নড়েচড়ে বসে গোঁফে হাত দিলো।

'বেশ। কিন্তু, ব্যাপার কী? রামচন্দ্র চৈতন্য সাহাকে হত্যার চেষ্টা করলো কেন'?

রামচন্দ্র ও চৈতন্য সাহার মুখের অবস্থা দেখে মনে হলো কনকমাস্টার তাদের দুজনের মাথা ঠুকে দিয়েছে লেখাপড়ায় অবহেলার জন্য।

নায়েবমশাইয়ের অনুসন্ধানী দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে রামচন্দ্র ও চৈতন্য সাহার মুখের উপরে পড়তে লাগলো।

'না, না। তা করবি কেন। রামচন্দ্র আমার বন্ধু। ছোটকালে আমরা খেলছি একসাথে। কেন রামচন্দ্র, খেলি নাই'? চৈতন্য প্রাণপণ করে বললো।

'কিন্তু থানায় মিথ্যা এজাহার দিলে কী হয়, তা বুঝি আপনি জানেন না'? কনক চোখ পাকালো।

'রামচন্দ্রভাই, তুমি গাঁয়ের সকলের হয়ে কথা কতিছ, আমার হয়ে দারোগা হুজুরেক কও'। চৈতন্য সাহা করুণ হলো।

কথাটার আকস্মিকতায়, সম্ভাব্য হত্যাকারীর কাছে চৈতন্য সাহার এই আশ্রয়ভিক্ষার ভঙ্গিটিতে প্রথমে কনক ও নায়েবমশাই, এবং পরে সকলে হেসে উঠলো।

পদ্ম বৈষ্ণবী কনকের আগে সান্যালবাড়িতে পৌঁছেছিলো, এবং ছোটোবাবুকে খুঁজেও বার করেছিল। খাজনার জন্য চাপ দিয়েছেন তিনি এ-গুজব শুনে বিপদের সময়ে তাঁর কথা মনে পড়লেও, ছোটোবাবুর সামনাসামনি কোনো কথা বলা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়েছিলো। এমন সময়ে সেখানে সুমিতি এলো। সে তার ঘরের জানলা দিয়ে দারোগাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো এবং স্থির করেছিলো, দারোগাকে তার ভদ্র ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রূপুর হাতে কাজ ছিলো না। দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির নকল তোলার চাইতে বউদির সঙ্গে এ-কথা সে-বলে সময় কাটানো ভালো। তাই করছিলো সে। পদ্ম অনুভব করলো, ছোটোবাবুকে বলা না গেলেও এ বউটিকে বলা যায়। কিছু কিছু আলাপ হলেও তখন সব কথা আলাপ করার সময় ছিলো না। এইরকম যোগাযোগ হওয়ায় কনক যখন রামচন্দ্রর লাঠালাঠির ব্যাপার শেষ করে হাসিমুখে কিন্তু সুকৌশলে বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার ঠিক এই সময়েই কেন চাপ দিলেন এই তথ্যটি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে নায়েবমশাইকে জেরা করে, একজন ভৃত্য এসে বললো, 'আপনাকে বাবুমশাইরা ডাকতেছেন'।

নায়েব বললো, 'যান, পরে আলাপ হবে ; অবশ্য আলাপ করার আগেও আপনাকে বলে রাখা যায় বাকি খাজনা আদায়ের পূর্ণ অধিকার জমিদারের আছে। ১৮২০-র কাগজপত্র আছে আমাদের'।

কনক ভৃত্যটির পিছনে কিছুদূর চলে কাছারির একটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজায় দামী পর্দা দুলছে। কাছারির ঘরে ঢুকতে গিয়ে যে কলগুঞ্জনের শব্দ কানে এসেছিলো, এদিকে তেমন নেই। কী একটা অজ্ঞাত ফুলের গন্ধ আসছে যেন। সদরের পুলিস-অফিসের গুঞ্জনের পাশে অথচ একেবারে নিস্তব্ধ পুলিস-সাহেবের খাস কামরার কথা মনে হলো কনকের।

ঘরে ঢুকে কনক দেখলো, একটা গোলটেবিলের পাশে তিনজন বসে আছে, একজন প্রৌঢ়, একজন মহিলা এবং একটি কিশোর। কনক সান্যালমশাইকে চেনে, প্রৌঢ়টি সান্যালমশাই নন। কিশোরটিকে চেনা চেনা মনে হলো মুখের আদরায়, কিন্তু আসলে সেও অপরিচিত। মহিলাটির দিকে চোরা চোখে চেয়ে কনক চিনতে পারলো, দিঘার স্টেশনে এঁকে সে দেখেছিলো।

মহিলাটি সুমিতি। সে বললো, 'আমাদের একটু দরকার আছে, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো দরকার আপনাকে ধন্যবাদ জানানো। সেদিন আপনি সাহায্য না করলে এতটা পথ আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে হতো'।

'না, না। সে আর কী'।

প্রৌঢ়টি সদানন্দ। সে বললো, 'অনেক সেটা, আপনি যা করেছিলেন, ইংরেজরা যদি অধিকাংশ পুলিস কর্মচারীকে তেমনটি করার সাহস দিতো, তাদের রাজত্ব তাহলে এত শীঘ্র টলটলায়মান হতো না'।

'তা নয়, সে কিছু নয়'। কনক বললো, 'এখনই টলটলায়মান বলাটা কষ্টকল্পনা'।

'অতি অবশ্য। কারণ রাজত্ব তো আর চোখের জল নয়। তবে ভাষায় ওটা চলে যাচ্ছে'।

'আমি সে-অর্থে বলিনি'।

'তা-ও বুঝি, তা-ও বুঝি'।

সুমিতি বললো, 'মাস্টারমশাই, আপনার আর যে কত ছাত্র চাই তা বুঝে উঠতে পারছি না'।

সুমিতির কথায় কনকের কানের পাশ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু সুমিতির ঝরঝরে হাসির মধ্যে রাগ করাও কঠিন।

সুমিতি তখন-তখনই বললো, 'আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে কথা বলতে চায়'।

'আমার সঙ্গে'?

'তাকে ডাকি'?

'ডাকুন'।

ভিতরদিকের পর্দার কাছে গিয়ে সুমিতি ডাকলো, 'পদ্ম, এদিকে এসো'।

বৈষ্ণবী ঘরে ঢুকে মুখ নিচু করে দাঁড়ালো।

'কী বলবে, বলো'।

পদ্মমণি বৈষ্ণবী বললো, 'আপনি রামচন্দ্রকে কয়েদ করতে চান, তা ভালো নয়'।

'ভালো নয় কেন, বলো তো'।

'অন্যায় সে করে নাই, চৈতন্য সা-র পিছনে লাগছিলাম আমরা। গান বাঁধার জন্যে আমি ছিদাম-মুণ্ডলাকে খোঁচাতাম। গান বাঁধে দিছি আমি। তারপর ওরাও বাঁধছে'।

'গান বাঁধা অন্যায় নয়'।

'তাছাড়া আমরা আর কিছু করি নাই'।

'রামচন্দ্র চৈতন্য সাকে মারতে গিয়েছিলো'।

'চৈতন্য সা রামচন্দ্রর দুশো হাতের মধ্যেও ছিলো না'।

'কিন্তু, রামচন্দ্র তোমার কে, সেটা আমার জানা দরকার ; এবং তার উপরেই নির্ভর করছে রামচন্দ্র সম্বন্ধে তোমার মতামতের মূল্য'।

পদ্ম মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মুখে ব্রীড়ার চিহ্ন ফুটি-ফুটি করছিলো, কিন্তু চোখের জল নেমে মুখের আর সব ভাবচিহ্নকে ঢেকে দিলো। 'সে আমার কেউ নয়'—এ কথাটা বলতে তার কেন বা আটকালো!

সান্যালবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে কনক দারোগা থানার পথ ধরলো। পদ্ম কথা বলতে-না-পেরে চলে গিয়েছিলো, তারপরে খানিকটা সময় একথা-ওকথা নিয়ে আলাপ হয়েছিলো এদের সঙ্গে কনকের। সোপকরণ চা এসেছিলো, এবং প্রাথমিক সংকোচের পর কনককে আহার্যে চামচ দিতে হয়েছিলো। সুমিতি একসময়ে হেসে বলেছিলো, 'দারোগাবাবু, এর সঙ্গে যখন আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো যোগই নেই, আশা করি রামচন্দ্রকে অ্যারেস্ট করা দরকার হবে না'।

'না, তা নেই'।

'ধন্যবাদ'।

কনকদারোগা মুখোশও এঁটেছিলো মুখে, সে বক্রোক্তির সাহায্যে এ ব্যাপারে সান্যালমশাইয়ের বড়ো ছেলের যোগাযোগের ইঙ্গিত করেছিলো। সুমিতি রিনরিন করে হেসে বলেছিলো, 'এ ব্যাপারে সান্যালদের যোগ হচ্ছে খাজনা আদায় করার চেষ্টা আদালতের মারফত। কিন্তু সে প্ল্যানও আমার এই ছোটোভাইটির, তা যদি এর দাদার বলে চালাতে চেষ্টা করেন তবে এর প্রতি অন্যায় করা হবে'।

কিন্তু সদানন্দমাস্টার বলেছিলো, 'এটাকে বিপ্লব বললে অন্যায় বলা হয় না। চাষীদের শক্তি আছে কিন্তু সব সময়ে চোখে পড়ে না। এটা সমস্যা বটে। আপনি পদ্মার তীর দিয়ে এলেন? ওকে দেখে কি মনে হয়েছে, ইচ্ছামাত্র আপনার থানা, আমাদের এই পাথরের বাড়ি, লোহার ব্রিজ—এ সবই মুছে দিতে পারে? মনে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ও তা পারে। শুধু প্লাবন দিয়ে নয়, অসহযোগ করে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েও যেমন অনেক জনপদকে করছে। যা কোনো কোনো সময়ে করে এবং সব সময়েই পারে, প্রয়োজন হলেই করে না কেন—এটা সমস্যা বটে। অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে, কিন্তু এখন তা আমার মাথায় আসছে না'।

থানামুখো কনকের চোখের সম্মুখে এদের ছবিই ভাসতে লাগলো।

মাথাভরা টাক, লাল মুখ, পরনে গরদের আগুল্‌ফ জামা, সদানন্দমাস্টার ; সুখলালিত রূপ; আর সুসজ্জিতা সুমিতি। সুমিতির হাতের বলয় দুটির আনুমানিক মূল্য তার পক্ষে আন্দাজ করাও কঠিন। অথচ রূপ? এ কথা কনক চিৎকার করে বলতে পারে তার স্ত্রী শিপ্রার যা ছিলো এবং যা থাকতে পারতো, তার কিছু নেই সুমিতির। সুমিতির হীরক বলয় আছে, এই বাড়ি আছে। কথা বললো যেন অনুগ্রহ করে। যদি নিজেরা দয়া করে ডেকে না পাঠাতো কথা বলাও সম্ভব হতো না, কারণ ওয়ারেন্ট ছিলো না। কিন্তু ওয়ারেন্ট থাক বা না-থাক অনুরূপ অবস্থায় যে কোনো দারোগা এসে শিপ্রাকে জেরা করতে পারতো।

আর কী অপচয় অর্থের এবং মানুষের শ্রমের। সদানন্দ মাস্টারের অমন মহামূল্য জামা সব সময়ে পরে থাকার কী যুক্তি? সুমিতির পরনে যে শাড়ি ছিলো সেটা তার আটপৌরে, কিন্তু শিপ্রার পোশাকী একমাত্রটির চাইতেও দামী। কে দেখছে বলো, এই গ্রামে!

আর ওই ঘরখানি। আসবাবে গালিচায় সদরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের খাসকামরাও এমন নয়। কিন্তু গালিচার ধূলা না-ই থাক, ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল ছিলো। দু বছরেও এ ঘরখানি একবার ব্যবহৃত হয় কিনা কে জানে। তবু এতগুলো টাকার কী অনর্থক ব্যবহার। এমন কত সুসজ্জিত অব্যবহৃত ঘর এ বাড়িতে আছে কে বলবে!

পথের পরিসরটা এত কম যে পাশের একটা কুঁড়ের নিচু চালা কনকের গায়ে লাগলো। পচা খড়ের কয়েকটা কুচি তার ঝকঝকে খাকির হাতায় লেগে গেলো। বাড়িটার উঠোনে একটা আট-দশ বছরের উলঙ্গ মেয়ে গোবর মেখে ঘুঁটে দিচ্ছে। এদের চোখে লাগে না, কিন্তু কনকের চোখে বিবস্ত্রা বলে মনে হলো। কী অশিক্ষা, তার চাইতে কত বেশি এই দারিদ্র্য!

বড়ো রাস্তা পেয়ে কনকের ঘোড়া দুলকি চালে চলতে লাগলো।

'—নিশ্চয়, নিশ্চয় ; এর প্রতিকার চাষীরাই করতে পারে'। কেন সহ্য করবে তারা, তাদেরই হাতের তৈরি ওই রাজপ্রাসাদ। সদানন্দমাস্টারের পদ্মার উপমাটি মনে পড়লো কনকের। আভিজাত্য? ছাই ছাই!

চিন্তাগুলি একটু থিতুলে কনক ভাবলো—বাহা রে! বিপ্লবী ধরতে এসে নিজেই বিপ্লবী হলাম!

লোকের মুখে কনক অসন্তোষের কথা এর আগেও শুনেছে, তার সেই সব বন্দী-বাবুরা তাকে এরকম ব্যাপারটাই বুঝিয়েছে, কিন্তু কনক সবটুকু বিশ্বাস করেনি। বন্দুকের কুঁদোর কাঠে যে ঘুণ ধরেছে এটা যেন নিজেকে দিয়েই সে অকস্মাৎ বুঝতে পারলো। সে ভাবলো, হয়তো একদিন পুলিস কনস্টেবলরা ধর্মঘট করে বসবে।

কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তার মতো একজন পুলিস কর্মচারীকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এদের না এলেও চলতো। নায়েব-কর্মচারী মারফত জানালেও খুব হতো। এটায় যেন এই বধূটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

একটা বাতাস উঠেছে। কনক ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো। আর বেশি বাতাস উঠলে বুধেডাঙার বেলেমাটির পথে চলতে কষ্ট হবে। সান্দারদের পাড়ায় ধুলোর ঝড় উঠবে।

কিন্তু হঠাৎ তার ঘোড়াটা থেমে গেলো, কান দুটো খাড়া করে দিলো।

'—চল্‌'।

ঘোড়াটা ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

শুয়োর-টুয়োর নাকি! যেরকম জঙ্গল পথের ধারে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রিভলবারটা হাতে নিলো কনক। ডানদিকের ঝোপটা দুলে উঠলো। প্রাণীটা ওর ভিতরেই আছে। কী সর্বনাশ, মানুষ! কিন্তু এত বড়ো সাহস কার এই গ্রামে যে পুলিসের সশস্ত্র দারোগাকে আক্রমণ করার জন্য গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে। সান্যালমশাইয়ের ছেলে? না—তাই-বা কী করে হবে। বিপ্লবীরা দারোগা খুন করে বটে, কিন্তু শুধুমাত্র খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া সে তো বিপ্লবপন্থী সান্যাল-ছেলের কিছুই ক্ষতি করেনি। কনকের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেলো। রিভলবার উদ্যত রেখে ঘোড়াকে ধীরে ধীরে চালিয়ে কনক অগ্রসর হলো।

মাথার উপরে হাত তুলে যে উঠে দাঁড়ালো সে চৈতন্য সাহা। ঘোড়ার পায়ের শব্দে পিছন ফিরে দূর থেকে কনকদারোগাকে দেখে তার চোখের আড়ালে থাকবার জন্য সে পথের পাশের এই ঝোপটাকে আশ্রয় করেছিলো। কিন্তু তার এমন পরিণতি হবে বুঝতে পারেনি।

কনক হো-হো করে হেসে উঠলো। থানার ডায়েরিতে লেখা গানের কথা মনে পড়লো তার।

'—ভাগ্ চিতিসাপ'!

চৈতন্য সাহা ঝোপঝাড় ভেঙেচুরে, খানাখন্দ ডিঙিয়ে টপকে ছুট দিলো। কনক অমন হাসি অনেকদিন হাসেনি। তার হাসির অস্বাভাবিক শব্দে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ফোঁসফোঁস করতে লাগলো।

কিন্তু দেরি করার সময় ছিলো না। দু-একবার গাছপালা নড়ে উঠলো, কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটায় জলও পড়লো। আকাশে যুধ্যমান হাওয়াই জাহাজের মতো দ্রুতগতিতে মেঘ চলেছে। কনক ঘোড়ার গতি দ্রুততর করে দিলো। যদি ভালো করে বর্ষা নামে বুধেডাঙার কাদায় ঘোড়া অচল হয়ে পড়বে।

কনকের পিছন দিকে তখন বর্ষা নামলো চিকন্দিতে। চৈতন্য সাহা ভিজলো, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রামচন্দ্ররাও। বৈশাখের এত সব বাতাস কোথায় আকাশের কোন দ'-এ আটকে ছিলো, রামচন্দ্রর হাসির মতো শব্দ করে বজ্র, বাজ, ঠাটা পড়ে সে-দ'-এর বাঁধে চিড় খেয়ে খেয়ে গেলো, বাতাস হু-হু করে বেরিয়ে এলো। সান্যালবাড়ির কাছারির জানলা দিয়ে, লাইমশাখার গন্ধ ধুয়ে নিয়ে তাদের বসবার ঘরে জলের ছাঁট ঢুকলো।

ঝোপঝাড়, খানাখন্দ, উঁচুনিচু, তে-ফলন আর হাজা শুখা জমি একসঙ্গে ভিজতে লাগলো।

১৪

মাধাই অবশেষে মালবাবুকে আশ্রয় করেছিলো। মালবাবুর নাম গোবিন্দ, তার বয়স মাধাইয়ের চাইতেও কম। পৈতৃক সুবাদে রেল কোম্পানিতে চাকরি। পিতা রেল কোম্পানিতে বড়ো রকমের একটি হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁরও আগে তাঁরও পিতা এই রকমই ছিলেন। কলেজ ছাড়ার পর গোবিন্দ বলেছিলো, সে কলেজের অধ্যাপক হবে। পিতা বললেন, 'অহো কী দুর্মতি'। তিনি চাকরি থেকে বিদায় নেবার পর নবদ্বীপ এবং পরে বৃন্দাবনে দীক্ষা নিয়েছেন। চেহারাই নয়, ভাষা পর্যন্ত বদলে গেছে তাঁর। আমিষ ত্যাগ করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ঘৃত মানেই আমিষ এই প্রমাণ করে অধুনা উদ্ভিজ্জ ঘৃতের কারখানা খুলেছেন। তিনি চাকরি করে দিলেন ছেলের, এই স্টেশনটি মনঃপূত হওয়ায় এখানেই বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করলেন। রেল কোম্পানির চাকরি, গোবিন্দর পরিবারে লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকা, প্রয়োজনের নয় শ্রদ্ধার।

কিন্তু গোবিন্দ মালবাবু হয়ে মালবাবুর পক্ষে অনুচিত কাজকর্ম করতে শুরু করলো। এখন হয়েছে কি, রেল কোম্পানির একখানি আইনের পুঁথি আছে মাল চলাচল সম্বন্ধে। গোবিন্দ যখন খোঁজখবর নিয়ে এক সপ্তাহের চেষ্টায় সেটাকে আবিষ্কার করলো তখন কেউ জানতো না একটি পুঁথির এমন বিরাট শক্তি থাকতে পারে। মাটিতে পাতা দুখানা লোহার উপর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড স্পেশ্যালগুলি যেমন গড়িয়ে যায়, তেমনি চললো গোবিন্দর অফিস-পুঁথির লাইনে লাইনে।

সরষের তেলের ম্যানেজার এসেছিলো, 'আজ চাই গাড়ি'।

'চাইলেই কি পাওয়া যায়'।

ম্যানেজার হেসে বললো, 'আপনি আমাকে চেনেন না, আমার নাম রামরিঝ দুকানিয়া। আমি...'

বাধা দিয়ে গোবিন্দ বললো, 'দুটি কানই আপনার এখনো আছে, শুনতে পাচ্ছেন না এই আশ্চর্য। গাড়ি পাবেন না। যে ক'খানা আছে আজ আম চালান যাবে'।

'আম। ছোটোলোকেরা যা চালান দেয়'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খেতে যা তিসি-মেশানো সরষের তেলের চাইতে ভালো'।

এদিকে-ওদিকের লোকগুলি হেসে উঠলো। দুকানিয়া বাংলা বলতে পারে বটে, কিন্তু তার মারপ্যাঁচ বোঝে না। সে অপমানিত বোধ করে স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। স্টেশনমাস্টারের ঘরে ডাক পড়লো গোবিন্দর।

'গোবিন্দবাবু, দুকানিয়া আমাদের বন্ধুলোক'।

গোবিন্দ হো-হো করে হেসে উঠলো।

স্টেশনমাস্টার তার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হলো, কিন্তু গোবিন্দর পিতার সম্বন্ধে তার একটা ধারণা ছিলো।

গোবিন্দ বললো, 'দুকানিয়া আমার বন্ধু নয়। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, ওর বংশগৌরবের চূড়ান্ততা হচ্ছে দুই-একখানা দোকান। আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি নিজেই কোলম্যান। এরা সাহেব বললেও আমি জানি আপনার পিতাঠাকুর কয়লা কাটতেন কিংবা ও-বস্তুটি ফিরি করতেন'।

সাহেব গর্জে উঠলেন, 'কী বলতে চাও, ছোকরা! তুমি আমাকে ফিরিওয়ালার ছেলে বলছো? তোমাকে আমি নরক দেবো'।

'সাহেব, আমার পিতাঠাকুর মৃত নন। তাছাড়া এস্টাব্লিশমেন্ট, স্টাফ ও অ্যাপিল তিনটি হেডক্লার্কই আমার পিতাঠাকুরের বন্ধু কিংবা আইনতুতো ভাই। তুমি যে বংশগৌরবে কিছু-নার চাইতেও কম তার প্রমাণ এ পর্যন্ত ইলিয়টসাহেব তোমার ছোঁয়া চা স্পর্শ করেনি'।

এটা কোলম্যানসাহেবের কোমল প্রাণের একটি দুর্বলতা। গোবিন্দ তার পায়ের কড়ার উপরে দাঁড়িয়েছে এমন মুখভঙ্গি করে কোলম্যান অশ্রাব্য শপথ গ্রহণ করে বললো, 'তোমার ইলিয়ট নরকে যাক'।

'তা যাবে', গোবিন্দ উঠে দাঁড়ালো, 'আপনি তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করলেন তাও তাকে জানিয়ে দেবো'।

দুকানিয়া অবাক হলেও তার বুদ্ধি লোপ পায়নি, সে বললো, 'বাবুসাহেব, আমরা কিছু ব্যবস্থা করে থাকি'।

গোবিন্দ আবার হাসলো, 'যা শিখিয়েছো সেটা শিখতে বাঙালি দেরি করবে না। তুমি শুনলে অবাক হবে ইতিমধ্যে আমার পিতাঠাকুর সিনথেটিক ঘিয়ের কারবার খুলে দিয়েছেন, আট-দশ লাখ রুপেয়া খাটছে। আর সেই ঘি-ও যাচ্ছে স্রেফ জয়পুর আর বিকানীরে চালান। তুমি আমাকে কী দেবে? আমার নিজের যা আছে তার ইনকাম ট্যাক্সই ওঠে না আমার মাইনেয়'।

দুকানিয়া এবার হতবাক।

কিন্তু আমের ব্যবসায়ীরা করলো মুশকিল। তারা এসে বললো, 'বাবুসাহেব, কাল থেকে আমাদের গাড়ি লাগবে না'।

'কেন, আমার বাপের ঠাকুররা'?

'দুকানিয়া আমাদের সব আম কিনে নিচ্ছে'।

'উত্তম কথা'।

সন্ধ্যার পর কোলম্যান সাহেব স্টেশন পরিক্রমার অজুহাতে এসে বললেন, 'দ্যাখো গোবিন্দ, তুমি বড়ো ছেলেমানুষ'।

'আদৌ নয়। লেখাপড়া তোমার চাইতে কম জানি না, আইনগতভাবেও আমি সাবালক। তুমি কি সেকেলে টেনিসন ব্রাউনিংয়ের নামও শুনেছো? তুমি বোধ হয় জানোই না, ইংরেজি সাহিত্যে শুধু সেকস্টন ব্লেক নয়। সাহেব, তোমাকে আর কী বলবো, তোমাকে শুধু ইংরেজ পণ্ডিতদের নামের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারি। তুমি কি ইটন কিংবা হ্যারো কাকে বলে জানো? আ-মরি, অমন মুখ হলো কেন? এখন

আর তোমার পক্ষে ইটনে যাওয়া সম্ভব নয়, বাড়িতেই একটু ইংরেজি গ্রামারটা উল্টেপাল্টে দেখো, ইলিয়ট সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধা হবে'।

বলা বাহুল্য এই কথাগুলি বলছিলো গোবিন্দ তরতাজা ইংরেজিতে এখানে-ওখানে স্মিতহাসি বসিয়ে।

কোলম্যান সরে পড়লো, গোবিন্দ তাব পিঠের উপর একরাশ উচ্চ হাসি ছুঁড়ে দিলো। মাধাই সেই ঘবের এক দরজায় দাঁড়িযে ছিলো। সে ইংরেজি না বুঝলেও কোলম্যানেব মুখ ও গোবিন্দর হাসি দেখে বুঝতে পেরেছিলো ব্যাপারটা কোলম্যানের পক্ষে খুব সুবিধাব হচ্ছে না। পবে আর-এক মালবাবুর মুখে শুনে তার শ্রদ্ধা হলো গোবিন্দর উপরে।

একদিন গোবিন্দ নিজে থেকেই প্রশ্ন করলো, 'হ্যাঁ বে মাধাই, তুই অমন মুখ কবে থাকিস কেন রে? তোব কি কোনো অসুখ আছে'?

'না'। মাধাই ইতিউতি কবে সরে পডাব চেষ্টা করলো।

'তাহলে তোব মনে কষ্ট আছে, আমি তোকে কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি'।

মাধাই দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগলো। যে-কথা শুনে জযহরিবাও হাসি-তামাশা কবে এমন শিক্ষিত লোকেব সামনে কী করে সে কথা বাল যাবে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর গোবিন্দ যখন তার বাসায় যাবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মাধাই ভয়ে ভয়ে কথাটা উত্থাপন করলো।

'আচ্ছা বাবু, স্টেশনের সব লোকে খাকি পরে এক আপনি ছাড়া'।

'হ্যাঁ, তা পরে। খাকি আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি'।

'কেন, বাবু'?

গোবিন্দ হাসতে হাসতে বললো, 'যে রঙেব কদর ময়লা ধরা যায় না বলে সে বঙ ভদ্রলোকেব পরা উচিত নয়'।

'না, বাবু। ঝকঝকে কাচা খাকিই তো সাহেববাবুরা পরে'।

গোবিন্দ একটুকাল চুপ কবে থেকে বললো, 'যুদ্ধটাকে আমি মানুষের কাজ বলে মনে করি না'।

'যুদ্ধ যদি খারাপই হবে, তবে বাবু, স্টেশনেব সব লোক এমন মনমরা কেন্, তাদের সকলের মুখ ফ্যাকাসে দেখায় কেন্ যুদ্ধের জেল্লা কমায়'।

মাধাই কথাটা বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটলো। এতক্ষণে তার বিদ্যাবুদ্ধির হাঁড়ি ভেঙে গেলো। কিন্তু অবাক করলো গোবিন্দবাবু, উৎসাহ তার চোখ দুটি ঝকঝক করে উঠলো।

'তুই লক্ষ্য করেছিস মাধাই, এত অনুভব করেছিস'?

মাধাই মাটির দিকে চোখ রেখে রেখে কথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বললো, 'সব যেন জল জল লাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এ যেন্ কেমন, এ যেন্ বাঁচা না। যুদ্ধ থামে সব যেন আডায়ে গেলো'।

গোবিন্দ বললো, 'তোর দেখায় খুব ভুল নেই ; এখন বাসায় যাচ্ছি, পরে তোর সঙ্গে কথা বলবো'।

একদিন গোবিন্দ মাধাইকে ডেকে স্টেশনের বাইরের আর একটি বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। সে লোকটি স্থানীয় রেলস্কুলের হেডমাস্টার।

গোবিন্দ বললো, 'মাস্টারমশাই, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারোনি, কিন্তু মাধাইকে জিজ্ঞাসা করো, সেও দেখতে পাচ্ছে, নেশা ছুটে যাওয়া মাতালের মতো হয়েছে স্টেশনেব লোকগুলোর অবস্থা, সমস্ত দেশটাতেই এমন অনেক দেখতে পাবে'।

মাস্টারমশাই বললো, 'মাধাই কোনটা চাচ্ছে—নেশা ছাড়া অবস্থাটা, না, আবার নেশা করে বুঁদ হতে'?

'কোনটা চাচ্ছে তা নিজেই একসময়ে ঠিক কববে, আপাতত যুদ্ধটাকেই ওর ভালো লাগছে নেশার

জন্য। ও বুঝতে পারছে ঘোরটা কাটার মতো হয়েছে, নীলচে দেখাচ্ছে সবার মুখ। সময়টা অস্বস্তিকর'।

সে নিজেই এতসব কথা বলতে পেরেছে নাকি কোনো সময়ে, এই ভেবে বিস্মিত হলো মাধাই। কথাগুলি তার মনের কথা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাধাই একটা কাজ পেলো। যুদ্ধের নেশা ছুটছে, তখন আর এক নেশা ধরিয়ে দিলো গোবিন্দ এবং মাস্টারমশাই। দেখালো, যেন সে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করে এই নতুনতর নেশার জন্যে দরখাস্ত করেছিলো। তারা হয়তো তার অনুভূতির কথা শুনে তাকে এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলো, হয়তো-বা হাতের কাছে তাকে না পেলে অন্য কোনো অসন্তুষ্ট আত্মাকে তারা খুঁজে বার করতো, কিংবা কোনো ঘুমন্ত আত্মাকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করতো। আর মাধাই নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ দিয়ে এটাকে নেশায় পরিণত করলো।

মাধাই প্রথমে নিজেব সমশ্রেণীর মধ্যে কথাটা বলে বেড়াতে লাগলো, শেষে সাহস পেয়ে বাবুদের মধ্যে। সময় পাখা মেলে উড়ে যায়। এমন নেশা লাগলো মাধাইয়ের, রান্না করে খাওয়ার সময়টুকুকেও অপব্যয় বলে মনে হয়, কোনো কোনো দিন সে হোটেলেই খেয়ে নেয়। প্রথম প্রথম সে মাস্টারমশাই আর গোবিন্দর কাছে কথা বলা শিখেছিলো, একসময়ে তারও আর দরকার হলো না।

মাধাই বলে, 'টাকার নেশায় তোমাদের পাগল করে দিছিলো, এবার টাকা গুটায়ে নিবে, নেশাও টুটবি'।

'জিনিসপত্তব তো আগুন, টাকা না থাকলি তো খাওয়া-পরা বন্ধ'।

'তোমরা ঠিক পাও নাই, কিন্তু এদেশের বারো আনা লোক এ কয় বছর সেসব বন্ধ করে আছে। কোন্‌কাব কোন্ দুই রাজা কবলো যুদ্ধ আর আমরা হলাম বোকা'।

জয়হবি যদি বলে, 'তুই কী বলিস, যদি তাড়ায়ে দেয়'?

'দিবি? তা দিউক। রাতারাতি লোক আসে কাজ চালাবের পারবি? তা পারুক। সারা ভারতের সকলেই যদি কয়, থাকলো কাজ কাম। তাইলে'?

'তাইলে হয়, কিন্তু সকলেই কি শুনবি'? মনিরুদ্দিন পোর্টার হাসতে হাসতে যোগ দেয়।

মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো দুলিয়ে মাধাই বলে, 'প্রথমে এই স্টেশনে কয়জন রাজী হইছিলো? এখন কয়জন হইছে'?

'তা হইছে'।

কিছুদিন যেতে-না-যেতে স্টেশনের কর্মচারীরা মিলে রীতিমতো সংঘ স্থাপন করলো। সদর থেকে কয়েকজন বক্তা এলো, সংঘমন্ত্রী, সভাপতি ইত্যাদি নির্বাচন হলো। গোবিন্দ বা মাস্টারমশাইয়ের নামও কেউ করলো না। শেষ সারিতে সকলের পেছনে যেখানে তারা তিনজন দাঁড়িয়ে ছিলো মাধাই সেখান থেকে অগ্রসর হতে যাচ্ছিলো, গোবিন্দ ইশারা করে তাকে নিষেধ করলো।

সেই মালবাবু চলে গেছে। বদলি নয়, চাকরি ছেড়ে দিয়ে। মাধাই আরো জানতে পেরেছে যাবার আগে কিছু নগদ টাকা তাদের সংঘকে দিয়ে গেছে গোবিন্দ, আর বলে গেছে মাস্টারমশাইকে, যদি সংঘের কাজ করতে গিয়ে মাধাই কখনো চাকরি খোয়ায়, সে যেন তার কাছে চলে যায়। ঠিকানা রেখে গেছে।

বস্তুত গোবিন্দকে মাধাই চিনতে পারেনি। স্টেশনের আর কেউ পেরেছে কিনা সে খবর মাধাই রাখে না। কিন্তু লোকটির ব্যক্তিত্ব যতই দুরধিগম্য হোক, মিথ্যা নয়। একটি রাত্রির কথা মাধাইয়ের মনে পড়ে—গোবিন্দর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিলো মাধাই ও মাস্টারমশাইয়ের। এ সম্বন্ধে প্রথমেই মাধাইয়ের যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে—আচ্ছা, বলো, কী দরকার ছিলো এমন করে মাধাইয়ের সঙ্গে একত্র বসে খাওয়ার, তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করার? সেই আহারের আসরে সংঘের কথাও উঠেছিলো।

গোবিন্দর একটা কথায় মাস্টারমশাই হেসে বললো, 'গোবিন্দ, তুমি কোলম্যানকে যা বলবে তারই কি মহলা দিচ্ছো? দ্বিধাহীন প্রচেষ্টা ছাড়া এমন হয় না তুমি যা করলে'।

'তোমাকে তো বলেছি সংঘ গঠন করা কত সহজ তাই দেখলাম। সব মানুষের প্রাণের ভিতরে সুখী

হওয়ার ইচ্ছা আছে, তার সব চেষ্টায় থাকে নিজের সুখ আহরণের উদ্দেশ্য ; এর আর একটা রূপ অন্যকে সুখী হতে দেখলে অসূয়া, ক্রোধ ইত্যাদি। উপর স্তরের বলো, বিদগ্ধ স্তরের বলো, তারা সুখের প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করে না। শ্রমিকরা বিদগ্ধ নয়, তাদের অসূয়া ও ক্রোধকে অতি সহজে খুঁচিয়ে তোলা যায়'।

'আচ্ছা গোবিন্দ, তোমাকে কি এতদিনের পরে আমাকে নতুন করে চিনতে হবে? এসব বলে তুমি কেন মাধাইয়ের মন ভেঙে দিচ্ছো'?

'মাধাই শ্রমিকের জাত নয়। তুমি কি লক্ষ্য করেছো, অন্য কোনো শ্রমিক তার জীবনটাকে শূন্য বোধ করছে? সেই কথা বলে বেড়াচ্ছে'?

'তুমি কী বলতে চাও, বলো তো'? মাস্টারমশাই একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন গোবিন্দর মুখের সামনে বসিয়ে দিলো।

'দ্যাখো মাস্টারমশাই, তোমার বহু অভ্যাসে অর্জিত তর্কশক্তি আমার নেই। কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। একটা ঘটনা শোনো। একদিন এক টেলিফোন অফিসে রাত কাটিয়েছিলাম আমি ; সারারাত চিন্তাকুল হয়ে থাকলাম—ঘুমের মতো বিষয়কে বিদায় দিতে হলো কার অভিশাপে। নানা যুক্তিতর্ক এলো মনে। অবশেষে স্থির করলাম, ব্যবসাদারের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। সারারাত পাট, তোষাপাট, বেল ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। তোমার কথামতো তখনো বাইরে থেকে দল গড়াব চেষ্টা করেছিলাম। পরে দেখলাম তারা কেউ রাতজাগা বন্ধ করার পক্ষে নয়, আরো রাত জাগতে চায় আরো টাকা পেলে। তা গুহায় যখন মিসেস পিল্টডাউনকে নিয়ে ঘুমুতাম, তখনো খড়্গদাঁত বাঘের উৎপাতে ঘুম হতো না, এখনো দেখছি তেমনি আছে'।

'এই তোমার স্বরূপ? তোমাকে আমি চিনি গোবিন্দ'।

'এটা তোমার গর্ব, আমি নিজেকেই চিনি না। কখন ইউলিসিস, কখন রামচন্দ্র, কখন অশোকের কোন সেনাপতি হয়ে দাঁড়াচ্ছি এ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আমার মন তোমার কোনো ইকুয়েশনে ধরা পড়ে না। আমি সাবালক মানুষ। ঈশ্বরেচ্ছা কিংবা ইতিহাস আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে না'।

আহার হয়ে গিয়েছিলো। গোবিন্দ তোয়ালেতে হাত মুছে একগোছা চাবি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার ভৃত্যটি আহার্যের পাত্রগুলি তুলে নিয়ে গেলো। তারপর সে টেবিলে নতুন কাপড় বিছিয়ে কতগুলি ঝকঝকে গ্লাস রেখে গেলো। এরকম ছোটো ছোটো অদ্ভুত চেহারার গ্লাস দিয়ে কী হয় মাধাইয়ের জানা ছিলো না।

গোবিন্দ একটা মদের বোতল নিয়ে ফিরে এলো। সেই ঠাণ্ডা মধুর মদ মাস্টারমশাই ও গোবিন্দ অবিমিশ্র চালাতে লাগলো।

মাস্টারমশাই বললো, 'অতঃপর তুমি কী করছো, গোবিন্দ'?

'চাকরি থেকে বিদায় নিচ্ছি'।

'যদি শুনতে পাই মানস সরোবরের পথে হাঁটতে শুরু করেছো, তাহলে বোধ হয় আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না'।

'তা হয় না,' গোবিন্দ হাসলো, 'আপাতত একটা সখ চেপেছে মাথায়। ছোটো একটা স্টিমার চাই ; পিতাজীর কোম্পানি রাজী হয়েছেন। বলেছি ডাঙার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে হংকংটা ঘুরে আসি। তাঁকে তাঁর উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের ব্যবসায়ের কথা বলেছি, খুব প্রচার করে আসবো—যুদ্ধের পর শান্তির অভিযান। অবশ্য পিতাজী এতদিনে বুঝতে পেরেছেন তাঁর ব্যবসায়ে জেলের ভয় আর নেই, সুতরাং আমাকে ম্যানেজার করা যায়'।

'সঙ্গে কেউ যাচ্ছেন'?

'শুনতেই চাও? সুধন্যাকে মনে আছে'? গোবিন্দ নির্লজ্জের মতো হাসলো।

'তার কি এখনো পঞ্চাশ পার হয়নি'?

'ওটা তোমার বাড়িয়ে বলা। ত্রিশ পেরিয়েছে বটে'। গোবিন্দ উদ্দীপ্ত হলো, 'তোমার মনে আছে মাস্টারমশাই, আমার কিশোর দৃষ্টির সম্মুখে সুধন্যার যৌবনধন্য রূপের পদচারণ? হাঁ করে চেয়ে থাকার জন্যে কতই-না তিরস্কৃত হয়েছি। সেই অগ্নিময়ী এখন আর সে নয়—আর সে জন্যেই মনটা কেমন করে তার জন্যে। আচ্ছা, মাস্টারমশাই, রমণীর অনন্য রূপ আর অসাধারণ কণ্ঠ কি একটিমাত্র পরিবারের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা উচিত, না তার জন্যে ট্রয়ের যুদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়? আমার তো মনে হয় মহাকবিরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি হেলেনের মতো মানসকন্যা একটিমাত্র রাজার রানী হয়ে ধীরে ধীরে জরা ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে'।

'নারী জাতিকে অবশ্য তুমি সম্পত্তি বলে চিন্তা করছো, গোবিন্দ ; তাদের মধ্যে কোহিনুর যারা তাদেব জন্যে নাদিরের লোভকেই তুমি তাদের মূল্যের স্বীকৃতি বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছো'?

'না, ঠিক তা নয়। ওই রূপ এবং ওই রুচির মূল্য কী করে দেওয়া যায় তাই ভাবছি। একটি পুরুষ কতটুকু মূল্য দিতে পারে'?

মাস্টারমশাই কথা বললো না, তার মুখখানা থমথম করছে।

'উত্তর দিলে না'? গোবিন্দ বললো।

'তাহলে সুধন্যা যাচ্ছেন? বিয়ে করবে তো'?

'আদৌ না', গোবিন্দ হেসে উঠলো, 'আমি শুধু জানতে চাই তিনি কেমন অনুভব করলেন জীবনটাকে। দশ বছরে অধ্যাপিকার জীবনে কী কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাই শুধু বুঝবার চেষ্টা করবো : ঘটনা নয়, রটনা নয়, শুধুমাত্র তাঁর মন কোথায় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিঘাত করেছে। দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি পাশাপাশি ডেকচেয়ারে বসে এমন কিছু নাটক-নভেল পড়া যায় না নিঃশব্দে। তখন কথা হবে। তোমাকে অবাক করার জন্যে বলছি না, সুধন্যাকেও এসব বলেছি'।

গোবিন্দ চলে যাওয়ার পরে একদিন ওভারব্রিজের সিঁড়ির মুখে দেখা হলো মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, মাধাই বাজার করা ভুলে কথা বলতে বলতে তার বাড়ি পর্যন্ত এসেছে।

'ও তো তোমার মতো খেটে খাওয়ার লোক নয়, ওর কথা আলাদা। ধরো পদ্মায় ঝড় উঠেছে, নৌকো টলছে, তখন অন্য সকলে মাটির দিকে ছুটবে ; আর দু'একজন হয়তো ছুটে যাবে জলের দিকে, ঝড়ের আঘাতে বড়ো বড়ো ঢেউগুলো যেখানে শাদা ফেনা হয়ে যাচ্ছে সে জায়গাটাই তাদের লক্ষ্য। এমনি এক জাত গোবিন্দর'।

'আচ্ছা বাবু, আমাকে তিনি খুব ভালোবাসেন, না? কিন্তু আমার কী গুণ আছে'?

'ভালোবাসার কারণ বলা যায় না। তুমি খুব বেশি করে বাঁচতে চাও, গভীর করে বাঁচতে চাও সেইজন্যে বোধ হয়। তোমাদের স্বভাবে খানিকটা মিল রয়েছে এই একটা জায়গায় অন্তত'।

'গভীর করে বাঁচা' কথাটা শিখলো মাধাই। তার মনের অব্যক্ত আবেশটি ভাষায় রূপ পেলো।

মানুষের চরিত্র কী করে সৃষ্টি হয় তা বলার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। মাধাইয়ের জীবনের ঠিক এই জায়গাটায় কিছুদিন ধরে গোবিন্দর সঙ্গে তার আলাপ তার চরিত্রের আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছে। এ পরিচয় তার জীবনের একটি ঘটনা যার কার্যকারণ সম্বন্ধ হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরকমটা প্রায়ই হয় : চারিদিকের চাপে চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে, অস্ফুট কথাগুলি মনের গভীরে গিয়ে হয়তো-বা চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করছে। গোবিন্দও ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র গোবিন্দ হয়নি। বহু জীবনের ছাপ রয়েছে তার চরিত্রে, যেহেতু সে শিক্ষিত হয়তো-বা বহু পুস্তকের ছাপও আছে। পরে একদিন সুধন্যার অধ্যাপিকা-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও তার চরিত্রকে অন্তত আংশিকভাবে পরিবর্তিত করবে। অথবা ঈশ্বর কিংবা

অর্থনীতির ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব তার জীবনকে বিধৃত করে না বলে সে নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে যতদূর পারে অগ্রসর হবে।

সংঘের কাজকর্মের সঙ্গে যাতে মাধাইয়েব প্রত্যক্ষ যোগ না-থাকে সে ব্যবস্থাই করে গেছে গোবিন্দ। আবার সময় কাটানো কঠিন হলো মাধাইয়ের। একথা ঠিক নয় তার যথেষ্ট সময়, চাকরি ছাড়াও নিজের আহাব প্রস্তুতের কাজ বয়েছে, নিজেব বেশভূষার ব্যবস্থা করতেও তাব খানিকটা সময় যায়। আসলে সে অনুভব করে একটা নেশা ধরেছিলো আর একটা যখন ছাড়ছে, সে নেশাটাও ফিকে হয়ে আসছে। কোনো একটি বিষয়ে মেতে উঠতে না-পারলে যেন শান্তি নেই।

মাস্টারমশাই একদিন তার ঘরে এসে উপস্থিত। মাস্টারমশাই গোবিন্দ নয়।

'মাধাই আছো'?

'আজ্ঞে'? মাধাই ধন্যর চাইতেও ধন্য হলো। একজন অত বড়ো বিদ্বান প্রধানশিক্ষক তার দরজায় দাঁড়িয়ে।

'তুমি তো আজকাল সংঘটার দিকে লক্ষ্য রাখছো না বাপু'।

'বাবু...' মাধাই লজ্জিত হলো।

'নিজেব হাতে তৈরি জিনিস তোমাব। তুমি একা যা করেছো ওরা পাঁচজনে মিলে তা পারছে না। তেমন বুক দিয়ে পড়ে কাজটা তুলে দিতে কারুকে দেখছিনে। এটা ভালো লাগছে না বাপু'।

'আচ্ছা বাবু, আমি যাবো। যদি সংঘের বাবুরা রাগ না-কবেন, আমি কথাও বলবো'।

কিন্তু মাস্টাবমশাই চলে যেতেই মাধাই ভাবলো—দূব কবো! এ আর ভালো লাগে না। নিজের কী হলো দেখার সময় নেই, কথা বলতে বলতে গা গরম হয়ে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়।

স্টেশনে গিয়ে শুনলো সংঘেব গোলমাল আর কিছু নয়, কলকাতা শহব থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে গোপনে গোপনে কাজ করছে, তাব ফলে লোকোশেডেব শ্রমিকরা একটা আলাদা সংঘ তৈরি কবেছে, দলাদলি শুরু হয়েছে। তাদেব কেউ পুরনো সংঘেব বাবুদের দোষ দিচ্ছে, বাবুদের কেউ কেউ তাদের দোষ দিচ্ছে। মাধাইয়ের অজ্ঞাত অনেক রাজনৈতিক গালি এ-দল ও-দলকে বর্ষণ করছে। মাধাই স্টেশনের চায়ের দোকানের একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললো, 'কী হিংসে, কী হিংসে'!

তবু মাস্টারমশাইয়ের সম্মান রাখার জন্য সন্ধ্যার পব মাধাই জয়হরিকে সঙ্গে নিয়ে বার হলো।

'কোথায় যাবা'?

'চলো, লোকোশেডের পাড়ায়'।

স্টেশনের পশ্চিমে লোকোশেড, আর লোকোশেডের পশ্চিমে ক্লিনার-ফিটার-সান্টার প্রভৃতি কর্মচারীব বাস।

জয়হরি বললো, 'এমন হাই হুই করে বেড়াতি তোমার কী ভালো লাগে তা বুঝি না, মাধা'।

'তুমি বুঝবা কেন, স্টেশনের গাড়ি থেকে মাছ চুরি করবা, ধনে লঙ্কা সরাবা। কিন্তুক চুপ করে বসে থাকে কী লাভ? জীবন ফুরায়ে যায়'।

'ছুটাছুটি করলেও ফুরাবি'।

'জংধরা এঞ্জিন হয়ে লাভ কী'?

'শরাব পিয়ো, বেরাদার'। জয়হরি বললো।

'ওরে আমার হিন্দুস্থানী রে'! মাধাই হাসলো। একটু পরে বললো, 'আজ লোকোশেডের লোকদের কয়ে আসতে হবি, তারা বাঁচে আছে না মরে আছে'।

'বাঁচে সকলেই, তোমার মতো কেউ জীয়ন্তে মরা না। সুখ আছে, আহ্লাদ আছে, মদ আছে, মিয়েমানুষ আছে। হৈ-হৈ করো, সোডাপানির মতো ছিটেফিটে ওঠো, তা না। কেবল দুঃখকষ্ট ঘোলায়ে তোলো'।

'আমি কি দুঃখকষ্ট ঘোলায়ে তুলি'?

'হয়, কষ্ট ভুলে থাকবের দেও না, চিল্লাচিল্লি করো। একদিন কেউ তোমাকে ঐজন্যি মার দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিবি'।

কথাটা আর এগুলো না। লোকোশেডের খালাসিদের মধ্যে মাতব্বরস্থানীয় আবদুল গনি ফরাজি আসছিলো সেই পথ দিয়ে। সেলাম বিনিময়ের পর আবদুল গনি জিজ্ঞাসা করলো, 'রাত করে কনে'?

'আপনেদের পাড়ায়'।

'কী কারণ'?

মাধাই বললো, 'এই একটুক সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা'।

আবদুল গনি এত বয়সেও এমন অদ্ভুত কথা শোনেনি, দোলদুর্গোৎসব, ইদ-মহরম নয় তবু লোকে চলেছে এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়ায় সুখদুঃখের কথা বলতে। বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো, মাধাইয়ের হাত ধরে বললো, 'চলো ভাই, চলো'।

নিজে সে কোন কাজের ধান্দায় কোথায় যাচ্ছিলো তা-ও ভুলে গেলো।

অল্পকিছু দূরে গিয়ে একটা চায়ের দোকানের সম্মুখে থামলো আবদুল গনি। ভিতরে যারা কোলাহল করছিলো, তাদের কয়েকজনকে আহ্বান করে আবদুল গনি বললো, 'ইউনুস, মেহের, ফটিক, দেখ দেখ কারা আসেছে। ইস্টিশনের নোক'।

দোকানটায় দেশী মদও বিক্রি হয়। মুড়ি-মুড়কি থেকে চপ-কাটলেট নামক একপ্রকার পদার্থ পর্যন্ত। লম্বা ময়লা দু-চারখানি বেঞ্চ ইতস্তত ছড়ানো। কেরোসিনের লাল আলোয় ইউনুস প্রভৃতি খাওয়াদাওয়া করছিলো, আবদুল গনির ডাক শুনে দোকানের দরজার কাছে উঠে এসে এদের অভ্যর্থনা করলো।

সকলে আসন গ্রহণ করলে আবদুল গনি বললো, 'এমন খুশির দিন আর হয় না, একটুকু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করো, অ রজনি'!

দোকানের মালিক রজনী বললো, 'কী ব্যবস্থা, চা, না বড়ো-চা'?

স্কুলের হাইবেঞ্চের অনুরূপ একটা লম্বা টেবিলের দু'পাশে এরা মুখোমুখি বসেছিলো। রজনী দু-তিনটে দেশী মদের বোতল ও প্রয়োজন মতো মাটির খুরি রেখে গেলো। কিছু ভোজ্যও এলো।

জয়হরি বললো, 'আনন্দ দিলেন খুব'।

'পাতেছিও অনেক'। এ পক্ষের থেকে ইউনুস বললো।

মাধাই বললো, 'আপনাদের কাছে আমি আসেছিলাম এস্‌সিওসনের কথা বলতে'।

'বেশ, ভালো, কন'।

'আপনাদের মধ্যে এখনো অনেকে মেম্বর হন নাই'।

'তাইলে তো লজ্জার কথা। তা এদিকেও সেই কোলকেতা শহরের বাবুরা কী বলে, কী কয়। হলে আপনের কাছে মেম্বর হবো। মায়নার দিন আপনে একবার আসবেন। তা দেখেন, দোষও দেওয়া যায় না। সারাদিন খাটনির পর বাসায় আসে খাওয়া শোওয়া ছাড়া আর কিছু মনে থাকে না'।

মাধাই সংঘের গুণপনা বর্ণনা করে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কারো মুখের দিকে চেয়েই সে উৎসাহ পেলো না।

মাধাই বুঝলো সংঘের সভ্য এরা হবে, একদলে থেকে দলে ভারি হওয়ার সুবিধা সম্বন্ধে এরা হুঁশিয়ার কিন্তু সংঘ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলাপ করতে ভালো লাগবে এমন লোক এরা নয়। ততক্ষণে জয়হরি ও ইউনুস কী একটা কথা নিয়ে চাপা হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

আবদুল গনি বললো, 'হাসতিছো কেন্ তোমরা'?

'না, তেমন হাসি কই! আমাদের মিস্ত্রিসাহেব ফটিকের কথা একটু কতিছি'।

'কী কথা ভাই, কী কথা'? দু'তিনজনে প্রায় সমস্বরে বললো।

ফটিকমিস্ত্রি এবং ইউনুস সান্টারের কোয়ার্টার্স পাশাপাশি। ইউনুস মাঝে মাঝে ফটিকের ঘরের কথা বাইরে টেনে আনে ; হাসাহাসি হয়। ফটিক নিঃসন্তান এবং স্ত্রীর উপরে তার মমতা সাধারণের চাইতে বেশি।

ইউনুস বললো, 'না, তেমন কী। ফটিকের কপালে কালি লাগে আছে। তা জয়হরি কয়, কাজল কীসের'।

ফটিক বললো, 'কী কও তোমরা, কাজল কই? এঞ্জিনের কালি'।

'আমু তো তাই বলি। জয়হরি কয়, পাশের বাসায় থাকি বলে দোষ ঢাকতিছি। কেন্, দোষ ঢাকার কী আছে? বউ যদি কারুকে কাজল পরায়, দোষ কী'?

ফটিক তাড়াতাড়ি কাপড়ের খোঁট তুলে কপাল ঘষতে ঘষতে বললো, 'আরে এঞ্জিনের কালিও চেনো না ; দাঁড়াও তোমাদের দেখাই, মবিলের গন্ধও পাবা'।

কপাল ঘষে লাল করে কাপড়ের খোঁটটা চোখের সম্মুখে মেলে দেখলো ফটিক, এতটুকু কালির দাগ কাপড়ে ওঠেনি। এরা কিন্তু ফটিকের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। ফটিক ভাবলো কালিটা বোধ হয় গালে লেগে আছে। আবার কাপড়ের খোঁট তুলে সে দুটি গালই ঘষতে লাগলো। এবার সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

আবদুল গনি বললো, 'কেন্ ভাই, তোমার মন এমন দুব্বল কেন্? ওরা ঠাট্টা করলো আর তুমি অমন করে মুখ ঘষলা'!

ফটিক হাসতে হাসতে বললো, 'কওয়া যায় না, শালীর অমন সব আছে তুকতাক। কালি লাগায়ে দিলিও অবাক নাই। দেয় মাঝে মাঝে'।

হাসি থামলে মাধাই আর একবার চেষ্টা করলো তার বক্তব্যটা উত্থাপন করতে, কিন্তু ততক্ষণে স্ত্রীদের নিয়ে কথা অত্যন্ত জমে উঠেছে।

জয়হরি পরম জ্ঞানীর মতো বললো, 'তা যা-ই বলো ভাই, ছেলেপুলে না-থাকলে শুধু কাজলে সোয়ামীকে বউরা আটকাবের পারে না সবসময়'।

মেহের বললো, 'ঠিক, ঠিক'।

আবদুল গনি বললো, 'বিলকুল ঠিক'।

মেহের বললো, 'চাচামিঞা, তোমার সেই কেচ্ছাটা কও'।

আবদুল গনি বললো, 'কেচ্ছা আর কী, সামান্যই এক কথা'।

'না-না, কও'।

আবদুল গনি বললো, 'তখন আমার যৈবনকাল। পনেরো-ষোল বছরে বিয়েসাদি দিয়ে বাপ মনে করছিলো উড়ু উড়ু ছাওয়াল চাষবাসে মন দিবে। দুর! বলে চলে আসলাম। আট বছরের বউ, কালো কিট্‌কিটা, জ্বরে ভোগা, ভাতের জন্যি দিনরাত কাঁদে এমন বউ। আসে এই লোকোশেডে কাম নিলাম। একটু একটু করে কাম শিখলাম। তখনকার দিনে আমি নাম সই করবের পারতাম না, তা চিঠি লেখা। আর চিঠি লেখবো কাকে? বাপ মা বউ কেউই অক্ষর চেনে না। আর বউ! বউ কয় নাকি আট বছরের সেই কালো কিট্‌কিটা মেয়েডাকে। দশ বছর বাড়ি যাই নাই, চিঠি দিই নাই। ততদিনে আমি সান্টার হইছি। মন কলো বাড়ি যাওয়া লাগে, বাপ-মা আছে না গেছে কে জানে! হঠাৎ বাপের জন্যি বড়ো কষ্ট হবের লাগলো। বাপ খুশি হবি জানলি—ছাওয়াল সাহেবের এঞ্জিন চালায়। অনেক পথ হাঁটে-হাঁটে যখন গাঁয়ে ঢুকলাম, তখন দেখি, ও মা, এ কী? গাঁয়ে ঢোকার পথে, বুঝছ না, নতুন এক খ্যাড়ের বাড়ি, ঝকঝকে বালিমাটিতে তোলা নতুন বাড়ি, এক বর্ষাও পড়ে নাই তার গায়ে এমন, মনে কয় খ্যাড় পোয়াল থিকে

ধানের বাসনা উঠবি। দেখি কি, সে বাড়ির দরজায় দাঁড়ায়ে এক কন্যে। কী যে রূপ! বুঝলা না, কটা-ফরসা না, কালো-কোলো, কিন্তুক রূপের বান ; মনে কলো, নাকানি-চোবানি খাওয়া লাগে তো এমন বানে। কিন্তুক কার বাড়ি চিনবের পারলাম না। এ বাড়ি আগে ছিলো না এ পাড়ায়'।

'তোমার নিজের বউয়ের কী হলো, তার কথা কলে না'?

'আরে দুর, সেও নাকি এক বউ! আট বছরের মিয়ে বউ হওয়ার কী জানে। কিন্তুক বড়ো কষ্ট পালাম রে। বাড়ির কাছে যায়ে দেখি, বাড়ি নাই, ঘর নাই, চষা খেত সেখানে। হায়-হায় করবের লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাস করলাম—বাপ কনে, মা কনে? তুমি কেডা?—না, আবদুল গনি সাল্টার, এইখানে আমার বাড়ি ছিলো। কেউ কলে, বাড়ি যেন্ ছাড়ে আলে, তোমাক চিনি না, এইখানে যার বাড়ি ছিলো সে উঠে গেছে বড় সড়কের ধারে। ফিরে যায়ে দেখি সেই নতুন খ্যাড়ের বাড়ির দরজায় আমার বুড়া বাপ বসে। বাপ আর ছাওয়াল কাঁদাকাটা করলাম, মা আর ছাওয়াল কাঁদাকাটা করলাম, আর দেখি, ভাদুই পদ্মা, থমথম-যৈবন এক মিয়ে। —আম্মা! —কী? —না, ওই মিয়ে কার? তোমার সেই বেটাবউ কনে গেছে যাক, আমি কৈল ওই মিয়েক ছাড়বো না। কও, সম্মন্দে আটকাবি? আম্মা কয়—আটকাবি নে। সাঁঝকালে দেখি মিয়ে জল আনবের যায়। বুঝলা না, চুল বাঁধেছে, সুর্মা কনে পায়, সুর্মাও দিছে চোখে। সামনে আগায়ে কলাম—মিয়ে, পেরান আমার যায়। না—কী হলো, পোকায় কাটছে? না। তো কী? মিয়ে, তোমার ওই পরীমুখ দেখছি, ওই হাঁটন দেখছি, আর আমি বাঁচবো না। নজ্জা পায়ে সে ক'লো—আমি যে নিকা করছি, ছোটোকালে একজনের সাথে নিকা হইছে। কই—যদি বাঁচে থাকে সে, তালাক দেও। সোভানাল্লা, কয় কী!—না—তার কী অন্যাই। আমি দেখবের ভালো না, সেজন্যি সে চলে গেছে, তাক আমি তালাক দিবের পাববো না। কাঁদেকাটে একছা হলাম, মিয়ের মন গলে না। ভাবলাম রাত্তিরে লুকায়ে পাবি তো আরও দু'এক কথা কাঁদাকাটা করবো'। আবদুল গনি হাসতে লাগলো, তার শাদা দাড়িগুলি সুন্দর দেখাতে থাকলো।

'সেই মিয়ে'?

'না-বুঝে থাকো, বুঝে কাম নাই'।

জয়হরি বললো, 'আপনার সেই কালো কিটকিটা বউ'?

'সে-ই'।

ইউনুস বললো, 'আরে কই হ্যায়, লাগাও দুই বোতল আর'।

'আবার'? মেহের প্রশ্ন করলা।

'আড্ডা জমেছে আজ'।

দোকানীব লোক যথোচিত ব্যবস্থা করলো।

মেহের বললো, 'আমাব বউয়ের কথা আর কয়ো না। বিটি যে এমন ভালোবাসা কনে শিখলো কে জানে। কিন্তুক বড়ো রোগা হয়ে যাতিছে, কী করি বুঝি না'।

জয়হরি বললো, 'ভাত, ভাত, পেট ভরে ভাত খাবের দিয়ো'।

পাত্রে পাত্রে মদ পরিবেশন করে ইউনুস বললো, 'দুনিয়ার সার এই মদ, দুনিয়ার বার ওই মিয়েমানুষ। যদি কামে কাজে থাকবের চাও, যদি ওভারটাইম করবের চাও, একটুক একটুক শরাব খাবা, তন্ দুরস্ত। আর যদি মন খারাপ হয়, ভাইসব, মনের মতো মিয়েমানুষ খুঁজে বার করবা। মনের কথা তাক কয়ে হাল্কা হবা। দুনিয়া-ছাড়া হবা তাক্ নিয়ে'।

সেদিনের আড্ডায় সংঘের কথা হলো না। সে বারের মদের পাত্রগুলি নিঃশেষিত হলে আর কিছুকাল হাসাহাসি গালগল্প করে যে যার বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলো।

আবদুল গনি প্রথম কথা বলেছিলো, সে-ই শেষ কথা বললো, 'ভাই, বউ না-থাকতো যদি মক্কায় যাতাম ; বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। শালা, এই এঞ্জিন ঠেলে বেড়াতাম না। বাড়ি মানেই তো বউয়ের

বাড়ি, কও ? মাধাই, আবার আসেন একদিন। কী আনন্দই পালাম, কী আনন্দই দিলেন। যাতেছিলাম ডাল আলু কিনবের। বউ বকে তো চুপ কবে থাকে পরে সেই পদ্মায় জল আনার কথা মনে করায়ে দেবো'।

আবদুল গনির মাথার চারিদিকে না-হোক, তার মুখে চোখে শাদা দাড়িতে শান্তির কিরণ চকচক করে উঠলো।

আবদুল গনি দলবল নিয়ে লোকোশেডের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। একটা ছোটোখাটো চাঁদ উঠে পড়েছিলো, তার বাঁদর রঙের আলো পাথরের টুকবোর অমসৃণ পথে পডছে। ইঞ্জিনখানার কালিমাখা এই পুরুষ কয়েকটি তখনো সম্ভবত স্ত্রীদের নিয়েই আলোচনা করছে, তার ফলে তাদের হাসাহাসির শব্দ দূর থেকে কানে আসছে। এরা সুখী কিনা তা নির্ণয করা কঠিন। সুখের কোনো জাত্যগুণ সহসা চোখে পডে না যে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাবে। আত্মা যদি একটি কল্পনামাত্র হয়, সুখ ও দুঃখ তবে একই বিষয় স্নাযুব কুঞ্চন-প্রসারণমাত্র। এদের মধ্যে যে স্নায়ু-উৎক্ষেপগুলি আত্মবিস্তাব ও আত্মরক্ষণের পক্ষে সহায়ক সেগুলিকে সুখ বলা যেতে পারে। বেঁচে আছি, বেঁচে আছি—এ অনুভবের চাইতে গভীর আর কোন অনুভূতি ? মনের এ অবস্থায় রুগ্ন দেহকেও সবল বোধ হয, প্রাচীন বটের পাশে দাঁড়িয়ে তার মতোই জীর্ণ ত্বকের গভীরে প্রাণস্পন্দিত মনে হয নিজেকে। তখন সমুদ্র উদধি, সূর্য, বৃক্ষারণ্য, হিমাচল ও প্রাণ সখা হয়। আনন্দ ও হাস্য, পরে করুণাব জন্ম। এগুলিকে জীর্ণ বা সংকীর্ণ কবতে কোনো অসার্থকতাই যথেষ্ট বিদ্বেষপরায়ণ নয়।

চিন্তা-ভাবনা নির্জন না হলে আসে না। ফিরবার পথে জয়হবি বকতে বকতে চললো। তখন চিন্তা না করে তার কথায় কান পেতে বাখতেই ভালো লাগলো মাধাইয়েব।

কিন্তু মাস্টারমশাই লোকটিব ছাত্রদেব উপবে অবশ্যই প্রখর দৃষ্টি ছিলো। পরদিন সকালেই সে উপস্থিত হলো।

'ও পাড়ায় গিয়েছিলে মাধাই ? কথাবার্তা হলো'?

'কথাবার্তা তেমন না, গল্পসল্প আব কি'।

'কীসের গল্প, মাধাই'?

বলা কি উচিত হবে, ভাবলো মাধাই। মদ আর মেয়েদের কথা কী করে বলা যায় মাস্টারমশাইয়ের মতো লোককে।

'বলো মাধাই, মেহনতি মজুরের লজ্জার কী আছে'?

'বউদের কথা হলো'।

মাস্টারমশাই হেসে বললো, 'পৃথিবীর আধখানা বউরা, তাদের কথা বলতে লজ্জা নেই। কিন্তু তাব চাইতে বড়ো কথা, প্রথম দিনেই যারা তোমার সামনে বউদের নিয়ে আলোচনা করেছে তারা তো তোমার বন্ধু। রবিবারে খোঁজ রেখে আবার যেও'।

মাধাই কাজে যাবার আগে পোশাক পরছিলো, তখন কথাটা মনে হলো তার। মাস্টারমশাই দু'কথায় আবদুলের সব কথা সমর্থন করেছে, জীবনের সঙ্গে স্ত্রীদের যে যোগটার কথা আবদুল গনি বলেছিলো সেটা তবে মূল্যহীন নয়।

গোবিন্দর কথা মনে হলো, আর সেই সুকন্যা না কী নাম যার সেই মেয়েটির কথা। গোবিন্দবাবু কি তাকে সুখী করার জন্যেই চলে গেলো!

স্টেশনের পথে চলতে চলতে মাধাই চিন্তা করলো : তাই হয় বোধ হয়, বেঁচে থাকা তখনই ভালো লাগে যখন আপন একজন থাকে। সংঘের কাজে বিদ্বেষের নেশাটা আর তেমন ধরছে না। বাকিটুকু কর্তব্যের মতো, চাকরির মতো ভারি বোধ হচ্ছে। গোবিন্দবাবু বোধ হয় এ কথা অনেক আগেই বুঝতে

পেরেছিলো। মাস্টারমশাইয়ের অবশ্য এসবে দৃকপাত নেই, সব সময় অন্যের চিন্তায় ব্যস্ত, যেন সকলকেই পরীক্ষায় পাস করাবে।

কিন্তু মদ? কাজের ছোটোখাটো অনেক অবসরে কথাটা মনে পড়লো। মদ যদি খারাপ জিনিস না হয়, ভদ্রলোক ছি ছি করে ওঠে কেন? মন হাতড়াতে গিয়ে যে দৃশ্যটা সে খুঁজে পেলো সেটা ছি ছি করার মতোই। ধাঙড়পাড়ায় রোজই দেখা যায়, রাস্তার পাশে মরার মতো স্ত্রী-পুরুষরা পড়ে আছে, মুখের উপর ভনভন করে নীল মাছি উড়ছে। কী কুৎসিত, কী ময়লা!

তবে মদ যে পথে পথে খেতে হবে এমন কথা নয়। সাহেবরা খায়, তারা খানায় পড়ে থাকে না। গোবিন্দবাবুও খান। তাহলেও—

মাধাই 'তাইলেও' কথাটা উচ্চারণ করে ফেললো চিন্তা করতে করতে। তাহলেও মদে কী হবে। মাধাই স্বচক্ষে দেখেছে স্পেশ্যাল ট্রেনের কাচের জানলা দিয়ে কাঁটা-চামচ, তোয়ালের ফুল, কাচের আলোর সেই স্বর্গরাজ্যে বসে সাহেব-যোদ্ধারা মদ খেতে খেতে চলেছে। তখনো কিন্তু তাদের বসবার ভঙ্গিটিও নির্জীব। মুখের কথা বোলো না, যেন জোর করে কেউ তাদের পাঁচন খাওয়াচ্ছে।

মাস দু-তিন পরে আবাব একদিন মাস্টারমশাই এসে বললো, 'ঘরে আছো মাধাই'?

'আসেন, প্রণাম হই'।

'কী হলো, মাধাই'?

'কই, তেমন কিছু আর কী'!

খানিকটা সময় আলোচনা করে মাধাইকে কথার মাঝাখানে পরিখা খুঁড়ে শক্ত হয়ে থাকতে দেখে একটু থেমে হাসি হাসি মুখে মাস্টারমশাই বললো, 'তুমি কি বাঁচতে চাও মাধাই'?

আজ মাধাই অত্যন্ত দুঃসাহস প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর। সে বললো, 'তাই চাই'।

'বাঁচতে হলে ঘরদোর লাগে, অন্নবস্ত্র লাগে'।

'তা লাগে'।

'এখন যা পাচ্ছো তা যথেষ্ট নয়'।

'তা নয়'।

'যথেষ্ট পাওয়ার কী উপায়'?

'ঠিক জানি না, মাস্টারমশাই'।

'দল বেঁধে দাবি করতে হবে, দর কষাকষি করতে হবে। একসময়ে তুমি টাকার জন্য গোরুকে বিষ দিতে'।

মাস্টারমশাই তার সম্বন্ধে কতদূর খবর রাখে জেনে মাধাই বিস্মিত হলো। কিন্তু ধীরভাবে বললো, 'আর কোনোদিনই কাউকে বিষ দেবো না'।

'এখনই বলা যায় না।

'তা না-যাক, টাকাতে সুখ হয় না। আপনার টাকা আমার চেয়ে বেশি'।

'আমি তোমার চাইতে সুখী কিনা এই তো তোমার প্রশ্ন'?

'না বাবু, তা করা আমার অন্যাই। আমি পারিনে, ভালো লাগে না'।

'পরে একদিন আসবো' বলে মাস্টারমশাই সেদিনের মতো চলে গেলো। কিন্তু মাধাই মাস্টারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করলো না। ইতিমধ্যে একদিন লোকোশেড মহল্লায় গিয়ে এমন পরিশ্রম সে করলো যে সে খবর যখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পৌঁছলো তখন সে স্তম্ভিত হলো, কলকাতা শহর থেকে যে শ্রমিকনেতারা এসে পারস্পরিক নেতৃত্বের মহার্ঘতার প্রচার করছিলো তারাও বিপন্ন বোধ করলো সাময়িকভাবে।

কিন্তু ফিরতি পথে মাধাই একটা কাজ করে বসলো, সে খবর কারো কাছে পৌঁছলো না। রজনীর

দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে কিছু খেয়ে কিছু সঙ্গে নিয়ে সে বাসার পথ ধরলো। গলা সুড়সুড় করছিলো। প্লাটফর্মে উঠে অন্ধকার জায়গা দেখে আরও খানিকটা গলায় ঢেলে দিলো সে। বাসার কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো তার। কিন্তু তার মধ্যেও মন যেন বল পাচ্ছে অনেকদিন পরে। সে সম্মুখের অন্ধকার শূন্যকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠলো, 'এই ওপ'।

নিজের ঘরের বারান্দায় বসে সে একটা সিগারেট ধরালো। কয়েক টান ধোঁয়া গিলে তার শরীর অস্থির হয়ে উঠলো। শরীরকে সুস্থ করার জন্য বোতলের বাকি মদটুকু সে চুষে চুষে খেলো। তার বোধ হলো সে আর বাঁচবে না। চোখে জল এলো। অন্ধকারে শায়িত নিজের একটি বিপন্ন প্রাণকে যেন সে দেখতেও পেলো। তার মনে হলো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। ঘরে ঢুকে মাটিতে বসে বিছানায় মাথা রাখলো সে। দেহ ও মস্তিষ্ক একটি আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় মাথাই বিছানা থেকে ফসকে মাটিতে শুয়ে পড়লো। মূর্ছা ও ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় সে কখনো কখনো ফোঁপাতে লাগলো, যেন তার একটি অন্তরাত্মা আছে, এবং সেটা অত্যন্ত ব্যথিত এবং তার চাইতে বেশি ভীত হয়ে কাঁদছে।

১৫

এগোলেও মৃত্যু, পিছলেও তাই। সুরতুন একদিন একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিলো ফতেমাকে, আগুনের বেড়াপাক। মোকামে পুলিস চালের পুঁটুলি কেড়ে নেবার ভয় দেখালে টেপির মা তাদের পাল্টা ভয় দেখাতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রেনের তলায় গিয়ে বসতো আত্মহত্যার ভঙ্গিতে। সেই অভিনয় যে কত মর্মান্তিক তার পরিচয় দিয়েছে ফুলটুসির মৃত্যু। বাঁচার জন্যই চালের কারবার। চাল প্রাণ দেয় বলেই এত করা, যদি সেই বাঁচার আশ্বাস আর না থাকে, চাল যদি বিষের দানা হয়?

সমস্যা বাড়িয়েছে ফতেমা। ফতেমা গ্রামমুখো হয়ে পড়ছে ক্রমশ। দু-তিন মাস সুরতুন চালের কারবার থেকে দূরে দূরে কাটালো। অথচ অন্য কোনো জীবিকা অবলম্বন করতেও পারেনি। অবশ্য বছরের এ সময়টায় চালের কারবারে মন্দা পড়ার কথা, কিন্তু সুরতুনের বিপন্ন বোধ হয় চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে। একা একা চালের মোকামে যেতেও সে সাহস পায় না। ঠারে ঠারে কথা বলার পর একদিন সে খোলাখুলি বললো ফতেমাকে। তখন তারা দুজনে খেতে বসেছিলো। ফতেমা মুখ নিচু করে ভাতের পাত্রে হাত দিয়ে বসে রইলো। তার মুখটা বিষণ্ণ। কী একটা কথা বলতে গেলো সে, কিন্তু নিরুদ্ধ আবেগে যেন দুলতে লাগলো। এঁটো হাত দিয়ে কপাল চাপড়াতে লাগলো সে, যেন তার চোখের জল আসছে না, যা এসেছে তা প্রচুর নয়।

সুরতুন ভয়ে ভয়ে বলেছিলো, 'ভাবি, ভাবি, তুমি কি মরে যাবা'?

সুরতুন ভেবেছিলো যা এতদিনের মধ্যে একদিনও ঘটেনি সেটা এমন আকস্মিকভাবে আজ ঘটলো কেন? ইয়াকুবের জন্য ফতেমার অন্তরটা এত কাতর এ বুঝবার কোনো উপায়ই ছিলো না।

পরে ফতেমা বলেছিলো, 'যাবো মোকামে, কিন্তু এখন সেখানে ধানের দাম চড়া। কয়দিন যাক'।

'কিন্তুক বসে বসে কয়দিন খাবো? লাভের ট্যাকা শেষ হবি, চাল কেনাবেচার ট্যাকা থাকবি নে'।

'তা ঠিক'।

তবুও ফতেমার এই নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি খুঁজে পায় না সুরতুন। মানসিক ক্লান্তির সঙ্গে তার পরিচয় নেই যে সেটা ফতেমাতে আরোপ করবে। ফতেমাই বরং উৎসাহের আকর। ফুলটুসির ছেলে দুটিকে সে যেভাবে আদর করে দিঘায় গেলে, তাতে মনে হয় না পৃথিবীতে তার কিছুমাত্র দুঃখ আছে। ভাবো দেখি,শুধু আম্মা বলে ডাকা নয়, ফুলটুসির ছোটোছেলে ফতেমার বুকের কাপড় সরিয়ে তার বন্ধ্যা স্তনে মুখ ঘষতে থাকে। এর আর-একটি দিকও আছে। প্রতিবারই যাওয়া-আসার পথে ফুলটুসির ছেলে দুটিকে

রান্না করে খাওয়ায় ফতেমা। অর্থব্যয় হয়। সুরতুন একদিন এ কথা উত্থাপন করায় ফতেমা বরং বলেছিলো, যতদিন ব্যবসা চলে ভাবনা কী।

সাহস সংগ্রহে বাধ্য হয়ে সুরতুন একদিন দিঘায় এলো একা একা। সে আশা করেছিলো টেপির মায়ের খোঁজ পাওয়া যাবে। তা গেলো না, কিন্তু বন্দরের পূর্বপরিচিত এক মহাজনের আড়তে একটা কাজ জোগাড় হলো। সকাল থেকে কাজ আরম্ভ—মহাজনের গুদামঘরে নিভৃততম অংশে বসে কেরোসিন কুপির স্বল্প আলোয় বস্তাপচা চাল থেকে পোকা ঝেড়ে ফেলার কাজ। দু'বেলা খাবার জন্য ওই চাল থেকেই কিছু কিছু পায় সে। যদি সে এক মাস কাজ করে, আর এক মাস কাজ থাকে, তবে নগদ তিনটে টাকাও পাবে।

দিনের বেলায় বাজারের বটতলায় সে রান্না করে। সে এ বিষয়ে একা নয়। বটগাছটার আর এক দিকে একটি সংসার আছে। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত কৃষক, তার স্ত্রী, একটি শিশু ও একটি বুড়ি। এত দুঃখেও এরা একসঙ্গে আছে।

কিন্তু রাত্রির আশ্রয় নিয়েই হচ্ছে মুশকিল। বটতলায় একা একা রাত কাটাতে তার সাহস হয় না। মাধাইয়ের ঘরের বারান্দা আছে, কিন্তু সে ঘর থেকে মহাজনের আড়ত প্রায় এক ক্রোশ পথ, সন্ধ্যার পরে আড়ত থেকে বেরিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। যে পথটায় অনেক রাত পর্যন্ত আলো থাকে ছোটো ছোটো দোকানগুলিতে, স্বভাবতই সুরতুন সেটাকে বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু দিনেক দু'দিনে সে ভুল বুঝতে পারলো। প্রথম দিনেই সে যে বিপন্ন হয়নি, এ তার ভাগ্য বলে মনে হলো। পথটা শহরের কুৎসিত পল্লীর প্রান্ত দিয়ে গেছে। একটা সুফল হয়েছে—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানাখন্দ বেয়ে চলা জনমানব পরিত্যক্ত একটা পথ সে খুঁজে পেয়েছে। রাত্রিতে আন্দাজে হাতড়ে একলা একলা পথ চলতে গায়ে কাঁটা দেয়। উপায় কী, এই ভাবে সুরতুন—এ পথে মানুষ অন্তত নেই।

মাধাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। দৈবাৎ দেখা হলে মাধাই অভ্যাসমতো বলে, 'কী খবর, কবে আসলে'? কিন্তু উত্তর শোনার জন্য দাঁড়ায় না। একদা সুরতুনকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাধাই গল্প করেছিলো ভোর রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকারে, সেটা যে ব্যতিক্রম তা সুরতুনও জানে। বিনা প্রয়োজনে এর আগে সে অনেক কথা সুরতুনদের সঙ্গে বলেনি, তারা নিজে থেকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছে। তবু এরই মধ্যে কিছু একটা সুরতুন অনুভবও করলো। বন্দরে গিয়ে কাজ শুরু করার আগে একবার, দুপুরের পরে রান্না করতে এসে আর একবার সে গ্রামের লোকদের খোঁজ নিলো একদিন। চেনা চেনা লাগলো একজনকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো—সে চিকন্দির লোক, ঘাস বিক্রি করতে এসেছে। সুরতুন তাকে বলে দিলো সে যেন চিকন্দি যাওয়ার পথে বুধেডাঙায় দাঁড়িয়ে রজব আলি সান্দারের বেটাবউ ফতেমাকে বলে যায়, মাধাই রাগ করেছে, সে যেন আসে। এ খবর পেয়েও ফতেমা আসেনি, এবং না আসায় একরকম ভালোই হয়েছে, হয়তো মাধাই রাগ করেনি, ফতেমার কাছে আর একবার সে নির্বোধ প্রতিপন্ন হতো। এই ভেবেছে সুরতুন।

মহাজনের গুদামে চালের কাজ তিন সপ্তাহে শেষ হয়ে গেছে। সে আবার একেবারে বেকার বসে। সমস্তদিন সে মোকামের অন্য কোনো যাত্রী আছে কিনা তার খোঁজখবর নিয়ে কাটিয়েছে। এদের মধ্যে দু'একজন বলেছে, তারাও আবার মোকামে যাবো যাবো করছে। অন্যান্য দিনের চাইতে কিছু আগে সুরতুন মাধাইয়ের বারান্দায় এসে বসেছিলো। মাধাইয়ের অনুমতি নেওয়া দরকার।

সন্ধ্যার পরই মাধাই এলো কিন্তু তাকে লক্ষ্যও করলো না। বারান্দার অন্যপাশে বসে সে আপন মনে একটা বোতল থেকে কী খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে উঠে মাধাই ঘরের মধ্যে চলে গেলো। ঘরের দরজা খোলা রইলো। আরও কিছুক্ষণ পরে শিশি বোতল পড়ার মতো কাঁসের একটা শব্দ হলো, তারপর একটা ভারী নরম জিনিস পড়ার শব্দ হলো। সুরতুন সন্তর্পণে উঠে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলো মাধাই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার প্রাণের মূল-দেশটা শূন্য হয়ে গেলো। সে ঘরে ঢুকে আবার তেমনি

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। হায়, হায়, কী করতে পারে সে। নিজের সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্র করেও সে প্রতিকারের কোনো পথ খুঁজে পেলো না। অথচ মাধাইকে সাহায্য করার জন্য তার সমস্ত প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠেছে। সে এগিয়ে গিয়ে মাধাইয়ের শিয়রের কাছে বসে মৃদুস্বরে ডাকতে লাগলো, 'ভাই, বায়েন'। কিন্তু মাধাইকে স্পর্শ করার সাহস সে কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলো না, উঠে এসে তার পায়ের কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। এমনি করে প্রায় সারাটা রাত কাটলো। একবার মাত্র ঢুলুনি এসেছিলো তার, সঙ্গে সঙ্গে নিজের তিরস্কারে সে খাড়া হয়ে বসলো। শেষ রাতের দিকে মাধাই পাশ ফিরে শুলো। সুরতুনের মুখে একটা ক্ষীণ আনন্দ ফুটে উঠলো।

ভোর হচ্ছে তখন, মাধাই বললো, 'একটু জল দে, খাই'।

সুরতুন জল এনে দিলো।

'আরো জল দে'।

দ্বিতীয়বার জল এনে দিয়ে সুরতুন বললো, 'কেন বায়েন, জ্বর আসছে'?

মাধাই কথা বললো না, ক্লিষ্টমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'একটা কিছু দে, পরি'।

সুরতুন দড়ি থেকে মাধাইয়ের একটা কাপড় এনে দিলো। মাধাই বিছানায় বসে জামা খুললো, জুতো খুললো, কাপড় পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো। কিন্তু অস্বস্তি গেলো না, এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো সে, তার কপালে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠলো। সুরতুনের মনে হলো ঘামের জন্য মাধাইয়ের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু দড়ির আলনা থেকে গামছা নিয়ে এসেও ঘাম মুছিয়ে দিতে সাহস পেলো না। মাধাই একবার তার লাল টকটকে চোখ মেলে সুরতুনকে খানিকটা সময় দেখলো। সে দৃষ্টিতে অনুভূতির কোনো চিহ্ন ছিলো না। কিন্তু হাত বাড়িয়ে সুরতুনের একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের কপালের উপরে রেখে আবার সে চোখ বুজলো।

দুপুর গড়িয়ে গেলে মাধাই উঠে বসে ডাকলো, 'সুরো রে'।

'কী কও, বায়েন'?

'বেলা পড়ছে'?

'তা পড়লো'।

'কেউ আসছিলো'?

'না। আপনে কিছু খালে না বায়েন'?

'না। মনে কয় জ্বর আসছে। তুই কি খাওয়া দাওয়া করছিস? তাই কর গা। সাঁঝের আগে ডাকে দিস'। মাধাই আবার শুয়ে পড়লো।

সুরতুন বারান্দায় এসে চুপ করে বসলো। দুপুরের রোদে পুড়ে আসছে বটে বাতাসটা, তবু মিষ্টি লাগলো। সে এই প্রথম অনুভব করলো তার চোখ দুটি জ্বলে যাচ্ছে।

মাধাই তাকে আহারাদি করতে বলে দিয়েছে। আহারের প্রয়োজন নিজেও সে অনুভব করছিলো, কিন্তু মাধাইকে একা রেখে যেতেও মন সরলো না। তার কী প্রয়োজন তা কিছুই সে বুঝতে পারছে না। হয়তো তার শিয়রে বসে তার কপালে হাতটা রাখা উচিত ছিলো। এখন কি সে যাবে? না, এখন আর যাওয়া যায় না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে সুরতুনের মনে হলো ঘরের মধ্যে মাধাই চলে বেড়াচ্ছে। মাধাইও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, 'জাগছিস'?

'শরীর ভালো বায়েন'?

'হয়'।

'ডিপ্‌টিতে যান'?

'হয়। সিক্‌ দেবো। ছুটি নিবো। মনে কয় কাল থিকে তুইও খাস নাই'।

কুণ্ঠিত বোধ করে সুরতুন মুখ নামিয়ে নিলো।

মাধাই ছুটি নিয়ে ফিরে এলে কী ব্যবস্থা হবে, কী করা সম্ভব হবে তার পক্ষে এ সব ভাবতে লাগলো সে। ঘটনাটা কোনদিকে গড়াতে পারতো এ অবস্থায় তার আলোচনার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ মাধই চলে যেতে যেতে ফতেমা এলো।

'কী হইছে রে বায়েনের'?

'তবে তুমি খবর পাইছিলা'?

'হয়। বায়েন কেমন'?

'এখন মনে কয় ভালোই আছে। পরশু রাত, কাল সারাদিন রাত কী যে তার হলো বুঝবের পারি নাই'।

অনেকক্ষণ ধরে ফতেমা সুরতুনকে মাধাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো।

মাধাই ছুটি নিয়ে বাসায় ফিরে দেখলো ফতেমা বসে আছে, সুরতুন নেই। মৃদু হেসে সে বললো, 'কাল যাক দেখছিলাম সে ফতেমা, না, সুরো'?

ফতেমা বললো, 'সুবোক বাজারে পাঠাইছি। খাতে হবি তো'। একটু থেমে সে প্রশ্ন করলো, 'অসুখ করেছে ভাই'?

মাধাই মাথা নাড়লো। কিন্তু সুবো ধরতে না পারলেও ফতেমার চোখে ধরা পড়ে গেলো—মাধাইয়ের চোখ দুটি তখনো লাল, মাথার চুলগুলো বিশৃঙ্খল, চোখ-মুখ বসে গেছে। ফতেমা তার কথায় নিবৃত্ত হলো না ; মাধাই ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিলো, সে এগিয়ে গিয়ে তার চুলে হাত রাখলো, 'না ভাই, অসুখ তোমার করেছে'।

কিন্তু শুধু অসুখই নয়তো, ফতেমা এবার আরও লক্ষ্য করলো মাধাইয়ের পায়ের একটা আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা, কপালের বাঁ পাশটা তামাটে রঙের হয়ে ফুলে আছে। সে আকুল হয়ে উঠলো, কান্না-কাতর স্বরে বললো, 'কও সোনাভাই, কী হয়েছে তোমার'?

তার সোহাগের স্বরে মাধাইয়ের অপূর্ব অনুভূতি হলো। রেল হাসপাতাল থেকে সদ্য-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নিজের পায়ের দিকে একবার, আর একবার ফতেমার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেমানুষি স্বরে বললো সে, 'অন্যাই করছি। নেশা করছিলাম'।

'নেশা তো বেটাছাওয়াল করেই, অন্যাই ক্ করছো'। প্রবোধ দিলো ফতেমা, 'কিন্তুক এমন করে নেশা করবের নাই। দ্যাখো তো পায়ের কী দুর্গতি করছো'!

মাধাইয়ের মুখ অত্যন্ত বোকা বোকা দেখালো।

ফতেমা আবার হাসলো, বললো, 'তা হঠাৎ নেশা করলা কেন্'?

মাধাইয়ের মন খালি করে কথা বলতে ইচ্ছা হলো। একটু ইতস্তত করে সে বললো, 'ভালো ঠেকে না। কেমন যেন একা একা লাগে'।

ফতেমা খানিকটা সময় ভাবলো কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। একটু থেমে সে বললো, 'আমি রান্নার যোগাড় করি, তুমি ছান করে আসো। শরীর সুস্থ হবি। চা না কী খাও, তা খাইছো'?

ফতেমা নিজে থেকে মাধাইয়ের র‍্যাশানের ঝোলা খুঁজে চাল বার করলো। কুলোয় করে চাল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাছতে বসলো।

ঘরের মধ্যে কিছুকাল খুটখাট করে, জামা খুলে মাধাইও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফতেমা তাকে আসতে দেখে চোখের দৃষ্টিতে স্বাগত করলো, মুখেও বললো, 'আসো'।

'তোমার সাথে কথা কওয়ার জন্যি আলাম'।

'আসবাই তো। বোসো। জিরাও'।

ফতেমা মুখ নিচু করে পটু হাতে চালের ধান-কাঁকর বেছে ফেলতে লাগলো, মাধাই খুঁটিতে হেলান

দিয়ে অন্যমনস্কভাবে কাজ দেখতে লাগলো তার।

ফতেমা বললো, 'বিড়ি খালে না, সোনাভাই'?

মাধাই বিড়ি ধরালো। বিড়ি ধরানোর পর বিস্ময় বোধ হলো তার। বাড়িতে অভ্যাগত এলে পুরুষের পক্ষে এরকম অনুরোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু ফতেমা কোথায় শিখলো এমন করে বলতে? টেপির মা নিজে বিড়ি খায় বলে তার মুখে এটা কতক মানাতো। কিন্তু ফতেমা তো বিড়ি খায় না।

মাধাই বললো, 'ছান করতে কও, কিন্তুক মাথা এখনো দপদপ করতিছে'।

ফতেমা কথা না বলে সরে এলো তার কাছে, তার পিঠে গলায় হাত রেখে পরখ করে বললো, 'জ্বর না বোধায়। রাত জাগছো, উপাস পাড়ছো। যাও ওঠো, অল্প করে ছান করে আসো'।

মাধাই স্নান করে এসে দেখলো উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে, বঁটি নিয়ে আনাজ কুটতে বসেছে সুরতুন। ফতেমা হাঁড়িকুড়ি মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন করে নিচ্ছে। মাধাইকে দেখে ফতেমা তাড়াতাড়ি সুরতুনকে বললো, 'তুই যে কী মেঠাই আনছিস, তাই আগে ভাইকে খাবের দে'।

কথাটা ভেবে দেখার মতো। মাধাইয়ের আহারাদির ইদানীং কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিলো না। কাজের ভিড় থাকলে, তা স্টেশনের হোক কিংবা ইউনিয়নের, রানিংরুমে গিয়ে সে খেয়ে আসে। র‍্যাশানের চাল দিলে যে কোনো হোটেলের চাইতে কম পয়সায় সেখানে আহার্য মেলে। ছুটিছাটাব দিনে সখ করে কিংবা মেজাজ হলে সে তার ঘরেও রান্না কবে। কিন্তু সেটা অনির্দিষ্ট ব্যাপার। রান্নার কাজে সময় ব্যয় না করে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে নিয়ে কাটাতেই তার ভালো লাগতো। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেশীগুলোকে অনুভব করা, আয়না কোলে করে বসে সিঁথি বাগানো, জামার বোতামগুলো নিপুণ হাতে সেলাই কবা, এসব নিয়ে তার সময়, যতটুকু তার অবসব, কেটে যেতো। ইদানীং রান্নার ব্যাপাবে তার আরও বিমুখতা এসেছে। নিজেকে নিয়ে সে চিন্তা করে।

কিন্তু তার ঘরে রান্নার ব্যবস্থা হিসাবে অ্যালুমনিয়মেব পাত্র, উনুন, বঁটি, লকড়ি, এসবই ছিলো। ফতেমাদের সে ব্যবহার করতে দিতো এসব। ফুলটুসির ছেলেদের জন্য রান্নার প্রয়োজন হয়েছিলো ফতেমার।

মাধাই বিস্মিত হলো। ফতেমা তার জন্য রান্না করতে বসেছে, যেন সেটাই অভ্রান্ত স্বাভাবিকতা। কোনো সংশয়ই যেন নেই। মাধাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করাও দরকার বোধ করেনি ফতেমা। তার মনে এমন কোনো দ্বিধা নেই—মাধাই তার রান্না খাবে কিনা।

কিন্তু সুরতুনের দেওয়া মিঠাই ও জল খেয়ে মাধাইয়ের মনে হলো এমন স্নিগ্ধতা সে দীর্ঘদিন অনুভব করেনি।

স্নান-আহার করে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে তার মনে হলো শরীরে কোনো কষ্ট নেই আর। ঘরের মধ্যে কিংবা বারান্দায় ফতেমারা ছিলো না। কোথায়-বা গিয়েছে কোনো চালের ধান্দায়, ভাবলো হাসি হাসি মুখে সে। বহুদিন পরে আবার সে এদের কথা ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করলো।

বাইরের দিকে চাইতে গিয়ে বহু পরিচিত কাঁঠাল গাছটার প্রথম ডালটায় তার চোখ পড়লো। কিছুদিন সে লক্ষ্য করেনি। মনে হলো যেন ডালটা বেড়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পাতা কাঁপছে। সেখান থেকে সরতে সরতে তার দৃষ্টি পড়লো আরো দূরের দৃশ্যপটে। দিগরের আবর্জনা বয়ে পাকা নালাটা কিছু দূরে গিয়ে খানিকটা নিচু জমি প্লাবিত করে একটা জলা সৃষ্টি করেছে। বর্ষায় জল বেড়ে ছোটো একটা বিলের মতো দেখায়। প্রথম চাকরি পাবার পর একদিন সে ছিপ নিয়ে গিয়েছিলো মাছ ধরতে, খুব পাকা একটা শোল পেয়েছিলো। এখন জল অনেক কমে গেছে। জলের ধারে ধারে বুনোঘাসের সবুজ ঝোপগুলোও ঠাহর হচ্ছে চোখে।

মনের গতি চিন্তার গণ্ডিবদ্ধ না-হলে যেমনটা হয়, তেমনি হলো মাধাইয়ের। বহুদিন-ভুলে-যাওয়া গ্রামের কথা মনে পড়লো তার। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তিক্ত কোনো ছবি নয়, একটি বিশেষ দিনের স্মৃতি।

বটন্তীকালীর পূজা হয়েছিলো সান্যালবাড়িতে। আর সেইবারই প্রথম ঢাক বাজানোর সাহস হয়েছিলো তার। দুখানা ঢাক নিয়ে সে আর তাব বাবা গিয়েছিলো সান্যালবাড়িতে। ধানখেতের আলের উপর দিয়ে পথ। ধানের পরিপূর্ণ গোছাগুলো ঢাকের গায়ে লেগে একবকম মৃদু বাজনার শব্দ উঠছিলো। অদ্ভুত, অদ্ভুত। এতদিনকার পুরনো কথা কী করে এত স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো, ভাবলো সে। পূজামণ্ডপে নতুন ধুতি গামছা বিদায় পেয়ে সে যখন ভাবছে যথেষ্ট পাওয়া হয়েছে, ঠিক তখনই তাদের কাঁশি বাজানোর ছোকরাটা তার বাবার ঢোল বাঁশি নিয়ে এলো। তার বাবা ছিনাথ ঢোল কাঁধে উঠে দাঁড়ালো, তার হাতে সানাই-বাঁশি দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'ঠিক করে বাজাস সারগাম। কষে রাখিস তাল'। সান্যালমশাই স্বয়ং বসে ছিলেন অন্দরের দরদালানে। সান-বাঁধানো আঙিনায় অন্যান্য বাজনদারদের মধ্যে গলায় ঢোল ঝুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো ছিনাথ বায়েন। রোগে ভুগে তার শরীর তখন জীর্ণ। তবু সে বাজনদারদের সেরা। সে আবাব বললো, 'বাজাস কৈল ঠিক করে, কর্তাক কইছি ছাওয়ালেক আনছি'। তারপর বাজনা শুরু হলো। বসে, দাঁড়িয়ে, নাচতে নাচতে, পিছিয়ে গিয়ে, প্রমত্ত তাণ্ডবে সম্মুখে হেলে পড়ে ছিনাথের সে কী বাজনা! মাধাই প্রাণপণে মুখস্থ সারগম দিয়ে বাবার সঙ্গে জুড়ি রেখে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওস্তাদি ভর করলো ছিনাথের মাথায়। নতুন বোল তৈরি হতে লাগলো তার মনে মনে, সেগুলি ঝংকার দিয়ে বাজতে লাগলো তার ঢোলে। মাধাই অবাক হয়ে যাচ্ছিলো, দম পাচ্ছিলো না, কিন্তু থামবারও উপায় ছিলো না। ছিনাথ কথা বললো না, কিন্তু তার ঢোলের বাজনা তেড়ে তেড়ে উঠে মাধাইয়ের সমস্ত নির্জীবতার উপর তর্জন করতে লাগলো। মাধাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়ে, হিংসা ভুলে সাবাস করে উঠেছিলো অন্য সব ঢুলিরা। আর তাদের দিকে ফিরে হাসি হাসি মুখে কাত হয়ে ঘুরতে-না-ঘুরতে তেহাইয়ের মাথায় আবার চাঁটি দিলো ছিনাথ।

মানুষের কৃতকর্মের শেষ বিচারে বলা যায় এই কাজটি না-করে তার উপায় ছিলো না। কিন্তু তার জীবনধারা অনুসরণ করতে করতে সবসময়ে বলে ওঠা যায় না তার ভবিষ্যতের ঘটনা আগেরগুলির পবিণাম হবে কিনা। হিসাবের চাইতে বড়ো যেন কিছু এসে পড়ে।

আগেব ঘটনাব অল্প কিছুদিন পরেই তাদের পরিবারে এলো বিঘোর দুর্দিন। ছিনাথের স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে ভেঙে পড়েছিলো। সে-বৎসর শীতের গোড়াতে যখন তার জ্বর হতে শুরু করলো তখন সে নিজেও হাল ছেড়ে দিলো। তার জ্বর সাধারণ নয়, বিপথ থেকে কুড়িয়ে-আনা বিষাক্ত ক্ষতগুলো সহস্রমুখে আত্মপ্রকাশ করলো। মৃত্যুটা হলো বীভৎস। তারপর এলো না-খেয়ে-থাকার দিন, গোরুকে বিষ দেওয়ার দিন। বাঁশির বদলে বিষ উঠলো হাতে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাধাই বিড়ি ধরালো। গ্রামের জীবন সে চিরকালের জন্য ত্যাগ করে এসেছে। এত দূরে থেকেও যখন তার বাবা-মা বর্তমান ছিলো, তাদের গৃহ ছিলো, সে-সময়ের কথা মনে হলো। কেন হলো এ কথা বলা শক্ত। হাতের কাছে অবশ্য ফতেমা আছে ; তার স্নেহ অন্য অনেক স্নেহশীল দিনের কথা মনে আনতে পারে।

ফতেমার কথা মনে হলো। সে লাজুক নয়, প্রয়োজন হলে সে অগ্রসর হতে পারে, তার সঙ্গীদের মুখে ছোটোখাটো ঘটনা শুনে মাধাই বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু এমন সোহাগ-ঝরানো কথা শুনবার অবকাশ মাধাইয়ের আগে হয়নি। স্ত্রীলোক এমনভাবে কথা বলে বলেই বোধ হয় শ্রান্ত পুরুষরা বাড়ির দিকে ছুটে যায়। কিন্তু সাধারণের চাইতেও বুঝি-বা বেশি কিছু ফতেমা, ভেঙে-পড়া পুরুষের পদস্খলন যারা স্নেহ দিয়ে ক্ষমা করতে পারে তাদের মতো বোধ হয় সে। বোধ করি এমন স্ত্রীদের কাছেই পুরুষ বার বার ফিরে আসে।

পরদিনও ফতেমাকে মাধাই যেতে দিলো না। ঘুম ভেঙে উঠে সে বললো, 'আজ না-গেলি হয় না'?

'থাকবের কও, ভাই'?

'হয়, থাকো'।

চার-পাঁচ দিন ফতেমা রেঁধে খাওয়ালো মাধাইকে। মাধাই যখন স্টেশনে ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে দেখে তার সঙ্গীরা অবশ্যই বুঝতে পারে না তার অন্তরকে গত কয়েকটি দিন কত কিছু এনে দিয়েছে। ইতিমধ্যে একদিন সে বলে ফেললো জয়হরিকে, 'হাত পোড়ায়ে খায়ে বেটা ছাওয়ালের চলে না। ফতেমা রাঁধে খাওয়ায়, বেশ আছি'?

'ফতেমা থাকে নাকি আজকাল তোমার কাছে'?

'আছে কয়দিন'।

কিন্তু সেদিনই অন্য একসময়ে জয়হরি রসিকতা করে বললো, 'দুটাই রাখবা'?

মাধাই বুঝতে না-পেরে বললো, 'কী কও'?

'কই যে, দুজনকেই পুষবা? শেষ দুজনে চুলাচুলি হবি'।

'না, ওরা ঝগড়া করে না'।

'পুরুষের ভাগ নিয়ে করবি'।

রসিকতার তলদেশ দেখতে পেয়ে মাধাই প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, বিরস মুখে বললো, 'ওরা আমাকে ভাই কয়'।

সন্ধ্যায় ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে সে দেখলো ফতেমা কুপি জ্বালিয়ে ঘরের কাজ করছে।

'সুরো কই'?

'গাঁয়ে পাঠাইছি। শ্বশুরের অসুখের খবর নিয়ে আইছিলো একজন'।

'রাত্তিরেও রাঁধা লাগবি নাকি'?

'হয়'।

রাত্রিতে নতুন করে রাঁধার প্রয়োজন হযেছে কেন সেটা ফতেমা ঠিক সাহস কবে বলতে পাবলো না। ফুলটুসির ছেলে জয়নুল ও সোভান এসে খেয়ে গেছে।

মাধাই ঘরের ভিতরে বসে বিড়ি টানছে, আর ফতেমা বাইরে রান্না করছে। ফতেমা বললো, 'আনাজ নামানের সময় কাঁচা তেল লঙ্কা দিয়ে নামালি খাও'?

মাধাই বললো, 'হুঁ'।

কৌতুকের মনে হলেও সত্য যে এ কয়েকটি দিনে মাধাই একপক্ষে সুরতুন-ফতেমা অন্যপক্ষে— এদের পারস্পরিক অবস্থানের যেন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এরা যেন খানিকটা আশ্রিতের মতো, খানিকটা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলো মাধাইয়ের চোখে। এখন যেন তার সমকক্ষ বলে বোধ হচ্ছে।

কিছু সময় ঘরে কাটিয়ে মাধাইয়ের মনে হলো ফতেমার সান্নিধ্যে বারান্দায় গিয়ে সে বসবে। এরকম আকাঙ্ক্ষা এর আগে কোনো সময়েই তার হয়নি। কিন্তু জয়হরির রসিকতাটাও তার মনে পড়ে গিয়ে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য এনে দিলো।

ফতেমা বাইরে থেকে ডেকে বললো, 'লাকড়ি কৈল নাই। দু-এক দিনের মধ্যে আনতে হবি'।

'কাল মনে করায়ে দিও কী কী লাগবি'।

মনের অস্বাচ্ছন্দ্যের চাইতে সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষাই অবশেষে প্রবল হলো। মাধাই বাইরে গিয়ে বললো, 'আবার আসলাম তোমার কাছে বসতে'।

'কেন্, ভয় করলো সোনাভাই'? ফতেমা যেন শিশু-ভ্রাতার ভয় দূর করছে।

মাধাই অপ্রতিভের মতো হাসলো। উঠে যাচ্ছিলো সে, ফতেমা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে বসালো।

'বোসো না কেন্, ভাই'।

মাধাই লক্ষ্য করলো ইতিমধ্যে ফতেমারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দিনের তুলনায় কিছু পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে। পরিধেয় ও মাথায় চুলেই পরিচ্ছন্নতার ভাবটা বেশি লক্ষণীয়। মাধাইয়ের মনে হলো, ফতেমা পথে বেরিয়ে পড়ার আগে হয়তো এরকমই ছিলো কিংবা এর চাইতেও বেশি ছিলো তার

লক্ষ্মীশ্রী।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাধাই বললো অবশেষে, 'রান্না করো তুমি, আমি একটু ঘুরে-ফিরে আসি'।

পরদিন দুপুরবেলায়। মাধাই ডিউটি সেরে ফিরেছে। আহার্যের আয়োজন দেখে বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'বিয়েসাদির ব্যাপার নাকি'?

ফতেমা বললো, 'সে হারামজাদারা আবার আইছে'।

'কে'?

'কাল যারা খায়ে গিছলো'।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ফুলটুসির ছেলে জয়নুল আর সোভান উপস্থিত হলো। কোথায় কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে হয়তো কেউ দরজায় কলাগাছ লাগিয়েছিলো তারই একটা তারা সংগ্রহ করে এনেছে। দেহে এমন বল হয়নি তাদের যে কাঁধে করে আনবে, সমস্তটা পথ মাটি দিয়ে হেঁচড়ে টেনে এনেছে, পথের আবর্জনায় কলাগাছটি ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে।

ফতেমা ধমকের সুরে বললো, 'ইল্লত! কোন্‌থে কুড়ায়ে আনলি, কী হবি'?

ছেলে দুটি সম্ভবত মাধাইকে দেখেই ভয় পেয়েছিলো, বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়ালো। নতুবা ফতেমার তিরস্কারে তারা বিমর্ষ হয়নি, তার প্রমাণ মাধাই শুনতে পেলো। ছোটোছেলেটা উঠে এসে ফতেমার পিঠ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললো, 'আম্মা, রান্না সারে উঠে কলাগাছটা কাটে দিবা। উয়েতে থোড আছে। ঠিক দুই পয়সার হবি'।

ফতেমা মিষ্টি হেসে বললো, 'সোনার চাঁদ ছাওয়াল। অমন করে পয়সা আনতে হবিনে তোর। কিন্তুক এখন তোরা যা, রাঁধে রাখবো। পরে আসিস'।

এবার বড়োছেলেটা বললো, 'কনে যে যাই বুঝিনে। বাড়িতে চাল না নিয়ে ঢুকলি আব্বা পাঁঠার কোলজের মতো কোলজে কাটে নিবে বলেছে'।

'কস কী? তোরা চাল পাবি কনে'?

'সে কয়, তা জানিনে। তোগরে ফতেমা আম্মার কাছে থিকে চাল আনিস'।

এবার ফতেমার রাগ হলো। সে বললো, 'তোগরে আব্বাক কয়ে দিস, ফতেমা তার বউ না'।

'উরে বাস! এ কথা কলি তার পাঁঠাকাটার ছুরি বসায়ে দিবি গলায়'।

একটু থেমে ছোটোছেলেটি আবার বললো, 'কেন্ আম্মা, আমি এখন খালে তোমার বায়েন রাগ করে'?

ফতেমা উত্তর দিলো না।

'তুমি যে কও আমি ছোটো ছাওয়াল। ছোটো ছাওয়ালের পরেও বায়েন রাগ করে'?

বড়োছেলেটি বললো, 'চুপ কর, চুপ কর, বায়েন ঘরে আছে'।

হঠাৎ মাধাইয়ের কী হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে ওদের কাছে দাঁড়ালো। ওরা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালানোর উদ্যোগ করলো। সে এক মুখ হেসে ফেলে বললো, 'আয় আয়, খায়ে যা। তোরা আগে খায়ে নে'।

মাধাই এত উত্তেজিত বোধ করলো যে তার মনে হলো সে নিজেই ওদের আসন করে খেতে বসাবে। তার অনুরোধে ফতেমা ওদের তখনই খেতে দিলো। সে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে বিড়ি টানতে টানতে ওদের খাওয়ার তদ্বির করলো। সে সময়ে এবং তারপরও কিছুকাল তার অনুভব হতে লাগলো যেন সে ফতেমার দলভুক্ত তার নেত্রিত্ব-আশ্রিত কেউ। সে-অনুভবে সে শান্তিও পেলো।

কিন্তু ফতেমার ভঙ্গিতে যতই গতিহীনতার প্রতিশ্রুতি থাক, তাকে চঞ্চল হয়ে উঠতে হলো। সুরতুন গ্রাম থেকে দুঃসংবাদই বয়ে এনেছে। ফতেমার শ্বশুর রজব আলি অত্যন্ত পীড়িত।

সব শুনে মাধাই বললো, 'তোমার যাওয়াই লাগে'।

ফতেমা প্রায় তখন-তখনই চলে গেছে। যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ বসে সুবতুনকে কী কী যুক্তি দিয়ে গেলো, মাধাই শুনতে না পেলেও আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে পারলো তার অনেকখানি তার নিজের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে। মাধাই শুয়ে শুয়ে ফতেমার কথা চিন্তা করতে লাগলো। অনেকদিনের পরিচিত ফতেমাকে এখন যেন সে অনেক বেশি করে চিনতে পেরেছে। ফতেমা যখন ফুলটুসির ছেলেদের মা হয়ে বসেছিলো সেই দৃশ্যটা তার মনে পড়লো। জয়হরি বা আবদুল গনিদের সংসার কী রকম কে জানে। তাদের স্ত্রীরাও কী রকম কে জানে। তাদের স্ত্রীরাও কি ফতেমার মতো এমন পটু, এমন স্নিগ্ধ।

এমনি তাদের যাওয়া আসা। 'যাবো' এ কথাটাও প্রত্যেকবার মাধাইকে বলে না, এবার তবু একবার অনুমতি নেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো। দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারটা ঘটেছে কিন্তু এই প্রথম তার অনুভব হলো তার বাড়ি থেকে কেউ যেন চলে গেছে।

সব চিন্তাকে ভাষায় পৌঁছে দেবার মতো অনুশীলিত মন নয় তার। সে যা ভাবলো তা কতকটা এইরকম পরের জন্য করা নয়, না করে পারে না বলেই ফতেমা এমন করে পরের জন্য উদ্বিগ্ন। কথাটা শ্বশুর বটে কিন্তু কী করেছে শ্বশুর তার জন্য? আহার আশ্রয় কিছু সে দিতে পারে না, শোকে সান্ত্বনা তো দূরের কথা। ফুলটুসির ছেলেদের জন্য এমন আকুল হয়ে ওঠে ফতেমা। যদি মাধাই বলতো তোমাকে ছাড়া আমার চলে না ফতেমা, হয়তো সে বাকি জীবনটা মাধাইয়ের সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে।

সুরতুন এসে যখন ডাকলো তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। সুরতুন বললো, 'ভাবী কলে লকড়ি নাই'।

'আজই যাওয়া লাগবি—বলে মাধাই উঠে বসলো। 'তুই তাইলে আছিস? ফতেমা কবে আসবি কইছে'।

'তা কিছু কয় নাই। যে কয়দিন না-আসবি আমাকে বাঁধাবাড়া করবের কইছে'।

কিছুক্ষণ বাদে মাধাই দা, লাঠি, দড়িদড়া নিয়ে লকড়ি আনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

'তাইলে তুই থাকবি আজ? বাজারে যাবি? রান্নার কী আছে তা আমি জানিনে। তুই কি রান্না জানিস'?

'ভাবি কলে কিছু লাগবি নে আজ। একটা কথা কব? লাকড়ি আনবের বাঁধে যাও'?

'হয়'।

'ছান করিনে অনেকদিন। কও তো আপনার সঙ্গে যাতাম'।

'তা চল। না হয় লাকড়ির বোঝা তোর মাথায় চাপায়ে দেবো। কিন্তুক অবেলায় ছান করবি'?

সুরতুন কিছু না-বলে দরজায় কুলুপ এঁটে চাবিটা মাধাইয়ের হাতে দিয়ে তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলো।

পদ্মার তীরে বাঁধ একটি নয়, তিনটি। প্রথমটি জল ঘেঁসে—চাঁই চাঁই পাথর মোটা মোটা তারের জালে বাঁধা। তার পিছনে প্রায় চার-পাঁচ হাত উঁচু বাঁধ, তারও পিছনে তৃতীয়টি পায়ের কাছে একটি অধিত্যকা। এই অধিত্যকাটুকু শুধু ঘাসে ঢাকা নয়, বাবলা, খেজুর, ঝাউ, বানে ভেসে আসা কলাগাছ, কাশে মিলে ছোটোখাটো একটা জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। সে জঙ্গলে খ্যাঁকশিয়াল থাকে, খরগোস, বুনো কাছিম, দু-এক জাতের বকের খোঁজও পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে ছোটো ছোটো খাদ চোখে পড়ে। বর্ষায় প্রথম বাঁধ ছাপিয়ে দ্বিতীয় বাঁধের মাথার উপর দিয়ে তৃতীয়টির গোড়ায় গিয়ে লাগে জল। বর্ষার পর পদ্মা অনেক দূরে সরে গেলে এই খাদগুলি জলাশয়ের মতো দেখতে হয়। শরতের কাছাকাছি এসে খাদগুলির বেশির ভাগ শুকিয়ে যায়, দু'একটায় জল থাকে, এবং ময়লা থিতিয়ে গিয়ে সে জল টলটল করে।

বাবলা খেজুর প্রভৃতি গাছগুলি বড়ো হলে রেল কোম্পানির সম্পত্তির সামিল হয়, কিন্তু সেগুলির ডালপালা কিংবা ছোটো বাবলা ঝাউ প্রভৃতির খবরদারি করে না কর্তৃপক্ষ। যেসব স্বল্পবেতনের কর্মচারী লকড়ি সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করে, কিংবা ঝাউয়ের ঝাঁটা বিক্রি করে যেসব উটকো লোক তাদের

চলাফেরায় জঙ্গলে সরু সরু পথ আছে। অবশ্য এমন নয় যে এ জঙ্গলে কেউ হারিয়ে যেতে পারে, যদিও দু'একদিন লুকিয়ে থাকা যায়।

পথে বেরিয়ে কথাটা মনে হলো মাধাইয়ের কিন্তু সমাধান করতে পারলো না সে। সুরতুনদের মতো যারা, তারা স্নান করে কোথায়? বুধেডাঙায় থাকবার সময় চৈত্র-বৈশাখ দূরের কথা আশ্বিন-কার্তিকে গ্রামের ডোবাগুলো শুকিয়ে গেলে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্যই দুর্ভাবনা হয়। সেক্ষেত্রে পদ্মায় গিয়ে দৈনিক স্নান দূরে থাক, সাপ্তাহিক স্নানও হয় না। গ্রামের বাইরে কী হয়? আহার্যের ব্যাপারে, নিদ্রার বিষয়ে মাধাইয়ের এই ভূয়োদর্শন যে, ওসবগুলি সকলের জন্য সমান নয়। নানা উপকরণের আকণ্ঠ আহার একদিকে, আর-একদিকে অনাহার ; এই দুইয়ের মাঝখানে বহু শ্রেণী, বহু ধাপ, বহু স্তর। কিন্তু মাটির তলায় গঙ্গা, সেই জলও যে সকলের সমান আয়ত্তাধীন নয় এই চিন্তাটা তাকে পেয়ে বসলো।

সে বললো, 'তোরা ছান করিস কনে'?

সুরোও ভাবলো উত্তর দেওয়ার আগে। গ্রামের বাইরে এবং গ্রামের ভিতরে বর্ষার সময় যখন আকাশ স্নান করায় তাছাড়া প্রত্যেকটি স্নানের ব্যাপারই একটা ছোটোখাটো অভিযান। সে বলতে পারতো রাত্রির অন্ধকারে চিকন্দিতে সান্যালদের পুকুরে, কখনো গভীরতর রাত্রিতে স্টেশনে ইঞ্জিনের জল নেওয়ার লোহার থামে, সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং ভোররাতে চরনকাশির কোনো জলায়—সে ফতেমা কিংবা অন্য সঙ্গীর সঙ্গে স্নানের অভিযানে যোগ দিয়েছে। একদা টেপির মা সন্ধান দেয় এই বাঁধের জলার। তারপর থেকে সপ্তাহে একবার সে স্নান করে আসছে, কখনো ফতেমার সঙ্গে গিয়ে, কখনো দুপুর রোদের নির্জনতায় একা একা। এত কথা গুছিয়ে বলা যায় না বলে সুরো বললো, 'করি। আপনের অসুখ বলে এই কয়দিনে একবারও করি নাই'।

মাধাই বললো বিজ্ঞের সুরে, 'ছান না-করে থাকিস, খোস-পাচড়া হবি'।

তা হয় না। গায়ের মরামাসের সঙ্গে ধুলো মিশে এমন একটা আবরণ তৈরি হয়েছে যাকে দ্বিতীয় ত্বক বলা যায়।

সুরতুনের পরিচিত খাদটা পথের ধারেই। কিন্তু সেখানে জল শুকিয়ে গেছে।

'তাইলে', বলে সুরতুন মাধাইয়ের দিকে তাকালো।

মাধাই বললো, 'আরো দূরে একটা না, কয়টাই আছে। বাঁয়ের দিকে চলে যা'।

জ্যামিতিক পাহাড়ের মতো সর্বোচ্চ বাঁধটির গায়ে গড়ানে রাস্তা বেয়ে নামতে নামতে মাধাই বললো, 'সবুজ জল দেখলে নামবিনে, তলায় বাবলার কাঁটা থাকতি পারে, জলও ময়লা। ওরই মধ্যে একটায় রেল কোম্পানি কোনো কাজে বালি ঢালছিলো, জল চুমুক দিয়ে তোলা যায়'।

আরো কিছুদূর একসঙ্গে গিয়ে সুরো জলাশয়ের খোঁজে চললো, মাধাই শুকনো ডালপালা সংগ্রহের চেষ্টায় গেলো।

সমস্ত অধিত্যকায় দুটিমাত্র মানুষ। মাধাইয়ের দায়ের খটখট শব্দ সুরোর কানে আসছে, সুরোর জল ছিটিয়ে স্নানের শব্দও একেকবার মাধাইয়ের কানে যাচ্ছে।

একসময়ে মাধাই ডাকলো, 'আর ভিজিস না, দিনকাল ভালো না, বর্ষার জমা জলে জ্বরও হয়'।

আরো কিছুক্ষণ কাজ চললো। সুরতুন লক্ষ্য করে দেখলো জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাধাইকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, কখনো তার দা-সমেত হাত, কখনো পিঠের খানিকটা, কখনো-বা মাথার চুলগুলো।

সুরতুন ভিজে কাপড় চিপতে চিপতে বললো, 'সারা জঙ্গলে লাকড়ি কাটলা, নিবা কেমন করে'?

'আজ কি আর সব নেওয়া যাবি। পারিস তো তুই কয়খান শুকনা ডাল নে, আমি কিছু নিই। কাঁচা লাকড়িই বেশি, সেগুলো শুকাক, আর একদিন আসবো'।

মাধাই সঙ্গে দড়ি এনেছিলো, শুকনো ডালপালার একটা বোঝা বেঁধে সেটাকে কাঁধে তুলে সে চলতে লাগলো, 'পথে কয়েক বোঝা এমন জমায়ে রাখছি, নিতে হবে'।

খানিকটা দূর হেঁটে বোঝা নামিয়ে গুছিয়ে-রাখা ডালপালা বোঝায় বেঁধে আবার হাঁটে মাধাই। সুরতুন কখনো দড়ির মাথা ফিরিয়ে দিয়ে, কখনো লাকড়ি তুলে তুলে দেয়।

মাধাই প্রশ্ন করলো, 'তোকে এক বোঝা বেঁধে দিবো'?

'দেও'।

সামনে মাধাই, পিছনে সুরতুন, দুজনে বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে।

একসময়ে সুরতুন বললো, 'আপনের পায়ের বিষ সারছে'?

'হয়'।

লজ্জিত সুরে সুরতুন বললো, 'ফতেমা সঙ্গে সঙ্গে দেখবের পায়, আমি সারাবাত বসে থাকেও দেখবের পারলেম না'।

'তুই সারারাত বসে ছিলি'?

বোঝার আড়াল থেকে সুরতুনের মুখ দেখা গেলো না।

বাসায় ফিরে লাকড়ির বোঝা নামিয়ে সুরতুন তখন তখনই বললো 'বাজারে যাই, কেন্ বায়েন'?

'কী হবি'?

'তরকারি আনাজ আনা লাগবি, আপনের কষ্ট হবি খাতে'।

'তুই যেন আজ ফতেমা হলি'।

ফতেমাকে সুরতুন ঈর্ষা করে না। সে জানে ফতেমা হওয়া তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অবশ্য সে যে সব বিষয়েই তার অনুকরণীয় এমনও তার বোধ হয় না। ফুলটুসির ছেলেদের জন্য দেখা হওয়ামাত্র খরচপত্র করা তার কাছে অনেক সময়েই বাড়াবাড়ি বোধ হয়। একদিন সেই ছেলেদের প্রয়োজনে ফতেমা কিছু পয়সা চেয়েছিলো তার কাছে, সে দেয়নি ; কিন্তু মাধাইয়ের প্রয়োজনে ফতেমা যা করলো তার জন্য সে খুশিই হয়েছে। তবু এখন যেন মাধাইয়ের কথায় একটা বেদনা বোধ হলো তার। সে ভাবলো, অন্যের সম্বন্ধে না হোক সে কি মাধাইয়ের সম্বন্ধেও স্নেহশীলা হয়ে উঠতে পারে না?

সুরতুন বললো, 'কেন্ বায়েন, কী কষ্ট তা কি কওয়া যায় না'?

মাধাই কথাটা শুনে যার-পর-নাই বিস্মিত হলো। কিন্তু হাসি হাসি মুখে বললো, 'কষ্ট কই? চল যাই বাজার করে আসি। বাজার করে তোর হাতে দিয়ে ডিউটিতে যাবো, রাঁধে রাখিস'।

বাজারের পথে কথা হলো। সুরতুনের মনে পড়লো মাধাইয়ের সঙ্গে আর একদিন সে বাজারে গিয়েছিলো। হাতে পক্ষী আঁকার দিন ছিলো সেটা। ঘটনাটা মনে পড়তে সুরতুন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো।

মাধাই বললো, 'বাজনা শুনছিস'?

সুরতুন ঠাহর করে শুনলো দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ আসছে।

'ও কী'?

'সার্কাস। যাবি একদিন দেখতে'?

'নিয়ে যাও যাবো'।

সুরতুন একা একা তার সামান্য প্রয়োজনের বাজার সওদা করে কিন্তু মাধাইয়ের সঙ্গে বাজারে আসা আর একা বাজারে আসা এক নয়।

একটা ছোটো চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাধাই বললো, 'র'স, একটু চা খায়েনি। তুইও আয়'।

মাধাই দোকানটায় ঢুকে গেলো, সুরতুন পথে দাঁড়িয়ে ক্রেতাদের যাওয়া-আসা দেখতে লাগলো। সহসা সে বিস্মিত হলো। চেহারার পরিবর্তন সাধনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও টেপিকে চিনতে তার অসুবিধা

হলো না। বিস্ময়ের কারণটা বেশভূষার বিবর্তন। পুরুষদের মতো পায়জামা আর পাঞ্জাবি, শাড়ির আঁচলের মতো খানিকটা ওড়না জড়ানো টেপিকে দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ততক্ষণে কানের কানবালা দুলিয়ে সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে উঁচু গলায় কথা বলতে বলতে টেপি চলে গেছে। তার সঙ্গীর দিকে চাইতে সুরতুনের সাহস হয়নি। গালে গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, কিন্তু সাহেবের মতো পোশাক।

চাল ডাল তেল কিনে মাধাই বললো, 'আলাম যখন মাছের বাজারেও ঘুরে যাই, সস্তা হয় নেবোনে'।

মাছের বাজারে যাবার পথে কয়েকটা বড়ো বড়ো আধুনিক কায়দার করে সাজানো ঝকঝকে দোকান আছে। সন্ধ্যা হতে তখনো দেরি আছে, তবু কাচের শো-কেসে দু'একটি আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

সুরতুন মাধাইয়ের পাশে চলতে চলতে বললো, 'টেপি না'?

মাধাই হো-হো করে হেসে বল্লো, 'মাটির পুতুল। আরো আছে'।

কাপড়ের দোকানদার পাঞ্জাবী, বাঙালি ও হিন্দুস্থানী এই তিন পদ্ধতিতে পুতুল সাজিয়ে কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রথাটা এ অঞ্চলে খুব পুরাতন নয়, এসব পথ দিয়ে সুরতুন একা হাঁটতে সাহস পায না বলেও বটে, এগুলি সুরতুনেব দেখা ছিলো না। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে বললো সে-'ঠিক যেন দুগ্‌গা ঠাকুর'। মনে মনে সে টেপির সঙ্গেও পুতুলগুলোর রূপের তুলনা করতে লাগলো।

মাছ কিনে মাধাই বললো, 'তুই এবাব বাসায যা। যা পারিস রাঁধ। আমাব যাতে যাতে রাত হবি'।

সুরতন ফিরে চললো। কাপড়েব দোকানের সামনে দিয়েই তার পথ। ঠিক সেখানেই একটি বিস্ময়কব ঘটনা আবার ঘটলো। এবার সুরতুন টেপির মুখোমুখি দাঁড়িযে পড়লো। সুরতুনকে দেখতে পেযে টেপি থামলো না বটে, বললো, 'ভালো আছিস'?

টেপি স্বচ্ছন্দ গতিতে আগে আগে চলছে, পিছনে সুরতুন।

রেশমি পায়জামা, সাটিনের পাঞ্জাবি, নকল বেনারসির ওড়নায় শ্যামা টেপি। পিঠের উপরে দোলানো লম্বা বেণী চকচক করছে ওড়নার তালে।

ধামা-ভরা চাল-ডাল, সুতোয় বাঁধা বোতলে তেল, হাতে মাছের একটা টুকরো ; ধামা কাঁকালে বাঁকা হয়ে চলছে সুরতুন। তার পরিধেয় মলিন মোটা সরু লালপাড় ধুতি। চুলগুলিতে আজ ময়লা নেই, কিন্তু তেলের অভাবে লাল হযে উড়ছে। তার চৌকো ধরনের মুখে টিকোলো নাক, টানা টানা ভ্রূর নিচে বড়ো বড়ো চোখ ভয়ে সংকুচিত। কিন্তু তার বাবার নাম ছিলো বেলাত আলি। তার রঙেব জেল্লা বিলাতওয়ালাদের মতো ছিলো, এই প্রবাদ। আজ সুরতুনের সদ্যস্নাত ত্বক পথের জনতার মধ্যে অনন্য বোধ হচ্ছে। ধবধবে শাদা নয়, বরং রোদে পুড়ে পুড়ে পাকা খড়ের মতে রঙ।

সুরতুন ভাবলো আশ্চর্য সুখী হয়েছে টেপি। স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে সে। সে স্থির করলো মাধাইকে সে জিজ্ঞাসা করবে কেন দোকানের সম্মুখে অমন পুতুল সাজানো থাকে, আর কেন টেপি সেই দোকানে যায়।

মাধাই যখন খেতে এলো তখন রেল কলোনীর এই নগণ্য অংশটিতে নিশুতি রাত। তার আগে রান্নার কাজ শেষ করে সুরতুন টেপির কথা ভাবলো, ফতেমার কথা ভাবলো, অবশেষে নিজের কথা। নিজের কথা চিন্তা করতে বসে সুরতুন স্থির করলো সকালে উঠেই সে মহাজনের কাছে যাবে কাজের খোঁজে। বাজারে যে-অঞ্চলে চাল বিক্রি হয় সেখানেও খোঁজ নিয়ে দেখবে চাল-কারবারের পরিচিত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বসে খেলে আর কয়দিন। মহাজনের কাছে কিছু, মাধাইয়ের কাছে আর কিছু জমা আছে ; সব জড়ালে, সুরতুন আঙুলে গুনে গুনে দেখলো, তিন কুড়ির কাছাকাছি হলেও হতে পারে ; কিন্তু তাতে কদিন যায়। ফতেমার যা-ই হোক, তার নিজের তো অন্যগতি নেই চালের কারবার ছাড়া।

খেতে বসে মাধাই বললো, 'বেশ তো রান্না শিখছিস'।

'ফতেমার রান্না দেখলাম যে'।

'তা ভালোই করেছিস'।

আর কোনো কথা নেই।

মাধাই খেয়ে উঠে গেলে, এঁটো পবিষ্কার কবে এসে সুবতুন কথা বলার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো।

'কিছু কবি? গাঁয়ে যাওয়ার কাজ আছে'?

'না। গাঁয়ে যায়ে কী করবো। কই যে, বায়েন, এবার কী কববো কও। ফতেমা চালেব মোকামে যাবের চায় না ; পুলিস আছে, চেকার আছে, মবণ আছে , কী কবি বোঝা যায না। চাল হলে এদিকেও সস্তা হবি ই সন। খাবো কী'?

'কেন্, তুই গাঁয়ে কী করতি দুভ্ভিক্ষের আগে। এবার শুনতিছি গাঁয়ে চাষবাস হবি'।

সুরতুন বললো, 'জমি-জিরাত নাই, ধান কুড়ায়ে, বাড়াবানে কযদিন চলবি। সে সময়ে দিন চলতো না'।

'হুম্'। মাধাই বিড়ি ধবিয়ে ধোঁয়াব মতো কথাটা উড়িয়ে দিলো বলতে বলতে, 'এই তো বেশ আছিস। রাঁধ, বাড, খা'।

'বসে বসে খাওয়াবা'?

'আপত্তি কী? যে কয়দিন চাকরি কবি খা না কেন্। দুজনেব খাওয়া-পবা আমাব টাকায চলে। টাকা দিযে আমাব আর কোন কাম'।

আহাবপর্ব মিটলে সুবতুন বাবান্দায তাব শয্যা বিছিয়ে নিচ্ছিলো। মাধাই বললো, 'আজ ফতেমা নাই, একা বাইবে শুবি কেন্'।

কথাটায সুরতুন বিস্মিত হলো। বহুদিন তাবা বাবান্দাব আশ্রযে কাটিযেছে। সব সমযেই ফতেমা থাকেনি। সে একা এই বাবান্দায অনেক শীত বর্ষাব অন্ধকাব বাত্রি কাটিযেছে।

সুরতুন বললো, 'আমাব কাঁথা পাটি মযলা, কালো'।

মাধাই হাসিমুখে বললো, 'তা ঠিক বলছিস, আমাব ঘব সাহেবদেব মতো মার্বেলেব তৈরি'। অবশ্য পবে নিজেই সে ভেবে পেলো না এতখানি আগ্রহ কেন সে দেখালো। নিজেব মনেব একটি অংশে এদের একান্ত আপনার বলে ভ্রম হচ্ছে। যেমন আকস্মিকভাবে হযেছিলো একটা করুণার বোধ ফুলটুসির ছেলেদেব দেখে।

পবদিন সকালে মাধাই বললো, 'আজ গাঁয়ে পলাবি নাকি'?

'না'।

'না যাস ভালোই হবি। রাত্তিবে সার্কাসে যাবোনে। সে যে কী জিনিস'।

'আচ্ছা'।

'তাইলে পলাসনে কৈল'।

দুপুরের আহারাদির জন্য মাধাই ফিরবে। এখন সে ডিউটিতে গেছে। সুরতুন বসে চাল ঝাড়ছিলো। নিজের রান্নার সময়েও ফতেমা চাল ঝেড়ে পবিষ্কার কবে নেয়। সুরতুন নিজের বেলায অত হাঙ্গামা করে না। কিন্তু মাধাইয়ের জন্যও বান্না করতে হবে, সুতরাং একটু সতর্ক হতে হয়।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে চেয়ে সুরতুন অবাক হয়ে গেলো—সামনে দাঁড়িয়ে টেপি। শাদামাটা রঙিন একটা শাড়িতে তাকে গত সন্ধ্যাব মতো ঝকঝকে দেখাচ্ছে না। চোখের কোলে অস্বাস্থ্যের কালো চিহ্ন। কিন্তু তবু তাকে বড়োঘরের ঝি-বউয়ের মতো দেখাচ্ছে। হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার, এসব তো আছেই, পায়ে জুতোও আছে। বলা বাহুল্য, সোনা গিলটির তফাত জানতো না সুরো।

টেপি ভূমিকা না-করেই বললো, 'তোর কাছে এক কাজের জন্যে আলাম। আমাকে একটু ওষুধ আনে দিতে হবি'।

'আমি? কও কী? আমি কি চিনি, কনে যাবো'?

'আমি তোকে দোকান দেখায়ে দিবো, টাকা দিবো'।

'তুমি নিজে যাও না কেন্? তুমি তো বাজারে ঘুরে বেড়াও। লোকের সঙ্গে কথা কও। কিন্তু ওষুধ কেন্, কার অসুখ'?

'অসুখ না, ওষুধ আমারই লাগে'।

সুরতুন ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে টেপির সঙ্গে বার হলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে টেপি বললো, 'কাল তোকে মাধাইয়ের সঙ্গে বাজারে দেখে মনে হলো তোর কাছে আসার কথা'।

টেপির কথায় সুরতুনের মনে একটু সাহস হলো প্রশ্নটা করার। প্রশ্নটা তার মনে কিছুক্ষণ থেকে উঁকি দিচ্ছিলো। সে বললো, 'অমন মেমসাহেবের মতো সাজে কাল কনে যাওয়া হইছিলো'?

টেপি সুরতুনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কী ভেবে নিয়ে বললো, 'তোকে কওয়া যায়। আমি আর চেকারের কাছে থাকি না। কাল যাক দেখছিস সে চেকার না'।

টেপির প্রাণের ভিতরে কথাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে বহিঃপ্রকাশের জন্য চাপ দিচ্ছিলো। বলার লোক প্রতিবেশীদের মধ্যে নেই। সুরতুনের প্রশ্নে প্রকাশের বাধাটা দূর হতেই টেপি বলতে লাগলো, 'চেকার বদলি হয়ে গেছে তিনদিন হয়। যাবার সময় আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। এক দোকান থিকে আমার জন্যে কাপড় জামা গয়না কিনতো। সাতশো' টাকা ধার হইছিলো। তার যাওয়ার দিন দোকানের লোক আসে উপস্থিত। অনেক কথাবার্তা কয়ে শেষ পর্যন্ত দোকানদারের কাছে টাকার বদলে আমাকে জমা রাখে গিছে। ফিরায়ে নিবি মনে হয় না। কী করি কও, সুরো। দোকানদার পাঞ্জাবী। কেন্ যেন্ কান্না পায়, ঘিন্না ঘিন্না করে। কাল পাঞ্জাবী সাজে বার হইছিলাম। চেকার গিছে আপদ গিছে, কিন্তুক, কও সুরো, কওয়ামাত্র অন্য আর একজনেক ঘরে আসবের দেওয়া যায়'?

টেপির অজ্ঞাতসারে তার কথাগুলি বাষ্প গাঢ় হয়ে যাচ্ছিলো। সুরতুনের কাছে স্পষ্ট হলো না সবটুকু, তবু সে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলো : দ্যাখো দেখি মানুষ নাকি বেচা যায়!

টেপি বললো, 'আমি সময়ে যা পারবো, আজই তা পারবো কেন্। আমার এক বুড়ি পড়শি কইছে এই ওষুধ আনে মসুরদানার সমান হালুয়ায় মিশায়ে খাওয়ালে পুরুষ ঘুমায়ে পড়ে'।

দুজনে নীরবে পথ অতিবাহিত করতে লাগলো। টেপির সমস্যা ফতেমা বুঝতে পারতো হয়তো, হয়তো-বা সে আন্দাজ করতে পারতো টেপি আফিম কিনতে যাচ্ছে এবং এ পদ্ধতি যে কতদূর বিপজ্জনক তাও বলতে পারতো। সুরতুন টেপির জন্য একটা অনির্দিষ্ট সমবেদনা অনুভব করলো শুধু।

দূরে দাঁড়িয়ে আফিমের দোকান থেকে সুরতুনের হাত দিয়ে রতি-ভর আফিম কিনলো টেপি।

ফিরবার পথে টেপি বললো, 'সুরো, তুই আজকাল মাধাইয়ের কাছে থাকিস'?

'হয়, আছি কয়দিন'।

টেপি একটু ইতস্তত করে বললো, 'সাহস হয়, একটা দুটো ছাওয়াল মিয়ে চায়ে নিস। মনে কয় এমন করে তাইলে মিয়েছেলেক বেচে দেওয়া যায় না'।

রাত্রিতে সার্কাস দেখার কথা ছিলো, সুরতুন তা ভুলে গিয়েছিলো। টেপির চালচলন কথাবার্তা কতবার যে সে ভাবলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মাধাই সকাল সকাল ডিউটি থেকে ফিরে বললো, 'কি রে, রান্না হয়েছে'?

সুরতুন তখনো উনুন ধরায়নি, সে বিব্রত মুখে বললো, 'ভাত নামাতে আর কত বেলা। আপনে ঘরে বোসো, এখুনি হবি'।

'কেন্, সার্কাসে যাবি না'?

'যাবো। সে কী'?

'বাঘ সিংহ মানুষেব কত খেলা'।

কৌতূহলেব চাইতে সুরতুনেব বিস্ময়ই বেশি। সে বললো, 'আচ্ছা আমি উনুন ধবাই'। মাধাই ঘরেব মধ্যে ঘোবাফেবা কবে সুরতুনেব কাজকর্ম লক্ষ্য কবতে লাগলো। একসময়ে সে বললো, 'তুই বান্না শেষ কব্, আমি আসি'।

মাধাই যখন ফিবে এলো ততক্ষণে সুবতুনেব ভাত নেমেছে। মাধাই খেয়ে উঠে বললো, 'আমাব সিগ্‌বেট শেষ হতে হতে তোব খাওযা হওযা চাই'।

সুবতুন হাঁড়িকুড়ি তুলে বেখে সামনে এসে দাঁড়াতেই মাধাই তাকে একটা কাগজে-মোড়া পুঁটলি দিযে বললো, 'কাপড জামা আছে, পব্'।

সুবতুনেব পবিহিতখানা পুবনো হলেও জীর্ণ নয, কাপড়েব কথায সে বিস্মিত হলো। জামা সে জীবনে কখনো গাযে দিযেছে বলে তাব জানা নেই। টেপি গাযে দেয। ফতেমাব যখন সুদিন ছিলো তখন তাব গাযে সে দেখেছে বটে। কিন্তু দুর্দান্ত শীতেব দিনেও সুবো বডোজোব গাযে কাপড়েব উপব কাপড জড়িযেছে, জামা পবাব দুঃসাহস তাব হযনি।

তাকে ইতস্তত কবতে দেখে মাধাই বললো, 'যা, যা, দেবি কবিস নে। খেলা আবম্ভ হযে যাবি'।

কাপড জামা নিযে সুবতুন বাইবে গিযে দাঁড়ালো। কাপড পাল্টে জামা হাতে কবে সে অন্ধকাবে দাঁড়িযে বইলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযে।

'কী বে, দেবি কী? চুল আচড়াবি নে'?

সুবতুন অন্ধকাব বাবান্দা থেকে ভযসংকীর্ণ গলায বললো, 'জামা না-পবলে হয না? পববেব জানি নে'।

'আ হা'। মাধাই বিবক্ত হলো, 'এদিকে আয। দুই হাতায হাত ঢুকা, ধুব, ওবকম না'।

অবশেষে মাধাই উঠে গিযে জামা পবিযে দিলো, 'পযলা নম্বব বোকা তুই। নে এবাব চুল আঁচড়া'।

চুল আঁচড়ানোব সমস্যা কী কবে সমাধান হবে সুবতুন ভেবে পেলো না। সে মুখ নিচু কবে ভীতস্ববে বললো, 'কাঁকই নাই'।

'কী আছে'।

দেযালেব গাযে বসানো একটা ছোটো তক্তা থেকে মাধাই তাব চিরুনি নামিযে দিলো।

'নে তাড়াতাড়ি সাবে নে'। বলে মাধাই নিজেব পোশাক পালটাতে লাগলো।

জট পাকানো মযলা চুলে চিরুনি বসাতেই সংকোচ হলো সুবতুনেব, আঁচড়াতে চুল ছিঁড়ে ব্যথা লাগতে লাগলো, তাও সহ্য হচ্ছিলো কিন্তু পটপট কবে দু-তিনটে চিরুনিব দাঁত ভেঙে যেতেই সুবতুন ভযে মুখ কালো কবে বললো, 'থাক বাযেন, আব আঁচড়াবো না'।

'চল তাইলে'। ম্লান আলোকে মাধাই সুবতুনেব চোখেব জল দেখতে পেলো না।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে মাধাই বললো, 'যদি তোর চুল কোনোদিন আব ময়লা দেখি নাপিত ডাকে কাটে দেবো। বাঁধে যায়ে চুল ঘষে আসবি কাল'।

তখনো সার্কাসেব দ্বিতীয় প্রদর্শন শুরু হতে দেরি আছে। অন্ধকাবে গলিপথ দিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে সার্কাসের আলোকোজ্জ্বল তাঁবুর কাছাকাছি এসে মাধাই বললো, 'ওই দ্যাখ'।

আলোর চাকচিক্য, তাঁবুর আয়তন ও পবিধি, লোকজনেব চলাচল দেখে সুরতুন হকচকিয়ে গেলো।

মাধাই বললো, 'টিকিট কাটে ওই তাঁবুর মধ্যে ঢুকবো। খেলা শেষ হলে যে-দরজায় তুই এখন ঢুকবি সেখানে দাঁড়ায়ে থাকবি, আমি আসে নিয়ে যাবে'।

টিকিটঘরে টিকিট কেটে মাধাই বললো, 'দাঁড়া, পান খায়ে নিই'।

সার্কাসের সামনে যেমন বসে, সস্তা কাচেব দুতিনখানা বড়ো বড়ো আরসি দিয়ে সাজানো ডেলাইট-

জ্বালা লালসালুতে উজ্জ্বল তেমনি একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো মাধাই।

'পান খাবি তুই'? মাধাইয়ের প্রশ্নে আশেপাশের লোক ও দোকানদার সুরতুনের দিকে চাইলো। সুরতুন লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে অস্ফুট স্বরে বললো, 'না'।

'না' বলার সময়ে মুখ নামিয়ে নিলেও সুরতুনকে বার বার চোখ তুলে চাইতে হলো। পানের দোকানে কোনাকুনি করে বসানো আরসিগুলোতে সুরতুনের একাধিক প্রতিচ্ছবি পড়েছে। অন্ধকারে কাপড়-জামা পরার সময়ে এ যে কল্পনা করাও যায়নি। নীল জমিতে সবুজ ডুরের জোলার শাড়িতে, নীল চকচকে ব্লাউজে একটি সুন্দরী মেয়েকে বারংবার দেখে সুরতুন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো যেন।

সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকে খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজের রূপের প্রাবল্য তার নিজের বক্ষেই যেন জোয়ার এনে দিলো। আয়নায় দেখা তার প্রতিচ্ছবির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সে যেন মনের মধ্যে খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলো। লজ্জাও হলো। মাধাই কি দেখেছে তাকে? টেপির মতোই তাকে দেখাচ্ছে না?

সার্কাসের কোনো খেলাই সুরতুন দ্যাখেনি। তার বিস্ময় ও ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ একসময়ে তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিলো। খেলার অবসরে এদিকে-ওদিকে চেয়ে সে পুরুষদের গ্যালারির মধ্যে মাধাইকে আবিষ্কার করলো। আর যেখানে লালসালুর ঘেরের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা চেয়ারে বসেছে তার মধ্যে টেপিকে দেখতে পেলো গালপাট্টাওয়ালা এক সাহেবের পাশে। টেপি তাহলে সাহেবকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেনি। ঠিক এমন সময়ে দুটি সিংহের হাঁকডাকে সে আবার সার্কাসের দিকে মন দিলো।

খেলা শেষ হলে মাধাই এসে সুরতুনকে ডেকে নিলো। সুরতুনের হুঁস হলো তখন। দুর্দান্ত পশুগুলির হাঁকডাক দাপাদাপি, পুরুষ খেলোয়াড়দের সুগঠিত দেহ, নারী খেলোয়াড়দের প্রকাশীকৃত দৈহিক আবেদন, গভীর রাত্রির তীব্র আলো—এসব মিলে তার মনে অভূতপূর্ব এক উন্মাদনা এনে দিয়েছিলো। তার স্নায়ুগুলি আতপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

এবার অন্ধকার পথ ধরে তাড়াতাড়ি চলার দরকার ছিলো না। মাধাইয়ের পিছনে বড়োরাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সুরতুনের আবার মনে পড়লো নিজের প্রতিচ্ছবির কথা। সেই প্রতিচ্ছবির পাশে সার্কাসের মেয়েদের ছবি ভেসে উঠলো। ট্যারচা চোখে সুরতুন নিজের শাড়ির আঁচলটা আর একবার দেখে নিলো। মাধাইয়ের কাজের অর্থ সে বোঝে না, বুঝবার চেষ্টায় মাধাইকে কোনোদিন প্রশ্নও সে করেনি। মাধাই যে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে এটার চূড়ান্ত প্রমাণই যেন আজ সে পেলো।

তারপর তার টেপির কথা মনে হলো। টেপি তার সঙ্গীটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলো, কিন্তু পরে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়েছে। টেপির আজকের সজ্জা অন্যান্য দিনের চাইতে অধিকতর উজ্জ্বল। এ কি কখনো হতে পারে টেপিকেও নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছে ওই সাহেবটি। সাহেবের মেজাজ তো! সে কি আর টেপির মতো একটি মেয়েকে সাজিয়ে দেয়। যখন মাধাই তাকে জামা পরিয়ে দিয়েছিলো তখন মাধাইয়ের উপস্থিতির ভয়ে সুরতুন ত্রস্ত। এখন মাধাইকে তেমন ভয়ংকর বোধ হলো না। ফলে, সেই জামা পরার ঘটনাটা মনে পড়ে সুরতুনের শরীর থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। মাটিতে যেন পা সোজা হয়ে পড়বে না। সার্কাসের সময়ের অনুভবগুলি জড়িয়ে গেলো এই কাঁপুনির সঙ্গে। টেপির জীবনের কথাও মনে পড়তে লাগলো।

ঘরের কাছে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুরতুন কী হবে কী হবে এই ভয়ে অস্থির হয়ে ইতিউতি করতে লাগলো। তার সহসা মনে হলো টেপি যেমন ওষুধ কিনেছিলো তেমন কিছু তারও সংগ্রহ করা দরকার। টেপিকে যেমন ওরা সাজায় তেমনি তো সাজিয়েছে মাধাই তাকেও।

মাধাই দরজা খুলে তার চৌকিতে বসে জুতো জামা খুলে বললো, 'জামা রাখ, একটু জল দে, খাই'।

সুরতুন জল গড়িয়ে দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাধাই বিছানায় শুয়ে বললো, 'এখন আর কী, ঘুমা গা যা। কাল মনে করিস মাথায় দেওয়ার তেল আনে দেবো। তোরা আমার কেউ না, কিন্তুক তোরা ছাড়াই-বা কে আছে আমার'।

বাইবেব অন্ধকাবে জামাকাপড পাল্টে সুবতুন কোথায় বাখবে বুঝতে না পেবে ঘবেব মধ্যে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক কবছে। সে ভেবেছিলো মাধাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধাই বললো, 'বাখ, আমাব জামাব পাশেই বাখ। কাল তোব জন্যি দড়িব আলনা কবে দেবো। কিন্তুক ময়লা হলে চলবি নে'।

বিব্রত সুবতুন কিছু না-বলে বাইবে চলে গেলো।

পবদিন সকালে সুবতুন ঘব ঝাঁট দিচ্ছে, মাধাই কলে জল সংগ্রহ কবতে গেছে, এমন সময়ে টেপি এলো। এদিক ওদিক চেয়ে ফিসফিস কবে টেপি বললো, 'মাধাই কনে? নাই তো? তোমাক একটা কথা বলবেব আসলাম'।

'কও না'।

'কাল যে-ওষুধ কিনছিলাম তা কৈল কাউকে কবা না, মাধাইকে না'।

'কেন, কী হলে'?

'ও বিষ। কাউকে খাওয়ালি সি ঘুমাতেও পাবে, মববেবও পাবে'।

'সব্বোনাশ'।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো টেপিব। সে বললো, 'তা ভাই, তুমি সাক্ষী থাকলা। এই দ্যাখো যতটুক কিনছিলা ধবাই আছে। তুমি নিজে হাতে নিয়ে ফেলায়ে দেও।

'তুমি ফেলায়ে দেও, তাইলেই হয়। তুমি তো তাক বিষ দিবেব চাও নাই'।

সুবতুনেব ইচ্ছা হলো সে টেপিকে প্রশ্ন কবে তাব নতুন সঙ্গীটিব সম্বন্ধে কিন্তু কথা সংগ্রহ কবতে পাবলো না।

এমন সময়ে দু হাতে দু বালতি জল নিয়ে মাধাই এলো। ঘবে জল বেখে ফিবে এসে বললো, 'টেপি যে? অনেকদিন পবে আলি'।

খুব মিষ্টি হেসে টেপি বললো, 'আলাম। তুমি ভালো আছো'?

'তোব মা কনে? বাঁচে আছে'?

'আছে, চালেব কাববাব কবে না। কাছেই এক গাঁয়ে বসছে'।

'গাঁয়ে বসে কী কবে'?

'একজন জুনালো। ভাবে মনে হলো মালা বদল কবছে কাবো সাথে'। একটু হেসে টেপি বললো আবাব, 'আমবা বোষ্টম'।

'নতুন সংসাব দেখবেব যাবা, কেমন'?

'না। মনে কয়, দূবে থাকে সেই ভালো। মাকে দেখবেব চালেও গাঁজা খাওয়া বোষ্টমদেব সঙ্গে থাকবেব পাবি নে'।

কথাটা কৌতুকেব বলে মনে হতে পাবে, কিন্তু টেপিব বেশভূষা ভঙ্গিব দিকে লক্ষ্য কবে মাধাইয়েব অনুভব হলো, টেপিব যে মা মাথায় গামছা বেঁধে পুরুষদেব দলে বসে গাঁজা খেতে খেতে অশ্লীল বসিকতা কবতে পাবে, টেপিব বর্তমান অবস্থা তাব থেকে অনেক পৃথক। এমনকী তাব এই বেল কোম্পানীব ঘব, হীন অবস্থাব কোনো গ্রাম্য চাষীব কুড়েব তুলনায় যত পবিচ্ছন্নই হোক তাব পটভূমিকাতেও টেপিকে যেন অসংগতভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যেন সে অন্য কোনো লোকেব অধিবাসী।

মাধাই প্রস্তুত হয়ে এসে বললো, 'ডিউটিতে যাবো'।

টেপি বললো, 'চলো একসাথে যাই'।

খানিকটা দূব চলে মাধাই বললো, 'তাইলে তুই ভালোই আছিস আজকাল'।

'তা আছি। তুমি কেমন আছো, দাদা'?

মাধাই প্রশ্নেব সুবটিতে এবং তাব চাইতেও বেশি সম্বোধনটিতে বিস্ময় বোধ কবলো। টেপির কথাবার্তায় পবিবর্তন হয়েছে। এব আগে কোনোদিন কাবো কাছে এমন সম্বোধন সে শোনেনি।

পথ চলতে চলতে ধীরে ধীরে বললো মাধাই, 'আমার আর ভালো মন্দ কি আছে? আছি—আছি'।

কিন্তু টেপি তো সুরতুন নয়, সে বললো, 'বিয়ে করো, সংসার করো'।

মাধাই রসিকতার সুরে বললো, 'তুই তাইলে কন্যে খোঁজ'।

'তা পারি, তুমি কও যদি আমি ভালো লোক দিয়ে কন্যের খোঁজ আনতে পারি'।

খানিকটা নীরবে চলে আবার বললো টেপি, 'স্বজাত বিয়ে করাই ভালো, তা যদি না মানো এক কন্যের খোঁজ আমার আছে। এমন রূপ দেখলে চোখ ফেরান্ যায় না, কিন্তু বি-যত্নে ছাই ঢাকা'।

মাধাই হাসি হাসি মুখে বললো, 'কেন্ রে, দিগনগরের মিয়ে? যারা চিকন চিকন চুল ঝাড়ে'।

'মস্করা করি নাই, দাদা। ঘরেই চোখ চায়ো, আজ কয়ে গেলাম'।

আহত এবং ক্লিষ্টের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে সমবেদনার আশ্রয় খোঁজা। মাধাই একসময়ে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সংঘের কাজের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিলো। তার নিজের জীবনটাকে অর্থহীন বোধ হতো, তাই সংঘের কাজ করে, কাজের লোক হয়ে জীবনের ফাঁকিটাকে সে ভরে তুলতে চেয়েছিলো। কিন্তু সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলো, ওটা বিদ্বেষের পথ, জীবন আরও ফাঁকা হয়ে যায় ওপথে। নেশার মতো। যতক্ষণ বেহুঁস ততক্ষণ ভালো, হুঁস এলেই ঘৃণা। হঠাৎ এলো ফতেমা। পুরনো সুরতুন আর ফতেমার সান্নিধ্যে সে সমবেদনার একটু ছোঁয়াচ পেলো। পৃথিবীর অন্য সব লোকের চাইতে এরা তার বেশি পরিচিত। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সময় কাটানোর সময়ে অন্য কোনো কথা মনে থাকে না। আর এদের অভাব পূরণ করা, যা সে আগেও করতো, এমন একটা কাজ যাতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা যায়, অথচ যা ক্লান্তি আনে না। মাধাই স্থির করলো নিজের উপার্জনের কিছুটা সে ফতেমা-সুরতুনের জন্য ব্যয় করবে এবং সেটা তার ভালো লাগবে।

টেপির পাশাপাশি চলতে, চলতে একটি সুঘ্রাণ পাচ্ছিলো মাধাই, যে সুঘ্রাণ আকর্ষণ করে। মাধাইয়ের দয়াস্নিগ্ধ মনে এই কথাটা উঠলো, যখন টেপি আর সুরতুন চালের ব্যবসা করতো সুরতুনকে টেপির তুলনায় হীন বলে বোধ হতো না, এখন যেমন হয়। পুরুষের আদরে টেপির এই পরিবর্তন। মাধাই ভাবলো, সাবান এসেন্স কাপড়চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা এমন কিছু কিছু ব্যাপারে সে লক্ষ্য রাখবে। সেদিন ডিউটি সেরে ফিরবার সময়ে মাথায় দেওয়ার তেল ও একটা সাবান কিনলো মাধাই। মধ্যবিত্তের চোখে সেগুলো নিচের স্তরের হলেও মাধাইয়ের চোখে তেমনটা নয়।

দিবানিদ্রা সেরে উঠে মাধাই বললো, 'মনে কয় যে লাকড়ি কাঁচা কাটে রাখে আসছিলাম তা শুকাইছে'।

'আনবের যাবা'?

'তা যাওয়া যায়। তুইও চল না কেন ছান করে আসবি'।

সুরতুন খুব একটা প্রয়োজন বোধ করছিলো না স্নানের। মাধাই ঘুমুলে ঘরে তোলা জলে হাঁড়িকুড়ি ধোয়ার সময়ে হাত পা ধুয়ে নিয়েছিলো, আঁজলা করে করে জল তুলে মাথায় চাপড়ে চুল ভিজিয়ে নিয়ে, ভিজে আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়েছিল। কিন্তু সে সময়েই সে স্থির করেছিলো এখানেই যদি থাকতে হয়, ভোরে রাত থাকতে বাঁধের জলে মাঝে মাঝে স্নান করতে যাওয়া যায় কিনা মাধাইকে তা জিজ্ঞাসা করে নেবে—কিংবা রাত দশটায় যখন শেষবারের মতো রাস্তার কলে জল আসে তখন সেটা ব্যবহার করা যায় কিনা।

'চলো, তা যাই'।

'এক কাজ কর, ঘরে তেলের শিশি আর সাবান আছে, তা আন। নতুন কাপড়জামা আন'।

সুরতুনকে প্রায় জলের ধারে পৌঁছে দিয়ে মাধাই তার আগের বারের কাটা লকড়ির খোঁজে গেলো। সুরতুনের হলো মুশকিল। না-পারে তেলের শিশি খুলতে, না-পারে সাবান মাখতে সাহস করে। খানিকটা বাদে মাধাই নিজেই এলো।

'কি রে, বসে আছিস'?

সুবতুন তেলের শিশিটা দেখিয়ে মুখ নিচু করে হাসলো

'খুলবের পারিস নাই'?

খুলতে মাধাইয়েরও জোর লাগলো, পকেট থেকে ছুরি বের করে তার সাহায্য নিতে হলো।

'এক কাজ কর, চুলে অনেক ধুলা আছে। সাবান দিয়ে মাথা ঘষে নে'।

'কী কাম'?

'কলাম ঘষে নে। ময়লা থাকে লাভ কী'?

সুবতুন নিজের মাথা ঘষার কাজটা জীবনে করেনি। গ্রামে থাকার সময়ে কোনোদিনই তার এসব কথা খেয়াল হতো না। চালের কারবারে বেরিয়ে বরং একবার সে মাথা ঘষেছিলো, যেদিন মোকামের ছোটো নদীটিতে সন্ধ্যাবেলায় তারা দল বেঁধে স্নান করতে নেমেছিলো ট্রেন ফেল করে অন্য কিছু করার ছিলো না বলে। ফতেমা সেদিন অনেকটা সময় ধরে তার মাথা ঘসে দিয়েছিলো।

'কী হলো'? মাধাই প্রশ্ন করলো।

'আমি জানি নে।

তখন সুবতুনকে পিঁড়িতে বসিয়ে, ভয়ে দিশেহারা করে দিয়ে মাধাই তার ঝাঁকড়মাকড় চুলগুলো আর সাবান নিয়ে দু'হাতে মাজতে বসলো। একটি অনভ্যস্ত পুরুষ যেমন পারে তেমনি করে চুল ঘষে ঘষে পরিচ্ছন্ন করে মাধাই বললো, 'এবার গায়ে সাবান মাখে ডুব দিয়ে নিয়ে চুল ঝাড়ে মাথায় তেল দিস। আমি লাবড়ি বাঁধে আনি'।

মাধাই ফিরে এসে দেখলো সুবতুনের স্নান হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন গামোছাপরা একপিঠ ছাপানো চুলে সুবতুনকে যেন চেনাই কঠিন।

মাধাই বললো, 'তোর ছাড়া শাড়ি কী করলি, ধুয়ে নিয়া কাম নি যে ময়লা ও তার পরেও কাম নি'।

'কী করবো'?

'পা দিয়ে ঠেলে জলে ফেলে দে।

সামনে সুবতুন, পিছনে মাধাই। লকড়ির ভারে মাধাই হেঁট হয়ে চলছে কিন্তু ইতিমধ্যে মাধাই সুবতুনকে লক্ষ্য করেছে কয়েকবার।

সে বললো, 'কাঁপিস কেন'?

'জার লাগে'।

'তা জার একটু লাগবের পারে। অবেলায় সাবান ঘষা তো।

একটু চুপ করে থেকে সুবতুন বললো, কাপড় ফেলায়ে দিলাম—

'আবার কিনলি হবে। টেপির মতো গয়না দিবের পারবো না, সিল্কের শাড়িও না। জোনাকি এক আধখান ধারে হলিও কিনে দিবো। ক' আমার যে টাকা তার কিছু হলে তোর চলে কিনা'।

ঘরে ফিরে মাধাইয়ের কথামতো চুল আঁচড়ে সিঁথি কেটে সুবতুন যখন ঘরময় কাজ করে বেড়াতে লাগলো মাধাইয়ের বিস্ময় বোধ হলো এই ভেবে, এমন রূপ এমন কঠিন কোথায় লুকানো ছিলো। লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা তার ছিলো না, নতুবা অন্তত একটা আভাসের মতো মাধাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো সুবতুনের দৈহিক দিকটা। অনাহারে যে কাঠি-কাঠি কাঠ কাঠ হয়েছিলো, চালের ব্যবসায়ের শত কষ্ট সত্ত্বেও নিয়মিত আহার পেয়ে সে তেমনটা আর ছিলো না। একটা মালিকানা বোধও হলো তার। এই দেহটির কী দুরবস্থা হয়েছিলো অনাহারে। পিঁপড়ে ঢাকা মৃতদেহের মতো সুবতুনকে কুড়িয়ে এনেছিলো সে। সে ছাড়া আর কেউ সুবতুনকে এমন করে সাজাতে এগিয়ে আসেনি অন্তত এ কথাটা তো ঠিক। কাজের এক অবসরে সে সুবতুনকে ডাকলো।

'কী কও'?

লাইন-দেখা রেল কোম্পানির আলোটা তুলে সুরতুনকে মাধাই যেন পরীক্ষা করলো। নিজের ঘরে তেমন বড়ো আরসি ছিলো না যে তার সম্মুখে সুরতুনকে দাঁড় করাবে। মাধাই ভাবলো, ও কি বুঝতে পারে ওকে কেমন দেখায়। স্বাস্থ্য ও দেহবর্ণ কথা দুটির প্রয়োগ করতে না পারলেও মাধাই অনুভব করলো টেপির চাইতেও সুরতুন গরীয়সী। এমন পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে সুরতুন কি মালবাবুর সেই সুকন্যে না কী তার নাম, তার মতোই হবে না?

মাধাইয়ের উপলব্ধি হলো জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে। সুরতুনকে নিয়ে এই খেলা তার মুখে যেন স্বাদ এনে দিলো।

কিন্তু যারা মনের গোপন তথ্য নিয়ে বহু আলোচনা করতে অভ্যস্ত তারাও কি মনের গতি নির্ধারণ করতে পারে? মনের কোনো হদিসই যার জানা নেই সেই মাধাই পোর্টার কী করে জানবে তার মনে কোন রূপটি তার ব্যবহারে কখন আত্মপ্রকাশ করে বসবে। আমি কর্তা, আমি অভিভাবক, আমার প্রাচুর্য থেকে দান করে ওকে ধাপে ধাপে একটি স্বচ্ছন্দ জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, এই ছিলো তার অনুভব। এবং এরই ফলে তার হৃদয় আতপ্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আর একটি বিষয়ের দিকে তার নজর ছিলো না। মলিন সুরতুনকে দেখে যা কোনোদিন হয়নি তেমনি একটা কামনা সংগোপনে তার চেতনার অজ্ঞাতে বেড়ে উঠেছিলো তার সন্ধান সে কখনো রাখেনি। প্রকাশের মুহূর্তেও তা তার চেতনায় পরিস্ফুট হলো না। ইতিমধ্যে সুরতুনের জন্যে সে একজোড়া রোল্ড গোল্ডের বালা এনে দিয়েছে, চোখে দেবার সুর্মাও।

সুরতুন প্রসাধনের আর কিছু জানতো না, কিন্তু সুর্মা দেওয়া জানতো। বোধ করি তাদের সমাজে পুরুষরাও পালে-পার্বণে সুর্মা ব্যবহার করে বলে। সে রাত্রিতে আবার সার্কাসে যাবার কথা ছিলো, পৃথক আসনে না বসে আজ কাছাকাছি বসার কথা। সুরতুন নিজেই আজ সেজেছে। রান্না শেষ করে মাধাই ডিউটি থেকে ফেরার আগে চুল বেঁধে, চোখে সুর্মা দিয়ে সুরতুন প্রস্তুত হয়েছিলো। সার্কাসে যাবার জন্য পোশাক পরে ফিরে দাঁড়িয়ে সুর্মা-আঁকা চোখজোড়া দেখে মাধাই যেন তারই আকর্ষণে এগিয়ে গেলো সুরতুনের দিকে। আকস্মিক দুর্দম্য কামনায় মাধাই সুরতুনের সুগঠিত অবযব ছাড়া অন্য সবই বিস্মৃত হয়ে গেলো।

উদ্বেল অবস্থাটা কেটে গেলে মাধাই লক্ষ্য করলো সে তখনো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যে কুপিটা দরজার কাছে ছিলো সেটা ছিটকে পড়ে খুলে গিয়ে দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। সুরতুন নেই। মাধাই ধোঁয়ায় ও কেরোসিনের গন্ধে বিরক্ত হয়ে জুতোসুদ্ধু পায়ের চাপ দিয়ে কুপিটি চটকে লেপটে আগুনটা নিবিয়ে দিলো।

মাধাইয়ের ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে অন্ধকার পথে দিশেহারা হয়ে ছুটে সুরতুন কলোনির প্রান্তসীমায় এসে পড়েছিলো। কিন্তু এ জায়গাও যেন যথেষ্ট গভীর আশ্রয় নয়। সুরতুন উঁচু বাঁধের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। একবার তার মনে হলো বাঁধের নিচের জঙ্গল লুকানোর পক্ষে ভালো, কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন একটা শিয়াল খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তাকে ভয় দেখালো। গতি দ্রুততর করে চলতে চলতে সুরতুনের মনে হলো, এই বাঁধ যেখানে গিয়ে ব্রিজের নিচে লেগেছে তার কাছে কতকগুলি কুটির আছে। প্রায় একবছর হলো সেগুলি খালি পড়ে আছে, বাঁশের গায়ে বিলেতিমাটি বসানো দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে, সেগুলির প্রতি এত অযত্ন। সুরতুনের বোধ হলো, ঐরকম একটা ঘরে গিয়ে যদি দরজা বন্ধ করে দিতে পারে তবে সেই নিশ্ছিদ্র আবরণে সে নিশ্চিন্ত হবে।

ঘরগুলির কাছে এসে একটু ভয় ভয় করলো তার। সে শুনেছিলো এগুলি এক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিলো। তারা চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারী কি কেউ নেই? যতদূর সম্ভব নিশব্দে এবং একটি মানুষের পক্ষে নখ ও দাঁতকে যতখানি প্রস্তুত রেখে এগোনো সম্ভব তেমনি করে চলে একটি ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকটা সময় সে লক্ষ্য করলো সেই গভীর অন্ধকারে কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া যায় কিনা। ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে সে ঘরটিতে প্রবেশ করে হাতড়ে

হাতড়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

সকালে পাখপাখালির ডাকে ঘুম ভাঙলে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। তার বাঁদিকে ঘরের ছাদ আর দেয়ালের মাঝখানে অনেকটা জায়গা ভাঙা, সেদিক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার গায়ের উপরে। আরও খানিকটা সময় চুপ করে বসে থেকে সে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের চেষ্টা করলো।

একসময়ে সে ঘরটির বারান্দায় গিয়ে বসলো। মাধাইয়ের কাছে ফিরবার মুখ আর তার নেই। মাধাইকে সে শুধু যে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে তাই নয়, ঠিক সে-সময়ে একটি অভূতপূর্ব বন্য আগ্রহও সে অনুভব করেছিলো মাধাইয়ের প্রতি। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও ছিলো।

সম্মুখে বাঁধটা অনেকটা চওড়া। বাঁধের নিচের দুটি ধাপ ক্রমশ উঁচু হয়ে সর্বোচ্চটির সঙ্গে মিশেছে ব্রিজের তলায়। এ অঞ্চলে লোক চলাচল কম। বাঁধের উপরে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানগাছের মতো উঁচু উঁচু ঘাসের মাঠ। উপরে ছাই রঙের আকাশ। এ দুয়ের মাঝখানে শাদা ঢেউ তোলা কাচের মতো ব্যবধান। ঘাসের সবুজ তলটির উপরে দু'একটি সরু সরু গাছ চোখে পড়ে। সেগুলি ঘাসের জঙ্গলের উচ্চতার সমতা বুঝতে সাহায্য করছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সুরতুন বারান্দাটিতে বসে রইলো। খাড়া রোদ গায়ে না পড়লেও দুপুরের উত্তাপে কষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু সে যেন ক্ষুৎপিপাসাতেও কাতর হবে না এমনি তার বসার ভঙ্গি। পিপাসার কষ্ট একসময়ে দুঃসহ হয়েছিলো, কিন্তু বাঁধ ও বাঁধের জঙ্গল ডিঙিয়ে জল খেতে যাবার চেষ্টা করাও তার কাছে সমান অসম্ভব বোধ হলো। একটা পুরো দিন সুস্থ দেহে উপবাস করা তার জীবনে এই নতুন নয়। এর আগে একবার রজব আলির কাছে মার খেয়ে সে নিজের ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলো, নিরম্বু উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর ছিলো না। মনোভাবের দিক দিয়েও ঘটনা দুটি তুলনীয়। কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, তখন না খাওয়া আধপেটা খাওয়াই ছিলো দিনের সহজ নিয়ম। এরই ফলে সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত এই ঘরের কোণে টিনের কৌটো ইত্যাদির জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখে থেকে থেকে তার লোভ হচ্ছিলো আহার্যের সন্ধান করতে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে জনসমাগম হলো। তিন হাত লম্বা একটি লোক। মাথাটা দেহের তুলনায় অনেক বড়ো। মাথার পাতলা চুলে কানের দু পাশে পাক ধরেছে। চিবুকে দশ-পনেরোটি দাড়ি, তিন চার আঙুল লম্বা। একমুখ হলুদে দাঁত মেলে সে হেসে বললো, 'তোমার বাড়ি কোন দ্যাশে, মিয়ে? কালও দেখছিলাম, আজও দেখছি। মনে করছিলাম মাটির পুতুল, মনে করছিলাম পরী, এখন দেখি মিয়ে'।

মানুষের সাড়ায় সুরতুন ভীত হয়েছিলো, কিন্তু লোকটির মুখের দিকে চেয়ে তার সাহস ফিরে এলো। দিঘার বাজারে দুধের দোকানের পাশে এ লোকটিকে ঘাস বিক্রি করতে সে ইতিপূর্বে দেখেছে।

'কেন্, মিয়ে, কোন দ্যাশের লোক তুমি'?

সুরতুন বললো, 'বুধেডাঙায় ছিলো, এখন কোনোখানেই নাই'।

'বুধেডাঙায় যাবা? আমার সাথে গেলি যাতে পাবো। আমার বাড়ি চরণকাশি'।

কোথাও তো নিশ্চয়ই যেতে হবে।

সুরতুন অন্যমনস্কের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলেন, আমিও গাঁয়েই যাই'।

পথে যেতে যেতে লোকটি সুরতুনকে গ্রামের অনেক সংবাদ দিলো। তার মধ্যে চৈতন্য সাহা ও রামচন্দ্রর খবরও ছিলো। চৈতন্য সাহার বেলায় সেগুলি মুঙলাদের গানে প্রচারিত, রামচন্দ্রর ক্ষেত্রে রূপকথার শক্তিকল্পনা। সুরতুনের মন এতটা ভারমুক্ত হয়নি যে সে প্রশ্ন করবে। নীরবে সে শুনে যাচ্ছিলো।

লোকটি প্রস্তাব করেছিলো উঁচু সড়ক ছেড়ে আলের পথে চলার, তাতে নাকি তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছনো যাবে। উঁচু সড়কে প্রকাশ্যে চলার চাইতে অপেক্ষাকৃত অবিশিষ্ট হয়ে চলা যায় আলপথে। সুরতুন রাজী হয়েছিলো। আলের দু-ধারের জমিতে আউসের চাষ হয়েছে। কখনো কখনো পরিপুষ্ট ধানের

ছড়া গায়ে এসে লাগছে।

কৌতূহল নিয়ে না-শুনলেও, লোকটির গল্প আগ্রহভরে গ্রহণ না করলেও ধানের স্পর্শ সুরতুনের মনের উপরে শান্তির মতো কিছু লেপে দিচ্ছিলো, যেমন জ্বরতপ্ত দেহে সকালের বাতাসটুকু দিতে পারে।

কিছুদূর গিয়ে লোকটি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলো, 'কেন্ মিয়ে, তুমি আমাক বিয়ে করবা'?

বিয়ে? প্রস্তাবটার আকস্মিকতা ও প্রস্তাবকারীর স্বরের দ্বিধাহীনতা লক্ষণীয়। অন্য কোনো পুরুষ যদি এমন দৃঢ়স্বরে বলতো সুরতুন নিঃসন্দেহে ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠতো। কিন্তু নির্জীব এই লোকটির মুখের দিকে এই প্রস্তাবের পরও সে চাইলো। লোকটিই বরং লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলো।

'কেন, আপনে আমাক বিয়ে করবের চান কেন্'?

'এমন লজ্জত আর দেখি নাই'।

'কেমন লাগে দেখতে'?

লোকটি অকবি নয়। সে বললো, 'মিয়ে নতুন ধানের মতন। আমার এক পাখি ধানের জমি, চাষ দিছি, বুঝলা। আমার নাম ইস্কান্দার। আউস উঠলি সেই খ্যাড়ে ঘরে ছাউনি দিবো'।

ইস্কান্দারের গলা আবেগে ধরে এসেছিলো। হয়তো এ কথা সত্যি তার এই প্রৌঢ় চাষী জীবনে সুরতুনের মতো সুবেশা কোনো রূপবতীর ছাপ এর আগে পড়েনি। চোখে পড়ছে সুরতুনের পরনে মাধাইয়ের দেওয়া নতুন জামাকাপড়। ধানের জমির আল দিয়ে চলতে চলতে ধানের অজস্রতা তার প্রৌঢ় শিরায় বিবাহের প্রস্তাব করার যে সাহস এনে দিয়েছিলো, ঘরের কথা উঠতেই কিন্তু তার সবটুকু নিমেষে স্তিমিত হয়ে গেলো। কিছুকাল চিন্তা করে সে বললো, 'ঘরে আমার ছাওয়ালের মা আছে, মিয়ে, তোমাক বিয়ে করা হবি নে। ছাওয়ালের মা অরাজী'।

কিছুকাল ইস্কান্দার তার ছেলের মায়ের গুণ বর্ণনা করলো। তার ধানের ভালোবাসার মূর্তিরূপা সেই বিগতযৌবনা স্ত্রীলোকটির গৃহকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলো সে। তারপর তার ভালোবাসাবৃত্তি ধান স্ত্রীলোক-বর্জিত আকাশকে আশ্রয় করে ঘরের দিকে একমুখী হয়ে রইলো।

বুধেডাঙার সীমান্তে, যেখানে পথের ধারে একটা খেজুর গাছের গায়ে পরগাছার মতো অশ্বত্থগাছ উঠেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে ইস্কান্দার বললো, 'পথ চিনবা? যাও। মিয়ে, আবার বাজারে যাবা কবে'?

'বলতে পারি নে, কেন্'?

'তোমার পাশে পাশে হাঁটতাম'। ইস্কান্দার ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

'বলতে পারি নে কবে আবার যাবো বাজারে'। বলে সুরতুন পথ ধরলো।

ইস্কান্দার তার চিবুকে হাত রেখে অবাক হয়ে সুরতুনের দিকে চেয়ে রইলো। এ মেয়ে কি গল্পে শোনা জিন পরীদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এই যেন তার সমস্যা।

খানিকটা দূরে গিয়ে সুরতুনও একবার পিছন ফিরে দেখতে পেয়েছিলো ইস্কান্দার গালে হাত রেখে তাজ্জবের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ইস্কান্দারের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে সুরতুন ফতেমার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। মাধাইয়ের কথা মনে হলো। অনেকটা সময় মনে হয়নি বলেই যেন চতুর্গুণ প্রবল হয়ে মনে পড়ে গেলো। যে বোবা-আশঙ্কায় সে রাত্রির অন্ধকারে বাঁধের পথে ছুটে পালিয়েছিলো এত দূরে এসে সে ভয়টা তত নেই; কিন্তু খানিকটা গ্লানি, খানিকটা নিজের আচরণের জন্য অনুতাপ, দুয়ে মিলে একটি পাথরের মতো ভার তার মনের মধ্যে চেপে রইলো।

আহার্য সংস্থানেরই-বা কী উপায় অবশিষ্ট রইলো?

আর এই রূপ! মাধাই যা আবিষ্কার করলো, বোকা ইস্কান্দারের চোখেও যা ধরা পড়ে, কোথায় লুকাবে তা?

চরণকাশির জোলা নয় শুধু, সমস্ত গ্রামটাই একদিন পদ্মার গর্ভে ছিলো। কোনো সময়ে হয়তো চিকন্দির মাটি গ্রাস করেছিলো পদ্মা, একসময়ে সে মাটি ধীরে ধীরে চর হয়ে মাথা তুললো। কিন্তু তখনো পদ্মার মনোভাব বুঝবার উপায় ছিলো না। চরের তিন দিকে তো বটেই, চরকে দ্বিখণ্ডিত করেও স্রোত চলতো। কালক্রমে সেই মধ্যস্রোতই জোলা হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলটাই চিকন্দির তুলনায় এদিকের ভাষায় দোলা অর্থাৎ নিচু জমি। জোলাটার প্রবাহ একটানা নয়। আঁকাবাঁকা গতিপথের কোথাও কোথাও সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোথাও দু পাশের জমির চাইতে দু'তিন হাত নিচু, মাত্র একটি জায়গায় বারো মাস জল থাকে। প্রগাঢ়তম বর্ষাতেও এখন জোলা পদ্মার স্বপ্ন দেখে না। ভরা বর্ষার একটা-দুটো মাস দু-একটি তালের ডোঙা চলে, দু'একটা জালও হয়তো ছপছপ করে পড়ে, কিন্তু তখনো বদ্ধজলায় আগাছার মতো জোলার বুকে আমনধানের মাথাগুলি জেগে থাকে জলের উপরে এক আধ হাত করে। আর চৈত্র-বৈশাখে পিচ্ছিল শ্যাওলা ঢাকা তলদেশ বেরিয়ে পড়ে তারপর লাঙলের মুখে মাটি উলটে শ্যাওলাগুলি ঢাকা পড়ে যায়, কখনো কখনো গত ফসলের বিচুলির অংশও চোখে পড়ে।

তবু প্রবাদ এই পদ্মার সঙ্গে এর গোপন সংযোগ আছে। তার প্রমাণ নাকি এই যে, এদিকে বর্ষা নামতে একদিন দুদিন করে যখন দেরি হচ্ছে কিন্তু উত্তরের পাটকিলে জল এসে এক সুত দু সুত করে ফুলতে থাকে পদ্মা, তখন জোলার তলদেশও ভিজে ভিজে ওঠে। আসলে জলটা আসে সানিকদিয়ারের কাটা খাল বেয়ে পদ্মার পুরনো প্রবাহপথ থেকে।

তা যতই না দুর্বল হোক, জন্ম যার মহাবংশে—এরকম একটা মনোভাব হয় আলেফ সেখের।

জোলাটার অনেকাংশ হাজিসাহেব গয়রহের দখলে। সানিকদিয়ারে তাঁর বাড়ি থেকে সোজা পুবে হেঁটে এসে যে বাঁশঝাড় তার নিচে থেকে প্রায় সিকি মাইল জোলা ধরে এগিয়ে গেলে একটা বুড়ো পাকুড় গাছ, তার গোড়া পর্যন্ত জোলাটা হাজিসাহেব এবং তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর। এদিকের চৌহদ্দিটা আরও পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট করা আছে। পাকুড়ের গোড়া থেকে এপার ওপার বিস্তৃত একটা বাঁধ। এপার থেকে বাঁধ ডিঙিয়ে নামা সহজ নয়। এদিক থেকে বাঁধের উচ্চতা প্রায় চার পাঁচ হাত, ওদিক থেকে হাত দু তিন। জোলা যখন টইটুম্বুর তখনো বাঁধটা আর হাতটাক জলের উপরে জেগে থাকে।

আলেফ সেখ জোলার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে বাঁধটার নিচে হাজিসাহেবদের চৌহদ্দির এপারে থামলো। হাতের লাঠিটা দিয়ে বাঁধটার গা ঠুকতে ঠুকতে সে স্বগতোক্তি করলো--বোধায় ওপারের জমি আরও ভালো।

আলেফ সেখ একটা প্রবাদ শুনেছিলো, সেটা এই—পদ্মার প্লাবন হলেই কেউ না কেউ বড়লোক হয়। পুরনো প্রাসাদ যখন ভেঙে পড়ে তখন পদ্মার জলে ঝনঝন করে লোহার শেকল বাঁধা ঘড়া পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। যে ভাগ্যবান দুঃসাহসী সে ই আবর্তের কাছাকাছি যেতে পারে, তার আর হা অন্ন করতে হয় না। বাল্যে যেমন এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার বলে মনে হতো, এ বয়সে তেমন হবার কথা নয়। তাহলেও পদ্মার ভাঙাগড়ায় ব্যাপারের সঙ্গে হঠাৎ কারো ভদ্রলোক হওয়ার সম্ভাবনা তার মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। যুক্তির সাহায্যে বরং তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পদ্মার গতি পরিবর্তন মানেই জমি ভাঙা আর চর জেগে ওঠা। যার জমি ভাঙে সে নিজের কপাল চাপড়ে চাপড়ে ফাটায়, আর যার ভাগ্যে চর পড়ে তার কপাল আপনি ফাটে—রবাতের বরকত, এক আবাদে বিশ ধান, ধানের মাপের বিশ নয়, বিশগুণের বিশ। সে বারের ব্যাপারটাও পদ্মার কূল ভাঙার মতো হয়েছিলো। হৈঁউতি ধানের ফলন দেখলেই মাথা ঘুরে যায় ফসল ঘরে ওঠার আগেই। ঘরে যখন উঠলো ধান তখন মতি স্থির রাখা যায় না।

ঠিক সেই বছরেই আলেফ সেখ আর তার ভাই এরফান সেখ শহর থেকে পেন্সন নিয়ে গ্রামে এসেছিলো। বিদায়ের সময়ে তারা কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলো, তারই সাহায্যে বহুদিন পরিত্যক্ত নিজেদের

বাড়িঘর মেরামত করে, লাঙল-বিঁধে-বলদ কিনে, দুই ভাই স্থির করেছিলো জীবনের বাকি কয়েকটি দিন শান্তির দিকে মুখ করে একটানা নমাজে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

গ্রামে আসার পর তাদের নিজ গ্রামের কয়েকজন লোক আলেফ সেখ ও এরফান সেখের কাছে এসে কথায় কথায় বলেছিলো, গ্রামে একটা পাঠশালা ছিলো সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যদি দু'ভাই এদিকে নজর দেয় ভালো হয়। পাঠশালায় ধর্মকথা শেখানো হবে, এবং তার নাম মক্তব হবে এই শর্তে আলেফ সেখ নজর দিয়েছিলো। অবশ্য গ্রামে বিদ্যোৎসাহী জনতা ছিলো এমন নয়। আমজাদ, যাকে গ্রামের চাষীরা আড়ালে খোঁড়া মৌলবী বলে, তারই উদ্যোগে ব্যাপারটা হয়েছিলো। সে সরকার থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করার দরুন বৎসরে তিন কুড়ি টাকা পায়। পাঠশালাটাকে একটু ভালো করতে পারলে সেটা বেড়ে বৎসরে তিন কুড়ির উপবে বারো টাকায় দাঁড়াতে পারে। আলেফ সেখ এর পরে মক্তবের সেক্রেটারি হলো এবং তদারক করে পদ্মার তীর থেকে স্বচ্ছন্দজাত কাশ ও নলখাগড়া কাটিয়ে এনে ঘরটিও মেরামত করে দিয়েছিলো।

এরপরেই এলো ধানের বন্যা। সে এরফানের সঙ্গে পরামর্শ করে ধান কেনাবেচার কাজ করেছিলো। চিরকালের অস্থিরমতি ধানের সে এক অবুঝ পাগলামি। এ-হাটে ধান কিনে ও-হাটে যাও, দু'টাকা ব্যাজ মনে। সাতদিনের দিন ধানের দাম বাড়ে পাঁচ টাকা। কিন্তু ভাঁটার টান লাগলো ধানেব বন্যায়। সে-টান এমন যে চড়চড় করে জমি ফেটে যেতে লাগলো। ধান যেন পদ্মা। সে-ভাঁটার টানে মাথা ঠিক রেখে নৌকো চালানো যার-তার কাজ নয় তো! চৈতন্য সাহা আর তার বাঙাল মাল্লারা ছাড়া আর সকলেই সরে দাঁড়ালো।

আলেফ সেখ এরফানকে ডেকে বলেছিলো, 'কেন্ বে আর ধান কিনবো'?

এরফান জানতো আলেফ ধানের হাত-ফেরতার কাজ কবছে। সে বললো, 'কেন্, হলে কি? কতকে'?

'গহরজান তিনপটি দিবের চায়,চৌদ্দ মনের দরে'।

'সব্বোনাশ! চৌদ্দয় উঠেছে। আব কেনা নাই'।

'কেন্'?

'এবার নামবি'।

'নামবি তার কি মানি'?

'নাইলে মানুষ জেরবার হবি। বাঁচবি কে? খোদাই আর দাম উঠবের দিবে নে, নামাবি'।

যুক্তিটা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না-করলেও আলেফ ধান কিনতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার এসেছিলো।

'এরফান রে'

'কী কও বড়োভাই'?

'জমি ধরবো'?

'জমি'?

'হয়। বিশ টাকায় বিঘা, এক বছরের খাইখালাসি'।

'ভাবে দেখি'।

আলেফ তখনকার মতো চলে গেলো। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সে জমি কিনবে না। এরফানের সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই বুধেডাঙার এক সান্দারের পাঁচ বিঘা জমি সে খাইখালাসিতে রেখে টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খটকা লেগেছে তারও, জমির এই স্বল্পমূল্য কি প্রকৃত কোনো ব্যাপার, না জিন-পরীর খেলা। সে অপেক্ষা করতে লাগলো, ঘুরঘুর করে বেড়াতে লাগলো সুযোগের অপচয় করে উদাস ভঙ্গিতে এ-মাঠে ও-মাঠে।

এরকম সময়ে একদিন মাঠের পথে রিয়াছৎ মৌলবীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো। রিয়াছৎ তখন

বাস্তার পাশ থেকে খানিকটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তার লজ্‌ঝড় সাইকেলটার একটা অংশ মজবুত করছে। আলেফকে দেখে সে প্রীতি সম্ভাষণের ভঙ্গিতে বললো, 'আদাব সেখসাহেব'।

'আসলাম্'।

'ইস্কুলডা কেমন চলতেছে'?

'কোন্ ইস্কুল'?

'আপনার সেই মক্তবডা'।

আলেফ উত্তর দিতে গিয়ে থামলো। মক্তবটার দিকে সে কয়েক মাস নজর দিতে পারেনি ধান উঠবার আগে সে স্থির করেছিলো মক্তবের নামে একটা ফান্ড খুলে দেবে। কিন্তু ধান ও জমির ভাবনায় সেদিকে আর কিছু করা হয়নি। রিয়াছতের কথায় আলেফের গা চিড়বিড় করে উঠলো। সে যেন আলেফের পায়ের কড়া মাড়িয়ে দিয়েছে। রিয়াছৎ কিছুদিন আগে সানিক দিয়ারের মসজিদের জন্য কিছু অর্থ-সাহায্য চাইতে এসেছিলো, আলেফ বলেছিলো মক্তবের জন্যই তার অন্য কোনো সৎকাজে অর্থব্যয় করার সামর্থ্য নেই। সে কথাটা রিয়াছৎ কেচ্ছার মতো আজগুবি করে ছড়িয়ে দিয়েছে।

আলেফ বললো, 'চলবে না কেন্, বেশ চলতেছে, জোরের সঙ্গে চলতেছে'।

'আজ যে বন্ধ দেখলাম'।

'তা মাঝে মধ্যে বন্ধ দেয়াও লাগে'।

রিয়াছৎ ফিক করে হেসে সাইকেলে চড়লো। তার হাসিটা বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক প্রফুল্লতার লক্ষণ নয়।

আলেফ ক্রুদ্ধ হলো। যে কটূক্তিটা মুখে এসেছিলো সেটা চেপে সে রিয়াছৎকে ডাকলো, 'শোনো শোনো, রিয়াছৎ'।

'জে'। রিয়াছৎ সাইকেল থেকে নামলো।

'তুমি শুনছো নাকি মক্তবটার জন্য দুইশ টাকার ফন্ড করে দিছি'?

'তা তো দিবেনই, আপনার মক্তব'। রিয়াছৎ উদাসীন সুরে বললো।

আলেফ আশা করেছিলো খবরটা শুনে রিয়াছৎ বিস্মিত হবে। আশানুরূপ ফল না পেয়ে সে আবার বললো, 'ধরো যে দুইশ তো নগদ, এছাড়াও মেরামতরে, বেঞ্চিরে টুলরে, এ সকলেও খরচ খরচা আছে'।

রিয়াছৎ এবার বিস্মিত হয়ে বললো, 'দেওয়াই তো লাগে, পাঠানের বংশ আপনার'।

বলা বাহুল্য, ফান্ড, বেঞ্চ, টুল এসবই কাল্পনিক বদান্যতা , আলেফ আর কথা বাড়ালো না। পায়ে পায়ে বাড়িতে ফিরে সে ভাবতে বসেছিলো। স্ত্রী এসেছিলো খরচের পয়সা চাইতে, আলেফ বললো, 'নাই, নাই'।

'কও কী, এত ধান তুললা'?

'হয়, ধানই তো'।

দুপুরের পরে এরফানের বাড়িতে গিয়ে সে বললো, 'কও দেখি কী অত্যাচার'।

'অত্যাচার করলো কে'?

আলেফ রিয়াছৎ মৌলবীর ব্যাপারটা বর্ণনা করলো।

এরফান হেসে বললো, 'দিলা নাকি এসব'?

'তুই কি কস'?

'ভালো কাজ। কিন্তু এখন মানুষ না খায়ে মরে। এখন এ কী কথা'?

বাড়িতে ফিরে খানিকটা সময় আলেফ ভাবলো। হয়তো তার সঙ্গে আলাপ করার আগে খোঁড়া মৌলবীর সঙ্গে মক্তব সম্বন্ধে রিয়াছৎ আলাপ করে এসেছিলো এবং ফান্ড ইত্যাদি যে সবই কাল্পনিক এ কথাটা এতক্ষণে প্রচার করতে লেগে গেছে। এবং প্রচার করার সময়ে আলেফের পাঠান-বংশ সম্বন্ধেও

ইঙ্গিত করছে। এরপরে দু-এক দিনের মধ্যে ফাণ্ড খোলা, মক্তবের বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে আলেফের টাকার একটা মোটা অঙ্ক খরচ হয়ে গিয়েছিলো ; যদিও ছাত্র বা মাস্টারদের তখন আসবার কথা নয়, আসেওনি তারা।

জমি কেনার পথে প্রথম বাধা হিসাবে এ ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য ছিলো এই মনে হলো এখন আলেফের। জোলার খানিকটা জমি হস্তান্তর হবে এ সংবাদ শুনেই আজ সে পরিদর্শনে এসেছে। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের বছরের তুলনায় এ বৎসর দাম প্রায় পাঁচগুণ। এখন দাঁড়িয়ে বাঁধের গায়ে লাঠি ঠুকে জমির পরখ করতে করতে আলেফের মনে হলো এছাড়া আরও বাধা ছিলো। রিয়াছৎ মৌলবীর ব্যাপার মিটবার পর কিনি-না-কিনি করতে করতে কাউকে কিছু না বলে পাঁচ দশ বিঘা জমি বুভুক্ষুদের কাছে কিনে, গ্রামে যতদূর লেখাপড়া করে নেওয়া সম্ভব তা সব শেষ করে আবার একদিন এরফানের বাড়িতে গিয়েছিলো সে।

এরফান ফুর্সিটা আলেফের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো, 'বড়োভাই, এদিকে আর আসো না। কাল গিছলাম তোমার বাড়ি, পাই নাই। জমি কেনার কথা বলছিলা, কিনলা'?

'অল্প সল্প কিছু'।

'দাম কমে যাতেছে। আল্লা, কী হলো দুনিয়ায়'!

এরফানের কথা বলার ধরনটা আলেফের ভালো লাগলো না। জমির দাম কমা যেন খুব একটু খারাপ ব্যাপার এরকমই তার কথায় মনে হলো। সে কথার পিঠে কথা বললো না।

এরফান বললো, 'ধান কিন্তুক ছাড়ো না'।

'তুই সবই উল্টা কস। জমির দাম কম তাও খারাপ, ধানের দাম বেশি তাও ধান ছাড়বো না'।

'ছয় মাসের খাবার রাখে যা হয় করবা। দুর্ভিক্ষ কতদিন চলবি কে বলবি'।

আলেফ এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তুই জমি কিনলি না'?

'ভাবছিলাম কিনবো, তা কিনলাম না'।

'কেন্, এমন সুবিধা কি আর কখনো পাবি'?

এরফান খানিকটা সময় ভাবলো বড়োভাইয়ের মুখের সম্মুখে কথাটা বলা উচিত হবে কিনা, তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'কেন্ বড়োভাই, ওরা খাতে না পায়ে জমি বেচতেছে, সে জমি কেনা কি অধর্ম না'?

আলেফ খুঁতখুঁত করে হাসলো।

'অভাবে না-পড়লে কেউ কোনোদিন বেচে সম্পত্তি, সে সান্দারই হোক আর সান্যালই হোক'।

এরফান এ কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলো না। পৃথিবীর সব ক্রয়-বিক্রয়ের মূলকথা এটা। তবু তার দ্বিধা কাটলো না। সে বললো, 'আমার আর খানেযালা কোথায়, কী হবি জমিতে'?

এর ফলেও জমি কেনার প্রবৃত্তি কিছু সংহত হয়েছিলো আলেফের কিন্তু আসল বাধাটা এলো অন্যভাবে।

ঠিক এরকম সময়েই শোনা যাচ্ছিলো খানিকটা জোলার জমি বিক্রি করবে রহমৎ খন্দকার। হাজিসাহেবেরই বংশের লোক রহমৎ। শহরে গিয়ে ভিক্ষা করতে পারবে না, ঘরেও ধান নেই যে তারই জোরে ঘরে থাকা যাবে ; ঘরে থাকতে হবে ঘরেরই একাংশ বিক্রি করে।

খবরটা শুনে আলেফ সানিকদিয়ারে গেলো হাজিসাহেবের বাড়িতে। হাজিসাহেব নমাজ শেষে উঠে বসতেই কথাটা সে উত্থাপন করলো। গত কয়েক মাসে হাজিসাহেব আর একটু বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে কম দেখছেন। আলেফের কথা শুনে বললেন, 'ওরা কি গাঁয়ে থাকবি নে'?

'তা থাকবি'।

'তবে বাপ বড়ো-বাপের জমি বেচে কেন্? তা কি বেচা লাগে'?

'মনে কয় জমি বেচে খোরাকির ধান কিনবি'।

হাজিসাহেব দুর্ভিক্ষের খবরটা ভালোরকম জানতেন না। নমাজ, ফুর্সি ও বিশ্রামের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে আজকাল পৃথিবীর সংবাদ কমই পৌঁছায়। তিনি জিভ-টাকরায় চুকচুক শব্দ করে প্রশ্ন করলেন, 'খোবাকির ধান জমি বেচে, কও কি আলেফ'?

'হয়, তাই শুনি। আপনে জমিটুক্ রাখবেন'?

রহমৎ খন্দকারের বাপ-জ্যাঠার সঙ্গে তারা যতদিন বেঁচে ছিলো হাজিসাহেবের মামলা চলেছে। এ জোলা নিয়েও শরিকানী হুজ্জত কম হয়নি তখন। হাজিসাহেবের কপালের পাশে দু'একটা শিরা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বড়োছেলে ছমিরুদ্দিকে ডাকলেন তখন, তখুনি যেন জমি সম্বন্ধেই কোনো নির্দেশ দেবেন।

শেষ পর্যন্ত হাজিসাহেব কিন্তু জমি কিনলেন না। এখন বাঁধের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছুকভাবেই আলেফ মাথাটা নত করে মনে করলো ঘটনাটাকে। একটু পরে হাজিসাহেব বলেছিলেন—না আলেফ, লোভ সামলান্ লাগে - কামটা ভালো না। লোকে কবি বিপদে পড়ছিলো আপুজন , তাক না দেখে, হাজি তার মাথায় বাড়ি মারলো। তোবা। ছমির, দুই বিশ ধান দেও না কেন রহমতেক।

আলেফকে তখন-তখনি বাড়ি ফিরতে দেননি হাজিসাহেব। গোসল, খানাপিনা শেষ করে রোদ পড়লে হাজিসাহেব আলেফকে ফিরবার অনুমতি দিলেন। ধানের কথা, জমির কথা তলিয়ে গেলো। হাজিসাহেব বললেন, 'কেন্ আলেফ, তোমার বাপের সেই মজিদের কী হলো'?

'আছে সেই রকমই'।

কও কী, কলে যে দুই ভাই পিন্সান পাও।

'তা পাই'।

'এবার তাইলে মজিদের ভিত পাকা, রং করে দেও।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা করে আলেফ বলেছিলো, 'বেআদব যদি করছি মাপ করবেন, হাজিসাহেব'।

'কও কী, আলেফ, তুমি সৈয়দ বংশের। আসছিলা তারই জন্য সুক্রিয়া করতেছি'।

কিন্তু জমি জমিই। বিশেষ করে জোলার জমি। একসঙ্গে তিন চাষ। আউস, আমন, কলাই। আউস তোলো, নামুক ঢল। জল বাড়বি, আমন বাড়বি। এক হাত বাড়ে জল, সোয়া হাত আমন। কাটো সোনার আমন। জল কমবি, জল শুকায়ে যাবি। একেবারে শুকানের আগে ছলছলায় কাদায় ছিটাও কলাই। ধরো যে চাষই নাই।

কথাগুলি প্রায় সোচ্চার করে আবৃত্তি করতে করতে বাঁধ থেকে নামলো আলেফ। খুব ঠকেছে সে এরকম অনুভব হলো তার। এখন কি আর জোলার জমি টাকায় বেড় পাওয়া যায়। লাঠির আগায় খানিকটা এঁটেল মাটি লেগেছিলো। লাঠিটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মাটিটুকু আঙুলে করে তুলে ডলে ডলে সে স্পর্শটুকু অনুভব করলো ; নাকের কাছে এনে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা অনুভব করলো। স্বগতোক্তি করলো সে-এতদিন চাকরি না করে জমির চেষ্টা করলে জোলার অনেকখানি আমার হলেও হতে পারতো।

জোলার উপর দিয়ে সে হাঁটতে লাগলো। কচিৎ কোথাও জলের চিহ্ন আছে, তাছাড়া সর্বত্রই শুকনো পলিমাটি। যখন কাদা কাদা ছিলো জমিটা, তখন গোরুর খুরের গর্ত হয়েছে। দেখে মনে হয় শক্ত। পা দিলে ভেঙে সমান হয়ে যায়।

হায়, হায়, এমন সব জমি পড়ে আছে! তার হলে কি এই দশা হয় জমির। জোলার বাঁধের ওপারে যেমন হাজিগোষ্ঠী, এপারে তেমনি সান্যালরা। এদিকের অধিকাংশ জমি পড়েছে মিহির সান্যালের জমিদারীতে, কিছু খাস, অধিকাংশ পত্তনিতে প্রজা বসানো ছিলো। খাসে তবু কিছু চাষ পড়েছে, প্রজাপত্তনি ভুঁইয়েতে চাষ না হওয়ার সামিল। যারা নেই তারা নেই। দু'সন পরে যারা ফিরেছে তাদেরও অধিকাংশ বাকি খাজনার মামলা-হামলায় কোর্ট-কাছারি নিয়েই ব্যস্ত, চাষ হয় কী করে? নানা দিক থেকে বাধা পেয়ে ইচ্ছানুরূপ জমি কেনা তার হয়নি। একটা ক্ষোভের মতো হয়ে ব্যাপারটা তার মনে ঘুরতে থাকলো।

জোলা ধরে হেঁটে আসতে আসতে মুখ তুলে দেখতে পেলো আলেফ তার সম্মুখে কিছুদূরে জোলার একটি অংশে চাষ হচ্ছে। দুজন কৃষাণ, দুটি লাঙল। জোলার ধারে একজন ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি যে হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। জমির অবস্থান লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পারলো ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে এরফান চাষের তদারক করছে।

জোলার এই অংশটার প্রায় দশ-পনেরো বিঘা জমি আলেফ-এরফানদের পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে অন্যত্র যা আছে পেন্সান নিয়ে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আপোষে ভাগ করে নিয়েছিলো তাবা, কিন্তু এটা এজমালি থেকে গেছে। ব্যবস্থা করা ছিলো চাষ ইত্যাদির সব দায়িত্ব এরফানের, ফসল উঠলে সে ভাগ করে দেবে। কথা ছিলো চাষের খরচেরও একটা হিসাব হবে। সেটা এ পর্যন্ত হয়নি, খরচটা এরফানই করে। আর, সব জমি ভাগ করার পর এটা এজমালি রাখার মূলে একটা মেয়েলি সখ ছিলো। আউস উঠবার পর আমন যখন একবুক জলে দাঁড়িয়ে শিরশির করে তখন জোলায় মাছ আসে, ট্যাংরা পাব্দা তো বটেই, সংখ্যায় নগণ্য হলেও পাঁচ-দশ সের ওজনের বোয়ালও কখনো কখনো পাওয়া যায়। জোলাটার অন্যতম গভীর অংশে এই জমি, পলাদ'র পরেই এর গভীরতা। জমিটা ভাগ করে নিলে মাছ ধরার কী উপায় হবে সেখবধূবা তা নিয়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়ায় এরফান এজমালি রাখার প্রস্তাবটা তুলেছিলো।

এখন এখানে জল নেই বললেই চলে, যেটুকু ছিলো লাঙলের টানে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। বাঁ পাড় থেকে শুরু করে চষতে চষতে লাঙলজোড়া তলদেশে পৌঁছে গেছে, এবার ডান পাড়ের দিকে লাঙলের মুখ ফিরবে।

সকালে উঠে যখন আলেফ এই পথ দিয়ে বাঁধের দিকে গিয়েছিলো তখন এখানে লাঙল ছিলো না। এরফানের সঙ্গেও তার দু তিনদিন দেখা হয়নি, কাজেই কবে চাষ হতে পারে এটা জানা ছিলো না তার। কথা বলার মতো দূরত্বে পৌঁছে আলেফ বললো, 'আজই দিলা চাষ'?

এরফান ফিরে দাঁড়িয়ে আলেফকে দেখতে পেয়ে বললো, 'হয়। দেরি করে কাম কি'?

দেরি করার কথাও নয়। জল দাঁড়ানোর আগেই আউস কেটে তুলতে হবে ; আষাঢ়ে পনেরো দিন থাকতে থাকতে সামাল করতে হয়। কাজেই চৈত্রের গোড়াতেই জোলায় চাষ দিতে হয়। ধান নাব্‌লা হলে আর রক্ষা নেই।

আলেফ বললো, 'আমি যে জানবেরই পারি নাই'।

এরফান বললো, 'আমিও জানতাম না। আজ পেরভাতে ঠিক হলো। চাষের লোক পায়ে গেলাম দুজন, নামায়ে দিলাম'।

'আজ লোক পালা, আজই নামায়ে দিলা? খুব যেন আগ্রহ করতিছ'?

এরফান বললো, 'রোজ পাবো এমন কী ভরসা'।

কথাটা শুনবার জন্য আলেফ অপেক্ষা করলো না। সে ততক্ষণে চাষ দেওয়া জমিতে নেমে গিয়ে লাঙলের কাছাকাছি ঘুরছে। লাঠিটা একবার শূন্যে উঠছে, একবার মাটিতে বিঁধছে। খুব ঠাহর করে দেখতে দেখতে মনে হয় তার লাঠিচালনা আর চলায় মিলে একটা ছন্দ তৈরি হচ্ছে। বিচালি থেকে ধান আলাদা করার পর ধান থেকে ধুলো আর চিটে উড়ানোর জন্য কুলোর হাওয়া দিতে দিতে চাষীরা যখন একবার এগোয় একবার পিছোয় সে সময়েও কতকটা এমনি হয়। অভ্যস্ত চোখে স্বাভাবিক বলে বোধ হয়, যারা নতুন দেখছে তারা অনুভব করে ছন্দটুকু।

কখনো লাঙলের পেছনে, কখনো আগে খানিকটা সময় ঘুরে ঘুরে আলেফ অবশেষে এরফানের কাছে ফিরে এলো। তখন তার জুতোজোড়া এঁটেল মাটির প্রলেপ লেগে লেগে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে ; পায়জামার পায়ের কাছে কাদা লেগেছে, কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

এরফান রহস্য করে বললো, 'লাঙলের মুঠাও ধরছিলে নাকি'?

আলেফ বললো, 'তা ভালো করছিস আজ চাষ নামাযে। মিঠে মিঠে রোদ্দুর আছে'।

আজকের রৌদ্র গতকালের মতোই। এরফান হেসে বললো, 'হয়, চিনি চিনি'।

আলেফ আবার হাসলো, বললো, 'মস্করা না, মাঠে নামে দ্যাখ'।

'তুমি কি আর না দেখে কইছো'।

ব্যাপারটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। দুজনে দাঁড়িয়ে লঘুস্বরে কথা বলাই এর একমাত্র সার্থকতা।

কিন্তু কোনো কোনো মনে সুখ নিখাদ অবস্থায় থাকতে পারে না। পেন্সান নিয়ে বাড়ি আসবার পর থেকে আলেফের মনের গতিটা এরকমই হয়েছে। আহারাদির পর যখন ভালো থাকা উচিত তখনই তার মনটা খারাপ হয়ে উঠলো। নিষেধের পর নিষেধ এসে তাকে যেন কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। সামান্য ওইটুকু জোলাজমির চাষে যদি এত আনন্দ, রহমৎ খন্দকারের জোলাটুকু পেলে কত না গভীর আনন্দ সে পেতে পারতো। ওই সামান্য জমি, তবু সবটুকু তার একার নয়।

এমন অবশ্য শোনা গেছে দু ভাইয়ের এজমালি জমি অবশেষে একজনের অধিকারে এসেছে। এক ভাই খাজনা চালাতে পারেনি, অন্যজন সেই সুযোগে খাজনার ব্যবস্থা করে ক্রমে জমিটার দখল নিয়েছে।

চিন্তাটা পাক খেতে খেতে একটা কল্পনা গড়ে উঠছিলো, কাঁচামাটি থেকে মৃৎপাত্র গড়ে ওঠার মতো। সেটা সম্পূর্ণ গড়ে ওঠামাত্র আলেফের চিন্তা বাধা পেলো। চুরি করে ধরা পড়লে যেরকম মুখ হয় তেমনি মুখ করে সে বললো, 'তোবা, তোবা। এরফানেক ঠকানের কথা ভাবা যায় না'।

কিন্তু এত সহজে ঝেড়ে ফেলার নয়, চিন্তাটা আবার অন্যরূপে ফিরে এলো। জমিটা বিক্রি করে না এরফান? ভাবলো সে। অভাবে পড়া চাষীদের মতো নয়, ন্যায্য দাম নিয়ে হাত বদল করে না?

করে হয়তো, কিন্তু কী করে প্রস্তাব তোলা যায়। এরফান যদি হেসে উঠে বলে—কেন্, বড়োভাই, ট্যাকা যে খুবই হলো? কিংবা ধরো যদি সে রাগ করে? কিংবা পাল্টা প্রস্তাব করে—বড়োভাই, নতুন যা কিনছো আমারও তাতে ভাগ দেও না ট্যাকা নিয়ে।

কাজ নাই লোভ করে—এই ভেবে আলেফ কল্পনাকে সংহত করলো। মনের মধ্যে তবু অসন্তোষ প্রশ্ন তুললো—একবার যাচাই করে দেখলে কী হয়? এতই যদি নির্লোভ এরফান, দেখাই যাক না কী বলে সে।

সন্ধ্যার আগে আগে আলেফ এরফানের বাড়িতে গেলো। এরফানের উঠোনে তখন ধান ঝাড়া চলছে। একদিকে আমন অন্যদিকে আউস ঢেলে দুজন কৃষাণ কুলোর বাতাসে ধুলো চিটে উড়িয়ে বেছন বাছাই করছে। ধুলো আর চিটে আবর্তের মতো উড়ছে। সে সব অগ্রাহ্য করে আলেফ প্রথমে বাঁ দিকের স্তূপটার কাছে গিয়ে একমুঠো ধান তুলে নিয়ে নাকেমুখে খানিকটা ধুলো খেয়ে বললো, 'আউস, কেন্'? তারপর ডাইনের স্তূপটার কাছে গিয়ে অনুরূপভাবে বললো, 'আমন, কেন্'?

এরফান বারান্দায় বসে তামাক টানছিলো, সে হাঁ-হাঁ করে উঠলো—'করো কী, ধুলো খাও কেন্? আঃ হাঃ'!

আলেফ হাসিমুখে বারান্দায় গিয়ে বসলো, 'এত ঝাড়ো যে ধান'?

এরফান কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বললো, 'ধান দেখলেই ঘুরানি লাগে, বুঝি? লোক পালেম, ঝাড়ে রাখি'।

আলেফ বললো, 'তোর অত অভরসা কেন্? এবারও কি লোকে খাটে খাবি নে'?

এরফান ফুর্সিতে মুখ দিয়ে দম মেরে রইলো, তারপর বললো, 'বড়োভাই, দুনিয়ার হাল কে ক'বি কও? আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়ে। শুনছো না খবর? লোক দেশ ছেড়ে যাতেছে'।

'দেশ ছাড়ে কনে যায়'?

'কেন্, শোনো নাই? ওপারের কলে নাকি মেলাই লোক নিতেছে'।

'গাঁয়ের সব লোক খাবি এত বড়ো পেট কোনো কলেরই নাই, তা তোক কয়ে দিলাম'।

'তা নয় নাই। সময়মতো হাতের নাগালে লোক না পালে সময়মতো তোমার চাষও হয় না, ধান

ছিটানোও হয় না। কেন্, খোঁজ করে দেখলেই পাবো বুধেডাঙায় কয়ডা লোক আছে। কয়জন খেত আর লাঙল এক করলো, কও'।

কথাটা মিথ্যা নয়, ভাবলো আলেফ। শুধু বুধেডাঙা কেন, চিকন্দি, চরণকাশি আর সানিকদিয়ার কোথাও যেন চাষের তাগাদা নেই এবার।

নিস্পৃহ উদাসীন ভাব যেন কৃষকদের। এরফানের একক প্রচেষ্টার কথা ছেড়ে দিলে জোলাতেও আজ পর্যন্ত চাষ পড়লো না।

আলেফ বললো, 'হয়, শুনছি। চৈতন সা-র জমিগুলোতে এবার কেউ চাষ দিবের চায় নাই। মিহির সান্যালও জমি সব খাস করতেছে। লোক পাওয়া কঠিন হলেও হবের পারে। তাইলে আমার জমিতেও চাষ ফেলা লাগে। এজমালিডার ধান ছিটানে কবে করবি'?

'কাল লাঙল, পরশু মই, তরশুদিন ধান বই'।

'রঙ্গ রাখেক। বেছন ঝাড়তিছিস'?

'ঝাড়া লাগে না'?

'লাগে না কেন্। আমার নতুন কেনা জমিগুলোতেও কালই চাষ দিবো, কি কস? রাখাল পাঠায়ে আজই লোক ডাকাবো। তা শোনেক এবফান যত ধান ঝাড়ছিস সব তো তোর জোলায় লাগবি নে'।

'না, তা লাগবি নে'।

'তাইলে আমার জমিটুকের জন্যে খানটুক রাখিস'।

এরফানের হাসি পেলো। তার বড়োভাই যতদিন চাকরি করেছে ততদিন তার এ পরিচয়টা ঢাকা ছিলো। এখনো খরচের জাঁক তারই বেশি। মক্তব করা, মসজিদ তোলা, এসব পরিকল্পনা এরফানের মাথায় আসে না। অথচ এই সামান্য সামান্য ব্যাপারে আলেফের ব্যয় সংকোচের চেষ্টাও হাস্যকর।

'তা রাখবো'। বললো এরফান হাসিমুখে।

ফুর্সিতে আর দু'একটি টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আলেফ, বললো, 'তাইলে আর বসি না। চাষডা কালই দি। বুঝিস না গত সন সান্দারদের জমিতে এক ফসল পাইছি। এবার দু ফসল তোলা চাই'।

বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে সে বললো, 'মনে রাখিস বেছনের কথা'।

বাড়িতে পৌঁছে সে দেখলো, তার স্ত্রী কুপি ধরে পথ দেখাচ্ছে আর রাখাল ছেলেটি গোরুবাছুরগুলো গোয়ালে তুলছে।

দরজার কোণে লাঠিটা রেখে সে গোয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মনটা তার খুশি খুশি হয়ে উঠেছে। চাষ, চাষ। একটা প্রত্যাশায় অন্য সব অভাববোধ সাময়িকভাবে মন থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে। স্ত্রীকে হকচকিয়ে দিয়ে সে হাঁই হাঁই করে বললো, 'কেন্, জমি কিনবা, চাষ দিবা না'?

বুঝতে না-পেরে স্ত্রী বললো, 'আমি কি মানা করছি'?

'তা করো নাই, বুদ্ধিও দেও নাই'।

স্ত্রী তার মনোভাব বুঝতে না-পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

স্ত্রীকে ছেড়ে আলেফ রাখালকে আক্রমণ করলো, 'শালা গিধ্ধর, শোনেক'!

'জে'।

'জের কাম না। তোর বাপ দাদাক কাল আনবি'।

'জে, যদি না আসে'?

'তুমি এ মুখ হবা না, হাড় ভাঙে দেবো তোমার'।

রাখাল ছেলেটি মনিবের আকস্মিক রূঢ়তায় ফ্যালফাল করে চেয়ে রইলো।

'বোঝ নাই আমার কথা? কাল তোর বাপ-দাদাক আনাই চাই'।

ছেলেটি পলায়নের ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করলো। সে চলে যেতেই আলেফের স্ত্রী বললো, 'নেশা

করছো নাকি বুড়াকালে, আচমকা ছাওয়ালডাক তাড়লা'।

'তাড়লাম কই। রহস্য করলাম। বুঝলা না, কাল ধরো যে তোমার জমিতে চাষ দিবো। ওব বাপ-দাদা না হলি চাষ করে কেডা'।

'চাষ দিবার জন্যে বউযেক আর রাখালকে মারপিট করতি হয়? ও, মনে কয়, কাল আসবি নে, বাবা-দাদাক আনা দূরস্থান'।

'কও কী'!

আলেফ বাইরে এসে দাঁড়ালো। চৈত্রের চাঁদের আলোয় ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে রাখাল ছেলেটি হেঁটে যাচ্ছে। আলেফ ডাকলো, 'ছোবান'! উত্তর না পেয়ে মুখের দু পাশে হাত রেখে আলেফ হাঁক দিলো, 'ছু-বা-না'!

'জো এ এ'।

'বাপ আমার—শো-নে-ক'।

ছেলেটি কাছে এলে আলেফ বললো, 'তোর আজি ডাকতিছে রে, জলপান দিবি'। রাখাল ছেলেটির হাত ধরে বাড়ির ভিতরে এনে স্ত্রীকে বললো আলেফ, 'দুড়ে জলপান দেও না'।

'এখনই তো গরম ভাত রাঁধে দিছি'।

'তা হোক, তা হোক। কাল কত খাটবি খোটবি। দেও, দুড়ে দেও।

রাখাল ছেলেটির কোঁচড়ে জলপান এসে পৌঁছুলে আলেফ বললো, 'ছুবান আমার সোনার ছাওয়াল। কাল তোমার বাপ আর দাদাক আনবা, কেমন? কবা যে, কী যেন কও তুমি, কবা যে সেখের বেটা ডাকছে তোমাদের। তার বুধেডাঙার জমিতে চাষ দিবি'।

ছেলেটির মুখে এবার হাসি দেখা দিলো।

আহারাদির পর আলেফ স্ত্রীকে বললো, 'তুমি শোও, আমি আসতেছি'।

'রাত করে জমি দেখবের যাও নাকি'?

'শোও না, শোও। আমি আসতিছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে লাঙল-বিঁধে থাকে খানিকটা সময় সেখানে অকারণে ঘোরাঘুরি করে আলেফ মসজিদটার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। লম্বা চওড়ায় বারো তেরো হাত, টিনের ছাদ, বাঁশের ছ্যাঁচার উপরে মাটিলেপা বেড়ার ঘর, পাশে একটা পাতকুয়া। এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো আলেফের বাবা। প্রধানত এটা পারিবারিক উপাসনার জন্যই ব্যবহৃত হবার কথা। কখনো কখনো গ্রামের লোকরাও আসে। প্রবাদ এই যে, চরণকাশি ও বুধেডাঙার নতুন মাটিতে লাঙল দেবার নেশায় যখন আদমজাদরা রহমান খোদাকে বিস্মৃত হয়ে গেলো তখন আলেফের বাবা এ দুটি গ্রামের প্রতিষ্ঠাকে শয়তানের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় এই মসজিদ স্থাপন করে তৎসংলগ্ন পাচ-ছ কাঠা জমি পৃথক করে রাখে। আলেফ চাকরি থেকে ফিরে কিছু অর্থব্যয় করে এটাকে আবার ব্যবহারযোগ্য করেছিলো কিন্তু জমির দিকে নজর দিয়ে মসজিদকে বাঁধিয়ে পাকা করার পরিকল্পনা কাজে আসেনি। ফকির বোধ হয় চেরাগের তেল পায়নি আজ। বার্ধক্যের দরুন ঘুমও হয় না, মসজিদের বারান্দার একটেরে চুপ করে বসে আছে।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে বোধ করি আহারের আশায় ফকির এই দেশে এসেছিলো। কিন্তু কেউই তাকে আশ্রয় দেয়নি। অবশেষে সে এই মসজিদের কাছে এসে বসে পড়েছিলো। ময়লা ঝুলঝুলে আলখিল্লা আর ছেঁড়া ছেঁড়া কাঁথাগুলো বয়ে বেড়ানোর ক্ষমতাও তার আর অবশিষ্ট নেই তখন। অন্ধকারে লোকটিকে বসে থাকতে দেখে আলেফ রাগ করে বলেছিলো—কে ওখানে?

ফকির ভীতও হলো না, আগ্রহও দেখালো না।

আলেফ উঠে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো—এখানে কী হতিছে?

—বাবা—

—ভিক্ষা-শিক্ষা এখানে নাই।

—ভালো, বাবা, ভালো।

—নিজেই খাতে পাই না।

—ভালো, বাবা।

—গ্রামের বড়ো বড়ো লোক আছে, উঠে দেখেন।

—তা বেশ, বাবা। আজ রাত থাকি। গ্রামের লোক ক'লে সৈয়দবাড়ি এটা।

—হুঁ। কী ক'লে?

—সৈয়দবাড়ি।

—হুঁ, সৈয়দবাড়ি। ওয়াজীব।

আলেফ দম্-দম্ করে পা ফেলে অন্দরে গিয়ে বললো—লোক না খায়ে মরে দরজায়। স্ত্রী বললো—আমি কী করি কও। আমি মরতে কই নাই।

—ও কি যাবের আসছে মনে করো? নড়বি নে, থাকবি। খাবের তো দেওয়া লাগবি। ওর জন্যি পাক, মনে কয়, করা লাগে।

সেই থেকে ফকির মসজিদে আছে। প্রথম দু'চার দিনের পর আলেফ নিজের অকারণ অর্থব্যয়ে বিরক্ত ও শঙ্কিত হয়ে ফকিরকে প্রকারান্তরে স্থানত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলো, এমনকী একবেলা আহারও বন্ধ করে দিয়েছিলো। কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। নির্বিরোধ ফকির। যা বলো তাতেই 'তা বেশ, বাবা' ছাড়া অন্য কথা মুখে নেই। একটা দিকে অবশ্য সুবিধা হয়েছে, ফকির মসজিদের যত্ন করে। দাওয়া ও ঘরের ভিতরে নিকিয়ে ঝকঝকে করে রাখে। ছ্যাঁচার বেড়া থেকে মাটির প্রলেপ খসে গেলে নিজেই কাদামাটি ছেনে আস্তর লাগায়। মোটকথা মসজিদ সম্বন্ধে আলেফ নিশ্চিন্ত।

'আলেকোম সেলাম'।

'আস্সাম আলাইকুম। আলোয় ঘুরতেছেন'? ফকির প্রশ্ন করলো মৃদুস্বরে।

'আপনের কাছে আসছিলাম। কাল জমিতে চাষ দিবো কিনা'।

'তা বেশ, বাবা, বেশ'।

'ধরেন যে আমি তো চৈতন সা-র মতো মানুষকে জেরবার করি নাই। নগদ দামে জমির স্বত্বও কিনছি, জমিদারের হালতক খাজনাও শোধ করছি'।

'চাষবাসের কথা আমি বুঝি না বাবা, সেই কোন বয়সে ঘরবাড়ি ছাড়া'।

'তা না। ধরেন যে বছরের প্রথম খন্দের চাষ। তা ধরেন মৌৎ, হায়াৎ, দৌলৎ, এ তো ধরেন যে মানুষের কাছে থাকে না'।

'খোদার ফরমায়েস, বাবা'।

'ধরেন যে মজিদের কাছে আসে একবার তো অনুমতি নেওয়া লাগে'।

'বেশ, বাবা, বেশ'।

স্বামী বিছানায় এলে আলেফের স্ত্রী প্রশ্ন করলো, 'সাঁজে কতি গিছলা'?

'এরফানের বাড়ি'।

'কেন্'?

কথাটা আবার মনে হলো। আলেফ বললো, 'এজমালিডার সবটুক যদি আমার হতো'।

'না হলিই-বা ক্ষতি কী'?

'ক্ষতি কী, হলে বৃদ্ধি ছিলো'।

ও পক্ষ থেকে কোনো উৎসাহের সঞ্চার হলো না। আর তাছাড়া তখনকার মন আর সকালের মনে পার্থক্য আছে। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের টুকিটাকি বিষয়গুলি শোভাযাত্রা করে তার মনের উপর দিয়ে চলতে লাগলো। লাঙল ঠিক আছে কিনা, মইয়ের দুখানা কাঠ ভেঙে গেছে, কাল সকালে ছোবানের বাপ-দাদা দুজন এলে তাদের জলপান দেওয়া উচিত হবে কিনা। বলদ দু জোড়াকে এতদিন দেখা হয়নি, কাল তারা লাঙল কীরকম টানবে কে জানে। ছোবানের বাপ দাদা আসবে তো? শেষের এই প্রশ্নটা অনেক সময় ধরে মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরলো। এরফানের কথায় ভয় হয় কাজের মানুষ পাওয়া যাবে না।

এ চিন্তাগুলি শেষ করে আলেফ সদ্য চাষ-দেওয়া জমিগুলির চেহারা কল্পনা করতে লাগলো। বুধেডাঙার যে জমিগুলিতে কাল চাষ দেওয়ার কথা সেগুলিকে ভুলে গিয়ে আবার জোলার কথাই চিন্তা করতে লাগলো সে। মানুষের দুখানা হাত একত্র করে যাচ্ঞার ভঙ্গি করলে যেমন দেখায় অঞ্জলিটা, তেমনি যেন জোলার চেহারা। কালো রঙের একজন চাষী অঞ্জলি পেতে আছে। সেই অঞ্জলি ভরে উঠবে ধানে, জলে, কলায়ে।

আলেফ খুশি খুশি মুখে ঘুমিয়ে পড়লো।

সব জমিতে আউসের চাষ হয় না। নতুন পুরনো মিলে আউসের সব জমিতে চাষ দেওয়া শেষ করে, ধান ছিটানো শেষ করে এদিকে-ওদিকে চাইবার অবকাশ পেলো আলেফ। চৈতন্য সাহার নামে গান বেঁধেছে ছেলেরা, সেটা কানে এলো তার। প্রথমে শুনে ছেলেদের উপরে রাগ হয়েছিলো। পরে একসময়ে সে কৌতুক বোধ করলো। এরকম সময়ে একদিন চৈতন্য সাহার সঙ্গে মাঠের মধ্যে তার দেখা হয়ে গেলো। সেদিন সন্ধ্যার পর এরফান এসেছিলো। প্রাথমিক আলাপের পরই আলেফ বললো, 'শুনছ না গান'?

'কিসের'?

'চৈতন সা-র নামে বাঁধেছে। রাখাল কতেছিলো'।

'হয়, শুনছি। তোমার ছোবানই আমার উঠানে নাচে নাচে শুনায়ে আলো'।

'কাণ্ড'! বলে আলেফ খুঁতখুঁত করে হাসলো।

এরফান বললো, 'এবার যদি তোমার নামে বাঁধে'।

'সোবানাল্লা, কস কী'?

'তুমিও তো কিনছো কিছু কিছু জমি, কিছু খাইখালাসিতে রাখছো'।

কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, খানিকটা সময় ভাবলো আলেফ।

'কস কী, সে তো মুশকিল। তাইলে তো কোনো ব্যবস্থা করা লাগে'।

'ব্যবস্থা আর কী করবা? এত যদি ডর হাই-হুই করে বেড়াও কেন্, বয়স তোমার বাড়তিছে না কমে'?

'কেন্ রে, কী বাঁধবি গান আমার নামে'?

'কেন্, তুমি নিজেক সৈযদ কও, তাই নিয়ে যদি চ্যাংড়ামো করে'।

'তাই করবি নাকি'?

'করবি তা কই নাই, করবের পারে তো'।

আলেফ বিরক্ত হয়ে বললো, 'মানুষ কি মজিদের ফকির—তার নড়াচড়া নাই'?

এরফান এবার হাসলো। ফুর্সিটায় সুখটান দিয়ে দাদার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'ছোটোকালে বা'জান যখন এক হাতে লাঙল ধরছে তার থিকে এখন অনেক বাড়ছো। আর কেন্, এবার সাজায়ে গুছায়ে আরাম করো। ছাওয়াল বড়ো হতিছে। সে কি চিরকালই মামার বাড়ি থাকবি'?

'মামার বাড়ি থাকবি কেন্। গরমের বন্ধেই তো আসবি'।

'তা আসবি। কী লেখছে জানো'?

'কই, চিঠি তো পাই নাই আজকালের মধ্যে'।

'তার চাচীক লেখছে কোলকাতায় নাকি পড়বের যাবি। এনট্রেন্স পাস করে সে থামবি নে'।

'হয়, হয়, পাস করুক'! তার পাস করার ব্যাপারটা আলেফ বিশ্বাস করে না।

'পাস সে দিবি, নইলে অমন কথা লেখে না। লেখছে কলারসিপ না-পালেও সে পড়বি। চাচী যেন চাচাক কয়ে রাখে'।

ছেলের কথায় কিছুকাল আলেফ অন্যমনস্ক হয়ে রইলো। সেদিন এরফান উঠে দাঁড়ালে আলেফ বললো, 'চৈতন সা-র মতো গান যদি বাঁধে, চুপ করে থাকাই ভালো হবি, তাই না'?

এরফান বললো, 'সে তখন দেখা যাবি'।

এরফান চলে গেলেও খানিকটা সময় আলেফ বসে বসে চিন্তা করলো : কী সর্বনাশ! কয় কী! ছাওয়াল যদি সে গান শোনে, কী কবি?

রাত্রিতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আলেফের অভিমান হলো। ছেলে মামার বাড়ি থেকে পড়ে, তারও আগে নিঃসন্তান চাচার কাছেই মানুষ হয়েছে। আলেফকে বহুদিন পর্যন্ত ভয় করে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াতো। সেসব অল্পবয়সের ব্যাপার। এখন ছেলে বড়ো হয়েছে, তার বাপ মা চেনা উচিত।

আলেফ বললো, 'কেন্, ছাওয়ালের মা? তোমার ছাওয়াল নাকি পাস দিবি'?

'হয়। ওর চাচা কলে মেট্রিক না কী পাস দিবি'।

'হুম'।

'কী কও'?

'বলি ছাওয়ালডা আমার তো'?

'তার মানি'?

'মানি আর কি? দুনিয়ার লোক জানে ছাওয়াল পাস দিতেছে, আর আমি জানবের পারলাম না'।

'তোমাক তো লেখছে। তুমি তো চিঠি হাতে পায়েও চালের বাতায় গুঁজে রাখছিলে, গোঁজাই আছে। সে পেরায় একমাস'।

'কাল সকালে দিবা। পড়বো। সে নাকি কোলকাতায় পড়বের যাবি।

'হয়। ওর ছোটো চাচী কলে, ডাক্তারি পড়বের চায়'।

'ডাক্তারি! আল্লা, আল্লা, কয় কী? লোক মারে শেষ করবি তাইলে'। কিছুকাল চিন্তা করে আলেফ বললো, 'কেন্, ঘুমালে'?

'না, কী কবা'?

'কেন্, আমি কি কিছু কবের জানি না'।

'কোনোদিন কও নাই'।

আলেফ রসিকতার চেষ্টা করে বললো, 'তোমাক হেঁদুদের আয়োস্ত্রীর মতো দেখায়, কই নাই?

'কইছো। স্বামী যখন বাঁচে আমি তখন আয়োস্ত্রী না তো বিধবা হবো নাকি'?

চাকরির একসময়ে আলেফকে দীর্ঘকাল হিন্দুপল্লীতে বাস করতে হয়েছিলো। আলেফের স্ত্রীর মিশুক স্বভাবের জন্য হিন্দুমেয়েরা আলেফের বাড়িতে যাতায়াত করতো। কেন তা বলা যায় না, আলেফের স্ত্রী তাদের কাছে লেস বোনা জামা সেলাই করা যেমন শিখেছিলো তেমনি পায়ে আলতা দিতে প্রথমে, পরে কপালে সিঁদুরের টিপ দিতে। এখন অবশ্য সে আলতা বা সিঁদুর ব্যবহার করে না কিন্তু এঁটোকাঁটার বাছবিচার করে। এবং অত্যন্ত কৌতুকের ব্যাপার, কোনো মাংসই খায় না। একসময় ছিলো যখন আলেফ এসব নিয়ে বিদ্রূপ করেছে স্ত্রীকে কিন্তু স্ত্রীর নির্বিরোধ দৃঢ়তাই জয়লাভ করেছে শেষ পর্যন্ত। এসবের গোপন কারণ অবশ্য এরফান জানে। আলেফের স্ত্রী তার ছেলের মঙ্গল কামনা থেকে মাংস খায় না।

এটাকে এরফান প্রকাশ্যে সমর্থন না-করলেও মনে মনে প্রশংসা করে।

আলেফ বললো, 'কাল সকালে চিঠি দিয়ো, দেখবো ছাওয়াল তোমার কত লায়েক হইছে'।

'ওরকম করে কথা কও কেন্, ছাওয়াল এখন বড়ো হইছে'।

আট-দশদিন পরে আলেফের মনে হলো ছেলেকে একটা চিঠি লেখা দরকার। সহসা এ কর্তব্যবোধটা জাগ্রত হওয়ার কারণ আগের দিন সন্ধ্যায় এরফানের সঙ্গে আলাপ করে সে বুঝতে পেরেছিলো ছেলেকে কলকাতায় রেখে পড়ানোর অর্থ মাসে সত্তর-আশি টাকা খরচ।

আলেফ আঁতকে উঠে বলেছিলো—কস কি? সে যে আমার পিন্সানের সব টাকা দিলেও হয় না।

—তা কি করবা। ছাওয়ালেক ডাক্তার করতি গেলে তা লাগে।

আলেফ নিজের অর্থকৃচ্ছ্রতার কাল্পনিক ও অর্ধসত্য কাহিনী দু একটি উত্থাপন করেছিলো কিন্তু এরফান এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি। বরং ভয় দেখিয়েছিলো বেশি জোরজার করলে ছেলেই হাতছাড়া হবে। এরকম ভালো ছেলে এরকম ঘরে সব সময়ে হয় না। তার মামাবাড়ির দেশের যে কোনো সচ্ছল গৃহস্থ জামাই করে ছেলেকে ধরে রাখতে পারবে পড়াতেও পারবে।

রাত্রিতে অনেকটা সময় সে চিন্তা করে স্থির করলো ছেলেকে বাড়িতে এনে নিজের খপ্পরে পুরতে হবে, তারপর অন্য কথা।

খুব সকালেই গ্রামের ডাকঘরে চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলো আলেফ, এরফানও বেরিয়েছিলো লোহারের দোকানে নিড়ানি তৈরি করানোর জন্যে।

ফিরতি-পথে এরফান হঠাৎ থেমে দাড়ালো। তার সম্মুখের ঘাসবনটা দুলছে, ভিতর থেকে একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দও উঠছে। শুয়োর না হয়ে যায় না। এরফান নিঃশব্দে সরে যাবার চেষ্টা করছিলো, এমন সময় সে জঙ্গলের মধ্যে সবুজে রঙের আলখিল্লা ও শাদা দাড়ির কিছু কিছু দেখতে পেলো।

'সোভানাল্লা, বড়োভাই! কী করো'?

কথাটা শুনতে পেয়ে আলেফ থেমেছিলো, রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে এরফানকে দেখতে পেয়ে হাসি হাসি মুখে বললো সে, 'বুঝলি না, লটা ঘাস। কুশেরের মতো লাগে। ছোটোকালে খাইছিস মনে নাই'।

'তা খাইছি, কিন্তুক এখন কি তুমি আবার ছোটোকালের মতো কায়েফলা আর লটা খায়ে বেড়াবা নাকি'?

'না, না, আমি খাবো কেন্? গোরু ভালো খায়'।

'তোবা। গোরুর ঘাসও কাটবা'?

আলেফের মতি স্থির করা কঠিন হলো। ঘাস তুলে তুলে ইতিমধ্যে সে ছোটো একটা আঁটি করে ফেলেছে। করুণ চোখে একবার ঘাসের আঁটির দিকে, একবার এরফানের মুখের দিকে চাইতে লাগলো সে।

'থাক থাক, মায়া ছাড়তে না পারো—বাড়ি যায়ে রাখালেক পাঠায়ো। ও আর তোমাক মানায় না'।

বিপর্যস্ত আলেফ এরফানে পিছন পিছন চলতে চলতে বললো, 'ঠিকই কইছিস'।

এরফান সে কথায় ফিরে না গিয়ে বললো, 'ছাওয়ালেক চিঠি লিখলা'?

'লেখলাম'!

'গালমন্দ করে নাই তো'?

'তা করবো কেন্'।

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে আলেফ বললো, 'ডাকঘরে যায়ে এক কথা শুনে আসলাম'।

'কী কও'?

'জমি কিনবি'?

'জমি—জমি, আবার বুঝি ঘুরানি লাগছে। গান তাইলে ওরা এখনো বাঁধে নাই'।

'না-না, তাই কই নাই। শুনলাম রামচন্দর মণ্ডল জমি বেচে। বুঝলি এক লপ্তে আট-দশ বিঘা কি তারও বেশি হবের পারে। এ তো না-খাওয়ার ভুঁই না। ন্যায্য দামে কিনব, তার কী কথা কে কবি। আর জমি বুঝলি না, সে যেন কথা শুনে ফসল দেয়। রামচন্দরের জমি'!

'জোতদার হবের চাও'?

'জোতদারি আর কনে, একটুক বাড়ায়ে বাড়ায়ে খাতে হয়'।

'জমি কিনবা, লটা ঘাসও বাঁধবা, এ কেমন বুঝি না'।

আলেফ আবার চুপ করে গেলো।

একই বাপ-মায়ের সন্তান আলেফ এবং এরফান সেখ। আলেফ বড়ো, এরফান ছোটো। দু ভাই একই সঙ্গে প্রায় একই অফিসে চাকরি করেছে, একইসঙ্গে পেন্সান নিয়ে ফিরেছে গ্রামে। কথাটার চারিদিকে এক পাক ঘোরা দরকার। ইস্কুলের মাঝামাঝি এসে সে পথে দুজনের কেউই আর চললো না। আলেফ প্রায় তখন তখনই সরকারি কাজে লেগে গেলো, আর এরফান লাগলো পৈতৃক চাষবাসের কাজে। সকালে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে মাঠে যেতো, আর সন্ধ্যায় ফিরতো গোরুগুলিতে তাড়াতে তাড়াতে। তখনো তার মুখে না ছিলো সুখের চিহ্ন, না ছিলো বিমর্ষতা। তারপর তার সরকারি চাকরি হলো আলেফের চেষ্টায়। উন্নতিও হয়েছিলো, পিওন থেকে বাবু, এগারো থেকে একশ দশ। উন্নতিটা জোগাড়ের বেলাতেও ছিলো আলেফ। কাকে কোথায় তদ্বির করতে হবে, কাকে এনে দিতে হবে শিলিগুড়ির কমলা, গোয়ালন্দের ইলিশ, এ বলে দিতে যেমন আলেফ, সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দিতেও তেমনি সে। লোকে বলে, সেজন্যই নাকি দাদা চাকরির বাইরে যেতে ভাইও স্বেচ্ছায় বিদায় নিলো।

আলেফ এরফানের পাশে হাঁটছে। আলেফের মাথায় ছাতা, হাতে লাঠি। একবুক সাদা দাড়ি। পায়ের জুতোজোড়া বোধ হয় একটু বড়ো। মাটির পথে যত শব্দ হওয়া উচিত তার চাইতে জোরে একটা ফাঁপা শব্দ হচ্ছে আলেফের পায়ে পায়ে।

ছাতিটা পিঠের উপরে রেখে দুই বাহুতে আটকে সামনের দিকে টেনে ধরলে খানিকটা দেহভারও বোধ হয় তার উপরে হেলিয়ে দেওয়া যায়। তেমনি করে চলছে এরফান। তার গড়ন বলিষ্ঠ, যদিও তার মাথার চুলগুলো ধবধবে শাদা।

এরফানের ঘরে ছেলে নেই, মেয়ে নেই, দুই বউ আছে।

আলেফের সংসারও ছোটো, বহুদিন শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সংসারই ছিলো। ছেলে হওয়ার আশা যখন সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তখন তার একটি ছেলে হলো। বউ যায় যায়। এরফানের স্ত্রী পলতেয় করে দুধ খাইয়ে মানুষ করেছে। বড় হয়েও ছেলে অধিকাংশ সময় চাচীর কণ্ঠলগ্ন হয়েই থেকেছে মামার বাড়িতে পড়তে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। আলেফের কুটুম্ব মোক্তার। তার বাড়িতে কিছু লেখাপড়ার চর্চা আছে।

এরফানের দ্বিতীয় স্ত্রী দিঘা বন্দরের শালকর ইস্কান্দার বন্দীপুরের মেয়ে। এরফানের প্রথমপক্ষের শ্বশুর সম্পন্ন গৃহস্থ। ধান ও পাটের চাষে তাদের অবস্থা ভালোই বলতে হবে, কিন্তু সে পরিবারে কারো অক্ষরজ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্পর্কিত যে যেখানে আছে সবাই কিছুদিন লেখাপড়া করেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিজেও লিখবার মতো জ্ঞান রাখে। তার তিন ভাইয়ের মধ্যে দুজন রেল কোম্পানিতে চাকরি করে, সর্বকনিষ্ঠ যুদ্ধে গেছে। ছোটোবউ সুর্মা চোখে দেয়, জামা গায়ে দেয়, জড়িয়ে জড়িয়ে শাড়ি পরে, মেহেদি পাতার নির্যাস দিয়ে পা রাঙিয়ে রুপোর মল ও চটি পরে, বোরখা ছাড়া পথ চলে না। কোনো কাজই করে না সারাদিন। মুটিয়ে গেছে, ছেলেপিলে এরও হবে না।

সম্বন্ধটাও স্থির করেছিলো আলেফ। দুই ভাই যখন চাকরি করে, এবং গ্রামের বাড়িতে খড়ের চালের পরিবর্তে টিনের চাল উঠেছে, আলেফের সখ হলো অভিজাত ঘর থেকে একটি কন্যা আনার। শালকর ইস্কান্দার বন্দীপুরের সঙ্গে তার আলাপ ছিলো। ইস্কান্দারের পূর্বপুরুষরা নাকি অযোধ্যার নবাব পরিবারের

কাজ করতো। এখনও তাদের পরিবারে উর্দু লবজ চালু আছে। আলেফের কথায় ইস্কান্দার অন্য কোথাও খোঁজ না করে নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিবাহের প্রস্তাব তুলে বসলো। কিন্তু এবার আলেফ মত বদলালো। দেনমোহর বাবদ দু হাজার টাকার কথা উঠতেই পিছিয়ে গেলো সে, এবং এরফানকে এগিয়ে দিলো। তবু বিবাহের ব্যাপারে কিন্তু আলেফের উৎসাহই বেশি প্রকাশ পেলো। খানাপিনার ধুমধামে, সামাজিকতার উচ্ছ্বাসে সে সর্বত্র এই কথা প্রচার করে দিলো—যেন তেন ঘরের মেয়ে আনেনি সে ভ্রাতৃবধূ হিসাবে। রইবইস না হতে পারে, কিন্তু অযোধ্যার খানদানি ঘর। বিবাহের সভায় ও ভোজের আসরে আলেফ বেশখ্, সুক্রিয়া, খায়ের প্রভৃতি উচ্চারণ করে বাল্যের উর্দু শিক্ষা কাজে লাগিয়েছিলো।

কথাগুলো মনে পড়ায় এরফানের মুখে এখন একটা হাসি ফুটলো।

মাঝে মাঝে এরফানের দ্বিতীয়পক্ষের শালা সম্বন্ধীরা আসে। বাড়িতে আনন্দের হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। তিন চার বছর আগে তার বড়ো সম্বন্ধী ঈদের সময়ে বউকে সঙ্গে করে এসেছিলো। শাদা প্যান্ট শাদা কোট, চকচকে নতুন জুতোয় রেলের চেকারবাবু। কিন্তু একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিলো। কুরবানির মাংস হিসাবে এক আধ সের গোমাংস এর আগেও বাড়িতে আসেনি এমন নয়। ভাই এসেছে এজন্য একটু ভালোরকমের উৎসব করার সাধ হয়েছিলো ছোটোবউয়ের। বাড়ির একটা দামড়া বাছুর কুরবানির জন্য সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। অন্যান্য দিন রান্নাঘরের ভার থাকে বড়োবউয়ের, সেদিন ছোটোবউ রান্না করবে বলে বড়োবউ কাদামাটি তুলে নিয়ে বাইরের ঘরের দাওয়া পৈঠা নিকোতে গিয়েছিলো। চাকর যখন গোমাংস নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে তখন লাগলো বিবাদ। অবশ্য সেটাও একই পক্ষের। বড়োবউ মিনমিন করে ভয়ে ভয়ে বলেছিলো—কেন, ছোটু, ও মাংস তো রান্নাঘরে রাঁধা হয় না। আর যায় কোথায়! ছোটোবউ ফেটে পড়লো। কৃষাণের ঘরের মেয়ে, এর থেকে আরম্ভ করে নমশূদ্র, চাঁড়াল প্রভৃতি বলে বড়োবউকে নানাভাবে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে অবশেষে এরফান আসতেই সে বলে বসলো, ও যদি এ বাড়িতে থাকে তবে সে নিজে আজই ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাবে। বড়োবউ তিরস্কৃত হয়ে কাদামাটি হাতে নীরবে কাঁদতে লাগলো। ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না যদি ছোটোবউ নিজের বাড়ির দামড়াটা কুরবানিতে না দিতো কিংবা বড়োবউ তার বক্তব্যটা কুটুম্ব স্ত্রীর সম্মুখে উল্লেখ না করতো।

উৎসব অবসান হলে এরফানের শ্যালক যেন লজ্জিত হয়েই চলে গেলো। এরফান অন্যান্য দিনের তুলনায় গভীর রাত পর্যন্ত বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক খেয়ে অন্দরে শুতে এসেছিলো। অন্দরের উঠোনের দুপাশে দুখানা ঘর, ছোটো এবং বড়োবউয়ের। দীর্ঘ আট দশ বছরে যা মনে হয়নি সেদিন এরফানের তাই হলো। কোন ঘরে শুতে যাবে দ্বিধা করলো সে। ছোটোবউয়ের ঘরে দরজার পাশে ছোটোবউ দাঁড়িয়েছিলো, তবু নীরবে বড়োবউয়ের ঘরে ঢুকলো সে।

মলিন থান পরা বড়োবউ ম্লান চেরাগের আলোয় বসে শীতকালের জন্য কাঁথা সেলাই করছিলো। এরফান বিছানায় বসে কেশে গলা সাফ করে বললো, শোবা না?

—তুমি শোও গা, আমি শোবো নে।

—উঠে দুয়ার দেও।

বড়োবউ বুঝতে না পেরে দুয়োরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। দশ বছর বাদে এ-ঘরে শোবো এ-কথাটা বলতে এরফানের লজ্জা করছিলো, সে আর কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়লো। দরজা বন্ধ করে চেরাগ উস্কে দিয়ে বড়োবউ আবার সেলাই নিয়ে বসলো। এরফানের শোয়া হলো না। সে উঠে এসে বড়োবউয়ের পাশে বসলো, কিছুকাল নিচু স্বরে আলাপ করে বড়োবউয়ের মনের গ্লানি দূর করার চেষ্টা করলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যা করলো সেটাই উল্লেখযোগ্য। ঈদের দরুন নতুন কাপড় জামা এসেছিলো। ছোটোবউ, কুটুম্বদের, এরফানের নিজের জন্য, এমনকী বাড়ির চাকরটির জন্যও। এরফানের কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখার ভার বড়োবউয়ের উপরে। এরফান দেখতে পেলো ঘরের এক কোণে কাঠের বাক্সের উপরে তার নিজের জন্য আনা ধোলাই ধুতিজোড়া রয়েছে। সে নিজের হাতে করে নতুন

ধব্‌ধবে ধুতিখানা এনে বড়োবউকে পরতে দিলো। বিস্মিত বড়োবউ কিছু বলার আগে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার শনের নুড়ির মতো পাকা চুলে, জরাজীর্ণ গালে সে শত শত চুমু দিতে লাগলে। বিছানায় শুয়েও এরফান বড়োবউয়ের মাথা নিজের বাহুর উপরে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে দিয়ে তার শাদা চুলগুলোতে সিঁথি কেটে দিলো।

অনেক আদরে মুখ খুলে বড়োবউ বলেছিলো—কেন্, আমার বাপ ভাই যেন মুরুক্‌খু, আমি কি ভালোবাসি নাই আপনেক?

—সোনা, সোনা।

কিন্তু গভীর রাত্রিতে এরফান ঘুমন্ত বড়োবউয়ের ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে ছোটোবউয়ের ঘরে ফিরে গিয়েছিলো।

পুরনো ঘটনা, তবুও এরফানের এখন মনে হলো, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা যার অভ্যাস সেদিন তাকে অমন করে আঘাত না দিলেও চলতো। সে কারো পাকা ধানে মই দেবার মতো লোক নয়। পাকা ধান, ধানের হিসাব সবই তো তোমার দখলে, বাপু। এই তো আবার চাঁদির চন্দ্রহারে গিল্টি করার সখ হয়েছে তোমার, আর সেই কত বৎসর আগে ধান পাকার সময়ে সে শেষবারের মতো হয়তো কিছু চেয়েছিলো। কিছুই চায় না সে।

এসব মনে হওয়ার কারণ এই ছিলো, কাল রাত্রিতে ঘুমটা ভালো হয়নি এরফানের। ছোটোবউ গাল ফুলিয়ে রাগ করতে বসলো। নিদ্রাবঞ্চিত চোখ দুটি করকর করছে। এরফান স্থির করলো আজ থেকে সে বড়োবউয়ের ঘরে ঘুমুবে। ঘুমুলে মুখ দিয়ে ফৎ-ফৎ করে শব্দ হয় বটে, কিন্তু শীতল-স্নিগ্ধ সে। বহুদিন পরে দেখা হলেও চোখ মুখ দেখেই সে বুঝবে।—চেরাগ নিবায়ে দি, ঘুমাও। চুলে হাত বুলায়ে দেবো? হয়তো এসবই বলবে সে।

ছোটোবউয়ের রাগের উপলক্ষ্যগুলি আলোচনা করে সেগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলে মনে হলো। তার প্রথম ফরমায়েস হলো—একটা সামাই-এর কল লাগবি।

—কী হবি? বছরে তোমার কয় মন সামাই লাগে? দোকানে কেনা সামাইয়ে হয় না কেন্?

মেয়েছেলেদের সখ হয় বটে এমন তুচ্ছ জিনিসে, এরফান ভেবেছিলো এরপর সদরে লোকজন যখন যাবে বলে দেবে আনতে। কিন্তু এ ব্যাপারে মনস্থির করেও গল্পচ্ছলে এরফান বলেছিলো—যাই কও, সামাই যে লোকে খায় কেন্, বুঝি না। পায়েস যদি খাতে হয় নতুন আমনের আতপ আর খেজুরের গুড় আর দেও ক্ষীর।

এ আলাপের তবু নিষ্পত্তি হয়েছিলো কিন্তু দ্বিতীয় বায়নার বেলায় অন্যরকম হলো। ছোটোবউ বললো, পোশাক-আসাক ভালো করার লাগে।

—কেন্, এখন পোশাক-আসাক ভালো করলে কি তাজা হবো?

—তা কই না। তাজা পুরুষ দিয়ে কী করবো? আমার ভাই আসবি, তার সামনে জোলা সাজে বেড়াতে পারবা না।

—জোলা হবো কেন, আমি কি কাপড় বুনবের পারি?

—তা না। তুমি ধুতি পরে থাকো, বেমামান লাগে। ময়লা মোটাধুতি মানায় না যেন তোমাকে।

—কী করা লাগবি?

—কেন্, সকলে পায়জামা পরে, তুমিও পরবের পারো।

—তা পরবো কেন, আমি সায়েব না পচ্চিমা যে দু-চুঙ্গি পরবো?

—তাই বলে আমার ভাইয়ের সামনে তুমি ময়লা ধুতি পরে বেড়াবা, তা হবি নে।

—বেশ তো, তোমার ভাই যা চোখে দেখে নাই তাই করবো। সান্যালমশাই চাপড়ির কাপড়-চাদর পরে, তাই পরবো। একটু কড়া মুখেই বলেছিলো এরফান।

এরপরই রাগ হয়েছিলো ছোটোবউয়ের। ভাই চোখে দ্যাখেনি, এই কথাটাই রাগেব পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, তার উপরেও ছিলো সান্যালমশাইয়ের অনুকবণে কাপড় পরার কথা।

এরফান স্ত্রীকে ব্যাপারটা বোঝানোব জন্য বলেছিলো : চাপড়ি একটা জায়গার নাম। সেখানকার জোলা-তাঁতীরা সূক্ষ্ম চাদর আর কাপড় বুনতে পারে। এবং সেই কাপড় ও চাদর এখন কয়েকটি বিখ্যাত পরিবারেই ব্যবহৃত হয়, বাজারে বিক্রি হয় না।

দ্বিতীয় দফায় এরফান স্ত্রীর যুক্তির উত্তরে বলেছিলো—আমি যদি চাপড়ি পরলে দোষ হয়, তুমিও পাবনার শাড়ি পববের পাববা না, পাঞ্জাবি আর ঘাগবা কিংবা পায়জামা পরবা। পারবা? কেন, লজ্জা করে? আমারও করবের পারে তো!

এখন এরফানের মনে হলো ব্যাপারটা অত হাল্কা নয় যতটা সে ভেবেছিলো। তার অনুভব হলো কোনো কোনো বিষয়ে ছোটোবউয়েব সঙ্গে আলেফেব চরিত্রগত মিল আছে। পেন্সান পাওয়ার আগে থেকেই আলেফের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। মাথায় ফেজটুপি পরা, হাঁটু ছাড়িয়ে জামার ঝুল দেওয়া, ধুতিব বদলে পায়জামা। গ্রামে এসেও সে যেন প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলতে চায়। একদিন আলেফ এরফানকে দাড়ি রাখতেও অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু এবফান নিজের পোশাক বদলায়নি, দাড়িও বাখেনি। এক মৌলবীসাহেব বলেছিলো, ধুতি পরে নমাজ পড়া গুনাহ্। তারই ফলে ঈদের নমাজ পড়ার সময়ে এরফান একজোড়া পায়জামা ব্যবহার করে। অন্য সময়ে সেটা বাক্সে তোলা থাকে।

চরিত্রগত মিলটা সব সময় চোখে না পড়লেও, সে এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হলো। বাল্যে যাদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছে সেই সব প্রতিবেশী ও সে যে এক নয় তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই সুযোগ পেলেই আলেফ বলে, তারা সৈয়দ-বংশীয় পাঠান। এরফান বুঝতে পাবে না পাঠানত্ব কোথায় অবশিষ্ট আছে। ইতিহাস পড়া থাকলে সে হয়তো সৈয়দ এবং পাঠান একইকালে কী করে হওয়া যায় এ নিয়েও চিন্তা করতো। তেমনি ছোটোবউ প্রচার করে—সে অযোধ্যাব অধিবাসিনী। একটা কথা বলে দেওয়া যায়—দুজনেরই প্রাধান্য পাবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।

কিন্তু শান্তি পায় কি? আলেফকে মাঠে মাঠে হুট্‌হাট্ করে বেড়াতে হয়, মক্তবের জন্য টাকা খরচ করতে হয়। বড়োবউ তাকে শান্তির হদিশ দিতে পারে এই অনুভব হলো এরফানের।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আলেফ বারকয়েক ছোটোভাইয়ের মুখের দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'কী কস, রামচন্দ্রর জমিগুলের একবার খোঁজ নিবি'?

এরফান আলেফের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো।

প্রস্তাবের সময় খুব মনোযোগ না দিলেও, বলছে যখন বড়োভাই এরকম মন নিয়ে এরফান গিয়েছিলো রামচন্দ্রর কাছে জমির সংবাদ নিতে। ফেরার পথে সে শুনে এলো চৈতন্য সাহা বিপাকে পড়েছে, চাষীরা জমিতে চাষ দিচ্ছে না, উপর থেকে জমিদার খাজনার জন্য চাপ দিচ্ছে। চৈতন্য সাহার জন্য কিছুমাত্র সমবেদনা অনুভব করলো না সে, বরং তার মনে হলো অতিলোভের এরকম ফলই হয়ে থাকে।

সন্ধ্যার পরে আলেফের সঙ্গে দেখা করার জন্য এরফান নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলেফের বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। আলেফের রাখাল ছেলেটা খবর এনে দিলো আলেফ তখনো বাড়িতে আসেনি, জোলার জমি দেখতে গেছে। দাদার প্রতীক্ষায় এরফান এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে নামিয়ে রাখা গোরুর গাড়িটার জোয়ালের উপরে গিয়ে বসলো। যেখানে সে বসেছিলো সেখান থেকে মসজিদের বারান্দাটা খুব দূরে নয়। সে লক্ষ্য করলো ফকির মসজিদের বারান্দায় বসে একমনে কুলোয় করে চাল বেছে যাচ্ছে। তাকে দেখলে একটা নিবু-নিবু চেরাগের কথা মনে হয়। আগেও যেমন, এখনো তেমনি, থরথর করে কাঁপছে কিন্তু হঠাৎ কিছু হবে বলে মনে হয় না। একবেলার আহার্যমাত্র তাকে দেয় আলেফ। যেদিন প্রথম প্রস্তাবটা শুনেছিলো ফকির সে বলেছিলো—তা বেশ, বাবা, বেশ। একবেলাই ঢের।

আলেফের কাছে ফকির একটা জামা চেয়েছিলো, না পেয়ে নির্বিকার মুখে বলেছিলো—তা বেশ, বাবা। বোধ হয় 'বেশ, বাবা, বেশ' বলাটা ফকিরের মুদ্রাদোষ, কিন্তু শুনে সহসা মনে হয়, সবই ভালো তার কাছে, বেশ চলছে দুনিয়াটা।

এরফান পায়ে পায়ে মসজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'দরবেশজী, কী করেন, সেলাম'।

'সেলাম, বাবা, সেলাম'।

'কী করেন'?

'চাল কুড়ায়ে আনছি, বাছি'।

'কেন্, একবেলা কি রাঁধে খাওয়া লাগে'?

'কেন্, এবেলা তো আপনার বাড়ি থিকে খাবার দিয়ে যায় আপনার চাকর। বড়োবিবিসাহেবা পাঠায়'।

'দেয় নাকি? তা কি জানি। চাল দিয়ে কী হয তবে'?

'বাবা, একটা জামা লাগবি। জার আসবি, তার আগে একটা যইসই বানায়ে নেওয়া লাগে। পয়সার জন্যি চাল বাঁচাই'।

এরফান ফিরে এসে তার আগের আসনে আবার বসলো। সে মনে মনে বললো—বেশ, বাবা, বেশ নয়। এ, বাবা, সংসার। এর নামই তাই। কারো রেহাই নেই না ভেবে। তুমি ফকির, তোমাকেও ফিকির করতে হয়। আমরাই শুধু ধান-পান জমি-জমা হুই-হাই করে বেড়াই না। এই তো আমি ভেবেছিলাম, শান্ত হবো, পারলাম? তার চাইতে ভালো জমির সন্ধান পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম রামচন্দ্রর কাছে খোঁজ করতে। তখন ভাবিনি, রামচন্দ্র যদি গাঁ ছাড়ে তবে সে কত কষ্টে দগ্ধ হয়ে। বড়োভাইকে কী দোষ দেবো?

কিন্তু ফকিরের স্থৈর্যও অস্বীকার করা গেলো না। ওই যে চাল বেছে যাচ্ছে সে মাথা নিচু করে, সেও যেন ঘুমের মতো ব্যাপার। হ্যাঁ, এটাই ঠিক চেহারা ফকিরের। ঠিকটা যে কী তা ভাষায় এলো না, অনুভবটা হলো : এই যেমন নড়াচড়া নেই। বাঁচার অনিচ্ছা নয়, বরং বাঁচতেই যেন চাওয়া। ফকির নিজেও বলে, যতদিন বাঁচা যায় আল্লার খিদ্‌মদ্ করা যায়। তার খিদ্‌মদ্ বলতে এক আজান দেওয়া। বাঁচতেই সে চায় কিন্তু সে যেন গাছের বাঁচা, কিংবা মনে করো, চিৎসাঁতার দিয়ে নদী পার হওয়া।

সাঁতারের তুলনাটা আলেফই দিয়েছিলো। একদিন চারিদিকের অবস্থার কথা উত্থাপন করে এরফান বলেছিলো—দুনিয়ার গজব, বড়োভাই। কী যে দাড়ি ভাসায়ে হুট্‌পাট করে বেড়াও!

প্রত্যুত্তরে আলেফ বলেছিলো—কস কী! জলে যেন ডুবতিছি, তাই বলে কি প্রাণী হাত-পাও ছুঁড়বি নে? তখন এরফান লাগসই কথাটা খুঁজে পায়নি। এরপর যদি কখনো আলেফ এই ধরনের কথা বলে, এরফান হাত-পা না-ছুঁড়ে চিৎসাঁতারের কথা বলবে।

এরফান বাল্যে পদ্মায় সাঁতার দিতো। চিৎসাঁতারের আনন্দটা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যদি পরপারের কোনো একটা জায়গায় পাড়ি জমানোর গরজ না-থাকে তবে চিৎসাঁতার না-দিয়ে বুকে যে জল ঠেলে তাকে বেয়াকুফ ছাড়া আর কী বলা যায়।

বড়োভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো না। আর একটু বসে থেকে এরফান ফিরে গেলো। তার মনে হলো বড়োবউ এবং ফকিরের দলেই সে থাকবে।

দু'এক মাস পরে আলেফ আবার অস্থির হয়ে উঠলো। চিকন্দির চাষীদের জমি সম্বন্ধীয় অবস্থায় অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন হয়েছে। চৈতন্য সাহার দুদিক বাঁচানোর চেষ্টায় এই সাব্যস্ত হয়েছে, জমিদার তাকে খাজনা পরিশোধের জন্য ছ মাস সময় দেবে, আর সে নিজে চাষীদের খাইখালাসি জমিগুলি মাত্র আর-এক সন দখলে রেখে ছেড়ে দেবে ; এ সনে চাষীরা যদি তার খাইখালাসি-বদ্ধ জমিতে চাষ দিয়ে

আউস আমন তুলে দেয়, তবে খোরাকির ধানও সে দেবে। কিন্তু রেহান-বদ্ধ জমির বেলায় কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ওদিকে মিহির সান্যাল বলেছে, সে এমন কোনো প্রস্তাব মানতে রাজী নয়। রেহান-বদ্ধ জমি মায় সুদ আসল পেলে খালাস দেবে সে, কিন্তু খাইখালাসি-বদ্ধ জমির বেলায় সুদ আসলের কোনো প্রশ্নই নেই, দু বৎসরের ফসলের আনুমানিক মূল্য ও জমির খাজনা পরিশোধ করে দিতে হবে। সে একাধারে মহাজন এবং জমিদার, কাজেই তার প্রজাদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা বিপন্ন। চিকন্দির চাষীরা চৈতন্য সাহার শর্ত মেনে নিয়েছে। মিহির সান্যালের প্রজারা জমি বিক্রি করে দেবে এরকম কথা শোনা যাচ্ছে। এরকমই এক প্রজার নাম ইসমাইল আকন্দ। আলেফদের জোলার জমির পাশে প্রায় পাঁচ-সাত বিঘা জমি আকন্দর। বিপাকে পড়ে সে খাইখালাসি বন্ধক রেখেছিলো মিহির সান্যালের কাছে। আলেফ খুঁটে খুঁটে খবর নিতে গিয়ে ইসমাইলের ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে। কিছুক্ষণ আলাপের পর ইসমাইল বলেছিলো—বড়োমিঞা, মনে কয় জমি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও খানটুক জমি নিই। এমন মহাজন জমিদারের জমি রাখা যায় না।

'তা নেও না কেন্, সান্যালমশাইয়ের কোনো জমি পত্তনি নেও'।

'পারি কই, ট্যাকা নাই যে'।

'কেন্, কলে যে এ জমি বেচবা'?

'কে কেনে কন্? জমির দাম যা হোক তা হোক, মিহিরবাবুর ফসলের দাম কে দেয়'।

'সে কতকে'?

'দুই সনের ফসলের দাম ফেলাইছে ছয়শ বিশ'।

'ই আল্লা! অমন দাম হয'?

'তা বাজার দরে দুই সনের ধানে কলাইয়ে হবি। কন্, জমির দাম দিয়ে কলাইয়ের দাম দিয়ে কেডা অত টাকা একসাথে বার করে দেয়'?

'সোভানাল্লা, জমির দাম কতকে'!

'তা সাত বিঘা সাতশ হবি'।

আলেফ ইসমাইলের সম্মুখে উবু হয়ে বসে পড়ে বললো, 'সাতশ আর হয় না, কেন্'?

'পুরাপুরি হয় না। ছয় বিঘা কয়েক কাঠা জমি। এদিনে হিসাব করে নিলে সাড়ে ছয়শ হবি'।

দু'তিন দিন আলেফ ছুটোছুটি করে বেড়ালো। পায়চারি করে মনস্থির করার মতো অনুদ্দিষ্ট ঘোরাফেরা। ইতিমধ্যে একদিন গহরজান সান্দারের বাড়িতেও সে গেলো। জোলার জমিতে দুই সনের ফসলের আনুমানিক মূল্যটা স্থির করাই তার উদ্দেশ্য ছিলো। আলেফ মনে মনে হিসাব করে দেখলো জমি কিনে এবারই নিজের দখলে আনতে হলে পনেরোশ টাকা নিয়ে নামতে হয়। নতুবা শুধু জমি হস্তান্তরে কী লাভ? মিহিরবাবুর কাছে খবর নিয়ে সে জানলো ইসমাইল তাকে ঠিক খবরই দিয়েছে।

কিন্তু শেষ পরামর্শটা করা দরকার এরফানের সঙ্গে। পরামর্শ করার আগে জমিটার চৌহদ্দিগুলি আর একবার পরখ করার জন্য আলেফ প্রত্যূষে বেরিয়ে পড়েছিলো। অনেকটা বেলা পর্যন্ত জমিটার চারিদিকে চষে বেড়ানোর মতো ঘোরাফেরা করে দুপুরের আগে সে এরফানের বাড়ির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এরফানের বাড়িতে যাবার পথ তার নিজের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে। তন্ময় হয়ে চলতে চলতে সে লক্ষ্য করেও করলো না, তার বাড়ির দরজায় একটা টোপর দেওয়া গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আল থেকে মাঠ, মাঠ থেকে আবার আল ধরে সে এরফানের দরজায় গিয়ে ডাক দিলো, 'এরফান রে'!

এরফান তেল মেখে স্নানের আগের তামাক টানছিলো, সাড়া দিলো।

'পাঁচশ টাকা দিবা'?

এরফানের হাসি পেলো—দুপুর রোদে টাকার কথা, পাঁচশো টাকার কথা, তাও না-বসে, না-জিরিয়ে, বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় পথ থেকেই।

এরফান বললো, 'কেন্, ছাওয়াল চালে বুঝি'?

'ছাওয়াল? সে আবার কী চায়? সে তো কোলকেতায়'।

'তাই কও, নেশা করছো। ছাওয়াল আসছে দ্যাখো নাই'?

আলেফের এবার মনে হলো বাড়ির সম্মুখ দিয়ে আসার সময়ে অস্পষ্টভাবে একটা আসা-যাওয়ার ব্যাপারের মতো কিছু যেন অনুভব হয়েছিলো তার।

'আসছে নাকি? কিন্তু তোর কাছে আলাম অন্য কামে'।

'কী কাম? পাঁচশ টাকার'?

'হয়। তুই আদ্দেক দে, আমি আদ্দেক। জোলা.. '

'কীসের জোলা? ফসলের আদ্দেক তো পাবাই'।

আলেফের দৃষ্টিটা যদি ভাষা হতো তবে এখন সেটা কুণ্ঠা ও গোপন প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে তোতলা হয়ে উঠতো। এরফান তার দৃষ্টির পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পেলো না। সে বললো, 'তোমার অংশ বেচবের চাও পাঁচশ টাকা নিয়ে? তা করবা কেন্? ওটা পৈতৃক জমি, দুই ভাইয়েই ভোগ করবো। ও জমি আমাকেও না, কাকেও না, বিক্রি করবা না'।

কথাগুলি বললো এরফান আলেফের নীরবতার অবকাশে থেমে থেমে তার স্তব্ধভাব কারণ কল্পনা করতে করতে। সে আবার বললো, 'তুমি তো আজকাল কারো কথাই মানো না, তা একটা কথা কই তোমাক, ছনমন করে না বেড়ায়ে ছাওয়ালের দিকে মন দেও, ও ছাওয়াল বংশের গৈরব বাড়াবি'।

ফেরার পথে ভাবলো আলেফ, ঝোঁকের মাথায় সামনে পিছনে না তাকিয়ে কী কাজটাই সে করতে গিয়েছিলো। নগদ এরফানের যত আছে, তার অর্ধেকও তার নিজের নেই। পরে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে ইসমাইলের দরুন জমির মালিকানাও এরফান হয়তো ফিরিয়ে দিতে রাজী হতো, শত হলেও ভাই তো, এই ভেবেছিলো সে ; কিন্তু...

কিন্তু এরফানের এ পক্ষের সম্বন্ধীরা আবার প্যাঁচালো লোক। তারাও তো একটা যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বসতে পারে। যদি ফিরিয়ে দিতে না চায়? এমনকী, লাঠি দিয়ে মাটি ঠুকলো আলেফ, উল্টে আলেফের অর্ধাংশও চেয়ে বসতে পারে, কিংবা জমির খবর পেলে সে নিজেই ইসমাইলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বন্দোবস্ত করে নিতে পারে।

আলেফ নিজেকে শোনালো গদগদ করে—হয়, কওয়া যায় না জমির কথা। জমি যার নাম।

এতক্ষণে যে রোদটা লক্ষ্যের বাইরে থেকেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিলো, হঠাৎ বেশ ভালো লাগলো সেটা আলেফের, যেন সেও একখণ্ড কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসেছে। খুশির কারণটা নিজের উপস্থিত বুদ্ধি। প্রয়োজনের মুখে সে যে এমন দম মেরে থাকতে পারে এ সে নিজেও জানতো না। অন্য কেউ হলে হয়তো জমি কেনার কথা প্রকাশ করেই ফেলতো। আলেফ মিটমিট করে হাসলো—ও ভাবছে পৈতিক জোলার আদ্দেক আমি বেচবের চাই। তা ভাবুক, ক্ষেতি কি।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে খুশি হওয়ার আর একটা কারণ পেলো সে। ছিলোই কারণটা, এতক্ষণে অনুভূত হলো। এরফান বলেছে—'সে বংশের গৈরব'। পুত্রগর্বে বুক ভরে উঠলো। সদর দরজার কপাটটায় দোষ ছিলো, ছেড়ে দিলে আচমকা অনেক সময়ে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্যমনস্ক বা পুত্রমনস্ক হয়ে ঢুকতে গিয়ে আলেফ ফিরে আসা পাল্লায় গুঁতো খেলো।

অন্দরের উঠোনে নেমে কথা না বলে সে চোখ মেলে খুঁজলো ছেলেকে, কিন্তু কথা বলেও খুঁজতে হলো, 'কৈ, গেল কনে'?

'এই তো'। আলেফের স্ত্রী হাসিমুখে বেরিয়ে এলো দরজার কাছে।

'হয়। তোমাক খুঁজে চোখ কানা হইছে'। গদগদ করে বললো আলেফ।

'তা খুঁজবা কেন্, বুড়া হইছি যে'।

ক্ষোভের অভিনয় করে আলেফ জামা খুলতে ঘরে গেলো।

একটু বাদে ফিরে এসে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় বসে আলেফ বললো, 'কী কী রাঁধলা'?

'ডাল, ভাত, মাছ'।

'এরফান কী কলে জানো? কয়, ছাওয়াল বংশের গৈরব'।

'তা হবি'।

'আমিও কই ছাওয়াল পড়ুক। ডাক্তার হবি, না, উকিল হবি, তা হোক। থাক না কেন্ কোলকাতায়, যত ট্যাকা লাগে তা দিবো। দেখবো ট্যাকার বাড়ি কনে'।

রাখাল ছেলেটি কি একটা কাজে অন্দরে ঢুকছিলো, আলেফ হুংকার দিয়ে উঠলো, 'তামাক খাবের পলাইছিলি কাম ফেলে'?

থমকে দাঁড়ালো ছেলেটি।

আলেফ তো আর রাগ করে বলেনি যে তার কথায় হুংকারের জের থাকবে, একেবারে সাধারণ সুরে সে বললো, 'তামাক সাজ'।

তারা থেকে উদারায় নেমে আলেফ বললো, 'দুধ দোয়াইছিলি, কেন্? এক কাম করো না কেন্, সামাই দিয়ে...'

রাখাল ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললো বিমূঢ়ের মতো, 'জে, সামাই দিয়ে—'

আলেফ আবার বললো, 'সামাই দিয়ে, বুঝলা'?

দুশ্চিন্তায় মাথা চুলকে রাখাল বললো, 'জে, সামাই দিয়ে'।

আলেফ রাগ করে বললো, 'থাম ফাজিল, বদ্‌বখ্‌ত'।

স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললো, 'আমাক কতিছ বুঝি সামাই দিয়ে পায়েস করবের'?

'করো না কেন্। মনে করো কোলকেতায় কত হরকিসিম খাবার। সে শহর দেখি নাই, কী সে শহর'!

স্ত্রী হেসে বললো, 'এ কি দামাদ আসছে? ছাওয়াল কয়ে গেলো বড্ডা খিদে পাইছে, আম্মা। এখন আমার সময় নাই সাতখান রান্না করার'।

'কলে তাই? আম্মা কলে'?

'তো কি বা'জান কবি'?

আলেফ উঠোনে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। একবার ইতিমধ্যে সদর দরজা পর্যন্ত ঘুরেও এলো। বাইরের পথে উঁকি দিয়েও এলো।

'ছাওয়ালের জন্যি মন কেমন করে'? আলেফের স্ত্রী বললো।

'হয়, হয়। তোমাক কইছে, আমি মিয়েছাওয়াল, না'?

সংসারগত প্রাণ, সংসারের চাপে নমাজ হয় না রোজ। আজ নমাজ শেষ করে ঘরে ফিরতে ফিরতে আলেফ অবাক হয়ে গেলো। কোথা থেকে একটা মাধুর্য ক্ষরিত হচ্ছে শব্দকে অবলম্বন করে। সংগীত সম্বন্ধে আলেফের ধারণা অকিঞ্চিৎকর। যাত্রার পালাগান সে শুনেছে প্রথম যৌবনে, চাকরির শেষদিকে শহরে সিনেমাও দেখেছে, সে সব জায়গার দু'একটা গানের সুর তার কানে ছিলো। দুর্ভিক্ষের আগে একবার এক বাউল এসেছিলো। হিন্দু-মুসলমান সব ঘরেই তার গতিবিধি ছিলো। একতারা বাজিয়ে সে গান করতো, কী যেন সেই কাণ্ড, ফুল আর ত্বক আর—তার আড়ালে যে প্রাণপাখি থাকে তার কথা। কিন্তু সে সবকিছু দিয়েই এর তুলনা হয় না।

শব্দের অনুসরণ করে আলেফ এরফানের বাড়ির অন্দরে গিয়ে দাঁড়ালো। এরফানের বড়োবউয়ের ঘরের

বারান্দায় মাদুর পেতে বসে ধবধবে পাঞ্জাবি পায়জামা পরা তার ছেলে কী একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। যে চাঁদ এখনো ওঠেনি সবটুকু তারই সামান্য আলো এসে পড়েছে যন্ত্রটির উপরে, আলোয় কী একটা চকচক করছে। এরফান চিবুকের নিচে দুই হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে পাশে। রাগ-রাগিণী কাকে বলে আলেফ জানতো না, কিন্তু অনাস্বাদিতপূর্ব একটি মধুর বিষাদে তার মন ভরে গেলো। কিন্তু শুধু বাজনা নয় তো, তারই ছেলের বাজনা। আলেফের চোখ দুটিও জলে ভরে উঠলো।

বাজনা শেষ করে ছেলে বললো, 'ভালো লাগলো, চাচা? তোমার, বা'জান?

'খুব ভালো, এ বাজনা বুঝি সায়েবদের'?

ছেলে হেসে বললো, 'না, বা'জান, এ আমাদের দেশের। একে সেতার বলে'।

ছেলে সেতারটা নামিয়ে রেখে আড়মোড়া ভেঙে, তার বড়োচাচীকে বললো, 'এবার একটু সে-জিনিসটা বানাও, আম্মা'।

এরফানের বড়োবিবি ফিসফিস করে বললো, 'আমি পারবো ননে'।

'আচ্ছা তুমি যোগাড় করে নাও, আমি যাচ্ছি'।

'কী করবা'? আলেফ প্রশ্ন করলো।

'চা'।

আলেফ চাকরির সময়ে মাঝে মাঝে চা খেতো বটে। রাত জেগে কাজ করতে হতো, তখন মাঝে মাঝে দোকান থেকে আনিয়ে নিতো। এখনো সদরে মামলা করতে গেলে পথের ধারের ছোটো একটা দোকানে বসে সে খায় কখনো কখনো। তাই বলে নিজের বাড়িতে? এ যেন সাহেবের বাড়ি হতে চললো। একটু ইতস্তত করে সে বললো, 'আমাকেও একটু দিয়ো'।

এরফানের বড়োবিবি চা করতে উঠে গেলে ছেলে বললো, 'একটা অন্যায় করে ফেলেছি, বা'জান'।

'কী অধম্ম করলা'?

'অধর্ম নয়, এটা কিনেছি, দাম দেওয়া হয়নি। এবার ফিরে গিয়ে দিতে হবে'।

'কতকের'?

'এটা পুরনো। যাঁর কাছে শিখছি এটা তাঁরই জিনিস। সামান্য দাম ধরে দিলেই হবে'।

'তাও কত'?

'সত্তর-আশি টাকা দিলেই হবে'।

হঠাৎ আলেফ বুক চিতিয়ে দেওয়ার মতো সুরে বললো, 'তোর যত লাগে নিয়ে যাস। ট্যাকা, ট্যাকা তো মানুষের সুখের জন্যি। তুই কষ্ট করে পড়িস, আর তোর বাপ বুঝি বসে থাকে'!

চার-পাঁচ দিন পরে 'এরফান বাড়ি আছো' বলে এরফানের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো আলেফ।

'বড়োভাই যে'!

'হয়, তামুক খাও'।

তামাক পুড়তে পুড়তে ফুর্সির নলটা যখন গরম হয়ে উঠলো, তখন আলেফ নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে বললো, 'এক কেচ্ছা জানো? এক ছাওয়ালেক তো তার বাপ টাকা খরচ করে পড়ায়। ছাওয়াল পড়া শেষ করে ডিপ্‌টি হল। ঢাকার নবাব-বাড়ির এক মিয়েক বিয়ে করে শহরে থাকে। এদিকে ছাওয়ালের মায়ের কান্নায় বাড়ি টেকা যায় না। না থাকতি পারে বাপ গেলো শহরে ছাওয়ালের খবর করবের এক ধামি চিঁড়ে আর এক হাঁড়ি খেজুরের গুড় নিয়ে'।

গল্পটি এরফানেরও জানা ছিলো, সেও যোগ দিয়ে বললো, 'ছাওয়াল কলে বউকে—বা'জান বাড়ি থিকে চাকর পাঠাইছে'।

দুজনেই হাসলো। এবফান বললো, 'ছাওয়াল কলে নাকি কিছু'?

'কবি কি ছাওয়াল? আমি তোমাকে কতে আলাম, যায়ো সন্ধ্যায় আমাব ওখানে।

'মেঠাই খাওয়াবা বুঝি'?

'তা খাও না কেন্ একদিন'।

আসলে আলেফ ছেলেব বিষয়ে পবামর্শ কবতে গিয়েছিলো কিন্তু দ্বিধায় প্রকাশ কবতে পাবলো না। সন্ধ্যায় এবফান এলে আলেফ বললো দু'একটা সাধাবণ আলাপেব পব, ছাওয়ালেব কী কববা ভাবছো'?

'কা ভাবি কও? ছাওয়ালেব দুই চাচা ভাবে। ছোটোচাচী কয় ছাওয়াল গাডেব চাকবি কবক। সে চাকবিতে এখন তো পয়সা আছেই। পবে আবও অনেক হবি। তাব দাদা নাকি তাক কইছে। বডোচাচি কয় ছাওয়াল ডাক্তাব হবেব চায়, হোক না কেন। লোকেব প্রাণ বাঁচাবি। লোকে দোয়া দিবি'।

তুমি নিজে কী কও'?

'ডাক্তাব হওযা খাবাপ না।

ছাওয়াল নিজেও ডাক্তাব হবেব চায। ইন্টাবব্যু না কী যেন দিয়ে আসছে। কেমবেলে পডবি। আমিও কই পড়ুক'।

'ভালো। বংশেব এক ছাওয়াল পড়ুক না কেন। এবফান বললো'।

তাই কও। ডাক্তাব সৈযদ সাদেক আলি নাম ভালোই শুনতে হবি'।

'কিন্তুক সবদিকে ভাবে দেখছো? নগদ টাকাব কথা ভাবছো'?

'সে আব কত'?

'কত না, ঢেব। মাসে মাসে সত্তুব আশি টাকা কবে দিতে হবি। সেখানে তো মামুব বাডি নাই। হোটেলে থাকা লাগবি'।

আলেফ চিন্তা কবলো, সেই অবসবে এবফান বললো, 'আদ্দেক পডায়ে থামলিও চলবি নে। ধবো যে চাব পাঁচ বছব একনাগাডে পত্তি মাসে ওই টাকা দিবেব হবি। আদ্দেক পডায়ে থামলি ছাওয়াল নষ্ট ট্যাকাও গুনাগাব'।

আলেফ গুম হয়ে বসে বইলো।

এবফান আবাব বললো, 'আমি ভাবছি ছাওয়ালেক যদি পডবেব পাঠাও অন্তত এক বছবেব টাকা বাঁধে নিয়ে কামে হাত দেও। সে টাকায় ঠেকা না হলে হাত দেবা না, তাবপবেও পত্তি মাসে টাকা পাঠাবা জোগাড কবে। আব এক কথা, মানুষেব পবমাই না কববখানাব চেবাগ। কবে আছি কবে নাই। টাকা তোমাব ঠিক কবে বাখা লাগে। বাপচাচা নাই, পডলাম না, এ যেন না হয'।

এবফানেব যুক্তি অখণ্ডনীয। এ তো বডোমানুষেব সখ কবে চলা নয, কৃষকেব ধীব অথচ দৃঢ পদক্ষেপে এগোনো। ধানেব সুগন্ধে যাদেব মাথা ঘুবে যায তেমন কৃষক নয অবশ্য, খেত-মজুবেব থেকে ক্রমোন্নতিতে যাবা ভূস্বামী হয তাদেব মতো পাকা চাল যেন এবফানেব।

'কথা কলে না'?

'এক বছবেব ট্যাকা ধবো হাজাবেব কাছে'।

'তা হবি'।

'সোভানাল্লা'।

'কেন্, হাজাব ট্যাকা কি তোমাব নাই'?

'কিন্তু মানুষের তো অন্য কাম আছে। তা ছাডা পত্তি মাসেও তো পেবায একশ'। পত্তি বছবেই ধবো যে হাজাব'।

'তা তো হিসাবেই পাওযা যায'।

'ইন্‌সেআল্লা'!

'আমিও তাই কই। বুড়া হলে খোদাতালাক ডাকো। আহিঙ্ক কমাও। দেখো ছাওয়ালেক পড়ান কঠিন হবি নে'।

'তুই দিনরাত আহিঙ্কের কথা কস। কী আমার আহিঙ্ক দেখলি? আমি পত্তি বছরে নতুন বিবি আনতিছি, না ঘোড়া কিনতিছি'?

'সেসব কথা কই নাই, বড়োভাই। তুমি ইসমাইলেক আগের জুম্মাবারে জোলার জমির বায়না দিবের চাইছো। ধরো যে সেখানে তোমার দেড় হাজার খরচ। তাতে তোমার দুর্ভাবনা নাই, ছাওয়ালেব পড়ার খবচে এক হাজার বাঁধবের কলাম তো মুখ হাঁড়ি করলা'।

'ইসমাইল'?

'হয়, ইসমাইল! জোলার জমি বেচার খবর দিতে আসছিলো'।

'তারপর'?

'তারপর আর কী। ভাবছিলো বোধায় দু'এক টাকা দাম চড়ালেও চড়াতে পারি'।

'তার পাছে'? আলেফ ভ্রূকুটি করলো।

এরফান হেসে বললো, 'তোমার বড়ো সন্দেহ বাতিক বড়োভাই। ইসমাইলের কথা সেজন্যিই আমাক কও নাই। ভাবছিলা ভাগ বসাবো। তা আমি তাক কলাম চরণকাশির বড়োসেখ যা কইছে তার থিকে বিঘা প্রতি দশ টাকা কম দাম ধাইরয্য থাকলো ছোটোসেখের। শুনে ইসমাইল হাসতে লাগলো'।

আলেফ কথাটা সোজাভাবে না-নিয়ে বাঁকাভাবে নিলো। সে খানিকটা মেজাজের সঙ্গে বলে বসলো, 'কেন রে, খুব যে ঠাট্টা করিস। তুই বুকে হাত রেখে কবের পারিস জোলার জমিতে তোর লোভ নাই'?

'লোভ ছাড়া আদমজাদের পয়দা হয় নাই। ইসমাইলের জমির পাট্টা কবুলতি দেখছো'?

'নাঃ, না দেখেই আমি জমি কিনতাম'!

'তা তো গিছলাই কিনবের। যদি দেখে থাকো.তো আরও খারাপ। ইসমাইল তার ভাবির হক্ বেদখল করে খাতেছে। সব জমি ইসমাইলের না। তার ভাবীর মামলাব ট্যাকা নাই'।

'জমিদারে তার ভাবির অংশ খাস করে নিয়ে তাকেই পত্তন করছে'।

'কথাটা ভাবে দেখো বড়োভাই। ইসমাইল যে ট্যাকায় পত্তন-নজর দিলো সে ট্যাকাও তো তার ভাবির'।

'কোর্টে প্রমাণ হবি'?

অন্য সময়ে এরফান চুপ করে যায় কিন্তু আজ সেও যেন মরিয়ার মতো হয়ে ধরেছে বিষয়টাকে। সে বললো, 'কও বড়োভাই, কোর্ট বড়ো না হক্-বেহক্ বড়ো'?

এবার আলেফ ক্রুদ্ধ হলো। সে বেশ চড়া গলায় বললো, 'তুই চিরকালই বাগড়া দিবি। বাগড়া দেওয়াই তোর স্বভাব। এর আগেও জমি কিনবের যতবার গিছি বাধা দিছিস। এবার তোর কথা শুনবো মনেও ভাবিস না। তোর কথা শুনলে রহমৎ খন্দকারের জোলা অ্যাদ্দিন আমার হলেও হতো'। আলেফ দু হাতের বুড়ো আঙুল-তুলে এরফানের মুখের সম্মুখে নেড়ে দিলো। এরফান বললো, 'ছাওয়াল বাড়িতে, চেঁচায়ো না। আমি তোমাক কহ, বড়োভাই, ছাওয়ালেক পড়াবা, জমি কিনবা, এসব একসঙ্গে সামলাতে পারবা না'।

এরফান অপ্রসন্ন মুখে বিদায় নিলো। আলেফও ঝাঁজের সঙ্গে উঠে তার বাইরের ঘর আর মসজিদের মধ্যের ব্যবধানটুকুতে দ্রুতপদে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো। রাত্রিতে ভালো ঘুম হলো না আলেফের। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বাইরের ঘরের বারান্দায় বসে তামাক খেলো সে। প্রথম তামাকের পর দাওয়া থেকে নেমে একপাক ঘুরে এসে আবার সে তামাক সেজে নিয়ে বসলো। দ্বিতীয়বার তামাক খেয়ে অনেক বেলা হয়েছে স্থির করে সে যখন এরফানের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো তখন সে বাড়িতে মাত্র দু'একজনের

সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এরফানের বড়োবিবি বোধহয় রাখালকে হুকুম করছিলো গাই-বলদ সম্বন্ধে।

আলেফ ডাকলো, 'এরফান'!

রাখাল সাড়া দিতে এলে আলেফ বললো, 'ডাকাডাকির কাম নি, তামাক সাজে দিয়ে যা'। অতঃপর আলেফ এরফানের দাওয়ায় বসে তামাক খেতে লাগলো।

অনেকটা সময় পরে এরফান এলো। 'এত সকালে যে'?

'ইসমাইলের জমি নেওয়ার কাম নি, কী কস'?

এরফান উত্তর না-দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসলো।

'কলি নে কিছু'?

'কাল ভাবে দেখলাম জমির লোভ আমারও কম না। আমি চাপে রাখি। তুমি রাখো না। বুঝবের পারি নে ; মন কয় নগদ টাকার উপর আমার মায়া বেশি, সেজন্যেই চাপে রাখি'। বোকা বোকা মুখ করে এরফান বললো।

আলেফ বললো, 'তবে যে? তা শোনেক, আমিও কাল ভাবে ঠিক করলাম, ইসমাইলের জমি নেওয়ার কাম নাই। আর নেওয়াই যদি হয় তবে জমির দামই দেবো। দুই সনের ফসলের দাম আগাম দিয়ে এই সনেই জমি খালাস করার কাম নাই। দুই সন জমি আমার নামে যদি থাকে তবে ইসমাইলের ভাবি যা করার করবি। তারপর আর কী'?

এরফান বললো, 'তা করো। ছাওয়ালেক তাইলে কিছু দিবের পারবা'।

'হয়, যা তুই কস, বাঁধে থোবো। কনে থুবি তাই থুস'।

'আমি এক কথা কই'।

'কী কবা আর'?

'ইসমাইলের জমি আর যে নেয় নিউক, তোমার নেওয়া লাগে না। জোলার জমি চাও আমি জোগাড় করে দিবের পারি'। মুখ নিচু করে এরফান বললো।

'আবার ফজরেই ঠাট্টা লাগালি'?

'ঠাট্টা না। কাল বড়োবিবির সঙ্গে কথা কলাম। সেই-ই কলে'।

'কী কলে'?

'কয় যে, ইসমাইলের জমি না কিনে সেই দেড় হাজার ভাসুর ছাওয়ালের নামে বাঁধে থুক, তার বদলা—'

'কী তার বদলা'?

'তার বদলা আমাদের এজমালি জোলায় আমার অংশ তোমাক দিবো'।

'অল্-হম্-দলিল্লা'!

'না। বড়োভাই, ভাবে দেখলাম বড়োবিবির এ বুদ্ধি ভালো। তোমারও জোলায় জমি হলো, ছাওয়ালের ট্যাকাও বাঁধা হলো। কিন্তুক এক শর্ত থাকবি কয়ে দিলাম'।

'ঠাট্টা করিস কেন্'?

'ঠাট্টা না। তুমি শর্ত মানলি আমি লিখে-পড়ে দেবো। শর্ত এই : যদি বাঁচে থাকো ছাওয়ালের পড়া বন্ধ করবের পারবা না'।

অভিভূত আলেফ নির্বাক হয়ে এরফানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কোনো কোনো খবর প্রথমে এমন অভিভূত করে দেয় যে তার সবটুকু মাধুর্য সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা যায় না। তারপর মাটির তলা থেকে পাওয়া যখের ঘড়ার মতো যত মাজা যায় তত চাঁদিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম দুদিন আলেফকে বিশ্বাস করার জন্য চেষ্টা করতে হলো। হেলাফেলার জিনিস নয়, পৈতৃক, জোলার জমি। এরফানের মনেও যে জমির লোভ আছে, এ কথা সে নিজেই বলেছে অকপটে। কীসের

জোরে এমন দানটা করা যায় আলেফ ভেবে পেলো না। ছেলেকে টাকা দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হতো জোলাব জমিটুকুর স্বামিত্ব ত্যাগ না করে নগদ টাকাই সে দিতে পারতো। এ যেন বাধা দিয়ে দিয়ে আলেফের জমি কেনার সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দেওয়া। এ যেন দেখিয়ে দেওয়া, 'বড়োভাই, জমিতে লোভ ছাড়তে বলেছি তোমাক, লোভ ছাড়তে এই দ্যাখো আমি পারি'।

জমি কেনার ব্যাপার নিয়ে এ পর্যন্ত আলেফের যত কথা হয়েছে সে সবই একসঙ্গে মনে পড়লো। যোগ-বিয়োগ করে ফলে আলেফের লাভই দাঁড়িয়েছে। বিনা টাকায় জোলার সবচাইতে ভালো জায়গায় জমি হয়েছে তার। রহমৎ খন্দকারের অভিসম্পাত লাগেনি, হাজিসাহেবের কাছে মুখ ছোটো হয়নি, আর চিকন্দির ছেলেরা গান বাঁধেনি তার নামে। ভাবো দেখি যদি ওরা গান বাঁধতো আর সে গান শুনতো ছেলে!

একদিন সন্ধ্যায় জমি থেকে ফিরতে ফিরতে আলেফ এসব কথাই ভাবছিলো। আগামীকাল ছেলে কলকাতায় যাবে। তার ডাক্তারি পড়াই স্থির হয়েছে। দূর থেকে মসজিদটাই চোখে পড়লো আলেফের। সে ভাবলো স্বগতোক্তির মতো করে : কেন্ রে, জমি দিছিস, দিছিস ; তাই বলে কি তোক ঠকাবো? জমিতে খাটবো-খোটবো, খরচা করবো। ফসল উঠলি নেয্য ভাগ তোক দিবো। তফাৎ এই, জমিটার সবটুক্ আমার নামে হবি। তোর হক্ দাবায় কে। ফসলের আদ্দেক যদি তোক না দিছি কইছি কী। তুই ছোটোভাই হয়ে জমি দিবের পারিস আর আমি ফসল দিবের পারি না।

একটা তীব্র চিৎকারের আকস্মিক শব্দে চমকে উঠে আলেফ থেমে দাঁড়ালো। পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি-হাসি মুখে বললো সে নিজেকে শুনিয়ে : 'কেন্, আজান দেয় নাকি? খোদার কাছে ডাকতেছে ফকির। দ্যাখো দেখি কাণ্ড'!

১৭

নৃপনারায়ণের চিঠি এসেছে—এ সংবাদটা অনসূয়া পেলেন রূপুর মুখে। এ চিঠি রোজ আসে না। নৃপনারায়ণ বলেছিলো—যে চিঠি অন্য লোকে পড়ে, যার যাওয়া-আসা অন্য কারো মর্জির উপরে নির্ভর করে তার আদান-প্রদান বন্ধ থাক। মা চোখের জল চেপে বলেছিলেন—কোনো পক্ষ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে এর ব্যতিক্রম করতে হবে।

চিঠির খবরে অনসূয়া বিচলিত হলেন সুতরাং। নৃপ কি রাজরোষমুক্ত হয়ে চিঠি দিতে পেরেছে কিংবা সে কি অসুস্থ? একটি আনন্দের আশা এবং একটি আশঙ্কার দুশ্চিন্তায় তিনি বললেন, 'তুই তো খুব দুষ্টু হয়েছিস রূপু ; কই, চিঠি দে'।

'তোমাকে কী করে দেবো? বউদির চিঠি যে'।

'ও'। অনসূয়া খবরে কাগজের পাতা ওল্টালেন।

রূপু তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

অনসূয়া বললেন, 'আর কিছু বলবি'?

'দাদা ভালো আছে, মা। নাগপুরের কাছে কোথায় অন্তরীণ হয়ে আছে। বউদি বললেন তোমাকে খবর দিতে'।

মনে হলো অনসূয়া কিছু বলার জন্যই মুখ তুললেন, কিন্তু কিছু না-বলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'রূপু, রামনন্দনকে একটু ডেকে দিয়ো। মণিমালার বাড়িতে যেতে হবে'।

ঘণ্টাখানেক পরে রূপু সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো—রামনন্দন খাজাঞ্চিখানা থেকে কামদার ঝালর এনে পাল্কির ছাদের উপরে বিছিয়ে দিতে দিতে অন্দর থেকে অনসূয়াও বেরিয়ে এসে পাল্কিতে চড়লেন। রামনন্দন আর তার ছেলে পাল্কির দু পাশে চলতে লাগলো।

মণিমালার বাড়িতে যাবার কথা ছিলো বটে ; কথাটা ছিলো রূপুও সঙ্গে যাবে। অনসূয়া রূপুকে বলতেই যেন ভুলে গেলেন।

সদানন্দ মাস্টার সাতদিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছে। রূপুকে সে সাত দিন ছুটি দিয়ে গেছে। বিকেলের দিকে রূপু পায়ে পায়ে সুমিতির ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো, সুমিতি তখন ব্যালকনিতে বসে একটা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

'এসো, ছোটোবাবু। মা বুঝি নিয়ে গেলেন না'?

'তা নয় ঠিক। ছুটি আছে, বেড়াতে গেলে ভালোই হতো'।

'চলো না হয় দুজনে বেরিয়ে পড়ি'।

'যাবে তাই? যতক্ষণ না পাল্কি ফিরতে দেখি চলতে থাকবো। মার সঙ্গে সঙ্গে ফেরা যাবে'।

'মন্দ কী, এখানে এসে এসে এ পর্যন্ত বেরুইনি'।

'আমি আসছি'। বলে রূপু চলে গেলো।

প্রস্তাবটা করার সময়ে সুমিতি হাল্কাভাবেই বলেছিলো, কিন্তু রূপু যখন অত তাড়াতাড়ি কথাটাকে কার্যকরী করতে ছুটলো তখন তাকেও কাপড় পাল্‌টে প্রস্তুত হতে হলো।

ঘর থেকে বেরুতে সুমিতি বললো, 'তোমার ভয় ভয় করবে না তো'?

'আমার? কেন'?

'আমার একদিন করেছিলো, যেদিন প্রথম গ্রামে আসি'। বললো সুমিতি।

'রোসো, আসছি'। বলে কথার মাঝখানে রূপু দৌড়ে চলে গেলো।

রূপু একটি রিভলবার নিয়ে ফিরে এলে সুমিতি বললো, 'ও কী, ও তুমি চালাতে জানো নাকি'?

'এটা টিপলেই চললো'।

সুমিতি কপট গাম্ভীর্যে বললো, 'তাহলে তো বড়ো ভালো জিনিস। কিন্তু এ তোমাদের বাড়িতে আছে, এ যে বিশ্বাসই হয় না। আর থাকলেই-বা তুমি পেলে কোথায়'?

'ফিরে এসে বাবাকে বলবো, তাঁর দেরাজ থেকে নিয়েছি। তখন দেখো তিনি খুশি হবেন। তুমি সঙ্গে আছো বলেই ভাবনা'।

'তা বটে'। সুমিতি গম্ভীর হয়ে রূপুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিলো, পরক্ষণেই বললো, 'কিন্তু কথাটা ভাবো। যার দাদা রাজদ্রোহী বলে অন্তরীণ, তার হাতে রাজা রাখছে বিপ্লবের অস্ত্র। এ-রাজ্যে এও সম্ভব'।

রূপু পরিহাসের সুরটুকু ধরতে পারলেও সহসা উত্তর দিতে পারলো না। তার মনে পড়লো এরকম কথা একবার সে মামার বাড়িতে গিয়েও শুনেছিলো। সেখানে কথা হয়েছিলো—ভাগ্নে বিপ্লব করে বেড়ায় আর মামা করেন রাজারক্ষা। সান্যালমশাইয়ের পরিহাস থেকেই কথাটা উঠেছিলো। সুমিতির পরিহাসটা প্রায় সেরকম বলে ঘটনাটা মনে পড়লো রূপুর। সে বললো, 'আমার যেন মনে পড়ছে আমাদের বন্দুকগুলোর লাইসেন্স নিয়ে মাঝে মাঝে কী গোলমাল হয়, আর নায়েবমশাই সদরে ছোটেন। তারপরে সব ঠিক হয়ে যায়'।

'নায়েবমশাই সেখানে গিয়ে কী বলেন তা কি জানো'?

'অবশ্যই আত্মরক্ষার কথা বলেন'।

'এমন যদি হয় নায়েবমশাই তোমার দাদার চাল-চলনের সংবাদ দিয়ে তার বিনিময়ে লাইসেন্স ঠিক রাখেন'?

'তা কখনো হতে পারে'?

'পারে। নায়েবমশাই জমিদারির কাজে যা সব করেন তার সবগুলো ন্যায়সংগত নয় এ তো তুমিই বলেছো'। সুমিতির লুকোনো হাসি রূপুর চোখে ধরা পড়লো না।

'তাহলেও—আচ্ছা, আজই আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করবো'।

'কী সর্বনাশ! লক্ষ্মীভাই! নায়েবমশাই প্রকৃতপক্ষে অতি ভালোমানুষ এতে আর সন্দেহ কী? তার চাইতে এ আমরা কোথায় এলাম তাই বলো। ডান দিকে তো তোমাদের বাগানই চলছে। বাঁদিকে জঙ্গলটা কীসের? আমার মনে হচ্ছে তোমাদের সদর দরজা থেকে চারশ গজের মধ্যে এ জায়গাটায় পৌঁছেও আমার গা শিউরে উঠেছিলো। অবশ্য তখনো সদর দরজা চোখে পড়েনি'।

'এটাকে নিয়ে এক মুশকিল হয়েছে। কেটে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ওর ভিতরে একটা শিবমন্দির আছে। মাঝে মাঝে চারিদিকের জঙ্গল কেটে দেওয়া হয়, কিন্তু সবচাইতে উঁচু গাছগুলো মন্দিরের গা বেয়ে বেয়ে উঠেছে। সেগুলো কাটতে গেলে মন্দিরটাই ধসে যাবে'।

'ওখানে অনেক সাপ আছে নিশ্চয়ই'।

'তা হবে কেন? গাজনের সময়ে এবার দেখো। তার আগে থেকে দু-তিনদিন ওর ভিতরে গাজনের সন্ন্যাসীরা থাকে। সাপ থাকলে কি আর থাকতে পারতো! কিন্তু বউদি, কথাটা ভাবা দরকার, বাড়িতে বিপ্লবী থাকলেও বন্দুকের লাইসেন্স সবক্ষেত্রে থাকে কিনা'।

'আবার সেই কথা! আজ আমি গ্রাম চিনতে বেরিয়েছি'।

কিছুটা পথ নীরবে চলে সুমিতি বললো, 'তোমাদের বাগানটাকে দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ে। এক রাজার বাগানের ভিতরের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পথ যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানে ছিলো এক দৈত্যের বাড়ি'।

রূপু হা-হা করে হেসে উঠলো।

'বাঃ? হাসছো কেন? তোমার সমস্যাটাই আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম অন্য কথা বলতে বলতে। তোমার দাদার বিপ্লব তো আর আগ্নেয়াস্ত্রের দুমদাম নয়। সেটা বলে কয়ে করা, ধীরে ধীরে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া গান্ধিয়ানা। হাতে পেলেও বোমা ছুঁড়বে না তোমার দাদা, এ খবর রাজা রাখেন'।

রূপুর মনে যে প্রশ্নটা উঠেছে এটাকে তার একটা সমাধান বলে মনে হয় বটে, তথাপি খানিকটা কৌতুকবোধ, কিছুটা কৌতূহলের মতো হয়ে প্রশ্নটা ভেসে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু রূপু স্থির করলো অনভিপ্রেত আলাপটা সুমিতির সম্মুখে চালিয়ে যাওয়াটা ভালো হবে না। সে বললো, 'বাগানের মধ্যে দৈত্যদের প্রাসাদ আছে এটা আমারই আবিষ্কার বলতে পারো। কয়েক বছর আগে বাগানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি'।

সুমিতি বললো, 'একদিন এক চাঙারি খাবার, আর এক ফ্লাস্ক জল নিয়ে আমি আর তুমি তিন-চার ঘণ্টার জন্যে বাগানে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো'।

সুমিতি ও রূপুর পথ এই জায়গাটায় গ্রামের অন্যতম প্রধান পথটিতে এসে মিশেছে। দু-একটি করে লোক চোখে পড়তে লাগলো। তাদের অধিকাংশই সন্ত্রস্তের ভঙ্গিতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো, কিন্তু পথের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়েও রইলো সুমিতির দিকে। রূপু ফিসফিস করে বললো, 'সান্যালবাড়ির কোনো বউকে এমন কাছে ওরা কখনো দ্যাখেনি। আমি সঙ্গে না থাকলে সঙের পেছনে ছেলের দলের মতো দল বেঁধে ওরা তোমার পিছন পিছন চলতো'।

সুমিতি হেসে বললো, 'তাহলে আমি কী করতাম? ওদের সকলকে নিয়ে হাঁটতে পদ্মার জলে ডুব দিতাম'?

হাসি থামাতে হলো ওদের। পথটা এখানে মোড় নিয়েছে। মোড় ঘুরতেই ওরা দেখতে পেলো কয়েকজন কৃষক যাচ্ছে।

সুমিতি জনান্তিকের সুরে বললো, 'কী সর্বনাশ, দল বেঁধে যায় যে! হাতে লাঠি, কাঁধে নতুন গামছা সব'।

'তাতে কী হলো? ডাকাত'?

'ওরা কী বলে শোনো'।

রূপুরা শুনতে পেলো :

'বুঝলা না মামু, ধামি একটা আমারও কেনা লাগবি'।

'এখন কি আর তেমন পাবা? বাঁশেরবাদার হাটে সেইবার আসছিলো—কয় যে শিলোটি ব্যাতের'।

'ধামি যৈ সৈ, চাচা, আমার মনে কয় হাঁসেও বানাতে হবি'।

'ভক্ত নাই। দিঘায় যাতে হবি'।

নিজেদের কথায় মশগুল হয়ে এরা চলে গেলো।

রূপু বললো, 'শুনলে, ডাকাতরা কী বললো'?

'খুব সুখী বলে মনে হলো'।

'ধানের ছড়াগুলো দেখে অনেকেই এবার বলছে ধান খুব ভালো হবে'।

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক এ পথ সে-পথ ধরে চলে শেষ যে-পথটা ধরে এরা চলছিলো সেটা এখানে এসে শেষ হয়েছে। সম্মুখে যাবার উপায় নেই তা নয়, কিন্তু বেলেমাটির পায়ে-চলা পথে হাঁটতে গেলে জুতোর সবটাই ধুলোয় বসে যাচ্ছে। অবারিত মাঠ, অধিকাংশ জমিতে ধানের চাষ। দূরে দূরে চার-পাঁচটি করে কুঁড়ের এক-একটি গুচ্ছ। এখানে মাটি ক্রমাগত নিচু হয়ে গেছে দিগন্তের দিকে। পদ্মার নীলরেখায় সীমাবদ্ধ সেই দিক্‌সীমান্ত; আকাশে রং লাগছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় আকাশ গড়িয়ে রঙের কয়েকটি স্রোতোধারা পদ্মার দিকে নেমে আসছে।

এরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলো একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক আসছে। সুমিতি বললো, 'আমাদের ছায়া নাকি'?

রূপু দূর থেকে ঠাহর করে বললো, 'দারোগার কাছে রামচন্দ্রর জন্যে যে কেঁদেছিলো সেই পদ্ম বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গেরটি ছিদাম, ওকেও চিনি, ও গান করে'।

পদ্ম ও তার সঙ্গী এদের দেখতে পেয়ে থামলো। পদ্ম প্রণাম করার জন্য নিচু হচ্ছিলো, সুমিতি বললো, 'এখানে নয়। কোথায় গিয়েছিলে'?

পদ্ম বললো, 'এক হাল জমি আছে'।

'জমিতে তুমি কী করো'?

পদ্মর সঙ্গী বললো, 'সখ করে গিছলো'।

পদ্ম কিন্তু ঝিরঝির করে হেসে বললো, 'না, দিদিঠাকরুন, ছিদাম পরের ক্ষেতে খেটে বেড়ায়, নিজের জমিতে নিড়ানির কাজে মন থাকে না, তাই নিয়ে গিছলাম'।

ছিদাম বললো, 'ও জমিতে তোমার সংসার চলে'?

'ওটুক নিজের তো'।

কীর্তনের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে একটা সাড়া এনে দেওয়ার জন্য সাধারণ কৃষকের চাইতে ছিদামকে বেশি পরিচিত বলে মনে হলো রূপুর। সে বললো, 'তুমি কি আরও বেশি জমি চাষ করতে পারো? তা যদি হয় একসময়ে কাছারিতে যেয়ো'।

'আজ্ঞে যাবো'।

এদের আলাপে ছেদ পড়লো। হুম্ হুম্ শব্দ করতে করতে অনসূয়ার পাল্কিটা প্রায় এদের গায়ের উপরে এসে পড়লো। কথা বলতে বলতে এরা এতক্ষণ পাল্কির চাপা শব্দটা খেয়াল করেনি। পাল্কিকে পথ করে দেওয়ার জন্য সুমিতি ও রূপুকে পথ থেকে নেমে দাঁড়াতে হলো। আট বেহারার পাল্কিটি অত্যন্ত দ্রুতগামী সন্দেহ কী!

বেহারাদের পায়ে যে ধুলো উড়ছিলো সেটা একটু থিতোলে সুমিতি বললো, 'চলো, আমরাও ফিরি'। সুমিতি ও রূপু, তাদের পিছনে পদ্ম ও ছিদাম চলতে শুরু করলো। রূপু একসময়ে বললো, 'রোজ না-

হলেও মাঝে মাঝেই বেড়াতে বেরুলে কেমন হয় বউদি'?

'আশাতীত ভালো-একটা কিছু হয়'।

কিন্তু তখন তারা জানতো না তাদের এই বাইরে আসা কতদূর গড়াতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই রামনন্দন ও রামপীরিত পথের পাশে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। সুমিতি ও রূপু তাদের পার হয়ে গেলেই পদ্ম ও ছিদামকে আড়াল করে তারা নিঃশব্দে পিছন পিছন চলতে লাগলো।

তখনো পথে অন্ধকার হয়নি, দু-একটি ঝিঁঝিঁ ডাকতে শুরু করেছে মাত্র, তবু আর একটু দূরে একটি দাসী হিংকসের বড়ো একটা লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলো রূপু। দাসী নিঃশব্দে সঙ্গ নিলো। এতখানি সতর্কতার কাবণ খুঁজে না-পেয়ে সুমিতি কুণ্ঠিত হলো।

রাত্রিতে আহারাদির পর্ব মিটে গেলে সুমিতি নিজের ঘরে বসে সকালের ডাকে আসা চিঠিটা আবার পড়ছে এমন সময়ে একজন দাসী এসে খবর দিলো অনসূয়া তাকে ডাকছেন।

সুমিতি অনসূয়ার ঘরে গেলে তিনি তাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা কিছুদিন থেকেই বলবো ভাবছি'।

অনসূয়া সঙ্গে সঙ্গে কথাটা না বলে হিসেবের একটা খাতায় চোখ বুলোতে লাগলেন। আঙুলের ডগায় হিসেব করে যোগটা ঠিক আছে দেখে খাতাটা সরিয়ে রেখে চশমা খুলে মুখ তুললেন।

'সুমিতি, তুমি এ বাড়ির বড়োবউ। কতকগুলো ব্যাপারে তোমাকে তেমনি হয়েই চলতে হবে। এ কথাগুলো তোমাকে বলছি, এব মধ্যে আমার রক্ষণশীলতার লক্ষণ অবশ্যই দেখতে পাবে। আমার কিন্তু ধারণা, তোমার নিজের মঙ্গলের জন্যই কিছুটা রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, তুমি কি খোকাকে কখনো রান্না করে খাইয়েছো'?

'দু-একবার'।

'তুমি কি লক্ষ্য করেছো, তার রুচিটা কোনো কোনো বিষয়ে তোমার সঙ্গে মেলে না? আমি আহারের রুচির কথাই বলছি'।

আলাপটার গতি কোন দিকে তা বুঝতে না পারলেও বুদ্ধিমতী সুমিতি আলাপটা যাতে গুরুভার হয়ে চেপে না বসে সেজন্যই উত্তর দিল, 'আপনার ছেলে দুধের চাইতে মাছ বেশি পছন্দ করেন'।

'ধরতে পেরেছো। কিন্তু আরও সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে, যেমন আমি বলতে পার তপ্সে মাছ সে মোটেই খায় না। রুইয়ের কালিয়ায় টম্যাটো পছন্দ করে। তার দই-মাছ মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন'।

'আমি এত লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি। আপনার ছেলে এবার বাড়িতে এলে আপনি দেখিয়ে দেবেন, আমি নিজে রেঁধে দেবো'।

অনসূয়া যেন হাসলেন, বললেন, 'ছেলে দূরে আছে বলেই তার আহারের কথা এত মনে পড়ছে আমার, তা নয়। এই রুচিই তার চিরদিন থাকবে এমনও নয়। মায়ের রান্নার পদ্ধতি ছেলেরা ভালোবাসে। আহারের বেলায় যেমন অন্যান্য কিছু কিছু ব্যাপারও তেমনি, ছেলেরা নিজের বংশের প্রথাগুলোকে ধরে রাখে'।

অনসূয়ার কথার সুরে উপদেশ ছিলো, বক্তব্যগুলি ভাষার দিক দিয়েও গুরুভার। সুমিতি অস্বস্তি বোধ করলো।

অনসূয়া চশমা চোখে দিলেন, হিসেবের খাতাটা আবার টেনে নিলেন ; তারপর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমাকে বেশি বলার দরকার হবে না। জীবনের গোড়ার দিকে তার রুচির পরিপন্থী হওয়া তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে দুর্বল করে দেবে'।

সুমিতি বললো, 'আমার সংসার শুধু আপনার ছেলেকে নিয়ে নয়'।

কথাটার অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য অনসূয়া সুমিতির মুখের দিকে চাইলেন, বললেন, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছো কোনো অসংকীর্ণমনা পুরুষ নিজের পরিজন-বন্ধুবর্গের বাইরে গিয়ে শুধু স্ত্রীকে নিয়ে সবটুকু সুখী হতে পারে না, বিচ্ছিন্ন হলে তার জীবনরস কিছুটা শুকিয়ে যায়'?

সুমিতি বুঝতে পারলো, এই মার্জিত কথাগুলি শুধুমাত্র মতামত বিনিময় নয়, হয়তো সে নিজের অজ্ঞাতে দ্বিতীয়বার এঁদের কোনো পারিবারিক প্রথাকে আঘাত করেছে। সুমিতির বোধ হলো এর চাইতে অনসূয়া যদি সোজাসুজি তিরস্কার করতেন ব্যাপারটা এমন গুরুভার হতো না।

অনসূয়া বললেন, 'তোমার বিশ্রামের সময় হলো সুমিতি'।

সুমিতি প্রায় নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এলো।

অনসূয়াও উঠে দাঁড়ালেন। পাশের দরজায় দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখলেন সান্যালমশাই তখনো শুতে আসেননি। ওপাশের দরজায় হাত দিতে দরজা খুলে গেলো। রূপুর ঘরে রূপুও নেই। তখন অনসূয়া বারান্দা দিয়ে সান্যালমশাইয়ের বসবার ঘরে গেলেন।

দেওয়ালগিরির আলোয় সান্যালমশাই বসে আছেন। বসবার ভঙ্গিটা স্তব্ধ, কিন্তু ক্লান্ত নয়। সমস্ত ঘরখানা যেন একটি নীরব জলাশয়ের মতো শীতল স্নিগ্ধতা। প্রায় এক মিনিট কাল অনসূয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অবশেষে সান্যালমশাই যেন তাঁকে লক্ষ্য করলেন। অনসূয়ার ঘরে আসা আর সান্যালমশাইয়ের কথা বলার সময়-ব্যবধানটা থেকেই এরকম মনে হলো।

অনসূয়া পাশে বসলে সান্যালমশাই বললেন, 'আজ খুব ব্যস্ত ছিলে'?

'মণির বাড়িতে গিয়েছিলাম, মেয়েটার শরীর ভালো নয় , ওর শাশুড়িকে বলে এলাম, দু-তিন মাসের জন্য মেয়েকে আসবার অনুমতি দিতে'।

'নিজেকে যেতে হলো কেন'?

'তাতে কী, একটু ঘুরে আসা হলো'।

'তা হলো। মেয়ের বাড়িতে একটু ঘুরতে তোমার মতো একজন যায় না। মনে হচ্ছে যেন মনসার শাশুড়ি তাকে আসতে দেবে না আন্দাজ করেছিলে। সমাজে তুমি নেমে গেছো'?

'এ খবরে তোমার কী দরকার'?

'কিছুমাত্র না'। সান্যালমশাই হাসলেন।

'মেয়ের মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা মেনে নিতে হয়। পুতুল খেলার সময় থেকেই ছেলের মায়েদের কাছে হার মানতে হচ্ছে'।

সান্যালমশাই বললেন, 'ছেলের খবর পেয়েছো'?

'বেটা-বউকে চিঠি লিখেছে ছেলে, সে আলোচনা করা কি তোমার উচিত হবে'?

সান্যালমশাই কথা ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন, 'রূপু বলছিলো, আজ সে আর তার বউদি গ্রামের পথে বেড়াতে গিয়েছিলো'।

'আমি তা জানি'।

'সুমিতি ওদের কলকাতা শহরে নিশ্চয়ই বাইরে বেরুতো। এখানে যদি অন্দরে আবদ্ধ হয়ে থাকে সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে না'।

'কুমারী-জীবন আর বধূ-জীবন তো এক নয়'। অনসূয়া বললেন।

'তা নিশ্চয়ই নয়, রূপু বলছিলো বটে বউদিদিকে নিয়ে পথে বেরুতে তার ভয় ভয় করছিলো, সেজন্যে আমার দেরাজ থেকে রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলো'।

খবরটা নতুন। অনসূয়া একটু থেমে বললেন, 'রিভলবার নেওয়াটা তার পক্ষে উচিত হয়নি'।

'তা হয়নি, তা হলেও ছেলে যখন নিজের থেকে কোনো কাজ করে তখন চিন্তা করে দেখতে হয় তার মনের গড়নটা কীরকম হয়েছে। দেখছি রূপুর মর্যাদাবোধটা জন্মেছে'।

অনসূয়া চুপ করে রইলেন।

লঘুভাব সুরে সান্যালমশাই বললেন, 'রূপু একটা কথা বলেছে, তাই ভাবছিলাম। সে বলছিলো, ছেলে রাজার শত্রু আর বাবা রাজার বন্ধু, এ কী করে হয়, কী করে চলতে পারে এমন ব্যবস্থা।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না'।

'রাষ্ট্রদ্রোহ-নিবারণ আইনে ছেলে অন্তরীণ আর তার বাবাকে দেওয়া হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র।'

'দুই পুরুষে মতের পার্থক্য থাকতে পারে তো'।

'ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সমাজের এটা একটা কৌতুককর অবস্থা। তোমার বাড়িতে না হলেও অন্যত্র গৃহবিবাদ আছে বৈকি। কিন্তু আমি ভাবছিলাম রূপুর কথা, সে বলে, হয় তারা তার দাদাকে কিছুমাত্র মূল্য দেয় না, কিংবা তার বাবাকে অপদার্থ মনে করে'।

'ছেলে বলেছে'?

'না ঠিক এ কথাগুলো বলেনি, কিন্তু তার বক্তব্যকে বিশদ করলে এই দাঁড়ায় বটে। তার দাদাকে যদি তারা সত্যিকারের মূল্য দিতো তবে তাকে আর্থিক ও অন্যান্য পার্থিব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আমাকেই তারা আঘাত করতো, কিংবা এমন হতে পারে তারা ভেবেছে ছেলেকে আমি নিজেই শাসন করবো যদি সে প্রকৃতই বর্তমান ব্যবস্থায় পরিবর্তন চায়'।

সান্যালমশাই উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের উপরে রাখা বইখানি ও তাঁর চশমা হাতে নিয়ে অনসূয়া তাঁর পাশে পাশে ঘর থেকে বার হলেন। বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন তাঁরা রূপুর ঘরের দরজা খোলা, সে মশারি না ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসিমুখে সান্যালমশাই দরজার কাছে দাঁড়ালেন। অনসূয়া ঘরে ঢুকে মশারি ফেলে দিলেন। ঘরের দেয়ালগিরির আলোটা মৃদু করে দিয়ে, পড়ার টেবিলের বড়ো ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিলেন। রূপুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরের ভিতর দিয়ে সান্যালমশাইয়ের ঘরে গিয়ে অনসূয়া বই ও চশমা বিছানার পাশের ছোটো টেবিলটায় রেখে আলোর ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

পড়বে এখন'?

'কিছুক্ষণ পড়ি'।

'আলো নিবিয়ে মশারি ফেলে দিয়ো'।

অনসূয়া নিজের ঘরে এসে ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দেয়ালের গায়ে কিছুদিন আগে ঝুলানো বড়োছেলের ছবিটির দিকে চোখ পড়লো তাঁর। মোষের শিঙের সরু ফ্রেমে আঁটা এই ছবিটি ছেলের এক বন্ধুর সাহায্যে অনেক যত্নে আনানো হয়েছে। ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো সেই পুরনো কথাটা—তাঁর বড়োছেলের মুখাবয়বে যে প্রখরতা আছে সেটা সান্যালমশাই কিংবা রূপুতে নেই। নাক, ভ্রূ এবং চিবুকেই এই পার্থক্যটা বেশি স্পষ্ট। অবাক বোধ হয়, পাঁচ-ছটি বছরে ছেলের কী পরিবর্তন হয়ে গেলো। পরিবর্তনেরই বয়েস, পঁচিশ হলো। কিন্তু সে যদি দুরন্ত মানুষ না হয়ে জমিদারের ছেলে হয়ে থাকতো, হয়তো পরিবর্তনটাকে এমন আমূল বোধ হতো না।

দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি লালপাথরের মূর্তি আছে। বাড়িতে যে অষ্টধাতুর দ্বিভুজ জটাজূটশ্মশ্রু সমন্বিত সন্ন্যাসী শিবমূর্তির পূজা হয় তারই প্রতিরূপ এটা। একটি ঘিয়ের প্রদীপ রোজ সন্ধ্যায় এখানে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যখন মন্দিরে আরতি হতে থাকে।

বাড়ির কর্ত্রী হিসাবে গৃহবিগ্রহের পূজার আয়োজন অবশ্যই তাঁকে করে দিতে হয় কিন্তু নিজে তিনি মন্দিরে খুব কমই যান। তাঁর প্রথম বয়সে লোকে জানতো সংসারের সকলের খাওয়া-পরার ব্যাপার নিয়েই তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। এখনও সংসারের অন্য লোকেরা জানে সংসার-ব্যস্ত অনসূয়া মন্দিরে আসবার সময় পান না। শুধু সান্যালমশাই নন, কিছু কিছু রূপুও এখন জানে—ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। অনসূয়া বলেন কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা এবং পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ব্যক্তিগত ভগবানকে খুঁজে

পাওয়া যায় না। অনসূয়ার ভগবান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত আছে। ভগবান আছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু দল বেঁধে তাঁকে ডাকা যায় না। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, সেটাকে খুঁজে নিতে হয়। তাঁকে সোজা বাংলাতে ডাকা উচিত, সর্বজ্ঞ একজনের পক্ষে কোনো ভাষাই অবোধ্য নয়। সান্যালমশাই জানেন এসব কারণেই মন্দিরে যখন পরিবারের অন্য অনেকে উপস্থিত, অনসূয়াকে তখন সেখানে দেখা যায় না। ঘিয়ের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেওয়ার সময়ে শোবার ঘরের ছোটো মূর্তিটির সম্মুখে কখনো কখনো তিনি কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন। রূপু একদিন দেখে ফেলে প্রশ্ন করেছিলো, 'কী বললে, মা'? প্রথমে কিছু না বলে মৃদু মৃদু হাসলেন অনসূয়া, পরে বললেন, 'বললাম "হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ"। গানের সুরটা আজ সকাল থেকে বার বার মনে আসছে'।

সান্যালমশাই আর একটু জানেন—অনসূয়ার পিতৃগোষ্ঠীতে এককালে আচার্য কেশব সেনের প্রভাব এসে পড়েছিলো।

বিছানায় শুয়ে অনসূয়ার চোখ পড়লো কুলুঙ্গিতে। তিনি হাতজোড় করে বললেন, 'তুমি মনের মধ্যে দেখতে পাও। আমাকে অশান্তি থেকে রক্ষা করো। তুমি তো সমস্ত অশান্তি গ্রহণ করেও আত্মস্থ'।

অন্য অনেকদিন এরকম প্রার্থনা করার পরমুহূর্তে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু আজ চোখ বুজতে গিয়ে চোখ পড়লো বড়োছেলের ফটোটার উপরেই। ঘরে দেয়ালগিরির অত্যন্ত মৃদু একটা আলো, সে আলোকে ছবিটিকে সংকীর্ণ ও ক্লান্ত দেখাতে লাগলো। তাঁর বুকটা ধক ধক করে উঠল। মনে মনে বললেন—আমি এতটুকু রাগ করিনি খোকার উপরে। সে যদি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকে তাই বলে আমি কি তার উপরে রাগ করে থাকতে পারি। সে আমাকে চিঠি দেয়নি, সুমিতিকে লিখেছে, এতে অন্য অনেক মায়ের অভিমান হতো। অভিমান হওয়া সংগত। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিজেই তো ছেলেকে নিষেধ করেছেন।

তবুও কথাগুলি ভগবানকে নিবেদন করার মতো সত্য নয় বলে অনুভব হলো তাঁর। তিনি একটা ক্ষোভকে আড়াল করার জন্য মনসার বাড়িতে অত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলেন এরকম একটা কথা কেউ যেন বললো।

এরপর চিন্তা করলেন অনসূয়া এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় হয়েই বলতে পারেন যে, ছেলের কাছে তাঁর মূল্য কমেছে এ কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করবেন না। ক্ষোভ যদি হয়ে থাকে তবে তো ছেলে হার মেনেছে বলে, সেন্সর-করা চিঠি পাঠাতে রাজী হয়েছে সেই জন্য। সুমিতির জন্যই ছেলের এই পরাজয়।

কিন্তু পাছে শাসনে কিছুমাত্র বিরাগ থাকে এই ভয়ে সন্ধ্যায় বারংবার মনে হলেও সুমিতিকে তিরস্কার করেননি। সান্যালবংশের কোনো বধূ পায়ে হেঁটে চলেছে অথচ সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ দাসদাসী নেই, এ কল্পনা করা অসম্ভব। এর আগে এক দারোগাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তাকে সামনে বসিয়ে চা খাইয়েছিলো সুমিতি।—সুমিতি, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমার বুঝতে পারা উচিত কেন আজ খোকার রুচির কথা উত্থাপন করেছিলাম।

আজ কি ঘুম হবে না? চতুর্থ পর্যায়ে চিন্তার সূত্রপাত হলো। ছেলের রুচি নিয়ে অতগুলি কথা বলা ভালো হয়নি। এই পাঁচ সাত বছর জেলখানায় ঘুরে, অন্তরীণ থেকে রুচি বলে কি কিছু-আর অবশিষ্ট আছে তার?

সান্যালকে এ বিষয়ে বলে তাঁর পরামর্শ নিতেও পারেননি অনসূয়া। সুমিতিকে উপদেশ দিয়ে সান্যালের কাছে যখন গিয়েছিলেন তিনি তখন পরামর্শ করার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু সান্যালের সম্মুখে গিয়ে তাঁর মনে হলো সেই স্তব্ধ শান্তিকে বিঘ্নিত করার মতো কঠিন নয় সমস্যাটা। তাছাড়া—এ কথাও তাঁর মনে হয়েছিলো অস্পষ্টভাবে, কথাটা উত্থাপন করার ত্রুটিতে সান্যালমশাই যেন মনে না করেন, সুমিতিকে তিনি ঈর্ষা করছেন।

অনসূয়া উঠে জল খেলেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হলো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি

স্থির করলেন সেটা উচিত হবে না, কারো চোখে পড়ে গেলে বিষয়টা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। ভিজে আঙুল চুলগুলির মধ্যে চালাতে চালাতে নিজেকে তিনি বললেন—চুলগুলো আজ খুলেই দেওয়া হয়নি।

মনসা এসেছে। সকালে চায়ের টেবিলেই খবরটা এসেছিলো। একটা তরল হাসির শব্দ সুমিতিকে আকৃষ্ট করেছিলো। রূপু উঠে গিয়ে দেখে এসে বলেছিলো, 'মণিদিদি এলো'।

সুমিতি তখন থেকেই তাব প্রতীক্ষা করছিলো, হাতের সেলাইটায় মন বসছিলো না। কিন্তু মনসা যখন এলো তখন প্রায় দুপুব। কাঁধের উপবে গামছা জড়িয়ে ঘরে ঢুকে সুমিতি কিছু বলার আগেই তাকে প্রণাম করে প্রায় একই নিশ্বাসে বললো, 'চলো ভাই, স্নান করে আসি'।

অবাক হওয়ার কথা।

সুমিতি তার হাত ধরে বললো, 'আচ্ছা লোক তো, সেই সকালে এসেছো আর এতক্ষণে সময় পেলে'?

মনসা বললো, 'আমি বলতে পারি, তোমারই এতক্ষণ যাওয়া উচিত ছিলো ননদিনীব খোঁজে। আজকাল ননদিনীকে কেউ ভয় পাচ্ছে না'।

সুমিতি হেসে ফেললো, বললো, 'বোসো'।

মনসা বললো, 'তুমি কিছু নও, বউদি। গাল পেতেই রইলাম শুধু'।

মনসার আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে সুমিতি বললো, 'স্নানের এমন কি তাগাদা আছে'?

'তুমি অন্দরের পুকুরে স্নান কববে এমন অনুমতি রোজ পাওয়া যায় না। জেঠিমা আজ একবার বলতেই রাজী হলেন'।

দু'পাঁচ মিনিট কথা বলেই মনসা বললো, 'তেল কোথায় ভাই, সিল্ক পরে জলে নামতে অসুবিধা হবে'।

সুমিতি কাপড় পালটে নিতে নিতে মনসা সুমিতির তেল চিরুনি গামছা নিয়ে এলো। কার্পেটে বসে সুমিতির চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে এলো-খোঁপায় বেঁধে তার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, 'দেরি কোরো না আর, এখনি জেঠিমার কোনো দূত এসে পড়বে'।

চক মেলানো অন্দরমহলের চত্বরের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে লোহার কীলক বসানো দরজা দিয়ে মনসার পিছনে সুমিতি কর্মমহলে উপস্থিত হলো। চলতি ভাষায় বাড়ির এ অংশটার নাম রান্নাবাড়ি, যেমন অন্দরমহলের নাম ভেতর-বাড়ি এবং বহির্মহলের নাম কাছারি। ইতিপূর্বে সুমিতি মাত্র একদিনের জন্যই আসতে পেরেছে এ অঞ্চলে কিন্তু এত লক্ষ্য করতে পারেনি। আমিষ-নিবামিষ রান্নাঘর, ভাঁড়ার ও গৃহবিগ্রহের মন্দিরে বিভক্ত এ অংশটা একটা নতুন বাড়ি বলে মনে হলো। উঠোনে পাঁচ-সাতটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে খেলা করছে, দু-একটি বায়না ধরে কাঁদছে। নিরামিষ ঘরের বারান্দায় কয়েকটি বিধবা বসে তরকারি কুটছে। আমিষ ঘরের বারান্দায় ইতিমধ্যে কেউ কেউ খেতে বসেছে। কথাবার্তায় লোকচলাচলে মহলটি গমগম করছে। এতটা প্রাণচাঞ্চল্য অন্দরমহলে বসে অনুভূত হয় না। সেখানে চত্বরে দু-একটি ছেলে খেলা করে কখনো কোনো বিকেলে, একতলায় নামলে কখনো কখনো দু-একজনের কথাবার্তা কানে আসে বটে কিন্তু দোতলায় তার খুবই কম পৌঁছায়। বিশেষ করে দুপুরের কয়েক ঘণ্টা, এবং সন্ধ্যা থেকে প্রভাত অর্থাৎ যতক্ষণ সান্যালমশাই অন্দরে থাকেন সমগ্র মহলটা স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে থাকে।

আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে চলে সুমিতি মনসার পিছনে খিড়কিব ছোটো দরজা পেরিয়ে পুকুরের পাড়ে উপস্থিত হলো। প্রকাণ্ড কিছু নয়, তবু সুমিতির শহুরে অভিজ্ঞতায় বড়ো বলেই মনে হলো। পুকুরের তিনদিকে বাগানের বড়ো বড়ো গাছ প্রাচীরের চূড়ার মতো দাঁড়িয়ে। সেই গাছগুলির পায়ের কাছে মানুষের বুক-সমান-উঁচু আগাছার জঙ্গল প্রাচীরের মতো পুকুরের তিনদিক ঘিরে রেখেছে। ওদিকের

ঘাটগুলি কোথায় ছিলো জঙ্গলে ঠাহর করা যায় না। শুধু বাঁ দিকের জঙ্গলের প্রাচীরে একটা ছেদ আছে। সেখানে জলের কিনারায় খেজুরগাছের গুঁড়ির একটা ঘাট। এদিকে খিড়কির ঘাটে এখনো চুন-সুরকির সেকেলে আস্তর দেওয়া সিঁড়ি অনেকগুলি অটুট আছে। কিন্তু ব্যবহার কমই হয়, শুকনো পাতায় ঘাটের চাতালটুকু ঢেকে রয়েছে। কালো জল। পুকুরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোটো দাম তৈরি হচ্ছে। এক-দেড় হাত উঁচু ঘাসও তাতে চোখে পড়ে। গোটাকয়েক ডাহুক বসে আছে সেই দামে।

জলের কাছাকাছি গিয়ে গা ছমছম করে উঠলো সুমিতির। শিউরে উঠে সে বললো, 'এ জলে ম্যালেরিয়া হয় না, মণি'?

ততক্ষণে শাড়ি হাঁটুর কাছে তুলে গায়ের আঁচল কোমরে জড়িয়ে মনসা জলের কিনাবায় নেমে গেছে। সে বললো, 'সে তো শুনেছি মশার কামড়ে হয়। সাঁতাব জানো তো, ভাই'?

সুমিতি জলের ধারে নেমে এলো, বললো, 'কেউ যদি এসে পড়ে'?

'তুমি কি ভেবেছো জেঠিমা এতক্ষণে দরজায় কোনো তাতারনীকে বসাননি'? বলতে বলতে কালো জলকে শাদা করে দুমদুম কবে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে লাগলো মনসা।

আবক্ষ জলে নেমে সুমিতি বললো, 'এমন জল থাকতে স্নানের ব্যবস্থা ইঁদারায় কিংবা ঘরে কেন'?

'আমরা বোধ হয় ক্রমশ গোলালো পলিজ-শিলায় রূপান্তর নিচ্ছি'।

'সেটা কী রকম ব্যাপার'?

'এ বাড়িব লোকেদের চরিত্রে আগে অনেক কোণ ছিলো, খুব কাছে এলে খোঁচা লাগতো। এখন স্ট্রিম্‌লাইন্‌ড হচ্ছি'।

'ভাই ননদিনী, এ কথাগুলো যেন অন্য কোথাও শুনেছি'।

মনসা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, বললো, 'আমি আশ্চর্য হবো না যদি শুনে থাকো। দাদা এরকম ধরনের কথা বলেন'।

চাতালে উঠে সুমিতি বললো, 'জঙ্গলটা সাফ করিয়ে নাও না কেন'?

'দাদা ফিরে এলে হবে। তাঁর ছিপের সুতো ছিঁড়লে চলবে না, জলে রোদ না লাগলে মাছের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে না। অবশ্য আজকের এই নির্জনতা তোমার জন্যে, অন্যান্য দিন দাস দাসীরা এমন সময়ে স্নান করে'।

'তাহলে তাদেব কষ্টের কারণ হলাম'।

'কষ্ট আর কী, একদিন না হয় আধঘণ্টা দেরিই হবে'।

'তোমাদের জন্যেই কি ওদের এমন কষ্ট রোজই করতে হয়'?

'দাদা এখন ছোটো নয়। তিনি এলে দাসদাসীরা অবশ্যই দূরে থাকে। আমার কথা স্বতন্ত্র। মতির মা সঙ্গে না এলে স্নান করে সুখ নেই, তার মতো সাঁতার কেউ জানে না, মেজে-ঘষে দিতেও তার জুড়ি নেই'।

কাপড় পালটে মনসা আবার সুমিতির ঘরে এসে ডাকলো, 'খেতে এসো বউদি'। স্নানের ব্যাপারে যেমন আহারের ব্যাপারেও তাই। সুমিতির আহার্য বামুনঠাকরুনের হাতে অন্দরমহলের দোতলাতেই আসতো, যেমন আসে সান্যালমশাই এবং রূপুর।

সুমিতিকে সঙ্গে নিয়ে আমিষ ঘরের বারান্দায় উঠে মনসা বললো, 'ভাত দাও, বামুনদিদি'।

'দিই দিদি ; তারণের মা, ঠাঁই করে দে বাছা'। বলে দরজার কাছে এসে বামুনঠাকরুন সুমিতিকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো, কী করবে ভেবে পেলো না।

দুমদুম করে দুখানা পিঁড়ি পেতে মনসা বললো, 'বোসো ভাই, বউদি, এতদিন ওরা তোমাকে না হক্ কষ্ট দিচ্ছে। কত রকমের চচ্চড়ি ছ্যাঁচড়া বামুনদিদি নিজে রান্না করে একা একা খায় তা তুমি কল্পনা করতেও পারবে না'।

ভাত নিয়ে এসে বামুনঠাকরুন বিব্রত হয়ে বললো, 'সে কি রাবণের মা, অবাক হয়ে কী দেখছো, জল গড়িয়ে দিতে পারোনি'?

'থাক, থাক, ও অবাক হয়ে দেখুক। বউদি, যাও তো ভাই, একটু জল গড়িয়ে আনো'।

আহার পর্ব মিটলে মনসা বললো, 'তুমি এবার বিশ্রাম করো গে, রোদ পড়লে আমি আবার আসবো। তখন সুখদুঃখের কথা হবে'।

'আমার ঘরের ভেতরে তো রোদ নেই'।

'তা নেই। দেখলাম আজ এখনো জেঠিমার স্নান হয়নি'। তারপরে স্বর নিচু করে মনসা বললো, 'এবাড়ির বউ হওয়ার এই এক কষ্ট, দিবাভাগে সাক্ষাৎ হয় না'।

সুমিতির ভাবতে অবাক বোধ হলো অন্দরমহলের পিছনে এবাড়ির আর একটি মহল আছে।

মনসার কথায় যদি অতিশয়োক্তি না থাকে তবে এবাড়ির বড়োছেলের সম্বন্ধেও সে কিছুটা নতুন সংবাদ পেয়েছে। সান্যালমশাই, রূপু ও সদানন্দ, এ তিনজনের চালচলন দেখে নৃপনারায়ণ বাড়িতে এলে কীভাবে থাকে তার কতগুলি কাল্পনিক চিত্র সে এঁকেছিলো মনে মনে। কিন্তু মনসার কথায় এখন মনে হচ্ছে ছবিগুলো একদেশদর্শী হয়েছে। মনসা তার দাদার নামে অত্যুৎসাহী। এ যেন অনায়াসে কল্পনা করা যায় মনসা ও নৃপনারায়ণ দুজনে তিন মহলে, বাগানে, পুকুরে দুরন্তপনা করছে এবং তাদের অস্তিত্ব দিয়ে ভরে রাখছে। মূলত নৃপনারায়ণ হয়তো বা সান্যালমশাই থেকে খুব পৃথক নয়, কিন্তু তার ক্ষেত্রে আভিজাত্যের মর্মর যেন কোথায় চিড় খেয়েছে, আর সেই ফাটলে প্রাণশক্তি উচ্ছ্রিত হচ্ছে। মনসা যেন তার প্রতিভূ।

বিকেলে মনসা এসে বললো, 'চলো, বেড়াতে যাই'।

বাগানের বড়ো বড়ো ফলের গাছগুলির নিচে ছায়াপথের মতো রাস্তা সে পথে চলতে চলতে মনসা প্রকাশ করলো সে তিন মাস থাকতে এসেছে, এবং এই তিন মাস সে যজ্ঞের উৎসৃষ্ট তণ্ডুল হাঁসদের সঙ্গে খুঁটে খুঁটে খাবে। সুমিতি তার কথার অর্থ চট্ করে ধরতে পারেনি। পরে যখন মনসা বললো, উপমাটা ভালো হয়নি, একসঙ্গে লব কুশকে মানুষ করার মতো শক্তি তার নেই, তখন সুমিতি বুঝতে পারলো মনসা অন্তর্বত্নী।

সুমিতি তাকে প্রশ্ন করেছিলো, 'ননদিনী, তুমি বুঝি ইহজীবনে দাদাকে অনুকরণ করাই ধর্ম বলে গ্রহণ করেছো?

'অনুকরণ কি আর এখন সম্ভব হয়। যখন মেয়েমানুষ হইনি তখন অবশ্য দাদার ঘুড়ি লাটাই ছিপ বড়শি আমার ব্যবহারেও লাগতো'।

হঠাৎ গলার স্বর গভীর হলো মনসার, সে বললো, 'তোমাকে গোপনে বলি, বউদি, লোকে বলে যার কথা ভাবা যায় তার মতো চরিত্র হয় সন্তানের। এসব ধারণার মূলে যদি কিছু সত্যি থাকে তবে আমার ছেলেও যেন তার মামার মতো হয়'।

'নির্লজ্জ'!

'কেন বলো তো'?

প্রথম সন্তান হবে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবে, তা নয়—' কথাটা ঘুরালো সুমিতি।

'তাও বটে'। বলতে বলতে সত্যি মনসা লাল উঠলো লজ্জায়।

চার-পাঁচ দিন পরে। নিজের ঘরে সুমিতি বসেছিলো। রূপুকে সঙ্গে করে মনসা কোথায় বেড়াতে গিয়েছে। সময়টা এখন অলস মধ্যাহ্ন। কোন কথায় এ কথাগুলো উত্থাপিত হলো সুমিতি ধরতে পারছে না। তার মনে হলো একবার মনসা রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলো—তার দাদাকে সুমিতি কেন বিয়ে করেছে। কোনো একটি লোককে কেন ভালোবাসলাম এ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কোনো কোনো ভালোবাসা ত্বকগভীর মোহ বলে প্রমাণিত হয় অন্য দু'এক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসা

ক্রমাগত নতুন হতে থাকে।

সুমিতি অনুভব করলো নৃপনারায়ণের চাকচিক্য অন্য অনেকের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর তবু সে কেন দুর্নিবার বলে তাকে আকর্ষণ করলো তা বলা কঠিন। এ বিষয়ে তথ্যের কাছে পৌঁছুতে গেলে প্রশ্ন করার মতো লোক দরকার।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় মনসা গল্প করতে এসে কিছুকাল এটা ওটা নিয়ে আলাপ করার পর বললো, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার, ভাই, আমার এক অবাক করা অভিজ্ঞতা হয়েছিলো যা বলতে ইচ্ছে করে এবং যা তোমাকেই বলা যায়'।

'কী এমন অভিজ্ঞতা'?

'তার আগে তুমি বলো, আমি যা বলবো সেটাকেই চূড়ান্ত সত্যি বলে মেনে নেবে, মনে কোনো প্রশ্ন রাখবে না'?

'চেষ্টা করবো। তোমার উপরে বিশ্বাস আমার সহজে নষ্ট হবে না।

যত সহজে কথাটা বলতে পারবে ভেবেছিলো মনসা বলতে গিয়ে দেখলো বলাটা তত সহজ নয়। কথা হারানো নয় শুধু, লজ্জায় সে রাঙা হয়ে উঠলো। তবু সে ধীরে ধীরে বললো, 'আমি আর আমার দাদা আবাল্য খেলার সঙ্গী ছিলাম।

তা ছিলে'।

'খেলাধুলো, লেখাপড়া, ঘোড়ায় চড়া—'

'আজকালকার দিনে শহরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর জায়গা পাওয়া কঠিন বটে'।

তোমরা হলে হয়তো মোটর নিয়ে চলতে, মোটর ভেঙেচুরে তেলকালি মেখে দুজনে সেটাকে নিয়ে ঠুকঠাক করতে'। মনসা বললো।

'এরকম অভিজ্ঞতা কারো কারো হয়'।

'আসল কথা এই, দাদাকে আমি ভালোবাসতাম।

'সব বোনই তার দাদাকে ভালোবাসে'।

'তা নয়। আমার দাদা তখনো ভালোবাসার প্রকৃতি বিচার করার পক্ষে অনভিজ্ঞ। আমিও কি তখন সেটার স্বরূপ বুঝতে পেরেছি? আমার দাদার কোনো পরিবর্তন হয়েছিলো কিনা জানি না, হয়েছিলো বলে আমার বিশ্বাস নয়, কিন্তু আমার শ্রদ্ধায় একসময়ে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিলো'।

'তার মানে? তুমি কী বলতে চাও'?

'তোমার গলায় যে আশঙ্কা ফুটে উঠেছে ঠিক তা ই। প্রায় একটা বছর এই উত্তাপে আমি জ্বলেছি, বিয়ের পরে বুঝলাম এই উত্তাপকেই প্রেম বলে'।

'পোড়ামুখী'।

'তা বলো। এ কথা স্বামীকে বলা যায়নি, দাদাকে তো যাবেই না। তুমি তো এমন বিপদে পড়োনি, বউদি, তবু আশা করছি তুমি খানিকটা বুঝবে, কারণ তুমি ভালোবেসেছো। কেউ কি জানে সেই উত্তাপকেই আলোতে পরিণত করতে আমায় কত কষ্ট করতে হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণও পড়তে হয়েছিলো। পুড়তে ভালো লাগে তবু পুড়বো না, উত্তাপ ভালো লাগে তবু দূরে থাকবো। আর দাদার কাছে গোপন রাখতে হবে'।

সুমিতি মনসার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

কিছুপরেই অবশ্য সুমিতি দুষ্টুমির হাসিতে চোখ ভরে বললো, 'তুমি কি আমাকে ঘরছাড়া করতে চাও'?

'সে উত্তাপ নেই আর। কিন্তু খুব জবাব দিয়েছো'।

একটু বিরতির পরে মনসা বললো, 'এবার তোমার কথা বলো। আমি ভেবেছি দাদার সঙ্গে তোমার

আলাপ রাজনীতির ক্ষেত্রে। তা যদি হয়, ও ব্যাপারে তোমাদের মতৈক্য ছিলো বলে ধরে নিতে পারি। আর তা যদি হয়, আমাদের সামন্ততান্ত্রিক জীবন তোমার ভালো লাগার কথা নয়'।

সুমিতি বললো, 'আসলে হয়তো আমি আর তুমি এক। রাজনীতি আমার ছলনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এনার্জি ছিলো, সেটা ব্যয় করা দরকার হলো। যদি ধীর স্থির হতাম, হয়তো সেলাই করতাম, ছবি আঁকতাম, দুষ্পাঠ্য কবিতা লিখতাম। তা পারিনি বলে কতগুলি সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে হৈহৈ করে বেড়াতাম'।

সেদিনকার আলাপের শেষ দিকটায় দুজনের বাক্‌চাতুর্যের ঝলমল আবহাওয়ার আড়ালে দুটি সখি-হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো।

পরিহাসের ছলে সে যা বলেছে সেটার কতটুকু তার নিজের সম্বন্ধে খাটে, মনসা চলে গেলে সুমিতি তাই ভাবলো। নিজে সে অন্যের তুলনায় অস্থির প্রকৃতির কিনা এটাই প্রথম প্রশ্ন; দ্বিতীয়ত, যাকে এতদিন একটা আদর্শবাদ বলে সে মনে করেছে সেই রাজনীতি তার নিছক অবসর বিনোদনের ব্যাপার ছিলো কিংবা অন্য কিছু, এর বিচার করতে গিয়ে জীবনে সে এই প্রথম অনুভব করলো, নিজের কৃতকর্মগুলিকে বিচার করতে বসলে কীরকম অপূর্ব অনুভব হতে পারে।

দুপুরের পর রান্নাবাড়ির দিকে যাওয়ার আগে কোনো কোনো দিন এ জায়গাটায় অনসূয়া বসেন। বারান্দাটার এ অংশটা ঢাকা এবং এখানে দেয়াল থাম প্রভৃতি চিত্রিত। পাথরের তৈরি বড়ো একটা পাল্কি বলে ভ্রম হয়। এখানে অনসূয়াকে দেখলে পরিবারস্থ অনেকেই অগ্রসর হয় আবেদন ইত্যাদি জানানোর জন্য।

শ্যামার মা বললো, 'বড়দিদি, কাল শ্যামার জন্মদিন'।

'তুমি কাল সকালে একবার মনে করিয়ে দিয়ো, তরু'।

'এবারে ছ বছর হলো। ওর লেখাপড়ার কী করি'?

অনসূয়া যেন একটু চিন্তা করলেন। মনসার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মণি, তোর লেখাপড়ার কী ব্যবস্থা হয়েছিলো রে'?

মনসা বললো, 'তখন নবদ্বীপের ঠাকরুন ছিলেন, প্রথমে তাঁর কাছে পড়েছিলাম, তার পরে দাদার পিছনে ঘুরে বেড়াতাম'।

'তাহলে? আচ্ছা, তরু, তুমি এক কাজ করো না হয়, সুমিতির কাছে প্রস্তাব কোরো, তার সাহায্য চেয়ো। তার হাতে মেয়ে তোমার ভালোই মানুষ হবে'।

একটি দাসী এসে বললো, 'বড়ো-মা, বাড়িতে জামাই এসেছে'।

'তাহলে তুই কাজে এলি কেন? তা বেশ করেছিস। বামুনঠাকরুনকে বলিস জামাইয়ের জন্য যেন পরিষ্কার করে থালা গুছিয়ে দেয়। সকাল সকাল চলে যাস কিন্তু'।

দাসী চলে গেলে তরু বললো, 'বড়দিদি, শ্যামার জন্যে আমি নিশ্চিন্ত হলাম'।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এটা-ওটা বলে সেও চলে গেলো।

মনসা অনসূয়ার পিছনে গিয়ে তাঁর খোঁপা খুলে দিয়ে দু হাতে তাঁর চুল নিয়ে বসলো।

'ও কী করিস'?

'পাকা চুল তুলে দিই'।

'পাকা'?

'তা হবে না? দিদিমা হতে যাচ্ছ যে'।

পাকা চুল থাকার কথা নয়, অনসূয়ার এখন বিয়াল্লিশ চলছে। কিন্তু পাকা চুল তুলবার নাম করে

মনসা প্রথমে চিরুনি, পরে চুলের কাঁটা নিয়ে এলো।

'তোর শরীর ভালো যাচ্ছে তো মণি? একটা কথা তোকে বলি, বাপু। এ সময়ে একসঙ্গে অনেকটা খাওয়া যায় না, খেতেও নেই, অথচ পুষ্টির ব্যাঘাত করলেও চলবে না'।

'তাই বলে সব জিনিসই খাওয়া যায়'?

'কী খাওয়া যায়, তাই বল'।

'তা বলবো একসময়ে। এখন একটা কাজের কথা আছে শোনো—কাল কাকিমাব তিথিপালন'।

'কালই নাকি দিনটা'?

'হ্যাঁ, কালই পড়েছে তিথির হিসেবে'।

অনসূয়ার সুরটা একটু উদাস হয়ে গেলো, তিনি বললেন, 'তোমার এ অবস্থায় কিন্তু উপোস করতে নেই'।

'কী যে তুমি বলো। তুমি চিরকাল পারলে আব আমরা পাববো না'?

'তোমবা আবার কে কে হচ্ছো'?

'বউদিবও করা উচিত, সে তো এ বাড়ির বউ'।

বুদ্ধিমতী মনসা কথাটা তখন-তখনই ঘুরিয়ে নিলো, আব অনসূয়ার সামনে একটা আয়না এগিয়ে দিলো।

'দুষ্টু মেয়ে, এ কী করেছিস'?

'তুমি ভাঙতে পারবে না, জেঠিমা, আমি কিন্তু তাহলে বাগ করে যাচ্ছেতাই করবো'।

কিন্তু আয়নাব দিকে অনসূয়া একাধিকবার চাইতে পারলেন না। তাঁর চুলগুলি যত্নের অভাবে ইদানীং রুক্ষ ও অগোছালো দেখায়। অনসূযার এ বাড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র ছিলো দেহবর্ণ এবং মুখের গঠন। এ বাড়িতে আসবাব পর তাঁর চুলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো, যৌবনে তিনি যত সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। সেকালে যাকে আলবার্ট বলতো তেমনি কায়দায় ঢেউ-তোলা চুলের ছোটো ঝাঁপটা কপালে নামিয়ে মাথার পিছন দিক জুড়ে মস্ত একটা খোঁপা করে দিয়েছে মনসা। অনসূয়ার রূপ যেন ইতিহাস থেকে বর্তমানে চলে এলো।

মনসা আবার বললো, 'তাতে কী হয়েছে, সব সময়েই তো তোমাব মাথায় ঘোমটা রয়েছে'।

রান্নাবাড়িতে পা দিয়ে অনসূয়ার একটা অব্যক্ত অনুভব হলো। সুকৃতির কথা, সুকৃতি এবং সুমিতির তুলনা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এলে অতীত স্ত্রীলোকটির পরিবেশে নতুনটিকে যেমন কৌতূহলের বিষযীভূত বলে মনে হয়, এ যেন কতকটা তেমনি। যে ভগ্নস্তূপ কালাযত বিস্মৃতির গভীরতায় তলিয়ে যাচ্ছিলো তাব উপরে নতুন কিছুর কাঠামো খাড়া করে নির্মম আলোয পার্থক্যটা যেন দেখিয়ে দেওয়া। সুকৃতিব পর সুমিতি এই বাড়িতে আসবে, এ যেন একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে ও অঙ্কে প্রবেশ করে চবিত্রের আর একটি দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা।

তাঁর আকস্মিকভাবে মনে হলো, নৃপ কি জানতো সেই কলঙ্কের কথা? তা সম্ভব নয়। দুর্ঘটনা বলেই সে জানে ; আর সে জানাই কি সুমিতির প্রতি তার মনকে করুণ এবং পরে সংবেদনশীল করেছিলো?

মনসা যা বলে গেলো সেটা একটা আড়ম্বরহীন সাধারণ ব্যাপার। মনসা প্রায় তার বাল্য থেকেই অনসূয়ার অনেক উপবাসের সঙ্গী, তার কথা স্বতন্ত্র। অনেকসময় বাড়ির অন্য লোকেরা জানতেও পারে না। অনসূয়ার নিয়মিত একাধিক বার্ষিক উপবাসগুলির একটি হিসাবে দিনটি অলক্ষ্যে গড়িয়ে চলে যায়।

রান্নামহলের ব্যবস্থাপনা শেষ করে অনসূয়া দেখলেন মনসা ঠিক পথেই চলেছে। ব্যাপারটা সুমিতির কাছে প্রকাশ করার মধ্যে কুণ্ঠাবোধ আছে কিন্তু অপ্রকাশ রাখাও যেন একটা গোপনবৃত্তি। অবশেষে তিনি স্থির করলেন—হয়তো মনসাই বলবে, এবং হয়তো সুমিতিও উপবাস করবে। নতুবা বাড়ির লোকগুলির চোখে সুমিতি যেন কিছুটা হীন হয়ে যাবে।

মনসার এবারকার চালচলন অনসূযাব কাছে অর্থযুক্ত বলে বোধ হলো। সে যেন সুমিতিকে এ বাড়িব সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়। তা ভালোই হবে যদি মনসা সফল হয এ ব্যাপারে। ছেলের প্রেমপাত্রী ও তার শ্রদ্ধাস্পদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে ওঠা নিশ্চয়ই ভালো নয়।

সুকৃতিব জন্য মন করুণ হযেছিলো, সেই মনে অনসূয়া চিন্তা করলেন : সুমিতি বুদ্ধিমতী মেযে, সে কি বুঝতে পারবে না যে ব্যক্তি-অভিমান শুনতে যত জোবদার আসলে ততটা নয়। আমি যা, আমাকে সেই ভাবে গ্রহণ করো, এটা আধুনিক কিন্তু অর্থহীন কথা।

সুমিতির শরীরটা একটু খারাপ, সকালে উঠতে দেবি হয়েছিলো, স্নানে অনিচ্ছা বোধ করে হাত মুখ ধুয়ে এসে সে নিজের ঘরে বসে একখানি পত্রিকায চোখ বেখেছিলো। এতক্ষণে চায়েব ট্রে নিয়ে দাসীব এবং প্রায় তার সঙ্গে রূপুর এসে যাওয়ার কথা। এমন সময়ে মনসা এলো।

'বউদি, তোমাব চা পাঠাতে আমি নিষেধ করেছি। আজ উপোস কবতে হবে, পারবে তো'?

'তোমার কথাগুলো এমন যে বসিকতা কিংবা অন্য কিছু বোঝা কঠিন'।

'তা নয়, তুমি আমার সঙ্গে এসো'।

মনসার সঙ্গে সুমিতি অন্দবমহলেব একতলায় একখানি ঘবে গিয়ে দাড়ালো। বহুদিন বন্ধ থাকাব জন্য ঘরখানিতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সুমিতি দেখতে পেলো দুজন দাসী কাপড়েব টুকবো দিয়ে ঘবেব আসবাবপত্রগুলি মুছচে। স্পিরিটের গন্ধও এলো নাকে। কোনো একটি স্মৃতিঘবে নাম করা লোকেব ব্যবহৃত শয্যা-উপাদান, বসনভূষণ যেমন সাজানো থাকে তেমনি করেই এ ঘরখানা সাজানো। বিছানাব পাশে ছোটো একটা টিপয়ে একটা বইও আছে। খাটের পায়েব দিকে মখমলেব একজোড়া মেয়েলি চটি।

মনসা বললো, 'এটা আমাদের কাকিমাব ঘর'।

কাকিমা? কাকিমা বলতে কি সুকৃতিকেই নির্দিষ্ট করছে না মনসা? তা যদি হয তবে এ সবই কি সুকৃতিব ব্যবহৃত জীবন-উপকরণ? মৃত্যুর আগেব দিন কি সুকৃতি ওই বইখানি পড়েছিলো?

সুকৃতির যখন মৃত্যু হয় তখন সুমিতিব শৈশবকাল। দীর্ঘদিনেব ব্যবধানে ঘটনাটা মনে পড়লেও তা শোক বহন করে না।

সুকৃতিব একটা পূর্ণাবযব প্রতিকৃতি ছিলো সেই ঘবে। সবুজ বঙেব বেনারসি শাড়ি পরে সুকৃতি লীলাভরে নিজেব আঙুলগুলো যেন দেখছে। হাল্কা গড়ন ছিলো সুকৃতিব, ছবিতে যেন একটি ফুলেব গুচ্ছকে সাজিয়ে রাখাব কায়দায আঁকা হয়েছে। ঠিক এত বড়ো কোনো ফটো বা তেলবঙেব ছবি সুমিতিদের বাড়িতে নেই, কিন্তু তাই বলে চিনতে অসুবিধা হবে এমন নয়। ববং চিনে এই লাভ হলো যে উদ্বেল অশ্রুগ্রন্থিগুলো প্রবাহের পথ পেয়ে স্নিগ্ধ হলো কিছুটা।

মনসা বললো, 'বউদি, মালা আনিয়ে রেখেছি, পবিয়ে দাও। আজ কাকিমাব মৃত্যুতিথি। সেইজন্যেই আজ তোমাকে উপোস করতে বলেছি'।

সুমিতি উত্তর দিলো না, অনেকক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সুকৃতির ছবির দিকে চেয়ে রইলো, তাবপব মালাটা পরিয়ে দিলো।

যে কথাটা প্রথম সে বললো সেটা এই—'দিদি এত সুন্দরী ছিলেন, আমার ধারণা ছিলো না, মনসা। এমন বউই তোমাদের বাড়িতে মানায়'।

বাইরে এসে সুমিতি বললো, 'তোমরা আর কী করো, মনসা'?

'আর কিছু নয়। সমস্ত দিন এ ঘবটা খোলা থাকে। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় আর এক বৎসরের জন্যে'।

'ছবিটা আমাব শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না'?

'কী এমন আপত্তি তাতে? জেঠিমাকে বলবো'।

দিনটার মাঝামাঝি সময়ে সুমিতি তার ঘরে অর্ধশায়িত অবস্থায় মনসার সঙ্গে আলাপ করছিলো। কিছুক্ষণ আগে মনসা যা বলেছে তা থেকে ধরে নেওয়া যায়, হয়তো বা এই পরিবারের আত্মপ্রসারের একটা সময় এসেছিলো, ঠিক তখনই সুকৃতির মৃত্যু গতিটাকে মন্থর করে দিয়েছে।

তদানীন্তন রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশ্লেষণ করতে করতে মনসা বলেছিলো, 'কাল আমাদের আঘাত করেছিলো। কালের স্রোত যে পথ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে অনেক দূরে আমাদের অবস্থান, তবু তারই একটা আবর্তসংকুল ধারা প্লাবনের মতো এসে আমাদের কাল সম্বন্ধে সচেতন করেছিলো, বিমুখও করেছে'।

বর্তমানে ফিরে মনসা বললো, 'বউদি, কাকিমার ছবি তোমার ঘরে এনে রাখো। সে ভালোই হবে। কাকিমাকে জেঠিমা গভীরভাবে ভালোবাসতেন, কিন্তু সে গোপন ভালোবাসা বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না। যে সাহস দেখাতে গিয়ে তিনি মাঝপথে থেমে গেছেন তুমি যদি পারো তাহলে হয়তো তিনি খুশিই হবেন'।

সুমিতি বললো, 'এ বাড়ির কারো সাহসের অভাবেই যে এই গোপন ব্যবস্থা, তা নাও হতে পারে'।

কথাটা বলতে বলতে সুমিতি অনসূয়ার সম্বন্ধে এই রকম ধারণা করলো এটা জীবনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি। দু'এক ক্ষেত্রে মায়েদের সন্তানস্নেহ গোপন রাখতে হয়। সেটা যে সাহসের অভাবেই তা নয় শালীনতাবোধও অনেকসময়ে আজীবন দুঃখ বহনের পরামর্শ দেয়। কুন্তির সাহসের অভাব ছিলো না অনসূয়ার এ ব্যাপারেও যেন কতকটা তেমনি এক মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। এ বাড়ির যা কিছু সব বিধৃত রয়েছে অনসূয়াতে, সেইজন্যই তাঁর এই সংযম। যে বিধান তিনি ভাঙতে পারেন অনায়াসে যার জন্য তাঁর কৈফিয়ত নেওয়ার কেউ নেই সেটাই যেন ভাঙা কঠিন ঠিক সেইজন্যেই।

দিনটা একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মনসা দুজন ভৃত্যের সহায়তায় সুকৃতির ছবিটা সুমিতির ঘরে পৌঁছে দিলো।

এখন সন্ধ্যা। সান্যালমশাইয়ের ঘরে এসে অনসূয়া বললেন 'আমাকে ডেকেছো'?

'খুঁজছিলাম। উপাসনা হয়েছে'?

'এ জীবনে সেটা আর হলো কোথায়'?

'আমার বাড়ির দেওয়ানজির গল্প তোমার মনে পড়ে ?

'শুনেছিলাম যেন'।

তাঁকে বোধ হয় তাঁর বেদিটা ছাড়া কল্পনা করা কঠিন আমি তাঁকে বোধ হয় শৈশবে দেখেওছিলাম। বকের পাখার মতো শাদা চুল, অতিশীর্ণ এক বৃদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে তাঁর মর্মর বেদিটায় বসে আছেন। তাঁর পরে যারা দেওয়ান হয়েছিলো তারা সকলেই ম্যানেজারের পদবীতে রাজ্য শাসন করতো। যে রানী তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন, যে রাজার আমলে তিনি নীলকরদের শাসন করেছিলেন তাঁরা কেউ নেই। রাজার ছেলে এখন জমিদার। দেওয়ানজির স্থাপিত স্কুল ধ্বংস হয়ে গেছে, তাঁর লাইব্রেরির সেকেলে বইগুলো ধুলোর মতো মূল্যহীন, কিন্তু তাঁর সেই মর্মর বেদি আর তিনি যেন অবিনশ্বর একটি উপাসনা। উপাসনার কথায় তিনিও বলতেন—'পারলাম কোথায় ডাকতে'?

একটা স্বল্প বিরতির পরে অনসূয়া বললেন, হঠাৎ তাঁর কথা মনে হলো কেন'?

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে ডেকেছিলাম কেন তাই বলি শোনো। তোমার ছেলেরা বড়ো হয়েছে, এখন ওদের জীবনের উপকরণে খানিকটা আয়াস প্রয়োজন'।

'ওদের কষ্ট কোথায় দেখলে'?

'কষ্ট নয়। বিশিষ্ট অভ্যাস হওয়ার বয়স হচ্ছে ওদের। শোবার ঘরের আলো কী রকমটা দরকার,

সেল্‌ফে কী ধরনের বই থাকা উচিত, কিংবা আদৌ বই থাকবে কিনা এমন সব রুচিবৈশিষ্ট্য ওদের হয়েছে বৈকি, অন্তত হলে অন্যায় হয় না। সুমিতিরও এবিষয়ে কিছু বলার থাকতে পারে'।

'এদিকটায় আমার খেয়াল ছিলো না'।

'তাতে এমন কিছু ত্রুটি হয়নি তোমার। সুমিতির জন্যে আমি একটা মহলের কথা চিন্তা করছি। পাশাপাশি দুখানা শোবার ঘর, একটা স্বতন্ত্র বসবার ঘর, একটা বাড়তি ঘর যা লাইব্রেরি কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। এবং সেই সঙ্গেই ভাবছি রূপুর জন্যে যে-মহলটা হবে এখন থেকেই তারও পরিকল্পনাটা ঠিক করে রাখা দরকার'।

অনসূয়া কিছু বলার আগেই সান্যালমশাই হেসে আবার বললেন, 'এতে নিশ্চয় তোমার ছেলেরা জমিদার পরিবারের সহজলব্ধ আয়াসে অমানুষ হয়ে যাবে না'। এ ধরনের কথা নিয়ে একসময় তাঁদের অনেক দাম্পত্য বিতর্ক হয়ে গেছে। উকিলের মেয়ে অনসূয়া সে সময়ে জমিদারগোষ্ঠী সম্বন্ধে যে মতটি পোষণ করতেন সেটা শ্রদ্ধার নয়। অনসূয়ার পক্ষে এখন সেই মনোভাবটিকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাঁর ধারণা হয়েছিলো এমন একজনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে যাঁর বিরাট প্রাসাদের কোন কক্ষে কত উপপত্নী আছে তার নিশ্চয়তা নেই। নিজের রূপের উপরে তাঁর অভিমান হয়েছিলো। রূপের জন্যই বিবাহ। সে সময়ে তিনি স্বামীকে ভয় করতেন, ঘৃণা করতেন। পরে কর্তব্যবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকতে থাকতে প্রথমে ঘৃণা তারপর ভয় চলে গিয়েছিলো। কিন্তু তাসত্ত্বেও অনসূয়া নিশ্চিন্ত নন। যে অত্যাচার বৃত্তির পোষণ করেছে এই পরিবারের একাধিক পুরুষ, সেটা অর্জিত গুণ হয়ে এদের রক্তধারায় চলছে না তা কে বলবে? তখন অনসূয়ার ছেলেপুলে হয়নি, দু-একটা কথা বলার মতো সাহস তিনি অর্জন করেছেন, একদিন সেই কিশোরী অনসূয়া বলেছিলেন—আমাদের ছেলেরা যেন নীতিজ্ঞানহীন না হয়। কথাটা দুঃসাহসে বলে ফেলে অনসূয়া লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিলেন, প্রায় পুরো দুটো দিন স্বামীর সম্মুখে আসেননি। পরবর্তীকালে এই লজ্জা থাকার কথা নয়, ছিলোও না। ছেলে মানুষ করা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তখন বহু বিতর্ক হয়েছে। সেসব বিতর্কে অনসূয়ার পক্ষে মূল কথা ছিলো—অনায়াসলভ্য জীবনের উপকরণ মানুষকে অপদার্থ করে। অনেকসময়ে অনসূয়ার কথা মেনে নিলেও কখনো কখনো সান্যালমশাই বলেছেন—তোমাদের এই ব্রাহ্মশালীনতাবোধ, এই নীতিবোধের প্রাখর্য ভিক্টোরিয়ান ইংলন্ড থেকে ধার করা। এই পালিস সে যুগের ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য ছিলো। এর সৎবস্তুটুকু আবার পিউরিটানদের থেকে ধার করা। কিন্তু খোঁজ নিলে জানতে পারবে, কি এদেশের ব্রাহ্মগোষ্ঠীতে, কি ওপারের ইংরেজ সমাজে বর্তমান এত বাছ-বিচার নেই। অবশ্য অনসূয়ার শুচিপ্রিয়তাকে মূল্যও দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু এই বর্তমানে অনসূয়াকে তাঁর শুচিপ্রিয়তার কথা তুলে টুকতে কৌতুক বোধ হলো। সান্যালমশাই বললেন, 'কিছু বললে না'?

'সহজলব্ধ জীবনের উপকরণ-প্রাচুর্য বয়স্ক মানুষদেরও সংসারে অরুচি আনতে পারে, এবং সে অরুচিবোধটাকে দূর করার জন্যে সে কুপথ্য করতেও পারে। কিন্তু ছেলের জন্যে ঘর তুলতে চাচ্ছো তাতে কি এমন অন্যায় হবে? আমার ঘরগুলো তুলবার সময়ে আমার রুচির মূল্যও তুমি দিয়েছিলে'।

'তুমি যখন মত দিচ্ছো তাহলে বলি শোনো : এঞ্জিনিয়ার নক্‌সা করবে, কিন্তু পরিকল্পনাটা আমাদেরই করা দরকার। তুমি এসো, আমার পরিকল্পনাটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি'।

দুজনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখানে দাঁড়িয়ে সান্যালমশাই অনসূয়াকে তাঁর পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন। অনসূয়াও আলোচনা করলেন।

ফিরে এসে সান্যালমশাই বললেন, 'বলো, এ কি আমার উচিত নয়, এমন করে ওদের গুছিয়ে দেওয়া'?

'তুমি যে ছেলেদের আমার চাইতেও বেশি ভালোবাসো এ তারই প্রমাণ'।

'বলো কী, এ কি আমারই আত্মবিস্তারের চেষ্টা নয়'?

অনসূয়া কিছু না-বলে মুখ নিচু করে হাসতে লাগলেন।

'অমন মধুর করে হাসছো কেন'?

'এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার দেওয়ানজিদের কথা মনে পড়ছে'।

'কেন, কেন'?

'তোমার বর্তমান মনের অবস্থায় সান্যালদের রক্ত আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে, বিস্তার চাইছে। তোমাব বহু-ঘোষিত শান্তির বিপরীত। যা এতদিন পেয়েছো ভেবেছিলে তাকে ত্যাগ করে আসতে হচ্ছে বলেই মনের এখানে-ওখানে লুকিয়ে থেকে সেটা আত্মপরিচয় দিচ্ছে'।

'তাই কি? ওরে, তামাক দে'।

কেউ শুনলো কিনা দেখবার জন্য উঠে গিয়ে অনসূয়া দেখলেন একজন দাসী এগিয়ে আসছে।

'কী মা'?

'তামাক চাইলেন'।

হাসিমুখে অনসূয়া ফিরে এসে বসলেন।

'কিছু বলবে মনে হচ্ছে'। সান্যালমশাই বললেন।

'এবার ধান কীরকম হয়েছে'?

'ইংরেজিতে যাকে বাম্পার ক্রপ বলে'।

'প্রজারা বোধ হয় কেউ টাকা ফেলে রাখবে না'?

'তা কি এখনই বলা যায়? তবে শুনছি বিলেব পর্যন্ত জমি চাষযোগ্য হচ্ছে, এদিকেও চর জেগেছে বুধেডাঙার লাগোয়া'।

অনসূয়া হেসে বললেন, 'তোমাদের দেশেব প্রবাদটাই মনে পড়ছে ; তোমারও ধানের নেশা লেগেছে'।

সান্যালমশাই কথা না-বলে তামাকে টান দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসলেন।

সুকৃতির তৈলচিত্রে রোদ এসে পড়েছে। দেয়ালেব যে জায়গাটায় টাঙানো হয়েছে ছবিটা সেখানে সকালে ঘণ্টাখানেক রোদ পড়ে। মনসা লক্ষ্য করে বলেছিলো, 'নষ্ট হয়ে যাবে না তো, বউদি'?

'বলা কঠিন। এ যদি আমাদেব মাস্টারমশাইয়ের আঁকা হয়ে থাকে তবে তিনিই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন'।

পরদিন সকালে যখন রোদ পড়ার কথা, সদানন্দ এলো। ফুটবল দিয়ে মেপে-জুখে জায়গাটা ঠিক করে ছবিটাকে বসিয়ে দিয়ে সে বললো, 'তা যা-ই বলুন, মনটিকে ঠিক ধরা যায়নি ছবিতে'।

মনসা বললো, 'কেন, মাস্টারমশাই'?

'তখন আমি ভেবেছিলাম অত্যন্ত হাল্কা ফুলের মতো একটি মন ছিলো এঁর। পরে যত ভেবেছি ততই আমার মনে হয়েছে, অত্যন্ত অভিমানী মেয়ে। সে অভিমানটা যেন ফোটেনি'।

'হতে পারে তা'। মনসা বললো, 'আপনি এ ছবিটার একটা জোড়া আঁকুন না'।

'তা মন্দ হয় না', সদানন্দ বললো, 'তা মন্দ হয় না যদি এ জায়গাটায় সুমিতি-মায়ের একটা ছবি থাকে। কিন্তু এক বিপদ হয়েছে, জানো মণি, আমি যেন কারো প্রভাবে পড়েছি, পোর্ট্রেট আঁকতে হলে যে-মনটা দরকার সেটা আছে কি না-আছে। তা হলেও ভালো প্রস্তাব'।

সদানন্দমাস্টার চলে গেলো।

সুমিতি বললো, 'মণিদিদি, তুমি কিন্তু কখনো ছবি আঁকার কথা মনে করিয়ে দিয়ো না'।

'যদি তোমার এখনকার কোনো মনোভাব তাঁর কল্পনাকে আকর্ষণ করে থাকে তবে ছবি আঁকার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না। আর তখন তুমি প্রত্যাখ্যান করতেও পারবে না। সেটা তোমার নিজেব কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে'।

'কি বিপদ ঘটালে তুমি! তুমি নিজে কখনো সিটিং দিয়েছো'?

মনসার চোখে হাসি ফুটলো। সে বললো, 'ভাই বউদি, তুমি কি আমাকে এত কুরূপা মনে করো যে বয়ঃসন্ধির সময়েও কোনো শিল্পীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবো না'?

'ভালো হয়েছিলো নিশ্চয়ই ছবি'?

'তাকে মানুষের ছবি বলে মনে হয় না। আমার চোখ দুটো কি জুলফির উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে কান ছুঁয়ে আছে'?

'সে ছবি কোথায়, ভাই'?

'আগে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে থাকতে দেখেছি, এখনো আছে বোধ হয়'।

সুমিতি বোধ করি মনে মনে ছবিটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করলো। একটু পরে সে বললো, 'মাস্টারমশাইকে আমার অপূর্ব মনে হয়। তোমার রবিনহুডের গল্প মনে আছে'?

'কেন বলো তো? ফ্রায়ার টাকের কথা বলছো'? তার পরে খিলখিল করে হেসে উঠে মনসা বললো, 'ঠিক ধরেছো। মাস্টারমশাইকে বলবো'।

'বলো কী'।

'না, না, উনি শুনে খুশি হবেন। বলবেন, তাঁর ছাত্রদের দলে মিশবার উপযুক্ত একজনই এসেছে'।

কথার মোড় ফিরিয়ে সুমিতি বললো, 'কথাটা যখন উঠলো, বলি তোমাকে। একই জায়গায় বিশ-ত্রিশ বছর চাকরি করা অসাধারণ নয়, তাহলেও ওঁর মতো শিক্ষিত এবং গুণী লোকের পক্ষে এরকম একটা গ্রামে জীবন কাটিয়ে দেওয়া খুব প্রাত্যহিক ঘটনা নয় কিন্তু'।

'জেঠিমা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারের খোঁজ খবর রাখেন। তাঁর কাছে শুনেছি শৈশবে ওঁর বাবার মৃত্যু হয়। ছাত্র অবস্থাতেও উনি সৎমা আর দু-তিনটি ছোটো ভাই বোনকে পালন করতেন। তারপর অর্থোপার্জন করে বোনের বিয়ে দিয়ে সংসারকে একটু খাড়া করে দিয়ে এখানে চলে আসেন'।

'নিজের আত্মীয়-স্বজনের খবর রাখেন না'?

'রাখেন বৈকি। আগে দেখেছি বছরে দুবার ছুটি নিয়ে চার-পাঁচ মাস অন্যত্র গিয়ে থাকতেন। একবার ওঁর বোন এসেও কিছুদিন এখানে ছিলেন। ছোটো এক ভাই এখন কী একটা ভালো চাকরি করে, ওঁদের মা তার কাছেই থাকেন। কিন্তু সব চাইতে ছোটোটির কথা অবাক করার মতো'।

'কী হয়েছে তার'?

'গল্পের বইয়ের রোমান্টিক নায়কের মতো বিনিপয়সায় য়ুরোপে গিয়েছিলো লেখাপড়া শিখতে। তার কোনো খবর পাওয়া যায় না। পয়সার জন্যে সে দেশলাই ফিরি করতে শুরু করেছিলো—এই শেষ খবর'।

কাহিনীটা সুমিতিকে অন্যমনস্ক করেছিলো। একটু পরে সে বললো, 'এই বেদনাবোধের জন্যেই কি মাস্টারমশাই সমাজবিমুখ'?

'তা কী করে বলবে? সদানন্দ নামটা জেঠিমা রেখেছেন ওঁর স্বভাব দেখে। শোনা যায়, বিয়ের ভয়ে পালিয়েছিলেন—একদিকে মা, অন্যদিকে সহপাঠিনী সেই মেয়েটি। দুজনের মাঝখানে পড়ে, আমার মনে হয়, মাস্টারমশাই সত্যিকারের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন'।

মনসা যে সুরে কথা বলে তেমনি করে সুমিতি বললো, 'কাপুরুষ'।

'আসলে ফ্রায়ার টাক'। বললো মনসা। একটু পরে আবার বললো, 'চোখের সামনে পাথর হয়ে থেকে কষ্ট না দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছেন'।

মনসার খোঁজে একজন দাসী এলো, তার হাতে ট্রেতে চায়ের সম্ভার।

'আজ রবিবার'? মনসা জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার মনে ছিলো না। এসো বউদি, রবিবার করা যাক'।

সুমিতি বললো, 'রবিবারে কি তোমার দুবার ব্রেকফাস্ট হয়? তোমাদের দেশে রবিবারের চিহ্ন বুঝি চা'?

'তা বলতে পারো। এইটুকুই তো আছে। ফুর্সিও নেই, কোতল করি এমন মোবারকও নেই'।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনসা বললো, 'এর আগে একদিন রসিকতা করে বলেছিলে, রাজনীতি তোমার সময় কাটানোর ছল। সেদিন তোমাকে বুঝতে পারিনি, তারপর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তুলনা করে তোমাকে যেন চিনতে পারলাম। সক্রিয় রাজনীতিতে নিরুৎসাহ মাস্টারমশাই আমাদের দাদার জেলখাটা মতবাদের গোড়ার কথা জুগিয়েছেন। এ যেন ভূগোল শেখানো, ছাত্রকে ভুল শেখানো যায় না বলেই ঠিকটা শিখিয়ে দিয়েছেন। যেন সেকালের কোনো শস্ত্রবিদ্, সন্তুষ্ট হলে দিগ্বিজয়ের অস্ত্র দেন কিন্তু নিজে শস্ত্রচালনায় বীতস্পৃহ। তেমনি যেন তোমার ব্যাপার। বিদ্রোহ করাটা যুক্তিগ্রাহ্য, যেমন স্নান করা কিংবা বই পড়া, তার একটি প্রকাশ রাজার প্রতি তোমার বিরোধ. নতুবা শস্ত্রের নেশায় ক্ষত্রিয়ের মতো বিরোধের নেশায় তুমি চলতে চাওনি'।

সুমিতি হেসে বললো, 'ননদিনী, এ তোমার ভাইবউয়ের দোষ ঢাকবার চেষ্টা। সৎ চিন্তা নয়'।

'তা কেন হবে? এককালে যদি অঙ্ক করে থাকো চিরকালই কি অঙ্কই করতে হবে, কাব্য পড়া বারণ? কিংবা পৃথিবীর আধখানা ভাঙাগড়া তো মেয়েদের শরীরে, তাদের জীবনে। বিপ্লবী যদি আবার মানুষও হয়, বসতে হয় না তাকে সেই দুখানা পায়ের কাছে'?

মনসা চা শেষ করে বললো, 'চলো বউদি, রবিবারে। তুমি কি তোমার বাড়িটাকে চিনেছো এতদিনেও? একটা উপবন আছে তোমার তা কি দেখেছো'?

সুমিতি বুঝলো মনসা কোথাও যেতে চায়। কিন্তু সে দ্বিধা করতে থাকলো। তখন মনসা উঠে আলনার কাছে গেলো। সুমিতির জন্য শাড়ি বাছাই করতে গিয়ে আলনায় একেবারে নতুন একটাকে দেখে সে বললো 'বাহ্, এই তো দেখছি সিল্কের খদ্দর। তা হলে রূপুর সমস্যা মিটেছে। গতবারে বলছিলো শুনেছিলাম, বউদি খদ্দরে অভ্যস্ত, কী যে হবে? এটাই পরো না হয়। আমি বাগিচাকে নির্জন করে আসি'।

মনসা ফিরে এলে তারা খিড়কি দরজা দিয়ে বাগিচার পথে বেরিয়ে পড়লো।

অনেক জায়গা পেলে যে রকম হতে পারে বাগানটা আয়তনে তেমনি। দেশী নানা সুস্বাদ ফলের গাছ তো বটেই বিদেশী ক্ষণপ্রসবী গাছও সেখানে সে অবস্থায় থাকা স্বাভাবিক। তারা ফুলের কেয়ারিগুলোকে পার হয়ে ফলের গাছগুলোর মধ্যেকার বীথিগুলো দিয়ে চলতে থাকলে মনসা, 'এটা তোমার হিমসাগরের লাইন, এটা তোমার ক্ষীরসাপাতির'—এমন পরিচয় করে দিতে লাগলো।

সুমিতি একবার জিজ্ঞাসা করলো, 'এত কি তোমাদের খেতে লাগে? এ তো বেশ একটা ক্যানিং ইনডাস্ট্রির জোগাড়'।

মনসা বললো, 'রাম কহ, তোমরা আবার ইনডাস্ট্রিতে কবে গেলে'?

সুমিতি বললো, 'তা কেন, গ্রামে তো আরও মানুষ আছে। গ্রামের অন্যত্রও এরকম গাছ হতে পারে'।

ছায়ায়, আলোয়, ছায়াতে আলোর জালিকাটা পথে তারা ঘুরতে থাকলো। হিমসাগর, ন্যাংড়া এসব নামের সঙ্গে পরিচয় থাকায় শহরের মেয়ে সুমিতির সে সব সুস্বাদের উৎস সম্বন্ধে এই প্রথম কৌতূহল আর তার নিবৃত্তি হচ্ছিলো। তার একবার সেসবের জন্য 'আমাদের এসব' এরকম মমতা বোধ হলো। কিন্তু মনসা বললো, 'মাস্টারমশাইয়ের কথা কি দাদার কাছে শোননি? তিনি তোমাকে ইনডাস্ট্রির কথা বলতে পারবেন হয়তো'।

সুমিতি হাসতে হাসতে বললো, 'তিনি হয়তো বলবেন কেন ইনডাস্ট্রি হয় না, তার অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে, কিন্তু এখন আমার তা মাথায় আসছে না'।

মনসা বললো, 'বিউটিফুল। প্যাঁচটা ঠিক ধরেছো। হয়তো আসল কথা, বাজার কোথায়'?

চলতে চলতে সুমিতি বললো, 'অথচ, রূপুর মতো ছোটো ছেলেটি যদি এই সিল্কের খদ্দর জোগাড় করে থাকে, প্রমাণ করা করা যায় এখানকার মানুষেরা ইনডাস্ট্রির পক্ষে অনুপযুক্ত নয়'।

মনসা বললো, 'হয়তো চাপড়ির সেই তাঁতীর বোনা। হয়তো রূপুর পরামর্শে এই সুতোটা সে মুর্শিদাবাদে জোগাড় করেছে। হয়তো সে তাঁতী মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র। সে কিন্তু অন্য সময়ে চালানি

একশ' বিশ কাউন্টের সুতোয় ধুতি শাড়ি বুনে থাকে। তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না তো? তুমি কি গ্রামের মেয়েদের দিয়ে সিল্কের সুতো কাটানোর কথা ভাবছো'?

চলতে চলতে সুমিতির মনে পড়লো সদানন্দ আর তার স্কুলের কথা। ইতিমধ্যে কবে যেন কে যেন সেই ছোট্ট স্কুলটার কথা বলছিলো। কী শেখানো হয় সেখানে? কারা ছাত্রছাত্রী সেখানে? যে বলছিলো সেই স্কুলের কথা তার মতে দুর্ভিক্ষে ছাত্ররা পালিয়েছে। হয়তো তা সত্য নয়।

হয়তো সেই ঘটনার পরে সদানন্দর মন অন্যদিকে সরেছে।

সুমিতি ভাবলো, আজ সদানন্দকে কি খানিকটা বেশি চিনতে পেরেছে সে? সদানন্দর অত্যন্ত লম্বা ঝুলের সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথাভরা টাক ও মুখভরা হাসির সঙ্গে ফ্রায়ার টাকের ছবির মিল থেকে সেই নামটা মনে পড়েছিলো। ফ্রায়ারের ভোগে আসক্তি ছিলো না বলা যায় না। অন্যদিকে সে এক ধরনের বিদ্রোহী ছিলো বটে। তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রকে সে ঘৃণা করতো বলেই সে বনবাস বেছে নিয়েছিলো।

সদানন্দব মস্তিষ্ক যখন সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে থাকে, তখন তার মস্তিষ্কের অন্য অংশ যেন এই পলাতক জীবন, যা সামন্ততন্ত্র-আশ্রিত, তাকে বেছে নেয়। এ কি অন্তর্ঘাত? অথবা এ কি ঘুণপোকার স্বভাব? ও, না না, সে নিজের চিন্তায় হেসে ফেললো। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলতে এরকমই হয়। নতুবা বলতে হয় কোনো দুজন মানুষের চবিত্র এক নয়।

মনসা বললো, 'কথা বলছো না, ভাবছো বুঝি খুব'?

সুমিতি বললো, 'না, ননদিনী, বিপ্লবীদের একজোড়া পায়ের কাছে বসার কথা ভাবছিলাম'।

মনসা হেসে বললো, 'তুমি কি কারো বিদগ্ধা প্যারিসিনীকে ত্যাগ করে নিরক্ষবা তাম্রকায়া মাওরিনীব পায়ের কাছে বসাব কথা শোননি'?

সুমিতি ভাবলো : গগ্যাঁর সেটা একরকমের বিপ্লব বটে। কিন্তু তারা তখন খিড়কির পুকুরের দিকে চলে আসছিলো। পথের পাশে একটা ছাদহীন লতায় ঢাকা একটা উঁচু দেয়াল দেখে সে জিজ্ঞাসা কবলো, 'হট্‌হাউস নাকি, ভাই? নাকি মেয়েদের পোশাক পরার জন্য'?

মনসা বললো, 'না গো, অত দূরে তাহলে সে অসুবিধার বন্দোবস্ত এখানে মানা হতো না। ওটা প্রকৃতপক্ষে টেনিসের স্ক্রিন যা লতায় ঢেকেছে।

বেড়ানো উদ্দেশ্য বটে, ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত নয়। তারা পুকুরের পার ধরে খিডকির ঘাটের দিকে বরং চললো।

মনসা বললো, 'আচ্ছা, বউদি, একটা কথা বলবো ভাবি। খুব কৌতূহল আমার। তোমার আধুনিকতার সাহসকে আর ভালোবাসার ক্ষমতাকে আমি অবাক হয়ে দেখি। এটা বেশ ভালোই যে তুমি যেন বলছো আমি যেমন তাই থাকবো, ভালোবাসতে এসেছি, আমাকে নেবে কিনা, তা তোমাদের দেখার। বোঝাই যাচ্ছে এই গ্রাম্য আভিজাত্যের প্রাচীনতাকে তুমি যাচাই করছো। হয়তো দেখছো সেই প্রাচীনতা আর আভিজাত্য এত গভীর, যেন আকাশপট, যা তোমার আধুনিকতার আলোকে অনায়াসে ধারণ করে। এদিক দিয়ে কিন্তু তুমি আর জেঠিমা একই জাতের'।

সুমিতি বললো, 'ভাই, মণি, তুমি কবি আর তোমার কথা বলার ধরন অনেকটাই তোমার দাদার মতো'।

মনসা সুমিতির মুখের দিকে চেয়ে হাসলো, বললো, 'হয়তো দুজনেই ওটা জেঠিমার ঠোঁট থেকে পেয়েছি। কিন্তু বলো, জেঠিমা এ বাড়িতে এসেছিলেন টেনিস র‍্যাকেট আর চার্চ অর্গ্যান নিয়ে, তুমি কী নিয়ে এসেছো জানতে ইচ্ছা করে। বিশ্বাস হয় না, এ তোমার নিছক আন্ডারগ্রাউণ্ডে আসা'।

পুকুরের পার ঘুরে তারা খিড়কির বাঁধানো ঘাটে এসেছিলো। তখন অনেকে জলে নেমেছে স্নানে।

মনসা যেন জলে ভাসা সেই নানা রঙের পাখপাখালি দেখতে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো। সুমিতি তাকে অনুসরণ করছিলো, কিন্তু কোথা থেকে কীভাবে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো এই ঘাটেই আত্মহত্যা করেছিলো সুকৃতি। হয়তো তারপর থেকেই অনসূয়া আর এদিকে আসেন না।

সুমিতির পা দুখানা যেন পাথরের হয়ে সেই স্নানের ঘাটের সঙ্গে জুড়ে গেলো। যেন কী এক ইয়ত্তাহীন পরিবর্তন ঘটেছে এই জলে। কেন তা আর কোনোদিনই জানা যাবে না। সুমিতির মুখে যেন সেই ইয়ত্তাহীনতার নীল লাগছে। ততক্ষণে মনসা শাড়ি গুটিয়ে জলের প্রান্তে দাঁড়িয়েছে, যেন কুলকুচো করা, পা ধুয়ে নেয়া তার খুব দরকার।

১৮

শ্রীকৃষ্টের সংসারে চাষী সৃষ্টি হবে এটা কেউ কল্পনা কবতে পারেনি, কিন্তু তার ছেলে ছিদাম চাষী হলো।

ছিদামের হাতে সংসার প্রতিপালনের ভাব। তাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। নিজেদের বলতে সামান্য যেটুকু আছে তার চাষ হয়ে গেলেও সে বসে থাকেনি, অন্যের জমিতে মজুর খেটেছে।

চৈতন্য সাহাকে জমিদার সময় দিয়েছে, সেও খাইখালাসি থেকে জমি মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এইরকম : কোনো অত্যাচারেব বন্দীশালা থেকে মুক্তির এই শর্ত হয়েছে যে একশজন যোদ্ধার ব্যূহ ভেদ করে একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছতে হবে, আর দলপতি রামচন্দ্র যেন খোলা তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে সেই ব্যূহ ভেদ করতে অগ্রসর হলো। খোরাকির ধানের জন্য, হাল-বলদের জন্য জমি আবার চৈতন্য সাহার কাছেই রেহানে রাখতে হবে। রেহান-ছাড়া কবতে প্রাণপণ না করলে চলবে না, প্রাণপণে মুক্তি। ভোর রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিদাম মাঠে পড়ে থাকে।

সংসার প্রতিপালনের দায়িত্বের সঙ্গে কর্তৃত্বের অনিবার্য যোগ আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নিযে অনেকসময়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

কেষ্টদাস জমিজমা থেকে আগেই হাত গুটিয়ে নিয়েছিলো। অসুস্থতাব জন্য তাকে বিরক্ত করা অনুচিত ভেবেও বটে, আর তার কাছে উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ পাওয়া কঠিন বলেও বটে, ছিদাম তার চাষসংক্রান্ত আলোচনাগুলি বাড়িতে পদ্মর সঙ্গে, অন্যত্র মুঙ্লার সঙ্গে করে। এতে একটা উপেক্ষার ভাব আছে, কিন্তু কেষ্টদাস জীবনের কোলাহল থেকে পিছিয়ে পড়তে চায় বলে এটা তার গায়ে লাগেনি।

একদিন কিন্তু তার মনে আঘাত লাগলো।

কিছুদিন থেকে আবহাওয়াটা তার শরীরের পক্ষে অনুকূল যাচ্ছে। সকালে উঠে সে বেরিয়ে পড়ে; এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, বৃদ্ধ জরাজীর্ণদের দাওয়ায়, কারো বাড়ির কোনো গাছতলায় অনেকটা সময় কাটিয়ে দুপুরে বাড়ি আসে। তারপর স্নানাহার ও দিবানিদ্রা। বিকেলে কখনো কখনো তার বাড়ির দাওয়ায় কেউ এসে বসে, কোনোদিন সে যায় রামচন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে। সেদিন বাড়ির কাছাকাছি এসে গাছগুলির ছায়া দেখে সে টের পেলো, বেলা গড়িয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরে সে দেখলো শোবার ঘরে শিকল তুলে দেওয়া, রান্নাঘরেও তাই। সে ডাকলো, 'কই বৈষ্ণবী, গেলা কোথায়'? সাড়া না পেয়ে সে ভাবলো হয়তো কোথাও গেছে, এখনই আসবে। রান্নাঘরের বারান্দায় মাটির ঘড়ায় রোজকার মতো তার স্নানের জল তোলা ছিলো। স্নান শেষ করে সে কিছুক্ষণ আবার অপেক্ষা করলো। তার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার কথা। রান্নাঘরের দরজা খুলে সে দেখলো পিঁড়ি পাতা, পিঁড়ির সম্মুখে ধামা দিয়ে ঢাকা আহার্য সাজানো রয়েছে। একবার সে ভাবলো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক কিন্তু পরে মনে হলো, পদ্ম যদি তাড়াতাড়িই ফিরবে তবে খাবার গুছিয়ে রেখে যেতো না। তার দুর্বল দেহ উপবাসের পক্ষে অপটুও বটে। আহারের পর মনে হলো তার—হয়তো পদ্ম ছিদামের জন্য আহার্য নিয়ে মাঠে গেছে। একটা অভিমান হলো তার।

চিকন্দির সীমায় সানিকদিয়ারের মাঠগুলির লাগোয়া কেষ্টদাসের সামান্য কিছু জমি ছিলো। কেষ্টদাস

সেখানে গেলো। রোদ তখনো মাথার উপরেই আছে। জমিটার দিকে এগোতে এগোতে কেষ্টদাস ভাবতে লাগলো পদ্মর সঙ্গে দেখা হলে কী বলবে সে। পদ্ম যদি তার পূর্বের কোনো বৈষ্ণবীর মতো হতো তাহলে তার কাছে বিলম্বের জন্য কৈফিয়ত নেওয়া যেতো। এক্ষেত্রে সে নিজেই একটা কৈফিয়ত তৈরি করে ফেললো, সে স্থির করলো দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে হাট থেকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে কিনা।

জমিটার চৌহদ্দির আলের উপরে একটা আমগাছ ছিলো, কলমের গাছ খোলা আকাশের নিচে ছাতার মতো গোল হয়ে উঠেছে। ছিদাম, পদ্ম ও মুঙ্‌লাকে কেষ্টদাস দূর থেকেই চিনতে পারলো। তারা যেন গোল হয়ে বসে কী আলাপ করছে। বিষয়টা কী, তা তাব আন্দাজে আসছে না, কিন্তু আর এগোতেও পাবলো না সে।

দিনটা গড়িয়ে গেলো। রাত্রিতে কেষ্টদাস তার বিছানায় বসে শুনতে পেলো অন্যান্য দিনের মতো ছিদাম আব পদ্ম জমিজমা ফসল নিযে আলাপ করছে। সে আজ দুপুরবেলায় যা অনুভব কবেছে সেটা অন্য কারো অনুভব করার কথা নয়। তার মনে হতে থাকলো—পদ্মর কী একবারও প্রশ্ন করতে নেই দুপুরে সে আহাব কবেছে কিনা? অবশ্য সে আহার করেছে এটা পদ্ম জিজ্ঞাসা না কবেও বুঝতে পেরেছে, তবু জিজ্ঞাসা করলেই যেন স্বাভাবিক হতো। কেষ্টদাসের মনে হলো তেমন সেবাযত্ন আর যেন সে পায় না। এই যে ওরা আলাপ করছে এতেও যেন তাকে অস্বীকার করার ভাবটাই আছে। জমিজমা যতটুকু আছে সবই তার, তবু সে যেন উহ্য। মৃত্যুর পরেই বোধ করি এমন হয়।

কিন্তু সংসারটাকে দাঁড় করানোর অবস্থায় যদি এনে থাকে তবে সেটা করেছে ওরাই। এমন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হাজারে একজন পারে না। আর তাছাড়া, যদি ওর মা বেঁচে থাকতো তবে সেও ছেলের আহার্য নিযে নিশ্চয়ই এমনি করেই মাঠে যেতো। 'গুরু! গুরু'! বলে মনকে সংহত কবাব চেষ্টা করতে করতে কেষ্টদাস শুযে পড়লো।

পাঁচ-ছ দিন পরে কেষ্টদাস দিবানিদ্রাব আয়োজন কবে নিচ্ছে এমন সময়ে পদ্ম এলো তাব কাছে।

'কী কও পদ্মমণি'?

'উত্তরদিকের জঙ্গলের ভিটাগুলি কার'?

'মোহান্তদের মধ্যম গোঁসাইয়ের'।

'হাতের মাপে এক বিঘা চৌরস জমি। ওই ভিটায় আমার ঘর তুলে দেও না কেন, আমি থাকি'।

'এ-ঘরে কি কুলান হয় না, ও-ঘরে কাকে নিয়ে থাকবা, পদ্মমণি'?

'কেন, মধ্যম গোঁসাইয়ের সমাধি নাই'?

'তা নাই। গোঁসাই বৃন্দাবনে অভাব হইছিলেন অনেককাল আগে'।

'তবে তো আরও ভালো। ভিটায় বাগান করবো, শাকপাতা লাগাবো'।

পদ্ম চলে গেলো। তার পরনের হলদে ডুরে শাড়িটা জীর্ণ হয়েছে। কেষ্টদাসের মনে হলো, পদ্মর মতো রুচি নিয়ে চলতে গেলে নতুন শাড়ি আবার কিনতে হবে, পরিশ্রম না করেও উপায় নেই।

কেষ্টদাস কিছুকাল ব্যর্থ চেষ্টা করলো দিবানিদ্রার, তারপর উঠে পদ্মকে খুঁজে বাব করলো। রান্নাঘরের আড়ালে একটা গাছতলায় বসে কাঠের লাটাইয়ে পাক দিয়ে পাটের সুতলি পাকাচ্ছিলো সে।

কেষ্টদাস বললো, 'কাজ করো? দিনরাতই কাজ করো'!

পদ্ম লাটাই নামিয়ে রেখে বললো, 'খাওয়ার জল দিবো, গোঁসাই'?

'না, এমনি আলাম তোমার খোঁজে'।

দৃঢ়যৌবনা পদ্ম, আর রোগজীর্ণ কেষ্টদাস।

কেষ্টদাস বললো, 'তোমাদের কাজে আমাকে ডাকলিও পারো'।

'ভারি কাজ'!

'মিয়ে ছাওয়াল হয়ে তুমি এবার ক্ষেত নিড়াইছো'।

'না নিড়ায়ে উপায় কী! পরের বলদ আনে চাষ দিছিলো জমিতে, বলদেব ভাড়ার বদলা ছিদাম যায় তার ক্ষেতে কাম করবের'।

'নিড়ানি তুমি শিখলে কনে তাই ভাবি'।

'বাপের আহ্লাদি মিয়ে, বাপের কোলে থাকতাম। চাষের কামে বাপের হাত চলা দেখছি'।

কেষ্টদাস একটি অত্যন্ত আদরিণী মেয়ের পরিণতির কথা চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'তুমি কাজ করো, বৈষ্ণবী, আমি তোমার পান সাজে আনি'।

কেষ্টদাস পান সেজে নিয়ে এলো।

পান নিয়ে পদ্ম বললো, 'তাহলে ধরো, দড়ি পাকায়ে নি'।

পদ্ম সুতলির একটা মুখ কেষ্টদাসের হাতে দিয়ে দড়ি পাকানোব জোগাড় করে নিলো।

কেষ্টদাস বললো, 'এত দড়ির কী কাম'?

'মিযেমানুষের দড়ি-কলসি ছাড়া আর কী সম্বল কও'?

কেষ্টদাস হাসতে পাবতো কিন্তু পদ্মর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাব মনে হলো, এটা রসিকতা, কিন্তু এমন যার ঘরনী হওয়ার যোগ্যতা তাব সত্যিকাবেব ঘর বাঁধা হলো না। তার মনে দড়ি-কলসির কথা জাগলে অযৌক্তিক হয় না।

কিন্তু পদ্ম তখন-তখনই বললো, 'কী দ্যাখো, পানে ঠোঁট লাল হইছে'?

এব উপরে কি অভিমান করা যায়?

আব ছিদামেব কথা? সাবা গাঁয়ে তার নিন্দা নেই, প্রশংসা আছে। কয়েকদিন আগে তার বাড়িতে বসেই রামচন্দ্র তার প্রশংসা করে গেছে।

কেষ্টদাস মহাভারত নিযে পড়তে বসেছিলো। অভ্যাসের ফলে তাব পডাটা আগেকার তুলনায অনেক স্পষ্ট হয়েছে। এমন সময়ে ছিদাম এলো। তার গাযে তখনো মাঠের ঘাস লেগে আছে, কোথাও কোথাও মাটি।

কিছুক্ষণ দ্বিধায় কাটিযে অবশেষে সে বললো, 'জেঠা, একটা কথা কবো'?

'কও, কও না কেন্'। রামচন্দ্র বললো।

'বুধেডাঙায় সান্দারদের ইস্তফার জমি আছে'।

'তা আছে'।

'এক পাখি পাওয়া যায় না'?

'টাকা হলি যায'।

'কয়ে-বলে পত্তনি—নজর পরে দিলি হয না'?

'তা কি ছাড়ে জমিদার ; বরগা চায়ে নেও না কেন্'? রামচন্দ্র হাসিমুখে বলেছিলো।

'হাল-বলদ মানুষ নাই'।

রামচন্দ্র হেসে বললো, 'তবে পত্তনি নিয়ে-বা কী হয়'?

এই পরিবেশে রামচন্দ্র কেষ্টদাসকে বলেছিলো, 'ছাওয়াল আপনের ভালো, গোঁসাই'।

'কী কলেন'?

'কই যে, জোরদার ছাওয়াল। এমন গাছ লাগায়ে সুখ। খুব খাটে'।

'তা তো খাটাই লাগে। কেন্, আপনাব মনে নাই নবনে খুড়ো ক'তো—পুরুষের ঘাম জমির বুকে না পড়লি ফসলবতী হয় না জমি'।

'হ্যাঁ, এমন একটা ছড়া তার ছিলো'।

'কিন্তুক আপনার মতো কোনকালে হবি? এক চাযে জঙ্গল-জমি তিন ফসল দেয়, সে আর আপনে ছাড়া কার খ্যামতা'?

আউস উঠেছে। এ অঞ্চলে আউসের জমি কম, চাষও ভালো হয়নি। শুধু বর্ষাটা অকরুণ ছিলো না বলেই কিছু ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ধানের অধিকাংশ চৈতন্য সাহাদের। তবু দীর্ঘদিন রোগভোগের পর একটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা যেন, হোক না তা লাঠি ধরে ধরে।

এ বাড়িতে ছিদাম বলে যে আর একটি প্রাণী আছে, এটা কিছুদিন যাবৎ ঠাহর হতো না। একদিন সকালে কেষ্টদাস লক্ষ্য করলো, মুঙ্‌লা একটা গোরুগাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছে, পিছনে ছিদাম।

'কিরে'?

'ধান'।

'ধান'?

'হয়'।

'সব জমির'?

'জমির, মজুরির'।

'কিন্তুক খ্যাড়সমেত কেন'?

'ও তো আমার ; ফেলায়ে কী হবি'?

'গোরু কই? আচ্ছা জাকুক কবো যদি সে একটা বকনা-বাছুর দেয়'।

'তা দেয় ভালোই। এখন তো ঘর ছায়ে নিই'।

তখন কথা বলার সময় নয়। গাড়ি নামিয়ে ছিদাম ও মুঙ্‌লা ধান নামাতে শুরু করলো। ধানের আটিগুলি নামানোর সময়ে তারা যেন সেগুলিকে আলিঙ্গন করছে।

অনেকদিন পবে পাশাপাশি আহারে বসেছিলো কেষ্টদাস ও ছিদাম। পদ্ম পরিবেশন করছে। আজ অন্তত ছিদামের ছুটি।

খেতে খেতে এ কথা-সে কথা বলতে বলতে সে বললো, 'আর-এক কথা, এবাব বাঙালেক শিখায়ে দিছি ধান কাটা কাকে কয়'।

'কও কি'? কেষ্টদাস বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'হয়। সাচাই। চরণকাশির সেখের বেটার খেতে বাঙালরা কয়—বিশ আটিতে আটি নিবো। আমি কই—বাইশ আটিতে আটি। মুঙ্‌লাক নিলাম সাথে। ধান তো কাটবের বসলাম। বাঙাল তিন আটি কাটে তো আমরা কাটি দুই। মুঙ্‌লাক কলাম—মুঙ্‌লা রে, হার। খুব হার খালাম। মুঙ্‌লা কয়—কস্ কী? মুঙ্‌লা যেন্ বসে বসে লাফায়—কচ্-কচা-কচ্। চায়ে দেখি বাঙাল কাটে তিন, মুঙ্‌লা কাটে তিন। কী যেন্ হলো। কলাম—নিশ্বাস ছাড়া লাগে ছাড়বো। আঙুল নামে যায় যাক্। চোখে দেখি ধানের গোছ। চায়ে দেখি মুঙ্‌লা কাটে সোয়া তিন, বাঙালে তিন। কই—মুঙ্‌লা, ধরলাম তোক। সে কয়—আগ্‌গে শালা। কই—মুঙ্‌লা রে, শালা কয়ো না, ভাই, এই সাড়ে তিন নামালাম। সে কয়—মিতে, এই ল্যাও সাড়ে তিন। চায়ে দেখি, কনে বাঙাল? আলেফ সেখ আলে দাঁড়ায়ে দাড়ি ভাসায়ে গদ্‌গদায়ে হাসে আর কয়—সাবাসি বেটা, সাবাসি'।

ছিদাম যেন কোন স্বপ্নলোকে চলে গিয়েছিলো। গল্প বলতে বসে উত্তেজিত হয়ে সে ধান কাটার ভঙ্গি নিয়েছে। ধান কাটার কাজে বিশেষজ্ঞ বাঙালদের সে পরাজিত করেছে।

একদিন বিকেলের দিকে ছিদামকে তার রামশিঙাটা বার করে সাফসুতরো করতে দেখে পদ্ম বিস্মিত হয়ে কারণটা জিজ্ঞাসা করলো।

ছিদাম বললো, 'আজ চৈতন্যকাকার বাড়ি কীর্তন গান হবি'।

'চৈতন্যকাকা'?

ছিদাম হাসিমুখে বললো, 'সে কালের চিতিসাপ। কইছে তার বাড়ি একদিন কীর্তন গাওয়া লাগবি। মুঙলাক কইছে, সেও রাজী। চৈতন্যকাকা সকলেক কবি'।

পদ্ম ইতিউতি করে বললো, 'তাক কাকা কও, সে কি তোমাগের দেনা-দায়িক সব ছাড়ে দিলো'?

ছিদাম তার নবলব্ধ শক্তির পরিচয় পেয়ে নির্ভীক। পৃথিবীর সকলকে এমনকী শত্রুকেও সে এখন নিজের ঘরে ডাকতে পারে।

সে বেরিয়ে গেলে পদ্ম বললো, 'যেন ফাটে পড়বি'।

'তা ভালোই যদি চৈতন্য সার সঙ্গে মিলমিশ হয়'। বললো কেষ্টদাস।

'হয় হবি। আমি কৈল তাকে কোনোকালে ভালো চোখে দেখবো না। আখেরে জিতলো সে-ই, তার সুদের সুদ আর শোধ হবি নে'। পদ্ম কতকটা বিরস মুখে বললো।

কিন্তু রামচন্দ্রও এ ব্যাপারে পদ্মর সঙ্গে একমত হলো না। বরং তাব মতামত শুনে মনে হলো, ছিদামের মতের গোড়ার কথা তার মত থেকেই সংগ্রহ করা।

পদ্ম কিছুটা নালিশের ঢঙে কথাটা একদিন উত্থাপন করতেই রামচন্দ্র বললো, 'তার বাড়িতে কীর্তন হবি, তাতে দোষ কী'?

'তার চায়ে তার নামে গান বাঁধা ভালো, শাসনে থাকে'।

'সে তো মাপ চাইছে'। রামচন্দ্র বললো।

'কিন্তুক সুদ ছাড়ে নাই'।

'সুদ ছাড়বি? এ কি খয়রাতি? তা নিবো কেন্'? পবম বিস্ময়ে রামচন্দ্র প্রশ্ন করলো।

'যে জমি সে ছাড়ে দিছে তা আবার পাকে পাকে তুলে নিবে'।

'কেন্, তা হয় কেন? তার সুদ-আসল পরিশোধ করবো যদি'!

'ফসল তো উনা হবের পারে'।

'ভগোমানে তা পারে, নাইলে খেতে দু'না চাষে উনা ফসল হয় কেন্'?

এবার পদ্মকে থামতে হলো। রামচন্দ্র ছিদাম নয়। তাব পরিমিত ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে কথাগুলি পুরাকাল থেকে বারংবার প্রমাণিত হওয়া সত্য বলে বোধ হচ্ছে। অনেক খরায় পিঠ পুড়েছে, অনেক বর্ষায় শ্যাওলা পড়েছে এমন একজন চাষী যখন কথা বলে তখন সশ্রদ্ধ হয়ে শুনতে হয়।

তথাপি সে বললো, 'মানুষের বেরামপীড়া আছে। সকলে সমান খাটবের পারে না'।

'তা হয়'।

'তাইলে'?

'জোয়ার-ভাঁটা হবি, দোলনার মতো উঠবি-পড়বি'।

'লোক তো ফৌত হবেরও পারে'।

'কন্যে, চৈতন সা-ও চিরকালের পরমাই নিয়ে আসে নাই'। রামচন্দ্র খানিকটা হেসে নিয়ে বললো।

রামচন্দ্র চলে যাওয়ার পর কেষ্টদাস তার বিস্ময় বোধটাকে পুরোপুরি অনুভব করতে পারলো। শুধু যে ধান এসেছে তাই নয়, সমগ্র চাষীসমাজের কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারই ঘরে।

রাত্রিতে পদ্ম উনুন জ্বালে না। তার হাতে এখন খানিকটা অবসর, কিন্তু তার এই অবসরের মধ্যেও ছিদাম হাত পেতে আছে। পদ্ম লাটাই নিয়ে সুতলি পাকাতে বসলো। ধান ঘরে উঠেছে তবু ছিদামের বিশ্রাম নেই। ভোর রাতে উঠে এখনো সে কাজে বেরিয়ে পড়ে। মুঙলার এক প্রতিবেশীর ঘরে কাজ হচ্ছে, মুঙলা আর ছিদাম তাই নিয়ে ব্যস্ত। তার কাজ শেষ হলে ছিদামের বাড়িতে কাজ শুরু হবে। কখন এসে ছিদাম সুতলি চেয়ে বসে তাব স্থিরতা নেই।

সুতলি পাকাতে পাকাতে পদ্ম রামচন্দ্রর কথাও ভাবলো। নিজে সে রামচন্দ্র নয়, ছিদাম পর্যন্ত নয়। মেরুদণ্ড ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে তবু সংহত শক্তির প্রতীক হতে পারবে এমন গঠন ভগবান তাকে

দেননি, এই যেন অনুভব করতে লাগলো পদ্ম। নিজের যা নেই তারই আধার চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়ে পদ্ম আবার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করতে লাগলো।

তখন তার মনে পড়লো রামচন্দ্রর বাঁ দিকের চোয়ালের উপরে একটা বড়ো তিল আছে। রাতের বেলায় হারিকেনের আলোতেও সেটা চোখে পড়ে। অমন গোঁফের উপরে অমন একটা তিল না থাকলে পুরুষ কখনো এত আকর্ষণীয় হয় না।

চৈতন্য সাহার বাড়িতে কীর্তনের আসরে কথায় কথায় একটা মহোৎসবের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মহোৎসবের স্থান সম্বন্ধে এই স্থির হয়েছে যে সান্যালমশাই যদি রাজী হন তবে তাঁর বাগানের মধ্যেই হবে। কর্মকর্তাদের মধ্যে কেষ্টদাস আছে, শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে তার একটা অগ্রাধিকার লোকে পুনরাবিষ্কার করেছে।

সান্যালমশাই প্রস্তাবটায় হাসিমুখে রাজী হলেন। রামচন্দ্র, কেষ্টদাস, চৈতন্য সাহা এবং গ্রামের আরও কয়েকজন মাতব্বর-স্থানীয় ব্যক্তি গিয়েছিলো প্রস্তাবটা করতে।

ব্যবস্থাটা হবে সমবায় পদ্ধতিতে। যার যে রকম সংগতি তার উপরে তেমন আয়োজনের ভার দেওয়া হয়েছে। সংগতি সম্বন্ধে কৌতুকের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে এই যে, রামকে যদি বলা যায় পাঁচ সের চাল দেবে তুমি, সে বলছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাড়ে সাত সের নিয়ো। সান্যালমশাইকে তেল চিনি ঘি মশলা প্রভৃতি দামী জিনিসের ভার দেওয়া হয়েছে। চাষীরা নিয়েছে চালের ভার। গ্রামের ভদ্রব্যক্তিরা ডাল আনাজ প্রভৃতির জোগাড় রাখবে। চৈতন্য সাহা ভার নিয়েছে টাকাপয়সার। এটা নিয়ে একটু হাসাহাসি হয়েছিলো।

চৈতন্য সাহা এতক্ষণ দায়িত্ব বণ্টনের কথাবার্তায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিলো ; এমনকী, দায়িত্বের অবহেলা করা কারো উচিত হবে না এমন উপদেশও মাঝে মাঝে দিচ্ছিলো। নিজের দায়িত্বের কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠলো তড়াক করে : 'অন্যাই, অন্যাই। লেখাজোখা নাই এমন দায়িত্বের নিবের পারি না'।

'বেশ তো, লেখাজোখা থাক। পাঁচশ এক টাকা বরাত থাকলো'। নায়েবমশাই এসব ব্যাপারে মধ্যস্থ, সে-ই বললো।

'কী কন, এক-পঞ্চাশ? আমাকে ঘানিত ফেলে মোচড়ালিও একপঞ্চাশ বার হবি নে'। নায়েবের চারিদিকে যারা সভা করে বসেছিলো তাদের দু-একজন বললো, 'এক-পঞ্চাশ না সাজিমশাই, পাঁচ-শয় এক'।

'বুঝছি, আপনেরা আমাকে পেড়ন করবের চান। এক-পঞ্চাশ যখন ধরছেন তাই দিবো। না দিয়ে উপায় কী'?

'তা তো কথা নয়। এসব ব্যাপারে নগদ টাকার দরকার হয়। কীর্তনীয়াদের বিদায় আছে। দীন-দুঃখীদেরও কিছু কিছু দিতে হবে। আপনি যে কানে কম শোনার ভান করছেন তাতে কিছু কাজ হবে না'। বললো নায়েবমশাই।

চৈতন্য সাহা কী করতো বলা যায় না। ছিদাম ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়ালো। এই সভায় চৈতন্য সাহাকে সে-ই বাড়ি থেকে ডেকে এনেছে এবং অহেতুক যোগাযোগের মতো কীর্তনের দিনে চৈতন্যর বাড়িতে ফেলে-আসা রামশিঙাটাও সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ছিদাম উঠে দাঁড়াতেই চৈতন্য তেড়ে উঠলো, 'বোসো, বোসো, তুমি আবার ওঠো কেন। তোমার আধখানও তো আছে দেখি'।

মুঙলা শ্বশুরের সম্মুখে জড়োসড়ো হয়েছিলো, সে আরও লজ্জিত হয়ে মুখ নামালো। চৈতন্য বললো, 'গাঁ কি? না, চিকন্দি। ভাই বন্ধুসকল, দিঘায় সেইবার মোচ্ছব হইছিলো। যদি তোমাদের মচ্ছোব তার চায়ে কমা হয় এক পয়সাও পাবা না'। এ যেন অন্য কোনো চৈতন্য। কথাটা বলবার আগে চৈতন্য হাসলো এবং বলতে বলতেও হাসিমুখে চারিদিকে চাইলো।

'আর যদি না হয়'?

'হাজারে এক ধাইর্যো থাকলো'।

মচ্ছোব খেতে বসে হুংকার দেওয়ার প্রথা আছে। তেমনি হুংকার দিয়ে কেষ্টদাস বললো, 'ট্যাকা কার'? অনেকে প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে বললো, 'চৈতন সা-র'।

ছিদাম-মুঙলারা এখনও চাষী বলে পরিগণিত হয়নি। চাল জোগান দেওয়ার দুশ্চিন্তা তাদের নেই। কেষ্টদাস আর রামচন্দ্রর দেয় চাল তৈরি হচ্ছে রামচন্দ্রর বাড়িতে। পদ্ম সেখানে কেষ্টদাসের চালের ভাণ্ডারি। ছিদাম আর মুঙলা একটা কাজ বেছে নিলো। আরও চার-পাঁচজন সমবয়সীকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে গ্রামের প্রাচীনতম তিনটি আমগাছকে তাবা আক্রমণ করেছে। মহোৎসবের দিন পনেরো আগে লকড়ির কথা উঠতেই ছিদাম জবাব দিলো, 'পোস্তত'।

সান্যালমশাইয়ের বাগিচার বড়ো বড়ো আম গাছগুলির তলা থেকে আগাছার জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে। তার কোনো কোনোটির তলায় কাপড় ও খড় দিয়ে দূরাগতদের জন্য আস্তানা করা হয়েছে।

বাগিচার একপ্রান্তে কীর্তনের আসর বসেছে একটি সামিয়ানার তলায়। সামিয়ানার খুঁটিগুলিতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েক রকমের ছবি লটকানো। সামিয়ানার তলায় অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলছে। গিজ্‌তা গিজাং করে খোল বাজছে। বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করে চলেছে দলের পর দল। কীর্তনের এক-একটি পর্যায়ের শেষের দিকে এসে উদ্দাম নাচে পৃথিবী যেন টলতে থাকে।

বাগিচার শেষ সীমান্তে অন্দরের পুষ্করিণীর পাবে এসে মহোৎসবের রান্নার জোগাড় হয়েছে। সারি সারি দশ পনেরোটা উনুনে গ্রামের সবগুলি বড়ো ডেগ এনে বসানো হয়েছে। হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ঢেলে রাখা হচ্ছে যেগুলিতে সেগুলি বোধ হয় সান্যালবাড়ির জলের ট্যাঙ্ক। ভাত রাখা হচ্ছে নতুন চাটাইয়ের উপরে নতুন কাপড় পেতে, সামিয়ানার নিচে ভাতের পাহাড়। চাটাই দিয়ে একটা জায়গা ঘেরা হয়েছে, তার আড়াল থেকেও মানুষের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে, রান্নার তেলের কলকল শব্দ আসছে। সেখানে নায়েবগিন্নীর তত্ত্বাবধানে তরকারি, ভাজা ও মালপোয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে, সান্যালমশাই শেষ পর্যন্ত বলেছেন—রোগী ও শিশুর দুধ রেখে আশপাশের দশ গাঁয়ে যত দুধ, সব দুধই আসবে মহোৎসবে, দিঘায় বা সদরে যাবে না। দামের জন্য চিন্তা নেই। অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা বলাবলি করছে—সকলেই পায়েস পাবে, কেউ বাদ যাবে না।

কথা ছিলো, দুপুর হতে হতেই আহারপর্ব শুরু হবে কিন্তু বিলের পার থেকে যাদের আসার কথা তারা এসে পৌঁছয়নি, পদ্মপাতাও আসেনি। অবশেষে তারা এলো। গোরুগাড়িতে বোঝাই হয়ে আসছে পদ্মপাতা, আর তার আগে আগে বিলের দল আসছে কীর্তন করতে করতে। হৈ হৈ পড়ে গেলো। কথা ছিলো, একবারে একশ জন করে বসবে। কিন্তু গাড়ি থেকে পদ্মপাতা তুলে নিয়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে বাগিচার একটা চওড়া রাস্তার দুপাশে এক বালখিল্যের দল আসন পেতে বসলো। সেই দলকে যে থামাতে গিয়েছিলো, পদ্মপাতা থেকে ঝরা জলে পিছল মাটিতে সে গড়াগড়ি দিয়ে উঠলো, কিন্তু বালখিল্যের দলকে রোধ করতে পারলো না। তখন ছিদাম আর মুঙলার দল হুংকার দিতে দিতে বালতি-হাতে পরিবেশন করতে এগিয়ে এলো।

নিমন্ত্রণ ভোজ প্রভৃতির তুলনা দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝা যাবে না, এ আহার নয়। একটি উদ্দাম জীবনভোগ বললে কাছাকাছি বলা হয়। ডাল ভাত দিতে দিতে ছিদাম-মুঙলাদের গাল বেয়ে যখন ঘাম পড়ছে তখন বেরুলো তরকারির ঘর থেকে লোক, তাদের পেছনে দিগন্তে রামচন্দ্রর খবরদারিতে মালপোয়া আর পায়েসের দল।

ওদিকে কীর্তনও উদ্বেল হয়ে উঠলো। কেষ্টদাসের গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মালা, সে নবাগত কীর্তনের দলগুলিকে বিষ্ণুপূজার নির্মাল্য বিতরণ করছে।

দুপুর একটু গড়িয়ে যেতে লোকারণ্যে বাগিচার গাছগুলির কাণ্ড অদৃশ্য হয়ে গেলো। সহস্র কণ্ঠে

উৎসারিত নামকীর্তন কালবৈশাখীর গর্জনকে ডুবিয়ে দেওয়ার পক্ষেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে উঠলো। তবু নতুন নতুন লোক আসছে। কণ্ঠের বালাই নেই, সুর-তান-লয় এই প্রবল স্বননে অর্থহীন। যেন কোনো এক নতুন জগৎ থেকে নিশ্বাস নেওয়ার নতুন বাতাস এসেছে, প্রাণপণে সে দুর্লভ্যকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে প্রত্যেকে।

ভোজের মহল্লাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস সমুদ্রতরঙ্গের মতো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রত্যেকটি ভোজ্যদ্রব্য যেন এক-একটি রাজ্যলাভ। পরিবেশকরা হুংকার দিচ্ছে পরিবেশন করতে করতে. যারা খেতে বসেছে তারা জ'কার দিয়ে উঠছে।

বিকেলের দিকে সান্যালমশাই এলেন। রামচন্দ্র তাঁকে দেখতে পেয়ে পরিবেশনের মাঝখানে থেমে গর্জন করে উঠলো, 'রাজো রাজোধিরাজ'। সহস্রাধিক কণ্ঠে বজ্রের মতো ফেটে পড়লো, 'জয়'!

সান্যালমশাই ফিরে দাঁড়ালেন হাসিমুখে, তাঁর চোখের কোনায় কোনায় জল এসে গেলো। কিন্তু কীর্তনের আসরে পৌঁছুতে বেগ পেতে হলো তাঁকে। চৈতন্য সাহা পথ করে দেওয়ার চেষ্টা করছিলো, কেষ্টদাসও তাঁকে দেখতে পেয়ে যত্ন-করে-রাখা নির্মাল্যের মালাগাছি পৌঁছে দিতে গেলো। কিন্তু চৈতন্য সাহা জনসমুদ্রে তলিয়ে গেলো, কেষ্টদাসও তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারলো না, বাইরের চাপে আবার কীর্তনের আসরেই পৌঁছে গেলো।

মহোৎসবের স্বরূপটা রূপুর জানা ছিলো না। তার পড়ার ঘরের ব্যালকনি থেকে দেখা না গেলেও পুরনো মহলের আলসে-দেওয়া ছাদে দাঁড়িয়ে বাগানটা দেখা যায়। কোলাহলের দিকটা আন্দাজ করে সে ছাদে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলো এবং মনসা ও সুমিতিকে ডেকে এনেছিলো। সুমিতিও এর আগে এ ব্যাপার কোনোদিন দ্যাখেনি।

মনসা বললো, 'ভালো কথায় একে মহোৎসব বলার চেষ্টা করতে পারো বটে, এর প্রকৃত নাম কিন্তু মচ্ছোব। লক্ষ্য করে দ্যাখো এখানে এদের অস্পৃশ্যতা বলে কিছু নেই। শ্রীক্ষেত্রে নাকি সব জাত এক হয়ে যায় ; এখানে একটা সাময়িক শ্রীক্ষেত্র তৈরি হয়েছে'।

রূপু বললো, 'দিদি, এদের দেখে মনে হচ্ছে, রোগ-তাপ অভাব-অভিযোগ কারো কিছু নেই'।

'তাই হচ্ছে। তুই এখন বড়ো হয়েছিস, নিচে গিয়ে দেখে আয়। দাদা থাকলে দেখতিস পরিবেশনে লেগে গেছেন'।

রূপু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

মনসা বললো, 'এ যে দেখছি, জ্যাঠামশাই! ওই দ্যাখো বউদি, যাবে নাকি'?

কিন্তু মনসার প্রস্তাবটা শেষ হবার আগেই জনতার জয়নাদে চতুর্দিক কাঁপতে লাগলো।

সুমিতি ভীতকণ্ঠে বললো, 'কী হলো, মনসা'?

মনসা বললো, 'হুংকার দিচ্ছে'।

দুজনে নীরবে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা অনুভব করতে লাগলো।

সুমিতি বললো, 'মণি, এমন উদ্দাম সংগঠন, সমবায় কাজের এমন প্রয়াস যদি ঠিক পথে চালিত হতো, কত কী না সম্ভব ছিলো এদের পক্ষে'!

'তুমি কি রাজনীতির কথা বলছো'?

'রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি যা-ই বলো'।

'কিন্তু এই-বা মন্দ পথ কী'? সহসা মনসার কণ্ঠস্বর গভীর হলো। সে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার চাইতে বেশি জানো, বউদি, এমন একটি কীর্তনমুখর জনতার চাপে পড়ে চাঁদকাজি তার অত্যাচারের পথ ছেড়ে এসেছিলো। আমি কিছু জানি না, মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনেছি সে-কালটার গর্ভে নিহিত

ছিলো গণসংযোগের বীজ'। তারপরও মনসা যা বলে গেলো তার মর্ম উদ্ধার করলে এইরকম শোনায় : বাংলার সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের আবহাওয়ায় পড়ে যুদ্ধ-শিশুদের মতো জাতিগোত্রহীন হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিত্বশালী কেউ যদি শিবের উপাসনা করতে চেয়েছে তার মধুকর গেছে তলিয়ে, লোহার বাসরে কালনাগ প্রবেশ করেছে। বিশ্বজননীর রূপ কঙ্কালময়ী। ভালো না বাসো, ভক্তি না করো, ভয়ে মাথা লুটিয়ে রাখো, এই যেন সে-কালের দাবি। কিন্তু মানুষ কখনো অন্য কারো মনের খাঁচায় দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজমানসের অতি ধীর পরিবর্তন যা অনন্তশয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্তনের মতো অদৃশ্য কিন্তু অনিবার্য, তারই লক্ষণ দেখা দিতে লাগলো। নির্ভীক সাধারণ মানুষের ভয়ের মোহ দূর করার জন্য বহু চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতে ও প্রতিযোগিতায় সৃষ্ট একটি প্রতিযোগিতার-অতীত অসাধারণ মানসের প্রয়োজন ছিলো। শ্রীচৈতন্য এলেন।

সুমিতি চুপ করে ছিলো। তার নীরবতায় লজ্জিত হয়ে মনসা থেমে গেলো। তার চোখ দুটি একটা নীরব হাসিতে টলটল করে উঠলো, সে বললো, 'খুব বকিয়ে নিলে, বউদি'।

সুমিতি বললো, 'কিন্তু সে যুগের অত আয়োজন যদি অন্য পথে যেতো বাঙালির রাজনৈতিক জীবন হয়তো-বা মার খেতো না'।

মনসা বললো, 'বউদি, সেযুগে অন্য কিছু একটা ছিলো। দেখতে পাচ্ছো না, যদুরা জালালুদ্দিনেব রূপ নিচ্ছে! নিমাই চৈতন্য থেকে গেলো, অন্যদিকে হুসেন শার সৃষ্টি হলো, সেই কি ভালো নয়! এবং এটাই একটা প্রমাণ যেন হুসেন শা কিছুটা-বা প্রজা-নির্বাচিত। তোমার কথায় এখন মনে হচ্ছে, হুসেন শা যদি তখনকার বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের তাগিদের সঙ্গে পা না-মিলিয়ে চলতো, যেমন হয়েছিলো তা না-হয়ে, হয়তো-বা কৃষ্ণের কংসনিসূদন মূর্তি প্রকাশ পেতো'।

এরপরে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তর্কের মতো শোনাবে মনে করে সুমিতি নীরব হয়ে রইলো, কিন্তু চিন্তা করলো—পাঁচশ বছর আগে জনমানসের আত্মপ্রকাশের যা অবলম্বন ছিলো আজও সেটাকেই অনুরূপভাবে গ্রহণ করা যায় কিনা! এই আজগুবির দেশ ভারতবর্ষে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে দেবতা রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মনসা যেমন প্রবঞ্চিত, সেটা কি তেমন আর একটি প্রবঞ্চনাই মাত্র!

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনসার চোখেমুখে তার সদাচঞ্চল প্রাণের ছায়া পড়লো ; সে বললো, 'ভাই বউদি, ওদের তৈরি মালপোয়া খেতে খুব লোভ হচ্ছে যে'।

'সে কী! এ সময়ে এমন লোভ তো ভালো নয়। কাউকে পাঠিয়ে দেবো'?

মনসা যেন প্রস্তাবটার সবদিকে চিন্তা করলো এমন ভান করে সে বললো, 'না, ভাই। তাঁরা আবার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ, এসব বারোমিশেলি বারোয়ারি ব্যাপার পছন্দ করেন না। তার চাইতে রাযের জঙ্গলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করো। আর তা যদি তোমার পছন্দ না হয় বিলমহলে চলো'।

'একটা শর্ত আছে, আমার ননদাইকে যদি আনিয়ে নাও'।

'সে ভদ্রলোক শিকারী হিসেবে ভালো বটে, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ি আসতে পারছেন না'।

'তুমি একজন লোক ঠিক করে দিয়ো, আমন্ত্রণ নিয়ে যাবে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করো। এরা করে মহোৎসব, যার প্রাণ হচ্ছে নামকীর্তন, আর তোমাদের বেলায় প্রাণীহত্যা আর জলক্রীড়া'।

'কী সর্বনাশ'! কপট ত্রাসে বললো মনসা, 'এই পাদরির রোগ হলো তোমার, এ যে বড্ডো ছোঁয়াচে'।

সুমিতি গাম্ভীর্য রাখতে পারলো না। সে বললো, 'তোমার চড়ুইভাতির অনুপ্রেরণা যে মালপোর সুপ্ত লোভ, এ জানতে পারলে কি তোমার শাক্ত পুরুষটি রাজী হবেন'?

'তা ওঁরা হন। সুরা এবং অন্যান্য কী কী ব্যাপারে নাম পালটে দিলে ওঁদের আপত্তি থাকে না'।

খানিকটা হাসাহাসির পরে মনসা বিদায় নিলো।

সে চলে গেলে সুমিতি চৈতন্যের সময়ের আরও কিছু খবর নেবার জন্য সদানন্দর কাছে বই চেয়ে

পাঠালো। একসময়ে সে চিন্তা করলো, চৈতন্যের পরেও দেখা গেছে, যে আবহাওয়া শিবাজীকে সৃষ্টি করে, সেটাই আবার রামদাস স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে। রাজা রামমোহন কেন মোহনদাস গান্ধি হলেন না, এটা শুধু কালকে বিশ্লেষণ করলেই কি জানা যাবে?

কিন্তু জীবন্ত মানুষের দাবি ঐতিহাসিক প্রাণীদের চাইতে বলশালী। সুমিতি সেইদিনই অন্য আর-এক সময়ে চিন্তা করলো মনসার কথা। সে এই প্রাসাদের বহু আশ্রিতের ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, এখন সে শীর্ষস্থানীয়দের একজন, অনসূয়ার কন্যার অধিক। সান্যালমশাইয়ের পুঁথিঘর এবং সদানন্দ মাস্টারের সঞ্চিত জ্ঞান থেকে মনসা নিজের খেয়ালখুশি মতো যা আহরণ করেছে তার পরিমাণ কম নয়। মনসার এই পরিবর্তনে তার মনীষা কতটা সাহায্য করেছে তা ভেবে দেখার মতো।

বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, তার জীবনের গতি কোথাও আবর্তসংকুল হয়ে ওঠেনি, যদিও তেমনটি ঘটবার যোগ ছিলো। তার নিজের ভাষায় তার জীবনে একসময়ে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিলো।

কী পেলো মনসা এই জীবনে—পাতিব্রত্য? তার মতো একটি রমণীর হৃদয়ের একটি কোণ একটি সাধারণ পুরুষের পক্ষে নিখিলভুবন। আত্মত্যাগের মহিমা? দূর করো। ঋণাত্মক কিছু নিয়ে যে নিজেকে ধন্য মনে করে তার চোখ দুটিতে অত বিদ্যুজ্জ্বালা থাকে না।

তখন সুমিতির মনে হলো গড় শ্রীখণ্ডর এই পরিবেশ, যাতে পঞ্চদশ শতক ক্ষণকালের জন্যও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে যে-কোনো একটি সাধারণ দিনে, এর সঙ্গে মনসার যেন কোথায় একটি ঐক্য আছে।

কিংবা, সুমিতি ভাবলো, গগ্যাঁর তুলনায় কি মনসার নিজের জীবনও বোঝা যায়! সে মেয়েদের শরীর আর মনের বিপ্লবের কথা বলেছিলো বটে। শহর থেকে দূরে বলে যাকে অন্ধকার মনে হয় তেমন এক গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে কি সে সৃষ্টিশীল কিছু করছে গগ্যাঁর মতো! তা হলে তো তার জীবনটাকেই একটা কাব্য বলতে হয়, যে কাব্য দুঃখ, সুখ, ভালোবাসা, অপ্রেমের দ্বন্দ্বে সংঘাতে তারই রচনা।

১৯

সুরতুন পথের ধুলোয় বসে মুঠি মুঠি ধুলো তুলে মাথায় দেয়নি, শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ফেলে তাকে যোগিনী সাজতেও হয়নি। মাধাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসার একমাস কালের মধ্যে স্নানের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে, মাটির আরও কাছাকাছি সুরতুন আর-দশজন ভূমিজার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

এমন একসময় ছিলো যখন বর্তমানের ক্ষুধার দংশন এত সন্নিকট ও প্রবল ছিলো যে, ভবিষ্যতের চিন্তা করা একরকমের অর্থহীন কল্পনাবিলাস বলে বোধ হতো। তার সেসব দিনের তুলনায় তার চালের কারবারের দিনকে সুদিনই বলতে হবে। এখন সে ভাবতে শিখেছে। কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধাই-ত্রাসটা কমে গেলে তার মনে প্রশ্ন উঠলো, এরপরে সে কী করবে। আউস উঠেছে। ধানভানার কাজে সে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু চিকন্দির চাষীরা আগের তুলনায় হিসেবী বেশি হয়েছে, তাদের আহ্লাদী বউ-ঝিরাও এবার নিজেরাই ধান ভানছে। এর জন্য চৈতন্য সাহার ঋণের বোঝা কতখানি দায়ী তা অবশ্য সুরতুনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

তার ফলে তার সঞ্চিত টাকায় হাত পড়েছে, এবং এ ব্যাপারটাই তাকে অস্থির করে তুললো আবার। দু'একদিন গাঁইগুঁই করে একদিন সে ফতেমাকে স্পষ্ট করে বলে ফেললো, 'ভাবি, তুমি যেন, গাছের মতো শিকড় ছাড়ে দিছো ; মোকাম কাক কয় জানো? গাড়িতে আবার কোনোদিন চড়বা কি চড়বা না'?

ফতেমা প্রস্তাবটির সব দিকে চিন্তা করলো কিছু সময়। কথাটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে সে বললো, 'ভাবে দেখি একটুক'।

ভাবনার কী আছে? এই ভাবতে বসে সুরতুনের মনে পড়লো প্রাচীন দিনের কথা। এবং একথাও

অস্বীকার করা যায় না ফতেমার মনেও অনুরূপ চিত্রই ভেসে উঠেছিলো। দুজনে দু জায়গায় বসে চিন্তা করছে কিন্তু ঠিক যেন কথোপকথনের সাহায্যে একে অন্যের বর্ণনাকে পরিস্ফুট করে দিচ্ছে।

ফতেমা ভাবলো, দুর্ভিক্ষ হওয়ার বছরেই ধান কুড়োনোর কাজ শেষ হলে একদিন ফতেমা শ্বশুরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রজব আলি বলে—কী কও আম্মা? —না, আমাব ধানটুক্ বেচে দেন।—তোমার ধান! সে কয়টুক্? —সোয়া মন হবি। —ই-রে আম্মা, কস কী? মাপলি কিবা করে? —ধামায় কাঠায়। —উ রে আম্মা, এ যে আধ মনে সোয়া মন ফলাইছিস্।

সুরতুনও যেন ঘটনাটা চোখের সম্মুখে দেখতে পেলো।

মজুরিতে পাওয়া ধান, আর নিজের জমির ধানে রজব আলিব আঙিনার অনেকাংশ ভরে গেছে। বলদ দুটির মুখে ঠুলি পরিয়ে ইয়াকুব আঙিনায় বিছানো ধানের আটিগুলিব উপরে টালিয়ে নিয়ে বেডাচ্ছে। পাঁচু আর বেল্লাল দুজনে এসেছে। রজব আলি তাদের সঙ্গে বসে তামাক খাচ্ছে।

পাঁচু সান্দার বললো—তাইলে আমাক কাল দিতেছো বলদ?

—তা দিবো, কিন্তু বলদেক খাওয়াবো কি?

—কেন, খৈল দিবো, মাড় দিবো ভাতের।

—তাতে হবি নে। গুড়ে জ্বাল দিয়ে সবাপিঠা খাওয়াবা নাকি কও।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাও খাওয়াবো। রজবভাই যেন্ চ্যাঙড়া হতিছো দিন দিন। পাঁচু হাসলো।

—আসো না, চালা-ডুগডুগ্ খেলি, দেখি কে পাবে।

তাব পবে বেল্লালের পালা। সেও বলদ চায়। সে বললো—তোমার বলদেক চান কবায়ে শিঙে তেল মাখায়ে দিযে যাবঅনে, সকালে নিয়ে বেলা ডোবাব সাথে সাথে—

—হবি নে, হবি নে।

—কী করতি হবি কও?

—বলদের বদ্‌লা বিবিসাহেবাক যদি একবেলার জন্যি ধার দেও চিড়া কোটার কামে, তবে।

পাঁচু বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো—ইনসাল্লা!

বেল্লাল হঠবার পাত্র নয়, সে বললো—কিন্তুক সে অখুশি হয়ে যদি বাড়ি যায় খেসারত দিবের হবি কৈল।

—কেন্? তোমরাই কও রজব আলি চ্যাঙ্ড়া হতিছে।

তিনজনে ডাক ছেড়ে হেসে উঠলো।

ফতেমার মনে পড়লো—সে তার শোবার ঘবের জানলায় মেহেদিবাঙানো আঙুলগুলো বেখেছিলো ইয়াকুবের নজরের আওতায়। বলদজোড়া থামিয়ে ইযাকুব বাড়ির ভিতরে গিয়েছিলো পান খেতে। যখন সে পান নিচ্ছে তখন সে এবং ফতেমা দুজনেই দেখতে পেয়েছিলো খড়ের নিচে নিচে ধানের যে স্তর জমেছে রজব আলি হাতে তুলে তা দেখছে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে, যেন এক এক জায়গায় এক এক রকম ধান পাওয়া যাবে। কু-কু-কুক্-কুরা-কুর-কু-কু—এরকম একটা শব্দও আসছে কোথা থেকে। অবাক লাগলো ইয়াকুবের। শব্দটাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে ফতেমাও দেখতে পেয়েছিলো—রজব আলির ঘোরাটা যেন শুধুমাত্র ঘোরা নয়, নিচু হয়ে ধানটা রেখে যখন সে দাঁড়াচ্ছে দ্বিতীয় মুঠি তুলে নেওয়ার আগে তখন বাঁ পাটি ডান পায়ের আড়াআড়ি পড়ছে। কুক্-কুরা-কুর শব্দটাও উঠছে তখন। নাচে নাকি বা জান? এখন ফতেমার মনে হলো—হায়, হায়, এ কী হলো? কান্নাও আসে না, দম ফেলাতেও যে পারি না।

সুরতুন তার চিন্তার জঞ্জাল থেকে মুক্ত হওয়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললো—ওই দ্যাখো, রজব আলি বুড়া হইছে কিনা দ্যাখো! এক ডালা শাদা চুল মাথায় যে নিষ্কর্মার মতো মাটিতে আঁকিবুকি কাটছে কাঠি দিয়ে সে-ই যদি রজব আলি হয় তবে ধানে তোমার কি বিশ্বাস?

অবশ্য অতীতের স্মৃতিই শুধু সব সময়ে দিক্‌নির্ণয়ে সাহায্য করে না। যদি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য সম্পদ

থাকে অতীতের বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে এমন কিছুই চোখে পড়ছে না যার উপরে নির্ভর করা যায়। খুব খোঁজ-খবর করলে, একবারের জায়গায় বিশবার হাঁটলে চাল তৈরি করে দিয়ে খুদে-চালে মিশিয়ে একজনের পেট চলে, কিন্তু এই ধানেও দু মাস পরে টান ধরবে। তখনকার ভাবনাও এখনই ভাবতে হয়। তাছাড়া এখন বোধ হয় সে একদিনও আর উপবাস করতে পারবে না, যদিও এর আগে বহু দিনরাত্রি উপবাসে কেটেছে যখন সে মোকামের পথ চেনেনি।

চিকন্দির পথ ধরে চলতে চলতে আর একদিন সে চিন্তা করলো—এমন কষ্টের যার জীবন তার মাধাই এমন করে কেন?

রৌদ্রে ও ক্ষুধায় খিন্ন হয়ে সে মনস্থির করার চেষ্টা করতে লাগলো, প্রথম যখন এবার দেখা হবে, মাধাইয়ের কাছে কেঁদে-কেটে তার পা জড়িয়ে ধরে সে বলবে—তুমি অমন করো কেন, আগে যেমন ছিলে আবার তেমন হও।

কিন্তু সাহস জিনিসটার স্বরূপ এই, চিন্তাভাবনা করতে গেলে যুক্তিগুলির মূল্যহীনতাই বেশি করে চোখে পড়ে।

সে যা-ই হোক, চিকন্দির মহোৎসবে অন্য অনেকের মতো সুরতুনও গিয়েছিলো। বাগিচার একান্তে সান্দাররা বসেছিলো। মালপোয়ার জিম্মাদার রামচন্দ্র তাদের দিকে এসে রজব আলিকে দেখতে পেয়ে বললো, 'কেন্, আন্ধারে ও কে? রজবভাই যেন্'? রজব আলি কী একটা বলেছিলো, তৎক্ষণে রামচন্দ্র হাঁকাহাকি শুরু করেছে, 'গরম ভাত দেও, ভাজি আন, ওরে ছিদাম ডাল আনিস বেশি করে'।

সান্দারদের আকণ্ঠর উপরে আকণ্ঠ খাওয়া হলো। রামচন্দ্র মালপোয়ার তল্পিবাহকদের হুকুম দিলো, 'এখন দিন ফুরায়ে আসতেছে, ডবল ডবল চালাও মালপুয়া আর পায়েস'।

আহার শেষ হলে সুরতুন পুষ্করিণীতে হাত্মুখ ধুতে গিয়ে সান্দারপাড়ার অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিলো। একা একা ফিরছিলো সে। কেষ্টদাসের বাড়ির কাছে এসে সে সম্মুখের দলটির মধ্যে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কাছের লোক চেনা যায় না, আর তাছাড়া অন্ধকারে যেটুকু ঠাহর হলো তার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের মিল নেই।

পরদিন চিকন্দিতে কাজ ছিলো বলেও বটে, পরিচিত কণ্ঠস্বরটির অনুসন্ধানের জন্যও বটে, সুরতুন অত্যন্ত সকালে চিকন্দির পথ ধরেছিলো।

সুরতুন ঠিকই আন্দাজ করেছিলো, লোকটি টেপির মা-ই বটে। কিন্তু দিনের আলোয় এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার খট্কা লাগছে। টেপির মা ঠোঁট টিপে না হাসলে বোধ হয় সে সাহস করে ডাকতেও পারতো না। টেপির মায়ের পরনে গেরুয়া রঙের ধুতি, তার সেই কদম ফুলের মতো করে ছাঁটা চুলগুলি যাতে সে পুরুষদের মতো করে গামছা জড়াতো সেগুলি বেড়ে বেড়ে কাঁধের উপরে থলো-থলো হয়ে লুটোচ্ছে। নাকের উপরে রসকলি। সুরতুন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। শুধু বেশভূষায় নয়, টেপির মা দেহের দিকেও যেন নারীত্বের পানে কয়েক পা ফিরে এসেছে।

টেপির মা বললো, 'এই গাঁয়ে থাকিস? দিঘায় আসছিলাম, সেখানে শুনলাম মচ্ছোবের কথা'।

'একাই আলে'?

'না। গোঁসাইও আইছে'।

'গোঁসাই'?

'টেপির ধম্মবাপ'।

এবার মনে পড়লো সুরতুনের, কথায় কথায় টেপি এমনি একটা সংবাদ দিয়েছিলো বটে। ওরা কথা বলতে বলতে টেপির ধর্মপিতা বেরিয়ে এলো। পিঠের উপরে মাঝারি গোছের কন্থা-ঝোলা, হাতে গোপীযন্ত্র, পায়ে পিতলের ঘুঙুর। অত্যন্ত কৌতূহলে যেটুকু সাহস হয় তারই সাহায্যে সুরতুন গোঁসাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। একমুখ কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি, সেগুলি চিবুকের নিচে একটা

গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে দুলছে। মাথার চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা। মুখের দৃশ্যমান অংশ বসন্তের চিহ্নলাঞ্ছিত। সে যখন কথা বললো, দেখা গেলো তার মুখের সম্মুখে একটা দাঁত নেই।

গোঁসাই এলে টেঁপির মা বললো, 'ভালোই হলো দেখা হলো। আমরা এখন আবার হাঁটতে লাগবো। সানিকদিয়ার যাবো'।

'দিঘায় ফিরবা না'?

'কাল এমন বেলায়'।

'বুধেডাঙা হয়ে যাবা? তাইলে তাই যায়ো, ফতেমার সঙ্গেও দেখা হবি'।

সেদিনটার প্রায় সমস্তক্ষণই সুরতুন চিন্তা করলো। সন্ধ্যার পর ফতেমার সঙ্গে টেঁপিকে নিয়ে আলোচনা করলো। ফতেমাও বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে শুনলো। তারপর তারা দুজনে মিলে টেঁপির মায়ের প্রকৃত বয়স কত হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করলো।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অবশেষে সুরতুন বললো, 'কেন্ ভাবি—'

'কী কস'?

'চলো না কেন্, টেঁপির মায়ের সঙ্গে আবার দিঘায় যাই'।

'দিঘার পথ কি তোমার অজানা'?

'গাঁয়ে থাকেই বা কী করি'?

'যাও তাইলে'।

পরদিন সকালে টেঁপির মা তার গোঁসাইকে নিয়ে বুধেডাঙার পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, সুরতুন দেখতে পেয়ে তাদের ডেকে আনলো ফতেমার বাড়িতে। সেখানে পারস্পরিক কুশল প্রশ্নের ছলে কিছুটা কথাবার্তা হলো। একসময়ে ফতেমা হেসে হেসে গোঁসাইয়ের কাছে গান শুনতে চাইলো। একতারা বাজিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ঊর্ধ্বাঙ্গ গতিশীল করে গোঁসাই গান শোনালো। দেহতত্ত্বের গান, অর্থ সবটুকু বোঝা যায় না, কিন্তু শুনলে লজ্জার মতো বোধ হয়।

ফতেমার কাছে বিদায় নিয়ে টেঁপির মা যখন দিঘায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলো সুরতুন বললো, 'দাঁড়াও, আমি আসি'।

গোঁসাই আগে আগে, পিছনে পাশাপাশি টেঁপির মা আর সুরতুন। মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে প্রথম ধাক্কাটায় টেঁপির মায়ের পিছনে আত্মগোপন করা যাবে এ সময়ে এই কি ভেবেছিলো সুরতুন?

খানিকটা চলার পর টেঁপির মা জিজ্ঞাসা করলো, 'সুরো, আমার গোঁসাইয়েক দেখলা, পছন্দ হয়'?

'ভালোই হইছে, তুমি কি আগেই চিনতা ওনাক'?

'না। ও তো মোকামের লোক। চালের মোকামে এক আখড়ায় থাকতো। একদিন পথে আলাপ হইছিলো। তারপর মোকামে একদিন জ্বর হইছিলো আমার। জ্বর নিয়ে গাছতলায় শুয়ে আছি, দেখি ও যায় পথ দিয়ে। কলাম—বাবাজি, শোনেন একটু, দিঘার গাড়িতে বসায়ে দিবেন'?

'তারপরই তোমার হলো'?

'তাতে কি হয়। তারপর যখন দেখা হলো, দেখা করে হবি ঠিকঠাক করে রাখছিলাম। ততদিনে নিজেও ঠিক হলাম। গিরিমাটি কিনছিলাম, কাপড় রাঙালাম। চুল কাটলাম না, তেল দিয়ে জল দিয়ে আট পয়সার এক কাঁকই কিনে পাট পাট করলাম। তারপর দেখা হলো'।

দিঘার কাছাকাছি এসে সুরতুন ভাবলো মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা না হয় এমনি একটা পথ দিয়ে চলা উচিত, কিন্তু কীভাবে প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যায় ভেবে পেলো না। টেঁপির মা বললো, 'চলো, সুরো, টেঁপিক দেখে যাই'।

এটা এমন এক পল্লী যেখানে অন্য শ্রেণীর মেয়েরা আসে না। গেরুয়াপরা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখে মেয়েরা বেরিয়ে এসে ভিক্ষাও দিতে চাইলো। তখন টেঁপির মা টেঁপির কথা জিজ্ঞাসা করলো। টেঁপির

কথা শুনে টেপির পরিচিত দু'একজন আগ্রহ করে কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন বলেই ফেললো, 'তাইলে তোমরা টেপির খোঁজে আসছো'?

'সে কনে গেছে, এখানেই তো থাকতো'।

'পালাইছে'।

'সে কী! কনে গেলো'?

কোথায় গেলো পালিয়ে এ যদি বলাই যাবে তবে আর পালানো হলো কী।

মেয়ের খবর না পেয়ে টেপির মায়ের মনটা ভার হয়েছিলো, সে আবার হাঁটতে লাগলো। কিন্তু পল্লীর একটা অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়ে দোকানে যাওয়ার ছল করে এদের পিছন পিছন আসছিলো। মোড়ের দোকানটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মেয়েটি টেপির মাকে ডাকলো।

'শোনো'!

'কিছু বলবা'?

মেয়েটি চারিদিকে চেয়ে দেখে ফিসফিস করে বললো, 'সেই চেকারবাবুই টেপিক গাড়িতে উঠায়ে নিছে'।

'সেই চেকারবাবুর সঙ্গেই গিছে তাইলে'?

'মনে কয়। সেই চেকারবাবুর বউ নাকি মরছে। এক ছাওয়াল আছে, তাক মানুষ করতে হবি'।

'এত জানো তবে আগে কও নাই কেন্'?

'টেপি কয়ে গেছে, মাকে কয়ো, আর কাউকে কয়ো না। তাই দেখলাম তোমারা তার আপন লোক কিনা'।

টেপিদের পল্লী থেকে বেরিয়ে টেপির মা বললো, 'সুরো, তুমি কোথাও যাবা'?

'কনে যাই'? মাধাই-পূর্ণ দিঘায় নিঃসঙ্গ হবার ভয়ে সুরতুনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেলো।

'আজই মোকামে না যায়ে চলো না কেন্ আমাদের গাঁয়ে। একসাথে খাওয়াদাওয়া করবঅনে। রাত কাটায়ে তারপর যা করবের হয় কোরো'।

নিমন্ত্রণ পেয়ে সুরতুন বেঁচে গেলো।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচুনিচু পথে অনেকটা সময় হেঁটে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন টেপির মায়ের বাড়িতে অবশেষে পৌঁছনো যায়। একটা ছোটো শোবার ঘর, ততোধিক ছোটো একটা রান্নাঘর নিয়ে বাড়ি। তার বেশিকিছু অন্ধকারে ঠাহর হলো না।

ঘরে ঢুকে গোঁসাই দেশলাই জ্বাললো, একটা কুপি ধরিয়ে নিলো। এমন হয় যে, দিনের পর দিন দুজনের একজনও থাকে না বাড়িতে। কাছেই ছ্যাঁচড়া চোরের চোখে পড়তে পারে এমন কোনো সংসার করার উপাদান ঘরে নেই। শোবার ঘরের দুপাশে দুটি বাঁশের মাচা। বাঁশের খুঁটির গায়ে ঝোলা টাঙিয়ে রাখার আড়। সেই আড়ের উপরে দুখানা চট ঝুলছে। ঘরে ঢুকে টেপির মা চট টেনে নিয়ে দুটি মাচাতেই পেতে দিলো। সুরতুনকে বসতে বলে সে গোঁসাইকে বললো, 'তুমি ঝোলা থিকে কাঁথা কাপড় সব বার করে বিছানা পাতো দুইখান, আমি জল নিয়ে আসি'।

গোঁসাই এতক্ষণ কথা বলেনি, জল আনার প্রস্তাবে বললো, 'আমি থাকতি তুমি এই আন্ধারে জল আনতে যাবা, লক্ষ্মী'?

'যাবো আর আসবো। এই আন্ধারে তোমাকে একলা ছাড়ে দিবের পারি'?

গোঁসাই আর পীড়াপীড়ি করলো না। ঝোলা থেকে দু-একখানা কাঁথা বার করে সে মাচার উপরে বিছানো চট দুখানা যতদূর সম্ভব ঢেকে দিলো।

জল নিয়ে ফিরে এসে টেপির মা বললো, 'আমার দুইবার রাঁধা লাগবি, ততক্ষণ তোমরা গান করো, গল্প করো'।

গোঁসাইয়ের ঝোলা থেকে বেরুলো দুটি মালসা, একটা ছোটো হাতা, চাল, ডালেব একটি মোড়ক, কয়েকটি আলু-বেগুন, একটা তেলের শিশি, তরকারি কোটার ছুরি—অর্থাৎ সংসার বলতে যত কিছু সব।

সুরতুন হেসে বললো, 'দুনিয়া নিয়ে বেড়ান দেখি'।

এরকম সংসার করায় টেপির মা যে অত্যন্ত পটু তো বোঝা গেলো। রান্নাঘরে প্রদীপের মৃদু আলোয় রান্নাব জোগাড় করে নিয়ে সে ফিরে এলো। বললো, 'গোঁসাই, একটু কষ্ট দিবো যে। কয়খানা কলাপাতা কাটতে হবি। চলো যাই'।

'তুমি যাবা? সেই জঙ্গলে তোমাকে আমি যাতে দিতে পারবো না'। এবার সে একটু দৃঢ়স্বরে বললো।

লোকটি ঘোর অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো। সেই নিঃশব্দ গভীর অন্ধকারে পৃথিবীর সবই প্রায় অবলুপ্ত, তার অন্যান্য অধিবাসীরা এখানে স্মৃতিমাত্র। জোনাকির ঝাঁকগুলি কোনো অজ্ঞাত কারণে মাটির দিকে নামছে, আবার উপরে উঠে যাচ্ছে।

গোঁসাই পাতা নিয়ে ফিরে এলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরতুন বললো, 'সাপখোপের ভয় নাই আপনার'?

'সব সাপ কামড়ায় না , আর কালসাপের কথা—সে লোহার বাসরেও কামড়ায়'। এরই মধ্যে একসময়ে টেপির মা এসে বললো, 'একটুক দেরি আছে পাকের, ততক্ষণে গোঁসাই একটা গান ধরো। গান শুনতে শুনতে কাম করি'।

কিন্তু সুরতুনের অন্যরকম ইচ্ছা ছিলো, সে বললো, 'গোঁসাই, আপনেরা যখন দুইজনেই চলে যান তখন এ বাড়িঘর দেখে কে'?

'ভগোমান। কিন্তু দেখার কী বা থাকে'?

'তা ঠিক। যা আছে দুনিয়ায় তা আছে ঝোলায়। আপনেও কি চালের মোকামে যান'?

'ও কারবার আমি করি না'।

'টেপির মা বুঝি একা যায়'?

'না তো। তাক যাতে দিবের পারি কই? মনে হয় হারায়ে যাবি'।

কুপির ম্লান আলোয় গোঁসাইয়ের মুখের চেহারা বোঝা গেলো না।

সুরতুন বললো, 'সংসার তো চালাতে হয়'?

'পথে পথে হাঁটি। লোকে চাল দেয়, দু-একটা পয়সাও দেয়। দুজনে ভিক্ষাশিক্ষা করি। গাছতলায় চাল ফুটায়ে নিই'।

'তাতে কি সুখ হয়'?

'ছার সুখ'! গোঁসাই একটা পদ সুরেলা করে আবৃত্তি করলো

দু দিকে দুই পাহাড়। যশোমতী পাহাড়ে শীতল বরফ, ডানদিকে ধনোবতী পাহাড়ে বাঘ-ভালুকের বাস। মাঝে উপত্যকা। চাষী, জমি চাষ করতে করতে পাহাড়ে চায়ো না। কত পণ্ডিত যশোমতী পাহাড়ে বরফ-পাথর হলো, কত চাঁদবেনে ধনোবতী পাহাড়ে সাপের বিষে মরেছে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো, সে যুগল পাহাড়ের সন্ধান দিবি, যুগল স্বর্ণপাহাড। সেই পাহাড়ের মাঝে সুখ বাস করে।

সুরতুন বললো, 'আপনের কথা আমি বুঝবের পারি না, শুনবের ভালো লাগে'। টেপির মা আহারের আয়োজন শেষ করে এদের ডাকতে এসেছিলো, সে হাসিমুখে বললো, 'এই দ্যাখো, তোমারও ভালো লাগতি লাগলো'!

খুব সকালে উঠেও সুরতুন দেখলো টেপির মায়ের অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে গেছে। রান্নাঘরের সামান্য দু-একখানি বাসন মেজে-ঘষে শুকোতে দিয়ে সে তখন রান্নাঘর ও উঠোন নিকোচ্ছে। টেপির মা বললো, 'চান করবা? পুকুরে চলো যাই'।

দুজনে একসঙ্গে স্নান করে এসে সুরতুন দেখতে পেলো গোঁসাইয়ের আলখাল্লা পরা হয়ে গেছে। ভিজে চুলগুলো চূড়া করে বেঁধে তখন সে দাড়িতে গ্রন্থি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

ঘরের মধ্যে তার দ্বিতীয় কাপড়টি ও একটা চটের থলি ছিলো, সেগুলির অনুসন্ধানে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে সুরতুন দেখলো মাচা দুটি ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কিছু নেই।

গোঁসাই বললো, 'এই যে বুনডি, তোমার থলে এখানে'।

সুরতুন দেখলো বৈষ্ণবীর কাঁথা ঝোলা ও গোপীযন্ত্রের পাশে তার থলিটাও গুছিয়ে রেখেছে গোঁসাই।

টেপির মাও সাজসজ্জা করে নিলো। গোঁসাইয়ের ঝোলা থেকে ছোটো একটা আয়না বের করে উঠোনের মাটিতে জল দিয়ে সামান্য একটু কাদা করে রসকলি আঁকলো সে। সুনিদ্রিত, সদ্যস্নাত প্রসন্ন টেপির মায়ের দিকে চেয়ে সুরতুনের আবার মনে হলো, এ যেন টেপিই অন্য এক সজ্জায় এখানে বসে আছে, শুধু গায়ের রংটা টেপির চাইতে মলিন আর ত্বকের এখানে-সেখানে দু-একটা আঁচিল চোখে পড়ে, টেপির যা নেই।

তারপর যাত্রা শুরু হলো। যাত্রার শুরুতে গোঁসাইয়ের হাতের গুপীযন্ত্র বুং-বুং করে উঠলো দু-একবার। 'জয় শিবোদুর্গা রাধে'।

তাদের পিছনে সকালের রোদ্দুরে ঝাঁপ টেনে খড়ের ঘর দুটি যেন প্রতীক্ষায় বসে রইলো।

কিছুদূর গিয়ে টেপির মা প্রশ্ন করলো, 'কও সুরো, আমাক কি ভালো দেখলা না'?

সে যেন পিতৃকূলের কারো কাছে প্রশ্ন করে জানতে চায় নিজের শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে মতামতটা।

রাত্রিতে যা চোখে পড়েনি এখন সুরতুন সেগুলি লক্ষ্য করলো। দুইটি শাখা রেলপথ সংযুক্ত হয়ে দিঘার কিছু দূরে যে কোণটি সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অবস্থিত সরকার থেকে খাস করা এবং পরে পরিত্যক্ত একটা গ্রাম এটা। গ্রামের যে অঞ্চলে বসতি ছিলো সেখানে এখন অগম্য জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কিছু কিছু আম কাঁঠালের গাছ, কখনো দু-একটি নারকেল গাছ চোখে পড়ে। কেউ হয়তো কোনো কালে সখ করে লাগিয়েছিলো, এখন জঙ্গুলে হয়ে গেছে এমন কয়েক ঝাড় কলাগাছও দেখতে পাওয়া যায়। কলাগাছে মোচা হয়েছে, নাবকেল গাছে ফল আছে। সেকালে এটা বোধ হয় গ্রামের একটা সড়ক ছিলো, এখন অনেকাংশই লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। গ্রামের যে অংশে চাষের জমি ছিলো সেদিকে ভাঁটের আর বিছুটির জঙ্গল, এখানে-সেখানে ছড়ানো কয়েকটা বাবলা গাছ। এই বিস্তীর্ণ জায়গাটায় জনমানবের সাড়া নেই। দিনমানে পথটি ধরে হয়তো দু-একজন লোক চলে, বিকেলের দিক থেকে নির্জন হয়ে যায়। এই নির্জনতায় টেপির মায়ের দুখানা নিচু কুঁড়ের বাড়ি।

যেতে যেতে সুরতুনের মনে হলো, কিন্তু ঘবে ছেলেপুলে থাকলে কি এরা এমন করে দুজনে বেরিয়ে পড়তে পারবে যন্ত্র হাতে করে? সে ভাবলো, যে বয়সে মেয়েরা প্রথম সন্তানবতী হয়, টেপিব মাযেব সে বয়স নয় কিন্তু সন্তান ধারণের পক্ষে টেপির মাকে এখন অপটু বলেও মনে হচ্ছে না।

টেপির মা সঙ্গীকে নিয়ে অন্য গ্রামের পথ ধরলো। সুরতুন মোকামের ট্রেনের খোঁজ নেওয়ার জন্য স্টেশনের দিকে গেলো।

যে কথাটা সর্বক্ষণ মনে থাকে সেটা কিছুকালের জন্য আদৌ মনে ছিলো না কেন, ভাবলো সুরতুন। স্টেশনে যেতে তাকে কেউ বাধা দেবে না একথা ঠিক, তেমনি ঠিক যে, স্টেশনটি সরকারের, কিন্তু একথা ভুললে চলে কি করে সুরতুনের কাছে সমগ্র দিঘাটাই মাধাইয়ের। বুদ্ধি স্থির করতে তার সময় লাগলো। ওভারব্রিজটা অনেকটা উঁচু, তার রেলিংটাও মানুষকে আড়াল করে রাখে। সুরতুন স্থির করলো ওভারব্রিজ দিয়ে সে স্টেশনে ঢুকবে। তাহলে দূর থেকে মাধাইকে দেখতে পেয়ে সাবধান হওয়া যাবে।

ওভারব্রিজের তিনটে সিঁড়ি স্টেশনে নেমেছে। প্রথম সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে মাধাইকে দেখতে না পেয়ে সে যখন উৎসাহিত হয়ে নামতে যাচ্ছে স্টেশনে, ঠিক তখনই সে দেখতে পেলো রোদে পিঠ দিয়ে একটি প্যাকিং বাক্সর উপরে বসে আছে মাধাই। যেন বেড়াতে এসেছে স্টেশনের কাজকর্ম দেখতে, এমনি তার ভঙ্গি। দু-তিন ধাপ নেমেছিলো সুরতুন, মাধাইকে দেখতে পাওয়ামাত্র ফিরে দাঁড়িয়ে ওভারব্রিজের রেলিং-এর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক এই সময়ে সুবতুনেব মনে হলো—একে তো বেগে আছে মাধাই, তাব উপরে এই ময়লা কাপড় আব ঝাঁকড়-মাকড় ময়লা চুল নিয়ে সামনে গেলে আব বক্ষা থাকবে না।

পবে ভেবেচিন্তে সে ঠিক কবলো এই স্টেশন-ভর্তি লোকজনেব মধ্যে মাধাই তাকে না বকতেও পাবে এবং যদি গোপনে চলতে গিয়ে ধবা পড়ে যায় তাব চাইতে ববং মাধাইয়েব চোখেব সম্মুখে চলাফেবা কবাই ভালো। অন্তত সে ক্ষেত্রে সে বলতে পাববে—তোমাব কাছেই তো যাচ্ছিলাম।

সুবতুন নিজেব পরনেব শাড়িটাব আঁচল ঘুবিয়ে দু-ফেবতা কবে গা ঢেকে নিলো। তাবপব পা মেপে মেপে অগ্রসব হলো। মাধাইয়েব কাছাকাছি এসে সে এমন কবে মাটিব দিকে চাইলো যেন তাব দৃষ্টি ফেবাতে হলে দু হাত দিয়ে তাব মুখ তুলে ধবতে হবে। এ তো তাব দৈহিক ভঙ্গি। তাব মনে কিন্তু অপূর্ব একটা ব্যাপাব ঘটলো। দূব থেকে যত কাছে সে যাচ্ছিলো ভয়েব ভাবটা তত বেশি পবিবর্তিত হচ্ছিলো। ব্যবধান যখন খুব বেশি নয় তখন হঠাৎ তাব সেই বাত্রিটাব কথা মনে পড়ে গেলো। তাব সমস্ত গা বি বি কবে কেঁপে উঠলো। এবং অদ্ভুত একটা অনুভূতি এই হলো যে, মাধাইয়ে ডুবে যেতে পাবলেই যেন সব ভয় এড়ানো যায়।

'এই মেয়ে, তুমি কী চাও'?

সুবতুন দেখলো টিকিটবাবু জানলাব ওপাব থেকে কথা বলছে। নিজেকেও সে লক্ষ্য কবলো। টিকিট ঘবেব লোহাব বেলিং ধবে সে দাঁড়িয়ে আছে। 'একখান টিকিট দেন বিবামপুবেব'।

কাঁপা কাঁপা আঙুলে টাকা-পয়সা গুনে মোকামেব টিকিট নিয়ে সে কোনদিকে যাবে তা ভাবলো।

এবাব যা সে কবলো সেটা তাব পূর্বতন চিন্তাধাবাব সমান্তবাল নয়, সমভূমিস্থ তো নয়ই। তাব মনে হলো, মাধাই তাকে চিনতে পাবেনি। তখন হঠাৎ তাব একবকমেব কষ্ট বোধ হলো। সে যা ই হোক, ভাবলো সুবতুন, অনেকদিন পবে সে মোকামে যাচ্ছে, যাওয়াব আগে মাধাইয়েব সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানো তাব কর্তব্য।

কিন্তু মাধাই সেই প্যাকিং বাক্সেব উপব ছিলো না।

ট্রেন এলো। মোকামে যাওয়াব পবিচিত ট্রেন। সুবতুন একটা কামবায় উঠে যাত্রীদেব পায়েব কাছে মেঝেতে বসলো। ট্রেন ছাড়লো।

ট্রেনটা যেখানে দিঘাব দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যায় সেখানে একজন লোক ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো কখনো এই কাজটিতে মাধাইকে দেখা গেছে। সুবতুন জানলা দিয়ে বাইবে চেয়ে ছিলো। ট্রেন তখনো পুবো দমে ছুটতে শুরু কবেনি। মাধাই—মাধাই। মাধাই গাড়িব দিকে চেয়ে ছিলো তাব মুখেব উপবে সোজাসুজি সুবতুনেব চোখ দুটি গিয়ে পড়লো। মুহূর্তেব জন্য হলেও দৃষ্টি দুটি পবস্পবকে ধবাব চেষ্টা করলো।

'বোগা দেখালো মাধাইকে। চুলগুলো তেমন পাট কবা নয়। পোশাক পবিচ্ছদ যেন কেমন ঝুলঝুলে। বোগা দেখালো মাধাইকে'।

সুবতুনেব বসবাব জায়গাটা ঠিক হয়নি। নিকটতম যাত্রীটি অনববত পা দোলাচ্ছিলো, আব যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনো তাব হাত কখনো তাব হাঁটুটা সুবতুনেব গায়ে লাগছিলো। সুবতুন উঠে গিয়ে একটা জানলাব কাছে দাঁড়ালো। সেই জানলাটায় মলিন চেহাবা ও ময়লা কাপড়পবা চাব-পাঁচটি মেয়ে নিশ্বাস নিচ্ছিলো।

ট্রেনেব ভদ্রব্যক্তিবা সুবতুন এবং তাব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীলোক কটিকে নিয়ে আলোচনা শুরু কবলো। তাবা সকলেই এই এক বিষয়ে একমত যে এবা টিকিট কাটে না, চালেব চোবাচালান কবে এবং এদেব জন্য গাড়িতে চড়া আজকাল অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চালেব এমনি চালান উচিত কিংবা অন্যায়, এ নিয়েও তাবা আলোচনা কবলো। তাবপব তাবা আলোচনা শুরু কবলো, একজন মেয়েছেলেব পক্ষে কতটা চাল লুকিয়ে নেওয়া সম্ভব। এবপবে আলোচনাটা স্বাভাবিকভাবেই এদেব অন্তর্বাসেব গবেষণায়

পরিণত হলো। এমন আলাপ প্রতিবারই যাত্রীরা করে, তবে এবার কল্পনার আতিশয্য দেখা দিয়েছে। বিব্রত হয়ে স্ত্রীলোক কটি যাত্রীদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

মনটা একটু থিতুলে সুরতুন ভাবলো : টিকিট কেটে এ ব্যবসা চলে না। ভদ্রলোকরা ঠিকই বলেছে, টিকিটের টাকা চালের লাভ থেকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। গ্রামে বসে যখন মোকামে যাওয়াব কথা ভাবতো তখনই সে স্থির করেছিলো টিকিট কেটে যদি সে যাওয়া-আসা করে তবে বোধ হয় মাধাইয়ের সাহায্য ছাড়াও চলতে পারে। এই চিন্তাটাই প্রচ্ছন্ন থেকে তাকে টিকিট কিনিয়েছিলো। টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধও হচ্ছিলো। হিসাবের কথাটা উঠতে এখন সে বুঝতে পারলো টিকিট কেনাটা চলবে না।

সুরতুন তার পাশের মেয়েটিকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো, 'মোকামে চাল কত'?

'উনিশ'।

'এখানে কতকে'?

'পঁচিশ'।

সুবতুন আঙুলে গুনে গুনে হিসাব কবলো—উনিশে পঁচিশে ছয়। ছয় আধে তিন। পনেরো সেরে দুই টাকার কিছু উপবে। ভাড়াব টাকা ওঠে, খাবে কী?

পবের দিন সকালে, মোকাম থেকে চাল নিয়ে ফিরে সুরতুন তাব পুরনো মহাজনেব কাছে গেলো। 'চাল নিবা গো'?

'কতকে'?

'পঁচিশ'।

'দূর বিটি। মোকামে উনিশ, এখানে না হয় বাইশ হবি'।

'তাইলে খুচরা বেচবো'।

সুরতুন দিঘার বাজারের একান্তে গামছা বিছিয়ে চাল বিক্রি করতে বসলো। কিন্তু আগেকার মতো লোকেব যেন চালের উপরে টান নেই। সুরতুন খোঁজ কবতে গিয়ে দেখলো গ্রামের দিক থেকেও চাল আসছে। লোকে সেই মোটা চালই সস্তায় নিচ্ছে।

চাল বিক্রি করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো, কিন্তু জেদ করে পঁচিশের এক পয়সা নিচে সে নামলো না। বাজারের কলে মাথাটা ধুয়ে আহারের চেষ্টায় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো সে। মাধাই আর তার নেই যে সেখানে গিয়ে রান্না চাপাবে। কাল সারাদিন, আজ এখন পর্যন্ত ভাত খায়নি সে। ভাতের খোঁজে সে হোটেলে ঘুবলো, কিন্তু প্রায় সকলেই এমন দামের কথা বললো যে শুনে সে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলো না। একটা বিহারি চা-ওয়ালার দোকান থেকে সেঁকা রুটি আর টকো ডাল খেয়ে আঁজলা পুরে পুরে জল পান করে সুরতুন স্টেশনের বাইরের মালগুদামের কাছে বসে পড়লো। এখন সে কী করবে? আশ্রয়?

স্টেশনে থাকা যায় সারাদিন সারারাত, কিন্তু তা শুধু জেগে থাকা, বসে থাকা, সতর্ক হয়ে। স্টেশনের উপরেই অনেকের অনেক বিপদ ঘটেছে। গত রাত্রিতে ঘুমনো হয়নি বলে ঘুমনোর জন্য আজ গ্রামে ফেবা যায় না। তাহলে ব্যবসা হয় না। আজও কি সে টেঁপির মায়ের বাড়িতে গিয়ে তাদের কাছে নির্লজ্জের মতো বলবে—আজও এলাম। তার চাইতে মাধাইয়ের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা ভালো নয়? তুমি আমাকে আবার ঘরে থাকতে দাও, যা হয় হোক, যা হয় হোক—এই বলে মাধাইয়ের দুখানা পা জড়িয়ে ধরবে? গ্রামে থাকতে আর একদিন এমনি সাহসী হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা সে করেছিলো। এই সময়ে তার মনে হলো কত সস্নেহ ব্যবহারই না ছিলো মাধাইয়ের।

নিরুপায়ের মতো অন্ধকারে পথ ঠাহর করতে করতে টেঁপির মায়ের বাড়ির কাছাকাছি এসে সে লক্ষ্য করলো একটা আলো যেন জ্বলছে কিন্তু সেটা যে জোনাকি নয় তা নিশ্চিত বলা যায় না। সে দাঁড়িয়ে

পড়লো, তাহলে সে কি ফিরে যাবে? পিছনের দিকে চাইলো সে। বিপদ যত পেছন থেকেই আসে। মুহূর্তে সেই নির্জনতা অসংখ্য অদৃশ্য অস্তিত্বে কিলবিল করে উঠলো। মহাবিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একদিন এক নির্জন কুটিরে রাত কাটিয়েছিলো সে ; সে সময়ে তার মোহাবস্থা ছিলো। ভয়ে এখন তার গা ঘামতে শুরু করলো। একদা সে পতিত গোরস্তানের পথে যাওয়া-আসা করেছে, মনের সে অবস্থাও তার আর নেই। মাধাইয়ের ভয় যেন তার অর্জিত সাহসের মূল-দেশটাকেই শিথিল করে শৈশবের ভয়শীলতায় পৌঁছে দিয়েছে।

এখানে তবু একটা কুটির আছে এই মনে করে একদৌড়ে সে টেপির মায়ের আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালো।

শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ হতেই গোঁসাই বললো, 'কে ভাই? মানুষ যদি তাহলি আসো'। গোঁসাই যেন তারই প্রতীক্ষা করছিলো সুরতুনকে দেখতে পেয়ে এমন ভঙ্গিতে সে স্বাগত করলো।

সুরতুন ঘরে ঢুকে দেখলো, এদিকে মাচায় বসে গোঁসাই তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা করছে, ওদিকের মাচায় টেপির মা ঘুমুচ্ছে গুটিসুটি হয়ে। তার শোওয়ার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে সে যেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ কেউ।

'খাওয়া-দাওয়া হইছে, বুনডি'?

'হইছে'।

'তাইলে এক কাজ করো। তোমার দিদির পাশে যায়ে শোও'।

'আপনেদের খাওয়া-দাওয়া'?

'আজ আর কেউ খাবো না। পোরস্কার জলের এক পুকুর পায়ে তার বাউরিতে এক আমগাছের তলায় তোমার দিদি রান্না করলো ও বেলায়'।

এর আগের দিন রাত্রিতে গোঁসাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে টেপির মা আর সুরতুন শুয়েছিলো। গোঁসাই জেগে বসে থাকবে আর সে শুয়ে পড়বে এতে যেন কোথায় সংকোচ বোধ হলো সুরতুনের।

কিন্তু গোঁসাই বোধ হয় মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে, সে বললো, 'আচ্ছা, তামাক না হয় না খালাম। তুমি শোও, আমি আলো নিভায়ে দি'।

গোঁসাই ফুৎকারে কুপিটি নিভিয়ে দিলো। সমস্ত পৃথিবী যেন চোখ বুজলো।

সুরতুন একটি অনুভবগ্রাহ্য নির্ভরতায় টেপির মায়ের পাশে শুয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও পড়লো।

সকালে উঠে টেপির মা সুরতুনকে দেখতে পেয়ে বললো, 'ওমা, তুই কখন আলি? কী খালি? কী অন্যাই, আমাক ডাকলি না কেন্'?

সুরতুন বললো, 'বড়ো মুশকিলে পড়ছি ; করি কী কও'?

সুরতুন তখন থেকে শুরু করে পুকুর থেকে স্নান করে আসতে আসতেও তার অসুবিধার কথাগুলো ব্যক্ত করলো। শুধু মাধাইয়ের কাছে যেতে কেন ভয়, সেটার সবটুকু প্রকাশ করলো না।

সব শুনে টেপির মা রসিকতার লোভ সংবরণ করতে পারলো না, কিন্তু সুরতুনের মুখে বিরসতা দেখে সে বললো, 'তা ধরা দেওয়া না-দেওয়া তোর ইচ্ছে। ব্যবসা করবের চাস, কর। যেদিন মোকামে যাবি না, নিজের গাঁয়েও যাতে ইচ্ছে হবি নে, আমার গাঁয়ে আসিস। রোজ আমাদের পাবি না, দূরে চলে গেলে আর ফিরি না, ঘরের আগাড় ঠেললিই খুলবি। আর তা-ও যদি তোর মনে কয়, আমার ঘরের পাশে ঘর তুলে নিস। গোঁসাইকে কবো। পড়শী হবি'।

নিজের সমস্যার সমাধান হিসাবে প্রস্তাবটা লোভনীয় বোধ হলো সুরতুনের ; সে বললো, 'জমি কার'?

'তা কি জানি। যদি উঠায়ে দেয় দিবি। গোঁসাই কয় কি জানিস? কয় যে, সারা দেশে র‍্যালগাড়ি গিছে। তার দুইপাশে বিশ-পঁচিশ হাত জায়গা কোনো জমিদারের দখলে নাই। এখান থিকে উঠায়ে দেয় র‍্যালের ধারে যায়ে বসবো কোথাও। সেখান থিকে তুলে দেয় আবার অন্য কোথাও। এমনি পাঁচবার ঘর তুলতি তুলতি পরমাই ফুরাবি। নিষ্পত্তি'।

ঘর তোলা হোক আর না হোক সুরতুন মোকাম থেকে ফিরে দু'বার এদের ঘরে বাস করেছে।

এবার সে প্রশ্ন করলো, 'টেপির মা লো, এ তোমার কী ব্যবসা? এতে কি চালের ব্যবসার চায়ে লাভ'?

'চালের ব্যবসায় চুরি আছে। এতে ধরো যে তা নাই'।

'গোঁসাই কী কয়'?

'সে কয়—ভিক্ষে কও তা-ও আচ্ছা। কিন্তুক লক্ষ্মী, আমি গান না করলি কি ভিক্ষে হয়'?

শুনতে শুনতে সুরতুনের পছন্দ হয় এমন জীবনটাকে। যেটা সে অনুভব করে সেটা এই : পিছন থেকে ধরার কেউ নেই, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরাব তাগিদ নেই। যেখানে রাত্রি সেখানেই আশ্রম। মাথার উপরে গাছ থাকে ভালো, না থাকে সেও মন্দ নয়।

কিন্তু সমস্যার সমাধান অত সহজ নয়।

টেঁপিব মা রোজ ঘবে ফেরে না এটা শুনেছিলো সুরতুন। এক সন্ধ্যায় সুবতুন এদের ঘরে এসে দেখলো তখনো এরা ফেবেনি। প্রতীক্ষায় কযেক ঘণ্টা অতিবাহিত করলো সে ; রাত্রিই শুধু গভীর হলো। সুরতুন দরজার কাছে বসে ছিলো, বাইবে অন্ধকাব ঢাকা প্রান্তব। দূরে দূরে জোনাকির তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে, আজ যেন ঝিঁঝির ডাকও কানে আসছে। কয়েকদিনেব যাওয়া-আসায় এ জায়গাটার সঙ্গে পুবোপুরি পরিচয় হয়েছে। তাব ফলে এই গভীর অন্ধকারে আধ ক্রোশের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী নেই, এ বোধটাই তীব্রতব হলো।

মনেব অনুভব করাব একটা সীমা আছে। সেই সীমায পৌঁছনোব পরে সুখদুঃখ ভয়-ভাবনা সব এক হয়ে গিয়ে মন পাথর হয়ে যায়। তেমনি স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকতে থাকতে সুরতুন দুঃস্বপ্ন ও ঘুমের মধ্যে রাত্রিটা অতিক্রান্ত করলো। দিনের আলো ফোটামাত্র সে বাড়িটাকে দূবে রাখবার জন্যই বেরিয়ে পড়লো, যেন সেটাই বিভীষিকা। কিন্তু কী উপায়? কে বলে দেবে পথটা? গ্রামে ফিবে যাবে? অনেক চিন্তা করে সে স্থির করলো দিনের বেলায বাজারে কাটাবে, রাত্রিতে ট্রেনে চলবে। যদি তখনো শরীব বিশ্রাম চায়, স্টেশনে বসে থাকবে। যদি মাধাই তাকে দেখতে পায় তো দেখুক, যদি সে ধরে নিয়ে গিযে শাসন করে, করুক। সে নিজের বুদ্ধিতে আর এগোতে পাবছে না এটাই আসল কথা। মানুষ তো ট্রেনেও কাটা পড়ে।

স্টেশনে একদিন বসে থাকতে থাকতে জীবনের এক অদ্ভুত রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো সুরতুনের। ক্লান্তি, অনিদ্রার অবসাদ ও আত্মকেন্দ্রিক আবর্তপ্রায় চিন্তায় তখন সে নিমজ্জমান। কে তাব গায়ে হাত দিলো। দিশেহারা হয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই লোকটি বললো, 'তুমি সুরো না? কেন্ সুরো, আম্মা কনে'? এবার সুরতুন লোকটির মুখের দিকে চাইলো। সোভান রাতারাতি বেড়ে উঠেছে এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে যেন, আর তার মুখে যেন রাতারাতি কিছু দাড়ি গজিয়েছে ; কোলে জয়নুল।

বিস্মিত সুরতুন বললো, 'কার কথা জিজ্ঞেসা করো, তুমি কেডা'?

'আমি ইয়াজ। আম্মা কনে—ফতেমা'?

'সে গাঁয়ে'।

'হায়, হায, কী করি কও'?

'কী হইছে'?

'সেই খাঁ লাগাইছিলো গোল। মারলাম এক তামেচা উয়েরই এক কুকুরমারা লাঠি দিয়ে। রক্ত কত! জমিন ভিজে গেলো'।

'কী করছো? কাক মারছো? আমার কাছে আসছো কেন্? পুলিস আসবি তা বোঝো'?

'বুঝি। পালাতেই তো হবি। যাবো কনে তাই কও। আর তাছাড়াও, সোভানেক ওরা ঘিরে ফেলাইছে বাজারের মধ্যি। তাক তো ছাড়ায়ে আনা লাগবি। করি কী তাই কও'?

'তুমি এখান থিকে যাও, যাও। আমাক বিপদে ফেলাবা'।

'সুরো, এক কাম করো। জয়নুল, কোলেব মধ্যে লাফালি চড় খাবি কৈল। সুরো, তুমি এক কাম করো, তুমি জয়নুলেক একটুক রাখো, আমি সোভানেক নিয়ে আসি। সে আটকা পড়ছে'।

কথাটা বলতে বলতে সম্ভবত সোভানের করুণ মুখখানা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো তার কাছে, জয়নুলকে সুরতুনের কোলে ঠেলে দিয়ে সে দৌড়ে চলে গেলো।

ইয়াজ চলে গেলে সুরতুন ভাবলো, সে তো ফতেমা নয়, সে কী করতে পারে। মোকামে যাওয়ার গাড়ির সময় হয়েছে, যদি এখনই ইয়াজ না আসে তার মোকামে যাওয়া হবে না। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা—পুলিস। এ সবের সন্ধানে পুলিস নিশ্চয়ই আসবে, এবং যদি তারা আসে তাকেও রেহাই দেবে না। সুরতুনের মনে হলো ইয়াজের তাকে চেনার কথা নয়। জয়নুলই নিশ্চয় তাকে চিনিয়ে দিয়েছে, তেমনি জয়নুলের উপস্থিতিই পুলিসকে নিশানা দিয়ে সাহায্য করবে।

সুরতুনের মোকামে যাওয়া হলো না। সে মনস্থিব করাব আগেই মোকামের গাড়ি চলে গেলো। অবশেষে টেপির মায়ের খোঁজে যাওয়াই উচিত বলে বোধ হলো তার। পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে পারে এমন একজন পুরুষ অন্তত সেখানে আছে। জয়নুল ঠিক সেই মুহূর্তে যাত্রীদেব কাছে ঘুরে ঘুরে পয়সা চেয়ে বেড়াচ্ছিলো। সুবতুন স্থির করলো এই সুযোগেই পালাতে হবে। ওভাবব্রিজের উপরে কিছু দূরে উঠেই কিন্তু সে দেখতে পেলো জয়নুল তাব পিছুন পিছুন ছুটে আসছে।

সে সন্ধ্যাতেও টেপিব মা ফিবলো না। বরং জয়নুলেব খোঁজে ইয়াজ এলো সোভানকে নিয়ে।

সুরতুন বললো, 'এখানে আসছি জানলা কী কবে'?

ইয়াজ বললো, সে অনেকক্ষণ থেকেই সোভানকে নিয়ে দূবে দাঁড়িয়ে সুরতুনের দিকে লক্ষ্য বাখছিলো, সকলে একসঙ্গে ধরা পড়াব চাইতে যে কোনো একজন ধরা পড়া কম দুঃখের হবে বলেই সে কাছাকাছি আসেনি।

সুবতুন বললো, 'আমাক পুলিশে ধববে কেন্'?

'তোমার সঙ্গে জয়নুল ছিলো। আর তা ছাড়া সে হারামি পুলিসেক কইছে, আমি তুমি জয়নুল সোভান সবই একদলের। ফতেমার নাকি দল'।

উচ্ছ্রিত জানুর উপরে চিবুক রেখে নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে বইলো ইয়াজ এবং সুরতুন। জযনুল-সোভানের মুখেও কথা নেই।

সুরতুন একসময়ে প্রশ্ন করলো, 'যাক মারলা সে কে'?

'ইসামাইল কসাই। জয়নুলদের বাপ'।

'তাক মারলা কেন্? মারলাই যদি তবে তাবই ছাওয়ালদেব টানে বেড়াও কেন্? এরা তোমার কে'?

এটাই ইয়াজেরও সব চাইতে গোলমাল লাগছে। ব্যাপারটা এই রকম · ফুলটুসিব ছেলে সোভান-জয়নুল ইদানীং স্বাবলম্বী হয়েছিলো। প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার পথের পাশে বসে তারা যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চায়। ভিক্ষালব্ধ পয়সায় তারা একটা হোটেলে খায়। এ সবের পরামর্শ ইয়াজই দিয়েছিলো। হোটেলের বাসি ভাত-তরকারি ফেলে দেওয়ার বদলে সস্তা দামে এই শিশু দুটির কাছে বিক্রি করা লাভজনক বলে হোটেলওয়ালা নজর মিঞা আপত্তি করে না। মদ চোলাই করার গোপন এক কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে ইসমাইলের অবস্থা হালে একটু ভালো হয়েছে। পশ্চিমী রইসদের রক্ত তার শরীরে আছে এটা প্রমাণিত করা কঠিন নয় তার পক্ষে, এই হযেছে তার বর্তমান মনোভাব। নজর মিঞার হোটেলে বসে কাল সন্ধ্যায় এরকম কথাই হচ্ছিলো। যদি আত্মগবিমার প্রচারমাত্র হতো ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু গোলাপি নেশার আমেজে ইসমাইলেব মনে হযেছিলো উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে তারা তার তুলনায় নীচস্তরের লোক।

নজর হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'তা আর বলতে! ছাওয়ালরা যখন ভিক্ষে করে খায় তখন অযুধ্যার লওয়াব ছাড়া আর কী বলা যায়'।

'কী, আমার ছেলে ভিক্ষে করে খায়'! দিশি ভাষায় এইটুকু বলে লাফিয়ে উঠলো খাঁ সাহেব। বাড়ি ফিরে সে জয়নুল-সোভানকে ধমকে দিলো, 'খবরদার, ভিখ্ মাঙ্‌বে না'। ব্যাপারটা জয়নুল-সোভানের কাছে শুনে ইয়াজ বলেছিলো, 'কেন্, খাতে দিবি বুঝি'?

আজ সকালে জয়নুলরা ভিক্ষার কৌটা নিয়ে বেরুতে গিয়ে খাঁসাহেবের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলো। খাঁ সাহেব হেঁকে বললো, 'কাঁহা যাতা'?

সোভান-জয়নুল হাঁক শুনে উঠোনে থেমে গিয়েছিলো। শাসনের প্রথম কিস্তি হিসাবে দুজনের দু গালে দুটি চাঁটি মেরে ইসমাইল খাঁ খানদানি উর্দু ঝাড়লো, 'ইব্লিস কা বাচ্চা, কালি কুত্তিকি বেটা'।

হাঁকাহাঁকিতে ইয়াজের ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এসে সে বললো কৌতুক করে, 'খুব যে চুস্তপুস্ত। ব্যাপারডা কি'?

'চপ্ শালে বেতমিজ্। তু শিখলায়া'।

'দ্যাখো, গাল দিয়ো না কয়ে দিলাম। ভিক্ষা করবি নে তো তুমি কি খাতে দিবা'?

'বেশখ'।

'সখ করে ও কাম কেউ করে না'। ইয়াজ বললো।

'চপ্ বেওকুফ'।

ইয়াজ হাসবার চেষ্টা করলো কিন্তু তার আগে খাঁসাহেব জয়নুল আর সোভানকে দ্বিতীয় কিস্তি শাসনে ভূমিসাৎ করো দিলো।

হঠাৎ কী হলো ইয়াজের, সেও লাফিয়ে পড়লো উঠোনে। ইসমাইল খাঁ তৃতীয় কিস্তি শাসনের জন্য একটা চেলাকাঠ হাতে করতেই ইয়াজও একটা লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। বহু দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিলো ইয়াজের। আবাল্য নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছে সে। তার গরঠিকানা জন্ম নিয়ে চ্যাচামেচি করেও যখন ইসমাইল থামলো না বরং চেলাকাঠটাকে ব্যবহার করার জন্য জয়নুলের দিকে এগিয়ে এলো, তখন ইয়াজ লাঠিটা দিয়ে খাঁসাহেবকে এক ঘা বসিয়ে দিলো।

সুরতুনের প্রশ্নে এটুকু বলে ইয়াজ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো। জয়নুল, সোভান, ফুলটুসি, ইসমাইল আর সে নিজে কী একটা গূঢ়সূত্রে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জয়নুল ও সোভান ফুলটুসি-ইসমাইলের সন্তান এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাল্যকালে ফুলটুসি ও ইয়াজ যাকে আম্মা বলতো সেই বৃদ্ধা ইসমাইলকে স্বামী হিসাবে স্বীকার করেছিলো।

ইয়াজ বললো, 'ইসমাইল বাপ হোক, কিন্তুক ও ওদের মারবি কেন্'?

'আগে ওরা বাপের ছাওয়াল, তোমার কিন্তুক ওরা কে'?

'কেউ না হলিও ওরা ফুলটুসির ছাওয়াল'।

'সে তোমার কে'?

'কেউ যদি নাও হয়, সে বড়ো ভালো ছিলো। ছোটোকালে একসঙ্গে আমরা খেলা করছি'।

গাঢ় অন্ধকারে সমাধান খুঁজবার ভঙ্গিতে ওরা বসে রইলো। জয়নুল ইয়াজের গায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সোভান ইয়াজের ভঙ্গি অনুকরণ করে বসেছিলো বটে, ঘুমেও ঢুলছিলো।

সোভান বললো, 'বড়োভাই, আব্বা কি আমাদের সঙ্গে দৌড়ায়ে পারবি'?

'না পারবের পারে। কেন্'?

'তবে আর ভয় কি? ধরবের পারবি নে। আমরা মনে কয় ভিক্ষে করেই খাবো। আঁধারে পালায়ে থাকলি খাতে দেয় কে'?

সোভানদের ক্ষুধা পেয়েছিলো। সে তার বর্তমানের অনুভব দিয়ে যা স্থির করলো যুক্তির দিক দিয়েও তার মূল্য আছে। তিনজনে আত্মগোপন করে থেকেও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে এমন সংগতি নেই ইয়াজের।

ইয়াজের মনে অনুশোচনা এসেছিলো। সে ভাবছিলো মারামারি না করে এখন যেমন পালিয়ে এসেছে তখনো তেমনটা করলেই হতো। সে রাগ করে বললো, 'সেই ভালো, তোরা ভিক্ষে কর। কীসের মায়া, কও, সুরো : আপনি বাঁচলি চাচার নাম। যার বাপ তারে মারছে আমার কী মাথার দরদ। ঠিক। পালানই লাগবি'।

সোভান বললো, 'তাই যাও। সে যদি মারধোর করে আবার তোমাক কয়ে দেবো। আর ফতেমাক না পাই, সুরোক পাবো'।

যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে তাকে যে প্রয়োজন হলেই পাওয়া সম্ভব নয় সোভানের পরিকল্পনার মধ্যে এমন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করলো না।

ইয়াজ বললো, 'তোমাক কিন্তু এক কথা কই, সুরো : যদি এমন-তেমন দেখো এ দুডেক নিয়ে ফতেমার কাছে পৌঁছায়ে দিয়ো'।

ইযাজের স্বরে এমন আকুতি ছিলো যে সুরতুনকে রাজী হতে হলো।

সারা রাত উৎকণ্ঠায় দরজার পাশে বসে থেকে ভোরের আলো ফোটার আগেকার জ্যোৎস্না আকাশে দেখে সুরতুন খুটিতে হেলান দিয়ে বসেছিলো বাঁ দিকের মাচাটায়। ডান দিকের মাচাটার উপরে ইয়াজকে জড়িয়ে ধরে তার দুই ভাই ঘুমে অচেতন।

সুরতুন ধড়মড় করে উঠে বসলো। সে দেখতে পেলো টেপির মা ও গৌসাই এসেছে। এদিকে ইয়াজরাও রাত্রির স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে।

সুরতুনকে গৌসাই প্রথমে দেখতে পেয়েছিলো, সে বললো, 'বুনডি আছো? ভালোই হয়েছে। দ্যাখো দেখি আমরা কী বিপদ নিয়ে ফিরে আলাম'।

'কী হইছে'?

'তোমার বুনের পা মচকায়ে গেলো। তা ঠিক করলাম পা ফুলে অচল হওয়ার আগেই ঘরে চলো। যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো হলো না'।

টেপির মা বললো, 'তুমি আজ রাঁধে খাওয়াবা আমাক সেই আসল কথাটা কও'।

গৌসাই এ-কথার উত্তর না দিয়ে বললো, 'বুনডি, আজ কৈল তোমার ধানের মোকামে যাওয়া হবি নে। আজ সারাদিন আমরা এখানে থাকবো। সকলে মিলে বাঁধেবাড়ে খাওয়া-দাওয়া করবো। গান-বাজনা করবো'।

গৌসাই রান্নার জোগাড় করে নিলো। উনুনে আগুন দিলো যেন তামাকে আগুন রাখবার জন্য। ভাত নামতে নামতে তার বিশবার তামাক খাওয়া হয়ে গেলো।

স্নান-আহারের পর্ব খুশি খুশি হাল্কা আবহাওয়ার মধ্যে শেষ হলে টেপির মা একটা বড়ো কাঁথা পায়ের উপরে মেলে নিয়ে সেলাই করতে বসলো। গৌসাই তামাকের কল্‌কে নিয়ে সুরতুনের সঙ্গে গল্প শুরু করলো। তখন সুরতুন ইয়াজদের ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলো।

গৌসাই বললো, 'তারা গেলো কোথায়'?

'গা ঢাকা দিছে'।

'তবে তোমার কোনো ভয় নাই, বুনডি। এতে পুলিস তোমাক কিছু করবি নে'।

কিছুক্ষণ বিরতির পর টেপির মা সেলাই থেকে মুখ তুলে বললো, 'আমার কী মনে হয়, সুরো, তা তোমাক কই। মনে কয়, ফুলটুসি নিজে সাধে মরণ আনছিলো'।

গৌসাই তামাকে মন ডুবিয়েছিলো। সে বললো, 'জীবনটা বড়ো মজেদার দেখি। কও, ইয়াজের কে ঐ সোভানরা। তার জন্যি তোর অত কেন্? বুঝলা না, লক্ষ্মী, তুমি একদিন জিজ্ঞাসা করছিলে, উত্তর দিবের পারি নাই। দুইজনে দেখা হওয়ার আগে তুমি নিজের ভাত-কাপড় রোজগার করতা, আমিও করতাম। তবে দুইজনে এই দোকান সাজালাম কেন্? কেন্ যে সেদিন বুঝি নাই, বুঝলেও

কবের পারি নাই ; এই দ্যাখো জীবনে ভাতের চায়েও মজা আছে'।

কয়েকটা দিন সুরতুনের নির্বিঘ্ন শান্তিতে কাটলো। টেপির মা ও গোঁসাই ঘরে ছিলো। পুলিসের ভয়ে দু'তিন দিন সে মোকামে গেলো না। তারপর গোঁসাই তার মনের অবস্থা বুঝে আবার তাকে বোঝালো পুলিসের ভয় নেই। তারপর মোকামে যেতেও অসুবিধা হয়নি, ফিরে এসে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আশ্রয়ও পাওয়া গেছে। একদিন কথায়-কথায় টেপির মা বলেছিলো, 'যদি একা ঘরের মধ্যি থাকতি ভয় করে ঘরের বাইরে থাকিস। আলো জ্বালালে মানুষের চোখে পড়ার ভয় যদি থাকে আন্ধারে থাকিস। ভয় নাই। পৃথিমিতে ভয় কীসের'।

ভয়ের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন সুরতুনের অনুভব হলো, ভয় আছে কিন্তু তাকে অত মান্য না করলেও চলে। বিকেলের পর সে টেপির মায়ের ঘরের দিকে আসছিলো। আজ যদি টেপির মায়েরা চলে গিয়ে থাকে—এই আশঙ্কা থেকেই চিন্তার সূত্রপাত। দ্যাখো কৌতুক—ভয় পেয়ে এ-ঘর থেকে পালিয়ে স্টেশনে অনিদ্রাব রাত কাটাতে আরম্ভ করেছিলো সে। তারপর ঝড়ের মতো এলো পুলিসেব ভয়, সেই ভয়ে যেন সাপের গর্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো সে। মাধাইয়ের উপরে নির্ভর না করে চালের ব্যবসা অসম্ভব, এ আশঙ্কাও কেটে গেছে। নিজের হয়ে সে ব্যবসা করছে। টিকিট ফাঁকি দেওয়ার একটা ফিকির সে ইতিমধ্যে আবিষ্কার কবেছে। পুলিসের ভয় আছে ; সে কি একেবাবেই যায়? তবে সেটা অসহ্য কিছু নয়। এই ভাবতে ভাবতে টেপির মায়ের ঘরের কাছে পৌঁছলো সে। টেপির মায়েরা সেদিন সত্যিই অনুপস্থিত। সুরতুনের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো না সে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে মৃতের মতো নিঃশব্দে শুয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো।

সহজে ঘুম এলো না। একফালি চাঁদ উঠলো। ছ্যাচার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে পড়লো। তখন সুরতুন একটা বেপরোয়া মনোভাব অবলম্বনের চেষ্টা করতে লাগলো। নিজের মুখে সে যে কাঠিন্য ফুটিয়ে তুললো সেটা তার দেখতে পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না, কিন্তু নিজের সুগঠিত পেশল বাহু দুটিকে লক্ষ্য করলো, হাতের আঙুলগুলির শক্তি যাচাই করার জন্য দু হাত কয়েকবার মুষ্টিবদ্ধ করলো।

মনটা একটু জুড়োলে একদিন সে ভাবলো ইয়াজের কথা। তার কথায় একটি বিচিত্র অনুভূতি হলো তার। গোঁসাইয়ের কথা পুনরাবৃত্তি করে সে বললো, জীবন কী মজাদার দ্যাখো। ফতেমা নিজের অর্থ ব্যয় করে জয়নুলদের খাওয়াতো। তখন সুরো এজন্য ফতেমাকে সমালোচনা করেছে। পাছে তাদের সঙ্গে আলাপ হলে সে নিজেয় তহবিলে খরচ করে বসে এই আশঙ্কা থেকে সে জয়নুল-সোভানদের দেখলে অনির্দিষ্টভাবে বিরক্ত হয়েই উঠতো। অথচ ইয়াজ এলো তারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে।

ইতিমধ্যে একদিন সুরতুনের মনে পড়লো মাধাইকে শেষ যেদিন সে দেখে ছিলো ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, রোগা-রোগা দেখিয়েছিলো তাকে।

আর-একদিন সুরতুন টেপির মাকে বললো যে সে মোকামে যাবে। কিন্তু গেলো না। স্টেশনে পৌঁছে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে মাধাইয়ের খোঁজ করে বেড়াতে লাগলো সে। সারা স্টেশনে খুঁজে এমনকী ওভারব্রিজে দাঁড়িয়েও মাধাইয়ের সন্ধান না পেয়ে স্থির করলো, সে ফিরে যাবে। ওভারব্রিজের সিঁড়িটা যেখানে প্রধান প্ল্যাটফর্মে নেমেছে তার কাছেই রেলের একটা অফিস এবং তার বিপরীত দিকে মিলিটারিদের স্থাপিত ক্যান্টিনের গুদামঘর। এই দুয়ের মাঝখানে দু হাত চওড়া একটা সরু গলিপথ। এ-পথে লোক চলাচল প্রায়ই নেই। সুরতুন এই পথ ধরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। ঠিক এমন সময়ে দেখা হয়ে গেলো সেই গলিটার মধ্যে মাধাইয়ের সঙ্গে। সুরতুনের সাহসটার কিছু আর অবশিষ্ট ছিলো না তখন। তার মনে হতে থাকলো সারাটা সকাল সে শুধু মাধাইকেই খুঁজেছে। সে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাধাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তার হাতে ছোট একটা পুঁটুলি, সম্ভবত সে বাজার করে ফিরছিলো। সুরতুনের সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেয়ালে নিজের দেহভার ছেড়ে দিয়ে মাধাইয়ের চোখের দিকে চোখ তুলে দাঁড়ালো সুরতুন। দেয়ালে দেহভার ছেড়ে

দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না তার। পা কাঁপছিলো, চোখের সম্মুখে দৃশ্য জগৎ বর্ণহীন হয়ে আসছিলো। তার মনে হলো মাধাই হাত বাড়িয়ে না ধরলে সে পড়ে যাবে।

মাধাইয়েব ঠোঁট নড়লো ; অবশেষে সে কথা বললো, 'সুরতুন্নেছা? ভালো আছো'?

'ভালো আছি। আপনে কেমন আছো, বায়েন'?

'তা ভালোই'।

মাধাই চট করে চলে যেতে পারলো না। সুরতুনেরও সরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিলো না। সে যেন মাধাইয়ের কালি-পড়া চোখের দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে। সে লক্ষ্য করলো মাধাইয়ের গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, তার চোখের কোণে কালি পড়েছে। পাট-পাট করা বড়ো বড়ো চুল ছিলো মাথায়, কানের পাশে বাবরির মতো দেখাতো। এখন চুলগুলি যেন ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, ঘাড়ের কাছে অনেক দূর তুলে কামানো। রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু কথা আব এগোলো না। মাধাই চলে গেলো।

চলতে শুরু করে সুরতুন স্থির করলো আজ আর সে মোকামে যাবে না। একবার তার মনে হলো হোটেল থেকে সে খেয়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে স্থির করলো—তাহলে তো চলবে না। রান্না যখন করতেই হবে আজ থেকে করলেই-বা দোষ কী? ভয় ও অভিমানের আড়ালে একদিন কোথায় একটা প্রতীক্ষাও লুকিয়ে ছিলো। সেটা যেন আজ মুছে গেলো। পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নেওযাই ভালো, এই স্থির করলো সে। টেপির মা বা গোঁসাই আপত্তি করুক কিংবা না-ই করুক, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের হেঁসেলে ঢুকতে সংকোচ বোধ হলো সুরতুনের। একটা হাঁড়ি, একটা ছোটো কড়া, লোহার একটা হাতা কিনে নিয়ে সে আস্তানায় ফিরবে। চাল আছে। টেপির মায়েব বাড়ির পিছনে জঙ্গলে ধুঁদুল দেখে এসেছে সে।

রান্না চড়িয়ে সুরতুন তার ব্যবসায়ের হিসেব নিতে বসলো। এবার ব্যবসা করতে আসার সময়ে সে আট টাকা কয়েক আনা মূলধন নিয়ে বেরিয়েছিলো। কোমরের গেঁজে খুলে বার করে খুচরো পয়সা রেজগিতে গুনে দেখলো পাঁচটা জমেছে। আঁচল খুলে নোট বার করে গুনে দেখলো সেখানেও চারটে টাকা আছে। এ কয়েকদিনের ব্যবসায় তার মূলধন তাহলে কমেনি।

ধুঁদুল তেমন তেতো ছিলো না। অনেকদিন পরে নিজের রান্না নিজে করে খেতে ভালোই লাগছিলো। টাকার হিসেবেও সে ঠকেনি। সুরতুন একটা দিবানিদ্রার ব্যবস্থা করে নিলো।

কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে তার মনে হলো, তখন মাধাই যদি তার হাতের পুঁটুলিটা তার হাতে দিয়ে বলতো—চল, তাহলে সে কি না গিয়ে পারতো? মাধাই কি তাব নিজেব প্রয়োজন বোঝে না? সে তো পড়ে যাচ্ছিলো, কেন মাধাই তবে তাকে তুলে নিলো না!

২০

প্ল্যাটফর্মে কাঠের বাক্সে রোজই সে বসে থাকে, সব সময়ে লোকজনের সঙ্গ তার ভালো লাগে না। সেদিন তেমনি বসে ছিলো মাধাই। সুরতুন ধীরে ধীরে এলো। তার মনে হয়েছিলো কিছু একটা বলা উচিত কিন্তু কথা জোগালো না। ট্রেনকে ঝাণ্ডা দেখাতে গিয়ে আবার সে দেখতে পেলো সুরতুনকে।

যেদিন রাত্রিতে সুরতুন নিখোঁজ হয়েছিলো সে-রাত্রির সব কথা আবার মনে পড়লো তার।

প্রথমে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও সংকুচিত বোধ করেছিলো। তারপর সেই সংকোচ থেকে আত্মত্রাণ করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু সে-ক্রোধ পরে একটা আশঙ্কায় রূপান্তরিত হলো। তখন সে একটা রেলের লণ্ঠন নিয়ে

সুরতুনকে খুঁজতে শুরু করেছিলো। বাজার স্টেশন ইত্যাদি জায়গায় অনির্দিষ্টভাবে খুঁজে, প্রায় ভোর রাত পর্যন্ত হেঁটে, কখনো বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হেঁটে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সে স্থির করেছিলো—কেউ যদি লুকিয়ে থাকতে চায় তবে বন্দর দিঘার মতো অত বড়ো জায়গায় একক চেষ্টায় তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে বাসায় ফিরেছিলো এবং ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির চেষ্টায় নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলো। মনের এরকম অবস্থায় জাগরণক্লান্ত মস্তিষ্কে সে ভাবলো : যে সাজায়-গোছায় সে কী চায় তা বোঝো না? পরক্ষণেই তার মনে পড়লো, সাজানো-গোছানোর পিছনে সত্যি তার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। থাকলে বোধহয় সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার আগে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা করতে পারতো। এ যুক্তি যখন টিকলো না তখন অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে সে স্বগতোক্তি করলো—মেয়েমানুষের সেই দুর্গতির দিনে যে আশ্রয় দিয়েছিলো তোমাদের, তার কি কিছুমাত্র দাবি নেই? 'রক্ষক যে ভক্ষক সে' এই প্রবাদটা সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো। এ যুক্তিটাও বানচাল হয়ে গেলো। হাতের পিঠে একটা জ্বালা করছে, চিবুকেও। এতক্ষণে যেন সে লক্ষ্য করার সময় পেলো। অনেকটা জায়গা কেটে গেছে হাতের পিঠে, আরসিটা তুলে নিয়ে দেখলো চিবুকেও বিন্দু বিন্দু রক্ত জমে আছে। মাধাইয়ের ক্রোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, 'শালী বনবিলাই। আয়ডিন লাগাতে হবে'।

এসব কিছুতেই সান্ত্বনা পায়নি সে। তার ঘরের বাইরে শুকনো পাতা খচমচ করে উঠতেই সে বলেছিলো, 'সুরো আসলি? আয়, নির্ভাবনায় আয়'। এমনকী উঠে গিয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়েছিলো।

পরদিন মাধাই কাজে যায়নি। সুরতুন এসে যদি তাকে না পায় এই আশঙ্কায় সারাদিন সে ঘরেই ছিলো। দিনের বেশিরভাগ সময়ে চিন্তা করেছিলো—ভয় পেয়েছে ও।

আজ সুরতুনকে দেখতে পেয়ে তার মনে একটি অনির্বচনীয় ভাব জমে উঠতে লাগলো। ইতিমধ্যে তার জীবনে অন্য একটি স্ত্রীলোক এসেছে। তার প্রতি যে কোনো মোহ জন্মেছে তা নয়, তবু যেন কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধ, সামান্য কিছু করুণা তার জন্য অনুভব করলো সে। সুরতুনকে গ্রহণ করা কিংবা তার সম্পর্কে উদাসীন হওয়া যেন এ ঘটনা থেকেই জটিল একটা ব্যাপার হয়ে উঠলো।

যে অনুতপ্ত তার অনুশোচনাকে মূল্য না দিলে অনেক ক্ষেত্রে সে-অনুতাপ চিরস্থায়ী বিদ্বেষেও পরিণত হতে পারে। সুরতুন চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে বিদ্বেষ যখন তার সব চিন্তার মূল রস, তখন একদিন তার মনে পড়লো রমণী হিসাবে টেপি সুরতুনের তুলনায় কিছু কম তো নয়ই বরং অনেক দিক দিয়ে অনেক বেশি কাম্য। টেপিরও এক ধরনের রূপ আছে, অধিকন্তু সে রুচিসম্মত বেশভূষা ব্যবহার করতে জানে, সব চাইতে বড়ো কথা—সে কথা বলতে জানে, রসিকা সে। সাত-পাঁচ মাথামুণ্ডু ভাবতে ভাবতে মাধাই টেপিদের পল্লীতে গিয়ে পৌঁছেছিলো। তখনো সন্ধ্যা হতে কিছু দেরি আছে। মাধাই লক্ষ্য করলো সবগুলি বাড়ির দরজা খোলা, খোলা দরজার পাশে সজ্জিতা স্ত্রীলোক, কোথাও-বা একাধিক। হঠাৎ যেন মাধাইয়ের ভয় ভয় করে উঠলো। সে কোনোদিকে না চেয়ে রাস্তাটা ধরে মুখ নিচু করে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

টেপি ফিরছিলো সওদা করে। সে মাধাইকে এ পথে দেখে অবাক হলো। এ অবস্থায় মাধাইয়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতে সে থেমে দাঁড়িয়েছিলো।

মাধাই বললো—তোমার কাছে আসছিলাম।

—আমার কাছে, কেন্?

ডুবন্ত মানুষ যেমন করে তৃচ্ছকে অবলম্বন বলে আঁকড়ে ধরে তেমনি করে মাধাই টেপির মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

টেপি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলো, তারপরে বললো—তুমি আসো আমার সঙ্গে।

মাধাই টেপির দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখের চশমা থেকে পায়ের চটি পর্যন্ত সর্বত্র সুরুচির চিহ্ন।

হাসি হাসি মুখে টেপি দাঁড়িয়ে আছে। টেপির ঠোঁট দুটিও লাল টুকটুক করছে রঙে।

যে-ভয়ে পালাচ্ছিলো মাধাই সেটা যেন দূর হলো। এমন সঙ্গিনী পেলে কোথাও ভয় থাকে না।

টেপির ঘরে এসে মাধাই হকচকিয়ে গেলো। ঘরটি খুব পরিচ্ছন্ন নয়। দেয়ালের চুনবালির আস্তর এখানে-সেখানে খসে পড়েছে। কিন্তু ঘরের সস্তা আসবাবপত্র ও শয্যা-উপকরণগুলি পরিচ্ছন্ন ও নতুন এবং সেজন্য মাধাইয়ের চোখে অপূর্ব সুন্দর বলে বোধ হলো।

মাধাইকে একটা চেয়ারে বসিয়ে টেপি বললো—চা করি?

—করো।

টেপি নিজে চা করতে গেলো না। হরিদাসী বলে একজন কাকে ডেকে জল ফুটিয়ে দিতে বললো। এরকম অবস্থায় চট করে কথা পাওয়া শক্ত। পথে দাঁড়িয়ে টেপির রূপে মনে যে ঔদার্য এবং সাহস এসেছিলো সেটা এই ঘরের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ক্রমশ ম্লান হয়ে যেতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে এ পল্লীর উদ্দেশ্যটা কালো হয়ে উঠতে লাগলো।

টেপির মনে হলো যদি দিনের কোনো কাজ হতো এতক্ষণে মাধাই বলে ফেলতো। মাধাই তা বলেনি।

হরিদাসী একটা কেটলি করে চায়ের জল দিয়ে গেলো। মাধাইয়ের সম্মুখে চা-বিস্কুট ধরে দিয়ে টেপি বললো—চা খায়ে নেও, তারপর তোমার কথা শুনবো।

খানিকটা সাধাসাধির পর চায়ে হাত দিলো মাধাই।

কিন্তু মুখ নিচু করে চা খেয়ে মাধাই যখন চোখ তুললো ততক্ষণে টেপির সাজ-পোশাকেব পরিবর্তন হয়ে গেছে। চোখে চশমা নেই, গলায় সেই ঝুটা মুক্তার মালা নেই। এ যেন খানিকটা নাগালের মধ্যে একজন।

মাধই বললো—টেপি, মানুষ আসার সময় হলো?

—না। বোসো। আজ মানুষ আসে না। আমাক তোমার মনের কথা কও। এমন হলো কেন্?

—কী হইছে?

—এখানে আসছো কেন্?

মাধাই হাসবার একটা করুণ চেষ্টা করলো।

তখন টেপি বললো—তোমার কষ্ট সওয়া যায় না। দাদা, তুমি শুধু সুরতুন আর ফতেমাকে বাঁচাও নাই। তুমি জানো না, কতবার কত জায়গায় ধরা পড়ে আমি কইছি মাধাইয়ের বুন হই আমি।

হঠাৎ মাধাইয়ের মন ভাষা পেলো—কেন্ রে, দুনিয়ার সব মিয়েমানুষ কি আমার বুন হবি?

সে যেন একটা পরম কৌতুকবোধে হো-হো করে হেসে উঠলো।

মাধাই উঠে দাঁড়ালো। টেপির মনে হলো এমন অদ্ভুত কথা কেউ কোনোদিন বলেনি।

সে বললো—তুমি তো জানোই আমাক ঘরে নিয়ে সুখী হওয়ার পথ আর নাই।

একটু তিক্ত হেসে মাধাই বললো—বুন হবা বললা, বুনই ভালো।

কিন্তু টেপির পল্লীর বাইরে পৃথিবী বহুবিস্তৃত। পাঁচ-সাতদিন উর্ধ্বশ্বাসে জীবন নিয়ে ছুটোছুটি করে মাধাই রেল কলোনীর একান্তে চাঁদমালাকে আবিষ্কার করলো।

এমন সময়ে আবার দেখা দিলো সুরতুন। দু-তিন মাসের ব্যবধানেই সুরতুন তার ধূলিমলিন স্বাভাবিক রূপে ফিরে গেছে। তার কথা ভাবতে ভাবতে মাধাইয়ের মন উদাস হয়ে গেলো। দু-চারদিন আগে এক গোঁসাইয়ের মুখে সে একটা গান শুনেছে: 'শাদা-শাদা পায়রা তোমার উঠোন থেকে মটর খেয়ে যায়। যদি তুমি চাও যে সে পায়রা থাকবে তবে ধরতে যেয়ো না। এই জীবনের কথা, ভাই মানুষ, শোনো, এই অবসরে বলা হলো। সুখকে ফাঁদ পেতে ধরা যায় না'।

পায়রা উড়ে গেছে, সুখের পায়রা, তাই সুখও গেছে। ধরতে গিয়েই তো এই বিড়ম্বনা।

স্কুলের সেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আজকাল নিয়মিত সপ্তাহে একদিন দেখা হয়। বাঁধা রুটিনে মাধাই রেলশ্রমিক সংঘের অবৈতনিক সহ-সংগঠন-সম্পাদক হিসেবে সভাপতি মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যায়। রিপোর্ট দেয়। এবং রুটিন রিপোর্টের দস্তুরমতো তাতে আজকাল যথেষ্ট মিথ্যাও থাকে।

কিন্তু গোঁসাইয়ের গানের পরিসীমায় নিজের মনকে আবদ্ধ করে রাখতে পারলো না মাধাই। সামান্য একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে সে একটা আকস্মিক ধর্মঘট আহ্বান করে বসলো। খবর পেয়ে তার সংঘের অন্যান্য মন্ত্রী ও সভাপতি ছুটে এলো। ব্যাপার কী, মাধাই? কিছুই নয়। ব্যাপারটা একটা বড়ো রকমের ঘটনায় পর্যবসিত হতে পারতো, কিন্তু হয়নি ; কারণ তার আগেই মাস্টারমশাই ও স্টেশনমাস্টারের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলো, একটা সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা গেলো। ঘণ্টাতিনেক বিলম্ব করে গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। মাস্টারমশাই জনান্তিকে মাধাইকে মৃদু তিরস্কার করে বললেন, 'শক্তির অকারণ খরচ করলে, মাধাই'।

কিন্তু মাধাইয়ের কাছে এ সবই মূল্যহীন। স্টেশনের সব কর্মচারী যখন ইউনুস ফিটারের অপমানের কথা, যা ধর্মঘটের মূল কারণ, এবং তার প্রবল শক্তিশালী কিন্তু অনির্দিষ্ট বন্ধুকে নিয়ে আলোচনা করছে, তখন সেই বন্ধু মাধাই বাসায় ফিরে ভাবলো : ইস্টিমবোঝাই এঞ্জিন, মনে কয়, দুনিয়া বাঁধে দ্যাও ল্যাজে, দুনিয়া নিয়ে ছুটবি, ক্যানিস্তাব-টিন-বাঁধা কুকুর যেমন পাগল হয়ে ছোটে। কিন্তুক আজ দিলাম বন্ধ করে। ল্যাও, গলায় দড়ি-বাঁধা কুকুব, কত ছুট্‌বা ছোটো।

মেয়েটির নাম চাঁদমালা, কিন্তু আশ্চর্য এই যে সে নিজেও জানে না তার নাম এটা। সে বলে চাঁদমালা তার নাম নয়, আসলে সে চন্দ্রাবলী। মাধাই বললো, 'চন্দ্রাবলী, একপদ গান করো'।

'আপনে বড়ো বাজে কথা কন্‌'।

'কী আর বাজে কথা কলাম। আজ যা করছি শুনলে তুমি বুঝবা আমি কে। রেলগাড়ি দেখছো? ফোটিন ডাউন? কলকেতা শহরে যায় মাছ আর ঘি, দই আর ছ্যানা নিয়ে। কলাম—যাবিনে আজ গাড়ি। গেলো না'।

চাঁদমালা তার বোকা বোকা কাজল-আঁকা চোখে তাকিয়ে রইলো। ঘরের এক কোণে চাঁদমালার নীলেব বড়ো নাদাটা, তার পাশে একটা নেবানো উনুনের উপরে ইস্ত্রি দুটি। তার পাশে মাধাইয়ের আনা লাইন-দেখা আলো জ্বলছে। চাঁদমালা অত্যন্ত কালো, কিন্তু পালোয়ানি স্বাস্থ্য তার দেহে। দূর থেকে এই স্বাস্থ্যই আকর্ষণ করে। একটু পরিচিত হতেই মাধাই লক্ষ্য করেছে চাঁদমালা কল্পনাতীত বোকা। কাপড় জামা হিসেব করে ফেরত দিতে পারে বটে, পয়সা আদায়টা ঠিক ঠিক করতে পারে না। পশ্চিমা সেই ধোবাটির মৃত্যুর পর থেকে চাঁদমালা মাধাইয়ের মতোই নিঃসঙ্গ।

'কিন্তু চন্দ্রাবলী, গান না হয় না করো, নাচো একটু'।

'কী জ্বালা'!

'চন্দ্রাবলী, মদ খাবা'?

'রোজই তো কন্‌, একদিনও খাওয়ান না'।

'আচ্ছা, শনিবার আবার আসবো, সেদিন আনবো। সিগ্রেট খাবা'?

মাধাই একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে চাঁদমালার হাতে দিলো। চন্দ্রাবলী ভঙ্গিভরে বিছানায় বসে সিগারেট নিলো।

'আচ্ছা, চাঁদমালা, আগে তোমার ঘরে সোডার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ থাকতো, আজ যেন্‌ নাই। কাম ছাড়ে দিলা, দিন চলবে কেমন করে'?

'দুই সপ্তাহ হলো কাপড় আনি নাই। লোকেক কইছি কোমরী-বাত'।

'খালে কী? তোমার মাংস খাওয়ার খরচই তো দিন একটাকা'।

'মাংস খাওয়া ছাড়ে দিছি। আপনে সেইদিন দুই টাকা দিয়ে গিছিলেন, তাতেই এ কয়দিন চালালাম কষ্টেসেষ্টে'।

মাধাই কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'চন্দ্রাবলী, আফিং খাবা'?

'সে খায়ে তো মানুষ মরে'।

'তোমারও বাঁচে কী সুখ'?

চাঁদমালা এক নিমেষে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, 'গাল পাড়েন আপনে, আপনে আর আসবেন না'।

'কেন্, তোমার আগের লোক নাকি আফিং খাতো'।

'আগেও লোক থাকার কথা যদি বিশ্বাস করেন তাইলে আপনে আর আসবেন না'।

'কিন্তুক আফিং-এ নিশাও হয়। খাবা একদিন'?

'তা দিয়েন'।

'তা দিবো। কোকিয়ান খাবা, চন্দ্রাবলী'?

'সে কি'?

'বড়ো নিশা'।

'আপনে কিছুই দেন না। খালি কন'।

মাধাই হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো।

'সে কী, চলে যান'?

'এই নেও, টাকাটা ধরো। আফিং আনতি যাই'।

'আর একটা সিগ্রেট দিবেন। আর আমার একখন্না কাপড়ের দরকার। কিনে দিবেন'?

'তা-ও দিবো'। বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলো মাধাই।

মাধাই সোজা স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলো। একটা চায়েব দোকানে বসে সে বললো, 'ডবল ডিমের মামলেট দ্যাও, আর দুই পিচ্ রুটি। চা যে করবা ষাঁড়ের রক্ত হওয়া চাই'।

চা-রুটিতে নৈশ আহার শেষ করে মাধাই দেয়ালঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো রাত এগারোটা পার হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে চলতে চলতে সে দেখতে পেলো জয়হরি ডিউটিতে আসছে।

'কী ভাই, ডিপ্‌টিতে আসলা'?

'আসলাম, কী করি কও'? জয়হরি মুখ গম্ভীর করে বললো।

'তোমার বড়ো ছাওয়ালডার তাড়াসে জ্বর শুনলাম'।

এখানে বলা দরকার জয়হরির র‍্যাশান কার্ডে একাধিক ছেলের হদিশ পাওয়া গেলেও তার সন্তান বলতে একটিমাত্র মেয়ে, এবং এ-খবর মাধাইয়ের জানা ছিলো।

'না'। অবাক হলো জয়হরি।

'তবে'?

'বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলো'। জয়হরি মাধাইকে বুঝতে না পেরে সত্যি কথাটা বলে ফেললো।

'মন কেমন করতেছে'?

'না। তেমন আর কী'।

এরপর জয়হরিকে অবাক করে দিয়ে মাধাই প্রস্তাব করলো, 'তুমি বাড়ি যাও ভাই, বউয়ের পায়ে হাত রাখে মাপ চায়ে নিবা। আমি তোমার ডিপ্‌টি করে দিতেছি'। জয়হরি ভেবেছিলো এটাও পরিহাস। কিন্তু ততক্ষণে মাধাই দক্ষিণের কেবিনের দিকে জয়হরির ডিউটি দিতে রওনা হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, ডিউটি দিতে দিতে চাঁদমালার কথা মনে পড়লো না। মাধাই নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলো—এটা ধরো বদ্‌লির ব্যাপারের মতো। যার সঙ্গে খুব আলাপ হলো, রানিংরুমে বসে একসঙ্গে গালগল্প হাসিঠাট্টা করলাম সে বদ্‌লি হয়ে গেলো একদিন। সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিলো, মিটে গেলো।

এই হচ্ছে সুরতুন।

কিন্তু মাধাই তখনো বুঝতে পারেনি যে যার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এটা বুঝতে চিন্তা করা দরকার, তাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটলো—সুরতুনের সঙ্গে তার দেখা হলো মিলিটারি ক্যান্টিনের সরু গলিতে। সজ্জিতা নয় সুরতুন। একটু ক্লান্ত দেখালো তাকে, যেমন তাকে সাধারণত দেখায়। কিন্তু তার মুখের দিকে মুখ নামিয়ে অনেকটা সময় নীরবে চেয়ে ছিলো মাধাই। এত ঘনিষ্ঠ সে-দেখা যে সুরতুনের চোখের সূক্ষ্ম লাল শিরাগুলি তার চোখে পড়ছিলো, নিশ্বাসে নিশ্বাসে তার বুকের কাছে যে অস্পষ্ট নীল শিরাটা থরথর করে কাঁপছিলো সেটিও।

ঘরে ফিরে তার মনে পড়লো . সুরতুন তিরস্কারের এমন সুযোগ পেয়েও ছোটো একটি ভীত মেয়ের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিজের কোনো অপরাধের জন্য দুঃখপ্রকাশ করবে।

সে তখন ভাবলো—আচ্ছা বোকা আমি। তখন-তখনই সুরতুনকে ডেকে আনার জন্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ; কিন্তু এগিয়ে যেতে পারলো না, খানিকটা সময় তার কোয়ার্টারের সম্মুখে অস্থিরভাবে পদচারণ করে বেড়াতে লাগলো।

মাধাই একদিন মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে গেলো।

'কে, মাধব? এসো, এসো। এমন অসময়ে যে'?

কথাটা পাড়া সহজসাধ্য নয় ; সূত্র হিসাবে যতগুলি কথা মাধাই মনে মনে স্থির করলো কোনোটিই তার পছন্দ হলো না। শেষ পর্যন্ত সে বলে ফেললো, 'আন জাতের মেয়ে বিয়ে করার নিয়ম কী'?

মাস্টারমশাইয়ের কৌতুক বোধ হলো। সেটা দমন করে সে বললো, 'তুমি করবে নাকি'?

'যদি করি মন্তর পড়ার কী হবি, পূজার কী হবি'?

'ওসব করতেই হবে এমন কী কথা আছে'?

'ওছাড়া অন্য মিয়েমানুষ আর বউয়ে কি তফাৎ থাকে'?

'তারা যদি হিন্দু হয় তবে মন্ত্রপড়ার ব্যবস্থা করা যায়'।

'আর যদি হিন্দু না হয়'?

'মাধাই, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সরকারি আইন আছে'।

'সেরকম বউ কি লোকে গণ্যমান্য করে'?

'তা করে বৈকি'।

মাধাই মুখ নিচু করে বসে রইলো, তারপর হঠাৎ অভিমানের সুরে বললো, 'যুদ্ধের হুড়-হাঙ্গামায় আমি যেন বুঝতে পারি নাই আমি কী চাই। আপনেরা ভদ্দরলোক হয়েও কেন ধরবের পারলেন না আমার কী দরকার। সংঘের কাজ-কামে তারপরেই লাগায়ে দিতে পারতেন'।

বক্তব্যটিকে বিশদ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে মাধাই উঠে পড়লো। সমগ্র দিনটি সে মাস্টারমশাই-এর কথাটা একটি মূল্যবান আহরণের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। একসময়ে সে স্থির করলো—কিন্তু তারও আগে নিজে পরিষ্কার হতে হবে। চাঁদমালার মলিন শয্যা পরিহার নয় শুধু, নিজের এতদিনের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, শয্যা, সবই যেন পরিহার্য।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে চাঁদমালার কথা মনে হলো। তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা, তার বোকামির জন্য একটা সহানুভূতি অনুভব করতে লাগলো সে। তাহলে এটাই কি পাপ? কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে প্রতিভাস্ফুরণের মতো একটা কথা তার মনে হলো—গঙ্গাস্নান করে পরিষ্কার হওয়া যায়। একদিনে হবি নে। দিন দশ-পনেরো গঙ্গার ধারে থাকে রোজ স্নান করা লাগবি।

কথা শুধু কথাই নয়। জয়হরিকে বললো মাধাই, সে কাশী যাবে, অন্য কাউকে বললো মাসির বাড়িতে যাচ্ছে। তীর্থযাত্রার কথা পূর্বাহ্ণে প্রকাশ করলে ফলশূন্য হয় পরিক্রমা, এরকম একটা কথা সে কখনো

কারো কাছে শুনে থাকবে, তাই এত ছলনা। প্রকৃতপক্ষে সে মনিহারিঘাটে যাওয়াই স্থির করলো। গ্রামে থাকতে সে শুনেছিলো পিতৃপুরুষের অস্থি বিসর্জনের পক্ষে মনিহারিঘাটই প্রশস্ত। তা যদি হয় তবে তার চাইতে পবিত্র কে?

মাধাই সত্যি ছুটি নিলো, সত্যিই একদিন ট্রেনে চেপে বসলো। সে-সময়ে সুরতুনকে একবার দেখার লোভ হলো তার।

সুরতুন লক্ষ্য করে দেখলো, সে জীবনের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। যতদিন মোকামের দর আর এখানকার দরের পার্থক্য লাভজনক থাকবে ততদিন গোঁসাইয়ের এই কুটিরেই সে বাস করবে। অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ, তবু দুবেলা আহারের নিশ্চিত সুযোগ। স্বাবলম্বনেব তৃপ্তিটাও যেন উপভোগ করা যাচ্ছে।

একদিন বন্দরের দোকানগুলির সম্মুখ দিয়ে চলতে চলতে সে হাসি হাসি মুখে থেমে দাঁড়ালো। একটা বিড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ব্যাপাব। একজন বয়স্ক লোক মাথায় লালপাগড়ি বেঁধে, গলায় হাবমোনিয়াম ঝুলিয়ে আর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গান কবছে, নাচেব ভঙ্গিতে পা ঠুকে ঠুকে ঘুঙুর বাজাচ্ছে। আর দুটি ছেলে রাধাকৃষ্ণ কিংবা রাজারানী সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন বেলা হয়েছে। গান বাজনা বেশিক্ষণ আর চললো না। মূল গায়ক গলা থেকে হারমোনিয়াম খুলে কাছের একটা চায়ের দোকানে বসলো। রানীও তার কাছে রইলো, কিন্তু রাজা চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে সুরতুন যেখানে বসে চাল বিক্রি করছিলো তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'আমাক চিনছো'?

'হয়, চিনলাম। রানী কি তবে জয়নুল? কবে আসছিস'?

'পেরায় চারদিন'।

'ইযাজ কনে'?

'তা কী জানি'।

সোভান তাদের মাস দু-একের ইতিহাস গলগল কবে বলে গেলো। তার সারমর্ম এই : কিছুদিন ভিক্ষা করার পর তারা অবশেষে মোকামের দিকে এক শহবে এক বিড়ির কারখানায় চাকরি নিয়েছে। বিড়ি বাঁধতে পারে না, দিনে দশ-বারো ঘণ্টা একটা টিনের পাতের মাপে বিড়ির পাতা কাটাই তাদের কাজ। দু'বেলা হোটেলে খায়, রাত্রিতে সেখানকাব স্টেশনে শোয়। এখন তারা সফরে বেরিয়েছে, ফিরে গিয়ে সেই কাজই করবে আবার।

যাবার সময় সোভান বললো, 'যাওযার আগে তোমাব হাতের রান্না খায়ে যাবো'।

চার-পাঁচ দিন পরে এক সন্ধ্যায় টেপির মায়ের ঘরের কাছাকাছি এসে সুরতুন জয়নুল, সোভান আর তাদের সঙ্গী হারমোনিয়ামওয়ালাকে আবিষ্কার করলো। 'কি রে, তোরা আসছিস'?

'আলাম, রাঁধে খাওয়াও। এনাকেও ধরে আনছি'। কিন্তু অপরিচিত বয়স্ক একজন লোককে সে কী করে সমাদর করবে? সুরতুন একটু ইতস্তত করে বললো, 'তোদের দুইজনেক না হয় রাঁধে দিলাম, কিন্তুক ওনাক কী রাঁধে দিবো? রাঁধে দিলেও কি খান'?

লোকটি এই প্রথম কথা বললো, বাবরি চুল দুলিয়ে সে বললো, 'বেহুলা যদি রাঁধে, খায় না কে? যদি কও, সুন্দবি, হাটবাজার করে আনি'।

সোভান লোকটির ভুল ধরিয়ে দিলো, 'ওর নাম সুরো, সুন্দরি না। এখন না হয় আমরা মাসি কবো'।

লোকটি বললো, 'তা ধরো যে সুরৎ আর সুন্দর একই হলো'।

সুরতুনের নীরবতায় সম্মতি পেয়ে যেন লোকটা বাজারে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

সুরতুন বললো, 'তাইলে কলাপাতা, আনাজ, তেল আর ঝাল মসলা আনবেন'।

সে রাতটি শুক্লপক্ষের ছিলো, কাজেই পরিচ্ছন্ন উঠোনটা চাঁদের আলোয় ধব্‌ধব্ করছিলো। জয়নুল সারাদিনের ক্লান্তিতে উঠোনে গামছা পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সোভান বয়স্কদের ভঙ্গিতে বসে বিড়ি টানছে। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সুরতুন দেখতে পেলো লোকটি হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

সুরতুন তাকে বললো, যেমন করে গ্রামের মেয়েরা ফকির-বাউলকে বলে, 'আর একটা গান করেন'।

লোকটি কিছু বললো না। কিন্তু সুরতুন রান্না করতে করতে শুনতে পেলো, একটা গান ধরেছে লোকটি।

গোঁসাই গান করে। তখন তার হাসি হাসি মুখের দিকে চাইলে সুরের চাইতে কথা, এবং কথার চাইতে গায়ককে বেশি ভালো লাগে। কিন্তু এ লোকটির গানের তুলনায় গোঁসাইয়ের গানকে নিষ্প্রভ মনে হয়। বহুদিন সে যাত্রার দলে সখী সেজে গান করেছে, এবং এখন যে গানটি করছে সেটা পানোন্মত্ত কোনো রাজার নৃত্যশালার দৃশ্য থেকে আহরণ করা। সুরতুন না জেনে ভালো কবেছিলো।

এদের রাত্রির ট্রেন ধরে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আহারাদির পব প্রথমে জয়নুল এবং পরে সোভান বিশ্রাম করতে চাইলো। লোকটিও রাজী হতে পেরে খুশি হয়ে বললো, 'কাল সকালেব ট্রেনে গেলিও যাওয়াই হবি'!

জয়নুল ঘবের হদিশ জানতো। সে ঘরে গিয়ে শুয়ে পডলো। সোভান নিজের বয়সের মর্যাদা দেখানোর জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে জয়নুলকে অনুসরণ করলো। সারাদিনের বোদ লেগেছে গায়ে, নেচে নেচে পথ চলেছে তারা—এমন নিশ্চিন্ত মায়ের কোলেব মতো আশ্রয় পায়নি অনেক দিন। সোভান আর জয়নুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো।

রান্নাঘরের কাজ শেষ করে এসে সুরতুন এইবার চবম বিব্রত হয়ে পড়লো। ঘবে ঢুকে দেখলো জয়নুল ও সোভান দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবরিওয়ালা লোকটি উঠোনে তার হারমোনিয়ামের পাশে বসে আছে। এখন সে কী বলবে, কী করবে, এই হলো সুরতুনের চিন্তা।

'ছাওয়ালরা ঘুমালো'?

'তা ঘুমালো'।

তারপরই আবার দুজনেই থেমে গেলো।

লোকটি একটা বিড়ি ধরিয়ে চিন্তা করাব মতো মুখ করে বসে থেকে থেকে অবশেষে বললো, 'এ বাড়ি তোমার? এই জমি-জিরাতও তোমার'?

'না'।

'তবে পরের বিষয় পাহারা দেও'?

'তাও না'।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ করে থেকে লোকটি বললো, 'তাইলে এক কাম করা যাক। হারমনি আর ঝোলা-ঝক্কর ঘরে থাক। ইস্টিশনে যাই, কাল পরভাতে আসবো'।

লোকটি বিদায় নিলে সুরতুন শুতে যাবে এমন সময়ে মনে পড়লো তার শাড়িটার দু-এক জায়গায় সেলাই করা দরকার। কুপিটার পলতে বাড়িয়ে দিয়ে সূচ-সুতো নিয়ে বসলো সে। কয়েক মুহূর্ত পরে পায়ের শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। সে তো গোঁসাই নয় যে বলবে—দরজা খোলা আছে, মানুষ হও এসো।

'জাগে আছো? পথ চিনে ইস্টিশনে যাবো এমন ভরসা পালাম না। চাঁদের আলোয় পথঘাট সব সমান দেখাতিছে'।

হারমোনিয়ামওয়ালা ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'ভাবলাম কপালে যা আছে, ফিরে যাওয়াই

লাগবি'।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুরতুনের মনে হলো, ঝাঁকড়া চুল আর মুখের লাবণ্যহীনতায় লোকটিকে যত বয়স্কই মনে হোক এই হাল্কা-পলকা লোকটি প্রকৃতপক্ষে ইয়াজদের বয়সী হবে, অন্তত সে সুরতুনের নিজের চাইতে বয়সে ছোটো হবে এতে আর সন্দেহ নেই। লোকটি যেন ভয়ে হাঁপাচ্ছে।

'ভয় পাইছো'?

'না, ভয় আর কী? নতুন জায়গা, গা ছমছম করে'।

'এখন আর কোন কাজই-বা আছে, বসে বসে গান করো'।

লোকটি গান ধরলো কিন্তু গাইতে পারলো না, তার গলা কেঁপে কেঁপে যেতে লাগলো। থেমে গেলো সে।

'কী হলো'?

'হয় না'।

'কেন্? এখনো ভয়'?

'জান্নে'।

অনেকদিন যাত্রা করেছে লোকটি। নিজের কথা না বলে, কিংবা নিজের কথা কী করে বলা যায় তা বুঝতে না পেরে, সে নায়িকা সেজে দাঁড়ালে তাকে লক্ষ্য করে অন্য কেউ হয়তো যা বলেছে, সে কথা কয়টি সে বলে ফেললো, 'প্রাণ পুড়ে যায়, পাদপদ্ম বিনে শীতল হয় না'।

এও যেন আর একটি গান, তেমনি ভাষা। সুরতুন বললো, 'পাদপদ্ম কী'?

সে বললো, 'কন্যে, তোমার বিহনে আহারে আমার রুচি নাই'।

সুরতুন খিলখিল করে হেসে উঠলো।

এরকম অনুভব সুরতুনের জীবনে কখনো হয়নি। হারমোনিয়ামওয়ালার অবাস্তব ভাষা, অবাস্তব ভঙ্গি, তার ভয়, তার রোগা-পক্কা চেহারা, তার বয়স সম্বন্ধে সুরতুনের নিজের ধারণা সুরতুনকে এক ধরনের সাহস যুগিয়ে দিলো। গোঁসাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টেপির মা যেমন টিপে টিপে হাসে তেমন অকুতোভয়তা তার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হতো। কিন্তু তার নিজের মধ্যে কোথাও লুকনো ছিলো এমনি যেন তার এই সাহসী সত্তার সাময়িক প্রকাশ। তার ইচ্ছা হলো সে টেপির মাকে অনুকরণ করবে। সে বললো, 'পেরাণের পোড়ানি কমছে'?

হারমোনিয়ামওয়ালা কথাটায় প্রশ্রয় পেয়ে এগিয়ে এসে সুরতুনের একখানা হাত নিজের হাতে নিলো।

কালো রোগা রোগা হাতের উপর নিজের পুষ্ট হাতখানা লক্ষ্য করলো সুরতুন। সে বললো, 'আমার আঙুলগুলি কী হবি'?

'সুরতুন, কও, তুমি আমাক দয়া করবা'?

সুরতুন খিলখিল করে হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চাঁদের আলোয় চরাচর আচ্ছন্ন। সে নিজের অভূতপূর্ব অনুভবটাকে নির্ণয় করার চেষ্টা করতে লাগলো। একেই কি সাহস বলে! তার সঙ্গীরা কি এর অভাবকেই তার মধ্যে আবিষ্কার করে আলোচনা করতো! এর অভাবেই কি সে মাধাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে?

'আমি আসবো'?

'আসো না কেন্, কে আটকায়'। সুরতুন হাসলো।

কাছে এসে লোকটি বললো, 'সুন্দরি, আজকের এই চান্দের আলোয়—'

সুরতুন বললো, 'একটুক জল খাবো, গরম লাগতিছে। পুকুরের থিকে জল আনে দেও'।

হারমোনিয়ামওয়ালা বললো, 'কলস নিয়ে যাতে পারি যদি পথ দেখাও'।

'তা দেখাবো'।

দুপুররাত্রিতে পুকুর থেকে জল আনতে যাচ্ছে লোকটি, সুরতুন আগে আগে যাচ্ছে। পথে খানা-খন্দ ঝোপঝাড়। লোকটি একবার হোঁচট খেয়ে বললো, 'বাবা, ই কী পথ'!

পথের যে জায়গাটায় সবচাইতে বেশি জঙ্গল সেখানে হঠাৎ সুরতুন অদৃশ্য হয়ে গেলো। হারমোনিয়ামওয়ালা দেখলো, সে যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকেই আশশেওড়ার ঝোপ, আর সেগুলির মধ্যে মধ্যে সরু সরু পথ। ঝোপগুলি যেমন প্রত্যেকটি অন্যটির মতো দেখতে, তেমনি সেই সরু পথগুলি।

'কোথায় গেলা, সুরতুন? পুকুরের পথ কোন দিকে'?

সাড়া না পেয়ে লোকটি ভাবলো সুরতুন এগিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খানিকটা ছুটে গিয়ে দেখলো যে পথ ধরে সে চলেছে সেটার প্রান্ত একটা বড়ো ঝোপড়া জঙ্গলে গিয়ে শেষ হয়েছে।

থমকে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ামওয়ালা ডাকলো, 'সুরৎ'।

কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সে ভাবলো, পাশের ছোটো ঝোপটা ডিঙিয়ে যেতে পারলে সুরতুনের কাছে পৌঁছনো যাবে। বলপ্রয়োগ করে ঝোপ সরিয়ে চলতে গিয়ে পাঁচ-ছটা কিংবা তারও বেশি কাঁটা তার হাতেপায়ে বিঁধে গেলো। ইস্ উস্ করে ঝোপটা থেকে বেরিয়ে এসে সে বললো, 'তুমি হাসো, সুবতুন, আমাব পরাণ যায়'।

'কেন্, কী হলো'?

স্বরটা যেন তার বাঁ দিক থেকে এলো। সে দিকটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। অনেকটা দূর ঘাসে-ঢাকা মাঠ দেখা যাচ্ছে। হারমোনিয়ামওয়ালা দৌড়ে খোলা জায়গাটা পার হতে হতে বললো, 'এইবার তোমাক ধরছি'।

অনেক দূরে বড়ো জঙ্গলটার মাথায় মাথায় কয়েকটা পাখি কবাক্ কবাক্ করে উঠলো।

পিছনে ফিরে সে দেখবার চেষ্টা করলো কুঁড়েঘরগুলি কোথায়। ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে, সেগুলি সহজেই চোখে পড়লো। হারমোনিয়ামওয়ালা কলসি মাটিতে রেখে কর্তব্য চিন্তা করলো। সে শুনেছে এর আগে এমন নির্জন মাঠে এমনি ঘটনা ঘটেছে। দিশেহারা মানুষ সারারাত পথে-বিপথে ছুটে সকালের দিকে কোনো মজাপুকুরে কিংবা দ'য়ে ডুবে প্রাণ হারায়। ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাকে সে দেখেছিলো সে হয়তো সুরতুন নয়। হয়তো-বা সুরতুন ঘরে ফিরে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছে। ঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে তার মনে হলো—তা না হলে এমন রূপ, এমন হাসি!

পিছন থেকে কে যেন খিলখিল করে হাসলো, মিঠিয়ে মিঠিয়ে বললো, 'পালাও কেন্'?

তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। পথের মাঝখানে সুরতুন দাঁড়িয়ে।

হারমোনিয়ামওয়ালা বললো, 'ঘরে চলো, জল আনবের আমি পারবো না'।

'আমার কলস কোথায়'?

'হারাইছে'।

ঘরে ফিরে এসে হারমোনিয়ামওয়ালা সোভান-জয়নুলকে ডেকে তুললো, 'রাত ভোর হয়, ট্রেন ধরবের হবি নে'?

ঘুমন্ত ছেলে দুটিকে ঠেলতে ঠেলতে খানিকটা দূর অত্যন্ত দ্রুত হেঁটে একসময়ে সাহসের ভাব নিয়ে হারমোনিয়ামওয়ালা পথের উপরে দাঁড়ালো। ইতস্তত করে জয়নুলকে সে বললো, 'আচ্ছা, তোরা কস, এখানে তোরা আগেও আসছিস। কখনো রাত করে পুকুর থিকে জল আনতে কেউ কইছে'?

'না। তা কবি কেন্'?

হারমোনিয়ামওয়ালা কী ভাবলো, তারপর মাথা দুলিয়ে বললো, 'সে বয়স তোদের হয় নাই'।

পানীয় জলের খোঁজে সুরতুন রান্নাঘরে গেলো। ততক্ষণে কুপির তেল নিঃশেষে পুড়ে গেছে। হাতড়িয়ে টেপির মায়ের কলসটি সে বার করলো। চাঁদের আলোয় নিয়ে দেখলো কলসের তলায় জল চকচক করছে। পোকামাকড় থাকতে পারে এই ভেবে নিজের পরনের শাড়ির আঁচলটায় কলসের মুখ ঢেকে সেই কাপড়ে মুখ রেখে চুষে চুষে অনেকক্ষণ ধরে জলটা খেলো সুরতুন।

শরীরটা কিছু স্নিগ্ধ হয়েছিলো। সে ভাবলো, এখুনি ঘুম এসে যাবে।

সকালে ঘুম ভাঙলেও অনেকটা বেলা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ কবে গড়িয়ে গড়িয়ে একসময়ে সে উঠে বসলো। স্বগতোক্তি কবলো—রাত-বিরেতে এমন ছুটোছুটি করলে গায়ে ব্যথা হয়। সে মোকামে গেলো না। তখন কেউ যদি সুরতুনের মুখ দেখতো তবে তাব মনে হতে পাবতো তাব চাহনির পরিবর্তন হয়েছে, চোখের কোণ দুটি চঞ্চল হয়েছে।

একদিন ট্রেনে উঠতে গিয়ে সুরতুন নিঃশব্দে সরে এলো। গাড়ির কামরার সামনে মাধাই দাঁড়িয়ে।

সে-ট্রেনেই উঠলো না সুরতুন।

মাধাইকে আজ অন্যরকম দেখিয়েছে। রেলের বোতাম বসানো শাদা একটা কোট পরেছে মাধাই বাবুদের মতো। খাকির পোশাকে নেই বলেই কি এমন দেখিয়েছে? তাকে বলশালী বলে বোধ হলো না।

নিজের হাসি সবসময়ে দেখা যায় না, কিন্তু সুরতুন আজ মাধাইয়ের কথা ভাবতে মিঠিয়ে মিঠিয়ে হাসলো একবাব।

এক দুপুরে বসে বসে সে নিজেব টাকার হিসেব নিলো। গেঁজে ও আঁচলে ভাগ করে বাখা টাকা-পয়সা নোট গুনে-গেঁথে দেখলো, তেরো টাকায় পরিণত হয়েছে তার মূলধন।

টাকাপয়সা সব আঁচলে বেঁধে সে বেরিয়ে পড়লো।

দিঘা বন্দবের দোকানের পথ এখন তাব অপবিচিত নয়।

বাজাবের ঠিক মাঝখানে একটা কাপড়ের দোকানের সম্মুখে গিয়ে সুরতুন দাঁড়ালো।

'কী চাই'?

'শাড়ি'।

দোকানদার তাকে দু-একখানা শাদা শাড়ি দেখালো।

সুরতুন বললো, 'রঙিন নাই'?

দেখেশুনে একটি শাড়ি সে পছন্দ করলো, কালো জমিতে লাল চওড়া দাঁত-দেওয়া পাড়। কিন্তু দাম দিতে গিয়ে সে বিপন্ন বোধ করলো। দশ টাকায় একখানা কাপড়! কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাড়িটা কিনলো সে।

শেষ সম্বল অবশিষ্ট তিনটি টাকা শক্ত করে আঁচলে বেঁধে বাজারের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো সে।

হঠাৎ তার চোখে লাগলো, তিনজোড়া রেশমি চুড়ি কিনলো সে।

বাজার থেকে বেরুনোর পথে তার চোখ পড়লো একটা ইরানীর দোকানে।

ইরানী বললো, 'সুর্মা লেবে'?

'কতকে'?

'দো-আনা শিশি'।

'দেও একটা। ওটা কী, সাপান'?

'দো-আনা'।

'দেও একটা'।

এই সময়ে দোকানের এক অংশে সুরতুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। লাল মোটা কাচের বড়ো বড়ো পুঁতির

তৈরি একটা মটরমালা। মটরের মধ্যে মধ্যে আবার কাঠি পরানো। সুরতুন মালাটা চেয়ে নিয়ে হাতে করে ওজন দেখলো। সুতোয় গাঁথা নয়, পেতলের তারে বসানো, লক্ষ্য করলো। তারপর সে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, তখন ইরানী নিজে উঠে এসে মালাটা তাকে পরিয়ে দিলো। ঠাণ্ডা কাচ গায়ে লেগে সুরতুনের গা হিম হয়ে গেলো।

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কতকে'?

ইরানী বললো, 'তিন রুপেয়া'।

সুরতুন হারটিকে খুলবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগলো। সে বললো, 'তিন ট্যাকা নাই'।

'কত আছে'?

'দুই ট্যাকা। তা আমার খাতে আট আনা লাগবি'।

ইরানী ভঙ্গি করলো, মিথ্যা বললো, অবশেষে বললো, 'খানেমে চার আনা রাখো'।

সুরতুন চার আনা পয়সা রেখে আর সব দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

সুরতুন প্রথমে স্থির করলো বাঁধের ডোবায় স্নান করতে যাবে। তেমনি করে বিসর্জন দেবে পুরনো কাপড় যেমন একবার দিয়েছিলো। মাথা ঘষবে, হাতেপায়ে সাবান দেবে। আয়না? স্নানে যাওয়ার পথে অবশিষ্ট সম্বল সিকিটা দিয়ে একটা চিরুনি, একটা খুব ছোটো আয়না হয় কিনা দেখতে হবে।

কিন্তু কোথা থেকে এক লজ্জা এসে বাধা দিতে লাগলো। বাঁধে যাওয়া হলো না। বিকেলের আলো যখন পড়ে এসেছে পুকুর থেকে সে স্নান করে এলো। মাথা ঘষা হলো না কিন্তু শুধু জল দিয়ে চুলের ময়লা যতদূর সম্ভব উঠিয়ে দিলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নতুন শাড়ি পরে সুরতুন দিঘার পথ ধরলো।

মাধাইয়ের কোয়ার্টার্সের অনতিদূরে তাকে একবার থামতে হলো। ঘরের ভিতরে যেন মানুষ চলার শব্দ হচ্ছে, আর সে শব্দ তার নিজের বুকের মধ্যে গিয়ে ঘা দিচ্ছে। বুকের নিচে তার অন্তরদেশ থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে সে একটা খুঁটি চেপে ধরলো। পা টাল খাচ্ছে, সেটা সামলাতে হবে, পালানোর প্রবল ইচ্ছাটাকেও বাধা দিতে হবে।

খোলা জানলায় চোখ পড়তে সে বিস্মিত হলো, বিস্ময়ের টানে এগিয়ে গেলো। মাধাই ঘরে নেই, এমনকী তার শয্যা-উপকরণ, জামাকাপড় কিছু নেই। সে কি ঘর ভুল করেছে? বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ঘরখানিকে চিনবার চেষ্টা করলো।

তখন তার মনে হলো, এখনই সে স্টেশনে ছুটে যাবে। রেল কোম্পানির যত লোক আছে সকলকে সে জিজ্ঞাসা করবে মাধাই কোথায় গেলো।

কিন্তু দুর্নিবার একটা অভিমানও হলো তার—কেন্, চলেই যদি যাবা আমাকে কলেই হতো সেদিন? ঝরঝর করে জল নামলো চোখ থেকে। অন্ধের মতো কিন্তু দ্রুতপায়ে টেপির মায়ের বাড়ির দিকে সে হেঁটে যেতে লাগলো।

কখনো সে নিজেকে দুষলো—বেশ হইছে! মাধাই কি হারমোনিওয়ালা!

দুদিন সুরতুন ঘর থেকে বার হলো না। তৃতীয় দিনে টেপির মা ফিরলো।

'একা যে'?

'গোঁসাই ঘর তোলার জায়গা দ্যাখে'।

'সে কী! কেন্'?

'তা শোনো নাই? এদিকে ইঁটের ভাটা হবি। তার জন্যি না, গোঁসাই কয় সে-জায়গা এর চায়ে ভালো'।

'ও কী'?

'আসতে আসতে দেখলাম পথে পড়ে আছে—বনবিল্লাই। নিবি'?

'কী করবো'?

'পোষ না কেন'।

আহারাদি করে, গোঁসাইয়ের জন্য ভাত নিয়ে টেপির মা চলে গেলো। দুপুরটা সুরতুন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। বনবিড়ালটার সামনের একটা পা ভেঙে গেছে। সেটা ঘরের এক কোণে বসে সুরতুনের দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইলো। টেপির মায়ের কথা মনে এলো। কোথায় এর চাইতে ভালো জায়গা পেলো কে জানে। এ ঘরগুলির জন্য এতটুকু মোহ আছে বলে মনে হয় না, যদিও হয়তো এর কিছু কিছু অংশ এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে তারা। কিংবা যদি সুরতুনের প্রয়োজন হয় এখানে ঘর এমনই থাকবে।

উদাস কথাটা সুরতুন জানে না কিন্তু একটা ঔদাস্যে তার মন ভরে উঠলো। দুপুরের পর একসময়ে চাল আনার ঝোলাটায় তার সামান্য যা সম্বল তা পুরে নিয়ে সুরতুন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। কোনদিকে যাবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

চলতে শুরু করে তার মনে হলো বনবিড়ালটার কথা। বিস্মৃতপ্রায় অতীতে তার যে বনবিড়াল পুষবার সখ ছিলো তা মনে হলো।

বনবিড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে সুরতুন বললো, 'মাদী! তা মিযেমানুষ হয়ে পরাক্রোম দেখাবের যাওয়া কেন্'?

প্রাণীটি হিংস্র। সেটার আহত পাটাকে বাইকে রেখে অন্য থাবাগুলি চটের থলি দিয়ে ঢেকে নিলো সুবতুন।

২১

কালের হিসাবে তিন-চার মাস সময় পিছিয়ে গিয়ে সুমিতিদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মনসার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। দু মাসের ছেলেটিকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেছে।

অনসূয়া ক্লান্তি বোধ করছেন। তাঁর সংসারে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে কিছুকাল থেকে। সদর থেকে মজুর মিস্ত্রি মিলে প্রায় দশ-পনেরোজন এসেছিলো। চারুর তত্ত্বাবধানে তারা খিড়কির ঘাট থেকে কাছারীর বারান্দা পর্যন্ত বাড়ির যেখানে-সেখানে বাঁশ বেঁধে বেঁধে মেরামত করে বেড়ালো প্রায় পনরো-বিশ দিন। তারা চলে গেলো, এলো একদল উড়ে মিস্ত্রি, প্রায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি। তাদের কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। তাদের অধিকাংশ চলে গেলেও এখনো কয়েকজন আছে। চারু এদের তত্ত্বাবধান করে না শুধু, এদের কাছে কিছু কিছু কাজও শিখছে। এরা ইলেকট্রিকের এবং জলের কলের মিস্ত্রি। এদের কয়েকজন নাকি ছোটো ডায়নামোটা চালানোর জন্য থেকে যাবে। অন্দরের সেই স্তব্ধ শান্তি আর নেই।

আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন আগে এমনি একটি সাময়িক ব্যবস্থার শেষ পর্যায় শেষ হয়েছিলো। গ্রামের ডাক্তারের পরামর্শে সদর থেকে ডাক্তার আর তার পরামর্শে একজন যাত্রী এসেছিলো। সদরের ডাক্তার সপ্তাহে একদিন করে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতো। ধাত্রী একটানা প্রায় তিন মাস ছিলো। সদরের ডাক্তার বেশ জোর দিয়েই বলেছিলো, স্বাস্থ্য কিছু খারাপ তা নয়, আজকাল আমরা অকারণে রিস্ক্ নিতে চাই না।

ধাত্রী যাওয়ার আগে হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'আবার তো আসতে হবে'। কী বলা উচিত সহসা অনসূয়া খুঁজে পেলেন না। সে যে সুমিতিকে ইঙ্গিত করেছে এ তো সহজেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু সুমিতির ব্যাপার কি সত্যি তাই? এ যদি কেউ জানতে পারে যে তিনি চোখের সম্মুখে মেয়েটিকে রেখেও বুঝতে পারেননি তাতে এটাই প্রমাণ হবে এ বাড়ির শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে এমন একটি ব্যবধান আছে

যে এমন একটি ব্যাপারও শাশুড়ির চোখে পড়েনি। অনসূয়া কোনো কথায় না গিয়ে বলেছিলেন, 'যদি রাখি এখানে, তোমাকেই আবার আসতে হবে বৈকি'।

কথাটা এখন মনে হলো। এ বাড়ির অন্য কারো মুখে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার আগেই তাঁরই জানানো উচিত দু-একজন বর্ষীয়সীকে। তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, শুধু তিনি আলোচনাটা কীভাবে গ্রহণ করবেন তা বুঝতে না পেরে হয়তো চুপ করে আছে।

কিন্তু তারও আগে। এটা সুমিতির মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই উপেক্ষার ভাবটি। অনসূয়া সুমিতির ঘরে গেলেন।

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার : তাঁর বাড়ির এই ঘরখানিতে যা নাকি তাঁর নিজের মহলের অঙ্গীভূত, সেটায় আজ প্রায় চার মাস পরে আবার এই এলেন। অথচ এর আগে এটায় সপ্তাহে একবার আসতেন দাসীদের ঝাড়পোঁছের কাজ তদ্বির করতে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে সুকৃতির ছবিটিতে চোখ পড়লো প্রথমে। তারপর সুমিতির ছোটো লিখবার টেবিলটিতে। টেবিলটার উপরে দু-তিনখানা বই, তার পাশে একটা জাপানি ভাস-এ একটা লাল গোলাপ রাখা হয়েছে, সুমিতির কলম আর প্যাডের কাছে একটি পোস্টকার্ড সাইজের ফটো। মায়ের চোখ, ফটোতে ছেলের চেহাবা আবিষ্কার করার জন্যে ফটোকে তুলে নেওয়াব দরকার হলো না, মাথা নিচু করে দেখতেও হলো না। কিন্তু ফটোতে চেহারা এত অস্পষ্ট যে কখনো কারো তৃপ্তি হতে পারে না। আর গোলাপ ফুলটিও যেন কেমন বিবর্ণ। একটা যেন সংকোচের ভাব কোথাও ছড়ানো রয়েছে।

সুমিতি জানলার গোড়ায় একটা সোফায় বসে ছিলো। সোফাটার পিঠের আড়াল থেকে সুমিতিকে দেখা যায়নি। অনসূয়া ফিরতে গিযে তাকে দেখতে পেলেন।

'সুমিতি'!

সাড়া দিয়ে সুমিতি উঠে দাঁড়ালো।

অনসূয়া এগিয়ে গিয়ে সুমিতির সোফাটায় বসে তাকেও বসতে বললেন। অনসূয়া বললেন, 'ধাত্রীকে এখন খবর দেওয়া দরকার। সে এসে থাকুক এখানে, কি বলো'? অকস্মাৎ কথাটা শুনে সুমিতি লজ্জায় সিঁদুরমাখা হয়ে গেলো। সোজা হয়ে বসে থেকে যতদূর সম্ভব মুখ নামানো যায় তেমনি করে সে নিচের দিকে চেয়ে রইলো। তার স্বামীর মায়ের পক্ষে এমন প্রশ্ন তো খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যহ দেখা হয় না বলে প্রশ্নটা এতদিন ওঠেনি। সংকোচে ও কুণ্ঠায় মনসাকে সে ঘোষণা থেকে নিরত করেছিলো বলে বাড়ির সর্বত্র প্রচারিত হয়নি। কিন্তু যে দাসী তার ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার চোখেই হয়তো ধরা পড়েছে। ধাত্রীর চোখে ধরা না পড়লেই অবাক হতে হতো। অনসূয়া বললেন, 'প্রথম সন্তান কিনা, তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়। তুমি কি এখানেই থাকবে'?

কিন্তু সুমিতি কোথায় থাকবে এ প্রশ্নটা করা তাঁর উচিত হয়নি। প্রথম কথা ওই যে, এই মেয়েটি অন্য সব বিষয়ে যত অভিজ্ঞ হোক, সন্তানবহন এই প্রথম করছে, এবং তার পক্ষে কোন অবস্থায় কী করা সম্ভব এবং নিরাপদ এটা অনসূয়ারই বলে দেওয়ার কথা। দ্বিতীয় কথা, তাদের কলকাতার বাড়িতে এখন কারা আছে এবং তাদের পক্ষে এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা সেটাও চিন্তা করে দেখা দরকার।

সেজন্য অনসূয়া বললেন, 'এ সময়ে অনেক কিছু চিন্তা করে এগোতে হয়। ধাত্রী এসে বলুক এখন ট্রেনে চলা তোমার পক্ষে সম্ভব কিনা, তারপর আমি তোমাদের বাড়িতে চিঠি লিখবো। যদি সবদিক দিয়ে সুবিধা হয়, তবেই যাওয়ার কথা চিন্তা করা যাবে'।

অনসূয়া কিছু মামুলি উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে তিনি বললেন, 'ফুলটা শুকিয়ে গেছে, ঝি-চাকরের এদিকে দৃষ্টি নেই কেন'?

অনসূয়া কয়েকটি দিন ধরে দেখলেন—এ কখনো প্রকাশ করা চলে না যে, সুমিতির ব্যাপারগুলি তাঁর মনঃপুত হয়নি। নিজের মনেও তিনি অনেক যুক্তির সাহায্যে এ কয়েকটি দিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ সন্তানকে না মেনে নেওয়াটা একটা গর্হিত অন্যায়। সেই যুক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু সে যেন আলো দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে রাখা, কৃত্রিম কিছু এই মনোভঙ্গি। হৃদয়কে যুক্তির প্রাবল্য দেখিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে মস্তিষ্কের কাছে মাথা নত করতে। কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় অন্য একটি বিষয়ে আলাপ করতে করতে মস্তিষ্ক এবং হৃদয় নিয়ে একটা আলোচনা উঠে পড়েছিলো। রূপু যোগ দিয়ে চূড়ান্ত আপাত সত্যটা বলেছিলো : হৃদয় মানুষকে রক্ত জোগাতে পারে, চালাতে পারে না। সান্যালমশাই মস্তিষ্কের জয় ঘোষণা করেছিলেন ; অনসূয়া নিজে যুক্তি দিতে ইতস্তত করলেও বলেছিলেন : মানুষ হৃদয়ের সাহায্যে আহার গ্রহণ করে, গান করে, বন্ধু সংগ্রহ করে। সদানন্দ বলেছিলো : আমি এ কথা হলপ নিয়ে বলতে পারি পৃথিবীর সবগুলি আবিষ্কারের পিছনে আছে হৃদয়। কল্পদ্রষ্টা না হলে, হৃদয়বেগে বেগবান হতে না পারলে গভীর চিন্তা করা যায় বটে, আবিষ্কার বা সৃষ্টি করা যায় না। কথাগুলি নতুন নয়। একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় লেখা সদানন্দর একটি প্রবন্ধে এরকম কথা ছিলো বটে। সে বলেছিলো, মস্তিষ্ক দিয়ে ভূতার্থকে বিশ্লেষণ করা যায়, দুয়ে আর তিনে দশ করা যায় না। হৃদয় এই দশের সংবাদ না দিলে কাব্যও হয় না, কোয়ান্টাম থিয়োরিও না।

অনসূয়া যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা লেখা হলো না। মৃদুস্বরে দাসীকে ডেকে খবরের কাগজ আনতে বললেন।

কাগজে চোখ রেখে একটি-দুটি খবর নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অনসূয়া ভাবলেন . এ কী সমস্যা! জীবনের যে স্তরে এসে ভাবা গিয়েছিলো হৃদয়, মস্তিষ্ক ও দেহের একটি সামঞ্জস্য হয়ে গেছে তখনই আবার তরঙ্গ-উৎক্ষেপটা দেখা দিলো। তিনি ভেবেছিলেন সুমিতির এ বাড়িতে আসবার অভিনবত্ব এ কয়েক মাসে পুরনো খবরের কাগজের মতো অনুল্লেখযোগ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক যে সময়টা ধরে সেটা হওয়া দরকার তখন যে তিনি সহজ হয়ে চলেননি তার প্রমাণ যেন সুমিতির অন্তর্বর্ত্নী হওয়ার ব্যাপারে লক্ষ্য না রাখা। হৃদয়বিমুখ না হলে এমন হয় না। তিনি বুদ্ধির সহায়তায় যাকে গ্রহণ করেছেন ভেবেছিলেন, তার বেলাতেই এমন হলো।

দাসী এসে খবর দিলো কর্তাবাবু ডাকছেন।

সেই পুরনো স্টাডির রূপগত পরিবর্তন হয়েছে। দেয়ালগিরি অপসারিত, সান্ডেলিয়ার ঝাড়টি অপসৃত নয় কিন্তু অকারণে রয়েছে বলে মনে হয়। অভ্যস্ত চোখে দেয়ালগিরির অভাব যাতে বোধ না হয় সেজন্য পোর্শিলেনের প্লেট দেয়াল কেটে বসিয়ে তার আড়ালে অতি নিষ্প্রভ বাল্ব থেকে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোগুলির একটি যেখানে ছবিতে আঁকা চাঁদের কিরণের মতো মরক্কো-বাঁধানো ব্লটিং প্যাডের উপরে পড়েছে সেখানে দুটি হাত একত্র করে সান্যালমশাই কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর বাঁ হাতের তেলোর বড়ো তিলটি এবং ডান হাতের নীলাটি অনসূয়ার লক্ষ্যে এলো। সান্যালমশাই বললেন, 'তোমার ধাত্রী এসে যাচ্ছে কাল। চিঠি দিয়েছে। সে তো এখন এখানেই থাকবে'?

'তাই তো বলেছিলাম সদানন্দকে'।

'সদানন্দ তার হস্‌পিট্যালের চাকরির কথায় বলছিলো, ওর তেমন ইচ্ছা নেই চাকরিতে ফিরে যাওয়ার'।

'নিজে প্র্যাক্‌টিশ করতে চায়'?

'তোমার একখানা সার্টিফিকেট পেলে সুবিধাই হবে ওর। কিন্তু সদানন্দ দেখলাম ওর অনেক খোঁজখবর রাখে। শুনলাম নাকি মেয়েটি দু-তিন বছর হলো খৃস্টান হয়েছে। হিন্দু সমাজে নাকি ফিরবার

উপায় ছিলো না। ইতিমধ্যে নাকি একদিন আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলো, সদরে নাকি এ নিয়ে হৈচৈ হয়েছিলো'।

'সদানন্দ এত খবর নিচ্ছে কেন? ধাত্রী তার কাজ ফুরুলে চলে যাবে'।

সান্যালমশাই বললেন, 'সদানন্দর কাছে খবরগুলি আপনা থেকেই এসেছে। সদরে এসব মুখরোচক সংবাদ, বুঝতেই পারো'।

উত্তর দেওয়ার আগে অনসূয়াকে কুণ্ঠা কাটাতে হলো, তিনি বললেন, 'এরকম আলাপে আমি অভ্যস্ত নই, তুমি কোনদিকে এগোচ্ছো ধরতে পারছি না'।

সান্যালমশাই বললেন, 'এইসব পরিচয়ের পরেও কি তাকে তুমি দীর্ঘদিন বাড়িতে রাখতে রাজী আছো'?

'কাজ মেটা পর্যন্ত বলছো'?

'না। আমি ভাবছিলাম শিশুটিকে মানুষ করার জন্যে যদি ওকে রেখে দেওয়া যায়, কেমন হয় তাহলে'?

'সুমিতি কি পারবে না? মনসা তো নিজেই পারবে'।

সান্যালমশাই একটু চিন্তা করে বললেন, 'তা হয় না এমন নয়। সেকথা যদি বলো পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা না হলেও চলে কিন্তু পেলে সুবিধা হয়। গভর্নেস বা নার্স যা-ই রাখতে চাও সেটা নিরক্ষর আয়ার চাইতে ভালো। আর তাছাড়া এই ধাত্রী-মেয়েটিও তার নিঃসঙ্গ জীবনে একটি বলিষ্ঠ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়েছে আমার—এই জন্যেই তার পরিচয় দিলাম'।

অনসূয়া কিছুকাল নীরব থেকে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি এটা একটা পরিকল্পনা যাব সব দিক চিন্তা করে তুমি এগিয়েছো'।

'কিন্তু সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা তোমার মতের অপেক্ষা রাখে। যদি সংগত বোধ করো তাকে কথায় কথায় জানিয়ে রাখতে পারো, তুমি নাতিদের জন্যে গভর্নেস রাখবে'।

অনসূয়ার হাসিটা হঠাৎ প্রকাশ পেলো বটে কিন্তু কয়েক মুহূর্ত থেকেই মনে মনে এটার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন; তিনি হাসিমুখে বললেন, 'গভর্নেসের জন্য ঘরদোর, নাতিদের নার্সারি, এসবও নিশ্চয় তোমাব পরিকল্পনায় আছে'?

একটু সলজ্জভাবেই ড্রয়ার থেকে ব্লুপ্রিন্ট বার করলেন সান্যালমশাই। হাতে একটা পয়েন্টার নিয়ে ব্লুপ্রিন্টে একটি জায়গা উদ্দিষ্ট করে বললেন, 'এঞ্জিনিয়ার বলছে এদিকটায় দোতলা তোলা যাবে না. চুন-সুরকির পুরনো দিনের গাঁথুনির উপরে দোতলা তোলা নিরাপদ বলে মনে হয় না। সিমেন্ট কংক্রিট এবং লোহা দিয়ে সম্পূর্ণ একটা ব্লক তৈরি করতে চায় সে, এটাকে ভেঙে ফেলে'।

অনসূয়া অনেকটা সময় ভাবলেন, তারপর ধীরে ধীরে প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বললেন, 'আমার শ্বশুরের সময়ের এই চুন-সুরকির গাঁথুনি আমার জীবনকালে স্থায়ী হবে এই আমার বিশ্বাস। তোমার বাগানটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড়ো। যদি মনে করো নতুন ধরনের কিছু দরকার, কংক্রিটের ক্যাটালগ এনে যথেষ্ট পরিমাণে কাচ ও হাল্কা ধরনের আসবাব দিয়ে একটা বাংলোবাড়ি তৈরি করো'।

কথা বলতে বলতে ব্লুপ্রিন্টের উত্তর দিকটা অনসূয়া দেখিয়ে দিলেন, বললেন, 'সুমিতির পক্ষে এই নতুন বাড়িটাই আরামপ্রদ হবে। মনের সঙ্গে মিলবে। সেখানে নার্সারি হোক, গভর্নেসের ঘর'।

সোনার চশমার আড়ালে অনসূয়ার চোখ দুটির চেহারা কিরকম হলো দেখবার জন্য চোখ তুললেন সান্যালমশাই, কিন্তু অনসূয়ার চোখে কাঠিন্যের কোনো ছাপ এসে থাকলেও ততক্ষণ সেটা সেখানে ছিলো না।

সান্যালমশাই বিস্মিত হলেন, কিন্তু সে বিস্ময় তাঁর ভাষায় প্রকাশ পেলো না। তিনি বললেন, 'তোমার দুই ছেলে, অনু, তুমি কি দুখানা নতুন বাড়ির কথা চিন্তা করছো'?

'না, আপাতত একটি হোক'।

'কথাটা আগে বলোনি'।

'অসুবিধা হবে'?

'না, না'। সান্যালমশাই হাসলেন, 'নতুন করে ব্লুপ্রিন্ট করাতে হবে'।

কিছুকাল দুজনে নীরবে বসে রইলেন। তারপরে অন্য কথা হলো, অনসূয়াই নিয়ে গেলেন সেদিকে। তারপর তিনি কাজে গেলেন।

খানিকটা নীরব অবকাশে সান্যালমশাই আবার বিস্ময়ে তলিয়ে গেলেন। যে অনসূয়াকে এতদিন ধরে চিনে এসেছেন এ যেন সে নয়। কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের ভঙ্গিটা এতদূর বিশিষ্ট যে, প্রায় আট-দশ বৎসরের পুরনো একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেলো সান্যালমশাইয়ের। এই গ্রামের রায়বংশের ছেলে মন্মথ রায় তাঁর সমবয়সী এবং কলকাতার কলেজের সহপাঠী। তিনি এসেছিলেন গ্রামে ; নিজের জমিজমার বন্দোবস্ত করাই উদ্দেশ্য ছিলো। শিকারের প্রস্তাব এসেছিলো। বোটে করে বিলে বিলে ঘুরে পাখি শিকার হচ্ছিলো। কোনো সন্ধ্যায় তাঁরা ফিরতেন, কখনো বোটে রাত কাটতো। একদিন আকস্মিকভাবে সদানন্দ উপস্থিত বিলের ধারে। তার হাতে সিলমোহর-করা চিঠি। তাতে লেখা ছিলো—তোমার একবার আসা দরকার। এ-কথা কয়েকটি আষ্টেপৃষ্ঠে সিলমোহরে আটকানো। 'কী ব্যাপার—' বলে স্ত্রীর সম্মুখে হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সান্যালমশাই। অনসূয়া ঠিক কি কথাগুলি বলেছিলেন এতদিন পরে তা উদ্ধৃত করা যায় না, কিন্তু তাতে ছেলের বড়ো হওয়ার কথা ছিলো, এবং নৃশংসতা মানুষকে শুধু হৃদয়হীন করে তোলে না, তার শুভবুদ্ধিকেও আড়ষ্ট করে, রুচিকে তামসিক করে—এরকম কিছু বক্তব্য ছিলো। কিন্তু বক্তব্যের চাইতে ভঙ্গিতেই বেশি কাঠিন্য ছিলো। মর্মরের মতো মোলায়েম, শীতলস্পর্শ, সুন্দর, কিন্তু পাথরও বটে। শিকার বন্ধ হয়েছিলো। কিন্তু, বলে ভাবলেন সান্যালমশাই—ওদের পৃথক করে দেবো?

তিনি স্থির করলেন—অবশ্য এটার অন্য দিকও আছে। ছেলেরা বড়ো হয়ে উঠলে তাদের রুচি ও প্রকৃতি পৃথক হতে পারে। তখন তাদের পৃথক স্বয়ংপূর্ণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিতে পারে। বাড়িটা তৈরি হোক যেমন অনসূয়া বলছে। যদি ওরা এই পুরনো বাড়িতেই থাকতে চায় নতুন বাংলোটা অন্য কোনো ব্যবহারে আসবে। মানুষের একাধিক বাড়ি থাকতে নেই এমন নয়।

অন্দরমহলের উঠোনে নামার সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালেন অনসূয়া। নিজেকে নিয়ে সেই প্রথম জীবনের পরে আর কবে এমন বিস্মৃত হয়েছেন? এ কী করে এলেন তিনি? কী ভাবলেন উনি? আমি কি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় পেয়ে এমন করে সুমিতিকে পৃথক করে দিচ্ছি? তাঁর কি বলা উচিত ছিলো, এই বাড়ির প্রতিষ্ঠা সুমিতিকে দিয়ে আমার আর তোমার জন্য ছোট্ট একটা বাড়ি করো—এরপরে এত বড়ো একটা বাড়িকে গুছিয়ে রাখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো?

সদানন্দ এলো।

'কিছু বলবে নাকি'?

'বলবার ছিলো, কিছুদিন যাবৎ আপনাকে পাচ্ছি না'।

'কী রকম'? সান্যালমশাই হাসলেন, 'কতদিন থেকে পাচ্ছো না'?

'যেদিন থেকে চারুর দল আপনাকে দখল করেছে'।

'স্কুলের জন্য টাকা চাই'?

'না। এবার সদরে গিয়ে কথা বলে এসেছি। কমিটি করে দেবো। সরকার থেকে সাহায্য দিয়ে চালাক'।

'মতের পরিবর্তন করলে যেন'।

'বহুদিন আগেই করা উচিত ছিলো। শহরের স্কুলে পড়ে ছেলেরা শহরে থাকছে, গ্রামের স্কুলে পড়েও তারা শহরমুখো হচ্ছে। স্কুল করা মানে গ্রামের বুদ্ধিমান ছেলেদের শহরের দিকে লুব্ধ করা। তাই যদি হবে তবে আর বোঝা বয়ে মরি কেন'?

'এমন কথা কোনো শিক্ষক বলতে পারে বলে ধারণা করিনি। আপাতত কী ঘটেছে'?

'রূপুকে ম্যাট্রিক দেওয়াবো কিনা এ-বিষয়ে আলাপ করতে চাই'।

'এতদিন কী স্থির ছিলো? কেম্ব্রিজের কোর্সে পরীক্ষা দেওয়ার পর কী-একটা হবে, এরকম যেন শুনেছিলাম তোমার মায়ের কাছে'।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেরকমই ছিলো। কিন্তু ভাবছি এদেশের ইতিহাসটার উপরে জোর দেওয়া যায় কি না। মাও বলেছিলেন বটে প্রাচীনের কথা'।

'এ সম্বন্ধে কি খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দরকার'?

'দু'এক মাসের মধ্যে দরকার হবে'।

'দু মাস পরে আলাপ করলে হয়'?

সদানন্দ হেসে বললো, 'চারু বোধহয় এখন আসবে'?

অন্তত সাময়িক একটা পরিবর্তন যে হয়েছে সান্যালমশাইয়ের জীবনভঙ্গিতে এটা আর গোপন নেই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মচারীদেরও কাজ বেড়েছে। তাদের কাউকে কাউকে একটু বেশি দ্রুতগামী হতে হয়েছে, এবং কারো কারো জীবনধারায় রদবদল হয়েছে।

নায়েব একদিন হন্তদন্ত হয়ে বেরুচ্ছে। তার স্ত্রী বললো, 'এমন ছুটোছুটি কি এ বয়সে চলে? শরীর শুকিয়ে গেলো যে'।

'গেলেও উপায় নেই'। জামা গায়ে দিতে দিতে নায়েব বললো।

'কিছুদিন থেকেই এরকম হয়েছে। কাজ যেন বেড়েই যাচ্ছে'।

'বাড়াকমা কিছু নেই। বিলমহলে কর্তা নিজে যাওয়ার আগে আমার যাওয়া দরকার। মামার মুখে শুনেছি বিলমহলের দাপটেই তিনি চাকরি ছেড়ে আমাকে বহাল করেছিলেন'।

'সেখানে কী হচ্ছে এখন, তহসিলদাররা পারে না'?

'সাহস পায় না। আমিও যে খুব পাই তা নয়। গুলবাঘ দিয়ে জমি চাষ করানো, বুঝতেই পারো'।

'রসিকতা রাখো'।

গৃহিণীর হাত থেকে শরবৎ নিয়ে নায়েব বললো, 'তোমার জেনে রাখা ভালো বলেই বললাম। সেখানকাব চাষীদের গুলবাঘ না বলে গণ্ডারও বলা যায়। তাদের দিয়ে বিল দখল করতে যাচ্ছি'।

'এমন বিপদের কাজে হাত দিচ্ছো, কর্তা মত দিয়েছেন'?

'এটা কর্তারই বুদ্ধি। এই ফিকিরেই ত্রিশ বছর আগে হাজার বিঘা খাসজমি বিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। নিজে যা করেছিলেন আমি এখন সেটা করলে খুব একটা রাগ করতে পারবেন না। যদি নিষেধ করেন হুকুম ফিরিয়ে নেবো। না করেই-বা উপায় কী? লাখ টাকা খরচ হবে এই চৈত্রের আগে। টাকা আনি কোথা থেকে, যদি জমি না বাড়াই'?

স্ত্রীর হাত থেকে পান নিয়ে নায়েব রওনা হলো। পাল্কি খাড়া ছিলো। সে বললো, 'তেমাথায় থাকগে যা। গাঁয়ের মধ্যে আর পাল্কিতে চড়াস নে, লোকে হাসাহাসি করবে'। নায়েবের লোকজন পাল্কি নিয়ে চলে গেলো। নায়েব হাঁটতে হাঁটতে চারুর বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো।

চারু বাড়িতে ছিলো। সে বেরিয়ে এলে নায়েব বললো, 'এদিক থেকে ছুটি নিয়ে একবার বিলমহলে যেতে হয়। জমি দখল করতে হবে'।

'সর্বনাশ! মারপিট নাকি'?

'তার চাইতেও বেশি। বিল থেকে জমি কেড়ে আনতে হবে'।

'সে তো বিলমহলের লোকরা করে শুনেছি, খাল কেটে, পাড় বেঁধে নৌকো দিয়ে জল ছেঁচে'।

'তা করে। গত ত্রিশ বছরে নিজেদের বুদ্ধিতে একশ ঘর বর্গাদার তিনশ বিঘা নিয়েছে। আমি যে এক বছরে হাজার বিঘা চাই। নিজেদের মাইনা বাড়িয়ে নিয়েই তো বিপদে ফেললে। বছরে বারো হাজার টাকা খরচ বাড়ালে। এখন চলো দেখি, বাঁধটা কীভাবে দিলে ছোটো বাঁধে বড়ো কাজ হয়। আর তোমার

সেই কী যন্ত্র আছে, পুকুরের জল তুলে ফেলতে, সেটাও চাই'।

'কর্তাকে বলে রাখবেন, যাওয়া যাবে'।

নায়েবমশাই হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করলো, মাঝখানে দীর্ঘদিন সান্যালমশাই ধীরস্থির হয়েছিলেন বটে কিন্তু বিশ-বাইশ বছরের যে লোকটি শুধুমাত্র বন্দুক সম্বল করে বিলমহল শাসন কবেছিলো, আর সেই শাসিত বিলমহল দিয়ে বিলকেও শাসন করেছিলো তার মূলগত পরিবর্তন আশা করাই অন্যায। টাকার প্রয়োজন হওয়ামাত্র তিনি নিজেই বিলমহলে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন।

এক সন্ধ্যাবেলায় পরিচিত গলার শব্দে সুমিতি অবাক হলো। ধাত্রী দাসীকে দরজার কাছে বিদায় দিয়ে একা একা এলো ঘরে। তার বেশভূষার ঢিলেঢালা ভাব দেখে বোঝা যায় অনেকটা সময় আগেই সে এসেছে।

অল্পবয়সী ধাত্রী, পরীক্ষা দিয়ে পাস-করা শুনেই তার উপরে নির্ভর করা যায়। নমস্কার করে সে হেসে বললো, 'আমি আবার এলাম'।

'আসুন'।

'মনসাদিদির চিঠি পেয়েই ভাবছিলাম আসি আসি, কালকের ডাকে গিন্নীমার পত্র পেলাম। দেখতে মনে হয় ভালোই আছেন। আপনি কী বলেন'?

সুমিতির মনের কুণ্ঠিত অবস্থায় একটি-দুটি এক শব্দের বাক্য রচনা করার বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। সে রক্তহীনের মতো হেসে বললো, 'কী বলবো'?

ধাত্রী বললো, 'সে যা বলার আমিই কাল বলবো, এখন মনে হচ্ছে আর একটু কায়িক পরিশ্রম করা দরকার। আপনি বেড়াতে ভালোবাসেন তো? তা হলেই হলো'।

সুমিতি কথা বাড়ালো না। ধাত্রী এখানে আসতে পেরে যেন খুশি হয়েছে। সে এ-কথা ও-কথা তুলে কিছুক্ষণ আলাপ করলো।

ধাত্রী চলে গেলে সুমিতি ভাবলো, এ ভালোই হলো। এভাবে যদি অনসূয়া না আসতেন, এইসব ব্যবস্থার সূচনা না করতেন, তবে তাকে নিজের সম্বন্ধে আর একটি সিদ্ধান্ত নিতে হতো। এক্ষেত্রে সেটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও ছিলো। এটা শহর নয়, মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লে পথেব মোড়ে ক্লিনিক পাওয়া যায় না।

এরপরে আবার লজ্জা এসে তাকে আবৃত করলো। এরপর থেকে সকলের চোখে যে প্রশ্ন কিংবা কৌতূহল প্রকাশ পাবে সেটা যেন এখনই সে সর্বাঙ্গে অনুভব করলো। এ বাড়িতে আসবার পরই যে-কুণ্ঠা তাকে নিয়ত বিব্রত করতো, কিছুদিন চাপা থাকার পরে এখন যেন সেটা আবার আত্মপ্রকাশ করলো।

মনসা রহস্যছলে যে প্রশ্নগুলো তুলেছিলো তাছাড়া আর কেউ কখনও তাকে প্রশ্ন করেনি। অবহেলাও তাকে কেউ করেনি। তার ব্যক্তিগত সুখসুবিধার দিকে একাধিক দাসদাসীর সতর্ক দৃষ্টি নিযুক্ত আছে। তার ব্যক্তিগত পরিচারিকাটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সবসময়েই সে ডাক শোনার প্রতীক্ষায় আছে, কিন্তু সম্মুখে এসে যখন দাঁড়ায় নিজে থেকে, মনে হবে যেন ঘটনাটা আকস্মিক। হয়তো সুমিতি বিকেলের দিকে লাইব্রেরিতে যাচ্ছে, পরিচারিকা যেন শূন্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে বললো, 'বড়োবউদি, আজকাল তো এমন সময়ে আপনারা চা খেতেন মাঝে মাঝে, আনবো'?

'না, সেটা মনসার খেয়ালে হতো'।

পরিচারিকাটি তখন সুমিতির একখানা শাড়ি আলসে থেকে তুলে নিয়ে কোঁচাতে-কোঁচাতে চলে গেলো, যেন এ কাজটার জন্যই এদিকে সে এসেছিলো।

ধাত্রী এসেছে। এবং সুমিতি এখন থেকে আন্দাজ করছে এরা সে ব্যাপারটাকে অবলম্বন করেও একটা

উৎসবের আয়োজন করবে। সর্বত্র না-হলেও সে উৎসবে কোথাও কোথাও গভীর আনন্দ বিচ্ছুরিত হবে। তার সন্তানকেও কেউ হয়তো অবহেলা করবে না।

সেদিন রূপুর সঙ্গে দেখা হলো সিঁড়ির গোড়ায়। রূপু অনেক সময়ে পৃথিবীর অনেক সুখবর ও আনন্দ বহন করে আনে। আজও তার মুখচোখ হাসিমাখা। সুমিতি প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়ালো।

রূপু দূর থেকেই বললো, 'কংগ্রাচুলেসনস্ সিস্টার সু'।

'কী হলো'?

রূপু এত আনন্দের কারণ, এতখানি বিচলিত হওয়ার কারণ বহুদিন পায়নি। দিদিকে যেমন ছোটো ভাই জড়িয়ে ধরতে পারে তেমনি করে সে সুমিতিকে বাহুবেষ্টনে ধরে বললো, 'তুমি ভালো, কিন্তু এত ভালো আমি জানতাম না। এত ভালো তুমি? এতদিনে যা হোক কিছু একটা হবে এ বাড়িতে'।

সুমিতি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু প্রশ্নগুলো নিজেব মনে উঠছে আবার নতুন করে। আর পুবনো প্রশ্ন নতুন করে উঠলে প্রায নতুন চেহারা নেয়। তার বিবাহটা এরকম হলো কেন তা কি আবার প্রশ্ন? সব বিষয়ে যারা অগ্রসর চিন্তার পরিপোষক তারা বিবাহের মতো ব্যাপাবে, যা মনসার ভাষায় এক বিপ্লব, মন্ত্রোচ্চারণ এবং ক্রিয়াকাণ্ড, যাতে তাদের বিশ্বাস নেই মেনে নেবে কেন? মানেনি কারণ মানা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাউকে আঘাত কবাব কথা দূরে থাক, কারো কথা চিন্তা করাব অবকাশ ছিলো না। আর সেভাবেই তো প্রমাণ করা সম্ভব কাবো বাকি জীবনটা আধুনিক থাকবে কিনা।

সুমিতি মনে মনে যেন মনসার সঙ্গে কথা বললো, হ্যাঁ, মণিদিদি, তোমার তুলনাটা হয়তো আমার পক্ষেও খাটে। গগ্যাঁর জীবন আর তার ছবি আঁকা এক হয়ে গিযেছিলো, তোমাব জীবন আর সংসার মিলে একটামাত্র নাটক হয়তো যা তুমি রচনা করছো ; তেমনি কারো জীবন আর একটা গ্রাম তো এক হয়ে যেতে পারে। কেউ যদি এই গোটা গ্রামটাকেই তার সংসার করে নিতে চায়? তুমি বলবে, নতুন কি? আকাশে বাতাসে এখন গ্রামে ফেরা, গ্রামকে স্বাবলম্বী করার কথা।

সুমিতির মুখে নিঃশব্দ হাসি দেখা গেলো। সে মনে মনে বললো, 'মণি, না হয় বলো সেই জার্মান ভদ্রলোকের কথা, যিনি কঙ্গোর গ্রামে গিয়ে বাস করছেন। একটু পরে সে আবার তেমন করেই মনে মনে বললো, হয়তো কেউ টেনিস র‍্যাকেট ত্যাগ করেছে ; হয়তো কারো সেই বহু অক্টেভের অর্গ্যান, যাকে তুমি চার্চ অর্গ্যানেব মতো প্রকাণ্ড বলেছো, তা আর কাজে লাগে না , হয়তো গোটা গ্রামটার দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার চাপে অন্য কেউ অকালবৃদ্ধা হবে, ততদিন আমার স্বামীর গ্রামটাকেও আমাকে ভালোবাসতে দিও।

কিন্তু সুমিতির চিন্তা সহসা প্রায় আর্ত হলো।

সুকৃতি তার নিজের বোন। কাল্পনিক একটা কলঙ্কের মিথ্যা রটনা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে যা করেছিলো তাতে সবরকমেই আত্মহত্যা হয়েছে। অথচ সে নিজে কলঙ্কের—অন্তত এদের চোখে তো বটেই এবং কলঙ্ক মানেই প্রতিবেশীর দৃষ্টিভঙ্গি—উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এ বাড়িতে এসে উঠেছে। সুকৃতি যে কালের প্রতিভূ সেটা গত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র কালই কি? সুকৃতিকে যেমন সে সৃষ্টি করেছিলো তেমনি কি আমাকেও করছে?

এরফানের শালা এসেছে। তার সঙ্গে গত সন্ধ্যার আলাপের মুলতবী অংশটুকু শেষ করে নিতে অতি প্রত্যুষে আলেফ সেখ ছোটোভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। এরফানের শালা আল মাহ্‌মুদ অনেক জানে-শোনে। তার কাছেই আলেফ জানতে পেরেছে তার মতো গ্রাম্য লোকদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়রা চিন্তা করছেন। পুত্রের ভবিষ্যতের কল্পনায় সুখী হয় না এমন পিতা পৃথিবীতে কে আছে?

কিন্তু তার স্বভাবসিদ্ধ প্রথায় তাড়াহুড়ো কবতে গিয়ে আলেফ বিব্রত বোধ করলো। গত সন্ধ্যায় যে-সব আলাপ হয়েছিলো তার মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক কথা ছিলো। এ বিষয়ে বয়োবৃদ্ধ আলেফের তুলনায় এরফানের যুবক শ্যালক আল মাহ্‌মুদ বেশি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলো। পরে কুটুম্বের চোখে হীন প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বেশ খানিকটা ঝোঁক দিয়েই কথা বলেছিলো আলেফ। নমাজ না করে এত সকালে আসা ভালো হয়নি।

আল মাহ্‌মুদ বেরিয়ে এলো।

সে কিছু বলার আগেই আলেফ বলে উঠলো, 'আজ বড়ো কাহিল লাগলো ভাই, নমাজ পড়া হলো না'।

আল মাহ্‌মুদ শহরের ছেলে, যুদ্ধে গিয়েছিলো, কিছু লেখাপড়া শিখেছে। মোটরগাড়ির কাজে আছে; উচ্চাভিলাষ আছে কালক্রমে নিজে গাড়ি কিনে ভাড়া খাটাবে। সে কৌশল করে বললো, 'আমিও গেলাম না মসজিদে। গোসল না কবে নমাজে বসতি ভালো ঠেকে না। এখানকার জলে গোসলের সাহস হলো না'।

আলেফ স্বস্তি পেলো। আল মাহ্‌মুদের চায়ের বন্দোবস্ত ছিলো। চা-তামাকের সঙ্গে গল্প জমে উঠলো।

গত সন্ধ্যার আলাপের একটা বিষয়ের জের টেনে এনে আলেফ বললো, 'তা তোমার শহরের ফুড্ কমিটির সেক্রেটারি তুমি হইছো'?

'শহরের না, পাড়ার কমিটির। লোকজনের দরখাস্ত নিতি হয়, পাস করতি হয়। যে যত বড়োই হোক কমিটির কাছে না আসে তেল চিনি কাপড় পাওয়ার উপায় নাই। হেঁদু পূজা করবি, তাও আমার কাছে আসতি হয়'।

'তুমি ভালোই করছো, আল্লা তোমার উন্নতি করবি'।

'আপনার গাঁয়েও তো কমিটি হবি'।

'কই? শুনি নাই তো'।

তখন আল মাহ্‌মুদ ব্যাপারটা আর একটু খুলে বললো। সাপ্লাইয়ের এক অফিসাব এসে এ বিষয়ে এরফানের সঙ্গে আলাপ করেছিলো। আল মাহ্‌মুদ নিজে এবং তার বোন অর্থাৎ এরফানের দ্বিতীয় স্ত্রী এরফানকে কমিটিতে থাকতে অনুরোধ করেছিলো, কিন্তু এরফান তাদের কথা হেসে উড়িয়ে দেয়নি শুধু, বলেছে, 'চাষার ছেলে চাকরি করছি সেই অনেক'। আলেফ বললো, 'তোবা, তোবা, ওর আর বুদ্ধি হবি নে। নিজের বাপ বড়ো-বাপকে গাল দেওয়া হয়, তা বোঝে না। কও, মামুদ'।

'তাছাড়া কী। হলাম বা চাষা। তা বলে কি চেরকালই চাষা। ইংরেজ আসার আগে আমরা ছিলাম ভদ্দরলোক আর হেঁদুরা ছিলো চাষা। তারা লেখাপড়া শিখলো, ইংরেজের চাকরি পালো, ভদ্দরলোক হলো, আর আমরা চাষা হলাম। এখন যদি সব চাকরি আমরা পাই, তাইলে'?

কথাটা মনে লাগলো আলেফের। চৌকিতে তিনটি টোকা দিয়ে সে বললো, 'খুব কইছো'।

আলেফ ফুর্সিতে গভীর মনঃসংযোগ করলো। চিন্তার রেখা পড়লো তার কপালে। তাজ্জব! এমন খবরটাও এরফান তার কাছে লুকিয়েছে। এরফান নিজে সেক্রেটারি হতে চায় এমন ধরনের কথা তার

সম্বন্ধে আর ভাবা যায় না। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আলেফ বললো, 'আমার কি মনে হয় জানো, এরফান গোল বাধাবি। সারাজীবন সে কয়ে আসছে—ছাড়ো, ছাড়ো, কাম নি। এতেও তাই কবি'।

'তা হবি কেন্? ধরেন যে, গাঁয়ের মধ্যি আপনের ছাওয়ালের মতো ছাওয়াল কার। সে কি চাষার ঘরে মানায়'?

আলেফের মনে গত রাত্রিতে কিছুটা উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিলো। আজ সকালেই সে দ্বিপ্রহরের মতো উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। ফুর্সিতে ঘনঘন টান দিয়ে সে বললো, 'তুমি এক কাম করবা ভাই, সে সময়ে আসবা'।

সন্ধ্যার পর আলেফ আবার এরফানের বাড়িতে গেলো।

'আল মামুদ, আছো না'?

'না, সে এসফন্দিয়ার গেছে তার গাড়ি চালাতি'। এরফান বললো। এটা ব্যঙ্গ, তবে এরফানের বিদ্রূপে সহসা রাগ করা যায় না। আরো মসৃণ হয়েছে তার গলার স্বর, অধিকতর শান্ত হয়েছে দৃষ্টি। সামান্য কয়েক দিনেব নমাজেই এগুলি সে অর্জন করেছে।

আলেফ বললো, 'ঠাট্টা কবে না, কুটুমকে অমন কয়ো না'।

এরফান নিঃশব্দে হাসলো কিন্তু মনে মনে বললো, যদি জানতে সে আর তার ভগ্নী কেমন করে মানুষেব জীবনের শান্তি ব্যাহত করতে পারে তাদের নিজেদের অন্তরেব অসন্তোষ উদ্‌গীর্ণ কবে, তাহলে আমার এই বিদ্রূপকে তোমার প্রশ্রয় বলেই বোধ হতো।

আলেফ বললো, 'একটা কামে আলাম। খবর শুনছো না'?

'রোজই শুনতিছি, কোনটা কও'?

'কমিটি নাকি কী হবি'?

'হবি তো এই মাসেই'।

'তাইলে সেক্রেটারি কে হয়'?

এবফান সহসা হো হো করে হেসে উঠলো।

যেন কিছুই হয়নি, যেন কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি সে, এমনি মুখ করে ফুর্সিটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিবিষ্টভাবে ধূম্রজাল রচনা করতে লাগলো আলেফ। এরফানের হাসি থামলে অবশেষে সে বললো, 'একটা কথা আজ কবো তোমাক। ছাওয়ালের কথা ভাবো? কি বলো ভাবো না'?

'তা ভাবি, বংশের তো ঐ একই ছাওয়াল। কিন্তুক এ কথা আজ হঠাৎ তোলো কেন্'?

'না, তুলি না। ভাবে দেখো, তাই কই। শহর কৈলকাতায় পড়ে তোমার ছাওয়াল। তাক হাকিম-হেকিম করবের চাও। আমার কী দুঃখ যদি বাপ বলে না মানে। কিন্তুক তোমাকেও যদি চাচা গণ্য না করে'?

'কও কী'? এরফান মৃদুমন্দ হাসতে লাগলো।

আলেফ বুঝতে পারলো যুক্তিটা বানচাল হয়ে গেলো।

সে এবার সোজাসুজি কথাটার অবতারণা করলো, 'তাইলে তুমি সেক্রেটারি হও'।

'না, ঝামেলা'।

'তাইলে আমাক হতি হয়'।

'সে তো মামুদের কথাতে বুঝছি। কিন্তুক গাঁয়ের লোক তোমাক সেক্রেটারি করে কেন্'?

আলেফ খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলো। ভাবলো, তাই তো, কী জন্য গ্রামের লোকরা বিশেষ একজনকে মনোনীত করে ঠাহর হচ্ছে না। সে করুণ করে বললো, 'তুমি আমি দুজনে চেষ্টা করলি চরণকাশির ভোট তো পাবোই। আল মাহ্‌মুদ আসবি, সেও চেষ্টা করবি। যদি কও, ছাওয়ালেক ডাকি, সেও দু'চার কথা কবের পারবি। কেন্, এরফান, চেষ্টা করবা না'?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো এরফানের। ভাইয়ের জন্য দুঃখ বোধ হলো। এত বয়েস হয়েছে তবু প্রাণের

ভিতরটা অল্পবয়সের গরম রক্তে পুড়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত সুরে সে বললো, 'করবো'।

আলেফের দাড়িঢাকা প্রকাণ্ড মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গ্রামের সাধারণ লোক যত বিস্মিতই হোক, তবু খানিকটা আগ্রহ নিয়ে শুনলো, মাতব্বরস্থানীয়েরা কথাটা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তা লিবেন ভোট'। অন্য কেউ হলে এতে খুশি হয়ে উঠতো কিন্তু আলেফ এদের সরলতায় বিশ্বাস করতে পারলো না। তার ধারণা হলো, এটা গ্রামবাসীদের একটা কূটকৌশল, তাকে তার উদ্যম থেকে নিরস্ত করে প্রস্তুতি থেকে দূরে রাখাব। তাহলেও সেটা নিজের গ্রাম। আসল যুদ্ধক্ষেত্র চিকন্দি। সেখানে লোকসংখ্যাও বেশি। সেখানে দুধের ছেলেরাও টক্‌টক্ করে কথা বলে।

চিকন্দির প্রবেশপথে আলেফের দেখা হলো ছিদামের সঙ্গে।

আলেফ বললো, 'কোন গাঁয়ে থাকা হয়'?

'চিকন্দি'।

'হয়? আমার কোন গাঁয়ে থাকা হয় জানো'?

'জানি, চরণকাশির পাকামজিদ আপনের'।

খুশি খুশি মুখে গদগদ স্বরে আলেফ বললো, 'চেনো তাইলে। তা তুমি কার ছাওয়াল'?

'শ্রীকৃষ্টদাস'।

'সে তো বন্ধুলোক আমার। ভালোই হইছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। তোমার বাড়ি যাতেছি'।

কেষ্টদাসের বাড়িতে কেষ্টদাস ছিলো, রামচন্দ্র ছিলো। আর আলেফ ঢুকতে-ঢুকতে শুনতে পেলো তাদের কথা হচ্ছে কমিটি নিয়ে।

রামচন্দ্র বলছিলো, 'যে ছাওয়াল, সে হযতো আবার গান বাঁধবি'।

শ্রীকৃষ্ট বললো, 'তা গান বাঁধলি কী হবি, সব তো চ্যাংড়ামো কথা না। চৈতন্য সা ছাড়া আর কার দোকান আছে সরকারের চোখে পড়ার মতো, কও'?

'তা হোক আর না হোক। যদি সেসব হয়ই চৈতন্য সাক একটু সাহায্য কবা লাগবি। ধরো যে তার তো অন্যায় করছি একদিন, একটু উপকার করা লাগবি'। রামচন্দ্র বললো।

ঠিক এই সময়ে মঞ্চাবতরণ করলো আলেফ।

'আসেন, আসেন'।

'আলাম বেড়াতি বেড়াতি। কী দিনকাল হলো কন্'?

কথাটা আলেফের মুখে মানায় না। রামচন্দ্র হাসিমুখে গোঁফ চারিযে দিয়ে বললো, 'আপনের তো ভালোই হইছে জোলার ধান'।

'হইছে, না'? কথাটা আলেফ অনুভব করলো, কিন্তু এক মুহূর্তমাত্র। নিজের চিন্তার একপ্রান্তে ধানের রং লাগতে লাগতে আত্মসংবরণ করলো সে। নিঃসংশয়ে কমিটির কথাটা চাপা দেওয়ার কৌশল এটা। আলেফ তাড়াতাড়ি কমিটির প্রান্ত চেপে ধরে বলে উঠলো, 'আল্লা, আল্লা! দিনকালের কথা কয়েন না, মণ্ডল। জোলাই-বা কি, দোলাই-বা কি। ধানপানে আর মন দেওয়া নাই। কমিটির কথা কী কতিছিলেন, কন্ শুনি। বাজে বাজে কথা কন্, কাজের কথায় প্রাণের কষ্ট বাড়ে'।

রামচন্দ্র বললো, 'তা কমিটি করতিছে সরকার। সস্তায় নাকি কাপড় দিবি, তেল চিনি দিবি'।

'সোবানাল্লা! সরকার ফেল পড়বি নে'?

'তা পড়ে না বোধায়। সরকার দোকান করবি, সেই দোকানটা পাতে চায় চৈতন সা'।

'আচ্ছা মজা হইছে'। আলেফ যেন পরম কৌতুকে হেসে উঠলো। 'বাঁচে থাকলে আরও কত দেখবো। কমিটিও কি তাই হবি নাকি, মণ্ডল'?

'তাই তো শুনি'।

আলেফ বারদুয়েক দাড়িতে হাত বুলিয়ে যেন চূড়ান্ত কৌতুকে হা হা করে হেসে উঠলো, 'তাইলে বুঝলা না, মণ্ডল, আমাকেই আপনেরা দশজন কমিটির হেড করে দেন। হাজিসাহেব রাগ করবি নে বোধায়। তার চায়ে দশ শালের ছোটো হলেও হবের পারি, কিন্তুক দাড়ি আমার বেশি পাকা, কী কন্ গোঁসাই'?

শ্রীকৃষ্ট বললো, 'তা হন, আপনেই হন। একজন হলিই হলো'।

'রামচন্দ্র, কী কন্'?

রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্টর মতো লঘুস্বরে বললো, 'হন না, আপনেই হন'।

আলেফ এবার আর হাসলো না। শ্রীকৃষ্ট-রামচন্দ্রর মুখ থেকে প্রগল্‌ভ হাসি যে কথা টেনে বার করেছে কৌতুক করলে সেটা লঘু হয়ে যাবে। আলেফ অনুভব করলো, তার একমাত্র করণীয় হচ্ছে কথাটার চারিদিকে গম্ভীর আলাপের ঠাসা বুনুনি বোনা। ক্রমশ আলাপটাকে টাকার লেনদেনের মতো কঠিন করে তুলতে হবে। গম্ভীর কথাবার্তার মাঝখানে পড়ে দানা বাঁধতে থাকবে কথাটা, অবশেষে প্রতিশ্রুতির মতো নিরেট হয়ে উঠবে।

আলেফ বললো, 'তামাক খাওয়াবেন না, কেন্ গোঁসাই'?

'নেচ্চায়'। শ্রীকৃষ্ট তামাকের জোগাড়ে গেলো।

আলেফ আবার বললো, 'কী কথাই শোনালেন আজ, মণ্ডল। কমিটি। তা সত্যি হবি? তা ধরেন যে বুড়া হলাম, ধর্ম্ম-কম্ম করা লাগে, দানধ্যান করা লাগে। গরিব তো। পরের ট্যাকায় যদি খোদার খেদমত হয়ে যায় মন্দ কী। গজবের কালে ইস্রাফিল কবি—' আলেফ থামলো, গজবের সময়ে ইস্রাফিল কী বলে সেটা চট করে খুঁজে পেলো না। শ্রীকৃষ্টর হাত থেকে তামাক নিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সে বললো, 'বুঝলেন না, আমি আজ ঢোল দিয়ে বেড়াবো গাঁয়ে গাঁয়ে, রাম-চন্দ্র-শ্রীকৃষ্টরা কইছেন আমাকে কমিটির সেক্রেটারি করবি'।

'তা কন্'।

কিন্তু ছিদাম এদের থেকে খানিকটা দূরে উবু হয়ে বসে মাটিতে আঁকিজুকি কাটছিলো। সে মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক হওয়ার ভঙ্গিতে বসলেও কান দুটি সজাগ রেখেছিলো। সে বললো, 'দশজনে মানবি কেন্ আপনেক, আপনি দশজনের কী করছেন'?

জ্যাঠা ছেলেটির কথায় ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিলো আলেফের। কিন্তু ক্রোধের সময় নয় এটা। আলেফ যে-সে করে একটা হাসি টেনে আনলো মুখে, বললো, 'কেন্ করি নাই? শোনো নাই আমার মজিদের কথা? কেন্, মক্তবটা দ্যাখো নাই'?

বাপ-জ্যাঠার সম্মুখে ছিদাম চুপ করে গেলেও আলেফের বুকের পাশে সে নিয়ত খচখচ করতে থাকলো। ছিদাম যা বলেছে সেটা বোঝার বয়স আলেফের হয়েছে বৈকি।

এরফানকে বলতে ভরসা হয় না। সে হয়তো হাসতে হাসতে বলবে, 'কেন্, বড়োভাই, ব্যালে কামড় বসাইছো'?

দু'তিনদিন চিন্তা করে আলেফ আল মাহ্‌মুদকে চিঠি লিখলো : অপর এথা সকল মঙ্গল জানিবা। পরে সমাচার এই, তুমি খৎ পাইয়াই চলিয়া আসিবা। কমিটি এ মাহিনাতেই হইবে। তুমি না আসা তক্ আমার কোনো গতি নাই।

আল মাহ্‌মুদ যে এসব ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী সেটা বোঝা গেলো। চিঠি পাওয়ার দুদিন পরেই নিজের কাজকর্ম ফেলে সে চরণকাশিতে এলো। প্রথম দিনটা সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ালো, দ্বিতীয় দিনের প্রত্যুষে সে আলেফের মসজিদে জমায়েত ডাকলো।

জন পঞ্চাশ লোক এসেছে। কৌতুকপ্রবণ চাষীদের গালগল্পের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে আল মাহ্‌মুদ বললো, 'ভাইসব, আপনাদেক একটা কথা কবো। এই সুবে বাংলার মালেক হতেছি আমরা মোসলমানরা।

ইংরেজ আমাদেক দাবানের জন্য রাজ্য কাড়ে নিয়ে হেঁদুকে বড়ো করছিলো। এতদিনে ইংরেজরা বুঝছে সরকার চালাবের ক্ষমতা হেঁদুর নাই। তাই এখন আমাদের ডাকে নিয়ে রাজ্য চালাবের কইছে। আপনেরা গৈগাঁয়ে থাকে খবর পান না, কৈলকাতা নামে এক শহরে আমরা হেঁদুদেক দাবায়ে দিছি। আমাদের মোসলমান উজির আপনাদেক ত্যাল, কাপড়, চিনি পরাবি। তা কন্‌, মাঝখানে হেঁদুক আসবের দেওয়া কেন্‌? আমাদের সেখসাহেব এই মজিদ করছে। তার মতো বড়ো মোসলমান কে আছে? মোসলমানদের মধ্যি তার বড়ো কে? তাই কই, চিরকাল হেঁদুর দাবে না থাকে, ভাইসব, মাথা উঁচু করে ওঠেন। সেখসাহেবেক কমিটির সেক্রটারি বানান'।

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। অধিকাংশই পরস্পরের কাছে আল মাহ্‌মুদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো।

ফিরতি পথে তাদের কেউ কেউ আলোচনা করলো, 'তাইলে কমিটি তোমাব হেলাফেলার না'।

'না বোধায়'।

'ভাবেচিন্তে কাম করা লাগে, মামু। কইছিলাম সেখসাহেবেক সেক্কেটারি কববো। সে-কথাও আবাব ভাবে দেখা লাগে'।

কিন্তু আল মাহ্‌মুদ চালে একটা ভুল করে বসলো। তাব জমায়েতের কথা যখন তিনখানি গ্রামে আলোচ্য হয়ে উঠেছে, যখন আলেফ সেখের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে, বোড়ের কিস্তি দিয়ে বসলো সে তেরচামুখো ঘোড়ার পথে লক্ষ্য না রেখে। হাজিসাহেবের নাকের নিচে সানিকদিয়ারে তাঁব বাড়িব লাগোয়া মসজিদে নমাজের পরে এক জমায়েত ডেকে বসলো সে।

জমায়েত ভাঙলে হাজিসাহেব আলেফ সেখকে কাছে ডাকলেন।

'ছাওয়ালডা কে'?

আলেফের মনে খুশি ছিলো। বিগলিত স্বরে সে বললো, 'জে, আমাব ভাই এরফানের কুটুম। উয়ের শহরে ও কমিটির সেক্রেটারি হইছে'।

'ভালো, ভালো'।

আলেফ উৎসাহিত হয়ে বললো, 'ও খুব ধরছে আমাকে, কয় যে, আপনেও সেক্রেটারি হন গাঁয়ের'।

'ভালো। কিন্তুক একটা কথা ও চ্যাংড়ামানুষ বুঝবের পারে নাই, তুমি ওক বোঝাও নাই কেন্‌? গাঁয়ে সেক্রেটারি হবা ভালো, কিন্তু বাইরের লোক আসে কেন্‌? আর কৈলকাতা খেস্টান শহরের কথা এখানে কেন্‌'?

আলেফের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে আশেপাশে চেয়ে দেখলো বহু কান উৎকর্ণ হয়ে শুনছে হাজিসাহেবের কথা, বহু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে হাজিসাহেবের উন্নীত তর্জনীর দিকে।

হাজিসাহেব বললেন, 'সুবার মালিক সিরাজদেল্লার কথা কলো। কও, সে বিপদ তো অন্য দেশের লোক আসে। কয় যে তোমরা পাঁচ হাজার কয় শ আর হেঁদুরা চার হাজার কয় শ। তা হউক, হেঁদুক দাবাবা কেন্‌? আর তারা কী দাববি? হেঁদুর ছাওয়াল ইংরেজেক দাবায়। তোমার ঐ পাঁচে আর চারে নয় হাজারের দাঙ্গায় যদি ইংরেজ-দাবানো হেঁদুর ছাওয়াল ভেড়ে, তবে তোমার এক হাজার বেশি কী করে? তোবা। তুমি সেক্রেটারি হবা কিন্তু আদমজাদেক পয়মাল করবা কেন্‌'?

বাড়িতে ফিরে আলেফ গুম হয়ে বসে রইলো।

পরদিন আলেফ আল মাহ্‌মুদকে বললো, 'দ্যাখো, ভাইসাহেব, ও কাম কোরো না'।

বিস্মিত ব্যথিত আল মাহ্‌মুদ বললো, 'কন্‌ কী, কেন্‌? ঘাটে ভিড়ানো নৌকা ডুবায়ে সাঁতার পানি'?

'গাঁয়ের লোক বুঝবের পারে না'।

'ইন্‌সে আল্লা। বোঝাবো, বুঝায়ে আমি ছাড়বো। আমি লীগের কাম করি'।

আল মাহ্‌মুদের বেরুবার পোশাক পরাই ছিলো, সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এখন আপনার সাথে

মেলা কথা কবার টাইম নাই'।

'যাও কোথায়'?

'চিকন্দিতে জমায়েত হবি। সান্যালগরে বাড়ির গেটে খানটুক্ জমি আছে সেখানে হবি'।

'আহা, করো কী'?

'আপনে না-চাইলেও আমার কাম চলবি, এ লীগের কাম'।

সে চলে যেতে বিতৃষ্ণায় আলেফ কালো হয়ে উঠলো। সময়ের সঙ্গে দুর্ভাবনা এলো। কিছুটা সময় ধরে আল মাহ্‌মুদের রক্তাক্ত আহত দেহ তার কল্পনায় ভাসতে লাগলো। শহরের ভদ্রব্যক্তি বলতে যে নির্জীব শ্রেণীকে বোঝায় তেমন নয় সান্যালরা।

দুপুরের বোদ পড়ে গেলে আলেফ তার মসজিদের সম্মুখে এক টুকরো ছায়াশীতল মাটিতে বসে তার ভাগ্যের কথা ভাবছিলো। কী আশ্চর্য, সবই কি, সকলেই কি তার বিরুদ্ধে যাবে? এই দ্যাখো আল মাহ্‌মুদকে সে ডেকে নিয়ে এলো, এখন সে-ই হলো পরম শত্রু। জ্যা-মুক্ত শরের মতো, সামুদ্রিক কলসের দৈত্যের মতো তাকেও আর বশে আনা যাবে না। এইটাই বাকি ছিলো—সান্যালমশাইযের সঙ্গে অকারণ প্রাণক্ষয়ী বিবাদ খুঁজে বার কবা।

নির্বাক নিস্তব্ধ মসজিদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আলেফের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রাণের সবটুকু বেদনা কারো কাছে বলার ইচ্ছা হলো তার। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে সে প্রথমে মসজিদের বাঁধানো চত্বরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ধূলিভরা পায়ে মসজিদের দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। অশুচি অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে দ্বিধা হলো, কিন্তু নিজে যে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সেখানে প্রবেশ করার দ্বিধা সহজেই সে জয় করতে পারলো। মসজিদের দূরতম কোণটি প্রায় অন্ধকার। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। তারপর তার বেদনা ভাষা পেলো। বললো সে, 'খোদা, আমি কী অন্যাই করছি, কও? কমিটির সেক্রেটারি হবের চাই, তা কি গুনাহ্? এই দ্যাখো, আল মাহ্‌মুদ কী বিপদে ফেলালো আমাকে। বুক ভাঙে যাতেছে আমার। আর কেউ না বুঝুক, তুমি তো বোঝো? খোদা রহমান, আমার জন্যি কি কমিটির সেক্রেটারি নাজেল-মঞ্জুর করবা না? আর তা যদি না করো তবে আমি যে তোমার কাছে এত কথা কলাম সে যেন কেউ না জানে। আর আল মামুদ যেসব কথা কতিছে সেসব লোকের প্রাণের থিকে মুছে দেও'।

আলেফ সেখের গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।

সম্ভবত খোদা রহমান আলেফকে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

ঘটনাটা এইভাবে ঘটলো :

এক বিকেলে এরফান সান্যালমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলো। সে দূর থেকেই দেখতে পেলো ঘরের মধ্যে সান্যালমশাইকে ঘিরে চারদিকের গ্রামের কয়েকজন ভদ্র ও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বসে আছে।

চৈতন্য সাহা দরজার কাছে থেকে বললো, 'আসেন সেখসাহেব। আপনেদের দুই ভাইকে ডাকার জন্যি লোক পাঠানো হইছে। ফুডের নিস্‌পেক্‌টার কাল সাঁঝে হঠাৎ আসে উপস্থিত। আজই কমিটি হবি। আমার দোকান থিকে সব বেচা হবি। এখন পারমেট দেওয়ার জন্যি একজন সেক্রেটারি চাই'।

চৈতন্য সাহা থামলো। এরফানের বলার কথা অনেক ছিলো, বস্তুত যা বলতে সে এসেছে সেটা আপনা থেকে উঠে পড়ায় তার সুবিধাই হয়েছে, কিন্তু তিন গ্রামের মুরুব্বিস্থানীয়দের সম্মুখে খপ করে কিছু বলতে তার সৌজন্যবোধে আটকালো।

এই সভায় সানিকদিয়ারের হাজিসাহেব ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর জন্যে একটি ফুর্সি এসে গেছে। চৈতন্য সাহার চাপা গলার কথা থামলেই তাঁর ফুর্সির মৃদু শব্দটায় আবার সকলের মনোযোগ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলো। অনেক দিনের অনেক হেরফের দেখা মানুষ, তাড়াতাড়ি করে এগোনোর পক্ষপাতী নন তিনি।

তিনি বললেন, 'ধান কেমন হলো, ও রামচন্দ্র'?

'ভালোই হবি মনে কয়'।

'তা আজকাল তো বড়ো বার হই নে। আসতে আসতে দেখলাম রামচন্দ্রর পাড়ায় গোরুবাছুব মানুষজন বেশ মোটা মোটা হইছে'।

এরফান বললো, 'হয়, ওদের দিকে আগুই হইছে'।

'তা আগুই হলেও যা, নাব্‌লাও তাই। সে গল্প জানো নাকি, মুকুন্দবাবু'? হাজিসাহেব হেসে বললেন।

গল্পটা এই : কৃষক বিদেশে গিয়েছিলো, তার বউ বড়ো একলা পড়েছিলো। চাষীবউ ধান ঠেকায়, না অন্য কিছু। এরকম বউ-ঝি গ্রামে থাকলে সেকালে দেওব-সম্পর্কে ছোটো ছেলেরা বড়ো উৎপাত করতো। পাখপাখালিব মতো হাসাহাসি বলাবলি করতো। বউ ভাবে ধান যদি আগুই হতো কৃষক তাহলে বোধহয় ঘরে আসে। তার কথা শুনে ধান হঠাৎ আগুই হলো। কৃষক দূর থেকে ধানের গন্ধ পেয়ে আ-আ-হৈ করে দৌড়তে দৌড়তে এসে ধান কাটতে বসে গেলো। ধানই কাটে, ধানই কাটে। একদিন চাষী-বউ আবার বললো, 'হা ঈশ্বর, ধান যদি একটু নাব্‌লা হতো দু'একটা কথা বলা যেতো চাষীব সঙ্গে'। সেই থেকে বিবক্ত হয়ে ধান আর কথা শোনে না।

গল্পটা সকলেই উপভোগ করলো।

মুকুন্দ রায় বললো, 'এখন ধানের আগুই নাব্‌লাব খোঁজ নেয় শুধু চৈতন্য'।

এই কথাতেই হাজিসাহেব গল্প শুরু করলেন, 'সেই যে কে সাজিমশাইকে ফোটাতিলক সরাতে কইছিলো, তা জানো'?

রেবতী চক্রবর্তী বললো, 'গল্প নাকি'?

হাজিসাহেবের দ্বিতীয় গল্প এইরকম : এক সাজিমশাইয়ের কাছে কৃষকরা খুচরো ধান পাঠাতো বিক্রি করতে, অল্প ধান, ছোটো ছেলেমেয়েরাই আনতো। দাম নিয়ে খুব কষাকষি কবতো সাজিমশাই। তা করুক। আরো একটা কৌশল ছিলো তার। দামে না বনলেও ধান মাপতো সে, তারপর ঘব থেকে বেরিয়ে বলতো, আরে এতে চার সেরও নাই, পাঁচ সের কি বলিস। যা, যা, এবকম কবে ঠকাতে আসিস নে। কৃষকরা বুঝতো কাঠায় করে মেপে দেওয়া ধান লোহার বাটখারার ওজনে চড়ে বিরক্তিতে কমে যায়। কিন্তু এক ছিলো কৃষক যে বাড়ি থেকে বাটখাবায় মেপে ধান পাঠালো সাজির কাছে। তবু তার ছেলে ফিরে এসে বললো, ধান মাপে সেরকে আধপোয়া কম। কৃষক ছুটলো সাজিমশাইযেব বাড়িতে। 'সাজিমশা, বাড়িতে'? 'আসো, আসো'। সাজিমশাই ঘর থেকে বেরুলো, কপালে মস্ত গোপীচন্দনের তিলক। পরনে লাল পাটকাপড়। সাজসজ্জা দেখে কৃষকের মন গেলো দমে। দম নিয়ে সে বললো, 'এক কাম করেন সাজিমশায়। উই তিলকডা সরান'। 'কেন্'? 'নাইলে ওখানে পা বসানো যায় না'।

একটা চাপা হাসি এ-মুখ থেকে ও-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। চৈতন্য সাহা অকারণে হেঁ-হেঁ করতে লাগলো। সান্যালমশাই সট্‌কার আড়ালে গাম্ভীর্য বজায় রাখলেন।

অন্য সকলের হাসাহাসির সময়ে হাজিসাহেব তাঁর ফুর্সিতে অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। হাসাহাসি থামলে তিনি আবার কথা বললেন। বললেন, 'কবে আছি, কবে নাই। এমন চাঁদের হাটে আর বসা হবি নে। শেষবার বসে গেলাম। চোখ বোজার কালে তোমাদের সকলের মুখ চোখে যেন ভাসে। কও, সান্যালমশাই, ছোটোকালে চাচা কতে, তা কি মনে আছে? কেন্ সান্যালমশাই, তোমার মনে নাই সেকালে আমি বুড়া ছিলাম না। তখন তোমার বিলমহল শাসন করতাম, চর দখল করে দিতাম'।

'মনে আছে বৈকি। সবই মনে আছে'।

'এইটুক্, এইটুক্। এখন সভার কথা বলা-কওয়া হোক, কাজের কথা হোক'।

সভার কাজ যখন শুরু হলো তখন এরফান তার দ্রুতগতিতে বিস্মিত হলো। সান্যালমশাই বললেন, 'এই ভদ্রলোক দিঘা থেকে এসেছেন। যেসব জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণের দুষ্প্রাপ্য

হয়ে উঠেছে সেগুলি একটা নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণে, সরবরাহ করা হবে। সরবরাহটা যাতে যথাসম্ভব সকলকে উপকৃত করে সেইজন্যে কমিটি। এরফান, চরণকাশির মত তুমি নিশ্চয়ই জানো, না তোমার দাদার জন্য অপেক্ষা করা হবে'?

এরফান কিছু বলার আগেই হাজিসাহেবের ছেলে ছমিরুদ্দিন বললো, 'আলেফ সেখ নিজেই সেক্রেটারি হবের্ চায়'?

'তাই চায় নাকি'? সান্যালমশাই যেন আগ্রহে সোজা হয়ে বসলেন, 'এটা ভালো সংবাদ। তাহলে সেই সম্পাদক হবে। যে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে তাকে সুযোগ দিতে হয়'।

ছমিরুদ্দিনের মুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। যেটাকে সে বিদ্রূপ হিসাবে ব্যবহার করেছিলো সেটা সান্যালমশাইয়ের কাছে সুসংবাদ হয়ে উঠবে ভাবতে পারেনি সে। কিন্তু তার বিবর্ণ মুখ সান্যালমশাইয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর দৃষ্টিতে কৌতুক চকচক করে উঠলো। তিনি বললেন, 'ছমির, এ-সব কাজে বরাবরই তোমার উৎসাহ আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছো তুমি, এটারও হও। তুমি আর আলেফ দুজনে মিলে দ্যাখো গরিব দুঃখীদের উপকার করতে পারো কিনা। তোমাদের কমিটিতে মুকুন্দবাবুকে নিয়ো, রেবতী আর রামচন্দ্রকে নিয়ো। হাজিসাহেব না থাকলে তো কঠিন ব্যাপারে সব সেরা বুদ্ধি তোমরা পাবে না'।

প্যান্টকোট-পরা লোকটি বললো, 'তাহলে এখানকার কমিটি তৈরি হলো'?

সভা সমস্বরে জানালো, 'তা হয়েছে'।

এরফানের সঙ্গে আলেফের দেখা হলো পথে।

এরফান প্রশ্ন করলো, 'দম্‌দম্ করে যাও কতি'?।

আলেফ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, 'সান্যালমশাই ডাকে পাঠাইছে। তুমি চলে আসলা যে'?

'থাকে আর করবো কী'?

আলেফের মুখ রক্তহীন হয়ে গেলো, 'তাইলে আমি আর যাই না। মনে কয়, আল মামুদের বক্তৃতার কথা হইছে'।

দুজনে বাড়ির পথ ধরলো।

পথ চলতে চলতে এরফান বললো, 'কেন্ ভাই, সেক্রেটারি হবের চাও'?

আলেফ একটা কটু কথা বলতে গিয়ে থামলো। তিরস্কার ও অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে সে ছোটো ভাইয়ের মুখের দিকে খানিকটা সময় চেয়ে রইলো।

এরফান হেসে বললো, 'হবা তো হও'।

'তার মানি'?

'সান্যালমশাই তোমাকে সেক্রেটারি করছে'।

'আল্লা রসুল'!

নীরবে কিন্তু অস্থিরভাবে খানিকটা পথ চলে অবশেষে আলেফ ভাবলো, 'আল মামুদেক হৈচৈ করবের মানা করো। সে যেন্ না কয় তার বক্তৃতায় কাম হইছে। সান্যালমশাই শুনলে ভাবে কী'?

'হয়'! এরফান বিস্ময়ের ভান করলো, যেন আল মাহ্‌মুদের কথা এই প্রথম শুনলো সে।

'ওর আর এ-গাঁয়ে থাকে কাম নি, চালান করে দেও'।

তিন-চারদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে গেলো আলেফের। পঞ্চম দিনে চৈতন্য সাহা এসে কিছু ছাপানো কাগজপত্র, কিছু বইখাতা দিয়ে গেলো।

চৈতন্য সাহা চলে গেলে ছেলেকে সুখবরটা দেওয়ার জন্য পত্র লিখতে বসলো আলেফ। সুসংবাদটা ফলাও করে বর্ণনা করে অবশেষে সে যা লিখলো তার মর্মার্থ এইরকম :

তুমি একবার এসে দেখে যেয়ো। আর আসবার সময়ে আমার জন্যে একটা টুপি এনো। লাল ফেজ

না। কালো লোম-লোম একরকম টুপির কথা গতবার বলেছিলে, সেইরকম এনো। আর-এক কাজ করবা, কলকাতায় পাঠান যদি থাকে খোঁজ করবা তারা কাবুলি-পাগড়ি বাঁধে, না টুপি পরে। মনে রাখবা আমরা পাঠান-বংশের।

২৩

ইতিহাসের এ অধ্যায়কে মুঙ্লার বিবাহ-খণ্ড বলা যেতে পারে। কিছু জমিজমা হস্তান্তর হবে এমন খবর এনেছিলো ছিদাম। এমন সব খবর আজকাল তার কাছে সবসময়েই পাওয়া যায়। এমন নয় যে সে জমি কিনবে। তার চাইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব থাকতে পারে অন্য অনেকের, কিন্তু তাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে। আলেফ সেখ, ছমিরুদ্দিন, গহরজান, মিহির সান্যাল ছাড়াও মুকুন্দ রায় আছে, রেবতী চক্রবর্তী আছে।

কেষ্টদাস বললো, 'ছিদামের কাছেই শোনেন'।

রামচন্দ্র বললো, 'ছেলেমানুষ কী বলতে কী শুনছে'।

ছিদাম ঘরে ছিলো, সে বললো, 'না জ্যাঠা, খবব ঠিক। সানিকদিয়াবের সকলেই জানে মহিম সরকার জমি বেচবি'।

'কেন্, তার কীসের অভাব? শুনি তার আট বেটা পাঁচ মিয়ে সবাই বাঁচে'।

'তা আছে। তার সকলের ছোটোমিয়ের বিয়ে দিবি, তাই নাকি জমি বেচবের চায়। কয় যে—কবে আছি কবে নাই। তখন ছোটোমিয়ের বিয়ে তার দাদারা দিবি কিনা দিবি, ঠিক কী। তা ছোটোমিয়ের নামে চৌদ্দ বিঘা জমি লেখা আছে, সে জমি বেচে নগদ টাকা করে ধুমধাক্কে বিয়ে দিবের চায়। এক পাত্র নাকি জুটছে'।

ছিদাম কাছে এসে বসলো। তার কাছে জমিজিরাতের খবর ছাড়াও গ্রামের সাধারণ খবরও পাওয়া যায়, বিশেষ করে কোথায় কোন অন্যায় অবিচার হচ্ছে তার লম্বা ফর্দ। রামচন্দ্র ও কেষ্টদাস ক্বচিৎ কখনো প্রতিকারের পথ বাৎলায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকে। একদিন কেষ্টদাস রাগ করে বলেছিলো, 'না রে বাপু, যত রাজ্যের লোক তোর কাছেই-বা লাগায় কেন্ এত কথা। নালিশ করার লোক কি তাদের নাই আর'?

এ-ধরনের কথায় ছিদাম অপ্রতিভ হয় না। সে হয়তো বলে বসে, 'যা-ই কও, চিতে সা আবাব শয়তানি লাগাইছে, তার জোগানদার ছমিরুদ্দিন না আলেফ সেক বুঝি না। বেশি দাম হলিও এতদিন জিনিস পাতে, এখন পাও না কেন্'?

আজ ছিদাম সেসব কথা বললো না। মহিম সরকারের জমিজিরাতের কথা নিয়েই মশগুল হয়ে রইলো।

রামচন্দ্র ছেলেমানুষকে ঠাট্টা করার সুরে বললো, 'তুমি যদি নেও জমি, দামদস্তুর করতে পারি'।

'আমি'! ছিদাম হেসে ফেললো। 'দাম শুনি তিন হাজার'।

বাড়িতে ফিরে রামচন্দ্র দেখলো বাইরের দিকে কেরোসিনের কুপির আলোয় বসে মুঙ্লা গোরুর জন্য খড় কুচোচ্ছে। রামচন্দ্রর স্ত্রী সনকা দিনের বেলাতেই রান্নার কাজ শেষ করে রাখে। চাঁদের ম্লান আলো ভিতরদিকের বারান্দায় যেখানটায় পড়েছে সেখানে নিঃসঙ্গ সনকা নীরবে বসে আছে। কোনো কাজ নেই, নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জন্য কোনো অকাজের কাজও সে আবিষ্কার করেনি। চিরদিনই সে স্বল্পভাষী। সংসারের আঘাতে সে আরও অন্তর্মুখী হয়ে গেছে। দিনের বেলায় সংসারের কাজ থাকে, পাড়াপড়শী দু'একটি স্ত্রীলোক আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর রামচন্দ্র কথা বলার জন্য কেষ্টদাসের বাড়িতে কিংবা অন্যত্র যায়, মুঙ্লা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন স্তব্ধতাই সনকার সঙ্গী। রামচন্দ্র নিরুপায়।

পুরুষ হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়ার অর্থ, মন ও দেহ দুটিকেই নষ্ট করা। বোষ্টমরা স্ত্রীদের সাহচর্য দেয় বলেই তারা পৌরুষহীন।

গায়ের জামাটা ঘরে খুলে রেখে এসে রামচন্দ্র বললো, 'আসলাম'। রামচন্দ্রর স্ত্রী উঠে দাঁড়ালো, মুঙ্‌লার কাছ থেকে কুপি চেয়ে এনে রামচন্দ্রর হাত-পা ধোবার জল, গামছা, খড়ম এগিয়ে দিলো। মুঙলা এসব কাজে তার শাশুড়ির সহায়তা করে। সে তামাক সেজে এনে দিলো। বারান্দার নিচু জলচৌকিটায় বসে তামাক খেতে খেতে রামচন্দ্র লক্ষ্য করলো কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে মুঙ্‌লা হাতমুখ ধুচ্ছে। সনকা কুপি নিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়তে গেছে।

আজই আকস্মিকভাবে চোখে পড়লো তা নয়, এর আগেও এসব লক্ষ্য করেছে রামচন্দ্র। বাড়িটার চেহারা আর ফিরলো না, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আবার ধান উঠেছে। দুর্ভিক্ষের ক্ষতচিহ্নের মতো শোকটা রয়েই গেলো। সনকা কিন্তু একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলো একদিন। বাল্যকালে তার দুরন্তপনায় রুষ্ট হয়ে এক প্রতিবেশী বলেছিলো তার মাকে—সনকা নাম রেখেছো আহ্লাদ করে, ওর ভাগ্য সনকার মতোই হবে। এ যেন এক ধরনের সান্ত্বনা যে এই সন্তানশোক তার ভাগ্য-নির্ধারিত, যেমন তার নাম সনকা হওয়া, কিংবা রামচন্দ্রর মতো প্রচণ্ড স্বামী পাওয়া।

একরাত্রিতে রামচন্দ্র স্ত্রীকে বললো, 'মহিম সরকার যেন্ কী হয় তোমার'?

'বাপের পিসাতো ভাই'।

'শুনছি নাকি সে তার ছোটোমিয়ের বিয়ে দেয়'।

'তা দেওয়া লাগে। চোদ্দ পনরো বছর হলো বোধায়'।

অন্যের ছেলেমেয়ের বিয়ের কথা শুনলে নিজের ছেলেমেয়ের বিয়ের কথা বয়স্ক লোকদের মনে হয়। কিছুকাল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে রামচন্দ্র বললো, 'কেন্, তোমার মুঙ্‌লার আবার বিয়ে দিতে হয় নাকি'?

'তা কি আর আমি দিবো? তুমি শ্বশুর; তার বাপ এখনো বাঁচে'।

এরপরে অনিবার্যভাবেই মেয়ের কথা মনে পড়লো। দুজনের দীর্ঘশ্বাস দুজনের কানে গেলো। রামচন্দ্রর মনে হলো একটি ছোটোবউ এসে যদি এ-বাড়ির ঘর-দরজায় ঘুরঘুর করে বেড়ায় তাহলে সনকার নিঃসঙ্গতা কিছু কমে।

কাজকর্ম আজকাল কম। মহোৎসবের জন্য যে-চাদরটা মুঙ্‌লা তার জন্য কিনে এনেছিলো সেটা কাঁধে ফেলে অনির্দিষ্ট গতিতে পথ চলতে চলতে সে একদিন সানিকদিয়ারের পথ ধরলো। নিজে সে চিকন্দির অধিবাসী হলেও তার অধিকাংশ জমি সানিকদিয়ারে। কাজেই সানিকদিয়ারে তার যাওয়া-আসা আছে। সানিকদিয়ারে পৌঁছে তার মনে হলো—এখানে কেন এলাম। সে কি এখন হাজিসাহেবের বাড়িতে যাবে? না, তার দরকার নেই। সেখানে ছমিরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হতে পারে এবং কমিটির কথায় অপ্রিয় কথা উত্থাপিত হতে পারে। ছমিরুদ্দিন জানে ছিদাম ও মুঙ্‌লার দল আজকাল ফুড্ কমিটি নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করছে। এরপর তার মনে হলো, সে মহিম সরকারের বাড়িতে যাবে। সেখানে খবর আছে।

মহিম সরকারের বাড়িতে পৌঁছতেই সে সমাদৃত হলো। মহিম সরকার নিজে এগিয়ে এলো।

'আসেন, জামাই'।

রামচন্দ্র নমস্কার করে বললো, 'ভালো আছেন, কাকা? আসলাম একটু খোঁজখবর নিতে'।

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর গালগল্প হলো। বেলার দিকে লক্ষ্য রেখে রামচন্দ্র বললো, 'এবার উঠবের হয়'।

'তাও কী হয়? ছান-আহার এখানেই হবি। আমি লোক পাঠায়ে মিয়েক খবর দিতেছি'। রামচন্দ্র 'না' 'না' করতে মহিম সরকার তার ছোটোছেলেকে ডেকে বললো, 'এঁয়াক চেনো, বলাই? তা না-চেনো, চিকন্দির রামচন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে যায়ে কয়ে আসো মহিম সরকার কয়েছে—জামাই এ-বেলা তার

বাড়িতে থাকবি'। মহিম সরকারের ছোটো ছেলে রামচন্দ্রর দিকে চোরাদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেলো।

স্নানাহারের পর রামচন্দ্র বললো, 'কাকা, জমি নাকি বেচেন'?

'না। মিয়ের বিয়ে দিতে হবি। তা এক পাত্র পাই শহরে। ভাবছি, মিয়ের নামে জমি, সে কি আর শহর থিকে ভোগ করবের আসবি? তার চায়ে নগদ টাকা করে দিবো। কেন্ জামাই, জমি নিবেন? তা নিলেও সুখ পাই। ভাববো, এক জামাই না নেয়, আর এক জামাই নিছে ; জমি ঘরের বার হয় নাই'।

'কিন্তুক—'

'কী কিন্তুক, কন্ জামাই। জমি নিবের চায় ছমিরুদ্দিন, সে শাসায় অন্য কেউ আগালে। আমি ভাবছি ছমিরেক আসবের দেবো না আমার জমির পাশে। ঐ জমিটুকের এক লপ্তে আমার আর দুই মিয়ের জমি আছে। পাশে ছমিরুদ্দিন জমি নিলে মামলা-কাজিয়া হবের পারে'।

'কিন্তুক—' রামচন্দ্রর কিন্তুকের অর্থ তিন হাজার টাকা ধাঁ করে বের করে দেবে এমন ক্ষমতা তার নেই। আর তাছাড়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে এক কাঁধে জমি আর এক কাঁধে ঋণ নিয়ে আগেকার মতো চলার দুঃসাহসও যেন তার কমে গেছে।

রামচন্দ্র বসে বসে গোঁফ পাকাতে পাকাতে হঠাৎ বলে ফেললো, 'কেন্, কাকা, এমন জামাই যদি হয়, মিয়ে আপনার চোখের উপরে থাকে, জমি আপনার বেচা লাগে না'।

'জমি কে বেচবের চায়? মিয়ে চোখের উপরে থাকে জমি ভোগ করবি এমন জামাই কনে পাই'?

'কাকা, মুঙ্লাক্ দেখছেন্'?

'মুঙ্লা'?

'হয়, মুঙ্লা'।

'যে-মুঙ্লার তুমি বাপ হইছো'?

'তার বাপ এখনো বাঁচে'।

'তাইলেও, তোমার জমিজিরাত দ্যাখে সেই ছাওয়াল'?

'হয়'।

'হুম্'। মহিম সরকার তার ডাবা হুঁকোয় মুখ দিয়ে মুহুর্মুহু ধোঁয়া টানতে লাগলো। তারপর 'ধরেন' বলে হুঁকোটা রামচন্দ্রর হাতে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলো। প্রায় পনরো মিনিট পরে মহিম ফিরলো। তার সঙ্গে তার সাত ছেলে।

মহিম সরকার বললো, 'কন্, জামাই, মুঙ্লার কথা কী কবেন'।

'কী আর কবো। তার বাপ বাঁচে। মুঙ্লা আমার কাছে থাকে'।

মহিম সরকারের বড়োছেলে বললো, 'লোকে তো জানে মুঙ্লা আপনের ছাওয়াল'।

'তা কয় লোকে'।

মহিম সরকারের মেজোছেলে বললো, 'মানুষ বলাবলি করে আপনের সম্পত্তির সেই হক্‌দার'।

'তা কউক, মিথ্যা কী কয়'?

মহিম সরকার বললো, 'মুঙ্লার বিয়ে দিবেন, জামাই'?

'না দিয়েই-বা কী করি, কন্'।

রামচন্দ্র বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরলো। পথে কথাটা সে ভাবলো। এ-কথা স্পষ্ট কোথাও উচ্চারিত হয়নি যে মুঙ্লার সঙ্গে মহিম সরকারের মেয়ের বিবাহের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু রামচন্দ্র মুঙ্লার কথা উত্থাপন করেছিলো এবং মহিম সরকার সপুত্রক তাকে প্রশ্নাদি করেছিলো এই সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে। রামচন্দ্র ব্যাপারটাকে দুদিন গোপন করে রাখলো, তারপর স্ত্রীকে বললো, 'এমন বিয়ে হয় নাকি'?

একদিন গোরুগাড়ি করে সনকা মহিম সরকারের বাড়িতে গিয়ে একবেলা কাটিয়ে এলো, আর একদিন

দুই বেটা-বউকে সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক মহিম সরকার রামচন্দ্রর বাড়িতে এলো। এরপরে একদিন রামচন্দ্র মুঙ্‌লার বাবার কাছে গিয়ে অনেক আলাপ করে এলো। তারপর রাষ্ট্র হলো মহিম সরকারের ছোটোমেয়ের সঙ্গে মুঙ্‌লার বিবাহ হচ্ছে।

বিবাহের তখনো কিছু দেরি আছে। একদিন ছিদাম এসে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে রামচন্দ্রকে প্রণাম করলো। রামচন্দ্র 'আহা-হা, করো কী, করো কী' বলতে বলতে ছিদাম প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালো। রামচন্দ্র তাকে শাসনের ভঙ্গিতে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'গোঁসাই অধিকারীর ছাওয়াল হয়ে আমার পায়ে হাত দেও, এ কী কথা'?

'কেন, জ্যাঠা, আপনে আমার জ্যাঠা হবের পারেন না'?

'এ কথা কও যে'।

'গাঁয়ের লোকে কয়—'

'কী কয়'?

'এমন পাকা বুদ্ধি আর কারো দেখি নাই, একটানে পনরো বিঘা জমি ঘরে উঠলো'। ছিদামের ভঙ্গিতে চপলতা ছিলো কিন্তু রসিকতা ছিলো না। সে যেন পথের উপরে দাঁড়িয়ে পথপ্রদর্শককে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানাতে গিয়ে আলোক-বিহুল হয়ে মন্ত্রের গাম্ভীর্য ভুলে গেছে।

মাসদুয়েকের মাথায় বিবাহের দিনটি এসে পড়লো। দিঘা থেকে ভাড়াকরা ডে-লাইট এনে, সানিকদিয়ারের জীবন ঢুলির ঢোল-ডগর বসিয়ে, গাঁয়ের লোকজনকে আদর-অভ্যর্থনা করে বউ ঘরে তুললো রামচন্দ্র। বিবাহের দিনেই কাগজে কাঁচা লেখার কাজ শেষ হয়েছিলো, তিন-চার দিন পরে দুখানা গোরুগাড়ি করে রামচন্দ্র ও মহিম সরকার সদরে গিয়ে সম্পত্তি রেজেস্ট্রি করে এলো।

মুঙ্‌লার বাবা এসেছিলো। যে শিশু-মুঙ্‌লাকে রামচন্দ্রর হাতে প্রায় দত্তকের মতো সে অর্পণ করেছিলো তাকে দেখে চিনতেই পারলো না চট করে। তার পরিচয় পেয়ে মহিম সরকার অবশ্য তাকেও যথাযোগ্য সমাদর করেছিলো।

কিন্তু হুঁশিয়ার মহিম সরকার। নগদ খরচ করতে নারাজ। বরযাত্রীদের ভালো করে খাওয়ালো সে, গহনার অধিকাংশ রামচন্দ্রকেই দিতে হলো। কিছু ঋণ হলো তার।

মুঙ্‌লার বউয়ের নাম ভান্‌মতি। মহিম সরকারের নিকষ কৃষ্ণ রং পায়নি সে কিন্তু দেহগঠন পেয়েছে। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। চোদ্দ-পনরো বছর বয়স হলো, কিন্তু পূর্ণতায় তাকে বিশ বছরের বলে ভুল হয়। প্রথম দিন যখন সে নববধূর পোশাক ছেড়ে সংসারের কাজে নামলো, সনকা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলো।

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলেও আরো ভালো করে জানার জন্য ভান্‌মতি মুঙ্‌লাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার মা কাঁদলেন কেন্'?

বলা উচিত কিনা এই ভেবে মুঙ্‌লা চুপ করে রইলো।

ভান্‌মতি আবার বললো, 'আমি আসে কি খারাপ করলাম'?

এ অবস্থায় মুঙ্‌লার বয়সের একটি ছেলে যেমন করে পারে তেমনি করেই মুঙ্‌লা বললো, 'তুমি এ বাড়িতে আলো আনছো'।

ভান্‌মতি সুর বদলে বোকার অভিনয় করে বললো, 'হয়, বাবা তোমাক একটা বিলেতি হারিকেন দিছে'।

ঘরের কোণে একটা নতুন হারিকেন মৃদুভাবে জ্বলছিলো। সেটাকে দেখিয়ে ভান্‌মতি খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু মুঙ্‌লা হাসিতে যোগ দেওয়ামাত্র শাসনের ভঙ্গিতে বললো 'পাশের ঘরে ওনারা আছেন'।

কিছুপরে ভান্‌মতি বললো, 'শ্বশুরেক দেখলে ভয় করে কিন্তুক আমার শাশুড়ির মতো মানুষ আর

কনে পাবো। আমার বউদিদিদের চাইতে অনেক ঠাণ্ডা'।

কিছুদিন যেতে না যেতে অসুবিধা হলো ছিদামের। কিছুদিনের মধ্যে সে আর মুঙ্‌লা সুহৃৎ-মিত্রই হয়নি, অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীও হয়েছে। গ্রামের পথে একজনকে দেখলে আর-একজনকে যে কাছাকাছি পাওয়া যাবে তা আন্দাজ করে নেওয়া চলে। সেই মুঙ্‌লা এমন হলো যে নিজে থেকে আসে না, ডেকে আনলে ছটফট করে।

একদিন ছিদাম কথাটা পদ্মকে বললো, 'কেন্, এমন হয় কেন্'?

পদ্ম কিছু না বলে হাসলো।

ছিদাম বললো, 'এবার ধান রোপার কী করবো ভাবে পাই না'।

'কেন্, গতবার কি আমি পারি নাই'?

'পারছো, লোকে কিন্তুক ভালো কয় নাই'।

পদ্ম একটু ভেবে বললো, 'ধান রোপার সময় সে আসবি। তার খেতের জন্যি তোমাকে ডাকবি'।

কিন্তু এসব মনোভাব প্রকাশের দুর্বল চেষ্টামাত্র। ছিদাম বাল্যে মাতৃহারা। পিতা উদাসীন। পদ্মর কাছে সাহচর্য ও স্নেহ পেয়েছে বটে কিন্তু মুঙ্‌লার কাছে যা পেয়েছে তার তুলনা হয় না। বুক ভরে ওঠার, শরীরে শক্তি এনে দেওয়ার মতো কিছু অন্য কেউ দেয়নি তাকে। সারাদিন একত্রে কাজ করেছে তারা, তবু ছিদামের ধান পৌঁছে দিয়ে যখন মুঙ্‌লা বাড়ি ফিরবে বহুদিনের অদর্শনের পর যেমন হতে পারে, তেমনি করে দুজনে দুজনকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছিলো। এটা একটা সূচক ঘটনা।

একদিন পদ্ম বললো, 'ছাওয়ালের বিয়ের কথা ভাবো নাকি'?

কেষ্টদাস বললো, 'ভাবে কী করি'!

'ছাওয়ালের মন খারাপ তাই কলাম'।

কারণটা কেষ্টদাস বুঝতে পারলো কিন্তু উদাস ভঙ্গিতে সে বললো, 'আমি কি রামচন্দ্র, যে নাম শুনলে মিয়ে নিয়ে আসবে লোকে'?

কানাঘুষায় কথাটা শুনে ছিদাম কিন্তু পদ্মর উপরে রাগ করলো।

'বিয়া দিবা? চৈতন্য সার ধার এখনো শুধি নাই। খাবা কী? পরবা কী'?

কথাটায় পরুষ সুর থাকায় পদ্ম হকচকিয়ে গেলো, একটু অপমানিত বোধ করলো সে। কিন্তু ছিদাম যখন চলে যাচ্ছে তখন তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পদ্মর মনে হলো . কথাটা ও মিথ্যা বলেনি। যদি শক্তিহীন পিতা এবং নিঃসম্পর্কিত একটি স্ত্রীলোককে প্রতিপালনের ভার ওকে বইতে না হতো তবে নিজের মনের মতো একটি স্ত্রী নিয়ে গৃহী হবার পক্ষে ওর শক্তি যথেষ্টই আছে। মনের গভীরতর স্থানে প্রবেশ করে পদ্ম স্থির করলো, দুইটি পুরুষের স্ত্রী হয়ে কালযাপন করার পর তার বোঝা উচিত ছিদামের মনের অবস্থাটা কী হতে পারে। কোনো কড়া কথা ছিদামকে বলা উচিত নয়, আর বোধহয় একটু হেসে কথা বলা উচিত।

সে খানিকটা-বা অভিনয় করে, কিছুটা-বা হৃদয়কে প্রসারিত করে ছিদামের বন্ধু-বিরহ দূর করতে চেষ্টা করলো।

সুরতুন পঙ্গু বনবিড়ালটাকে কোলে করে গ্রামের পথে চলছে। পথে লোকজন আছে। সুরতুনের দিকে অনেকেরই লক্ষ্য আছে তাও বোঝা গেলো। অন্তত দু-একজন লোক তার সঙ্গে সঙ্গে চলবার জন্য নিজেদের দল থেকে পিছিয়ে পড়েছিলো। দু-দুবার সেও দুজন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলো, যেন কথা বলাই তার প্রয়োজন।

উঁচু সড়কটার বাঁদিক থেকে একটা পায়ে-চলা পথ কখনো মাঠ কখনো আল ধরে পদ্মার জল থেকে এগিয়ে এসে যেখানে সড়কটায় মিশেছে সেখানে এসে সুরতুন ইয়াজকে দেখতে পেলো। যেন ইয়াজকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো পথে পথে, যেন সে জানতো তাকে এদিকেই পাওয়া যাবে এমনভাবে মুখে হাসি নিয়ে সুরতুন দাঁড়ালো।

'ইয়াজ'?

'সুরো'?

'কতি যাও, ইয়াজ'?

'বুধেডাঙায়'।

ইয়াজ এবং সুরতুন পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

ইয়াজ বললো, 'কেন্ সুরো, এই গাঁয়ে আমার আম্মা থাকে'।

এটা তার প্রশ্ন নয়। কথাটিকে নিজের মনের সম্মুখে ধরে অনুভব করা।

সুরো জিজ্ঞাসা করলো, 'ফতেমার সঙ্গে দেখা হয় নাই'?

'হইছে'।

'এই গাঁয়েই থাকো'?

'চেরকাল থাকবো'।

সুরতুন ইয়াজের কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখলো।

কিছুদূর গিয়ে সুরতুন আবার প্রশ্ন করলো, 'তোমার ভাইরা কনে'?

'জান্‌নে'।

'এখানে যদি পুলিস আসে'?

'আম্মা কোনো বুদ্ধি করবি'।

'এখানে যে চেরকাল থাকবা, করবা কী'?

'কেন্, মাছের ব্যবসা করবো'।

'সে কি'?

'গাঙে জালের কাছে মাছ নিয়ে গাঁয়ের পথে পথে বেড়াবো'।

'তাতে কী হবি'?

'কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না'।

'তা হোক, তোমার ব্যবসায় আমাকে নিয়ো'।

ইয়াজ বিস্মিত হলো। সুরতুনকে সে ফতেমার চাইতেও পাকা ব্যবসাদার বলে স্থির করেছিলো। তার মুখে একথা রসিকতা বলে মনে হয়।

ইয়াজ একটু চিন্তা করে বললো, 'কেন্, সুরো, তোমাক যেন খুব দুব্‌লা লাগে। অসুখ করছে'?

সুরতুন সম্বিৎ পেয়ে ইয়াজের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলো।

সকালে ফতেমা যখন উঠে গেলো অভ্যাসমতো সুরতুনও শয্যা ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাব মনে হলো উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনো উদ্দেশ্যও নেই তার চোখের সম্মুখে। সে অন্ধকারের দিকে মুখ করে শুয়ে রইলো। ঘরের কোণে বনবিড়ালটা পড়ে আছে। কাল সন্ধ্যায় হলুদ-চুন দিয়ে ইয়াজ তার ভাঙা পায়ের ডাক্তারি করেছিলো। ঘরের কোণে মাচাটার নিচের গাঢ়তম অন্ধকারে সেটা লুকিয়ে আছে। ঘরে কারো পায়ের শব্দ হলে দিনের বেলার জোনাকির আলোর মতো চোখ দুটি খুলছে, পরক্ষণেই আবার বন্ধ করছে। সেটার দিকেই মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলো সুরতুন। তার মনে হতে লাগলো সে-ও বনবিড়ালটার মতো অসহায়। একথা তার মনে হলো, ও যদি ব্যথা সারাতে পড়ে থাকে, আমি থাকলে দোষ কী!

দুপুরে ফিরে এসে ফতেমা সুরতুনকে তার শুয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পেলো না।

বিকেলের দিকে ইয়াজের গলার সাড়া পাওয়া গেলো। খুশিতে ডগমগ হয়ে সে বললো, 'মস্ত এক রুই উঠছিলো, তা জালেরা বলে দিঘায় নিয়ে যাতে হবি। আমি কই—আমাক দেও, গাঁয়ে বেচবো। গাং থেকে সড়কে উঠতি না-উঠতি একজন কয়—মাছ যাবি সান্যালবাড়ি। আমি কই—হয়। বুদ্ধি আলো। তা সেখানে গেলাম, কলাম—এই মাছ আনছি আপনাদের জন্যি।—কনে থাকো তুমি? কলাম—বুধেডাঙা। একজন মাছ নিয়ে গেলো আর একজন দশ ট্যাকার এক লোট দিয়ে কলো—বকশিশ। জালেদেব কলাম—তোমরা পাঁচ ট্যাকা ল্যাও আর আমার পাঁচ, এ তো বেচাকেনা না। তা ওবা কলে—ল্যাও। চাল আনছি আর জালেদের থিকে এই মাছ'।

আরও পরে ইয়াজ আর রজব আলি খেতে বসলো বারান্দায়। তারা খেয়ে গেলে ফতেমা এলো, 'কী রে, ওঠ, খাওয়াদাওয়া কর। ছাওয়াল চাল আনছে, মাছ আনছে'।

সুরতুন বললো, 'আজ ডাকো না, কাল উঠলিও উঠবো'।

সুরতুনের রোগটা এমন নয় যে বিশ্রামে ও অন্ধকারে কমে যাবে। অনেকক্ষেত্রে বিশ্রামের অবকাশে এর বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সুরতুনের একটা উপকাব হলো। মাথায় কিছু ধরছিলো না, জ্বরের ঘোরের মতো লাগছিলো, সেটা কমেছে।

পথে বেরিয়ে সে লক্ষ্য করলো পাঁচু সান্দারের ভগ্নদশাগ্রস্ত কুটিরটির কাছে একজন লোক বসে আছে। তার মনে হলো বেল্লাল সান্দাবের বাড়িতেও কে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। বুড়ো আলতাফের মতো তার মনে হলো—এর চাইতে গোরু-ভেড়া নিয়ে পথে পথে বেড়ানো ভালো। কিছুপরে সে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ধরার চেষ্টা করতে লাগলো—কী করা যাবে যদি এই ব্যর্থতাই তার ভাগ্য। এখানেই থাকতে হবে, এখানেই থাকতে হবে। মাঝখানে কিছুকাল নিজে ব্যবসা করে নিজের পেট চালাতে শিখেছিলে, দু বেলা আহার পেতে, সেটা চিরকাল থাকার নয় এটাই বুঝে নাও। এই বুধেডাঙা এখন তোমার পরবাস নয়, তিনপুরুষ হলো এখানে। কোণঠাসা হয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো . ভাগ্যের দিগন্তে মাথাই উঁকি দিয়েছিলো একদিন, এই বলে শোকই যদি করতে হয় তো পথে পথে পাগল হয়ে বেড়াতে হবে কেন, এখানেই কাঁদা যেতে পারে। দু-একদিন পরে এই চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে আর একটি বাক্য সে মনে মনে তৈরি করলো : হয়তো-বা ফতেমাও এমনি কাঁদে।

তখনো খুব ভালো করে আলো ফোটেনি। বারান্দার নিচে মাটিতে বসে ইয়াজ বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে কী একটা তৈরি করছে। কিছু দূরে রজব আলি উবু হয়ে বসে তামাক টানছে। তাবা দুজনে নিচু গলায় কি একটা আলাপও করছে।

সুরো বললো, 'কী হবে ও দিয়ে'?

'কেন্, মাছ ধরবো'।

'এখন ও দিয়ে কনে মাছ পাবা'?

'এখন কেন্, বর্ষার পর লাগবি'।

'ততদিন এখানে থাকবা'?

ফতেমা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, বললো, 'মাথাল বুনছে দ্যাখো নাই, সুরো? বিশ দিন আসছে, তার বিশ ফরমাস। কয় যে জমি নিবি, চাষ করবি'।

রজব আলি মাথা দোলাতে লাগলো।

রজব আলি এখন গোরু চরায়। সান্দাররা যখন যাযাবর ছিলো তখন গোরু মোষ ভেড়া চরানোই তাঁদের অন্যতম পেশা ছিলো। কিন্তু এখন যেন এটা রজব আলিকে মানায় না। গ্রামে আর দু'একজন বয়স্ক লোক রাখালি করে, তারা হয় পঙ্গু নতুবা জড়বুদ্ধি। রজব আলি তাদের পর্যায়ে নেমে গেছে। রোগা, খানিকটা-বা কুঁজো, মাথার চুলগুলি বড়ো বড়ো, শাদা শাদা। কিছুক্ষণ পরে ফতেমা তাকে নুন-পান্তা বেড়ে দেবে, সারাদিনের মতো রজব আলি বেরিয়ে পড়বে গোরু চরাতে। আঘাতটা কঠিন কিন্তু কাটিয়ে উঠবার চেষ্টাও করলো না সে।

রজব আলি বললো, 'শালা, বানাবের জানো ভারি'।

ইয়াজ রাগের অভিনয় করে বললো, 'শালা কয়ো না, কলাম'। কিন্তু হাতের দারকি ও বাঁশের চাঁচাড়িগুলো রজব আলির দিকে এগিয়ে দিলো।

সুরতুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটার অর্থগ্রহণের চেষ্টা করতে লাগলো, যেন এই সাধারণ ব্যাপারটায় ঘটনার বেশি কিছু আছে।

পেট চালানোর জন্য গ্রামের পথে পথে টুঁড়ে বেড়াতে হয় সুরতুনকে। অধিকাংশ দিন কাজ পাওয়া যায় না। ফিরতি-পথে অনেকবারই সে ভাবে এবার ইয়াজকে আর দেখা যাবে না। ফতেমাকে সে আম্মা বলে বটে কিন্তু সেটা এমন কিছু বন্ধন নয়। তার পুলিসের ভয়টা এখন আর নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু প্রতিবারেই গ্রামে ফিরে ইয়াজের সঙ্গে তার দেখা হয়।

সানিকদিয়ারে ছোটো একটা হাট হয়। সেই হাটে নিজের হাতের তৈরি গোটাদুয়েক মাথাল বিক্রি করতে গিয়েছিলো ইয়াজ, সঙ্গে একটা ছোটো ঝুড়িতে কিছু পানিফলও ছিলো। সে ফিরছিলো ব্যবসা করে, সুরতুন আসছিলো সানিকদিয়ারের হাজিসাহেবের বাড়ির দাওয়া নিকোনোর কাজ সেরে।

ধুলোর পথ। অনেক লোকের পায়ে পায়ে যে ধুলো উড়েছে, এখনো সেটা মাটিতে ফিরে আসেনি, বাতাসে ভাসছে, ফলে শূন্যটা যেন চোখে দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে এই ধুলোর আবরণ যেন একটা রেশমি বোরখার মতো।

দিনচর সব প্রাণীর বিশ্রামের সময় সন্ধ্যা, কাজেই সব শ্রেণীর মানুষের চিন্তায় এই সময়ে বিশ্রামের ও ঘরে ফেরার কথা। বিনা উত্তেজনায় এখন কেউ জোরে কথা বলে না, অকারণে দ্রুতগতিতে চলে না কেউ।

সুরতুন বললো, 'কেন্, ইয়াজ যে'!

'হয় সুরো? কখন নাগাল ধরলে, টের পাই নাই তো'?

পথটা সংকীর্ণ। একটু সরে গিয়ে ইয়াজ নিজের পাশে সুরতুনের পথ চলার জায়গা করে দিলো। একসময়ে সুরতুন বললো, 'ইয়াজ, তোমার ভাইগরে দেখবার মন কয় না'?

অভ্যাসমতো উত্তরটা তাড়াতাড়ি দিতে গিয়ে থামলো ইয়াজ, একটুপরে সে বললো, 'কেন্, সুরো, তুমি কি ওগরে খবর রাখো? জয়নুল কেমন আছে জানো'?

'না'।

'যদি যাই দিঘায়, একবার দেখে আসবো ওগরে'।

'তাইলে পরান পোড়ে? তা যাবাই যদি আসবা কেন্'?

'সেখানে আমার কে আছে, কও? এখানে আম্মা আছে, তুমি আছো'।

কিন্তু কথাগুলি যেন নিজের কানেই অবিশ্বাস্য শোনালো। যেন যে-মন্ত্রে আধখানা বিশ্বাস জন্মেছে তার এবং আধখানা অবিশ্বাস নিয়ে যাকে সে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে, কেউ সে মন্ত্রের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গি

ত করেছে। ইয়াজ রাগ করে বললো, 'বেশ, তাই যদি কও চলে যাবো একদিন'।

সুরতুন বললো, 'রাগ করে চলে যাবের কই নাই। আমি ভাবতেছিলাম তুমি কী করে বেভ্রমে থাকো। সে ভাইয়ের জন্যি বাপের মাথায় লাঠি মারলা তার কথা মনে পড়ে না'!

মানুষে মানুষে সম্বন্ধই-বা কী আর বিমুখতাই-বা কোথায়। কোথাকার ইয়াজ আর কোথাকার ফতেমা।

তা তো হয়ই, বলে হাসিমুখে ভাবলো সুরতুন, ধরো হাতের কাছে এই ফতেমার কথা। বাপ নয়, মা নয়, এমন কী ভালোবাসার মানুষ ইয়াকুব পর্যন্ত নয় ; বুড়ো রজব আলিকে মাঝখানে বসিয়ে ফতেমা একটা ফাঁকা জাল যেন বুনছে সংসারেব। এই জালে এসে পড়লো ইয়াজ।

ইয়াজ বললো, 'কেন্, সুরো, জয়নুল আর সোভানের সঙ্গে আমাব সম্বন্ধ কী? সে তো ঐ কসাইযের ছাওয়াল। তাদের আমি দেখবো শুনবো ভালোবাসবো, আমাক বাসে কে'?

জয়নুল-সোভান ইয়াজের আপন কিংবা নয়, এটা বড়ো প্রশ্ন নয়। সুরতুনের মনে হলো ভালোবাসা ইয়াজ জীবনে কখনো পায়নি, কেউই তাকে আপন করে কখনো কাছে টেনে নেয়নি।

সহসা সুরতুনের নিজেকেও অপবিসীম ক্লান্ত বোধ হলো। সানিকদিয়ারের হাজিসাহেবের বাড়ি থেকে পাওয়া চালেব ছোটো পুঁটুলিটা সুবতুন কাঁকাল বদলে নিলো।

এখন সে যাবে ফতেমার বাড়িতে। ফতেমা চিবকালই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, এবারও করবে, কিন্তু তাহলেও সেটা ফতেমার বাড়ি। রোজ এটা মনে না হলেও একদিন হতে পারে, যেমন এখন হলো।

সুরতুন ইয়াজের দিকে ফিরে বললো, 'কেন্ ইজু, আমি তোমার আম্মা না, তাই বুঝিন দ্যাখো না'?

অবাক হয়ে ইয়াজ প্রশ্ন কবলো, 'কী দেখি না'?

কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে সুরতুন থেমে গেলো। চাপা লোক হঠাৎ মনোভাব প্রকাশ হয়ে গেলে যেমন কবে তেমনি করতে লাগলো সে। সারাদিনের কায়িক পরিশ্রমের ও অনাহারের ক্লান্তি মানসিক ক্লান্তিতে সংযুক্ত হয়েছে। তার মনে হলো যেন এই পৃথিবীতে সে আর ইয়াজ ছাড়া সব নিবে গেছে।

সে ফিসফিস করে বললো, 'কেন্, আম্মা হলে কি চালের পুঁটুলিটা নিতে না'? সুরতুনের ভঙ্গিটা বিস্ময়কর, সম্পূর্ণ ভাবটা গ্রহণ করতে পাবলো না ইয়াজ। সে বললো, 'দেও না কেন্, দেও, মাথায় করে নিয়ে যাই'।

পথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। পাশাপাশি চলতে চলতে গায়ে-গায়ে লেগে যাচ্ছে। সুরতুনের ইচ্ছা হলো ইয়াজের ডান হাতখানা নিজের কোমরের উপরে রেখে নিজের হাত দিয়ে সেটাকে ধরেও রাখবে কিছুকাল।

বাড়ির সামনের মাঠটুকু পার হতে হতে সুরতুন বললো, 'কেন্, ইজু, আম্মাকে কবা নাকি এ সব কথা'?

বস্তুত সুরতুন যা চিন্তা করেছিলো সেগুলি যে সে ভাষায় প্রকাশ করেনি এ সম্বন্ধে তার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছিলো।

ইয়াজ মৃদু হেসে বললো, 'যদি কও তোমাক বু কবের পারি'।

সুরতুন আর ইয়াজের পায়ের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে উঠোনের নেড়ি কুকুরটা ডেকে উঠলো।

রসিকতা করা ফতেমার স্বভাব, রসিকতার সুরেই সে বললো, 'কেন্, সুরো, মনে পড়লো আমার কথা, আমার মনে হয় একবার যদি ভুলে যাও'।

সুরতুন দাওয়ায় উঠতে উঠতে বললো, 'ভুলে গেলি কী তুমি ভুলবা না'?

'অ মা, ভুলবো কেন্'?

ইয়াজ মাথার ঝাঁকা নামিয়ে ততক্ষণে তামাকে আগুন দিতে বসেছে। তামাক শেষ হলেই ভাতের জন্য সে তাগাদা দেবে। আলাপটা এগোলো না।

একদিন ইয়াজ এসে খবর দিলো গ্রামে দারোগা এসেছে। সঙ্গে পনেরো-বিশজন কনস্টেবল তার, চৈতন্য সার বাড়ি খানাতল্লাসি করছে। তার বাড়ির উঠোনে, বাগানে কোদাল চালাচ্ছে।

ব্যাপারটা এইরকম : দশ-পনেরোদিন আগে ছমিরুদ্দিন ও চৈতন্য সাহা দিঘা থানায় এজাহার দিয়ে এসেছিলো—সদর থেকে চিনি, কেরোসিন, তেল ও কাপড় আসছিলো। সন্ধ্যার কিছু আগে চরণকাশির বড়ো মাঠটার ধারে গাড়ি লুঠ হয়ে গেছে। গাড়োয়ান গাড়ি ফেলে পালিয়েছিলো প্রাণের ভয়ে। লুঠেরাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

চৈতন্য সাহা কী ভেবে এত সাহস পেয়েছিলো বলা কঠিন, হয়তো সে ভেবেছিলো কনক দারোগা দিঘা থানায় নেই। কিন্তু কনক দারোগা দিঘা থানায় ছিলো না বটে, দিঘা সার্কেলের ইনস্‌পেক্টর হয়ে ফিরে এসেছে—এ খবরটা চিকন্দিতে আসার কথা নয়, তাই আসেনি। দিঘার বড়ো দারোগা একজন কনস্টেবল ও একজন এ. এস. আই. পাঠিয়ে তদন্ত শেষ করবে ভেবেছিলো কিন্তু কনক বলে পাঠালো—আমি নিজেই যাবো তদন্তে, এবং অকস্মাৎ দিঘার দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে কনক চিকন্দিতে এসে চৈতন্য সাহার বাড়িতে দু দণ্ড আলাপ করে বললো, 'আমার সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে, চৈতন্য সাহা এবং ছমিরুদ্দিনের বাড়ি আমি সার্চ করবো'। যারা চুরির খবর পেয়ে গল্পগুজবের আশায় এসেছিলো তারা ব্যাপারটা শুনে বিস্মিত হলো এবং কৌতূহল নিয়ে চৈতন্য সাহার বাড়িতে পুলিসের অনুসন্ধানী দাপট লক্ষ্য করতে লাগলো। শুধু চৈতন্য সাহা শাস্ত্রোক্ত উদাসীন পুরুষের মতো তার দোকানে বসে কুঁড়োজালিতে হাত রেখে মালা টপ্‌কাতে লাগলো।

কিছু পাবার কথা নয়, পাওয়াও গেলো না, হতাশার ভঙ্গিতে কনক দলবল নিয়ে ফিরে চললো। যাওয়ার সময়ে চৈতন্য সাহার কাছে অত্যন্ত বিনয় করে বললো, 'আমি খুব দুঃখিত চৈতন্যবাবু, যে, আপনি চুরির এজেহার দিলেন আর চোবাই মালের জন্য আপনার বাড়িতেই সার্চ করতে হলো। এ আজকালকার নতুন এক কায়দা যা আমি ভালোবাসি নে, কিন্তু উপায় নেই। নিজের দোকানের মাল চুরি করা আজকাল যেমন দোকানীদের একটা প্রথা হয়েছে, আমাদেরও তেমনি প্রথা হয়েছে যার চুরি যায় তাকেই সার্চ করা'।

চৈতন্য সাহা মুখে বললো, 'না না, তাতে আর কী'। কিন্তু মনে মনে উচ্চারণ করলো, 'প্রায় ধরে ফেলেছিলো আসল চুরি। তুমি দিঘার ধারে কাছে আছো জানলে এ কাজ আর নয়'।

দিঘা থানার দারোগার মনে একটু আনন্দ হয়েছিলো কনকের এ হেন পরাজয়ে। উপরওয়ালা, তাই খোলাখুলি না বলে সে বললো, 'ছমিরুদ্দিনের বাড়িটা আর সার্চ না করলেও চলবে'?

'তা চলবে। চোরেরা অনেকসময়ে মাল রাখবার ব্যাপারে নির্বোধ হয়, চৈতন্য নির্বোধ কিনা দেখলাম। আসলে তার সাধারণ জ্ঞান আছে। চুরিটা হয়েছে সদরেই, অর্থাৎ চৈতন্য গাড়িতে মাল আদৌ চাপায়নি'।

তার চারিদিকে যে ভিড় হয়েছিলো সেদিকে লক্ষ্য করে কনক ধমকে উঠলো, 'তোমরা যাও, দারোগার রসিকতা শুনে কী হবে'।

ধমক খেয়ে ভিড়ের লোকরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, কিন্তু একজন হো-হো করে হেসে উঠলো। সে ছিদাম। কনক তাকে চিনতে পারলো না।

কনক তার ঘোড়ায় চাপতে চাপতে দারোগাকে বললো, 'আপনার কনস্টেবলরা গ্রামের বন-বাদা খুঁজে দেখুক। আপনি সান্যালদের নায়েবমশায়ের বাড়িতে দুপুরের আহারাদির প্রস্তাব করে পাঠান। চৈতন্য সাহা আপনার কনস্টেবলদের চাল ডাল আটা ইত্যাদি দেবে, রান্নার বাসনও দেবে। ওর দোকানে যথেষ্ট ঘি আছে, কনস্টেবলরা যেন শুকনো রুটি না খায়'।

'আপনি থানায় যাচ্ছেন, স্যার'?

'না, আমাকে একটু তদন্ত করতে হবে সান্দারপাড়াতে'।

ইয়াজ বললো, 'কেন, সুরো, দারোগা কি এতদিন পরে আমাক নিতে আসলো'? ইয়াজ দাওয়ায় উঠে মুখ গম্ভীর করে বসে রইলো।

সুরতুন ইত্যাদি কেউই ভাবতে পারেনি কনক সত্যি বুধেডাঙায় আসবে। শুধু বুধেডাঙায় আসা নয়, কনক রজব আলির বাড়ির উঠোনে ঘোড়ায় চড়েই ঢুকে পড়লো। ঘোড়ার পিঠে থেকেই সে ইয়াজকে দেখে বললো, 'এদিকে আয়'।

ইযাজ কাছে এলে সে বললো, 'উহুঁ, সান্দার নয়। তোকে আমি কোথায় দেখেছি বল তো? দিঘার কসাইপাড়ায়'?

'জে'।

'তোমার বাপের মাথা ফেটেছিলো, তুমিই নাকি সেই ওস্তাদ? এখানে কী হচ্ছে, খুন না চুরি'?

ইয়াজ 'আম্মা' বলে ডাক দিযে মাটিতে বসে পড়লো। কনক দারোগার ভ্রূকুটি সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ফতেমা ঘর থেকে বেরুলো। ভয়ে ভয়ে কিন্তু সুচিন্তিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বললো, 'হুজুর, ও আমার ছাওয়াল'।

'তোর ছেলে'?

'জে'।

এমন সময়ে ঘরের পিছন থেকে রজব আলি আত্মপ্রকাশ করলো।

'সেলাম'।

'কে? আরে তুমি রজব আলি না'? কনক ঘোড়া থেকে নামলো। 'বেঁচে আছো? খুব খুশী হলাম তোমাকে দেখে। তোমার ছেলের আব কোনো খোঁজই পাওনি, না? বড্ডো বুড়িয়ে গেলে তুমি। তোমার এখানে একটু বসি। না, না, ব্যস্ত হয়ো না'। ইয়াজকে বললো কনক, 'ঘোড়াটাকে বাঁধ আর ওর জিনের তলা থেকে আলগা গদিটা খুলে আন'।

ঘবের ছায়ায় জিন-এর গদিতে বুটপরা পা দুখানা ছড়িযে বসলো কনক। চুরুট টানতে টানতে সকলের খোঁজ খবর নিলো। ফতেমাকে উপদেশ দিলো, ছেলে ঘরে রাখতে হলে টুকটুকে বউ এনে দিতে হবে।

সবচাইতে কৌতুকেব খবর এই দিলো সে, যে তার এলাকা এখন অনেক বড়ো এবং সে এই এলাকার মধ্যে আরও অনেক সান্দাবের খোঁজ পেয়েছে। তাদের মধ্যে এখনো কেউ কেউ চুরিচামারি করে ভালোই আছে, কিছু অন্য ধরনেবও আছে। সে নিজে স্থির কবেছে তাদের মধ্যে যাদের পরিবার আছে তাদের কাউকে কাউকে এনে বুধেডাঙায় বসানো যায় কিনা চেষ্টা করবে। তারা এলে সান্দারদের আবার লোকবল হয়। কোনো বলই নেই, সেটা হলে তবু কিছু হলো।

প্রায় আধ ঘণ্টা পবে ঘোড়ায় চড়তে গিযে কনকের বিবেকটা বোধহয় কামড়ালো। সে একটু ঝুঁকে পড়ে রজব আলিকে প্রশ্ন করলো, 'এদিকে একটা বড়ো ধরনের চুরি, মানে, লুঠ হয়েছে নাকি'?

'লুঠ'?

'হ্যাঁ। এক গাড়ি তেল চিনি কাপড়'।

রজব আলি বললো, 'লুঠ হয় নাই। লুঠ করবাব মতো একজনই হইছিলো, সে ইয়াকুব। সে তো নাই'।

কনক চলে যাওয়ার পর ইয়াজ বললো, 'সুবো, শুনলা না দাবোগা সাহেব কী কলো? এ গাঁয়ে সত্যি লোক আসবি'?

'তা আনবের পারে কনকদারোগা'।

ইয়াজ কী ভাবতে লাগলো। কয়েকদিন পরে ইয়াজ বললো, 'জমি লিবো একটুক্। সুরো, চরণকাশির বুড়া মিঞার কাছে আমাক একটুক্ নিয়ে যাবা'?

ফতেমা বললো, 'ট্যাকা লাগে। হাল বলদ কেনা লাগে'।

ইয়াজের মুখ ফ্যাকাশে হলে গেলো।

পরিহাস করে সুরতুন বললো, 'মাছের ব্যবসা কর গা'।

'মাছের ব্যবসা'?

'ওই যে সেদিন কী বুনলি, তাই দিয়ে মাছ ধর গা'।

বিদ্রূপটা ইয়াজ বুঝতে পারলো, ক্রোধে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কিন্তু ইয়াজের যেন ইতিমধ্যে জ্ঞান হয়েছে, জমি ক্রোধের চাইতে মূল্যবান। সে রজব আলির কাছাকাছি গিয়ে তামাক সাজতে বসলো। বললো. 'নানা, জমি লিবো একটুক্'।

'নানা' সম্বোধনটা রজব আলির কানে লেগেছিলো, একটুপরে বোধ হয় বুকে গিয়েও বিঁধলো। হাতের কাছে একটা বাখারি পড়ে ছিলো, সেটা উদ্যত করে সে শাসিয়ে উঠলো, 'শালা বে শালা! কোনকার কোন অনজাতের চারা। তুই কি সান্দার? তুই কি ইয়াকুবের ছাওয়াল'!

'তা নানা', একটু সরে বাখারির আওতার বাইরে বসে বললো ইয়াজ, 'তা নানা, ধরো যে আমি তোমার ইয়াকুবের ছাওয়াল না হলাম। ফতেমা আমার আম্মা কিনা শুধাও'।

কথা বলতে বলতেই সে ক্রুদ্ধ হয়েও উঠেছিলো, বললো, 'হ্যাঁ, আজই তার ফায়সালা করো'।

একটা উদাসীন নিস্পৃহভাব যেন রুক্ষ বুধেডাঙায় ইতস্তত ছড়ানো আছে। সেটা সুরতুনকে অধিকার করে—কখনো-বা কয়েক মুহূর্তের জন্য, কখনো দু-একটি দিন তার প্রভাব থাকে। কতকটা যেন দূরে সরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। দূরে সরে এলে অনেকসময়ে কোনো কোনো বিষয়ের সমগ্র রূপটা চোখে পড়ে। সমগ্র বুধেডাঙা যেন একত্রে মনে ধরা যায়। কনকদারোগা বলে গেছে তার এক্তিয়ার থেকে সান্দার কুড়িয়ে এনে এনে এখানে জমা করবে। মানুষ যেন গাছের চারা। আগুনে বন পুড়ে গেছে, সেখানে লাগানোর জন্য অন্য জায়গা থেকে কুড়িয়ে আনা চারাগাছ লাগানো হচ্ছে, আর ইয়াজ যেন বাতাসে ভেসে আসা বীজ।

অন্য আর একদিন এই তুলনাটা পূর্বশ্রুত গল্পের মতো মনে পড়লো সুরতুনের। সে তখন নিজের কথা ভাবছিলো। আমনের চারার মতো সযত্নে মাধাইয়ের স্নেহে লালন করে কোনো এক বোকা চাষী তাকে এই কাশের খেতে বুনে দিয়েছে।

একটা বিরক্তিবোধ তাকে হিংস্র করলো। বনবিড়ালটার কথা মনে পড়লো তার। ধরতে গেলে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে উঠেছিলো, শেষে তার হাত আঁচড়ে দিয়ে পালিয়েছে। ইয়াজ ব্যাপারটায় হো-হো করে হেসে উঠেছিলো। পরে সে নিজেও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিলো। যতদিন তার পা সারেনি অন্ধকারে মাচার তলে পড়ে থাকতো। কেউ দয়া করে আহার্য দিলে খেতো। দিঘার ওদিকে কোন বনে জন্ম। বুধেডাঙা ও চিকন্দির জঙ্গলে কেউ তার পরিচিত নয়, কিন্তু সে কি একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে না?

কিন্তু আকস্মিকভাবে মনে পড়ে : আর মাধাই—

হায় মাধাই!

ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে গিয়ে আর-কিছু বালি পড়লো চোখে। হায়, হায়! মাধাই তো আসমানের জুন!

আর সে নিজে তো বনবিড়াল নয়।

মাধাই ভেবেছিলো গাড়ি থেকে সোজাসুজি গঙ্গায় গিয়ে নামবে। তার গাড়ি যখন গঙ্গার চড়ায় গিয়ে আটকালো তখন প্রভাতের সূচনা হচ্ছে। সারা রাত জেগে আসতে হয়েছে, চরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে তার শীত শীত করে উঠলো। গঙ্গার বুকে কুয়াশার মতো দেখা যাচ্ছে। ওপারের পাহাড়ের গায়ে সিঁদুরে সূর্য ধাপে ধাপে পা ফেলে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার ইচ্ছা হলো তার। একবার মনে মনে সে বললো, 'সবই পবিত্র দেখি'। কিন্তু উদীয়মান সূর্যের আলো তাব চোখে বিঁধলো, জাগরণক্লান্ত চোখ করকব করে উঠলো।

তখন সে বাঁশের চাঁচাড়ি আব খড়ের তৈরি একটি নোংরা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো। সেখানে লোকজনের মধ্যে বসে হলুদ রঙের চা কাচের গ্লাস থেকে খেতে খেতে সে আরাম বোধ করলো। একটা সিগারেট ধরালো। দ্বিতীয়বাব চা খাওয়াব পবে দেহে সে বল পেলো।

চায়ের দোকানে বসে সে স্থির করেছিলো একটু বেলা হলে স্নান করবে। কিন্তু খানিকটা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হলো চা খাওযার পর স্নানটা কীবকম হবে? এখানে স্নানের একমাত্র ব্যবস্থাই এই গঙ্গা, কিন্তু সব স্নান মুক্তিস্নান নয়।

কিন্তু এসবের ব্যবস্থা করতে হলে আশ্রয় জোগাড় করে নিতে হবে।

মাধাই স্টেশনে গেলো। তাব সম্বল বলতে যা কিছু সব একটি পেয়াদা-ঝোলায় কাঁধ থেকে ঝুলছে। মাধাই স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই তার রেল কোম্পানির বোতাম তার পরিচয় করিয়ে দিলো। বাঙালি টালি-ক্লার্ক আগ্রহ করে তার সঙ্গে আলাপ করলো।

মাধাই তার কাছে খোঁজ খবর নিলো, নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবে পরামর্শ চাইলো। টালি-ক্লার্ক বলো, 'পুজো যদি করতে হয়, কিংবা পিণ্ড দিতে চাও, আমাদের একজন লোক আছে, সে-ই সব করায়। জোগাড-যন্ত্র সব সে-ই কবে দেয়, তুমি কিছু টাকা ধরে দিলেই হলো'। টালি-ক্লার্ক শুধু খোঁজ বলে দিলো না, পুরোহিতকে ডেকে মাধাইয়ের সঙ্গে আলাপও কবিয়ে দিলো। লোকটি কুলিদের মেট। সে ব্যবস্থা দিলো, 'দুদিনে বাপ-মায়ের পিণ্ড দেন, তিনদিনে শুধু স্নান করেন। সব রোগতাপ দূর হয়ে যাবে'।

মাধাই কৃতজ্ঞের মতো বললো, 'আপনে যা কহা খুব আচ্ছা কহা, কিন্তুক পাঁচ রূপেয়া না লেকে তিন রূপেয়া নেন'।

আপসে মুক্তিস্নানেব দাম ঠিক করে শান্তি এলো মাধাইযের মনে। তার চোখের সম্মুখে সে যেন বারকয়েক সুরতুনকে দেখতে পেলো। একসময়ে তার মনে হলো পাগলিটাকে নিয়ে এলেও ভালো ছিলো, সেও স্নানের আনন্দ পেতো।

সন্ধ্যার সময়ে মাধাই ইতস্তত ঘুরতে বেরিয়েছিলো। অনেকসময়ে নিজেকে সহসা শক্তিমান বলে মানুষের মনে হয়। আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে, কখনো-বা হাত মুঠো করে সে শক্তিটুকুর পরিমাপ করার চেষ্টা করে। মাধাইয়ের পদক্ষেপে তেমনি একটা কিছু ছিলো।

এখানে স্টেশনের কোনো নির্দিষ্ট চৌহদ্দি নেই। নড়বড়ে জোড়াতাড়া দেওয়া সাময়িক বন্দোবস্ত। দিঘার পোর্টার মাধাইয়ের বিস্ময় বোধ হচ্ছিলো যে এর উপর দিয়েও যাত্রী নিয়ে ট্রেন চলে। পোর্টার হিসাবে লাইনের জোড়গুলি সম্বন্ধেই তার কৌতূহল হলো। এরকম এক জোড়ার মুখ পর্যবেক্ষণে যখন সে কৌতুক অনুভব করছে, তার কানে গানের শব্দ এলো।

এদিক ওদিক লক্ষ্য কবে মাধাই দেখলো, রেললাইন থেকে কিছু দূরে কয়েকটা বাবলা গাছ যেখানে একত্রে একটি ঝোপ তৈরি করেছে তার কাছে রেলওয়ে স্লিপারের একটা স্তূপের আড়ালে কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে। সেখানে গান হচ্ছে। মাধাই আর-একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলো, একটি মেয়ে গান করছে। একটা ছোটো হারমোনিয়াম বেসুরো শব্দ করে বাজছে। কয়েকজন দেহাতি কৃষক শ্রোতা।

হারমোনিয়ামের সুর যতই বেসুরো হোক, মেয়েটির হিন্দুস্থানী ভাষা যতই দুর্বোধ্য হোক, তার চড়া মিষ্টি সুরে মাধাই আকৃষ্ট হলো। কৃষকদের মধ্যে একজন একটি ঢোল নিয়ে বসেছিলো, চাঁটিও দিচ্ছিলো, কিন্তু মাধাইয়ের মনে হলো বেতালা বাজিয়ে বরং গানকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। গান থামলে যখন মেয়েটি আর-একটির জন্য গুনগুন সুর ধরেছে, মাধাই ভয়ে ভয়ে বললো, 'ওসকো মৎ বাজাইয়ে'। তার কথায় ঢোলকওয়ালা লোকটি থতমত খেয়ে থেমে গেলো। মেয়েটিও গান বন্ধ করলো।

মাধাই সংকুচিত হয়ে বললো, 'ব্যাতালিক হোতা হ্যায়'।

দেহাতি লোকগুলি রেলের কোটকে সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে। সেজন্যই বোধহয় তাদের একজন বললো, 'আপ বাজাইয়ে'।

মেয়েটিও প্রত্যাশার দৃষ্টিতেই যেন চাইলো।

মাধাইয়ের বাবা ছিলো ছিনাথ ঢুলি। মাধাই এই নতুন চেহারার ঢোলটা ভয়ে ভয়ে কোলে তুলে নিয়ে বসলো।

বলা বাহুল্য গানটি আগেকার তুলনায় অনেক ভালো শোনালো। মেয়েটি কৃতজ্ঞচিত্তে দু-একটা কথা বললো, তারপরই হাত পাতলো। অন্যান্য শ্রোতারা এক আনা দু আনা করে পয়সা দিলো। মাধাই তখনো ঢোল কোলে করে বসে আছে। মেয়েটি মাধাইয়ের সম্মুখেও হাত পাতলো। মাধাই তার রেল-কামিজের পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে একটা আধুলি দিলো মেয়েটির হাতে। আনন্দে ও বিস্ময়ে মেয়েটিব চোখ দুটি চকচক করে উঠলো।

সন্ধ্যার পর মাধাই একটা চায়ের দোকানে বসে ছিলো। সেই গায়িকা মেয়েটি একটি অ্যালুমিনিয়ামেব বাটি হাতে করে সেই দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালো, চা চেয়ে নিয়ে গেলো।

মাধাইকে দেখতে পেয়ে সে যেন একটু থমকে দাঁড়ালো, তারপর আপন হওয়ার সুর করে বললো, 'গান শুনিয়ে গা'?

মাধাই উত্তর না দিয়ে চা খেতে লাগলো। মেয়েটি চলে গেলো, কিন্তু মাধাই দোকান থেকে নেমে হোটেল লক্ষ্য করে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়ালো। এমন নিঃশব্দ তার গতি যে গলার শব্দে মাধাই চমকে উঠলো। মেয়েটি বললো, 'আভি চলিয়ে গা বড়োবাবু'।

'কোথায় যায়ে গা'? যে-স্ফূর্তির ঝোঁকে মাধাই তাকে লক্ষ্য করেনি সেই ঝোঁকেই যেন সে প্রশ্ন করলো।

মেয়েটি আবার গানের কথা বললো। তার মুখে ভাঙা ভাঙা হিন্দি শুনে মনে হলো যেন সে মাধাইয়ের বুঝবার সুবিধার জন্যই অমন ভাষা ব্যবহার করছে। সে যেন মাধাইকে বললো—তার বাজনা শুনেই মাধাইয়ের বাজনার সঙ্গে তার গাইবার সখ হয়েছে।

মুক্তির আস্বাদন করছে মাধাই অন্তরে। সে-আনন্দে বাজনা বাজাবার মতো মনের অবস্থা হয় না শুধু, বাজাতেও ইচ্ছা করে। মাধাই আশা করেছিলো রাত্রিতে আরও শ্রোতা থাকবে। আলোর ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু মেয়েটির ডেরায় পৌঁছে মাধাই বিস্মিত হলো, একটা কুপি পর্যন্ত জ্বলছে না। মাধাই দেশলাই জ্বাললো। মেয়েটি একটা হারিকেন বার করে নিয়ে এসে জ্বালালো। দিনের বেলায় মাধাই অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে ঘাসের উপরে বসেছিলো। এখন মেয়েটি একটি মাদুর পেতে দিলো।

মাধাই প্রশ্ন করলো, 'তুমি এখানে একা একা থাকো'?

মেয়েটি হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বললো, 'বড়োবাবু, আমার স্বামী জেলে গেছে। ওরা তাকে চোর বলে। আমার একটি লড়কি ছিলো, আমার স্বামীর বোন নিয়ে গেছে তাকে। আমি একা একা থাকি'।

'কিন্তু তোমার স্বামী কী করতো'?

'আমরা নাট্। আমরা গান গেয়ে বেড়াই'। মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। সে উঠেও দাঁড়ালো। একেবারে প্রথমে যা লক্ষ্যে আসেনি, পরে যেটা সবসময়েই চোখের সম্মুখে ভাসছিলো, এখন সেটাই

যেন আকস্মিকভাবে প্রবল হয়ে উঠলো। মেয়েটিও যেন সর্বাঙ্গে হিল্লোলিত করে কয়েক পা মাধাইয়ের দিকে এগিয়ে এলো।

মাধাই লক্ষ্য করলো মেয়েটির পরনে হলদে জমিতে লাল ছোপ দেওয়া অতি পাতলা ঘাগরা, গায়ে ততোধিক সূক্ষ্মবস্ত্রের পাঞ্জাবি, পিঠে দোলানো ঝুমকো-বাঁধা বেণী, চোখে সুর্মা। তার মনে হলো একটা উষ্ণগন্ধী সুঘ্রাণ আসছে আতরের। দিঘার স্টেশনে বসে দেখা অনেক ইরানীর কথা মনে হলো মাধাইয়ের। তাদের দেখে যে অনুভবগুলি তার মনে উঠে মুহূর্তপরে মনের অতল গভীরে মিশে গেছে সেসবগুলি যেন একত্র হয়ে একটা স্থূল বস্তুর মতো মাধাইয়ের বুকের মধ্যে চাপ দিতে লাগলো এবং সেগুলি একটা বিশিষ্ট মনোভাবের রূপ নিতে লাগলো।

চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে হারিকেনের ম্লান আলোতে এ যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কিছু। মাধাইয়ের ভয় ভয় করতে লাগলো। দু-এক বার সে শিউরে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসলো, 'মদ হ্যায়, দারু'? মেয়েটি ফিসফিস করে বললো, গ্রামের মধ্যে তাড়িখানা আছে, মাধাইকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মদের অন্বেষণে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে আলোতে পৌঁছে মাধাই একটা ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাধাই পিঠ থেকে ঝোলা নামিয়ে কম্বল বার করে বিছিয়ে ঘরটার বারান্দাতেই বসে পড়লো। উচ্চিংড়ে লাফিয়ে এসে পড়ছে গায়ে। কাছের আলোটা থেকে শ্যামা পোকা কিছু কিছু চোখেমুখে এসে পড়ছে, তবু মাধাই রাতটা এই দগদগে আলোর নিচে কাটানোই স্থির করলো।

পরদিন সকালে মাধাইয়ের ঘুম চটে গেলো। কে যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছে এই অনুভব নিয়ে উঠে বসে সে দেখলো, তার পুরোহিত হাতে একগোছা কুশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধাই উঠে বসলো। এই সকালে এত বড়ো স্টেশনে তাকে খুঁজে বার করা খোট্টা পুরোহিতের পক্ষেও বিস্ময়কর বটে।

পূর্বনির্দিষ্ট স্নান-পিণ্ডাদি হয়ে গেলো কিন্তু চাঁদমালাকে বিস্মৃত হতে পারলো না সে। বরং নিঃসঙ্গ, শীর্ণা, দীঘল চেহারার সেই নাট্ মেয়েটি যেন তাকে এক নতুন লোভে জড়িয়ে ফেলেছে। ছুটি শেষ হতে দেরি ছিলো। মাধাই দিঘার বিপরীত দিকে যাওয়ার ট্রেনে উঠে বসলো।

স্নান শেষ হওয়ার পরও দুদিন সে ঘাটেই ছিলো। এ দুদিনে সে গায়িকার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর শুনেছে। প্রায় পাঁচ-ছ মাস হলো স্টেশনের কাছাকাছি বাস করছে মেয়েটি। আগে ওর দলে একজন পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক এবং একটি শিশু সত্যিই ছিলো। পুরুষটি অন্য স্ত্রীলোকটি ও শিশুটিকে নিয়ে চলে গেছে। কেউ বলে মেয়েটির স্বভাবের জন্যই ঝগড়া হয়েছে। আর একজন বললো, 'আগে স্টেশনের বাবুদের অনেকে যেতো ওর কাছে। এখন তাদের সন্দেহ হয়েছে মেয়েটার কুষ্ঠ আছে। দাম পড়ে গেছে বলেই ওকে এখন হাঁটাহাঁটি করে ফাঁদ পাততে হয়'। সেই টালি-ক্লার্ক বাবুটি বললো, এ কথা মাধাইকে আগে থেকে বলে দেওয়াই উচিত ছিলো তার। তা যা-ই বলো, কুষ্ঠ হলেই তো খিদে মরে যায় না। ফাঁদ না পেতেই-বা কী উপায়'।

এখন ফিরে গিয়ে সুরতুনকে বলা যায় বিবাহের কথা। সুরতুন তো মনের ভেতরটা দেখতে পাবে না। কিন্তু রাত্রির স্মৃতিগুলি তার একার বুকের মধ্যে জ্বালা করতে থাকবে। এখানে কথাগুলি মাধাইয়ের মনের মধ্যে স্বগতোক্তির মতো ফুটতে লাগলো—যে-আগুনে তার দেহ পুড়বি, তার সঙ্গে মনের জ্বালাও আরো জ্বলে উঠে ফুরায়ে যাবি। লোকে কলো গানওয়ালি ফাঁদ পাতে। কিন্তু নিজের মন কার অগোচর কও? অভ্যাস না স্বভাব। মনে কয় অভ্যাস পাকা-ধরা ধরছে। চাঁদমালার কথা ভোলা গেলো কই? এ-ফাঁদ না পাতলেই-বা কী?

পাশের লোকটি মাধাইকে বললো, 'নড়াচড়া করছেন কেন'?

মাধাই বললো লজ্জিত স্বরে, 'এরপরে কোন স্টেশন'?

'বর্ধমান'।

মাধাই বিজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করে বললো, 'সেই যেখানে সীতাভোগ মিহিদানা'?

২৬

পুরোপুরি পাকা হওয়ার আগেই পাকা মসজিদের নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো। এখন চুনকাম করা দেওয়ালে মসজিদটি লাল রং-করা প্রাচীরের মধ্যে থেকে চরণকাশির মাঠের একটি অবলম্বনীয় দিকচিহ্নের মতো চোখে পড়ে। 'পাকা মজিদ' কথাটি এখন পাশাপাশি তিন-চারখানা গ্রামে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

কেউ কারো অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলে তার বিপক্ষরা অনেকসময়ে হাসিমুখে বলে, 'কেন্, ভাই তুমি তো পাকা মজিদ দিছো'।

হাট থেকে প্রয়োজন মতো সওদা সংগ্রহ করতে না পারলে গৃহিণীর ভ্রূকুটিতে ক্রুদ্ধ হযেও কৃষকরা বলে ঝাঁজের সঙ্গে, 'কেন্, আমি কি পাকা মজিদ দিছি'?

কেউ হয়তো একটা ঘর তুলছে। কেমন হলো ভাই, ঘর? পাকা মজিদ—মধুর রসিকতার উত্তর আসে।

এ হেন পাকা মসজিদ তুলেও আলেফ সেখের মনে শান্তি নেই। কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সদর থেকে এক সাইকেল-চড়া খাকি-পরা সরবরাহ কর্মচারী এসেছিলো। যে পথে পথে বেড়ায় তার সঙ্গেই দেখা হওয়া স্বাভাবিক, আলেফ সেখের সঙ্গেই তার দেখা হলো।

সে বললো, 'আলেফ সেখ সেক্রেটারির বাড়ি কোনটা'?

'ওই পাকা মজিদ'।

'তা শুনেছি, কিন্তু ওখানে তো আরও দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ছে। আপনি কি তাকে চেনেন'?

'আমিই আলেফ সেখ'।

লোকটি যেন এই ধরনের রসিকতায় বিরক্ত হয়েই আলেফ সেখকে পিছনে ফেলে পাকা মসজিদ লক্ষ্য করে চলে গেলো। পরে অবশ্য লোকটি তাকে চিনতে পেরে ক্ষমা চেয়েছিলো।

কিন্তু এরকম কেন হবে? এরফানের গায়ের রং তার তুলনায় কিছু পরিষ্কার তার জন্য তো সে দায়ী নয়, তেমনি এক-বুক শাদা দাড়ি রেখেও এরফানের তুলনায় তাকে গম্ভীর দেখায় না, তার জন্যও তাকে দায়ী করা যায় না। তখন তার পরনে একটা খাটো তফন ছিলো, কাঁধে গামছা ছিলো। কিন্তু পায়ে জুতো এবং মাথায় ছাতাও ছিলো। এরফানকে অবশ্য এরকম বেশে কেউ পথে দেখতে পায় না। কিন্তু ভদ্রলোক বলেই কি তাকে দিনরাত্রি চোগা-চাপকান এঁটে থাকতে হবে? জমিজিরাতের কাজ করতে হবে না?

এক সন্ধ্যায় হাত-পা ধুতে বসে নিজের হাত-পায়ের আঙুলের পিঠে কড়াগুলি তার চোখে পড়লো। সে স্ত্রীকে বললো, 'একখানা ঝামা দেও তো। দ্যাখো তো এ কি থাবা না হাত? এ কি ভদ্রলোকের পা? জুতাই বদলাবের হবি। এরফানের মতো হাল্কা একজোড়া নেওয়া লাগে'।

এসবের চাইতেও বড়ো অশান্তি আছে। বিষয়টি তার সেক্রেটারি হওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। অন্য অনেক প্রবাদ বাক্যের মতো এটাও চরণকাশির খোঁড়া মৌলবীর রচনা। আলেফের কপালে একটা ছোটো অর্বুদ আছে। খোঁড়া মৌলবী বলে, ওটা কিছু নয়, নমাজ পড়তে পড়তে হয়েছে—তবে এটা কাপড়ের জন্যে; শীতকালে কমিটির কম্বল দেওয়ার কথা, তখন আরও একটা কড়া পড়বে। আলেফ সেখ জানে, কমিটির কাজে গোলমাল আছে। চৈতন্য সাহা এবং ছমিরুদ্দিন একসঙ্গে হলেই ফিসফাস করে আলাপ শুরু করে। জমির কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে ব্যাপারটা সে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে না।

কিছুদিন আগে একশ টাকার দুখানা নোট নিয়ে চৈতন্য সাহা এসেছিলো। 'নেন, সামাইন্য কিছু'। লজ্জায় যেন মাথা ভূমি স্পর্শ করবে।

আলেফ সেখ টাকাটা রেখে দিয়েছিলো। তার আট-দশদিন বাদেই চুরির ব্যাপারটা ঘটে গেলো। চুরি করে সরকারি সওদা? রাগে আলেফ ফেটে ফেটে পড়তে লাগলো। সদর থেকে কোনো লোক তদন্তে এলো না, সেজন্য সে সরকারকেই গালাগালি করলো। তারপরই এলো কনক। সংবাদটা একটু বিলম্বে পেয়েছিলো আলেফ। সাজপোশাক করে মাথায় একটা কাবুলি মুরেঠা পরে এরফানের বাড়িতে গেলো সে তাকে নিয়ে তদন্তস্থলে যাবে এই ইচ্ছায়, কিন্তু সেখানেই খবরটা এসে পৌঁছলো—কনক দারোগা চৈতন্য সাহাকেই চোর সাব্যস্ত করেছে।

আলেফ কিছু না বলে এরফানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এটা ছেলেছোকরাদের গান বাঁধার ব্যাপার নয়। আলেফের নিজের পোশাক তাকে ধিক্কৃত করতে থাকলো, সেই দুশো টাকা দিয়ে সে এই নতুন আচকান-শিলোয়াবের দাম দিয়েছে।

হঠাৎ সে বলে বসলো, 'কেন্, ছাওয়াল কী কবি'?

আলেফ চিন্তায় যতদূর এগিয়ে গিয়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই এরফান তা যায়নি। সে বললো, 'এ কী কও'?

টাকার কথা বলতে বলতে সামলে নিয়ে আলেফ বললো, 'কনকদারোগা তো আমার-তোমার বাড়িও খোঁজ করতি পারে। ছাওয়ালের মনে সন্দেহ হতি পাবে। তার মাথা হেঁট হবি। কও, আমরা কি চোর'?

আলেফ দমদম করে হেঁটে নিজের বাড়িতে ফিরে পোশাক খুলে ফেললো। তার স্ত্রী বললো, 'সে কী, ফিরে আলে'?

আলেফ তারস্বরে বললো, 'খবরদার'!

তার স্ত্রী বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলো।

ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলে আলেফ একদিন চৈতন্য সাহাকে নিজের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে ডেকে পাঠালো। এরফানকে বলে এলো একটা টাকা-লেনদেনের সাক্ষী থাকতে হবে। চৈতন্য সাহা এলে টাকা দুশো তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে বললো, 'তোমার টাকা তুমি রাখো'। এরফান ফুর্সি টানতে টানতে ব্যাপারটার সাক্ষী হয়ে রইলো।

চৈতন্য-ছমিরের সংস্পর্শে ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়। আলেফ স্থির করলো, এ বিবেচনা থেকেই সান্যালমশাই গ্রামের কোনো ভদ্র ব্যক্তিকে তাদের দিকে এগিয়ে না দিয়ে তাকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। তাই যদি হয়, সে এখনো সান্যালমশাইয়ের চোখে ভদ্র হতে পারেনি।

কিন্তু সান্যালমশাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায় না। ইতিমধ্যে সে একবার সান্যালমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলো। কলকাতা থেকে তার ছেলে এসেছিলো, সঙ্গে সেও ছিলো। সান্যালমশাই কখনো তাকে, কখনো ছেলেকে প্রশ্ন করে সব খবর জেনে নিলেন। কিছু পরে নায়েবকে ডেকে বললেন—'দুশো টাকা দিয়ো তো আমাকে'। নায়েব টাকা এনে দিলে টাকাটা তার ছেলের হাতে দিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'কল্যাণ হোক'। ছেলে বিস্মিত হয়েছিলো, সান্যালমশাই হেসে বলেছিলেন, 'বই কিনো'।

টাকার অঙ্ক দুটিতেও মিল দ্যাখো। সেটা ছেলের কৃতিত্বের পরিচয়, আর এটা? আলেফ প্রথম কয়েকটি দিন ঘুরঘুর করে বেড়াতে বেড়াতে চিন্তা করলো—কড়া নজর রাখতে হবে চৈতন্য সাহা আর ছমিরুদ্দিনের উপরে। কিন্তু পরে ভাবলো, যা হয় করুক, আমি আর ওতে নাই।

জমিটা পড়ে আছে। রায়দের জঙ্গলের কাছাকাছি। জঙ্গল এককালে বাগান ছিলো, আর এ জমিটায় ছিলো প্রাসাদ। এখন কলওয়ালাদের হাতে পড়ে ইটগুলিও বিকিয়ে গেছে। ভিত্তির ইটপাথরগুলো তোলার খরচ বিক্রির দামে পোষাবে না বলে সেগুলি মাটির নিচে থেকে গেছে। বুনো ঘাসে ঢাকা জমিটা। দুটি তালগাছ

আছে। দ্বিতীয়টি জন্মাবার আগেই প্রথমটি বাজে পুড়ে নেড়া হয়ে গেছে। সে দুটি চিল-ওড়া নীল গভীর আকাশের মাঝখানে পরস্পরের সঙ্গী।

এটা অত্যন্ত পুরনো সত্য—জমি এবং নারী। আদর যত্ন না পেলে ওরা হাজা-শুখা কিংবা বন্য এবং হিংস্র। একদিন চিন্তায় কিছু রসিকতা মিশিয়ে আলেফ ভাবলো : নারীর সঙ্গে জমির এইটুকুমাত্র তফাত যে নতুন ও লোভনীয় দেখলেই তাকে ভালোবাসা যায়। তার জন্য ছেলে-বউয়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হয় না।

আলেফ সেখকে এ জমির দিকে অনিবার্যভাবেই আসতে হতো। তার মন চৈতন্যর চুরির ব্যাপারে অবলম্বনহীন হয়ে পড়েছে বলেই সময়ের দিক দিয়ে কিছু আগে হলো।

রেবতী চক্রবর্তী একদিন আলেফকে রায়দের পতিত জমিতে ঘুরে ঘুরে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি পরখ করতে দেখতে পেলো।

'ওখানে কী'?

'না, কিছু না। এমনি ঘুরে দেখলাম'।

'ভালো জায়গা বটে ঘুরে দেখার। মাটির তলায় একতলা সমান ইটের গাঁথুনি আছে। সাপখোপের আড্ডা। কত গর্তগাড়া দেখছেন না? বাস্তুসাপের বাচ্চারা ধাড়ীদের মতো খাতির-রেয়াৎ করে না'।

'তা তো বটেই, তা তো বটেই', বলে আলেফ জমিটা পার হয়ে রেবতী চক্রবর্তীর কাছে রাস্তায় উঠে এলো।

অন্য কথা দু'চারটে বলে পথ চলতে শুরু করলো দুজনে। খানিকটা দূরে যাওয়ার পর জমিটা আবার চোখে পড়লো আলেফের। আরও দু'চারটে অন্য কথা বলে আর-একবার জমিটা দেখে নিয়ে আলেফ গদগদ করে বললো, 'বড়োলোকের কাণ্ডকারখানা আলাদা'।

'কেন, বড়োলোকের জমিতে সোনার টুকরো পেলেন নাকি'?

'তা না, তবে কওয়া যায়। সোনার টুকরা ছাড়া কি জমিটা? তা না। বলতিছি ধরেন যে এদেশে তো রায়রা আর আসবি নে'।

'ও পড়ে আছে, পড়েই থাকবে'।

'তা কেউ কিনে নিলেই পারে। লাট দিতে হয় না, লাখেরাজ ভুঁই। সেসে আর কয় ট্যাকা। এক লটে পঞ্চাশ বিঘা ঢালা, নিখরচা'।

'এই দ্যাখো! বড়োঘরের জিনিসের দিকে নজর দেওয়া কেন'!

'বড়োঘরের হলেও এ তো পর্দার বিবি না'।

'সে বছরে রামচন্দ্ররা কয়েকজন ভাগে কিনতে চেয়েছিলো। তার মধ্যে লেগে গেলো দুর্ভিক্ষ। ও জমিতে লোভ হলেই অনর্থ'।

রেবতী চলে গেলো। ধুলোঢাকা পথে একটা পাক খেয়ে আলেফ সেখ ফিরতি পথে আঁকাবাঁকা চলতে লাগলো। আর তারপর ভাবতে ভাবতে ভেবে ওঠার আগেই সে রামচন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত।

রামচন্দ্র বেরিয়ে এলো। জলচৌকি টেনে দিয়ে তামাক ধরালো, কাঁঠালের পাতা এনে নল তৈরি করে দিলো।

'আলাম ঘুরতে ঘুরতে। তা কেমন আছেন? শুনলাম ছাওয়ালের বিয়ে দিছেন'।

এই হলো আলেফের ভূমিকা। এখানে আসবার সময়ে সে যেমন আঁকাবাঁকা পথে এসেছিলো তেমনি আঁকাবাঁকা কথায় সে জমির প্রসঙ্গে এসে পৌঁছলো।

রামচন্দ্র বললো, 'হ্যাঁ, সখ তো হইছিলো একবার। অনেক টাকা লাগে, পারলাম না'।

'তা ধরেন যে মিথ্যা না কথা। বড়লোকের জমি, আমাদের মতো অভাবে তো পড়ে নাই। রায়বাবুদের সরকারকে লিখছিলেন'?

'হুঁ। পাঁচ হাজাব সেলামি দিযে পত্তনি বহাল'।

'কন কী। তাও পত্তনি। তাও ওই সাঁইত্রিশ বিঘা পতিত ভিটা'।

কথায় নিবাশা ফুটাতে আলেফ জমিব পবিমাণ কমিযে আনলো।

বামচন্দ্র বললো, 'কিন্তুক শুধু জমি দেখেন না সেখেব বেটা। ও হতিছে জমিদাবেব গদি। ওখানে কাযেম হওয়া এই গাঁযে কাযেম হওযাব সামিল'।

আলেফ সেখ বামচন্দ্রব প্রতিটি কথাব শেষে মাথা দুলিযে দুলিযে যতি সূচনা কবে যাচ্ছিলো। সে বললো, 'হয, হয, ঠাট্টা। জমি নাই তাব জমিদাবী'।

বামচন্দ্রব বাড়ি থেকে বেবিযে আলেফ নিজেব বাড়িব পথ ধবলো। বৌদ্র প্রখব হযে উঠছে। চাবিদিকেব দৃশ্যপট প্রখবেব তুলিকায আঁকা। অন্ধেব বৈবি পৃথিবী। 'পাঁচ হাজাব সেলামি, পঞ্চাশ বিঘা জমি। না হয পঞ্চাশ বিঘাব প্রতিটায আব দু'পাঁচ টাকা কবে দেওযা গেলো সবকাবকে গদি-সেলামি। খাজনাব হাবে দু পাঁচ আনা ফেব ফাব কবতে সেই পাববি'।

মন যখন কোনো বিষযে চঞ্চল হযে ওঠে, সমগ্রকে গ্রাস কবতে চায, গভীবভাবে ডুবতেও চায, তখন সেটা ভঙ্গিতে গোপন বাখা যায না। আলেফেব হাতেব লাঠিটা দিগন্তেব দিকে কী একটা নির্দেশ কবতে গিযে একবাব আকাশকে কাটছে, আব একবাব মাটিকে ফুঁড়ছে।

'চবণকাশিতে পাকা মজিদ তোলো আব তাকে ঘিবে লাল প্রাচীব দেও। সে তোমাব গ্রামেব বাইবে চবযা ব্যাপাব। মানে খানদানি, নাকি , কী যেন বললো বামচন্দ্র—জমিদাবেব মসনদ'।

আলেফ হাসি হাসি মুখে ভাবলো আল মাহমুদ তাকে বোকা ঠকিযেছে, অকাজেব হাঙ্গামায় জড়িযে দিযেছে। সেই একবাব ভদ্রলোকেব ছেলেবা অনেক কাপড় পুড়িযে দিযে কাপড়েব দাম চড়িযে দিযেছিলো। গ্রামেব লোকবা বোকা ঠকেছিলো। এই হচ্ছে বাজনীতিব ব্যাপাব। আল মাহ্‌মুদ একটা প্রথম শ্রেণীব আহাম্মক। শহবেব লোকে 'ছিনেমা' দ্যাখে তা, সেটা গ্রামে কেন?

২৭

মুঙলাব যৌতুকে পাওযা জমিতে এপক্ষ থেকে এই প্রথম চাষ পড়বে।

বামচন্দ্র বললো, 'মহিম সবকাব কিন্তু ভালো চাষ জানে'।

'আমবাও তাগবে তাক লাগাযে দিবো'।

'কস কী'?

'ছিদাম হাসে হাসে কযছে, জান কবুল'।

আলোচনায এও স্থিব হলো মুঙ্‌লাবা আগেই বওনা হযে যাবে। বামচন্দ্র যাবে ভানুমতিকে সঙ্গে নিযে গাড়িতে।

আলাপেব একসমযে বামচন্দ্রব স্ত্রী বললো, 'সব তো ঠিক কবলা, এদিকে কী হইচে তা তো জানো নাই'।

'কযে দিলে, মা'। বলে মুঙলা মুখটায যতদূব সম্ভব বিপন্নতা ফুটিয়ে তুললো।

পবিকল্পনাটা ভানুমতিব। সে বুদ্ধিমতী, উপবন্তু বযস্কা দিদি বউদিদিদেব মধ্যে মানুষ হযে তাব স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি অভিজ্ঞতাব পবিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। সে ঘুমন্ত বামচন্দ্রব পাযেব ছাপ কাগজে তুলে মুঙ্‌লাকে দিয়েছিলো এবং সেই মাপে মিলিযে জুতো সহজে না পেলেও অবশেষে এক দোকান থেকে একজোড়া যোগাড় কবে এনেছে সে।

রামচন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত এবং বিব্রত বোধ কবে 'না না' কবে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে ভানুমতি জুতো

নিয়ে এসে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে কাগজের মোড়ক খুলতে লেগে গেছে।

রামচন্দ্র হেসে বললো, 'এ যে নৌকা'!

তার স্ত্রী বললো, 'লোকটা তুমি কোন পাখির মতো'?

জুতো পরানোর চেষ্টাটা কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। প্রথমে রামচন্দ্র নিজে, তারপরে ভান্‌মতি তারপর ভান্‌মতি এবং সনকা, শেষ পর্যন্ত মুঙ্‌লা এবং রামচন্দ্র চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে উঠলো। তথাপি যে পা দুখানা দীর্ঘ দিন ধরে দু-মনী দেহটা মাঠের উঁচুনিচু জমিতে, কখনো আতপ্ত ধুলোর কখনো বা হড়হড়ে কাদার পথে মাইলের পর মাইল বহন করতে অভ্যস্ত হয়েছে তারা কি জুতোর বাঁধন পরতে রাজী হয়? বাঁ পাটিতে অবশেষে পা গেলো। মুঙ্‌লা স্ফূর্তি প্রকাশ করতে গিয়ে দেখলো গোড়ালির দিকে খানিকটা জুতো তার হাতে ছিঁড়ে এসেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুঙ্‌লা হায় হায় করে উঠলো, কিন্তু রামচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলো এবং কিছুপরে মুঙ্‌লাও সে হাসিতে যোগ দিলো।

শুধু ভান্‌মতি রাগ করে কাঁদতে বসলো।

রামচন্দ্র বললো, 'কাঁদিস নে, মা, কাঁদিস নে'।

'ওরা কী কবি, আমার ভগ্নিপোতরা ঠাট্টা করে'।

'হুম্'। একটু ভেবে রামচন্দ্র বললো, 'তোর বাপেক জিগাস মা, জুতা না থাকলিও আমাদেব কিছু থাকে কিনা'। রামচন্দ্র তার গোঁফ জোড়াও পাকিয়ে দিলো।

প্রত্যুষে রামচন্দ্রর গাড়ি জমির ধারে তাকে নামিয়ে দিয়ে ভান্‌মতিকে নিযে মহিম সরকারের বাড়ির দিকে গেলো।

মুঙ্‌লা আর ছিদাম কোনোদিনই কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে না। আজ তারা যেন অনুপ্রেরিত হয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তারা পোয়াটেক জমি চাষ ফেলেছে।

রামচন্দ্র সাড়া দিলো, 'আ-হৈ'।

মুঙ্‌লা আর ছিদাম দুজনে প্রতিধ্বনি তুলে লাঙলের মোড় ফিরিয়ে কাছে এলো।

দুই জোড়া বলদই দ্রষ্টব্য। গহরজানের কাছ থেকে ছিদাম যে জোড়া চেয়ে এনেছে সে-দুটি পশ্চিমী, শাদা দুটি চলন্ত পাহাড়। মুঙ্‌লার জোড়া দেশী, কিন্তু এত পরিপুষ্ট যে ষাঁড় বলে ভুল হয়। বলদগুলি হাঁপাচ্ছে।

রামচন্দ্র বললো হাসিমুখে, 'দেখিস, বলদেক মারে ফেলিস নে'।

মহিম সরকার এলো খবর পেয়ে। তার হাতে একটা চটের থলে, তাতে তামাক, সোলা, ঠাকুরদাদার আমলের চক্‌মকি পাথর ও আঁকড়া লোহা, থলের গায়ে লোহার আঁকড়ায় ডাবা হুঁকো ঝুলছে।

রামচন্দ্রর কাছে এসে মহিম বললো, 'কেন্, বেহাই যে'!

'কে, কাকা আসছেন? পেন্নাম হই। আমাক আর বেহাই কন্ কেন ; আমি সামাইন্য'।

মহিম তামাক সেজে রামচন্দ্রর হাতে দিয়ে বললো, 'খাও বিহাই'।

রামচন্দ্র লজ্জিত মুখে তামাক নিয়ে খেতে খেতে বললো, 'কন্, কী ভাগ্য আমার, কাকা'!

মহিম বললো, 'একজন তো তোমার ছাওয়াল, আর একজন কে'?

'গোঁসাইয়ের বেটা ছিদাম'।

'ছিদাম? কেষ্টদাসের ছাওয়াল? এমন জোয়ান হইছে? চলো, দেখে আসি চাষ'।

দুই বেহাই জমিতে নেমে ঘুরতে ঘুরতে ছিদাম মুঙ্‌লার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। মহিম সরকার বলদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। একথা-ওকথা বলতে বলতে খপ্ করে বলে বসলো, 'বেহাই, আমরা কি এদের মতো চাষ দিতে পারতাম? তাইলে বোধায় আরও কিছু হবের পারতো'।

রামচন্দ্র বললো, 'কন্ কী, কাকা, আপনে সাক্ষাৎ বলরাম'।

মহিম বললো, 'তা ধরো যেন্ একটুক্'। সে মুঙ্লার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার লাঙলের মুঠিতে হাত রাখলো।

ইঙ্গিতটা বুঝে সলজ্জভাবে রামচন্দ্রও ছিদামের লাঙলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'হেদি'।

মুঙ্লা, ছিদাম ও রামচন্দ্র দেখলো, সড়সড় করে জমি কাটতে কাটতে মহিম সরকারের লাঙল এগিয়ে যাচ্ছে। তখন রামচন্দ্রও বললো, 'হেদি'। একটা ঝাঁকি দিয়ে তার লাঙলও ছুটে চললো।

মহিম সরকার বললো, 'বেহাই, লক্ষ্য রাখো ছাওয়ালরা না হাসে'।

রামচন্দ্র বললো, 'কাকা, মহিম সরকার লাঙল ধরলি হাসে কেডা'।

মহিম সরকার মোড ঘুরে বললো, 'হয, মিছে কও নাই, মহিম সরকার মানি এখন বামচন্দ্র। বুঝলা না, বেহাই—হেদি, ও বলদ, কথা শুনে হাসো না ; বুঝলা বেহাই, তখন মনে হতো, পৃথিমি পাই চষি। একদিন মনে হইছিলো চাঁদে অত জমি দেখি, চাষা দেখি না'।

মহিম সরকারের দুই ছেলে এসেছিলো। তারা বললো, জামাই আর তার বন্ধুকে তখনই তাদের মা যেতে বলেছে, অত রৌদ্রে চাষ দেওয়াব দরকাব নেই।

মহিম বললো, 'শুনছো না, বেহাই, তোমার কাকির কথা? আমি নাকি সুবিধা পালে জামাইকে খেত-রোখা করবো, তার মেয়ের কষ্টের কাবণ হবো। কও, আমি আর তুমি কি খেত-রোখা'?

ছেলেদের সম্মুখে এমন আলাপ কবতে সংকোচ হলো রামচন্দ্রর কিন্তু তাকে উত্তর দিতে হলো . 'তা হতি পারলাম কবে'?

আজ চাষের দিন নয়, আনন্দের দিন। মহিম সবকার অতঃপর মুঙ্লা, ছিদাম ও রামচন্দ্রকে নিয়ে তাব বাড়ির দিকে বওনা হলো। তাব দুই ছেলে লাঙল উল্টো কবে জোয়াল চাপিয়ে বলদগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে পিছন পিছন আসতে লাগলো।

দুপুবে রামচন্দ্র ও মহিম আলাপ-আলোচনায ব্যস্ত ছিলো। মহিমের বড়োছেলে দুটিও যোগ দিয়েছিলো। এমন সময়ে মহিম সরকাবের বড়োজামাই এলো। এ লোকটি মুঙ্লার বিয়ের সময়ে আসতে পারেনি। সে জামালপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে। অল্পবয়সে সাধারণ শ্রমিক হয়ে রেলের কাজ নিয়েছিলো, এখন অনেকটা দূর উঠেছে। তার ছেলেমেয়েরা সকলেই ইংরেজি স্কুলে পড়ে। তার একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিলো, অনেক ব্যাপারেই মূলীভূত বিষয়টি তার চোখে যেমন পড়ে আর কারো তেমন পড়ে না।

আলাপের মাঝখানে সে বললো, 'মানুষ ভাবে এক, কিন্তু অন্য হয়ে যায়'।

'তা হয়'।

'অনেকে অপুত্রক অবস্থায় জামাইকে ছেলে বলে মানুষ করে কিন্তু বুড়োবয়সে ছেলেপুলে হলে জামাইকে আর আপন মনে হয় না'।

'এরকমও হয়'। মহিম সরকার বললো, 'আমাব ছাওয়াল আছে, জামাইকে কিন্তুক পর করি নাই'।

'আমার-আপনার কথা নয়। এমনকী এরকম দেখা গেছে, জামাইকে বঞ্চিত করার জন্যে পুত্রের আশায় মানুষ দ্বিতীয় বিবাহ করেছে'।

'মানুষের অসাধ্য কী'? বললো রামচন্দ্র।

আলাপটা মহিমের ভালো লাগলো না। সে এর আগের আলাপের জের টেনে বললো, 'তাইলে মুঙ্লা কয়দিন আমার কাছে থাকবি'?

'তা থাক, কাকা, আপনের কাছে ছাওয়াল বিগড়ায় না'।

'তাইলে, ভানুও কি থাকবি'? মহিম এ প্রশ্নটা যেন ভয়ে ভয়ে উত্থাপন করলো।

রামচন্দ্র হেসে বললো, 'আপনের ইচ্ছা'।

ভান্‌মতি ঘরের ভিতর থেকে শুনছিলো, সে বেরিয়ে এসে বললো, 'আমি কৈল চিকন্দিতে যাবো। আমার শাশুড়ি কয়ে দিছে তাড়াতাড়ি ফিরতি'।

মহিমের চোখে অশ্রুবিন্দু দেখা দিলো, সে হাসতে হাসতে বললো, 'দেখলা, রামচন্দ্র, দেখলা'।

রামচন্দ্র বিমুগ্ধ হয়ে বললো, 'চল, মা, চল তাই'।

সন্ধ্যার দিকে মহিম সরকারের গাড়ি করে রামচন্দ্র ও ভান্‌মতি ফিরে চললো।

রামচন্দ্রর খুশি খুশি লাগছিলো কিন্তু তার মধ্যেও কী একটা সমস্যা যেন ওত পেতে আছে। সেটা সামনে এসে স্বরূপ প্রকাশ করছে না, কিন্তু তার নিশ্বাসের, কখনো-বা তার নড়াচড়ার শব্দ কানে এসে গা শিরশির করছে।

মহিমের বড়োজামাইয়ের বক্তব্যটুকু মনে পড়লো তার। রামচন্দ্র ভাবলো, আচ্ছা, সে কি আমাক লক্ষ্য করে কইছে। তা না কবের পারে, কিন্তু এমন কথা ওগরে সকলের মনে হবের পারে। ধরো, যদি ভান্‌মতিও মনে করে অবশেষে জোতজমা কিছুই মুঙ্‌লাক দিবো না? তাইলে ভান্‌মতির মনে সুখ থাকবি নে, তার ভালোবাসা শুকায়ে যাবি। তারপর রামচন্দ্র নিজের মনের অন্দরে প্রবেশ কবে সেখানে যাবা ছিলো তাদেব পরিচয় নিতে লাগলো। মুঙ্‌লাকে জ্ঞাতসারে কোনোদিন অনাদর করেছে এমন কারো সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া গেলো না। নিজের ছেলে হলে ভালো হতো এমন দু-একটি ইচ্ছার সঙ্গে দেখা হলো বটে কিন্তু তারা নিতান্ত অযত্নে অপুষ্ট। রামচন্দ্র স্থির করলো এই যে নিজের মনের কথা লোকে জানুক আর না জানুক, যা করতে হবে সেটা প্রকাশ করে বলাই ভালো। তাব অভাবে মুঙ্‌লা সম্পত্তি পাবে এটা সকলেই আন্দাজ করে, তবে সেটা সকলে জানলেই-বা কী ক্ষতি! লাভ আছে বরং। মহিমের বড়ো জামাইয়ের মতো যাদের মন তারা মুঙ্‌লাকে আর একটু শ্রদ্ধা করবে। তাছাড়া, ব্যবস্থাগুলি পাকাপোক্ত রকমে না করে গিয়ে অনেক মানুষ উত্তরাধিকাবীকে ফ্যাসাদে ফেলেছে।

রামচন্দ্র বললো, 'ভানু, ঘুমাইছো'?

'না, বাবা'।

'সদরে যাওয়া লাগবি। ভাবি যে সম্পত্তি সব মুঙ্‌লার নামে লিখে দিবো'।

'কেন্‌, তা দেওয়া লাগে কেন্‌? আমার ও বাপ তা দেয় না'।

'তোর বাপ বুঝি তোর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করে? তাইলে আমিও তাই করবো। জমি সব মুঙ্‌লাক লিখে দিবো'।

'তারপর সে যদি আমাক আর আপনেক তাড়ায়ে দেয়'?

'আমাক দিলেও দিতে পারে, তোক দিবে কেন্‌'?

'আপনেক তাড়ালে সে আমাকও হলো'।

রামচন্দ্র জানে যে-বয়সে স্বামী পৃথিবীর সকলের চাইতে আপন হয়, সে-বয়স হলে ভান্‌মতির এই মত বদলাবে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সে তার জীবন ধন্য করতে পারে।

তবু কথাটা অত সহজে ভুলবার নয়।

প্রায় একমাস পরে। সান্যালমশাইয়ের নায়েব গ্রামের অপেক্ষাকৃত শক্ত চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রকেও ডেকে পাঠালো। সকলে সমবেত হলে নায়েব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো। বুধেডাঙায় সান্দাররা ফৌত হওয়ার দরুন কিছু খাস জমি পড়ে আছে, কিছু জমি তারা ইস্তফাও দিয়েছিলো। আর তাছাড়াও বুধেডাঙার লাগোয়া সিকস্তি এবার চাষযোগ্য হবে। তা তিনশো বিঘা হবে চাষযোগ্য সিকস্তি। পত্তনি দেওয়া হবে? না, বর্গাদারি। খাসেই থাকবে, বরং আরও খাজনা-বাকি জমি খাস করা হবে। কীভাবে বর্গা হবে? হাল-বলদ-বীজ যদি চাষীর হয়, তিন ভাগের দুই ভাগ চাষীর ; হাল-বলদ-বীজ যদি রাজার হয় আধাআধি

ভাগ।

রামচন্দ্রর পাশে ছিদাম উসখুস করে উঠলো। রামচন্দ্র চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বললো, 'বোস'।

নায়েব আরও বিশদ করে বললো, 'বিল-মহল থেকে দশ ঘর লোক আনাবেন কর্তা। দাদপুর ভাঙছে নদীতে, তাদেরও প্রায় দশ-বারো ঘর আসবে। এখন তোমাদের মধ্যে কারা জমি নেবে স্থির করে এসে জানাবে। পরে যেন বলো না—রাজা তোমাদের না জানিয়ে অন্যায় করেছেন'।

কৃষকদের মধ্যে পরিপক্বরা যখন ইতিকর্তব্যতার চিন্তায় ব্যস্ত, বুধেডাঙার পাঁচ-ছয়জন সান্দার যেখানে মুখ নীচু করে বসেছিলো তার মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি অপরিচিত লোক উঠে দাঁড়ালো। আঠারো-উনিশ বছর বয়স হবে তার। সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ধপ্ করে বসে পড়লো।

নায়েব বললো, 'তুমি কে, কিছু বলবে'?

লোকটি আবার উঠে দাঁড়ালো। ঘরের একটা থাম হাতের কাছে পেয়ে সেটাকে অবলম্বন করে কিছু সাহস পেলো। বললো, 'জে, ইজু'।

'ইজু কে'?

'জে, ইজু সান্দার'।

'তা না হয় বুঝলাম। কার ছেলে তুমি? বাপ বড়ো-বাপের নাম বলো'।

লোকটি মুখ চৈত্রের ঝলসানো নতুন আমপাতার মতো ঝাম্‌রে গেলো। সে বললো, 'ইয়াকুব সান্দার আমার ধর্মবাপ। কও না, আজা, লোকজনের মধ্যে আমাকে বেহাল করো কেন্'। তখন রজব আলি উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, নায়েবকে নয়, রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে, 'বুঝলেন না মোণ্ডল, আমার কাছেই থাকে ও। ইয়াকুবের ছাওয়াল। আমার সেই ইয়াকুব, তার'।

'তোমরা জমি চাও? কিন্তু রজব আলি, তোমার পত্তনিটুকুও তো তুমি ইস্তফা দিয়েছো'।

'জে'।

'বর্গা চষতে পারবে'?

'জে'।

'কতটুকু চাও'?

'ক, ইজু, ক' বলে রজব আলি ইয়াজকে আবার তুলে দিলো।

ইয়াজ বললো, 'জে, বেশি চাই না। একা একা দুইজন আমরা, লাতি আর আজা। দশ বিঘা কি পনরো, জলের ধার ঘেঁষে দেন'।

'হাল-বলদ নেই তো? পাঁচ পাবে। তা বেশ, পরে এসে টিপসই দিয়ে কাগজ-কলম ঠিক করে নিয়ো। কিন্তু, রামচন্দ্র, তুমি কিছু বলছো না'?

'অধম আর কী বলবি'। গোঁফ চুম্‌রে রামচন্দ্র মাথা নোয়ালো।

ছিদাম ফিসফিস করে বললো, 'জ্যাঠা, রজব আলি তার লাতির জন্য কয়, কও জ্যাঠা, আমার জন্যে আমি কবো'?

'ক এবার'।

ছিদাম বললো, 'হুজুর—'

'তুমি কেষ্টদাসের ছেলে না'?

'আঁগে'।

'তুমি জমি চাও'?

'আঁগে'।

'কতটা পারবে'?

'আঁগে, ষাট কি সত্তুর বিঘা'।

'দূর পাগ্‌লা! এ কি গান বাঁধা'?

ছিদামের কান লাল হয়ে উঠলো। সে বললো, 'আঁগে, যদি না পারি প্রাণ দিবো'।

'তুমি কি চাকর রেখে জমি চষতে পারবে, এমন মূলধন আছে? হাল-বলদ আছে'?

'একটুক্ পাবো না জমি'? ছিদামের দু চোখ জলে ভরে এলো।

'পাঁচ-দশ যা হয় দিতে পারি যদি রামচন্দ্র তোমার হয়ে কথা দেয়। এখন সকলে চিন্তা করো, পাগলের মতো কথা বলো না। কিন্তু রামচন্দ্র, কর্তা তোমার জন্যে বিশেষ করে কিছু জমি দেগে রেখেছেন একলপ্তে ত্রিশ বিঘা'।

রামচন্দ্র বললো, 'আজ্ঞা'।

'কোথায় তা বুঝতে পেরেছো? সিঙ্গী জমিদারের সীমানা সামিল'।

'আজ্ঞা, বুঝলাম'।

'ভয় পাও নাকি'?

'আজ্ঞা, রাজার হুকুম হলে লাঙলও ধরতে হবি'।

'আচ্ছা, তাহলে এখন তোমরা যাও। সাতদিন পরে আবার হাটবারে এসো'।

সকলে চলে গেলে রামচন্দ্র বললো, 'নায়েবমশা—'

'বলো। আরও চাও বুঝি জমি? দাদপুরের দশ-বারো ঘর প্রজার ঘরদোর জমিজিরাত পদ্মায় গিয়েছে। তাদের জন্যও জমি রাখতে হবে তো। আর বিলমহলের তাঁতীরা কর্তার খাতিরের লোক তাও জানো। তবে তোমার জন্যে যে জমির কথা বললাম, একলপ্তে অত বড়ো জমি আর কোথাও নেই। সেটেলমেন্টের দাগি নিয়ে যা গণ্ডগোল'।

'আজ্ঞা পরে আপনেক কবো। একটা কথা আপনেক জিজ্ঞাস করবার চাই। সামাইন্য কথা। ধরেন যে আমার ঘরবাড়ি যদি কারো নামে লিখে দিই তাইলে সে কি আমাক তাড়ায়ে দিবের পারে'?

'তা তো পারেই'।

রামচন্দ্র একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো, 'আপনে উকিল পাস। কন, এমন কী উপায় আছে যে জমি আমারই থাকবি কিন্তুক আমার অভাবে আর একজন হক্‌দার হবি কিন্তুক আমার পোষ্যদের অযত্ন করবি নে'।

'তা আছে। তাকে উইল বলে'।

'উইল? সে কাগজ লেখা যায়'?

'তা যায়। কিন্তু উইল করার মতো বুড়ো তুমি হওনি। আর তাছাড়া তোমাদের পরিবারের হক্ নিয়ে গোল হবার কারণ দেখি না'।

'না, গোল আর কী'।

কাছারি থেকে বেরিয়ে রামচন্দ্র স্থির করলো সদরে গিয়ে তার উকিলকে দিয়ে উইল লিখিয়ে নেবে।

রামচন্দ্র চলে গেলে নায়েব চিন্তা করলো—লোকটার এমন হঠাৎ পরিবর্তন হলো কেন? এমন চপলমতি নয় যে জমির কথা শোনামাত্রই মাথা খারাপ করে হৈচৈ শুরু করবে। কিন্তু ধীরে সুস্থে হলেও জমি নেওয়া সম্বন্ধে তার মতো চরিত্রের লোকের কাছে নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব আশা করা গিয়েছিলো। এমন সুযোগ প্রতি বৎসর আসে না।

আলেফ সেখের সঙ্গে আবার একদিন রামচন্দ্রর দেখা হলো।

রামচন্দ্র যাচ্ছিলো চৈতন্য সাহার বাড়িতে কিছু কাপড় কিনতে। আলেফ সেখ বিপরীত দিক থেকে আসছিলো।

'কতি যাওয়া হইছিলো'?

'এই এদিকে'। আলেফ যে রায়দের জমিটাই আবার দেখতে গিয়েছিলো সেটা প্রকাশ করলো না। সে বললো, 'বিড়ি খান'।

রামচন্দ্র বিড়ি নিয়ে ধরালো।

আলেফ বললো, 'সেই যে জমির কথা কইছিলাম মনে আছে'?

'আছে'।

'বসেন না একটুক্, আলাপ করি'। আলেফ পথের ধারে ঘাসে-ঢাকা জমি দেখে উবু হয়ে বসে পড়লো। অগত্যা রামচন্দ্রকেও বসতে হলো।

আলেফ বললো, 'যা কইছেন মিথ্যা না, মণ্ডলের ব্যাটা। এখন জমি আর কনে আছে এ-গের্দে। কী যেন কইছিলেন, মসনদ না কী? বাড়ি করবের হয় তো ওইখানে'।

রামচন্দ্র নিরুত্তর। আলেফ বলে চললো, 'কিন্তুক লোকের কাছে খবর নিয়ে কলকেতায় রায়বাবুদের সরকারের ঠিকানায় চিঠি দিছিলাম। ফিরে আসছে। ধরেন যে রেজেস্টারি চিঠি, বিলি হওয়া লাগতো'।

'এখানে মিহিরবাবুর কাছে খোঁজ পালেও পাতে পারেন'।

'কন কী? তার কাছে খোঁজ নিবের গেলে সে কি নিজেই কিনবের চায় না'?

রামচন্দ্রর মনে হলো লোকটি বৃথা ঘুরছে। রায়বাবুরা যদি জমি বিক্রিই করবে তবে এটা এতদিন পড়ে থাকতো না। সকলের চোখেই পড়েছে জমিটা। সে আলেফের জন্য একপ্রকার সহানুভূতিও বোধ করলো। সে বললো, 'মিছা কেন্ ঘোরাফেরা করেন। ও জমি যদি নেওয়ার মতো হবি তাইলে আর কেউ না পারুক, সান্যালকর্তা এক কথায় নিবের পারতো'।

'কিন্তুক জমি পড়ে থাকবি, কেউ নিবি নে এও-বা কেমন কথা'।

'তা ছাড়াও রায়বাবুদের বাস্তুভিটার সম্মান আছে তো। হিন্দুরাই যখন ওটা নিতে পারে নাই, তখন বাস্তুভিটা মোসলমানের কাছে বেচবি এমন মনে হয় না'।

'তুমি বুঝি আমার দাড়ি দেখে ঠাট্টা করো'?

'না, ঠাট্টা না। জমি তো আজকাল খুব পাওয়া যাতেছে। সান্যালকর্তা মেলা খাসজমি বিলাতেছেন'।

আলেফ সেখ মিহির সান্যালের কাছে গিয়ে একদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জমিটার কথা উল্লেখ করলো।

মিহির বললো, 'না, ও জমি আমি নেবো এমন কথা রটনা হওয়া উচিত নয়। আপনি কার কাছে শুনলেন'?

'আমার পাড়ার লোকরা বলাবলি করে'। কথার চালটা বজায় রাখার জন্য আলেফ বললো। 'তা আপনি যদি না নেন, আরও গাহাক আছে'।

'এ তো বড়ো কৌতুকের কথা। যার জিনিস সে বিক্রি করবে না, খরিদ্দার পিছু নিয়েছে। কে কেনে'?

'ধরেন, আমরা দু ভাই আছি'।

মিহির বললো, 'এই আশাতে ঘোরাঘুরি? তা আপনাকে এ গ্রামের মধ্যে ঢুকতে দিলাম কেন? আমাদের বিয়ের বাজনায় আপনার ধর্মের ব্যাঘাত হবে, আমাদের গানের জলসায় আপনাদের খোদা নারাজ হবে। আপনাকে গ্রামে ঢুকিয়ে এটাকে আরব মরুভূমি করতে পারব না'।

'তাইলে আমি মোসলমান বলে পাবো না'?

'দেওয়ার মালিক আমি নই। তবে এ বিষয়ে আমরা আমাদের মতামত নিশ্চয়ই জানাবো। পৃথক জায়গায় আছি, সদ্ভাব আছে'।

মিহির কথাগুলি হাসি হাসি মুখেই বলেছিলো কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত ধারালো। আলেফ স্থির করলো এরা রামচন্দ্র নয় যে সহানুভূতি নিয়ে তার প্রস্তাব বিবেচনা করবে। তা ক্ষমতা আছে বৈকি মিহির সান্যালের। গ্রামের সব হিন্দুদের জোট পাকিয়ে একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে। আলেফ সব মুসলমানদের এক করতে পারে না, তাহলেও কিছু পারে। কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? সে যদি রায়বাবুদের পাঁচ হাজার দিতে চায় হয়তো মিহির তাকে জব্দ করার জন্য দশ হাজারে দাম তুলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসতে পারে।

আলেফ চিন্তা করলো। তার মনে পড়লো তখন, আল মাহ্‌মুদ একদিন কথায় কথায় বলেছিলো বটে সদরে অনেক রাস্তায় অনেক সময়ে তারা গানবাজনা বন্ধ করে দিতে পেরেছে। এবং সে কথা বলতে বলতে আল মাহ্‌মুদ আনন্দে উত্তেজিত হয়ে অনেকবার ইনাসাল্লা বলেছিলো। তাহলে তো মিথ্যা বলেনি মিহির, এই ভাবলো আলেফ।

কিন্তু সে বলতে পারেনি অথচ অনায়াসেই বলতে পারতো—তার ছেলের বাজনার কথা। এরফান গেলে সে হাসিমুখেই বলতে পারতো—মিহিরবাবু, এ আপনার লোকঠকানো কথা। গানবাজনায় কারো ধর্মের ব্যাঘাত হয় না। আমার ছেলের বাজনা একদিন আপনাকে শোনাবো। তাছাড়া এরফানের কথা বলার ধরনই অনেক মিষ্টি। নিজে না গিয়ে এরফানকে পাঠালে কাজ হতো।

তার ধর্ম সম্বন্ধে কে কী বললো এটা আলেফ ভুলে যেতে পারতো যদি কথাটা কোনো তত্ত্ব-আলোচনা মাত্রই হতো। কিন্তু জমিটার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলি অনবরত মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে মিশে ধর্ম সম্বন্ধে মিহিরের উক্তিগুলি একটি বিদ্বেষের রূপ নিতে লাগলো তার মনে।

এরকম কথাও সে চিন্তা করতে লাগলো যে আল মাহ্‌মুদকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নেবে। একদিন সে ছমিরুদ্দিনকে বললো, 'কেন্, প্রেসিডেন্‌সাহেব, তুমি না গাঁয়ে পরধান'!

ছমিরুদ্দিন রসিকতা করে বললো, 'কোন ধান কলেন'?

আলেফ রসিকতার দিকে না গিয়ে বললো, 'জমি নিবা'?

'জমি? তা নেন্ না। শুনি যে সান্যালমশাইয়ের অনেক সিকস্তি জমি এবার চাষ সামিল হইছে'।

'সে কি পাওয়া যায়? শুনছি হিঁদুরা পাবি'।

'তাও শুনছি। দাদপুরের দাসেরা নাকি উঠে আসে বসবি বুধেডাঙায়। আর বুধেডাঙার সান্দাররা নদীর কিনারে নামে যাবি'।

'কও, এ বন্দোবস্ত কেন্, সান্দাররা মোসলমান বলে'?

'হয়, তারা আপনের মক্কার মোসলমান'!

'তাইলেও দ্যাখো! তুমি কি ইচ্ছা করলেই চিকন্দিতে জমি নিবের পারো'?

'ইচ্ছা করলিই জমি হয়, একথা কবে শুনছেন'?

এরপরে আলেফ নিজেকে প্রকাশ করে ফেললো। রায়দের জমির কাহিনীটুকু সে বললো ছমিরুদ্দিনকে। ছমিরুদ্দিন ধৈর্য ধরে শুনলো। কিন্তু আলেফের কথা শেষ হলে বললো, 'শুনছি এসব কথা। এতদিনে আপনের জমি কেনার কথা সব লোকই জানছে। আপনের খোঁড়া মৌলবী আজকাল কয়ে বেড়ায়—বড়ো যে বাড়বাড়ন্ত, রায়ের ভিটায় বসবা বুঝি! এই তার নতুন শোলোক'।

আলেফ অন্যসময়ে এতে বিপর্যস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু রায়ের জমির উপরে তার মোহ প্রায় অন্ধ হয়ে উঠেছে। সে বললো, 'কেন্, জমির গায়ে কি নাম লেখা থাকে'?

'তা থাকে না। তবে এ জমি ধরে আপনেই-বা কেন্ চিকন্দিতে ঢুকবের চান'?

আলেফ বিস্মিত ছমিরুদ্দিনকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে দমদম করে চলে গেলো।

কিছুদিন আগে সান্যালমশাই কনট্রাক্টরের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। অনসূয়া ও সদানন্দ সঙ্গে ছিলো। কথাটা কোন সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে কেউই লক্ষ্য করেনি, একসময়ে শোনা গেলো সান্যালমশাই বলছেন, 'এখন আমার মনে হচ্ছে পুরোপুরি জীবনটাকে প্ল্যানে ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। বাইরের ঘটনাও পরিবর্তন সূচনা করে'।

সদানন্দ চিন্তা করলো : বাইরের ঘটনা যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা এ বাড়িতে সুমিতির আসা। একথা যদি কেউ বলে, পরিবর্তনগুলি তাকে উপলক্ষ্য করে হচ্ছে তাহলে তার কথাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিঃশব্দে এসে একটি মেয়ে কোনোরকম আত্মপ্রচার না করে তার রুচির ছাপই যেন সর্বত্র রাখছে।

অনসূয়া বললেন, 'পুরুষমাত্রেই আয়োজন ও আড়ম্বরপ্রয়াসী। কিছুকাল বিশ্রাম করে নিলে এই মাত্র, নতুবা তোমাকে আমি চিনি। ছড়িয়ে না পড়ে, আত্মবিস্তার না করে তুমি পারো না'।

সান্যালমশাই বললেন, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলছো। সুমিতির সন্তানের মধ্যে আমারই আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা অঙ্কুরিত হয়ে আছে। এমন সুযোগ যে আসবে তোমার ছেলের দিকে চেয়ে আমি ভরসা পাইনি'।

সদানন্দ চিন্তা করলো : এই কথাগুলি সান্যালমশাইয়ের আত্মগোপনের চেষ্টা নাও হতে পারে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ হিসাবে তুলে ধরা যায় যে নৃপনারায়ণের রাজনীতিবৃত্তি গৃহস্থ সান্যালমশাইয়ের সমস্ত উৎসাহ নিভিয়ে দিয়েছিলো। আর এদিক দিয়ে সুকৃতির ঘটনাও উল্লেখ করা যায়।

সে বললো, 'আপনি যা বললেন সেটা একটা অত্যন্ত প্রবল কিন্তু সাধারণ অনুভব। এরই জন্য উত্তরাধিকার ব্যবস্থা অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সেটা আঁকড়ে ধরে আছে। আর এ বিষয়ে সুমিতি মা বোধ হয় আপনাকে সাহায্য করবেন। খোঁজ করছিলেন আমাদের স্কুলে মেয়েদের গরদ, তসর এসবের সুতো কাটা শিখানো যায় কিনা। সেক্ষেত্রে অবশ্য মুর্শিদাবাদ থেকে ওসব কাজ জানে এমন দু'এক ঘরকে এনে এখানে প্রজা করতে হয়'।

সান্যালমশাই বললেন, 'তাও যদি না থাকবে তবে এই ষাটের দিকে অগ্রসর জীবনে কী অবলম্বন করবো। ধর্মে মতি নেই। তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিক হওয়ার চাইতে প্রথম সারির বাঁচিয়ে হওয়া ভালো। একে কি শান্তিনিকেতনের প্রভাব বলবে? না বলাই ভালো। হোক না এটা সুমিতির নিজের চিন্তা। সব দিক ভেবে দেখো না হয়'।

শাদা ঝকঝকে বাংলোটি যে আধুনিকতার চূড়ান্ত হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। যারা সান্যালমশাইকে চেনে দীর্ঘকাল ধরে তাদের পক্ষে এর গঠনটাও বিস্ময়জনক বোধ হবে। সহসা যদি সান্যালমশাইকে মর্নিংস্যুটে দেখা যায় কতকটা তেমনি বিস্ময়ের। এ বিস্ময়বোধকে দূর করতে হলে কল্পনা করতে হয় এটা তাঁর একটি শুভ্র সুন্দর রসিকতা। কথা হলো সদানন্দ পর্দার, সোফার ঢাকনা ইত্যাদির কাপড়ের অর্ডার দিতে সদরে যাবে।

সান্যালমশাই বললেন, 'রূপু বাংলোটার নামকরণ করেছে 'সুমিত'। তার ইচ্ছা পুকুর থেকে কেটে নিয়ে গিয়ে বাংলোর পাশে আঁকাবাঁকা একটা ঝিল করে দিতে হবে। তাতে থাকবে কাঠের সাঁকো'।

অনসূয়া বললেন, 'ছেলে কি 'শেষের কবিতা' পড়ছে'?

'তার প্রতি অন্যায় করা হবে যদি তোমরা এতে "শেষের কবিতা"র ছাপই শুধু দেখতে পাও। বরং সে আমাকে বলেছে উত্তরদিকে হওয়া সত্ত্বেও বাংলোর নাম 'উত্তরায়ণ' রাখেনি সে, ঠাকুর-জমিদাররা রেখেছেন বলে'।

সদানন্দ হাসলো। সে বললো, 'বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে'।

'তা তুমি মিথ্যা বলোনি। ঠিক কী রকম ছিলো আমার পূর্বপুরুষরা তার বিশ্লেষণ করার মতো

ঐতিহাসিক বুদ্ধি আমার নেই। তাহলেও কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশ যখন একটি বিশেষ দিকে দ্রুত ধাবমান হয়েছিলো তখন যারা সে-গতিতে বাধা দিয়েছে, বাংলাদেশের অন্য অনেক পরিবারের মধ্যে তাদের দলেই ছিলো আমাদের পরিবার। একথা তুমি বলতে পারো, সদানন্দ, আমরা অগ্রসরদের দলে থাকার অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। মানুষ নিজেদের অন্যায়ের সমর্থনেও যুক্তি খুঁজে বার করে। তেমনি মনোভঙ্গিতে ব্যাপারটা চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, রাজা রামমোহনের সময় থেকে এই যে আমরা বাধা হিসাবে কাজ করলাম এর ফল বোধহয় সবটুকু খারাপ হয়নি'।

এ যেন দূরস্থিত কাউকে নিয়ে আলাপ করা। সদানন্দ বললো, 'আপনাদের মতো শক্তিগুলিই বিদ্যাসাগরকে বাধা দিয়েছিলো, ব্রাহ্মদের ব্যঙ্গ করেছিলো'।

'শুধু একটা দিকই দেখো না। দুর্গোৎসবকে এবং রামপ্রসাদীকে ধরে রেখেছি। বাংলাদেশ হাওয়াই দ্বীপে পরিণত হয়নি কিংবা মেক্সিকোতে'।

সান্যালমশাই প্রফুল্ল হাসিতে আবার বললেন, 'বিদ্যাসাগরকে বাধা দিতে পেরেছিলাম, কেশব সেনকে প্রতিরোধ করতে সশিষ্য রামকৃষ্ণকে পাওয়া গিয়েছিলো, কিন্তু রূপের কাছেই হার মানলাম। ভদ্রলোক দেহের স্বাভাবিক হিসাবে যত অগ্রসর হলেন জবাব দিকে তত কি সুন্দরতর হলেন? আমার মনে হয়, সদানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও রবীন্দ্রনাথের মতোই রূপবান ছিলেন। চৈতন্যের পর সেজন্য রবীন্দ্রনাথই আমাদের অবদ্ধ বিলগুলিতে নতুন জল এনে দিলেন, নতুন পলিমাটি। রূপের প্লাবনে ভেসে যাওয়াই বোধহয় আমাদের জাত্যগুণ'।

অনসূয়া বললেন, 'এটা খুব খাঁটি কথা বলেছো। এইজন্যেই পদ্মাও তোমাদের জীবনের চূড়ান্ত বিস্ময়। তাকে ভালোবেসে, ভক্তি করে চূড়ান্ত আঘাত পাচ্ছো তবু নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারছো না। বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছি সাময়িকভাবে পদ্মার অনুগ্রহ পেয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে তোমার চেতনা'।

পদ্মার তীরে অনেক ঘটনায় পদ্মা নিজে এসে নায়িকা হয়। কখনো-বা তার কোনো কাজ থেকে সাধারণ মানুষের সোজা জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয়। তাদের শ্লথ দীর্ঘপথ অতিবাহিত করার ভঙ্গিতে গতি এসে ঘা দিতে থাকে। দু-এক মাসে দু-এক বছরের পথ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে যায় মানুষ। মাটি এখানে ধ্রুব নয়।

পদ্মা পাঁচ-সাত বৎসর এদিক থেকে ওদিকে ঝুঁকেছিলো। কিন্তু হঠাৎ আবার যেন নাচের ঢঙেই এদিকের দর্শকের দিকে ফিরে তাকালো। ইন্দ্রর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে যেন বরুণের দিকে আঁচলের ঢেউ তুলে এগিয়ে এলো। তার ফলে দাদপুর ভেঙে গেলো। দাদপুরের অনেক মানুষের আশা-ভরসা সেই নর্তকীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলা ফুলের মতো নিষ্পিষ্ট হলো। কিন্তু এদিকে পয়স্তি, সিকস্তি হলো। আর তার ক্ষণেকের দৃষ্টিপাতের মতো যে-বান এসেছিলো গত বর্ষায় তাতে ভয়ংকর সৌন্দর্যের সামীপ্যে যেমন হয়, দর্শকদের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক করে উঠেছিলো, পয়স্তি-সিকস্তি ধুয়েমুছে কপাল ভাঙার দ' হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু দেখা গেলো এক-কোমর পলি রেখে গেছে। নর্তকীর দৃষ্টির প্রসাদই নয়, যেন তার আলিঙ্গন। বুড়ো জোয়ান হয়ে উঠবে এমন লক্ষণ দেখা দিলো।

সান্যালদের প্রায় সকলেরই কিছু কিছু জমি চাষযোগ্য হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীমানের লক্ষ্মী। সান্যালমশাইয়ের প্রায় তিনশো বিঘা খাস জমি সোনা ফলার মতো উর্বর হয়েছে। আর তা তিনি গ্রামের চাষীদের মধ্যে মুঠিমুঠি করে বিতরণ করছেন। এমন ঘটনা বিশ বছরে একবার হয় কি না-হয়। ছিদাম এবং ইয়াজের মতো অপরিপক্ক চাষীরা অকারণে জোরে জোরে পা ফেলে বেড়াচ্ছে।

জমি বিলোনোর তারিখটাকে নায়েব কয়েকটা দিন পিছিয়ে এনে সুমিতির ছেলের অন্নপ্রাশনের তিথিটার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, আর সেই সুযোগ পেয়ে রামচন্দ্র দুশো বছর আগেকার একটা দিনকে যেন উদ্‌ঘাটিত করে দিলো।

কী দেওয়া যায়, কী দিলে সান্যালমশাইয়ের মান রক্ষা হয় এ নিয়ে আলাপ করতে করতে দু-একজন

কৃষক বলেছিলো, 'ট্যাকা কড়ি নাই'।

'ট্যাকা না থাকলিও কড়ি তো আছে'।

'ওই একই কথা'।

'ট্যাকা না পারো, কড়ি দ্যাও'।

এইভাবে কথার সূত্রপাত। ছিদাম বলেছিলো, 'বেশ, তাইলে একমুঠ ধান আর একটা লক্ষ্মীর কড়ি দেবো'।

'তাইলে আমরাও তাই দেবো। তার বেশি না'।

বাকিটুকু রামচন্দ্রর পরিকল্পনা।

নায়েবমশাই বিব্রত বোধ করলো। তার কৌশল করে জমি বিলোনোর তারিখ ঠিক করা কোনো কাজেই এলো না। প্রজারা কেউ টাকা আনলো না। চৈতন্য সাহার দোকান থেকে এবং দিঘা থেকে কড়ি এবং নিজেদের ভাঁড়ার থেকে মুঠি পরিমাণ ধান সঙ্গে নিয়ে তারা উপস্থিত হলো। তাসত্ত্বেও নায়েবমশাইকে আমলাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে প্রজাদের ভোজের তদ্বির করতে হলো।

কিছুক্ষণের জন্য সুমিতিকে সোনার টায়রা পরা ছেলে কোলে করে দরদালানে বিছানো সাচ্চা জরির কাজ-করা মখমলের জাজিমের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছিলো, প্রজাদের দিকে মুখ তুলে চাইতে হয়েছিলো—সেখানে নাম করা প্রজারা ধান আর কড়ি দিলো তার ছেলেকে।

খবরটা শুনে সান্যালমশাইও বিস্মিত হলেন।

কিন্তু সকলে এ বিষয়টিকে এভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। গ্রামের কয়েকজন জোতদার এবং সান্যালদের অন্যান্য তরফের দু একজন সান্যালমশাইয়ের কাছে আপত্তি জানাতে এলো এবং তারা ভূমিকাতে বললো, এ বিষয়ে তারা সানিকদিয়ারের হাজিসাহেবের মতও জানাচ্ছে। তাদের আপত্তি শুনে সান্যালমশাই হেসে বললেন, 'আমি দোষ স্বীকার করছি। এদিকটা আমি বিবেচনা করে দেখিনি। আমি নিজের লাভ লোকসানই খতিয়ে দেখেছিলাম। ব্যবস্থাটা আমার বিলমহলে বহুদিন আগেই চালু করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর সবকিছুর উপরে, জমি পত্তনি দিলে খাজনা যা পেতাম, এক-তৃতীয়াংশ ফসলেও এখানকার বাজার দামে তার চাইতে বেশি পাবো। তবে এই নিয়ম চিরকাল বহাল থাকবে এমন কথা নয়'।

জোতদাররা চলে গেলে সদানন্দ এলো।

'আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলে'?

'তা শুনলাম। এরকমভাবে নিজের মহত্ত্বকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে প্রথম শ্রেণীর রসিক ছাড়া আর কেউ পারে না'।

সান্যালমশাই বললেন, 'কথা শুনে মনে হয় আমার কাছে কিছু চাইবার আছে তোমার'।

'না, তা নয়। হিসেবটা আমি করে দেখিয়েছিলাম বটে যে এক-তৃতীয়াংশ ফসলের মূল্য খাজনার চাইতে বেশি। কিন্তু পত্তনি বন্দোবস্তের নগদ সেলামি যে হিসেবে ধরিনি এটা নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছিলো'।

'কিন্তু, সদানন্দ, এখন যে আমি ঠাকুর্দা হয়েছি। দূরদৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ারই কথা'।

সান্যালমশাই সেখান থেকে উঠে অন্দরের বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন। দাসী গিয়ে খবর দিলো সুমিতিকে, কিন্তু সুমিতির ছেলে তখন ঘুমুচ্ছে। সুমিতি নিজে এলো।

'ও যে ঘুমুচ্ছে'।

'থাক, থাক। ঘুমোক। তোমাকে যে কাজের ভারটা দিয়েছিলাম, হয়েছে'?

'পছন্দ করে রেখেছি। এনে দেবো ডিজাইনের বইটা'?

'বিকেলে দিয়ো। কিন্তু কথা কি জানো মেহগনি কাঠের চালান আনিয়ে নেওয়া কঠিন বলে বোধ

হচ্ছে খোঁজখবর নেওয়ার পর। আজকাল ওটা তেমন চালু নয়। বাগানে অবশ্য দুটি গাছ রয়েছে। কিন্তু সীজন্ করিয়ে নিতে ছ মাস কমপক্ষে'।

ঠিক এই কথাগুলির উত্তর দেওয়াই সব চাইতে কঠিন সুমিতিব পক্ষে। ডিজাইন পছন্দ করার ব্যাপারে এত অসুবিধা হয়নি। এমন কথা তার কানে এসেছে যে নতুন বাংলোটা তার রুচি অনুসারে নির্মিত হবে। সান্যালমশাই যখন তাকে আসবাবের ডিজাইনের বইটি দিয়ে পছন্দ করতে বললেন তখন তার মনে হলো সে প্রস্তাবে রাজী না হলে হয় অত্যন্ত বেহায়া কিংবা দর্শনীয়ভাবে লজ্জাশীলা হতে হয়। এবং এই দুইরকম অগ্রসরণই তার কাছে দুঃসহ বোধ হয়েছিলো। অবশেষে সে একটা পথ খুঁজে পেলো। সান্যালমশাই যখন বইটা উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছিলেন সুমিতি সান্যালমশাইয়ের ঝোঁকগুলি অনুমান করে নিতে পারলো, এবং সে স্থির করলো সান্যালমশাই জিজ্ঞাসা করলে তাঁর নিজের পছন্দগুলিই সে দেখিয়ে দেবে।

'ছ মাস যদি সীজন্ করতে দরকার হয়, তাই হবে। আমাদের এমন তাড়াতাড়ি কী'? সুমিতি একটি নিটোল হাসি ফুটিয়ে তুললো।

'ভেবে দেখি। তোমার সিল্কের সুতোব কাটুনিদের কথা শুনেছি। দেখছি'।

সুমিতি বেশ লজ্জায় পড়লো। কিন্তু এবপরে কি 'সে কিছু নয়' বলা যাবে?

এক সন্ধ্যায় অনসূয়া বললেন, 'এখন কাজ নেই হাতে। তোমার কাছে বসে সেতার বাজাবো'?

সান্যালমশাই বললেন, 'তাই বাজাও'।

অনসূয়া দাসীকে বলেই এসেছিলেন। সে সেতার রেখে গেলো।

পুঁথিঘরের একটি জানলাব ঠিক নিচে লাইম গাছটার পুষ্পিত পল্লবগুলি দেখা যাচ্ছে। গাছটাব বয়স হয়েছে বলেই হোক কিংবা বিদেশী গাছ, ক্রমশ অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ক্ষয়িত হয়েছে বলেই হোক, এখন আব তেমন অজস্র ফুল ফোটে না। তবু একটা সুঘ্রাণ আসছে। সেই জানলার পাশে আজ বিকেল থেকে গালিচা পাতা আছে। সান্যালমশাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে সেই গালিচায় অনসূয়া বসলেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সান্যালমশাই আধশোয়া অবস্থায় মনকে পরিপূর্ণ রূপে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সুশিক্ষার সুযোগ এবং রেয়াজ করার অবসর থাকলে সুরুচিসম্পন্ন মনের পক্ষে একটি রাগিণীকে মূর্ত করে তোলা কঠিন নয়। বাজনা থামাব পরও কিছুকাল নীরবে সেই সুঘ্রাণে তন্ময় হয়ে রইলেন দুজনে।

অনসূয়া যেন কিছু পরিমাণে লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, 'যে অন্যকে সুখী করার চেষ্টায় বাজাতে বসেছিলো সে নিজেও সুখী হলো, এই তো বলছো তুমি'?

সান্যালমশাই মধুর করে হাসলেন, 'আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে মুদ্রাদোষের মতো এটা একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে আমার—সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করে নীরস করে দেওয়ার'।

অন্য কেউ নিজের সম্বন্ধে যখন বলে তখন তার বক্তব্যে সবটুকু আস্থা রাখা কঠিন। বিশেষ করে কেউ যখন আত্মদোষ বর্ণনা করে তখন ধরে নেওয়া যায় সেটা প্রকাশিত হওয়ার আগে তার মন সেই আত্মগ্লানির কাহিনী সংশোধন করে দিয়েছে, সংসার-রাজনীতি তার বক্তব্যকে সেন্সর করেছে। কিন্তু অনসূয়ার কাছে সান্যালমশাইয়ের কথা স্বতন্ত্র। এই লোকটির বৃহত্ত্বের সঙ্গে এ পরিবারের সকলেই পরিচিত কিন্তু তাঁর ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণার কথাগুলি শুধু তিনিই জানেন। শুধু তাই নয়, দৃষ্টিভঙ্গির যে ক্বচিৎ ক্ষুদ্রতা সান্যালমশাই বুদ্ধির সাহায্যে জয় করার চেষ্টা করেন, অন্তরের যে ক্ষণ-প্রকাশিত কাপুরুষতাকে জয় করার চেষ্টা করেন ব্যবহারের দৃঢ়তা দিয়ে, সে সবই কোনো-না-কোনোসময়ে সান্যালমশাই তাঁর কাছে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীতে সবকিছু ব্যক্ত করার পরও একটি জায়গায় এসে মানুষ থেমে যায়—যে সংগুপ্ত কামনাগুলিকে জাগ্রত মন অস্বীকার করে, ভয় পায়, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায় না। অনসূয়ার ধারণা, সেই অরণ্যচারী আদিম স্বপ্নের সান্যালমশাইকেও তিনি কিছু চেনেন, তাঁর সঙ্গে

কোনো কোনো সময়ে সমপ্রাণও হয়েছেন। যদিও হঠাৎ একসময়ে নতুন কোনো আত্মপ্রকাশ করা সান্যালমশাইয়ের পক্ষে অসম্ভব বা অভূতপূর্ব নয়।

অনসূয়া বললেন, 'এই প্রবণতাকে তুমি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছো'?

সান্যালমশাই দাবা খেলেন না অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁর নেশা নেই। কিন্তু সেবার মন্মথ রায় এলে তাঁর আপত্তি টেকেনি। সান্যালমশাইয়ের সেই ভঙ্গিটি যা দাবা খেলার সময়ে হয়েছিলো সেটা, সুতরাং, দুর্লভ। অনসূয়ার মনে হলো সান্যালমশাইয়ের এই অত্যন্ত শীতল মনোভঙ্গি যেন তেমনি কিছু।

তাওয়াদার তামাক পুড়ছিলো। সেদিকে মন দিয়ে সান্যালমশাই বললেন, 'তোমার বিয়ের আগে এ বাড়িটা কী রকম ছিলো এই যেন মনে পড়ছে আমার। বাড়ি গমগম করা বলতে যা বোঝায় সেটা তখনো খুব ছিলো না। বাড়ির পিছন দিকের অংশে তখন অনেক আত্মীয় বাস করতেন, এখনো করেন। কিন্তু তখনকার সেই আশ্রিতদের মধ্যে বলিষ্ঠ কর্মক্ষম পুরুষও ছিলো। এখন বোধহয় মানুষের আত্মসম্মান-জ্ঞান এ ধরনের জীবনকে স্বীকার করে না। নাকি, হিরণ জ্যাঠার আপিসের খরচও সে সময়ে কাছারি থেকে ব্যবস্থা করা হতো, তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা আজকাল নেই বলে তাঁদের মতো লোকরা আর আশ্রয় চান না'।

অনসূয়ার মনে পড়লো এ বাড়িতে এসে তিনি প্রথম দিকে যাদের পেয়েছিলেন সেই সব আত্মীয়াদের মধ্যে দু-একজন তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। এখন তারা নেই। যারা আছে তারা সুমিতির সখ্যলাভ করেনি। অনসূয়া স্থির করলেন সান্যালমশাই বোধহয় এমন নিঃসঙ্গতার অনুভব থেকেই সেকালের কথা বলছেন। রায়দের যারা অবশিষ্ট আছে গ্রামে কিংবা সান্যাল-বংশেরই যারা আছে তাদের কেউই সান্যালমশাইয়ের দোসর নয়।

সান্যালমশাই ইদানীং যেন নতুন সঙ্গী পেয়ে সোৎসাহে পথ চলার ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বাড়িঘর সাজাবার উৎসাহে অন্তত তাই মনে হয়। অনসূয়া এখন ভাবলেন সেই অগ্রগতি কি তবে ত্বক্-গভীর?

কয়েকদিন আগে সদানন্দ কোথাও যাচ্ছিলো, অনসূয়ার কাছে নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি নিতে এসেছিলো।

অনসূয়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো'?

'বিলমহলের জন্যে আর একটা মোটরপাম্প আনতে'।

'সেই জল ছেঁচে জমি দখলের ব্যাপার বুঝি'?

'হ্যাঁ। আজকাল জলকরের মুনাফা কিছু নেই। বিলের প্রায় আধখানা জলাজমি'।

সদানন্দ চলে গেলে অনসূয়া তাঁর এক পুরনো চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেছিলেন : সুকৃতির সম্বন্ধে এ বাড়ির সকলেরই যে একটা আন্তরিক দুঃখবোধ আছে সেটাই হয়তো নৃপনারায়ণকে সুমিতির দিকে আকর্ষণ করেছিলো। পুরুষদের বেলায় এমন হয়। কেউ কেউ কোনো বিধবার দুঃখে বিচলিত হয়ে তাকে বিবাহও করেছে। সান্যালমশাইয়ের কর্মকাণ্ডের সূচনায় রয়েছে পুকুরঘাটের পুনঃ-প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যেখানে একদিন সুকৃতিকে হারাতে হয়েছিলো। সান্যালমশাইয়ের শান্তি অনুসন্ধানের পিছনে তাহলে ছিলো উদাস বিষণ্ণতা। আর তাহলে ভালোই হয়েছে সুকৃতির পরে সুমিতির আসা। কিন্তু এখন সান্যালমশাইয়ের বসবার ভঙ্গিটিতে নিঃসঙ্গতার ছাপই দেখতে পেলেন অনসূয়া।

তিনি চিন্তা করলেন, তাহলে এসবই কি আন্তরিক নয়?

সৃজনধর্মীদের স্বভাবই এই, কোনো একটি বিষয়কে উপলক্ষ্য করে তারা উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়। নিজের অন্তরগত সেই প্রেরণাটি যতক্ষণ না সার্থক হয়ে উঠছে ততক্ষণই তারা কর্মব্যস্ততায় উজ্জ্বল। কিন্তু তারপর?

সান্যালমশাই নিজের নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করছিলেন না। অনসূয়া আসবার আগে এবং তার পরের অবস্থাটা যেন তুলনা করছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমিও, অনসূয়া, সুকৃতি-সুমিতির মতো শহর থেকে

এসেছিলে এই পাট-ধানের হিন্টারল্যান্ডে। এই কথাটাকে বাংলায় 'ভর' বলা যেতে পারে। তুমি সঙ্গে করে এনেছিলে সংগীত। সেটা একটা বিদ্রোহ। কিন্তু মানুষের ন্যায়-নীতিবোধ কি রকম হাস্যকর দ্যাখো। অর্গ্যান বাজিয়ে অতুলপ্রসাদের গান করা তোমার মর্যাদায় কোথাও আটকাবে এরকম একটা আবহাওয়া ছিলো বাড়ির। এটা যেন ব্রাহ্মিকা খোপার মতোই তোমার পক্ষে বর্জনীয়। যেন গানকে অবলম্বন করে তোমার কণ্ঠস্বর কেউ শুনবে এটা উচিত নয়। কিন্তু সেতার বাজানো যেন অন্য কোনো ব্যাপার। তুমি শুনলে অবাক হবে, একসময়ে এ নিয়ে আমি খুব চিন্তা করতাম। তখন আমার এরকম একটা বালকোচিত ধারণা হয়েছিলো, সরস্বতীর হাতে বাদ্যযন্ত্র থাকে বলেই যেন আমাদের প্রাচীন আবহাওয়া তোমার সেতারে আপত্তি জানায়নি'।

'হয়তো তাই', বলে অনসূয়া ভাবলেন, এই পরিবারের বিশিষ্ট প্রথাগুলিকে গ্রহণ এবং পরিবর্জনের মাধ্যমেই তাঁর নিজের বর্তমান চরিত্র গড়ে উঠেছে। তারপর থেকে কি তিনি একটি মূল্যবান কিন্তু কঠিন পাথরের মতো আলোক প্রতিফলন করছেন? কিন্তু একথা মনে পড়ছে কেন সান্যালমশাইয়ের!

অনসূয়া চলে যাওয়ার কিছুপরে রূপু এলো একটা বইয়ের খোঁজে। সে যখন বই নিয়ে চলে যাচ্ছে সান্যালমশাই বললেন, 'হ্যাঁরে, রূপু, তোর বউদি গানবাজনা ভালোবাসেন না'?

কথাটা আকস্মিক, কোনোদিন রূপুর মনে জাগেনি। সে বললো, 'জানি না'।

সান্যালমশাই বললেন, 'হয়তো ভালোবাসেন কিন্তু এখানে হাতের কাছে কিছু পাচ্ছেন না। তুই খোঁজ নিয়ে যা প্রয়োজন সদানন্দকে বলে আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করিস'।

রূপু চলে গেলে সান্যালমশাইয়ের মনে হলো সুমিতির ব্যাপারটায় নতুনত্ব আছে। একে যদি কেউ সখ করে বিপ্লব বলতে চায় তা বলতে পারে। কিন্তু সেও হয়তো নিজের কিছু বর্জন করতে চাইবে যেমন অনসূয়া গানকে করেছিলেন। ভেবে দেখতে গেলে অনসূয়াও বিপ্লব এনেছিলেন। তাঁর নিজস্ব ধর্মমতের বলিষ্ঠতা প্রচারিত হওয়ার আগে তাঁর স্বকীয়তা প্রচারিত হয়েছিলো। কালীপূজোয় বলির ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিলো তাঁর কান্নায়। এমনি কিছু সুমিতির ক্ষেত্রেও হবে। একটুপরে কথাটা তাঁর মনে হলো : এটা লক্ষণীয়, ধর্মমতকে নিয়েই প্রথম নিজেদের স্বকীয়তা প্রকাশ করেছে দুজনেই। বিবাহটা ধর্ম বৈকি।

নিজের বয়সের কথা প্রকাশ্যে চিন্তা করতেও অনসূয়ার লজ্জা করে। কিন্তু কোনো কোনো দিন মানুষ অনভ্যস্ত কাজ করতে আরম্ভ করে।

ড্রেসিং টেব্‌লের বড়ো আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিরুনির কয়েকটি টান দিতে না দিতে কপালের উপরে কয়েক পাক কোঁকড়ানো চুল আজ থেকে বিশ বছর আগে যেমন প্রতি সন্ধ্যাতেই থাকতো তেমনি করে দুলে উঠলো। পরনের যে শাড়িটা কাজকর্ম শেষ করে ঘরে এসে পরেছিলেন সেটাও তিনি পাল্টালেন। ঘাসের চটিটা বদলে লাল মখমলের একটা চটি পছন্দ করে পরলেন।

সান্যালমশাই ঘরে ছিলেন। হাতের বইটি মুড়ে রেখে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। 'এসো'।

'অমন করে চেয়ে থেকো না'।

'অনেকদিন পরে দেখছি বলেই বোধহয় এমন লাগছে'। সান্যালমশাই অনসূয়ার হাত দুখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এই হৃষ্টতাবোধই আমাকে নতুন নতুন কাজে উৎসাহ দেয়'।

অনসূয়া বললেন, 'যদি কিছু পেয়ে থাকো সে তোমার আকর্ষণের শক্তিতেই পেয়েছো'।

রাত্রি যখন আরো গভীর হলো অনসূয়া বললেন, 'এমনি যদি কখনো কখনো আসি, বলো নির্লজ্জ বলবে না'?

'কিছু বলার মতো ভাষা থাকে না'। সান্যালমশাই বললেন।

ভোররাতের কিছু আগে নিজের ঘরে ফিরে এসে অনসূয়া বিছানায় গা রাখতেই ঘুমে তাঁর চোখ

জড়িয়ে আসতে লাগলো। ততক্ষণে তাঁর নিজের বিছানা খোলা জানলার বাতাস পেয়ে পেয়ে শীতল হয়েছিলো।

পরদিন সকালে দাসী এসে ডাকলো, 'বেলা হয়েছে, মা, উঠুন'।

সান্যালমশাই তাঁকে নিলাজ না-ও বলতে পাবেন, কিন্তু যা শুধু এই রাত্রিটির বৈশিষ্ট্য সেটা যেন সত্যিকারের চাইতে গভীর এবং বিস্তৃত বলে সমস্ত দিন মনে হতে থাকলো অনসূয়ার। একথাও দু-একবার স্মরণে এলো, হাতের চুড়িগুলি খুলে একজোড়া রত্নচূড় পরেছিলেন তিনি সেতার শুরু করে।

ওদের জীবন যে নতুন খাতে প্রবাহিত হতে চায় তা হোক, তা বলে মস্তিষ্কের সাহায্যে চলতে গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছি বলে, সঙ্গহীন হয়েছি বলে যে আশঙ্কা হয়েছিলো তাঁর, সান্যালমশাইয়ের নিঃসঙ্গতার ক্লান্তিতে যেভাবে ব্যথিতা হয়েছিলেন তিনি, তা সবের লক্ষণ দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হাতের মুঠোয় রাখা এই সংসারের কোথাও খুঁজে পাওয়ার কথা নয়, পেলেনও না।

৩০

দাদপুরের লোকরা বুধেডাঙায় বসবার জোগাড় করে নিয়েছে। তারা সান্যালমশাইয়ের বাগানের পাশ থেকে ক্রমে নেমে আসছে। সর্বসমেত কমবেশি পনেরো ঘর লোক হবে। তারপরই বিলমহলের আট-দশ ঘর ভালুকে চেহারার চাষী। এরকম কিংবদন্তী রটেছে, এদের গায়ে শ্যাওলা আছে।

এসব ব্যাপারে যেমন হয়, ইতিমধ্যে দু-একটা ছোটোখাটো কাজিয়া-ঝগড়াও হয়ে গেছে। জমি সুনির্দিষ্ট নয় এখনো, তবু কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে চায় না। দাদপুরের গলায়-কণ্ঠি কৈবর্তরা আর বিলমহলের মোষের মতো কাদামাটি-মাখা মুসলমান তাঁতীরা এ বিষয়ে সমান। কাজিয়া দু-একবার লাঠির পর্যায়ে পৌঁছাবে এমন সূচনাও হয়েছিলো। কিন্তু নায়েব প্রতিবারেই এসে দাঁড়িয়ে গোলমাল মিটিয়ে দিয়েছে।

এদের ঝগড়ার সূত্রপাত অনেক সময়ে ছেলেমানুষি কথার থেকে হয়।

একদিন বিলমহলের জসিমুদ্দিন বললো, 'আরে রাখো রাখো। জলের ভয়ে পলাও, আবার—' কথাটা সে বলেছিলো ঠিক তার পাশে যে ঘর তুলছিলো তেমন একজন দাদপুরী কৈবর্তকে। তার নাম মুকুন্দ।

মুকুন্দ বললো, 'ভাই রে, এ বিল না। এ জলেক মান্য করা লাগে'।

জসিমুদ্দিন বললো, 'বিল দেখছো না'?

'হয়, যেখানে কাদা থাকে'।

'কাদা? আমাদের বুঝি কাদার প্রাণী মনে করলা'?

'তা করবো কেন্? কাদা মাখবের ভালোবাসো'।

'মুখ সামলে কথা কয়ো'।

'কেন্? বিলের ডরে? আমরা পদ্মাপারী'।

রাগের মাথায় জসিমুদ্দিন বললো, 'তোমার পদ্মাক ধরে বিলে ডুবায়ে রাখবের পারি'।

দুইজনেই চালের উপরে বসে ঘর বাঁধছিলো। প্রায় একইসঙ্গে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো তারা।

'সান্যালকর্তা বাগান ঘেঁষে বসাইছে তাই বুঝি নিজেক মনে করছো খুব লায়েক'? জসিমুদ্দিন বললো।

'সেই হিংসায় জ্বলে মরো, মোষের মতো কাদা ঘোলায়ে তোলো'! মুকুন্দ উত্তর দিলো।

'সামাল'।

'খবরদার'।

'চোপ'।

'চপরাও'।

গদাগদ। দমাদম।

চারিদিক থেকে লোক ছুটে এলো। নায়েবমশাইয়ের কাছে খবর গেলো। এই বিশেষ কলহটায় একটু বৈশিষ্ট্য আনলো রামচন্দ্র। সে গড়িমসি করেও জমিদারের কথা রাখার জন্য জমি দেখতে বেরিয়েছিলো। লোকজনকে ছুটতে দেখে সেই এগিয়ে এসেছিলো। সে বললো, 'মনে কয় দুজনেক পদ্মার জলে চাপে ধরে মাথা ঠাণ্ডা করে দেই'।

একজন বললো, 'পারো তা'?

'কওয়া যায় না। পারলেও পারবের পারি'।

পিছন থেকে নায়েবমশাইয়ের গলা শোনা গেলো। 'কে, রামচন্দ্র না? ধরো, তাই ধরো। পদ্মায় না নিয়ে যাও, কাছারিতে চলো। কর্তা বাগানে দাঁড়িয়ে ওদের মারামারি দেখে গেছেন'।

কথাটা মন্ত্রের মতো কাজ করলো। মুকুন্দ ও ভসিমুদ্দিন পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে মাটি ঝাড়তে লাগলো নিজেদের গা থেকে।

কৈবর্তদের অশ্বিকুমার বললো, 'ছাওয়ালডা নতুন বিয়ে করে মনে করছে পিরথিমি ওর হাতের তলায়'।

বিলমহলের এরশাদ বললো, 'তাইলে তো আমাগের জছুরও তো সেই ব্যারাম। শোনো নাই, লাবেনের মিয়ের সঙ্গে ওর কথা চলতিছে'?

রামচন্দ্র গম্ভীর মুখে বললো, 'তেঁতুলগোলা জলে নিশা ছাড়ে শুনছি'।

কিন্তু শহরের কাজিয়া অন্যরকম। সেখানে অনেক মিহির সান্যাল আছে এবং অনেকগুলি আলেফ সেখ। নানা দিক্‌দেশ থেকে মিহির সান্যালরা এবং আলেফ সেখরা সেখানে জমায়েত হয়েছে।

কিছুদিন যাবৎ চিকন্দিতে সান্যালবাড়িতে রেডিও মারফত খবর আসছিলো, নোয়াখালি নামে এক জেলায় বহু লোকের প্রাণনাশকারী দাঙ্গা শুরু হয়ে ক্রমশ সেটা বিস্তৃতিলাভ করেছে।

কথাটা রূপুর মুখে প্রথম শুনে সান্যালমশাই বললেন, 'এ খবর যেন গ্রামে না রটে, বাড়ির দাস-দাসীরাও যেন না জানে'।

কিন্তু দিঘা শহর হিসাবে কলকাতার মতো না হলেও, শহরের জাত্যগুণ কিছু কিছু ছিলো তার। সেখানে রেলের কলোনি থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কলোনির ভিতরেও কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কোয়ার্টার্স বদলে বদলে কলোনিটিকে সাম্প্রদায়িক বিভাগে বিভক্ত করছে অধিবাসীরা। সেখান থেকে খবর আসছে লোকের মুখে মুখে।

একদিন কাদোয়া থেকে মনসা এলো। হাসিখুশি মুখে অনসূয়ার সঙ্গে খানিকটা কথা বলে সে সদানন্দর খোঁজ করলো, খুঁজে বার করলো। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপও হলো। আলাপের মূল কথাই হচ্ছে দু-তিন হাজার টাকার আতসবাজি চাই। শহরের যেসব বাজিকর আছে তাদের দিয়ে তেমন ভালো বাজি তৈরি হয় না আজকাল, কাজেই বিপিনকে চাই, সেই নুলো বিপিন মুখুজ্যেকে।

বিপিন মুখুজ্যের নাম শুনে সদানন্দর মুখ গম্ভীর হয়েছিলো। তখন দরজা বন্ধ করে প্রায় পনেরো মিনিট কাল তারা দুজনে সলা-পরামর্শ করলো। শহর থেকে বাজিকরদের আনানো হবে স্থির হলো। এবং এও স্থির হলো বিপিন মুখুজ্যেকে যদি না পাওয়াই যায় সদানন্দ বিপিনের দলের আর কাউকে আনবে এবং সে নিজেও বাজিকরদের প্রয়োজন মতো উপদেশ দেবে।

এরপর মনসা আবার অনসূয়ার কাছে গিয়ে বসেছিলো যেমনভাবে একটি অত্যন্ত আদরিণী মেয়েই বসতে পারে।

কথায় কথায় মনসা প্রস্তাব করলো, তাদের গ্রামে কিছু কিছু স্ত্রীলোক ও শিশুকে সান্যালবাড়িতে কিছুকালের জন্য রাখা যায় কিনা।

'তুমি তাদের আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করো, মণি'। অনসূয়া বললেন।

'তাহলে আমি এখন যাই। দরকার হলেই তাদের পাঠিয়ে দেবো'।

'দাঁড়াও। তোমার জ্যাঠামশাইকে বলি'। বলে অনসূয়া উঠে দাঁড়ালেন।

'না, না, সেটা ভালো হবে না'। বলে সিঁড়ি দিয়ে মনসা নামতে লাগলো।

'সঙ্গে লোক দিচ্ছি, দাঁড়াও'।

'লোক আছে সঙ্গে'। বলতে বলতে মনসা উঠোন পার হয়ে গেলো।

অনসূয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন, মনসার চার-বেহারার পাল্কিটার দাঁড়ায় আটজন কাঁধ দিয়েছে। সেটা পড়ি-মরি করে ছুটে চললো।

সান্যালমশাই অন্দরে এসে বললেন, 'মণি এসেছিলো যেন'?

'চলে গেছে'। বলে সে কেন এসেছিলো, কি তার প্রস্তাব তা বর্ণনা করলেন অনসূয়া।

সান্যালমশাই ভ্রূকুটি করে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো।

পরমুহূর্তে তিনি আসনে বসলেন আবার, হেসে বললেন, 'তামাক দিয়ো'।

তামাকে মন দিয়ে সান্যালমশাই সদানন্দকে ডেকে পাঠালেন।

'মণির খবর এই, তাদের গ্রাম নিরাপদ নয়। কী করা যায়'?

'নিরাপদ না হলেই-বা ক্ষতি কী'? সদানন্দ বললো।

'তার মানে'?

'মাৎস্যন্যায়ের সময়ে নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-অবস্থায় নিরাপত্তা মানে অপরপক্ষকে আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা। মণি ফিরে গিয়ে খুব ভালো করেছে। যদি তেমন হয় তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্যে দু-একজন মনুষ্যত্ব দেখাবে। নতুবা মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে একমাত্র যা দ্রষ্টব্য সেটারই অভাব হবে। মানুষ রাক্ষস তো হয়েছেই, জন্তুও হবে'।

সান্যালমশাই বললেন, 'তুমি মনে মনে একটা বক্তৃতা ঠিক করে রেখেছিলে বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার মতিগতি বুঝতে পারছি না'।

'খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি'।

'তুমি কি একটি চিতোরগড় কল্পনা করছো'?

'তাছাড়া অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় আমি সকলকে বুঝিয়ে দেবো : বাঁশের লাঠি সারা গ্রামে অজস্র আছে। সেন্সাস রিপোর্ট এ ব্যাপারে অর্থহীন। মনের জোর নিয়ে রুখতে পারলে অপরপক্ষ একসময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, সংখ্যায় ভারি হলেও। মরতে ভয় পেলে চলবে না'।

'এ কি রেটরিকের বেশি কিছু'?

'নদীর অকল্যাণ-গতিকে আটকাতে কখনো কখনো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়'।

'ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত রুখতে হবে? কিন্তু তুমি কি শুধু একপক্ষের কথাই চিন্তা করছো না? আমার প্রজাদের মধ্যে উভয় পক্ষই আছে'।

সদানন্দ লজ্জিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো।

একদিন আল মাহ্‌মুদকে দেখা গেলো। সে গ্রামের দিকে আসতে আসতে হায় হায় করতে লাগলো। যেন সে কোনো নতুন এক কারবালার জন্য শোক করছে। পথের লোকরা বিস্মিত হলো। ক্রমশ বিস্ময় বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে এরফান ও আলেফের বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে সে দাঁড়িয়ে পড়লো

এবং বুক চাপড়াতে লাগলো। তার চোখে জল নেই কিন্তু শোকের কান্নার শব্দগুলি মুখ থেকে বেরুচ্ছে। লোক জমে গেলো। এরফান অমঙ্গলের শব্দে নমাজ শেষ করতে না পেরে উঠে এলো। আলেফ জলযোগ করতে করতে ভাবছিলো, সিং-জমিদারের সীমানা-সামিল এক লপ্তের অতখানি জমি যদি রামচন্দ্র না নেয় তবে দখলে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে হয়তো পত্তনি বন্দোবস্তেও পাওয়া যেতে পারে। সেও উঠে এলো।

'কী হইছে, মহরম কেন্'?

'আর কী হবি, কলকেতায় শেষ'।

'কী শেষ হবি কলকেতায় হলেও তোমার কী'?

'একজন মোসলমান বাঁচে নাই'।

'কেন্, গজব'?

'না। হিঁদু আর শিখে মারে শেষ করছে'।

'কেরদানি রাখো। তুমি যে কও সে-দেশে এখন মুসলমানের নবাবি'।

'তাইলে কি হয়? আমাদের সাদেক নাই'।

'কী কও, আমার সাদেক নাই'? এরফান যেন মৃত্যুর আঘাতে আর্তনাদ করে উঠলো। আলেফের বাক্স্ফুরণ হলো না।

এরফান আবার প্রশ্ন করলো, 'কী কলি, সাদেক নাই'?

এরফান মাটিতে বসে পড়লো। তার প্রৌঢ়তার মর্যাদা ধুলিতে লুটিয়ে দিয়ে সে মাথা চাপড়ে আঁ-আঁ করে কাঁদতে লাগলো। 'হায় খোদা, হায় রহমান, হায় খোদা'।

খানিকটা কেঁদে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে এরফান বললো, 'বড়োভাই, তুমি কাঁদো না। দুই ভাইয়ের ওই এক ছাওয়াল খোদা নিছে। বড়োভাই, এমন কোন গুনাহ্ করছি আমি যার জন্যি খোদা এমন শাস্তি দিবি? আমি এই কাপড়েই কলকেতা যাবো। সেই আজব শহর শয়তানের আড্ডায় আমি খোঁজবো। ছাওয়ালের খবর আনবো। ছাওয়াল আমার বাঁচে আছে। চেরকাল বাঁচার সে-ছাওয়াল'।

এরফান খপ্ করে আল মাহ্মুদের হাত চেপে ধরলো : 'ক সত্যি কথা। গাঁয়ের লোক খেপাতে আসছিস? দিঘায় এই সব আজকাল হতিছে, তাই এখানে করবের আসছিস? ক। তোর হাত আমি মুচড়ায়ে ভাঙে দিবো। ক'।

আল মাহ্মুদ এতক্ষণ একটা মৃদু একটানা শোকের শব্দ করে যাচ্ছিলো। ভয় পেয়ে সেটা বন্ধ করে সে যা বললো তার সারমর্ম এই : দিঘার একজন দোকানদার জুতো কিনতে কলকেতা শহরে গিয়েছিলো। যে হোটেলে সে ওঠে সেই হোটেল দাঙ্গায় পুড়ে গেছে। তখন প্রাণভয়ে সে এক মেসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। সেখানে কথায় কথায় এ জেলার কয়েকটি ছেলের পরিচয় সে পায়, তার মধ্যে সাদেক সেখও একজন। সে একদিন সন্ধ্যায় তার কলেজে গিয়ে আর ফেরেনি।

'সে হয়তো অন্য জায়গায় আছে'।

'তা হবের পারে'। আল মাহ্মুদ এ সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

এরফান বললো, 'বড়োভাই, এখন তাড়াতাড়ি হাঁটে গেলে এগারোটার ট্রেন পাবো দিঘায়। এক কথা কয়ে যাই, আল মাহ্মুদের উপরে চোখ রাখবা আর কোনো অধর্ম করবা না। বিপদে পড়ে যাতেছি, এখন খোদাকে নারাজ করবা না। মনে রাখো, মজিদে না আলেও আদমজাদমাত্রই খোদার'।

এরফান বাড়িতে ঢুকে কিছু টাকা নিয়ে দিঘার দিকে পড়িমরি করে ছুটলো।

আল মাহ্মুদের উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হলো। কাব্যের সততা রক্ষা করে বলা যায় না খবরটা কতটুকু জেনে এসে সে এ গ্রামে হাহাকারটা ছড়িয়ে দিলো। তার চরিত্র যতটুকু উদ্ঘাটিত তাতে কোনো কিছু অনিবার্যভাবে গ্রহণ করা যায় না। এমনও হতে পারে জুতোওয়ালা তাকে মিথ্যা করে বানিয়ে গল্পটা

বলেছিলো। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে একটি বদ্ধমূল হীনমন্যতা থেকে উপজাত বিদ্বেষ তার দুঃখবোধটাকে প্রচারের মতো শোকে রূপান্তরিত করেছিলো।

সে যা-ই হোক আলেফ নিরুদ্ধ কণ্ঠে 'সাদেক সাদেক' বলতে বলতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তার স্ত্রী আগেই খবর পেয়ে বিছানায় মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছিলো। কথাটা চরণকাশির সর্বত্র রাষ্ট্র হলো এইভাবে, আলেফ সেখের ছেলেকে হিন্দু আর শিখরা একা পেয়ে হত্যা করেছে। বাকিটুকু করলো আল মাহ্‌মুদ।

একদিন হাজিসাহেব গোরুগাড়ি করে সান্যালমশাইয়ের কাছারিতে উপস্থিত হলেন।

'সান্যালকর্তা, কও, তুমি নাকি সব মসজিদ ভাঙো? সব মুসলমান কাটে পদ্মায় ভাসাও? কেন, তা করো কেন্? কাটো আগে আমার এই মাথা। দেখি কত বড়ো বীর হইছে আমার সেই হাতে-ধরে-শিখানো ছাওয়াল'।

সান্যালমশাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'এখন কী করবা'? হাজিসাহেব এগিয়ে গিয়ে সান্যালমশাইকে স্পর্শ করলেন।

সান্যালমশাই বললেন, 'মুশকিল এই, আপনার আর লাঠি ধরার শক্তি নেই। তা থাকলে আমি কলকাতার নবাবদের পরোয়া করতাম না। আপনি কয়েকটি দিন গোরুগাড়ি করে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ান'।

'আর কী করবো'?

'আল মাহ্‌মুদ বলে এক ছোকরা এসেছে এ গ্রামে'।

'তা আসুক। শয়তান কাটে লাভ নাই, আরও শয়তান জন্মায়'।

এরপরে অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে হাজিসাহেব পরামর্শ দিলেন, 'শহরের আগুন এ। সেখানে তাপ কম্‌লি এখানে নিবে যাবি। কেবল বুদ্ধি করে এড়ায়ে এড়ায়ে যাও। তোমাক আর কী কবো, বুদ্ধি ঠাণ্ডা রাখো। তোমার হিঁদু মুসলমান প্রজা বাঁচবি। তুমি কি একা পারো কলকাতার নবাবেক জব্দ করবের? আমি একেবারে অথর্ব'।

মানুষের অদ্ভুত আচরণগুলি লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। সাধারণত মানুষ একা একা ভয় পায়, দলে থাকলে নির্ভয় হতে পারে। কিন্তু বিপরীতটাই ঘটতে লাগলো। একটি হিন্দুর সঙ্গে পথে একটি মুসলমানের দেখা হলে আলাপ না জমলেও তারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু পাঁচজন হিন্দুর সঙ্গে পাঁচজন মুসলমানের দেখা হলে সকলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে, হিংস্রতাও জেগে ওঠে মনের মধ্যে। খেতে গেলে পাছে একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এইজন্যই যেন মাঠে যাচ্ছে না চাষীরা। হাট বসছে না। মানুষের মনের সঙ্গে সমপর্যায়ে আসবার জন্য বছরের এ সময়টাও যেন রুক্ষ হয়ে উঠলো। আবার যেন একটি মহা অমঙ্গল গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। গাছের পাতাগুলোর উপরেও ধুলোর একটা স্তর জমেছে, যেমন মলিন হয়েছে মানুষের মুখ।

সান্যালমশাই দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি তাঁর প্রাসাদের ছাদে পায়চারি করে কাটাতে লাগলেন। একটিমাত্র চিন্তা তাঁর, কলকাতার রাজনীতির এই প্লাবন যা তাঁর গ্রামকে বেষ্টন করে থৈথৈ করছে সেটা যদি তাঁর গ্রামের উপরে ভেঙে পড়ে কী করে তিনি সে ধ্বংসকে কাটিয়ে উঠবেন। কখনো তাঁর মনে হয় রাষ্ট্রশক্তি যদি অসতের সহায়তা করে তবে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। তাঁর অস্থির পদচারণায় অলিন্দগুলিতে প্রতিধ্বনি ওঠে। কিন্তু প্রায় পরমুহূর্তে মনে পড়ে যায় প্রাচীন ভুঁইয়াদের মতো নবাবী আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। মনের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে তিনি তেমন কোনো ভালোবাসার সাক্ষাৎও পান না। প্রজাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রীতি দিতে গিয়ে কুণ্ঠিত হন তিনি। তাঁর অনুভব হয়, তেমন

কেউ কি নেই যে অপরিমিত শক্তি, অনির্বাণ ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে রাজনীতির এই অন্ধ ভবিষ্যতে! নিজেকে পরাজিত মনে হয় এবং তা হতে হতে তাঁর সমগ্র চেতনা কঠিন হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভুঁইয়াদের মতো প্রতিজ্ঞা করেন শেষবারের মতো এই দুর্গেই দাঁড়াতে হবে—যা হয় হোক। যা হয় হোক।

পাঁচদিন পরে এরফান শহর থেকে ফিরলো। এ কয়দিনের পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা ও শোকে সে যেন অন্য আর এক মানুষ হয়ে গেছে। আলেফের অবস্থাও তার চাইতে ভালো নয়। খবর পেয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরুলো তার চোখ দুটি লাল টকটক করছে, সে চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে জ্বরবিকারের কথা মনে পড়ে যায়। ভাইকে একা একা ফিরতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইলো না। এরফান এতক্ষণ তার শোককে ঠেকিয়ে রেখেছিলো। হু হু করে কেঁদে সে সিঁড়ির উপরে বসে পড়লো। 'বড়োভাই, তাক আনতে পারি নাই, তাক আনতে পারি নাই বড়োভাই'। আলেফ কী বললো বোঝা গেলো না। তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

কিন্তু সহসা আলেফর তীব্র চিৎকারে সম্বিৎ পেয়ে এরফানকেও চোখ তুলে চাইতে হলো। সে দেখতে পেলো তীব্রধার একটি বল্লম হাতে করে আলেফ চিৎকার করতে করতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'বড়োভাই, বড়োভাই'।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে মসজিদটার কাছে একটা গাছের শিকড়ে পা বেধে পড়ে গেলো আলেফ। এরফান যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন আলেফের কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

পাড়ার লোকরা ভিড় করে এসেছিলো। আলেফকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার সেবায় আলেফের স্ত্রীকে এবং নিজের স্ত্রীদের বসিয়ে দিয়ে এরফান বাইরে এসে দাঁড়ালো। এতক্ষণে সে যেন তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছে। যেন কিছু হয়নি এমনি স্বরে সে বললো, 'একজন চিকন্দিতে গিরীশ ডাক্তারেক খবর দিবা? তা যদি সাহস না পাও সান্যালমশাইয়ের কাছে যাও, আমার মিনতি কয়ো, কয়ো ডাক্তারেক যেন পাঠায়ে দেন'।

একটি ছেলে সাহসে ভর করে রওনা দিলো।

'কে তুমি'?

'জে, ইজু। বুধেডাঙার ইয়াজ সান্দার'।

'যাও বাবা, যাও। আল্লা তোমার উপর খুশি হবি'।

ইয়াজ চলে গেলে সমবেত গ্রামবাসীর দিকে ফিরে এরফান বললো, 'আমার ছাওয়াল আমার বড়োভাইয়ের ছাওয়াল মারামারি করে যায় নাই। সে ডাক্তার হবের গিছিলো তাই রাস্তার থিকে জখ্‌মি-লোক কুড়ায়ে আনবের গিয়ে মারা গেছে। সে যে—'

এরফান এই পর্যন্ত বলে আবার হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বহুদর্শী হাজিসাহেব যা বলেছিলেন ব্যাপারটা তেমনি হলো। কলকাতার দাহ শেষ হতেই এদিকেও আগুন নিবে এলো।

ইতিমধ্যে বিলমহলের সর্দার এরশাদ একদিন গিয়ে আল মাহ্‌মুদকে বলে এসেছে, 'মেঞাভাই, শহরের ভদ্রলোক শহরে যাও। এখানে বেশি কথা কয়ো না। ভদ্রলোকের সঙ্গে মারপিঠ করো গা'।

'তোমরা কী'?

'যা-ই হই। জমিদারের হুকুম হলে হিঁদু কাটবের পারি, মোসলমানও কাটবের পারি। আমার নাম এরশাদ, তা মনে রাখো'।

প্রকৃতির দিকে চেয়ে রুক্ষতাটাই চোখে পড়ে। গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বুধেডাঙার দিকে পদ্মার তীরভুক্ত জমিগুলির দিকে চেয়ে দেখলে কষ্ট হয়। ধুলোর ঝড় উঠে পড়ে দুপুরবেলা। বিকেলের দিকে মনে হয় তামাটে রঙের আকাশে সেই ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে। মনে হবে, খুব দূরে আকাশ ও মাটির মধ্যে একটা বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীর সব সরসতা ধুলোর আকারে সরসর করে উঠে যাচ্ছে। খেতের আউস ধুলোয় ঢাকা। আমনের জমি ঘাসে ডুবে যাচ্ছে। ফসল কোনোদিন হবে এমন ভরসাও নেই।

একদিন বিকেলে ছিদাম সাহস করে বুধেডাঙায় গিয়েছিলো। বিলমহলের এরশাদ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। পাঁচ-ছয়জন বাছাবাছা লোকের পরামর্শ হবে।

সান্যালদের বাগানের মধ্যে দিয়ে ছিদাম দাদপুরী কৈবর্তদের নতুন পাড়ায় উপস্থিত হলো। মুকুন্দর সঙ্গে ইতিপূর্বে তার আলাপ হয়েছিলো। সে মুকুন্দর দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'যাওয়া হবি নে'?

'না। অগ্নিদাদা আর রাবণ যাবি। তারা গেছে বোধায়'।

ছিদাম আরও কিছু এগিয়ে বিলমহলের পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলো—'এরশাদদাদা'?

'আসো, ভাই, আসো'।

ছিদাম দেখলো এরশাদের ঘরের বারান্দায় পাঁচ-ছয়জন লোক জমেছে।

এরশাদ বললো, 'কী করা এখন, কও। জমির দিকে না চায়ে উপায় কী'?

'চাতে হবি'।

ইয়াজ বললো, 'জলবৃষ্টি নাই। খেত হবি কেন্? তা এরশাদচাচা, এখন কী করা লাগে'?

'হাল-বলদ ঠিকঠাক করা লাগে। জমিদারের লোক ডাকে আনে পতিকের জমির আল ঠিক করে নেওয়া লাগে। সকলেই কঞ্চি গাড়ে দখল নিছো'। এরা যখন কথা বলছিলো তখন মাঝেমাঝে ধুলোর ঝাপটা এসে এদের গায়ে লাগছিলো। একবার রাবণ কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই তার উন্মুক্ত মুখে কিছু ধুলো ঢুকে গেলো। অন্য সকলের চোখে-মুখেও কিছু বর্ষিত হলো।

এরশাদ বললো, 'চলেন, ঘরে বসি। জলের দেখা নাই, ঝড়ের দেখা নাই, কেবল ধুলোর ফক্কুড়ি'।

এদের আলাপ-আলোচনার মাঝেমাঝে দূরের কলরবের মতো, কখনো বা আর্তনাদের মতো একটা চাপা শব্দ কানে আসছিলো।

একজন বললো, 'নিকম্মার সাট্‌পাট্ বেশি। ধুলায় দুনিয়া পয়মাল'।

'বুঝলা না,' আর একজন হেসে বললো, 'যে কামড়ায় সে ভোকে না। ঝড় হবের হলে এতকাল এমন ধুলা ওড়ে না'।

'কথাটা আকাশেক শুনায়ে দেন'। ছিদাম বললো।

কিন্তু এর কিছুদিন পরে এক বিকেলে ধুলো থেকে নাকমুখ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছিদাম বুধেডাঙা থেকে দ্রুতপদে ফিরে আসছিলো। সে ভাবছিলো : এরশাদ তার জমায়েতের ব্যাপারে তাহলে সান্যালমশাইয়ের হুকুমে কাজ করেছে। যে-কাজটা দুদিন পরে হলেও চলতে পারে সেটাকে এখনি করা দরকার বলে চোখের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে।

কে একজন তার পাশ থেকে বললো, 'হাঁটো যে'?

'কেন্, দৌড়াবো? ভয় কী'?

'আকাশ দেখছো'?

ছিদাম আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেলো। পড়ন্তবেলায় আকাশ চিরদিনই অভিনব মূর্তি ধারণ করে কিন্তু সবুজ কালোয় মেশানো এমন রং কদাচিৎ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে আকাশে মন্থন হচ্ছে। এতদিন ধরে আকাশ যে ধুলো সংগ্রহ করেছিলো সেগুলি যেন পদ্মার বুকে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে।

গোঁ-গোঁ করে একটা শব্দ আগেও হচ্ছিলো। তখন ছিদাম সেটা গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার উপায় নেই। একটা ধুলোর ঝাপটা এসে ছিদামকে যেন ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিলো।

ছিদাম শব্দটা সহসা শুনতে পেয়েছিলো। হুড়মুড় দুমদাম প্রভৃতি অনুকার অব্যয় দিয়ে সে শব্দটাকে ধরা যায় না। মনে হলো, একসঙ্গে পৃথিবীর যত ঘরদোর সব ভেঙে পড়লো। খুব কাছেই কার বাড়ির খড়ের চালের একটা মস্ত বড়ো অংশ উড়ে গিয়ে একটা বড়ো আমগাছে লাগলো। আমগাছটার মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়লো। ছিদাম দাঁড়িয়ে পড়লো। সম্মুখে সান্যালমশাইয়ের বাগান, প্রাচীন গাছে পরিপূর্ণ। একটা ডাল ভেঙে পড়লে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সপাৎ করে কে যেন তার বাঁ হাতের উপরে চাবুক মারলো। আঘাতটা এমন যে সে আর্তনাদ করলেই স্বাভাবিক হতো। ছিদাম দেখলো একটা আমের পল্লব এসে পড়েছে তার গায়ে। তরঙ্গের উপরে তরঙ্গে শোঁ-শোঁ শব্দটা ভেসে আসছে। চোখে কিছু দেখা যায় না। আন্দাজে সান্যালবাগানের পাশ দিয়ে গ্রামে যাওয়ার রাস্তা ধরে ছুটলো সে, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থামলো। সে পথের দুপাশে বাঁশঝাড়। এখন সে পথে মোটা মোটা বাঁশগুলি ঝাঁটার মতো মাটিতে লুটোপুটি করছে। যাওয়া মানে প্রথম আঘাতেই মৃত্যু। ছিদাম নিজের পাড়ায় যাওয়ার ঘোরাপথটা ধরলো। চড়বড় করে শব্দ হচ্ছিলো। এবার কড়কড় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফেটে ফেটে তার দাহটাও প্রকাশ পেতে লাগলো।

বৃষ্টি-শিলা। বাতাসের জোর কমেছে। শিলাগুলি গায়ে পড়ে ব্যথা লাগছে কিন্তু তবু প্রাণে আশ্বাস এলো। জলের এই তোড় ঠেলে বাতাস এগোতে পারবে না।

পথ পিছল হয়ে গেছে। দু-একবার পড়ে গিয়ে কাপড়চোপড় ও গায়ে কাদা মেখে গেলো ছিদামের। ইচ্ছা করলে সে এখন পাশের কোনো বাড়িতে দাঁড়াতে পারতো কিন্তু এতক্ষণ ঝড়ের নিশ্বাস নিয়ে তার প্রাণেও দুর্দম্য পুলকের নেশা লেগেছে।

বাড়িতে পৌঁছে বারান্দার উপরে উঠে সে দেখলো পদ্ম একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ঝাপটায় তার সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। ছিদাম তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দু হাত বাড়িয়ে সে ছিদামকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তার কান্নাটাও প্রকাশ পেলো।

'বাব্বা, কী ঝড়'!

'হয়, রান্নাঘরের চাল উড়ে গেছে'।

'বাবা গেছে কতি'?

'মুঙ্‌লাদের বাড়ি'।

'তুমি কাঁদো কেন্'?

'কোথায় কাঁদি'? পদ্ম চোখ মোছার চেষ্টাও করলো না।

ভাদ্রের শেষে এই আশ্বিনমুখো ঝড় চলে গেলো একখণ্ড বর্ষা রেখে দিয়ে। আউসের ফলন্ত শীষের ধুলো ধুয়ে দিয়ে ম্লান মানুষগুলিকে ভিজিয়ে দিয়ে ঢল্ মারতে মারতে আমনের দলো জমিগুলিতে এক-আধ হাত পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে গেলো—পদ্মারঙের জল।

পরদিন সকালে ছিদাম এরশাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। কাত-হয়ে-পড়া চালের তলা থেকে এরশাদের একমুখ দাড়ি আর একগাল হাসি দেখা দিলো।

'কেমন এরশাদদাদা'?

'আগায়ে দ্যাখো জসিমুদ্দিন আর মুকুন্দর কাজিয়া কতদূর। জসিম কয়—আমার বেড়া ফিরায়ে দেও, মুকুন্দ কয়—তোমার বেড়া আমার ঘরের চাল ভাঙছে, তার খেসারত কে দেয়'?

'এখন করা কী'?

'রাঁধে খায়ে বিলে যাবো। মনটা ভালো নাই। ছাওয়াল বউ রাখে আসছি। ছাওয়ালের আবার ডোঙা নিয়ে বিলে মাছ ধরা বাতিক। ঝড় গেলো, মনে শান্তি নাই, ভাই'।

'ফিরে আসেও তো কিছু করা লাগবি'?

'হয়, এত জল। মনে কয় কিছু হেঁউতি ছিটালে হয়, নইলে জন্ন তো বেরথা'।

কিন্তু কিছু লোকের মনে দাগ রেখে গেলো এই সাম্প্রদায়িক ভীতি এবং তজ্জনিত বিদ্বেষ। সদানন্দর স্কুলের চারজন শিক্ষক ছুটি থেকে ফিরলো না। কর্মত্যাগের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে তারা।

সান্যালমশাইয়ের সেই সুমিত-প্রাসাদের কনট্রাক্টারও যেন ফিরছে না। তার খোঁজে লোক পাঠাতে হলো সদরে।

৩১

রামচন্দ্র মামলার নাম করে সদরে গিয়েছিলো। সে যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে সে লক্ষ করলো ভানুমতি গুনগুন করে গান করছে। ঘর্ঘর করে একটা জাঁতার শব্দও উঠছে। ভিতরের বারান্দায় এসে সে দেখতে পেলো ভানুমতি গান করতে করতে ডাল ভাঙছে। রান্নাঘরে রান্নার শব্দ হচ্ছে।

ভানুমতি তাড়াতাড়ি উঠে এসে দাঁড়ালো কাছে, বললো, 'আমার জন্যি কী আনছেন, বাবা'?

'আনছি, আনছি'। রামচন্দ্র তার গামছার পুঁটুলি খুলে একখানা রঙিন শাড়ি বার করলো।

কেউ কেউ আছে যারা গ্রহণ করার আন্তরিকতায় যে কোনো দানকে মহার্ঘ করে দিতে পারে। এ বিষয়ে ভানুমতির নাম করা যায়। রামচন্দ্রর মনে হলো সার্থক হয়েছে বাড়ি ফেরা।

স্ত্রী সনকা এলো। ভানুমতি গেলো হাত-পা ধোবার জল আনতে।

রামচন্দ্র বললো, 'তোমার জন্যও একটু আনছি'।

'চুপ করো, মিয়ে শুনবি'। বলে সনকা শাড়িখানা হাতে নিয়ে গলা নিচু করে বললো, 'এ যে বাবু-কাপড়'।

'হোক তা'।

কিন্তু আসল কথা রামচন্দ্র ভাঙলো খেতে বসে। সে ভানুমতিকে বললো, 'একদিন তুমি কইছিলে জমিজমা লিখে-পড়ে দিলে তাড়ায়ে দেয়'।

'তা দেয়'।

'তাই বলে লেখাপড়া না করলিও তো মানুষের চলে না। এমন লেখা লিখছি যাতে তাড়ায়ে দিবেরও পারবে না, অথচ লেখাও ষোলো আনা হইছে'।

'তুমি এইসে এজন্যি সদরে গিছলা'? বললো সনকা।

'ভালো কাজ চুপেচাপে করতি হয়। কাগজখান দিবো, যত্ন করে রাখবা। এর নাম উইল। পোকায় যেন না কাটে, জলে যেন না ভেজে'।

উইলের তাৎপর্য না বুঝলেও সনকা এবং ভানুমতি রামচন্দ্রর আনন্দের অংশ গ্রহণ করলো।

রামচন্দ্র বললো, 'বুঝলা না, ভানু, আমাক তাড়ায়ে দেওয়া দূরের কথা, যতদিন বাঁচে আছি আমার কাছেই তোমাদের থাকা লাগবি, তবে পাবা সম্পত্তি। উকিল লিখবের জন্যি বিশ টাকা নিছে'।

রামচন্দ্র সদর থেকে যেসব জিনিস এনেছিলো তার মধ্যে একখানা নতুন মহাভারত ছিলো। পরদিন সন্ধ্যার আগে বইখানা নিয়ে রামচন্দ্র কেষ্টদাসের বাড়িতে গেলো।

বই দেখেই কেষ্টদাস আনন্দিত হয়েছিলো, সে যখন শুনলো বইখানা তার ব্যবহারের জন্যই এনেছে তখন সে কী করবে খুঁজে পেলো না।

অপ্রতিভের মতো মুখ করে সে বললো, 'পড়বো'?

'আপনাব ইচ্ছা হয় পড়েন'।

'তার চায়ে আপনের কথা কন, শুনি'।

রামচন্দ্রও নিজের কৌশলটুকু বর্ণনা করার জন্য উন্মুখ ছিলো। সে তার জমি জিরাত কী করে উইল করেছে, কী করে সেই কাগজের প্যাঁচে মুঙ্‌লা এবং ভান্‌মতিকে জড়িয়ে ফেলেছে, তার এই অল্পবয়সী উকিলের কত বুদ্ধি, কীরকম হেসে হেসে সে কথা বলে, সদরে কাপড় চোপড়ের আজকাল কত দাম, এসব বর্ণনা করে অবশেষে বললো, 'কন্, এখন ওরা আপন হলো কিনা'?

৩২

সেদিন রামচন্দ্র বিদায় নিলে শ্রীকৃষ্ট ভাবলো তার উইল করার কিছু নেই। এই কথা চিন্তা করতে করতে যেটা নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তির উন্মেষ সেটা অর্থযুক্ত হয়ে উঠলো। সে চিন্তা করলো, তাব যেটুকু সহায়-সম্বল আছে তার কোনো ব্যবস্থা না করলে তার মৃত্যুর পর পদ্মর দুর্গতি হওয়াই সম্ভব। ছিদাম খুব নির্দয় নয়, পদ্মর সঙ্গে বর্তমানে তাব অত্যন্ত সদ্ভাবও আছে বটে, কিন্তু একসময়ে তার বিবাহ হবে, এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে পদ্মব বনিবনাও না-ও হতে পারে। একথা চিন্তা করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়, পদ্ম—গত পাঁচ-ছ বৎসরে যার নিরন্তর পরিশ্রমে বাড়িটা বাড়ির মতো হয়েছে—তার কিছুমাত্র দাবি নেই সমাজের এবং আইনের চোখে।

একদিন পদ্ম যখন রান্না করছিলো, কেষ্টদাস নিজে থেকে পদ্মর জন্য পান সেজে এনে দিলো। রান্নার দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'পদ্ম, অভাগার সংসারে আসে কত কষ্টই করলা, কত দুঃখই পালা'।

'সংসারে সুখ আর কোনখানে'?

'এমন বদ্ধ খাঁচায় আবদ্ধ থাকলা'?

পদ্ম একটু দ্বিধা করলো যেন, তারপবে বললো, 'মিয়েমানুষ আকাশে আকাশে উড়সে, ব্যাধেব ফান্দে পড়া লাগে'।

'এখানেও ধরো যে কীসের টান তোমার? ফান্দের দড়ি যতি কেউ পাতে'?

উত্তর যেন প্রস্তুতই ছিলো। পদ্ম হাসি হাসি মুখে বললো, 'সে ফাঁদ যতি পাতেও, ধরা দেওয়া না-দেওয়া পক্ষীর ইচ্ছায় হবি'।

পদ্মর উদ্দেশ্য ছিলো কেষ্টদাসকে অহেতুক ভয় থেকে নিরস্ত করা কিন্তু কথাটা শেষ হয়ে গেলে কেষ্টদাস অনুভব করলো, এমন খাঁটি কথাও আর নেই। একটা পরিচয়ের আড়াল দরকার ছিলো পদ্মর, কেষ্টদাস সেই পরিচয়মাত্র। নতুবা যদি সে অন্য কোথাও বন্ধনে পড়তে চায় এদিকের কোনো আকর্ষণেই সেই বন্ধন তার কাছে পীড়াদায়ক হবে না।

কেষ্টদাস তখনকার মতো উঠে পড়লো। তার তো সম্পত্তি নেই রামচন্দ্রর মতো, যে তারই টানে পরও আপন হবে।

প্রথম দিকের একটি নিঃশব্দ দ্বন্দ্বের কথা মনে পড়ে গেলো কেষ্টদাসের। একটা নতুন মৃদঙ্গ জোগাড় করেছিলো সে। পদ্ম গান করে না, কিন্তু সুকণ্ঠী। নতুন মৃদঙ্গ আনার পর কেষ্টদাস একদা মাথুরের দু-এক পদ তার সুরহীন গলায় করুণ করে গেয়ে বৈষ্ণবীর গলায় সুর ফোটাতে চেষ্টা করেছিলো। পদ্ম হেসে লুটোপুটি—'অমন করে গায়ো না, কান্না পায়'।

'তা পাওয়া লাগে। ভাবো তো শ্রীমতীর সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় গড়াগড়ি যাতেছে'।

'তা যাক। তুমি তো শ্রীমতী না'।

কেষ্টদাস ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলো।

এরপর যতদিন কেষ্টদাস সুস্থ ছিলো শ্যালিকাস্থানীয়া আত্মীয়া হিসাবে সে কখনো কখনো রসিকতা করেছে। তার প্রত্যুত্তরে মধুরতর রসিকতাও পেয়েছে, কিন্তু প্রেম কিছুমাত্র জন্মায়নি।

পদ্ম রাঁধে বড়ো ভালো।

পদ্ম তার সেবাও করে। বাদ্‌লাতে তার অসুখের বৃদ্ধি হয়। পুরনো ঘিয়ের বাটি হাতে করে পদ্ম সেদিন তার শয্যার পাশে এসে বসে। নিজের রোগজীর্ণ পাঁজরার উপরে পদ্মর স্বাস্থ্যপুষ্ট হাতখানি সে অনুভব করে। হয়তো-বা পদ্মর মুখ অন্যদিকে ঘোরানো থাকে কিন্তু পানরাঙা তার ঠোঁট দুটি কেষ্টদাসের চোখে পড়ে।

কতগুলি ঘটনা আছে যার আকস্মিকতা বজ্রের মতো ফেটে পড়ে নিজেকে প্রচারিত করে, আর কতগুলি আছে যা পদ্মার জলের মতো নীরবে অগ্রসর হতে হতে আচম্বিতে সমস্ত গ্রাম ধসিয়ে দেয়, কখনো সমস্ত গ্রাম প্লাবনে মুছে দেয়। মনে দৈনন্দিন চিত্রগুলির ছাপ পড়ছে, অস্পষ্ট হয়েও যাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ একটি দিনে মনোযোগের সন্ধানী আলো পড়তেই সেই অস্পষ্ট অতীতের ছবিগুলিও ফটোর মতো কিংবা তার চাইতেও অর্থগুরু চিত্রের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পদ্মকে কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত তার শ্রমের, একটু প্রিয়-সাধন করা উচিত, এই চিন্তা কেষ্টদাসকে পদ্মর দিকে আগ্রহশীল করলো। তার সংসার-উদাসীন মন সংসারের দিকে ফিরলো।

ছিদামের চড়া গলার শব্দে এক সকালে ঘুম ভেঙে গেলো কেষ্টদাসের। বাইরে এসে সে দেখতে পেলো উঠোনের একপ্রান্তে পদ্ম ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর ছিদাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করছে।

ছিদাম বললো, 'কইছিলাম বলদেক বাঁশপাতা আনে খাওয়ায়ো। তা মনে ছিলো না, এখন বলদ নড়বের চায় না। চায় দিবো কি নিজে জোয়ালে লাগে'?

ছিদাম গজগজ করতে করতে অসুস্থ বলদ দুটিকে বেঁধে রেখে ছোটো উঠোনটুকু পার হয়ে পাশের জঙ্গলাকীর্ণ একটা ভিটার দিকে চলে গেলো। দশ-পনেরো মিনিট বাদে যখন সে ফিরে এলো তখন তার মুখের ভাব বদলে গেছে। কিন্তু পুরুষমানুষ তো বটে। রাগটা পড়ে গেলেও সোজাসুজি পদ্মর দিকে না গিয়ে দাওয়ায় উঠে বসলো। অনেকটা সময় বসে থেকেও যখন প্রত্যাশিত খোশামোদটুকু পেলো না তখন অবশ্য তাকেই প্রথম কথা বলতে হলো, 'বাঁশের পাতা না আনে পতিত ভিটায় জমি কোদলাইছো, তা কলি কি হতো'?

পদ্ম উত্তর দিলো না।

'তা ভালোই করছো। দেবোনে দু-পয়সার চুয়া আনে। এখন পান্তা দিবা কিনা কও'

'পান্তা যে খাবা, নুন আছে না তেল'?

'তার এখন কী জানি আমি। কাল সাঁঝবেলায় কতি পাবো নাই'?

'কালও তো অকারণ রাগবের লাগলে। আমি তোমার কী অন্যায় করছি'।

ছিদাম অভুক্ত অবস্থায় দমদম করে বেরিয়ে গেলো।

তখন পদ্ম খানিকটা সময় আপন মনে বকবক করলো, তারপর রান্নার চালাটার আগড় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে বন্ধ করে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। সে রাঁধলো না। কেষ্টদাসের জন্য কিছু ফলাহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে শরীর ভালো নেই বলে ঘরে এসে শুয়ে রইলো।

সন্ধ্যায় ছিদাম বাড়ি ফিরলে পদ্ম কথা না বলে হাত-মুখ ধোবার জন্য এক ঘটি জল এগিয়ে দিলো।

ছিদাম হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গেলে পদ্ম ভাত বেড়ে দিয়ে উনুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো।

কলাইয়ের ডাল আর ডুমুরের তরকারি দিয়ে গরম গরম ভাত খেতে খেতে ছিদাম পুলকিত হয়ে উঠলো। পেট ভরে ভাত খেয়ে উঠে রহস্য করেও বাঁকা কথা বলার মতো মন রইলো না তার। সে

উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'সারাদিন যে জলও খাও নাই তা বুঝছি। খায়ে নেও, আমি আসতিছি, এক বুদ্ধি আছে'।

তামাক খেয়ে ছিদাম যখন ফিরে এলো তখনো পদ্মর খাওয়া হয়নি। কেষ্টদাস খেতে বসেছে। ছিদামের আর দেরি সহ্য হচ্ছিলো না। সে বললো, 'বাবার পুঁথি পড়া কুপিটা চুরি করবের হবি, বুঝলা না। তুমি আলো ধবে দাঁড়াবা, আমি শাকের বীজ ছড়ায়ে দিবো। কথা কও'।

পদ্ম কথা না বলে ঘরের কাজগুলি শেষ করতে লাগলো।

কেষ্টদাস আজ সমস্তটা দিন এদের কলহের গতি লক্ষ্য করেছে। খানিকটা তার কানে এসেছে, খানিকটা সে কান পেতে ধরেছে। শেষের দিকে শুনবার জন্য সে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তার মনে পড়ে গেলো যখন নিজে সে চাষী ছিলো তখন তার প্রথমা বৈষ্ণবীর সঙ্গে এমনি কলহ হতো। রাত্রিতে তার মনে হলো, হয়তো পদ্ম সারাদিনে কিছু খায়নি। বাড়ির কর্তা হিসাবে এ-বিষয়ে তার কি করণীয় কিছু নেই ? কিন্তু কী একটা সংকোচ তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখলো। বরং অহেতুকভাবে তার সেই দিনটির কথা মনে পড়লো যেদিন সে ছিদাম-পদ্মদের মাঠের গাছতলায় আবিষ্কার করেছিলো।

এক রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো। কী একটা শুনবার, কী একটা জানবার আগ্রহ যেন তার। সে দেখলো বৈষ্ণবীর বিছানা খালি পড়ে আছে, বারান্দায় ছিদামের মাদুরও খালি। তার মনে হলো এরকম ঘটনা তার জীবনেও ঘটেছে। দ্বিতীয়া বৈষ্ণবী অত্যন্ত কোপনস্বভাবা ছিলো। রাগ করে সে ঘরে আসেনি, এমন একটি রাত্রিতে সে আর তার বৈষ্ণবী রাগারাগির ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য গ্রামের অন্ধকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলো।

সে দেখতে পেলো বারান্দার নিচে বসে ছিদাম একটা জাল বুনছে, আর তার অনতিদূরে পদ্ম উদুখলে কী একটা চূর্ণ করতে করতে গুনগুন করে গান করছে। কেষ্টদাসের মনে হলো, কাজটা এমন নয় যে এই মাঝরাতে করতে হবে। কাজের চাইতেও পরস্পরের সঙ্গ পাওয়াই যেন এর সার্থকতা। বিছানায় ফিরে সে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো—এমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেই সংসারটাকে ওরা চালাচ্ছে।

দু-একদিন পরে অতি প্রত্যুষে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে লক্ষ্য করলো ছিদাম গোয়ালের পাশে লাঙল সাজাচ্ছে। চৈতন্য সাহার কাছে ঋণ নিয়ে ছিদাম একজোড়া রোগা রোগা বুড়োটে বলদ কিনেছে। বলদ জোড়ার কাঁধে জোয়াল তুলে দিয়ে পদ্ম ঘর থেকে ছিদামের মাথাল, হুঁকো-তামাকের থলি প্রভৃতি নিয়ে এলো। পদ্মর পরনে আজও একটি পরিচ্ছন্ন রঙিন শাড়ি। তার শাড়ি পরার ধরনটাতেও বৈশিষ্ট্য আছে—দুখানা হাত, একটা কাঁধ, হাঁটুর কিছু নিচে থেকে পায়ের পাতা অবধি অনাবৃত। এমন স্বাস্থ্য না হলে এমন মানায় না। পদ্ম কখনো মাথায় কাপড় দেয় না। শ্রীকৃষ্ট লক্ষ্য করলো পদ্মর চুলগুলিও চকচক করছে। এত সকালেই তার স্নান হয়ে গেছে। দ্রুত অভ্যস্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তারা কাজ করে যাচ্ছে এবং অনুচ্চ গলায় অনর্গলি কথাও বলছে। ছিদাম যখন পা বাড়াবে তখন পদ্ম এসে মাথালটা তার মাথায় বসিয়ে দিলো। হুঁকোর থলেটা তুলে দিলো হাতে।

ছিদাম চলে গেলে পদ্ম উঠে এলো কেষ্টদাসের কাছে।

'এত সকালে যে উঠছো'?

'এমনি। মনে হলো এমন সাজায়ে যতি দিতা আমিও একটু চাষবাস করতাম'।

পদ্ম হাসলো। সে বললো, 'হাত মুখ ধুয়ে আসো গা, খাবের দেই। চালভাজা গুঁড়া করে কাল মোয়া বাঁধে রাখছি'।

কেষ্টদাস একটি বাধ্য ছেলের মতো গেলো। কিন্তু কোনো এক অনির্দিষ্ট অসার্থকতায় তার মন সংকীর্ণ হয়ে রইলো। পদ্মর স্বাস্থ্য ও ছেলের যৌবনের পাশে তার রোগ ও বার্ধক্যজীর্ণ দেহ বারংবার তুলনার মতো মনে ফুটে উঠতে লাগলো।

কিছুদিন পরে কেষ্টদাস হাটে গিয়েছিলো। দীর্ঘদিন সে এ পথে চলেনি। হাটে পৌঁছে সে বুঝতে

পারলো সংসারের জন্য কী কিনতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার নেই এখন। তারপর তার মনে হলো ছিদাম এ হাট থেকে সওদা করে না, বুধবারের হাটেই তার কেনাকাটা করে। তখন কেষ্টদাস দু পয়সার পান, পয়সা চারেকের চুয়া, যা প্রয়োজনের নয় এমন এক-গাছি চুল বাঁধবার ফিতে কিনে খুশি খুশি মুখে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে সে থেমে দাঁড়ালো। শোবার ঘর থেকে ছিদাম আর পদ্মর হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের রাগারাগির সময়ে যেমন একটি কৌতূহল তাকে আবিষ্ট করেছিলো, এখন তেমনি একটি সংকোচ তাকে আচ্ছন্ন করলো। আকস্মিকভাবে তার অনুভব হলো, তার এই হাটে যাওয়ার ব্যাপার নিয়েই তারা হাসাহাসি করছে। তার মনে পড়লো না, তার পান চুয়া কিংবা চুলের ফিতে কেনার সংবাদ কারো জানার কথা নয়। সে পায়ে পায়ে ফিরে গিয়ে রাস্তার ধারের তিন্তিল গাছটার নিচে গাঢ় অন্ধকারে একটি ক্লান্ত বৃদ্ধ পথ-হারানো বলদের মতো ধুঁকতে লাগলো।

অনেক দুঃখে, অনেক আঘাতে আহত হয়ে এই কুঁড়েগুলির আশ্রয়ে সে পড়ে থেকেছে, সেই অভ্যাসেই যেন তার পা দুটি তাকে বহন করে নিয়ে এলো তার ঘরের দরজায়, তারপর ঘরের ভিতরে বিছানার কাছে। রাতটা তার জেগে জেগে কেটে গেলো।

দিন দশ-পনেরোর ব্যবধানে সে দর্শনের সাহায্যে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করলো। রাধা কি কখনো কিশোরের সান্নিধ্যে না হেসে পারে? দ্যাখো তো ওদের? অন্য অনেক জোড়া মানুষের কথা মনে হয় না? কিন্তু তার দর্শন ব্যর্থ হলো। সে নিজেকে ধিক্কার দিলো—ছি, ছি, নিজের ছেলের সম্বন্ধে এ কী ভাবনা! সম্বন্ধে পদ্ম মাতৃস্থানীয়া।

আর একদিন তার মনে হলো পাড়ার সব লোকের কাছে সে কেঁদে কেঁদে বলবে তার ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সম্মুখে যেন প্রতিবেশীদের ঠোঁটের চাপা হাসির দৃশ্যটা ভেসে উঠলো।

কিন্তু আনন্দের লহরের মতো ছিদাম এসে দাঁড়ায়, 'শুনছো না, বাবা, নায়েবমশাই বাড়ি হইছে। কন যে—বলদ যখন কিনছো ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ো'।

অবশেষে কেষ্টদাস স্থির করলো কৃতকর্মের ফলভোগ তাকে করতেই হবে। সহ্য করতে পারবে না সে—মহৎ মানুষরা যেমন পারে, প্রাণটাকেই বার করে দিতে হবে। কেবল হাঁটা আর হাঁটা না খাওয়া, না স্নান। নবদ্বীপ থেকে হেঁটে বৃন্দাবন। সেই ধুলোর পথে হাঁটতে হাঁটতেও যদি প্রাণ না যায় তবে বৃন্দাবন থেকে বুকে হেঁটে মথুরা। ঝোলা নয়, গোপীযন্ত্রে নাম নয়। রোদ হিম ধুলোর সাহায্যে দেহটাকে ধ্বংস করতে হবে। ছি, ছি, কী মন তার! ছেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা? কু-এ মন আচ্ছন্ন।

একদিন অতি প্রত্যুষে রামচন্দ্র দেখলো, তার দরজায় শ্রীকৃষ্ট দাঁড়িয়ে।

'কী খবর, গোঁসাই'?

কেষ্টদাস রামচন্দ্রর উপহার নতুন মহাভারতখানা তাকে ফিরিয়ে দিলো—'এটা রাখেন, ভাই'। কেষ্টদাসের চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো।

'কেন্, কী হলো'?

কেষ্টদাস একবার হাসির চেষ্টা করে বললো, 'তীর্থ করবের যাই। মনস্থির করে যদি ফিরে আসি আবার পড়বো'।

শ্রীকৃষ্ট চলে গেলো।

জমিদারেব মান রেখেছে রামচন্দ্র। ফসল খুব ভালো হবার কথা নয় তার জন্য নির্দিষ্ট জমিতে। উপর থেকে পলির গভীরতা ঠিক বোঝা যায়নি।

কিন্তু সীমানা নিয়ে কোনো গোলমালও হয়নি দখলের সময়ে। সিংহীদেব
জমির সীমায় সীমায় লাঙল ধরেছিলো রামচন্দ্র, এরশাদ, ছিদাম আর ইয়াজ—আমলাদেব ভাষায় গুলবাঘারা।

নায়েব একদিন রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠালো।

'রামচন্দ্র, ফসল প্রজাবা তিন ভাগের এক ভাগ দিক, কিন্তু সেই এক ভাগেব একটা কমপক্ষে পবিমাণ ঠিক থাকা উচিত, কী বলো'?

রামচন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'এরশাদভাই, কী কন্'?

'তা ধবেন যে থাকা উচিত। নাইলে লোভে পড়ে জমি নিলাম, চষলাম না, এমন হবি। হইছেও কিছু কিছু'। এরশাদ বললো।

নায়েব বললো, 'খাজনার পবিমাণ টাকাব ফসলটা অন্তত নিযমিত পাওয়া দরকাব'।

রামচন্দ্র বললো, 'আমি কিছুই কবো না এখন, ভাবে দেখি। আপনেব জ্ঞানবুদ্ধির লেখাজোখা নাই। আপনেও ভাবেন। সব বার সমান ফসল দেয় না জমি। তাছাড়াও মানষের জেবন—'

বিচক্ষণ নায়েব কথাটিকে তখনকার মতো সরিয়ে নিয়ে বললো, 'তামাক খাও, রামচন্দ্র'। তামাক খাওয়ার পর নায়েব বললো, 'রামচন্দ্র, তোমার কী একটা বলাব ছিলো যেন'?

'আজ না, আর একদিন কবো'। বলে রামচন্দ্র বিদায় নিলো।

নায়েবমশাই এর আগে একদিন বিস্মিত হয়েছিলো। যখন খাসজমিতে কায়েম হওয়ার আনন্দে সবাই উজ্জ্বল তখন রামচন্দ্র উইলের কথা ভুলেছিলো। আজকের রামচন্দ্রও যেন ততোধিক ক্লান্ত একজন।

পথে রামচন্দ্র ভাবলো, নায়েব কথাটাকে টেনে নিচ্ছিলো। কিন্তু প্রকাশ না কবেই ভালো কবেছে সে। রায়ত থেকে জোতদার হওয়ায় সত্যিকারেব কোনো লাভ নেই।

অবশ্য কথাটা উঠে পড়লে সে নিজের প্রস্তাবের যুক্তি হিসাবে বলতে পারতো—রায়ত থেকেই তো জোতদাব হয়, জমিদার হয়। জমির সংস্পর্শে থাকতে থাকতে তার সঙ্গে নানা প্রকারের সম্বন্ধই হতে পারে।

কিন্তু এটা উত্তর নয়। কিংবা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায়, আমরা যা কামনা করি সেটা কি সব সময়ে আমাদের চেতনাগ্রাহ্য? সেটা আমাদের নিজস্ব কামনা না হয়ে অন্যের আকাঙ্ক্ষার অনুকরণও হতে পারে। নিজের একটা বিশিষ্ট অভাববোধ আছে, তার স্বরূপ নির্ণীত হয়নি, অথচ প্রতিকাবেব দিকে অগ্রসব হচ্ছি, এমন সময়ে অন্যের কামনালব্ধ বিষয় দিয়ে নিজের অভাববোধটিকে প্রলেপিত করার ইচ্ছা হয়। জোতদারি রামচন্দ্রর উচ্চাভিলাষ নয়, বরং তার বিপরীত। রুপোর টাকার পাহারাদারি করতে, তাকে বাজারে চালু রাখতে উৎসাহ নেই ; অথচ তার মায়া ছাড়তে না পেরে কোম্পানির কাগজ করা।

এমন হতে পারে না কি মৃত্যু এবং অবসানের সূচক উইলের ব্যাপারটাই তার মনে একটা সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে? এবং সে-ব্যাপারটাও তার অজ্ঞাত?

যাই হোক, রামচন্দ্র বাড়িতে ফিরে দেখলো উঠোনে ধান মেলে দেওয়া হয়েছে। উঠোনের একপাশে বসে ধূলিধূসর ভানুমতি কুলোয় করে ধান ঝেড়ে পরিষ্কার করছে। রামচন্দ্র বললো, 'দিনরাতই কাম করিস কেন্'?

'না, বাবা, দিনরাত না'।

'দ্যাখ তো চেহারা কী করছিস ধানের ধূলায়'?

ভানমতি উঠে গিয়ে বামচন্দ্রব তামাক সেজে আনলো।

বামচন্দ্রব স্ত্রী এক এক হাঁড়ি সিদ্ধ কবা ধান রোদে মেলে দিতে এলো। ধানগুলো উঠোনে মেলে একটা বাখারি দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে সে বললো 'ধানের ধুলা পাকে লাগে না যার সে কেমন মেয়েছিলো? তোমার ভান্‌মতি কি সংসাব কববি নে'?

'কিন্তুক এ-সংসাব তো সনকাব'। বামচন্দ্র হাসিমুখে বললো।

'তা হলিও বেটাব বউ শাশুড়িব পাছে পাছে ঘুরে কামকাজ শিখে নিবি'।

সনকাও ভান্‌মতিকে ভালোবাসে। কিন্তু সে তাকে বেটা বউ বলে উল্লেখ করে। বামচন্দ্র তাকে মেয়ে হিসেবে দেখতে চায়।

অন্য আব একদিন সনকা অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললো 'শোনো, তোমাব এক কথা কই। তুমি যে আসনে বসো সেখানে ভান্‌মতিব বসা লাগে না'

বিস্মিত হয়ে বামচন্দ্র প্রশ্ন কবলো, 'কেন'?

সনকা কণ্ঠস্বরকে আবও নিচু করে বললো, 'জানবে কেন, অমঙ্গল হয় লোকে কয়। কখনো যদি মাথাব কাপড় ফ্যালে তা ফেলুক, তাই বলে এক আসনে বসা লাগে না'

'কেন্, আমাব মিয়ে থাকলি কি আমাব কাছে বসতো না'।

'সে তোমাব বক্তমাংসে তৈবি হইছিলো'।

'তা বটে। লোকে মন্দ কবি, না'?

'লোকেব কথাব ভাবি ধারি। কউক, মুণ্ডলাব বাপ মণ্ডল অন্যাই কবছে, মুণ্ডলাক শিখায়ে দিলো মাথা কাটে আর্নবি তাব'। তেজোবতী সনকা কথাটা উঁচু গলাতেই বলে ফেললো।

মেয়েব মৃত্যুর তারিখটা বামচন্দ্রর মনে আছে, কিন্তু সেটা কবে এসে পড়ে পাব হয়ে যায় তা তাব ঠিক খেয়াল থাকে না। কিছুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিবে সে দেখলো, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সনকা সেখানে বসে দু হাত দিয়ে তুলসীমঞ্চ স্পর্শ করে অস্ফুট স্ববে হবিনাম কবছে। দেখামাত্র বামচন্দ্র বুঝতে পারলো এবং ম্লান হয়ে গেলো। আজ তাব মেয়ের মৃত্যুবার্ষিকী। তাব স্ত্রী যেন কোনো এক অদৃশ্য পুরুষের দু পায়ে হাত বেখে মিনতি জানাচ্ছে।

বাত্রিতে রামচন্দ্র সনকাকে বললো, 'একটা কথা কবো'?

'কও'।

'আচ্ছা, এমন যে কাঁদাকাটা করো, ভান্‌মতিব লাগে না'?

'কেন্ লাগবি'?

'ধরো যে তার তো সতীন'।

সনকা একেবারে কাঠ হয়ে গেলো'।

'কথা কও না যে'!

সনকা বললো, 'ভান্‌মতির দুপাশে তুমি আছো আর মহিমকাকা আছে। তাব মুণ্ডলা আছে। এই দুনিয়াব সব তার দখলে। আমার সেই ছোটোমিয়েটার জন্যি কি কেউ থাকবি নে? আমিও না'?

সনকার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। কথাগুলি শুধু সনকার নয়, রামচন্দ্রর অন্তঃকরণই যেন সনকাব মুখ দিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করছিলো। বামচন্দ্রর চোখ দুটিও ঝাপসা হয়ে এলো। সে বললো, 'তুমি আমার পাশে শুয়ে শুয়ে ভগোমানের কাছে তার কথা কও। আমি যে কবেব পাবি নে'। শেষ কথাটি বলতে গিয়ে রামচন্দ্রর ঠোঁট দুটি অবাধ্যের মতো কাঁপতে লাগলো।

কিছুদিনেব মধ্যেই রামচন্দ্র কেষ্টদাসেব অনুপস্থিতি অনুভব করতে শুরু কবলো। একদিন বিকেল হলে

সে নতুন মহাভারতখানা হাতে নিয়ে কোঁচার খুঁটে ধুলো মুছে আবার কুলুঙ্গিতে রেখে দিলো। সে পড়তে জানে না।

পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন রামচন্দ্রর মনে হলো আবার একটা মচ্ছোব করলে হয়। দু-একজনাকে বললোও সে কথাটা, কিন্তু অত বড়ো ব্যাপারটায় হাত দিতে যতটা দরকার তেমন উৎসাহ কেউ দেখালো না।

এই পর্যায়ে আলাপ করতে করতে একদিন রেবতী চক্রবর্তী বললো, 'বাপু হে, ধর্মে কি আর কারো মতি আছে'?

'একেবারেই নাই তা না। ধান-পান করতি দিন যায়, কীর্তন গান করে কখন কন্'?

'কথা ভালোই। ধর্মে যদি মতি হয়ে থাকে শিবমন্দির উদ্ধার করো না কেন্'?

আলাপটা যেখানে হচ্ছিলো উদ্দিষ্ট শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি তার থেকে খুব দূরে নয়। গ্রামের মাঝখানে এই শিবমন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বহুদিন থেকে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে আছে।

রামচন্দ্র বললো, 'রেবতদাদা, তোমার তো পুরোত বংশ। এখনো তার জন্যি দু-পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি ভোগ করো। একদিনও কি পূজা দেও'?

রেবতী চক্রবর্তী বললো, 'বিশ্বম্ভর সারা বিশ্ব ভর করে আছেন, আমার বাড়িতে রোজ পূজা হয়। সে যদি কোথাও যায় তবে এখানেও আসে।

সূত্রপাত এমনি সামান্য কথাবার্তা থেকে। একদিন দেখা গেলো গ্রামের পাঁচ-সাতজন বৃদ্ধকে নিয়ে রামচন্দ্র দা হাতে করে শিবমন্দিরের জঙ্গল কাটতে লেগে গেছে। যে শক্তি ও উৎসাহের জন্য রামচন্দ্র চাষীদের মধ্যে বিশিষ্ট তার সবটুকু সে প্রয়োগ করলো জঙ্গলটার উচ্ছেদে। পথের ধার থেকে জঙ্গল শুরু হয়ে মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত প্রায় একশ হাত চৌরশ জমি। মাঝারি ও বড়ো বেল এবং আম কাঁঠালের গাছগুলিকে রেখে অন্যসব গাছ ও আগাছা কাটতে কাটতে রামচন্দ্রর দল ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যাপারটা অভিনবত্বে পথিক দাঁড়িয়ে পড়ে। রামচন্দ্র হাঁক দিয়ে বলে, 'ও ভাই, এদিকে আসো। তামুক খাও। পিটুলি গাছটায় একটা কোপ দিয়ে যাও। বাবা বিশ্বম্ভর কৃপা করবি'। অনেকে হাসি হাসি অপ্রতিভ মুখে পালিয়ে যায়। দু-একজন তামাকের লোভে কিংবা দলে মিশবার লোভে দা হাতে করে কিছুক্ষণ কাজ করেও যায়।

একদিন মুঙ্লা আপত্তি জানালো সনকার মুখ দিয়ে।

সনকা রামচন্দ্রকে বললো, 'মুঙ্লা একলা পারবি কেন্'?

'কেন্ পারে না? যখন আমি থাকবো না তখন কী করবি? আমি যখন একলা করছি তখন আমার কোন শ্বশুর আসে লাঙল ধরছে? আমার যে বয়েস তাতে ওপারের খবর নেওয়া লাগে'।

মুঙ্লার সঙ্গে লাঙল অবশ্য ধরেছিলো রামচন্দ্র কিন্তু সে যেন মুখ রক্ষা করার ব্যাপার। দুপুরের পর জমিতে ফিরে না গিয়ে রামচন্দ্র শিবমন্দিরের জঙ্গল কাটতে যায়। স্কুল-পালানো ছেলের মতো সে বলে, 'জমিতে রোদ্দুর, জঙ্গলে ছায়ায় বসা যায়'।

এমনি সময়ে রামচন্দ্রর কাছে একখানা চিঠি এলো। তাকে কেউ চিঠি লিখবে এটা বিশ্বাস করাই কঠিন। অবশেষে ডাকপিওন যখন বললো খামে নবদ্বীপের ছাপ আছে তখন মনে হলো তার, এ নিশ্চয় কেষ্টদাসের চিঠি। কে পড়বে? মুঙ্লা কিছু পারে পড়তে, ছিদামও কিছু জানে। কিন্তু কিছু জানার উপরে নির্ভর করে এমন একটা মূল্যবান জিনিস নষ্ট করা যায় না। ব্যাপারটা শুনে ভানুমতি বললো, 'আমি একবার দেখি না'। রামচন্দ্রকে বিস্মিত করে ভানুমতি একটু থেমে থেমে চিঠিটা পড়ে দিলো।

কেষ্টদাস নবদ্বীপে আছে। সে গ্রামে ফিরবে এমন সম্ভাবনা নেই। ছিদাম মানুষ হয়ে গেছে। তাহলেও

রামচন্দ্র যেন আপৎকালে তাকে দেখে।

রামচন্দ্র সেদিন আদৌ জমিতে গেলো না। সন্ধ্যা হতে হতেই সে কেষ্টদাসের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলো। কেষ্টদাস চিঠি লিখেছে সে ভালো আছে, এই সংবাদ দেওয়ার ছিলো, সে নিজে এতদিন পদ্ম-ছিদামের দিকে লক্ষ্য রাখেনি এই দুঃখ ছিলো।

ছিদাম বাড়িতে ছিলো না। পদ্ম তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ঘরে উঠতে গিয়ে রামচন্দ্রকে দেখতে পেলো।

'ছিদাম বাড়িতে নাই'?

'সানিকদিয়ারে গেছে, বসেন'।

কী কর্তব্য তাই ভাবছিলো রামচন্দ্র, ততক্ষণে পদ্ম মাদুর পেতে দিয়ে 'বসেন, আলো জ্বালে আনি' বলে চলে গেছে।

আলো জ্বেলে এনে পদ্ম খানিকটা সময় কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

রামচন্দ্র বললো, 'শুনছো না, কনো, গোঁসাই চিঠি দিছে, সে ভালোই আছে নবদ্বীপে'।

'আমরা কোনো চিঠি পাই নাই। ছিদাম চিঠি দিছলো কাকে দিয়ে লেখায়ে। তা মনে কয় ঠিকানায় যেয়ে পায় নাই'।

ইতিমধ্যে একসময়ে পানের বাটা নিয়ে এসেছিলো পদ্ম। সে মুখ নিচু করে পান সাজতে লাগলো। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়ায় মাটিতে ছড়ানো একগোছা পাতা উড়ে উড়ে বেড়ালো বারান্দার নিচের আঙিনাটুকুতে। শাদা মাটিতে লেপা বারান্দা, দেয়াল, আঙিনায় ম্লান আলো এবং ছায়ায় জালিকাটা।

এর আগেও মহাভারতের আসরে পান এসেছে, কখনো রেকাবিতে, কখনো ছিদামের হাতে। আজ রামচন্দ্রর প্রসারিত হাতে পান দিতে গিয়ে পদ্মর হাতখানা যেন একটি দীর্ঘতর মুহূর্ত রামচন্দ্রর হাতের উপরে রইলো।

পদ্ম বললো, 'আপনি শিবমন্দির পতিষ্ঠে করতিছেন'?

'শুনছো? পতিষ্ঠে কোথায়—আছেই তো'।

পদ্ম হেসে বললো, 'মুঙ্‌লা কয়, বাবা যদি শিব নিয়ে থাকে, জমি দ্যাখে কে'?

'অমন কয়। কও, পদ্ম, আমি যখন না-থাকা হবো তখন? আজ যে কেষ্টদাস নাই, ছিদামের সকল একা একা করবের হয় না'?

পদ্ম নিজে থেকে মাদুরের একপ্রান্তে বসলো। একটা যেন আকুল নিষেধ ফুটে উঠলো তার স্বরে। সে বললো, 'এমন না-থাকার কথা কন্ কেন্'?

তার মনে হতে লাগলো, বলিষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার প্রতীক বলে যাকে মনে হয় তার মুখে এ কী কথা! সে আবার বললো, 'এ কথা কি আপনের বাড়ির সকলে মানে নিছে'?

সে যখন এ কথা কয়টি বললো তখন অনুভব করলো : তোমার চারিপাশে তারুণ্য ও মধুর চপলতার অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে রাখলে এমন মনোভাব হতো না তোমার। বলা বাহুল্য, এ ভাষা তার জানা নেই, সুতরাং এই চিন্তাটুকুর অংশ হিসেবে মধুর হাসি ও চোখের বিদ্যুৎ ইতস্তত ছড়ানো রইলো। এবং সে বুঝতে পারলো না, তার নিজের চোখ দুটি যে-কোনো পুরুষের সম্ভাব্য কামনার স্নিগ্ধ আশ্রয়ের মতো ডাগর হয়ে ফুটে উঠেছে।

ছিদাম এলো না। আর একটু অপেক্ষা করে রামচন্দ্র চলে গেলো।

কিছুক্ষণ বাদে পদ্মর আত্মপ্রসারী ব্যাকুলতাটা সংকুচিত হয়ে তার দৈনন্দিন আবরণে আত্মগোপন করলো। কবিপ্রসিদ্ধিতে কোনো কোনো ফুল এমনি দিনেরাত্রে সংকুচিত হয়। নতুবা এই সংকোচে অনুশোচনা ছিলো না।

রামচন্দ্র পথে বেরিয়ে অনেকটা দূর নির্দিষ্ট কিছু চিন্তা করলো না। তার নিজের মনের একটা খুশি

খুশি ভাব সে উপভোগ করছিলো। অন্ধকারে সান্যালবাড়ির হাতার পাশে চলতে চলতে হাসনাহেনার গন্ধটাও এখন উপভোগ্য বোধ হয়। এরপরে এই খুশির কারণ অনুসন্ধান না করলেও তার মনে পড়লো, পদ্মর মুখের গড়নটা যে এমন তা সে জানতো না। আর পদ্ম একটা রুপোর চিক্‌হার পরেছিলো। সেটা নিশ্চয়ই নতুন, নতুবা অত সুন্দর দেখাতো না।

রামচন্দ্র মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সেকালের জমাট সুরকির আস্তর দেওয়া চত্বর। অধিকাংশ জায়গায় ভেঙে চটা উঠে গেছে। সে-জীর্ণতার এখানে-সেখানে দু-একটি পাকুড় জাতীয় গাছ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। তবু চত্বরে পৌঁছতে পেরে রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলো। সে চত্বরের একাংশে বসে সঙ্গীদের নিয়ে গল্প করছিলো। সান্যালমশাই বলেছেন—গ্রামের লোকদের যদি সত্যি এত আগ্রহ হয়ে থাকে তবে তাঁর বাড়ির কাজ শেষ হলে মিস্ত্রীদের তিনি পাঠিয়ে দেবেন। মেরামত করে মন্দিরটাকে উদ্ধার করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখা যাবে।

রামচন্দ্র এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে রটনা করছিলো।

এইরকম আলাপের এক ফাঁকে একজন বৃদ্ধ একদিন বললো, 'এমন সময়ে যদি কেষ্টদাস থাকতো তবে তোমার সুবিধা হতো মণ্ডল'।

কোথা থেকে কী কথা উঠে পড়লো। আলাপটা গড়াতে গড়াতে কেষ্টদাসের পারিবারিক ব্যাপারকে অবলম্বন করলো।

'সে থাকেই-বা কী করে? ক্ষেত খামার সংসার সে কোন কালে দেখছে'?

'তাইলেও অমন ভালো না'।

'কি ভালো না'?

বৃদ্ধটি বোধহয় কেষ্টদাসের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করেছে। বয়েস হয়েছে, বিদায়ের কথা তারও মনে হয়। তার অভাবেও বাড়ির আর-সকলের জীবন স্বাভাবিক কথাবার্তা হাসিখুশিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হবে—এটা ভাবতে যেন তার মন দমে যায়। সে বললো, 'তাই বলে এত হাসিখুশি এত কথাবার্তা ভালো না'।

'মানুষে কি চেরকালই মুখ গোম্‌রা করে থাকবের পারে'?

'তা না পারে, কিন্তুক তুমি দেখো রামচন্দ্র, ছিদাম আর পদ্ম যেন খুব কাছাকাছি গিছে'।

'তা একই বয়েস, ভাই-বন্ধুর মতো ওরা খাটেখোটে'। বললো রামচন্দ্র।

অন্য এক অবসরে রামচন্দ্র ভাবলো, বুড়োটা কী শুনতে কী শুনেছে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যদি এরকম মনে করে যে কেষ্টদাস চলে যাওয়াতে তারা দুঃখিত না হয়ে বরং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে, সেটাও তো ভালো নয়। মানুষের এমন নির্দয় হওয়া উচিত নয়। এই সময়ে একবার তার পদ্মর গলার চিক্‌হারটার কথা মনে পড়লো। হার পরার বয়েস তার পার হয়নি, তবে এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, হারটা আর দু-চারদিন পরে পরলেই ভালো ছিলো।

ছিদামকে এ-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত কিনা মনে মনে এই আলোচনা করতে করতে কিছু সময় চলে গেলো।

সানিকদিয়ারের জারু কামারের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে ছিলো। কেষ্টদাস তাদের পাল্টাঘর। চাষী হিসাবে ছিদাম উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। জারু কামার একদিন খোঁজখবর নিতে এসেছিলো।

সে যখন স্বগ্রামে ফিরে যাচ্ছে তখন রামচন্দ্রর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো।

জারু বললো, 'কেন্, পদ্ম কি কেষ্টদাসের ইস্ত্রি না'?

'গাঁয়ের লোক তো তাই জানে। এ কথা কন্ যে'?

'ছিদামও তো কেষ্টদাসের ছাওয়াল'?

'আপনের কথা ধরবের পারি না'।

জারু কথা ভাঙলো না। মামুলি দু-একটা কথা বলে সে চলে গেলো।

রামচন্দ্র ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলো। বিষণ্ণতায় সে দীর্ঘকাল মুহ্যমান হয়ে রইলো। কেষ্টদাস আপদে-বিপদে ছিদামদের রক্ষা করার জন্য চিঠিতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু এ কী বিপদে পড়লো ছিদাম। মানুষের মন, বিলের ঠাণ্ডা জলেও ঝড় উঠলে ভরা ডুবি। আহা, এ থেকে কি তাকে রক্ষা করা যাবে?

কিন্তু ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। তাই যদি না করা গেলো তবে বৃথাই শিবমন্দির করা। অবশেষে একদিন রামচন্দ্র ছিদামকে ডেকে নিলো। শিবমন্দিরের চত্বরটুকু ভরদুপুরে নির্জন থাকে। কথা বলার পক্ষে এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ছিদাম বিস্মিত হয়ে বললো, 'কেন, জ্যাঠা, এখানে ডাকে পাঠাইছো যে'?

'আয়, আয়, একটুকু কথা কই'।

কিছুক্ষণ চাষবাস নিয়ে আলাপ হলো। তারপর রামচন্দ্র বললো, 'তোক এক কথা কই, শোন। গোঁসাই যে মহাভারত পড়ে, শুনছিস? তার মধ্যে ভীষ্মর এক কথা আছে। তার মতো বীর আর কৈল কেউ না। ইচ্ছা করলি ধেনুকে বাণ জুড়ে সাতদিনে না কয়দিনে পৃথিমি রসাতলে দিবের পারে। ধরো যে সে গঙ্গার ছাওয়াল, পদ্মা আর গঙ্গা ধরো যে একই। এক মচ্ছকুমারী দেখে ভীষ্মর বাবার ইচ্ছা হলো তাক ঘরে আনে। খবর শুনে ভীষ্ম বলে—কন্যেক নিয়ে আসি। ভীষ্মর বাপ বুড়া আর সে জুয়ান। কন্যের মা-বাপ কন্যের বিয়ে দিতে চায় ভীষ্মর সঙ্গে। ভীষ্ম কয়, তা হয় না, বাপ যখন তাক চায়েছে ও-কন্যে তারই। অথচ মনে করো, ইচ্ছা করলি সে-ই রাজকন্যে পাতে পারতো'।

ছিদাম গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। গল্পটাকে মনে মনে আলোচনা করে সে বললো অবশেষে, 'এ-কথা কন্ যে'?

'ভাবে দ্যাখো ভীষ্ম কত বড়ো। আমরা কি এত পারি? তাইলেও কিছু তো করবের হবি'?

এরপরে অন্য অনেক কথা হলো। জমিজমার কথা রামচন্দ্রর মতো কে বলতে পারে। আর আজ সে যেন বহুদিন পরে মন খুলে জমিজমার কথাই আলোচনা করলো।

কিন্তু ছিদাম ভীষ্মর উপাখ্যান ভুলতে পারলো না। এই গল্পটা বলার জন্যই যে রামচন্দ্র তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো চিন্তা করতে গিয়ে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হলো।

পদ্মর কথা তার মনে পড়লো। যেদিন ক্লান্ত অসুস্থ পদ্ম প্রথম এসেছিলো সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কতভাবেই না সে পদ্মকে দেখেছে। অক্লান্তকর্মা পদ্ম, যে-পদ্ম গান বেঁধে দেয়, এক-হাঁটু জলকাদায় যে ধানের জমিতে কাজ করে পাশে দাঁড়িয়ে। পদ্মই তাকে উৎসাহিত করে চাষী করেছে।

একদিন ছিদাম বলেছিলো, 'কেন্, এত খাটবো কেন্'?

'মুঙলাও তো খাটে'।

'তার বাপ-মা আছে, ভানমতি আছে। আমার বাপ কনে গেছে কে জানে, মাকে জন্মের কালে খাইছি'।

পদ্ম কাছে এসে দাঁড়িয়ে রসিকতা করে বলেছিলো, 'ভানমতি একটা আনে দিবো'।

'আমি কি তাই কইছি'?

কোনো অভাব বোধ ছিদামের নেই। মুঙলা ভানমতিকে পাওয়ায় সে কিছুটা দুঃখিত হয়েছিলো। কারণ, মুঙলাকে সে আর তেমন করে পায় না। কিন্তু তার বদলে পদ্মকে সে যেন আরও কাছে পেয়েছে। এক রাত্রিতে চারিদিকে যখন জ্যোৎস্নার অগাধ নির্জনতা তখন ছিদাম পদ্মর পাশে বসে মাথালটা মেরামত করছিলো। সে বললো, 'তোমাক পদ্মই কবো'।

'কও'।

'দ্যাখো, পদ্ম, মানুষ যে বিয়ে করে কেন্ তা বুঝি না। কিন্তুক আমার যদি কোনোকালে বউ আনো

দেখেশুনে আনবা। সে যদি তোমার মতো কথা কবের না জানে, যদি আমাক দিয়ে এমন করে খাটায়ে না নেয় তবে কৈল আমি জমিজমা নিয়ে খাটবের পারি নে'।

কিন্তু যে-কথাটা বারবার মনে আসতে চাচ্ছে আর ছিদাম ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা বাইরের কথা নয়। সমবয়সী কৃষকদের দলে আলাপের সময়ে বউয়ের কথা উঠে পড়া স্বাভাবিক। যৌবনের ধর্ম অনুসারে ছিদামের মনেও একটি গৃহকোণের স্বপ্নচিত্র ফুটে ওঠে,সে-গৃহের হাসিমুখটুকুর সঙ্গে পদ্মর সাদৃশ্য থাকে।

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ছিদামের সহসা অনুভব হলো এখন বাড়ি ফিরলে সে হয়তো পদ্মকে এসব কথা বলে ফেলবে। বাড়ির কাছাকাছি এসে ফিরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতপদে সে এরশাদের বাড়ির দিকে রওনা হলো, যেন সেখানে কিছু কাজ পড়ে আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বাড়ি ফিরলো।

'ছিদাম আস্‌লে'? বলে পদ্ম এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে।

যেন মস্ত একটা ধানের বোঝা তার পিঠে চাপানো আছে, কথা বলার মতো দম আর অবশিষ্ট নেই, এমন ভঙ্গিতে ছিদাম পদ্মর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলো। অন্ন-জল, লাঙল-মাটির মতো যে-বিষয়টিকে প্রাত্যহিক অভ্যস্ততায় সে গ্রহণ করতে পেরেছিলো, ভীষ্মর গল্প শোনার পর সেটার গূঢ় অর্থ তার চোখের সম্মুখে খুলে গেছে। আর কোনোদিনই যেন সে সহজ হয়ে পদ্মর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

কুপি জ্বেলে নিয়ে পদ্ম ঘরে এলো। 'কী হইছে, ছিদাম, কোনো অনাই কাজ করছো'?

ছিদাম নিরুত্তর।

রাত্রিতে আহারের জায়গা করে পদ্ম বললো, 'খাতে আসো, ছিদাম'।

সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখলো ছিদাম বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে আরও কাছে গিয়ে পদ্ম দেখলো, চাপা কান্নার মতো একটা অত্যন্ত মৃদু আলোড়নে ছিদাম কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

পদ্ম বিছানায় বসে ছিদামের পিঠে হাত রেখে বললো, 'কেন, কাঁদো কেন্ ছিদাম'?

ছিদামের কান্না এবার প্রকাশিত হলো। সে উঠে বসলো, তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে, কী সম্বোধন করলে ছিদামের দুঃখ দূর হয়, চিন্তা করলো পদ্ম। 'কী হইছে, সখা? কী হইছে, ভাই'?

ছিদাম ভেবেছিলো সে প্রাণ থাকতে ভীষ্মর উপাখ্যান শোনার কথা পদ্মকে বলবে না, অন্তত উপাখ্যান শুনে রামচন্দ্রর বক্তব্য সম্বন্ধে তার কী মনে হয়েছে তা কখনো তাকে বলা যায় ন। কিন্তু সহসা সে বলে ফেললো।

পদ্ম মুখ নিচু করে শুনলো। গল্প শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'রাত হইছে, খাতে চলো'।

'কেন, পদ্ম, আমি কী করবো'?

'কিছু করবা না'। পদ্ম দৃঢ়স্বরে বললো

একটা পার্থক্যের দেয়াল দুজনের মাঝখানে রচনা করার চেষ্টা করলো ছিদাম। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি তাকে পদ্ম সাহায্য করতে অগ্রসর হলো। রান্নাঘরে ছিদামের আহার্য ঠিক করে রেখে পদ্ম ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। প্রয়োজনেও কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ছিদাম জমিজিরাত তদারক করতে যায় না। তার আহারে রুচি নেই। পদ্ম অনুনয় করতে বাধ্য হয়। ছিদাম ঘরে চলে এলে নিজের আহার্য অনেকসময়ে গোরুর মুখের সম্মুখে ধরে দিয়ে অভুক্ত পদ্ম ঘরে এসে পান সাজতে বসে। এক রাত্রিতে ছিদামকে পান দিয়ে সে চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। তার চোখ দুটি ঝকঝক করে উঠলো। সে বললো, 'তুমি আমাক খাওয়াও পরাও, যত্ন করো। মাথায় করে রাখছো। যেভাবে সেভাবেই তোমার আমি'।

সে রাত্রি শেষ হতে তখনো বাকি ছিলো। ছিদাম উঠে গিয়ে দেখলো পদ্ম তার বিছানায় নেই। সে কুপি ধরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো, একটা খুঁটির পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে পদ্ম।

'পদ্ম'?

'আসো। কুপিটা নিভায়ে দেও, চোখে লাগে'।

এ যেন কোনোদিনই পরিচিত নয় এমন এক পদ্মর কণ্ঠস্বর।

আর-একদিন রাত্রিতে ছিদাম পদ্মর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'আমি বলি কি, আমি চলে যাই'। পদ্ম বললো।

'কোথায় যাবা'?

'শূন্য থেকে আসছিলাম আবার কোনো শূন্য খুঁজে নিবো'।

'তাই যাও'।

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছিদাম বললো, 'তা যেন যাবা, একদিন যখন আবার দেখবের ইচ্ছা করবি'?

পদ্ম হু হু করে কেঁদে ফেললো।

পরদিন অত্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলা দেখে পদ্মর মনে হলো ছিদাম বোধহয় আজ অন্যদিনের চাইতে প্রত্যূষে উঠেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ছিদাম এলো না তখন সে ভাবলো, কয়েকদিন জমিতে যায়নি, আজ বোধহয় অনুতাপে পুড়ে রাত থাকতে উঠে সেখানেই গেছে। একটা আলোড়নের পরে সংসার আবার নতুনভাবে স্থিতিলাভ করবে এই আশায় পদ্মর মুখখানা হাসি হাসি হয়ে উঠলো।

দুপুর গড়িয়ে গেলে রান্না শেষ করে পদ্ম অপেক্ষা করতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়টা সৃষ্টি হচ্ছিলো সেটা সন্ধ্যায় বিভীষিকা হয়ে উঠলো। একা একা অন্ধকার পথে সে খানিকটা ঘুরে এলো। রাত্রিতে জেগে বসে থাকতে থাকতে পদ্ম পর্যায়ক্রমে একবার চোখ ঢেকে কাঁদলো, আর একবার পথের দিকে তাকালো। দ্বিতীয় দিন সে দুখানা গ্রামের পথে পথে একা একা ঘুরে বেড়ালো। তৃতীয় দিনে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো। সেদিন সন্ধ্যার পর সে রামচন্দ্রর স্ত্রীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো।

সনকা বললো, 'কনে গেলো'?

'জান্ নে'।

'কেন্ গেলো'?

'জান্ নে'।

রামচন্দ্র শুনে বললো, 'রাগ করছিলো'?

'না'।

'তুমি কিছু কইছিলা'?

'কইছিলাম, চলে যাবো'।

প্রায় সাতদিন পরে ছিদামের সংবাদ পেলো পদ্ম নিজেই। যে অসম্ভব জায়গায় তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো তার থেকেই প্রমাণ হয়, পদ্ম এ কয়েকটি দিনে সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গাই খুঁজতে ছাড়েনি।

শিবমন্দিরে কাজ করতে এসে তার কান্নার শব্দ অনুসরণ করে পদ্মকে দেখতে পেলো রামচন্দ্র। ছিদাম আত্মহত্যা করেছে। শিবমন্দিরের পিছন দিকে এখনো অনেক জঙ্গল। সেখানে একটা গাছের নিচু ডাল থেকে ছিদামের মৃতদেহ ঝুলছে।

রামচন্দ্র কাছে গিয়ে দাঁড়ালে পদ্ম প্রথমে হাহাকার করে উঠলো, তারপরে পাথর হয়ে গেলো। রামচন্দ্রর লোকজন শবটিকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

পদ্ম আর কাঁদলো না। পূতিগন্ধ গলিত মৃতদেহটার পাশে লুটিয়ে পড়ে সে ফিসফিস করে বললো, শোনো, ওঠো, কয়দিন ছান করো নাই, খাও নাই। চলো, আমরা চলেই যাবো। এখন ওঠো, খাও নাই যে। দ্যাখো না, চুলেও তেলজল পড়ে নাই'।

৩৪

রামচন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছিলো। মুঙ্‌লারা শব-সৎকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো কিন্তু নায়েবমশাই বলে পাঠালো, দারোগারা দেখে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু করা উচিত হবে না। দারোগারা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলো না, পরদিন সকালে এলো। সারাটা দিন, সমস্তটা রাত্রি মৃতদেহকে পাহারা দেওয়া দরকার। আর কে রাজী হবে? মুঙ্‌লা তুলসী গাছ এনে মৃতদেহটার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। ফুলের কথা তার মনে হয়নি। চৈতন্য সাহার দোকান থেকে একটা নামাবলী কিনে এনে সে শবটিকে ঢেকে দিয়েছিলো। অস্নাত অভুক্ত প্রায়-উন্মাদিনী পদ্ম মাটিতে মাথা কুটে কুটে কেঁদে শবের অনতিদূরে স্থির হয়ে বসেছিলো, আর ছিলো রামচন্দ্র। সন্ধ্যায় একটা প্রদীপ কে এনে দিয়েছিলো।

এমন একটি দিন এবং রাত্রি অতিবাহিত করার স্মৃতি মন থেকে সহসা মুছে যায় না।

শিবমন্দির উদ্ধার করার পরিকল্পনা রামচন্দ্র ত্যাগ করলো। যে গাছগাছড়াগুলির মূলমাত্র অবশিষ্ট ছিলো দু-তিন সপ্তাহে সেগুলির কোনো-কোনোটির মূল থেকে কচিপাতা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আরও দু-এক সপ্তাহের মধ্যে পল্লব এবং তারপরে ডালপালা তৈরি হবে। আবার আগেকার মতো জঙ্গল হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের কথা। ছিদাম যেন মৃত্যু দিয়ে বলে গেছে, এই শিবমন্দির উদ্ধার করার যোগ্যতা তার নেই।

অনেক রাত্রিতে শয্যায় উঠে বসে একদিন রামচন্দ্র স্ত্রীকে ডেকে তুললো, 'শুনতেছো, সনকা'?

'কও'।

'কাজটা আমি ভালো করি নাই'।

'কী করছো'?

'ছিদামেক শাসন করছিলাম ; কও, শাসন করার কী যোগ্যতা আমার আছে'?

উইলের যে-অবসাদ তার অন্তরকে বিষণ্ণ ধূসরতায় আচ্ছন্ন করেছে তাকে কমনীয় করে তুলেছিলো একসন্ধ্যায় পদ্মর চিক্‌হার-পরা কণ্ঠদেশ। এতগুলি কথা বলতে না জানলেও তার অনুভবে অব্যক্ত, সুতরাং, অধিকতর দ্যোতনা নিয়ে তা ধরা দেয়।

অন্য আর-একদিন রামচন্দ্র বাড়িতে ফিরে স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকের দাওয়ায় বসেছিলো।

সনকা এসে দাঁড়ালো, 'অমন করে বসে আছো যে'?

'না। ভাবি'।

'কী ভাবো'?

'এমন হবের পারে—ছিদামের এছাড়া উপায় ছিলো না'।

'তা পারে'।

'কও, এ কি ধর্ম না'?

দার্শনিক কোনো সূক্ষ্ম যুক্তি রামচন্দ্রর মাথায় আসে না। তার মনে হয় ধর্মের পথ বড়ো কঠিন। সে-পথে চলতে গিয়ে ভীমসেন অর্জুন প্রভৃতিও বেঘোরে প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে সে একদিন কেষ্টদাসের বাড়িতে গেলো। যেন সে অনুতাপ জানাতে চায়।

'আছো'?

পদ্ম ঘর থেকে বেরুলো। ইতিমধ্যে পদ্মর যেন বয়স বেড়ে গেছে।

রামচন্দ্র ইতস্তত করে বললো, 'গোঁসাইয়েক একটা খবর দেওয়া লাগে'।

'আমি আর কী খবর দিবো'?

রামচন্দ্র খানিকটা চিন্তা করে বললো, 'তাই। খবর আর কী দিবো'।

হঠাৎ পদ্ম রামচন্দ্রর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললো, 'আপনে কি তাক খুব গাল দিছিলেন'?

'না কন্যে, না কন্যে, তা আমি দেই নাই'।

কিছুটা সময় নীরবতার মধ্যে দিয়ে কাটলো। মৃদু মৃদু হাওয়া চলতে চলতে হঠাৎ যেমন কালবৈশাখীর নির্মম রূপ প্রকাশ পায় তেমনি আকস্মিক পরিবর্তন হলো পদ্মর। তার মুখে স্নিগ্ধতার অস্পষ্ট ছাপও অবশিষ্ট রইলো না। সে যেন তার হৃদয়টিকে বিচ্ছিন্ন করে উন্মুক্ত বায়ুতে এনে বিশুদ্ধ করে নিতে চায়। মুহূর্তের জন্য যোগারূঢ়ার মতো সে যেন পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও গেলো। সে বললো, 'পাপ ছিলো আমার মনে। চোখের সামনে আপনে, যেন্ সংসারে টানতেন। লোভ লাগতো'।

জ্বলন্ত লোহার মতো কথা। জ্বলন্ত বলেই কোমল স্পর্শ বলে ভ্রম হয়, কিন্তু নিমেষে সে-ভ্রান্তিও দগ্ধ হয়। রামচন্দ্র কিছুক্ষণ বসে রইলো বটে কিন্তু তার মুখে আর কথা ফুটলো না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রাণে অশান্তির বীজ বহন করে সে ফিরে এলো।

প্রায় একমাস পরে রামচন্দ্র একদিন তার স্ত্রীকে বললো, 'শুনছো, এখানে আমাদের এখন কোন কাম আছে? ওই দ্যাখো, আমি যখন শিবমন্দির নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, মুঙলা একলাই সব কাজ করছে। তাছাড়া মানুষ যদি নিজের মনে কাজ করবের না পায় কোনোদিনই শেখে না। ভানমতিও সংসার করা জানবি নে, মুঙলাও চিন্তাভাবনা করা শিখবি নে'।

'শিখে নেয় সেই তো ভালো'।

'আর তাছাড়া ওরা দুইজন দুইজনেক আরও ভালো করে চিনেজানে নিউক'।

'তা ও লাগে'। রামচন্দ্র প্রস্তাবটা ভয়ে ভয়ে করলো, 'কেন্, সনকা, তীর্থ করবের যাবা'?

'তীর্থ'?

'হয়। ওরা সংসার চিনুক, আমরাও তীর্থ চিনি'।

'নিয়ে যাবা, না ঠাট্টা করো'?

'যদি যাই, তোমাক নিয়ে যাবো'।

বিষয়টি আরও কিছুদিন তোলাপাড়া করলো রামচন্দ্র। সে আবার কেষ্টদাসের বাড়িতে গেলো।

মাটির দিকে চোখ রেখে রামচন্দ্র বললো, 'গোঁসাই আমাদের পথ দেখায়ে দিছে, মনে কয় তীর্থ করবের যাবো'।

'তা যান'। পদ্ম বললো।

'মনে করছি তোমাকও নিয়ে যাবো। আমি, তুমি আর সনকা। সেখানে গোঁসাইও আছে'।

পদ্ম কিছুকালের জন্য যেন বা লুব্ধ হয়ে রইলো, পরে বললো, 'আমি আর কনে যাবো? সে এত কষ্ট করে ঘরবাড়ি করছিলো সেসব দেখে রাখা লাগবি তো'।

'তাতে কি শান্তি পাবা'?

'তা পাবো না'।

প্রস্তাবটা শুনে মুঙলা বিমর্ষ মুখে বললো, 'এখনি যায়ে কী হবি? ফসল উঠুক, তখন না হয় আমিও যাবো'।

রামচন্দ্র মনে মনে হাসলো, তুমিও যদি যাবে তবে আর তীর্থ হলো কী করে। তুমি হয়তো এর পরে বলে বসবে, জমিজমাও নিয়ে যাবো। কষ্টই যদি না হয়, তোমাদের বিচ্ছেদ যদি কাঁটার মতো না বেঁধে

তবে তীর্থ করার তৃপ্তি আসবে না।

শুভদিন দেখে রামচন্দ্র রওনা হলো। নবদ্বীপেই সর্বপ্রথম সে যাবে। সেখানে গোঁসাইকে খুঁজে বার করে তার পরামর্শ নিয়ে যদি আরও কিছু দেবদর্শন ঘটে কপালে, ঘটবে। মুঙ্লা প্রস্তাব করেছিলো গোরুগাড়ি করে দিঘা পর্যন্ত যেতে। রামচন্দ্র বললো, 'তীর্থ গেলেও টাকার হিসেব করতে হয়। হাঁটেই যাবো'।

সামান্য কিছু বিছানার উপকরণ একটা বড়ো রকমের পুঁটলিতে জড়ানো, দু-একখানা পরিধেয় বস্ত্র একটা ঝোলায়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সব ওই ঝোলাতেই যাবে। দাওয়ায় এসব গুছানো ছিলো।

সনকা ভানুমতির হাত থেকে পান নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ঝোলা ও পুঁটুলিটার পাশেই পাকা একটা বাঁশের লাঠি ছিলো। ঝোলা ও পুঁটুলি লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে 'শিবো' 'শিবো' বলে রামচন্দ্র তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়লো।

ভানুমতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিলো। হঠাৎ এদের মঙ্গল কামনায় সে উলু দিয়ে উঠলো।

৩৫

সান্যালমশাইয়ের বড়োছেলে নৃপনারায়ণ গ্রামে এলো। কনকদারোগার দপ্তরে খবর পৌঁছনোর আগে নৃপনারায়ণ বুধেডাঙা চিকন্দির সংযুক্ত সীমায় পৌঁছে গেলো। সদর রাস্তা ছেড়ে আলের পথ বেছে বেছে সে অত্যন্ত দ্রুত চিকন্দির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। তাকে দেখে ইয়াজ বিস্মিত হয়েছিলো। দাদপুরীদের অগ্নিকুমার আর রাবণের কাছে যেন চেনা চেনা লেগেছিলো।

নৃপনারায়ণ খিড়কি-দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে হনহন করে রান্নার মহল পার হয়ে অন্দরের চত্বর পার হয়ে দোতলায় অনসূয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কাঁধের ঝোলাটা ড্রেসিং-টেব্‌লে রেখে ধূলিমলিন অবস্থাতেই সে অনসূয়ার বিছানায় গিয়ে বসলো, একটু-বা ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো। মা এসে কেমন চম্‌কে যাবেন এই চিন্তা করে সে মিটমিট করে হাসলো। কিন্তু দশ মিনিট পরেও যখন অনসূয়া এলেন না তখন সে সান্যালমশাইয়ের স্টাডির দিকে রওনা হলো। সেখানে সান্যালমশাই ছিলেন। নৃপনারায়ণ ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সান্যালমশাই কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'বটে'?

নৃপনারায়ণ বললো, 'হ্যাঁ'।

তারপর নৃপনারায়ণ একটা চেয়ারে বসলো।

সান্যালমশাই খবরের কাগজটা তুলে ধরলেন ; আঙুলগুলি ও হাতের খানিকটা ছাড়া আর সব কাগজে ঢাকা পড়লো। নৃপনারায়ণ দেখতে পেলো না কিন্তু সান্যালমশাইয়ের চোখে তখন্ সব লেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাগজ নামিয়ে চশমাটা একটুকরো শ্যাময় চামড়ায় মুছে নিয়ে সান্যালমশাই বললেন, 'মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে'?

'একটু লুকোচুরি খেলছি'।

নৃপনারায়ণ যখন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলো তখন ধাত্রী তার নিজের ঘর থেকে তাকে দেখে অবাক হয়েছিলো। কী করা উচিত এই যখন সে ভাবছে, সুমিতি ধাত্রীর ঘরে গেলো ছেলেকে দুধ খাওয়াতে।

ধাত্রী চুপিচুপি বললো, 'অপরিচিত একজন লোক ঢুকেছে মায়ের ঘরে'।

অনসূয়ার ঘরে পরিচিত দাসী ছাড়া যারা তাঁর অনুপস্থিতিতে এ-মহলে আসতে পারে তারা হচ্ছে সদানন্দ, রূপু এবং সান্যালমশাই স্বয়ং। দিনের বেলা এই যা ভরসা।

'অপরিচিত'?

'বলে বোকা হতে চাই নে, অস্বস্তি লাগছে কিন্তু'।

তখন অনসূয়ার কাছে খবর পাঠালো সুমিতি। কিন্তু খবর পাঠানোব দরকার ছিলো না। নৃপনারায়ণ বান্নামহলেব একজনের চোখে পড়েছিলো। সে চিনতে পাবেনি কিন্তু অনসূয়াকে বললো, 'কে একজন এলেন, মা'।

'সে কী কথা'!

'সাহেবের মতো রং। খুব লম্বা, দু লাফে যেন উঠোন পার হয়ে গেলেন'।

একটু ভেবে, অসম্ভবটা কি এমন আকস্মিকভাবে সম্ভব হয়, এই ভাবতে ভাবতে অনসূয়া নিজের ঘবেব দিকে চললেন। নিজের ঘরে ঢুকে অনসূয়া ঝোলাটা দেখতে পেলেন, ধুলোভরা স্যান্ডেল জোড়াও দেখতে পেলেন। বুকটা ধকধক কবছে। মুখ ফুটে কিছু না বলে তিনি নিজের ঘর থেকে সান্যালমশাইয়ের ঘবের দিকে চললেন। কষ্টের মতো কী একটা বোধ হলো। সুমিতির ঘবের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গ্রীবা না বেঁকিয়ে যতদূর সম্ভব সুমিতিব ঘবের ভিতরটা দেখে নিলেন। 'এ-ঘবে নেই' এমন একটা আশাকে বক্ষা করতে করতে তিনি এগোলেন। স্টাডিতে ঢুকে তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না, কারণ, ততক্ষণে নৃপনাবায়ণ প্রণাম কবেছে, মাকে বুকেব মধ্যে জড়িয়েও ধবেছে।

ছেলেকে বসিয়ে, নিজে তাব পাশেব একটা চেয়াবে বসে অনসূয়া বললেন, 'চমকে দেওয়ার অভ্যাস এখনো তোর আছে'।

'কাউকেই বোলো না এখন, আমি এসেছি। আগে কিছুক্ষণ তোমাদেব দুজনেব মাঝখানে বসে থাকি'।

'তা থাকিস। তোকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি খাবাবেব ব্যবস্থা করে আসি'। বলে অনসূয়া চলে গেলেন।

সংবাদটা তখন আর চাপা থাকলো না, সুমিতিব কানে গেলো, রূপু শুনলো।

ঈষৎ তপ্তজলে স্নান শেষ কবে নৃপনাবায়ণ খেতে বসেছিলো মায়ের ঘবে। জলযোগ শেষ হলে অনসূয়া বললেন, 'তুমি এবাব সুমিতিব ঘবে গিয়ে বোসো গে, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি'।

নৃপনারায়ণ যখন সুমিতির ঘবে গেলো তখন সেখানে সুমিতি ছিলো। বললো, 'ভালো আছেন, গ্রামে এসে কষ্ট হচ্ছে না তো আপনার'?

'না, কষ্ট হবে কেন? আপনাকে একটু বোগা দেখাচ্ছে'।

'দুদিনের বিশ্রামে ঠিক হয়ে যাবে'।

'ওদিকে খবর কী'?

'দেশের রাজারা নাকি প্রজাদের হাতে সত্যি শাসনভার তুলে দেবে'।

নৃপনারায়ণ তখনো বসেনি। সুমিতি বললো, 'বসুন। আপনাকে কিন্তু ক্লান্ত দেখাচ্ছে'।

নৃপনারায়ণ হাসলো।

এমন সময়ে রূপু এলো। 'এদিকে' 'এদিকে' বলে কাকে পথ দেখিয়ে আনছে সে। ধাত্রী নৃপনারায়ণের শিশুটিকে নিয়ে প্রবেশ করলো রূপুব সঙ্গে।

ধাত্রী বললো, 'বড়োবাবু, এমন সময়ে বকশিশ চাওয়াই প্রথা'।

নৃপনারায়ণ বললো, 'নিশ্চয, নিশ্চয। আপনাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করা উচিত'। এই বলে চোখ তুলে চাইতে গিয়ে সুমিতির চোখে চোখ ঠেকে গেলো তাব। সুমিতি সিঁদুব হয়ে মুখ নামিয়ে নিলো। নৃপনাবাযণের গালও রক্তিম হয়ে উঠলো। শিশুটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে নৃপনারায়ণ বললো, 'এখনো চোখ ফোটেনি যেন'।

রূপু হো হো করে হেসে বললো, 'কী বলো, দাদা, কত বুদ্ধি তা তো জানো না। আঙুল ধরতে চায়'।

'তুমি যে খুড়োমশাই তা মনে ছিলো না'।

'ও এখন ঘুমুবে'। বলে কিছুপরে ধাত্রী তার অধিকারকে নিয়ে চলে গেলো।

'তুমি বিশ্রাম করে নাও'। বলে রূপুও চলে গেলো। নৃপনারায়ণ সুমিতিকে বললো, 'আপনার বাড়ির লোকদের এ-খবর দিয়েছেন'?

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু আপনাকে যেন সে-সময়ে আমি 'তুমি' বলার চেষ্টা করতাম'। বিব্রতমুখে নৃপনারায়ণ বললো।

''তুমি' বলতেন। মাঝে-মাঝে গোলমালও হতো। একজনের খুব ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় হয়েছিলো'। সুমিতি আবার সিঁদুর হলো।

'না, না। এখন আর 'আপনি' বলাটা একদম মানায় না, সে তুমি যাই বলো'।

নৃপনারায়ণ হাসতে গেলো, রাঙা হয়ে উঠলো, বললো, 'এখন তা অস্বীকার করতে পারি না'।

এরপরে চা এলো। দাসীর হাতে ট্রে, কিন্তু অনসূয়া সঙ্গে এলেন। একটু যেন বাড়াবাড়ি হলো।

অনসূয়া এত সুখ অনুভব করেননি। তিনি মনসাকে পত্র দিলেন—'তোর দাদা এসেছে, মণি'।

নিজের ঘরের গভীরে অনসূয়া ভাবলেন—একটু স্বার্থপর হয়ে পড়েছি আমি। ছেলে বাড়িতে এসে প্রথমে মাকেই খুঁজেছে। এবং সেটাই উচিত। নতুবা ছেলেও বোধহয় এমন করতো না। ছেলে সুমিতির ঘরে আছে এরকম একটা আশঙ্কাতেই সে-ঘরের দিকে গোপনে চেয়েছিলেন তিনি, এরকম একটা লজ্জাও তাঁর হলো। অনুভব করলেন, কিছুই নয়, অন্যান্যবারের মতো দেখাতে চায়ের ট্রের সঙ্গে গিয়ে ভালো হলো না। ভাগ্যে আয়না সামনে নেই।

পুরনো খবর একটু দেওয়া যাক।

দাঙ্গা-রাজনীতির ব্যাপারটা কমে এসেছে তখন, এক সন্ধ্যায় খবরের কাগজের দাগিয়ে-দেওয়া অংশগুলিতে চোখ বুলিয়ে যখন সান্যালমশাই গ্রামের বাইরের পৃথিবীর খবর নিচ্ছেন এবং রাজনীতির আলাপ করছেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন, 'সদানন্দ, আমার মনে হচ্ছে বাঁশ যেমন একটি একটি করে গ্রন্থি পার হয়, তেমনি কোনো গ্রন্থি পার হয়েছে তোমার মন'।

'কেন বলুন তো'?

'শিপিং ইন্টেলিজেন্সে আমার আগ্রহ থাকার কথা নয়, দেখছি সে-খবরগুলি আজকাল প্রায়ই দাগানো থাকে'।

সদানন্দ বললো, 'তা থাকে, ওটা রূপুর কীর্তি'।

চোখের সম্মুখ থেকে কাগজ সরিয়ে সান্যালমশাই প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ছাত্র কি কোথাও যেতে চায়, কিংবা কারো আসার প্রতীক্ষা করছে'?

'ওটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাই নে, কারণ ওটার সঙ্গে লেখাপড়ার ব্যাপারটা তত সংযুক্ত নয়। তবে চারিদিকে একটা সাজোসাজো রব উঠেছে বটে'।

'কীরকম'?

'রূপুর বন্ধু, পরে শুনলাম, মন্মথ রায়মশাইয়ের ছেলে বিলেতে যাচ্ছে কী একটা শিখতে। পাঁচ-ছ বছর ধরে নাকি শিখবে। সে রূপুকে চিঠি দিয়েছে'।

তখনকার মতো সান্যালমশাই কাগজ ও তামাক নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। পরে তাঁর মনে হলো, যখন তিনি জেনেছেন তখন রূপুকে ডেকে জিজ্ঞেস করাই উচিত। রূপু জানবে যে তিনি জেনেছেন, অথচ কেউই কথাটা উত্থাপন করছে না, সে যেন এক গোপনবৃত্তি। আর বিস্ময়ের এই যে, এ-ব্যাপারে অনসূয়া একেবারে নীরব।

বাগানের মেহগনির অংশটিতে কাটবার উপযুক্ত গাছ দুটি সান্যালমশাই নিজেই নিজেই চিহ্নিত করে

দিয়েছেন। চার লোক জন নিয়ে গেছে অতি সন্তর্পণে গাছ দুটি বেড়ে নামাতে। পাশের অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট গাছগুলিকে নষ্ট করলে চলবে না। কথাটা ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি, আর তা সবসময়ে সহজও নয়। বাড়িটা তো উঠছেই যদিও দাঙ্গার পরের আর আগের মন এর নয় যেন। কাঠ সিজনড হতেও তো সময় লাগে ভালো কাঠ সব সময়েই মূল্যবান, নিছক পণ্য হিসাবেও। সকাল থেকে সান্যালমশাই রূপুর সঙ্গে আলাপ করবেন বলে মনস্থির করে রেখেছেন। তাঁর মনে হলো, এখন রূপুকে বাগানেই পাওয়া যাবে। বনস্পতি পাতনের মতো ব্যাপার নিশ্চয়ই তাকে আকর্ষণ করবে।

সান্যালমশাই বাগানে গিয়ে খানিকটা সময় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। তার সাড়া পেয়ে রূপু তার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমন ব্যাপার রোজ হয় না। বাগানে অনেক গাছ আছে যার সঙ্গে কোনো গল্প জড়ানো আছে আমগাছগুলি কোনো কোনোটি বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ থেকে আনানো। বোটানি ছাত্রদের জন্য তৈরি বাগান নয় যে টিনের প্লেটে সব তারিখ নামধাম লিপিবদ্ধ থাকবে। রূপু যেখানে একটি গাছ থেকে আর একটি পৃথক করতে পারে না সান্যালমশাইয়ের কাছে তখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বশালী। কোন গাছ কবে মুর্শিদাবাদ থেকে কলম হয়ে এসেছিলো কোনটা খাঁটি অলফন্সো কোন লাইনটা বোম্বাইয়ের, এসব রূপু সাগ্রহে প্রশ্ন করতে লাগলো এবং তেমনি সাগ্রহ উত্তর পেলো। হিমসাগরের লাইনটা যে বাগানের ঠিক মাঝখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে জামরুলগাছের কুঞ্জটাতে মিশেছে এটা যেন একটা আবিষ্কার।

সান্যালমশাই বললেন 'হ্যাঁ রে রূপু তুই নাকি বিলেতে যাচ্ছিস'?

রূপু হকচকিয়ে গেলো তারপর বললো তুমি না পাঠালে কী করে যাবো'?

যদি পাঠাই, কী করবি'?

তাও তুমি বলে দেবে।

সেখানে তো সবাই ইংরেজিতে কথা বলে। কথা বলতে বলতে থেমে দু একটা কথা বাংলায় বলে জিবিয়ে নিবি এমন উপায় নেই'।

রূপু খিলখিল করে হেসে উঠলো। পরে বললো, যদি এখনি যেতে দিতে বড়ো ভালো হতো। নিমাই যাচ্ছে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে'।

'তার বাবার খনি আছে। সে ফিরে এসে সেখানে কাজ করবে। তুমি কী শিখে আসবে? তোমার বাবা তো কৃষক'।

রূপু বললো, 'আমি যদি ডাক্তার হই'?

'তা মন্দ নয় কিন্তু অনেকদিন যে সেখানে একা একা থাকতে হবে' প্রায় বছরদশেক। সেখানকার স্কুলের পড়া শেষ করে তার পরে ডাক্তারি পড়া'।

'মাঝে মাঝে ছুটিও তো পাবো।

অনেকক্ষণ গাছের ছায়ায় ঘুরে বেরিয়ে সান্যালমশাই গল্প করলেন রূপুর সঙ্গে। অবশেষে তাঁর মনে হলো ছেলের মন খানিকটা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

এক সন্ধ্যায় সেদিনের ডাকে-আসা চিঠিটা পড়ে সান্যালমশাই কথাটাকে অনসূয়ার সম্মুখে উল্লেখ করলেন। বললেন, 'এতদিন আলাপটা শিশুমহলে ছিলো, এখন দেখছি বড়োদের দরবারেই উঠে এলো। তোমার ভাই মন্মট্ চিঠি লিখেছে'।

মন্মথ রায়ের নামোল্লেখ এর আগেও হয়েছে। তিনি অনসূয়ার সহোদর নন, এ গ্রামের রায়বংশের ছেলে। গ্রামে এরকম একটা প্রবাদ আছে যে, কয়েক পুরুষ আগে জলদস্যু সান্যালদের এক ছেলে রায়দের এক মেয়েকে রাক্ষস-মতে বিবাহ করেছিলো। প্রবাদ এও বলে, রায়দের সেই মেয়েই পলায়নের খিড়কি দরজা দেখিয়ে না দিলে চারজনমাত্র তরোয়ালবাজ রায় জমিদারের প্রাসাদ ঘেরা বাড়ির যাত্রার আসরের চিক-ঘেরা অলিন্দ থেকে একশো ঢালির চোখের সম্মুখ দিয়ে পালাতে পারতো কিনা সন্দেহ। মন্মথ রায়,

সান্যালমশাই তাকে মন্মট্ বলেন, এই সুবাদে রসিকতা করে বলেছিলো—আমার বোন অনসূয়া আছেন বলেই লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা। প্রকৃতপক্ষে তোমরা বায়দের লক্ষ্মী চুরি করে এনেছিলে।

অনসূয়া বললেন, 'মন্মথদাদা লিখেছেন, কই দেখি'?

চিঠিটা পড়া শেষ হলে তিনি আবার বললেন, 'তুমি কী করবে ঠিক করেছো'?

সান্যালমশাই বললেন, 'আজকাল যেন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি নে। তোমরা সকালে এত তাড়াতাড়ি ছুটছো যে আমি ভাবছি কোনো কোনো চাল আমি আগে থাকতে দিয়ে রাখবো কিনা। এখন মনে হচ্ছে রূপুর বিদেশ যাওয়ার কথা আমার অনেক আগেই চিন্তা করা উচিত ছিলো'।

'ছেলেকে যেতে দেবে'?

'মন্মট্ নিজে যাচ্ছে ছেলেকে সঙ্গে করে। নিজেও কিছুকাল কাটাবে সে দেশে। লোকে জানবে ছেলের শুভকামনায় এই বিদেশে থাকা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ছোটোবেলায় সে যে কাল্পনিক বোহেমিয়ার স্বপ্ন দেখতো সেটা পৃথিবীতে আছে কিনা ত খুঁজে দেখাই তার ইচ্ছা। নতুবা নতুন কোনো ব্যবসা মাথায় ঘুরছে। সে যা-ই হোক। রূপু সেখানে গিয়ে মনস্থির করাব সুযোগ পাবে। যদি ভালো না লাগে তাব সঙ্গে ফিরবে। অন্তত বেড়ানো হবে'।

এইভাবে রূপুর বিদেশ যাওয়া স্থির হয়েছিলো।

বাংলোটির নাম হয়েছে 'সুমিত'। রূপুর দেয়া নাম। গেটে রূপুর পরিকল্পনা অনুযায়ী কালোপাথরের ট্যাব্‌লেটে ব্রোঞ্জের অক্ষর বসিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় নামটি লেখানো হবে। ট্যাব্‌লেটটা সদর থেকে তৈরি হয়ে এসেছে, আজ মিস্ত্রিরা বসাবে। চারু ওভাবসিয়ার রূপুকে ডাকতে এসেছিলো, রূপু দাদা ও বাবাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না। তার পীড়াপীড়িতে সান্যালমশাই এবং নৃপনারায়ণ দুজনেই গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পথে রূপু বললো, 'বাড়িটা ভালো হয়নি, দাদা'?

'অনুপম হবে। এবার এসে বাড়িতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখছি'।

'তুমি ইলেকট্রিকের কথা বলছো? নাকি দীঘির ঘাটের'?

'হ্যাঁ, ইলেকট্রিকের কথাও বৈকি। বেশ আধুনিক হচ্ছো যেন'। নৃপনারায়ণ হাসলো।

ছুতোর মিস্ত্রিদের টিনের চালা থেকে কিছুদূরে বাগান ঘেঁষে আর-একটি খড়ের চালা। সেটার দিকে ইঙ্গিত করে নৃপ বললো, 'ওখানে কী হচ্ছে রূপু'?

'টবে গাছ তৈবি হচ্ছে। বেশির ভাগ টবই অবশ্য 'সুমিত-এর জন্যে'।

নৃপ বললো, 'যেভাবে বাংলোটাকে সাজাচ্ছো তাতে মনে হয় সমারোহের কিছু একটা প্রতীক্ষা করছো তুমি'।

রূপু বললো, 'আমার সবটুকু প্ল্যান কাজে লাগানো হয়নি। একটা আঁকাবাঁকা ঝিল কাটতে হবে। সেই ঝিলে একটা ছোটো ব্রিজ থাকবে যেমন, তেমনি থাকবে ছোটো একটা বোট'।

'তাহলে তার পাড়ে তারের জালে ঘেরা ঝোপেঝাড়ে বুনো হাঁস আর সারস রাখা যায় কিনা ভাবতে হয়। কিন্তু বুড়ো মালী শুনেছি বর্তমানে রাতকানা। বিলের জলে ডুবে প্রাণ না দেয়'।

'তা যদি বলো ব্রিজে একটা লাল আলোর ব্যবস্থা থাকবে'।

সান্যালমশাই বললেন, 'রূপু, তোমার সব পরিকল্পনা দাদাকে শুনিয়েছো'? এই বলে নিজেই হাসি মুখে তার দু-একটি পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। 'আর একটা বাংলো উঠবে। এটার মতো তত রংদার হবে না, কিন্তু আয়তনে কিছু বড়ো হবে। সেটার নাম হবে 'অনসূয়া ভবন'। সেখানে নাকি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে'।

রূপু লজ্জায় মুখ নিচু করে রইলো।

নৃপনারায়ণ রূপুর দিকে হাসিমুখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আর এই সুমিত্তবাড়িটা'?

রূপু বললো, 'গেস্টহাউস হতে পারে, অনেককিছু হতে পারে, একটা আধুনিক স্কুল হলেই-বা দোষ কী'?

'সদানন্দ মাস্টারমশাইয়েরটি, শুনছি প্রায় উঠে যায়'?

'তা কেন? সেদিন পোরট্রেট আঁকার সময়ে বউদি মাস্টারমশাইকে অন্যরকম স্কুলেব কথা বলছিলেন, যেখানে সিল্কের খদ্দব, তসর এসব বোনা শেখানো যায়, চামড়াব স্যান্ডাল, ব্যাগ এসব তৈরি কবা শেখানো যায়। সে রকম হতে পারে'।

নৃপ বললো, 'আচ্ছা! কিন্তু তোমাদের সেই স্কুলে অত লোকে যদি সিল্কের খদ্দব বুনতে শিখে যায় সে তো অনেক খদ্দর হতে থাকবে। কিনবে কে? তুমি বোধ হয় জানো না কাপড় একরকম ফাইন হলে মিলের কাপড় খদ্দব থেকে সস্তা হয়'।

রূপু বললো, 'সিল্কের খদ্দর পরার লোক নেই? মনে কবো, বউদিবই তো তা দরকার'।

নৃপ হেসে ফেলে বললো, 'তা ঠিক, ছোটভাই, তোমাব সেই খদ্দর জোগান দেয়ার রাইটও আছে বটে। অন্যদিকে দেখো, তুমি এতসব আধুনিক কবছো, টেনিস লনটাকে কিন্তু একদম উপেক্ষা করেছো। দেখলাম আকন্দর জঙ্গল হয়েছে'।

রূপু নৃপনারায়ণের খদ্দরেব পায়জামা-কুর্তাপবা চেহাবাটায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাঃ! কে খেলবে টেনিস? তুমি'?

'কেন, আমি, তুমি, মনসা...'।

'তাহলে কাল থেকেই লোক লাগিয়ে দিলে হয'।

নৃপ চাপা হাসির পিছনে কিছু ভাবছে। সান্যালমশাই হাসছেন কিনা মনে মনে, ভাবছেন কি না, বোঝা গেলো না ; মুখটা সন্তুষ্ট কিন্তু নির্লিপ্ত।

সন্ধ্যায় সান্যালমশাই নৃপনাবাযণকে বললেন, 'তোমাব ভাই বিদেশে যাচ্ছে তা বোধহয় শুনেছো'?

'রূপু নিজেই বলছিলো। জিজ্ঞাসা করছিলো, সে দেশটা কী বকম হবে। ছোটোবেলায় পড়া একটা কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়ে দিলাম, সেখানে চার কুড়িতে আশি হয, দরজাগুলো কাঠের, এবং এক গজ সেখানেও এক গজ'।

'তুমি ছিলে না যখন এ ব্যাপারটা ঠিক হয়, তাই এ বিষয়ে তোমাব মত জানা যায়নি'।

'যখন বাঙালিদের কালাপানির ভয় ছিলো সে যুগে য়ুরোপে যাওয়ার কথা আমাদেব বংশের কারো মনে হয়নি। ভালোই হয়েছে। তাই বলে এখনো পিছিয়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই'।

'য়ুরোপে যাওয়াকে এগিয়ে যাওয়া বলো? আমি আশ্বস্ত হলাম। ভেবেছিলাম পাছে তুমি বিষয়টিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারো ইংরেজবিদ্বেষ থেকে'।

সান্যালমশাই কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালেন। কিন্তু সেটায় মন না দিয়ে বললেন, 'খোকা, আমার মামার বাড়ির দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিলো। তোমাদের কালাপানির গবেষণায় সাহায্য করবে। সেই গ্রামের এক ছেলে বিলেতে গিয়েছিলো কৃষিবিদ্যা শিখতে, ফিরলো এক ঘেসো-মেম সঙ্গে করে। যথারীতি তার পরিবারের হুঁকো বন্ধ হলো। ছেলেটির কী অভাবনীয় মতি হলো যে চাকুরিস্থল থেকে এসে গ্রামকে সে আলোকিত করার চেষ্টা করলো। তখন সে-গ্রামে এক টুলোপণ্ডিত বাস করতো। তার ধারণা ছিলো, সে রূপ-সনাতন কারো একজনের বংশধর। সে-ই বললো—বাপু হে, বিয়ে করাটা কিছু দোষের নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীকে তা করেছিলেন। তার ফলে জম্বুবান জাতটাই মানুষ হয়ে গেলো। এই বলে তিনি এমন হাসলেন যে সেই রোগাপটকা বুড়ো বামুনের হাসির ছোঁয়াচ লেগে গেলো সারা গ্রামে। ছেলেটি তার চাকুরিস্থলে ফিরে গিয়ে ডিসকোর্স না ডেসপ্যাচ কী একটা অন্ হিন্দুম্যারেজ লিখেছিলো'।

নৃপ হো-হো করে হেসে উঠলো। সান্যালমশাইয়ের তামাক এসেছিলো। গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে ভৃত্য চলে গেলে তিনি বললেন, 'কালাপানি কথাটা চাটগেঁয়ে লস্করদের ভাষা কিনা জানা দরকার। তা যদি হয়, তুমি বলতে পারো, যারা কালাপানি নিয়ে হিন্দু সমাজকে ঠাট্টা করেছে তারা যে চাটগেঁয়ে শিককাবাবের দোকানে কথাটা শিখেছিলো তা ধরে নেওয়া যায়। সেকালের কলকাতায় চাটগেঁয়ে রুটি ও চিংড়ি ভাজার দোকান ছিলো বোধহয়'।

নৃপ কিছুসময় লঘু সুরে বলা সান্যালমশাইয়ের কথা কয়েকটিকে অনুভব করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু একসময়ে আবার নিজের হাতের পত্রিকাখানি বন্ধ করে বললো, 'একটা ব্যাপার কিন্তু সামঞ্জস্যহীন। তুমি নতুন করে ঘরবাড়ি তুলছো গ্রামে আর রূপুকে পাঠাচ্ছো বিদেশে। সে কি ফিরে এসে এই গ্রামেই থাকবে'?

'কেন থাকবে না? গ্রামে থাকা না-থাকার সঙ্গে যুরোপ যাওয়ার কিছু যোগ আছে? এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে চাটগাঁয়ের লস্কর যারা বছরে দুবার বিলেতে যায় তারা ছুটি পেলেই গ্রামেই ফিরে আসে। অথচ বাবা এ গ্রাম ছেড়ে গেলো যুরোপ না গিয়েই'।

'তার কারণ, তোমার সঙ্গে পাল্লায় পারলো না'।

'তাও হতে পারে। কিংবা গ্রামমুখো হওয়াটাই একটা আলাদা মানসিক গঠন'।

'কিন্তু রূপু যে অতবড়ো ডাক্তার হয়ে আসবে সে কি গ্রামে বসে থাকার জন্যে'?

'তুমি ঠকে যাচ্ছো। আমি খুশি হয়েছি রূপুকে তুমি গ্রামোদ্যোগ করতে বলোনি বলে। কিন্তু তুমি কি বড্ডো সুদের কথা ভাবছো না'?

নৃপ হাসিমুখে বললো, 'কেন, কেন'?

'শিক্ষার খরচটা বৃথা না যায় সেই মতলবই তুমি আঁটছো। চিন্তার কথাই হতো যদি নির্জনতার কোনো মূল্য না থাকতো। ভাবো না হয় সেই ঠাকুর জমিদারের কথা; তোমাদের মা যাঁর কথা বলে থাকেন'।

'আপাতত এর কোনো উত্তর নেই। শান্তিনিকেতন কি খুব প্রভাবিত করেছে রূপুকে? তবে এ কথা বলা যায় রূপুর হাতে তোমার জমিদারির শ্রীবৃদ্ধি হবে না'।

'পুত্রকে না দিয়ে পৌত্রদের হাতে ওটাকে তুলে দেওয়ার নজির আছে'। বলে সান্যালমশাই হাসতে লাগলেন।

কিন্তু রূপুর বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারি পড়া যে মুখ্য নয় তা যেন সান্যালমশাইয়ের মনোভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট।

নৃপনারায়ণ গ্রামে আসবার তিন চার সপ্তাহ পরে কথাটা উঠলো, সে বিলমহলে যাবে। অলিন্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করা যায় দু-একজন বরকন্দাজ তাদের পিতল-বাঁধানো লাঠি আমরুলের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে ঝকঝকে করছে। বিলমহল থেকে কয়েকজন জেলে এসেছে। তাদের ফরমায়েস মতো নৌকোর দাঁড় ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। বাড়ির ভিতরে তারণের মা-ই তোলা-উনুন তৈরিতে সব চাইতে পারদর্শী, সে নানা গড়নের কয়েকটা উনুন তৈরি করে রোদে দিয়েছে, এবং সেগুলির খবরদারি করছে। রান্নার মহলে মুগ শুকিয়ে ডাল তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে। ঢেঁকিশালে নৈমিত্তিক কাজ ছাড়াও কাজ হচ্ছে, বিল মহলের জন্য দুরকম চালই লাগবে। রান্নার মশলা যেখানে ভাজা হচ্ছে সেখানে দাঁড়ানো যায় না। তীব্র সুগন্ধে নাক জ্বলে ওঠে, চোখে জল আসে।

অনসূয়ার মনে পড়লো তাঁর প্রথম যৌবনের কথা। তখনকার দিনে সান্যালমশাই প্রায়ই বিলমহলে যেতেন। যাবার দিন ছলছল চোখে বিদায় দেওয়াই নয় শুধু, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত দীর্ঘ দুঃখের রাত্রি অতিবাহিত করা, ঝড়ের রাত্রিতে জানলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ্যবিধাতার কাছে আকুল

প্রার্থনা করা—বহুকাল তাঁকে স্বাভাবিক জীবনের উপাদান হিসাবে এগুলিকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো। কাজেই নৃপ বিলমহলে যাবে শুনে তিনি ততটা বিস্মিত হলেন না। কিন্তু সেখানকার কাছারি বাংলা কী অবস্থায় আছে, বজরা বা বোটে রাত কাটাতে হবে কিনা, তাহলে বোটের অবস্থা কীরকম আছে, এ সব প্রশ্নও তুললেন। তিনি জানতে পারলেন সান্যালমশাইয়ের সেই বজরাটা এখন আর নেই। নায়েবের জন্য যেটি কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে সেটা আছে। সেটাও খুব ছোটো নয়—চার কামরার।

কিন্তু অনসূয়া জানতে পারলেন জমিদারির কাজে নৃপনারায়ণ বিলে যাচ্ছে না, প্রমোদ-ভ্রমণই উদ্দেশ্য এবং তার অংশ হিসাবে শিকারের ব্যবস্থাও হচ্ছে। সদানন্দ সঙ্গে যাচ্ছে না , দু-তিনজন কর্মচারী যাচ্ছে যাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে—নৃপনারায়ণের যা নেই।

তিনি সান্যালমশাইকে বললেন, 'সেখানে কি শিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে'?

'ব্যবস্থা এমন কিছু নয়। সেখান থেকে যারা এসেছিলো তারা বলছিলো বটে বিলে শিকারের মতো পাখি প্রায়ই থাকে, আর তাছাড়াও বিলের জঙ্গলে কয়েকটি বাঘ উৎপাত শুরু করেছে'।

আবার যখন অনসূয়া কথা বললেন তিনি মন্তব্য করলেন, 'শিকারের উদ্যোগ হচ্ছে এ আমি জানতাম না'।

তাঁর মনটা ভার হয়ে গেলো। জীবনের একটা ভঙ্গি আছে যার সঙ্গে বিলে-জঙ্গলে পাখি শিকার করে বেড়ানো খাপ খায় না। যেমন খাপ খায় না নাচওয়ালীর নাচ, কিংবা মদের নেশা। অনসূয়ার মনে পড়লো, সেই অনেক আগে একবার মন্মথ রায়ের শিকার ব্যবস্থার মাঝখানে চিঠি লিখে শিকার বন্ধ করতে পেরেছিলেন। দেখা যাচ্ছে চিরকালের জন্য তা বন্ধ হয়নি।

সেই অনেকদিন আগে স্বামীকে যে যুক্তিগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলোও মনে ফিরে এলো। তিনি বললেন, শিকার, মদ, নাচওয়ালী এসব সামন্তপ্রথার রোগ, আমি এমন মনে করি না। রোগও নয়, বৈশিষ্ট্যও নয়। শহরের ব্যারিস্টার পাড়ায়, দোকানদারদের মধ্যে, অধ্যাপক, ডাক্তার, হকার, গ্রামের ডোমপাড়ায় মদের কিছু ঘাটতি নেই। তাদের মধ্যেও খেলার ছলে প্রাণীহত্যা পাবে। সিনেমায় যদি, ক্যাবারেতে যদি নাচওয়ালী, নিজের বৈঠকখানায় তুলে আনলেই তারা সামন্তদের বৈশিষ্ট্য হয় না, যে তাকে ধরে রাখতে হবে।

পুরনো অনুভূতির স্মৃতিতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে অনসূয়া যেন কাউকে লক্ষ্য করে বললেন, আসলে, ভেবে দেখো, খদ্দরপরা নৃপর সঙ্গে শিকার করা কি মানায়? খদ্দরটা কি জীবনের একটা ভঙ্গি নয়? ইমেজটাকে এভাবে নষ্ট করে দেবে?

কিন্তু কথাগুলো মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে না-উঠতে কে যেন সেখানে বলে উঠলো, তা কেন, তা কেন ; আর তাহলেও দোষ দিতে পারি না, একজনের প্রভাব তো সেই সেবার সান্যালমশাইও স্বীকার করে নিয়েছিলেন, নৃপর এই পরিবর্তনেও যদি অন্য কারো প্রভাব?

সান্যালমশাই বললেন, 'কথা কইছো না'।

অনসূয়া যেন ভয় পেলেন। কেউ যেন বললো, সেদিন এখানেই, অনসূয়া, সুমিতির জন্য পৃথক বাড়ি করার কথা বলে ফেলে, নিজেকে ভয় করছো।

অনসূয়া বললেন, 'তুমি পড়ো না হয় এখন'।

তিনি উঠে গেলেন।

রূপু এসে বললো, 'মা, দাদার সঙ্গে আমি যাবো'?

'তুমি কোথায় যাবে? এই তো কয়েকদিন পরে কতদিনের জন্যে তুমি চলে যাচ্ছো। এখন কি আর তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি'?

রূপু হাসিমুখে চলে গেলো।

কিন্তু নৃপনারায়ণের বিলমহলে যাওয়ার ঠিক আগের সন্ধ্যায় সুমিতি এসে দাঁড়ালো কাছে। আজকাল

কাজের ভার কিছু কমে গেছে অনসূয়ার। এটাও দাঙ্গার সময় থেকে শুরু। কতকটা যেন সুমিতিকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যেই সাংসারিক হিসাবপত্র রাখবার দায়িত্বটা সুমিতির হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। প্রচুর রঙিন উল এনে একটা গালিচা বুনতে শুরু করেছেন অনসূয়া সেই অবসরে।

'কিছু বলবে তুমি, সুমিতি'?

'কাল একটু বিল দেখতে যাবো—' কিছুটা-বা সলজ্জ ভঙ্গিতে বললো সুমিতি।

'বিল দেখতে মানে, খোকার সঙ্গে? বিল তুমি দ্যাখোনি, দেখতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার ছেলের অসুবিধা হবে না তো'?

'ধাত্রী বলছিলো তা হবে না। আর তাছাড়া আপনিই তো রইলেন'।

অনসূয়া একটু হেসে বললেন, 'আমার এ সংসারে অনেকদিন হলো, সুমিতি ; আমি কিন্তু এ পর্যন্ত বিল দেখিনি। যাও'।

অনসূয়া সান্যালমশাইকে পেলেন লাইব্রেরিতে। হেঁট হয়ে নিচের দিকের তাকে একখানি বই খুঁজছিলেন তিনি।

অনসূয়া বললেন, 'গল্প করতে এলাম'।

'চলো তাহলে। আমিও বেঁচে গেলাম। সদানন্দর জ্বালায় 'থরো'র লেখা বই আর খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই'।

অনসূয়া বললেন গল্পের ঝোঁকে, 'কোন থরো? সেই যে যিনি উত্তরাধিকারের অর্থবিত্ত প্রতিষ্ঠাকে কুকুরের লেজে বাঁধা টিন বলেছেন'।

'কতকটা বটে'।

পুঁথিঘরের একটি কোণে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসলেন দুজনে।

'সুমিতিও যাচ্ছে'।

'এ খবর তো জানতাম না। ভালোই হবে। বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে ওরা পরস্পরকে আরও ভালো করে চেনে এটা বোধহয় লাভজনক হবে'।

'নৃপর ছেলের কথা ভেবেছো'?

'ধাত্রী রয়েছে তো। তোমার উপরে নির্ভর করে এ বাড়ির এতগুলো লোকের যদি চলে, তবে ফিডিং বট্‌ল্ করে একটু দুধই যার একমাত্র দাবি তার কেন চলবে না'?

অনসূয়া উঠে নিজের ঘরে গেলেন। কুলুঙ্গিতে শিবমূর্তির সম্মুখে ঘৃতের প্রদীপটি জ্বলছে। সমস্ত বাড়িটার বাসকক্ষগুলোয় যে-কয়েকটি প্রদীপ আগে সন্ধ্যায় জ্বলে উঠতো তার মধ্যে এই একটি অবশিষ্ট আছে বলেই যেন এটি আজকাল অনেকক্ষণ জ্বলে। সেখানে গিয়ে কিছুটা সময় তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনে হলো দাঙ্গার সময়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে এই জায়গাটাতেই প্রার্থনা করে তাঁর দিন কেটেছে। একটু লজ্জিত হলেন এইজন্য যে, প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই প্রার্থনার সময় কমে গেছে, ঐকান্তিকতা ফিকে হয়ে এসেছে। অনসূয়া একটা ছোটো ধূপদানে কিছু কালাগুরু জ্বালিয়ে দিলেন। সেই দাঙ্গার সময়ে তাঁর বাল্যের প্রার্থনাগুলোই যেন বেশি মনে পড়তো। বাবার পাশে বসে অতিশৈশবে যে-প্রার্থনা তিনি করতেন সেগুলো যেন মনকে আশ্বাসে এবং শৈশব নির্ভীকতায় পূর্ণ করেও দিতো। তারই একটা প্রার্থনাকে মনে মনে বেছে নিয়ে তিনি 'পিতা নোহসি' বলে শুরু করলেন। কিন্তু অনেকটা সময় চেয়ে থেকেও তন্ময়তা কিছু এলো না। অকস্মাৎ চোখের জলের কাছাকাছি গিয়ে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার হৃদয় পুত্রহীন কোরো না, পুত্রহীন কোরো না'।

খবরটা পেয়েও মনসা যথাসময়ে আসতে পারেনি। সে ভাবলো অনসূয়া শাশুড়িকে লেখেননি, কাজেই যাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য অন্য প্রতিবন্ধকও আছে। নুলো বিপিন যে দামী দামী বাজি পটকাগুলো তৈরি

করেছিলো সেগুলোর একটা ব্যবস্থা না করলে যাওয়া যায় না। নুলো বিপিনকে বলতেই সে বললো, 'হাতের কাছে পদ্মা থাকতে চিন্তার কিছু কারণ নেই। কিন্তু প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে'? বিপিনের কথায় মনসার অস্বস্তি বাড়লো। খবরের কাগজের ভাষায়, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। যা ঘটবে তা কি দাঙ্গার চাইতে ভয়ঙ্কর হতে পারে? তখন কেউ কেউ দাঙ্গাকে মানি না বলেছিলো, এখন? শাশুড়িকে বলতেই তিনিও বললেন, 'সে কী, বউমা, আমি কি কোনোদিন নিষেধ করেছি'? তখন মনসা বাধাটার স্বরূপ দেখতে পেলো। শাশুড়ি নিষেধ করবেন না, পদ্মায় পটকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া যায়, এ দুটোর একটিও তার নিজের অজ্ঞাত নয়। মনসার মনে পড়লো, সুমিতিকে নৃপনারায়ণ সম্বন্ধে তার নিজের হৃদয়ের এমন কিছু সে বলে এসেছে যেটা একটা কুণ্ঠার মতো মনে জাগছে। রসিকতার ছলেও যদি সুমিতি নৃপনারায়ণকে সে সব কথা বলে থাকে তবে অনেক দিক দিয়েই মনসার পক্ষে নৃপনারায়ণের সম্মুখে মুখ দেখানো কঠিন হবে। কী যেন একটা যুক্তি ছিলো কথাগুলো বলার, সেটা মনে করার চেষ্টা করলো মনসা। দু-একদিন সাত-পাঁচ ভেবে এক দুপুরে মনসা শাশুড়িকে বললো, 'আমি একটু দাদাকে দেখে আসি'।

'যাও, কিন্তু বেশি দেরি কোরো না, বউমা'।

মনসা সান্যালবাড়িতে পৌঁছে দেখলো নৃপনারায়ণ এবং সুমিতি বিলে গেছে। সে শুনলো রূপু বিলেতে যাচ্ছে। ধাত্রীর ঘরে সুমিতির ছেলেকে সে আবিষ্কার করলো। তখন নিজের ছেলে এবং সুমিতির ছেলে নিয়ে সে সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ করে তুললো। তাদের স্নান করানো খাওয়ানো নিয়ে একদিন ধাত্রীকে ধমকেও দিলো—'তুমি পাস করা লোক বাপু, কিন্তু ছেলে হওয়াটা দেখে শেখা যায় না'। কিন্তু পাছে ধাত্রী কষ্ট পেয়ে থাকে এই মনে করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছুতো করে একটা দামী শাড়ি তাকে উপহার দিয়ে বললো। রান্নার মহলে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করতে করতে নৃপনারায়ণ ও সুমিতির সম্বন্ধে সে খবর সংগ্রহ করলো। একটি অল্পবয়সী পরিচারিকা যখন প্রকারান্তরে বললো তাদের শোবার ঘর আলাদা তখন মনসা গালে হাত দিয়ে বললো, 'ও মা, বলিস কী! বউদি বুঝি অনেক রাত পর্যন্ত মোটা মোটা বই পড়ে? কিন্তু জেঠিমার সামনে মুখেও আনিস নে'।

কিন্তু অনসূয়ার কাছে বসে তাঁর চুল বাঁধবার চেষ্টা করলো না সে কৌশল করে। বরং গম্ভীর সুরে বললো, 'তোমার কোনো অসুখ করেছে, জেঠিমা'?

'না'।

'করেছে বৈকি, নতুবা এমন রুক্ষ দেখাতো না'। কী হয়েছে বলো, নতুবা মাস্টারমশাইকে বলবো সদর থেকে ডাক্তার আনতে'।

অনসূয়া হাসলেন, 'দোহাই মা-মনসা, তুমি থামো'।

মনসা থামলো বটে কথাটাকে ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যই। সে বললো, 'জেঠিমা, যে-অনুমতি দিতে এত কষ্ট, না-ই বা দিতে'।

'মেয়েদের কষ্টই সইতে হয়'।

'তা যদি বলো, তাহলে বলবো হয়তো তুমি ভালোই করেছো'।

'এ কথা বললি যে'?

'আজ নয়। পরে জানাবো তোমার এ কষ্ট স্বীকারে লাভ হয়েছে কিনা'।

বিলমহলে যেতে তখনও দিনসাতেক দেরি। বিলমহলের তহশীলদার এসেছিল খবর পেয়ে। সে বজরা ইত্যাদি, বাংলো ইত্যাদিকে সাজিয়ে নিতে দিন সাতেক আরও সময় নিয়েছে।

তখন একদিন সুমিতিকে অবাক হতে হলো। নৃপনারায়ণ এরই মধ্যে একদিন বলেছিলো বটে, তার খদ্দরের ঝোলাটাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কথাটা যে সত্যি তা যেন প্রমাণ করতে হলো। খদ্দরের বদলে

গরদ উঠলো গায়ে, সদর থেকে ফরাসডাঙার ধুতি এসে গেলো। পিতামহীর কাছে পাওয়া সেই মণিটা আংটি হয়ে আঙুলে উঠলো। এ নৃপনারায়ণ যেন অনির্বচনীয়। কিন্তু কী ঘটেছে, অবাক হয়ে যাচ্ছে সুমিতি, যার ফলে যন্ত্রণা, সুখ, অপমান আর তেজের সেই যোদ্ধার বেশ ত্যাগ করতে হলো?

সেদিন রাতে মশারির ভিতর থেকে খাট থেকে নেমে এলো নৃপ। শোবার ঘরের সরু সোফায় বসে টেবল ল্যাম্পের ছোট সাদা বৃত্তটার মধ্যে বইসমেত দু হাত রেখে সুমিতি পড়ছে। ঘরের নীলাভ আলোর বড় বৃত্তটা ছোট সাদা বৃত্তটাকে তার কোলের উপরে কাটছে।

নৃপনারায়ণ বললো, 'কী পড়ছো'? সুমিতি বই-ধরা হাত দুটোকে একটু কাত করলে, মলাট দেখতে পেয়ে নৃপ আবার বললো, 'ওয়ালডেন, সেই বুড়ো থরো'?

সুমিতি হেসে বললো (সে তো না হেসে কোনো কথাই বলে না), 'ওয়ালডেন, লিখবার সময়ে থরো কি খুব বুড়ো হয়েছিলেন? জানি না'।

নৃপ খানিকটা দ্বিধা করলো, বললো পরে, 'বোধহয় বিশ্বাস হারানোর কথা। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না, আমরা যাঁকে প্রাণ মনে করতাম, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মেনে নিয়েছি, অন্য পথে গিয়েও যাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম, ইদানীং তাঁকে কেউ কেউ অচল সিকি বলতে আরম্ভ করেছে? সেই শুভ্রতা, সেই সবুজ, সেই উদার নীল যেন কোথাও হারিয়েছে'।

'এ কথা কি বিশ্বাস করবো যে তাঁর প্রভাব ইতিমধ্যে কমে যাচ্ছে'?

নৃপ একটু ভেবে বললো, 'যেন নেতাদের উপরে বেশি তা! আর তিনি নিজেও অনুভব করছেন, আমাদের চিন্তায় অস্বচ্ছতা ছিলো। এ কথা অস্বীকাব করা যায় না, আমাদের অহিংসা ভীরু ও দুর্বলের ছিলো। সে অহিংসা না বুদ্ধিদীপ্ত না শক্তিমানের। নতুবা এতবড় দাঙ্গায় সত্য ও অহিংসাকে আশ্রয় করে আর কাউকে দাঁড়াতে দেখা গেলো না, সুমিতি'?

সুমিতি বললো, 'পরিস্থিতিটা জটিল সন্দেহ নেই। তুমিও কি বিশ্বাস হারিয়েছো'? সুমিতি বেশ ভঙ্গি ভরে হাসলো। হতে পারে খদ্দর ছেড়েছো আজ। অস্বীকার করছি না আমার ধোঁকা লাগছিলো। ওদিকে স্বীকার করছি, আমারই লাভ, নতুন পোশাকে আরও ভালো লেগেছে যেন, কিন্তু এবার কী বলবে বলো। এইরকম অনুভব করতে করতে সুমিতি হাতের মোড়া বইটাকে টিপয়ে টেবল ল্যাম্পের গোড়ায় রাখলো। নৃপর দিকে তার বড বড় চোখ মেলে দিলো।

নৃপ বললো, 'অস্বীকার করে লাভ নেই। হিংসার্জিত স্বাধীনতার চাইতে অহিংসালব্ধ স্বাধীনতা বেশী ভালো এরকম মানতে দ্বিধা আসছে যেন। খদ্দরকে স্বাবলম্বন আর মিতাচার মনে কবতে সন্দেহ আসছে। হয়তো বিদেশী বণিককে আঘাত দেওয়ার কৌশল। জানো, নৌ-ধর্মঘটটা যখন মিটবার পথে, যখন ধর্মঘটীদের মনে কিছুটা কমেছে টেনশান, তাদের কেউ কেউ হেরে যাওয়া মানুষের ক্লান্তিতে হাসছিলো। বলেছিলো, অহিংসা, খদ্দর ও সত্য ছাড়াও তো দেশের অনেকটা জায়গার স্বাধীনতা আসছে, দেশের বাকি অংশে যদি অহিংসায় স্বাধীনতা আসেই'।

সুমিতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'পাওয়ার চেষ্টাটা কীভাবে হলো, তা কি কী পেতে চাই তার সমান মূল্যের নয়'?

নৃপ উত্তর দিতে পারলো না সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে বললো, 'তুমি কি আর একটু পড়বে? আমি বরং ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি। কত আর হয়েছে রাত'!

নৃপ চলে গেলে দরজার বাইরের অন্ধকার দেখে সুমিতি ভাবলো : এটাকে কি খদ্দরকৃচ্ছ্রতার প্রতিক্রিয়ামাত্র ভাবা যাবে না, এই গরদে ফিরে আসা?

কিন্তু এর চাইতেও বড়ো সমস্যা ছিলো সুমিতির। অথবা চিন্তার তুলনায় অনুভূতি গভীরতর বলে এরকম মনে হলো।

নৃপ ফিরে আসার দিনের সন্ধ্যায় সে তার শোবার ঘরের সাজসজ্জার অদলবদল দেখতে পেয়েছিলো।

ধাত্রীর ঘরে তার শিশুর খাট সরেছে। তার নিজের পালঙ্কটি সরেছে তার শোওয়ার ঘরের অ্যান্টিচেম্বারে। শোওয়ার ঘরের নতুন চওড়া পালঙ্কে বিছানা পেতে রাখছে দাসী।

সারাদিনই সুমিতির মনের কোথাও নতুন ধরনের শাড়ি পরার, নতুন করে চুল বাঁধবার ইচ্ছা ছিলো। বিশ্রামের সময় হয়ে এলে, সে দাসীদের তৈরি বেণী বাঁধা খোঁপা খুলে চুলগুলিকে মস্ত একটা এলো খোঁপায় জড়িয়ে নিয়েছিলো। শাড়ি পাল্টেছিলো। গলার হারটাকে বদলে নিয়েছিলো। সারাদিনে দু-তিনবার দেখা হয়েছে নৃপর সঙ্গে, কথাও হয়েছে, কিন্তু অন্য অনেক কথা যেন বলা হয়নি। মাঝখানের বিচ্ছেদের দিনগুলি যেন একটা সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহর যখন দেখা হয় না। একত্র অতিবাহিত শেষ রাত্রিটির সঙ্গে বর্তমানের সেই রাত্রিটি যেন একই লগ্নের দুটি পর্যায়। কথা বলার অপরিসীম সুখে কথা কবিতা হয়ে ওঠে, কথার চাইতেও অপরিসীম সুখ স্পর্শে। আর কপালে, কপোলে, গলায়, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হৃৎপিণ্ডে এই এক কবিতা অনুভব করা, দীঘল, মেদহীন, কিছু-বা শ্রান্ত শরীরটা একটা শুভ্র আদর্শ, যা তার পাশের বালিশে। যা তার নিজের।

কিন্তু দশদিনের মধ্যেই এমন রাত্রিও এলো, যে যখন বিশ্রামের সময় হলো, নৃপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'আসবো'?

'এসো'।

নৃপ হাতে একখানা বই নিয়ে ঢুকেছিলো। বললো, 'উপন্যাস যে এমন জিনিস তা মনেই ছিলো না, সুমিতি। অনায়াসে তুমি নিজের মনের বাইরে যেতে পারো'।

নৃপ বই খুলে বললো। সুমিতি আলোর স্ট্যান্ডটা ভাঁজ করে তার বইয়ের দিকে এগিয়ে দিলো, আর দেয়ালের আলোটা যেখানে হালকা নীল হয়ে পড়েছে সেখানে বসে উল বুনতে লাগলো।

সুমিতি সহজে মুখ তুলতে পারলো না ; একবার বললো, 'তুমি পান খাও? পান রেখে গিয়েছে'।

'না'।

সুমিতি মশলা এনে নৃপর হাতে দিয়ে আবার উল নিয়েই বসলো।

নৃপ উপন্যাসের নতুন পরিচ্ছেদের জন্য পাতা উল্টে নিলো। অবশেষে নৃপ বললো, 'ঘুম পাচ্ছে, সুমিতি'।

নৃপ শুতে গেলে, সুমিতি তার মশারি ফেলে দিলো, কোন জানালাটা খোলা থাকা পছন্দ করবে নৃপ তা জেনে নিয়ে অন্য জানালাগুলো বন্ধ করে দিলো। তারপর খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একসময়ে বললো, 'ছেলেকে দেখে আসি'।

'যাও'।

সে রাতে আহ্বান ছাড়াই ফিরে এসেছিলো সুমিতি। দেখেছিলো, চিন্তা করার সময়ে গালে হাত রাখা যেমন স্বাভাবিক, ঘুমের মধ্যেও নৃপর একটা হাত তেমন রয়েছে।

কিন্তু রোজ এমন হয় না। সংযুক্ত শয্যা বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কেউ বলেন কর্তব্য। সুমিতি নিজেকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করলো বটে, কিন্তু অনেক রাত্রিতে শোবার ঘরের অ্যান্টি-চেম্বারে কতকটা পালানোর ভঙ্গিতে রাত কাটিয়েছে সে একাধিকবার—এ অবস্থায় দাসী তাকে আবিষ্কারও করেছে।

এই অবস্থায় নিজের প্রেমকে বিশ্লেষণ করে দেখলো সে একদিন। তা অবশ্য পরীক্ষার উত্তর লেখার মতো ঠাণ্ডাভাবে হয় না। অনুভূতি ঠিকঠাক মনে পড়লে সে রাঙা হয়েও উঠতে থাকলো।

বিশ বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত ভালোবাসার কথা তার আদৌ মনে হয়নি। তখন পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছা ছিলো না। আই. সি. এস. অথবা ব্যারিস্টার হওয়ার কথা ভাবতে ভালো লাগতো। সমান বংশের সহপাঠিনীরা বিয়ের কথা, প্রেমের কথা বলতো। সমান বংশের কিছু পরিচিত কোন ছাত্রটি আই. সি. এস. বা আই. পি. এস. বা ব্যারিস্টার হয়ে নিশ্চয়ই আসবে উপযুক্ত প্রেমপাত্র হয়ে, এরকম তারা আলোচনা করতো। সুমিতির কাছে নিছক নিষিদ্ধ আলাপের সাহস দেখানোর

বেশি কিছু মনে হয়নি সেসব কথা। যখন গভীর হওয়ার চেষ্টা করতো সে আলাপ, তখন তা সুমিতির কাছে হাস্যকর মনে হতো ; কারণ তাদের কথায় সেসব যুবক রবীন্দ্রনাথের তৈরি অমিত রায়ের নামের পরিহাস হতো।

তাদের অনেকেই মাঝে মাঝে খদ্দর পরতো। দেশবন্ধু এবং জে. এম. সেনগুপ্তর পরে তখন খবরের কাগজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খদ্দর-পরা মানুষদের সংবাদ না-পড়াটাকে অন্যায় মনে হতো. সাহেবদের দিকে ঝোঁকটা নিশ্চয়ই আর আধুনিকতা ছিলো না। স্যার উপাধি পাওয়া তখনও ব্যবসায়-সাফল্যের নিরিখ হলেও, তখন আর তা স্বপ্নে দেখা আদর্শ ছিলো না। সহপাঠিনীদের মধ্যে খদ্দর পরে, শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে, সারা দিনের রোদে ক্লান্ত হয়ে ধুলো মেখে বাড়ি ফেরা দুর্লভ উদাহরণ ছিলো না। জানলা-দরজার পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি, ডিনার টেবিলের ঢাকনা ক্রমশ খদ্দবের হয়ে উঠছিলো। এতে অনেকক্ষেত্রে ফ্যাসানমাত্র ছিলো, অনেকক্ষেত্রে আন্তরিকতা ছিলো। কিন্তু লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনার ছিলো বহাল। সে সব টেবিলের খদ্দবের ঢাকনার উপরে পাত্রগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের সিরামিক হয়ে উঠলেও টেবল সাজানোটা বিলেতি কায়দার ছিলো। বাইশ থেকে পঁচিশ তো তার থিসিস করতেই কেটে গেলো। তার পক্ষে তখন বিয়েটিয়ের কথা যেমন, তেমন রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় যোগ দেবারও সময় ছিলো কি? অন্যদিকে তার থিসিসের বিষয়টাই যেন গ্রামের অর্থনীতির দিকে তাকে টানছিলো, তেমন বিয়ের কথা উঠলে সে সংকীর্ণ হতো, পুরুষ জাতটাকেই এড়িয়ে চলার বিষয় মনে হতো। কথাটা হয়তো ভালো নয়, তেমন স্পষ্ট করে বলাও নয়, কিন্তু তার মনে হতো যেন প্যারাসাইটের মতো যা তোমাকে নোংরা করে। তার মাসতুতো, খুড়তুতো দিদিরা বিয়ের পনরো বছরের মধ্যে গোলালো, মোটা পুতুল হয়ে গিয়েছে, যারা শুধু ইংরেজী কায়দায়, হয়তো খদ্দরের, হয়তো শান্তিনিকেতনের চাদর বিছিয়ে, পার্টি দেয়। তাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় এই কায়দাই। যদিও খুঁজলে দেখা যাবে, কায়দাটা নিম্নমধ্যবিত্ত ইউরেশিয়ান কোনো গভর্নেসের কাছে শেখা, যাব পক্ষে সত্যিকারের ইংরেজি উচ্চমধ্যবিত্তের কায়দা শেখাও সম্ভব নয়। পুরুষরা যেন অপবিত্র, ক্ষুধার্ত কিছু—এরকম মনে হতে থাকলে, সুমিতির এরকম ভয়ও হয়েছিলো, সে কি যাকে ফ্রিজিড বলে তেমন কিছু? একসময় ভেবেছিলো সে হয়তো তাই, আর তার জন্য দায়ী হয়তো তার দিদি, সুকৃতির মৃত্যু। যদিও সেই মৃত্যুর সময়ে তার বয়স হয়তো চাব. হয়তো পাঁচ, শোক মনে থাকার কথা নয়।

এই সময়ে থিসিস শেষ করে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন স্বাভাবিকভাবে, ঠিক তখনই শুভ্র খদ্দরে মণ্ডিত দীঘল চেহারার হিবিয়াস কর্পাসের মামলায় হাইকোর্টের রায়ে সেদিন সদ্য বেরিয়েছে এমন নৃপনারায়ণ এসেছিলো তাদের বৈঠকখানায়। কাকারই মক্কেল, কাকা পরিচয় দিয়েছিলেন 'আমাদের সুকৃতির বড় জায়ের ছেলে'। সেদিনের সন্ধ্যাতেই একবার, পরে রাতে ঘুমোতে গিয়ে আবার মনে হয়েছিলো সুমিতির, পুরুষ কখনো কখনো, (দেখো কাণ্ড) খদ্দরের মতো শুভ্র আর পবিত্র হতে পারে!

আর কথার আলোয় ঝকঝকে চোখ নয়, বরং রাত্রির আকাশের মতো ব্লু-ব্ল্যাক আর ভাবনায় গভীর ; এত লম্বা যে চিতার মতো রোগাটে মনে হয়, পাতলা ঠোঁট দুটোয় লিপস্টিকের ব্যবহার হয়েছে সন্দেহ হয় ; তাড়াতাড়ি চোখ নামালে, মস্তবড়ো দুখানা ধুলোমাখা স্যান্ডেলের উপরে প্রায় লাল এমন মস্ত দুখানা পা।

না, সুমিতি ভাবলো, এরকম সে প্রায় তিনমাস পরে দেখেছিলো। আর তা তাদের কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের পরের দিন বিকেলে। ছাত্রছাত্রীরা যখন পড়বেই না, তখন অধ্যাপিকার বসে থেকে কী লাভ? সুমিতি ছাত্রছাত্রীর জটলার পাশ কাটিয়ে রাস্তায় পড়তে গিয়ে নৃপকে দেখেছিলো বক্তৃতা শেষ করতে। পরদিন বিকেলে নৃপ এসে বলেছিলো, 'আমাকে ডেকেছেন'? সুমিতি যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো তা শুনে। তাহলে সে কি মনে মনে 'শুনছেন' বলার সঙ্গে হাত তুলে কিংবা চোখের ইশারা করেছিলো। যা, এমন নিলাজ সে কী করে হয়!

একদিন নৃপ বলেছিলো, 'আমাদের দেশ আর সমাজ নিঃশব্দে, সোরগোল না তুলে এত অজস্র আমাকে দিয়েছে, আমি তাদের জন্য তেমনই নীরবে একান্তে কিছু তৈরি করে যেতে চাই'। আর এরকম ধরনের কথা যখন সে বলে, তখনই বোঝা যায়, তার গলার স্বর কেমন নির্ভাজ আর গভীর।

আর এমন সব তৈরির কথা, সৃষ্টির কথাই তো জীবনে যা কিছু সুস্বাদ তা এনে দেয়। ভালোবাসা আর সৃষ্টি, একটা গৃহ, একটা গ্রাম, আর সেখানে কিছু সৃষ্টি করার সুযোগ, গড়ে তোলার সুযোগ।

সুমিতি মাস তিন-চারের মধ্যেই বলেছিলো, 'আপনাদের গ্রামে, আপনাদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে'।

নৃপ, বোধহয়, বলেছিলো, 'এখন কি গ্রামে যেতে সুবিধা পাবো? মনে হচ্ছে কলকাতার বাইরে গেলে ওরা এখনও আমাকে বাইরে থাকতে দেবে না। আপনি যদি একা বেড়াতে যেতে চান.. '

এরকম কোনোসময়েই, বোধহয়, 'আমি প্রোপোজ করি...' বলে সুমিতি মুখ লাল করে উঠে পালাচ্ছিলো।

নৃপ বলেছিলো, 'এ তো, আস্থা, সাগ্রহে'। বলে সে হাত বাড়িয়ে সুমিতির হাতের পিঠে হাত রেখেছিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলো, 'আমাকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কিন্তু ওদের সদয়, এমন নয়। হতে পারে, পুলিস জানতে চায় কার কার সঙ্গে সদ্ভাব, কার কার সঙ্গে ওঠাবসা করি'।

কিন্তু এখন? শুধু খবরের কাগজের ঘটনাগুলোকে পড়তে থাকলে কি বোঝা যাবে কেন এমন হচ্ছে? নৃপ যেন আহত কেউ, যখন ভালোবাসার কথা মনে আনাও হৃদয়হীনতা। ভাবো, তেমন পুরুষ যদি আহত হয় যুদ্ধে।

নৃপর বিলে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে কয়েকদিন ধরে ভেবে সুমিতি স্থির করলো, তারও যাওয়া দরকার। হয়তো নৃপকে সেখানে পাওয়া যাবে নিভৃতে, সেখানে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। হয়তো-বা সেখানে তার কোনো নতুন রূপ ফুটে উঠবে। আর সেই নতুন নৃপকে নিয়ে আবার তেমনি দিশেহারা হতে পারবে সে। একথা বলতে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে, প্রেমকেও তার শিশুটির মতোই উচ্ছল আনন্দে বাড়তে দেখছে না। অথচ নৃপনারায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করার সুখে সে ভাবতেই পারেনি, এই দীনতা আসতে পারে তার জীবনে। বইতে আশাভঙ্গ বলে যে কথা থাকে—একেই কি তা বলে?

নৃপনারায়ণ ও সুমিতি বিল থেকে ফিরলো সাতদিন পরে। মনসা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে উলু দিয়ে উঠলো যে, অনসূয়াও না-হেসে পারলেন না।

জলে ও জঙ্গলে কাটিয়ে সাতদিনে স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার কথা নয়। তাদের একটু শীর্ণ দেখালো বরং। পোশাক-পরিচ্ছদ কিছু মলিন। নৃপনারায়ণের কপালে একটুকরো অ্যাঢেসিব প্লাস্টার লাগানো।

সন্ধ্যায় মনসা বললো, 'দাদার লাভ তো ওইটুকু, তুমি কী এনেছো, বউদি'?

সুমিতি উত্তর খুঁজতে লাগলো, তখন নৃপনারায়ণ বললো, 'হাতে-পায়ে দু-একটা আঁচড়ে যাওয়ার চিহ্ন নেই বললে ঠিক হবে না। স্থায়ী চিহ্নের মধ্যে বোধহয় কয়েকখানা ফালা ফালা করে ছেঁড়া শাড়ি থাকবে বাক্সে। সেগুলো বোধহয় জঙ্গলের কাঁটাগাছগুলোর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মূল্যবান, মনসা'।

'কেন'?

'নতুবা আমি যখন বললাম তারই একটার আঁচল ছিঁড়ে কপালে বেঁধে দিতে, দিলো না তা। বরং দ্যাখো, বাতিল বস্তুর মতো এই ঢ্যাড়া চিহ্ন এঁকে দিলো প্লাস্টার দিয়ে'।

যেন কিছু সুখী হয়েছে সে এমন ভঙ্গিতে উপভোগ করতে লাগলো সুমিতি এদের আলোচনা।

নৃপনারায়ণ বইয়ের খোঁজে পুঁথিঘরে গেলো।

মনসা বললো, 'বাপ রে বাপ। এমনি করে যদি সব সময়েই দুজনে একত্র থাকো আমি কথা কই কখন'।

সুমিতি বললো, 'এখন বলো। তার আগে তুমি ধন্যবাদ গ্রহণ করো। কবে এসেছো'?

'তা হলো কিছুদিন। কিন্তু আমার কথা নয়, তোমাব কথা বলো, যদিও তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এসে যখন শুনলাম তোমরা বিলে গিয়েছো তখন কিছু করার না পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে মনে সমালোচনা করলাম। শৈবলিনীকে চুরি না করলেও চলতো লরেন্স ফস্টরের। শৈবলিনীই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। বিল-জঙ্গল তোলপাড় কবে দিচ্ছে, জলচর পাখিব কোমল বুক ছিন্নভিন্ন করে রক্তাক্ত করে তুলছে বিলের জল, এমন একটি রূপবান কঠোর পুরুষকে কেউ কেউ ভালোবাসে। অতএব—'

'আমাব সঙ্গে শৈবলিনীর মিল আছে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শৈবলিনীর ননদের নাম মনসা বাখলেই ভালো হতো। তুমি যখন উলু দিয়ে উঠলে তখন তোমাকে দেখে ভাবলাম, এই মেয়েটিই কি নুলো বিপিনকে দিয়ে বাজি পটকা তৈরি করিয়েছিলো'।

'খবরটা তোমার জানার কথা নয়'।

'কিন্তু এসব খবর রূপুর কাছে গোপন থাকে না। আমার পবে মনে হযেছে, সেদিন যখন তুমি এসেছিলে তখন যেন তোমাব পবনে রাজপুতানি ঘাগরা ছিলো, পাল্কিতে লুকোনো তরোয়ালও ছিলো'।

মনসা হাসলো। সে বললো, 'এবার আমায় বল, বউ, দাদা কী ফুল ভালোবাসেন'?

'কেন'?

'আমবা গেঁযো মেয়ে, বাসব সাজাতে ভালোবাসি। অবশ্য আড়ি পেতে শোনাব অভ্যেসও আছে'।

'তোমার দাদার পছন্দ তোমাবই বেশি জানাব কথা'।

রসিকতাটা উপভোগ করলো মনসা ; কিন্তু সে বললো, 'বউদি, বউভাতেব দিন যে গহনাগুলো পরেছিলে সেগুলো বাব করো, আমি তোমাকে সাজিয়ে দেবো। দাদাব বেশভূষাব পবিবর্তন হয়েছে, এখন তোমাকে দেশসেবিকাদের মতো নিবাভবণ দেখতে ভালো লাগছে না'।

সুমিতি মুখ নামালো। অনেকক্ষণ ধরে সে নিজের হাত দুখানাব দিকে চেয়ে রইলো। মনসার মনে হলো তার চোখের পাতার দীর্ঘ পক্ষ্মগুলো তার গালেব উপবে ছায়া ফেলে মুখটাকেই শ্যামলা কবে দিচ্ছে। কথা বলা যাচ্ছে না, এ বকম অনুভব করলো মনসা। অবশেষে সুমিতি বললো, 'আর একদিন। আজ নয়। সেদিন তোমাকে সাজিয়ে দিতে বলবো'।

মনসা সেই প্রাসাদে নানা দিক ঘুরে বাড়িভরা লোকজনেব মধ্যে কথা বলার মানুষ পেলো না। শেষে সে অন্দর আর কাছারির সংযুক্ত সীমায একতলার পশ্চিম অংশে সদানন্দব ছোটোমহলে উপস্থিত হলো। তখন বিকেলের আলো আরো আধঘণ্টা থাকবে। সে দেখলো পশ্চিমের জানলাব আলোয় ছবি আঁকছে সদানন্দ। অথবা ঠিক আঁকা নয়। বাঁ হাতে তুলিব গোছা, ডান হাতেব তেলোয তৈরি শঙ্খে ঠোঁট-চিবুক ডুবানো, ইজেলে লটকানো ছবির সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ সে।

পায়ের শব্দে সদানন্দর স্বপ্ন ভাঙলো না। তখন মনসা এগিয়ে তার হাত দু-তিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট করে বললো, 'এল্ গ্রেকো'?

সদানন্দ চমকে ঘুরে দাঁড়ালো, মনসাকে দেখে হাসতে গিয়ে থেমে প্রশ্ন করলো, 'নকল বলছো'?

'তা কি করে হবে? তার সময়ে বউদি ছিলো না স্পেনে, যে নকল করবেন। কিন্তু মানুষটার তুলনায় লম্বা দেখাচ্ছে না'?

সদানন্দ সুবিতিব পোরট্রেটকে একবার খুঁটিয়ে দেখলো, বললো, 'বলছো? দীঘল হয়েছে? বল্লী ব্রততী মনে হয়? অর্কিডের মতো'?

সদানন্দ তুলির গোছা পেলেটের পাশে রেখে বললো, 'হয়েছে তা হলে? থ্যাঙ্কু। বলো এবার। কবে এলে? বিপিনের তুবড়ি-ফটকা কি করলে'?

'বোধ হয় মায়া পড়েছে, নষ্ট করতে চাইছে না। দাঙ্গার পরে ছ মাস যায়, আপনার স্কুল খুলতে

পেরেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন'।

'কোড়ে খবর নিচ্ছে দেখছি। বলে দিও এরপরে এখানে সরকারি স্কুল ছাড়া কারো স্কুল চলবে না। তোমাকে বলতে পারি, তা যদি বলো, সুমিতির স্কুলও হবে না'।

সুমিতির স্কুলের কথা শুনে মনসা অবাক হলো। কিন্তু যা সুমিতি তাকে নিজে বলেনি তা এভাবে জানতে অনিচ্ছা হলো তার। সে বরং বয়োবৃদ্ধ বন্ধুস্থানীয় মাস্টারমশাইকে খোঁচাতে বললো, 'সে রকম স্কুল না হওয়ার নিশ্চয় কারণ আছে, যা এখন আপনার মাথায় আসছে না'।

সদানন্দ বেশ অবাক হয়ে বললো, 'কে বলেছে মাথায় আসছে না? সরকারের রেশম বিদ্যালয়ে পাস করা শিক্ষকই উপযুক্ত বেতন দিয়ে আনা যায়। যারা রেশমের সুতো কাটে, তাঁত চালায় সে রকম কয়েকটি পরিবারকে এনে লাখেরাজে বসানো যায়। এসবই ভাবা হয়েছে। রেশম দামী বলে মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পাবে, সুতোর খদ্দর যা পারে না। কিন্তু'..

মনসা সুমিতির পরিকল্পনার আন্দাজ পেয়ে অবাক হচ্ছিলো, কিন্তু তা সদানন্দকে বুঝতে না দিয়ে রহস্য করে বললো, 'তাহলে বউদি পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন? লোকে নিন্দা করবে ভয়ে'?

'নিন্দা? কৃষকদের তো লাভই হতো, বিশেষ কিষাণীদের'।

'যদি বলে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু লোভকে আড়াল করতে তা শুধু একরকম মুখোস পরা'?

সদানন্দ হো-হো করে হেসে উঠলো। 'যা, এরকম আমি বলিনি কখনও। তা এরকম বলে বটে। আসলে, মাথায় না আসার কথা বলছিলে। তা হবে কেন? দাদপুরী কৈবর্তদের দেখে শিখেছি। ওদের জমিটমি বাড়ানো, ঘরদোর তোলা, ছেলেমেয়েব বিয়ে এসব কল্পনা ছিলোই। পদ্মায় ভাঙতে ভাঙতে সেসব পরিকল্পনা আর নেই কারো। খোঁজ করে দেখো'।

মনসা কিছু না বলে ভাবতে থাকলে সদানন্দ আবার বললো, 'তুমি আজ খুবই অমনোযোগী। আচ্ছা, বেশ, শাহাজাদপুরের কথা মনে করো। এখন সেখানে অবশ্য ঠাকুরদের জমিজমা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে। মনে করো সেখানে ছিলো শান্তিনিকেতন। কী হতো তাব এখন? রসো, এঁকেনি আলো থাকতে'।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সদানন্দ তুলির গোছা আর পেলেট সংগ্রহ করলো।

ধুতি-পাঞ্জাবির রূপুকে অভ্যস্ত হতে হবে প্যান্ট-কোট-টাইয়ে। তার নিত্য ব্যবহারের জন্য সিল্কের স্যুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার নালিশ, সেগুলো তাকে আড়ষ্ট করছে। নতুবা নতুন পোশাকে তাকে ভালোই দেখায়।

ওদিকে মন্মথ রায় তাগাদা দিয়েছেন যাত্রার দিন স্থির করে। সান্যালমশাইকে লেখা চিঠি, কাজেই রসিকতার সঙ্গে মিশিয়ে লিখেছেন, রূপুকে যেন অবশ্যই আগে থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় টেবল ম্যানার্স শিখবার জন্য।

অনসূয়ার বসার ঘরে তখন অনসূয়া চিঠিটা পড়ে নিয়ে রেডিও খুলেছিলেন। নৃপ আসতে রেডিও বন্ধ করে চিঠিটা তাকে এগিয়ে দিলেন।

নৃপ বললো, 'দেখো কাণ্ড! ছেলে বিদেশে যাবে বলে এমন দিনরাত রেডিও খুলে বসে থাকতে হয়'?

রূপু অনসূয়ার পাশে বসেই স্কেচ করছিলো। খুব যথাযথ না হলেও ধরা যাচ্ছে তা ছেলে কোলে করে বসা সুমিতির। রূপু বললো, 'তাই বলছো? আমি ভাবছিলাম যে বুঝি মার বড়োছেলের সঙ্গীসাথীরা দিল্লি আর কলকাতায় কী হইহাই হট্‌হাট্‌ করছে তার খবর নিতে'।

নৃপ হো হো করে হাসলো, বললো, 'রূপু, সত্যি তুই তাহলে বড়ো হলি'।

সে চিঠিটা পড়লো। সেটাকে অনসূয়াকে ফিরিয়ে দিলো। বললো, 'রায়মামা একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তা মিথ্যে নয়তো, দু'দুটো নাবালক সঙ্গে নিয়ে চলা যে'।

একটু হেসে আবার বললো, 'ওটাও এক ফ্যাসাদ, রায়মামার এক কাকিমা মেম বটে, আর রায়মামার এক ভাগ্নী অনেকদিন বিলেতে থেকে ফিরেছে। আমি শুনেছি সেই কাকীমা সে দেশে স্কুলে পড়াতেন, আর সেই ভাগ্নী লন্ডনের ইকোনমিক্‌সের স্কুলে পড়েছে। কেমন টেবল ম্যানার্স যে রূপু শিখবে'?

সুমিতির পাশে থেকে মনসা বললো, 'তাদের টেবল ম্যানার্স ভালো নয় বলছো'!

'দেখো, দেখো, নেহাৎ মধ্যবিত্তর চাইতে বেশি কিছু কি তা হতে পারে'? কপট দুশ্চিন্তায় নৃপ বললো, 'কী যে হবে রূপুর'।

রূপু বললো, 'দাদা, তুমি ভীষণ সামন্ততান্ত্রিক। আমাদের শিবনারায়ণ বড় হলে যে তুমি কী করবে'?

নৃপ বললো, 'যতদূর মনে পড়ে সামন্ত কিছু মেদিনীপুরে থাকলেও থাকতে পারে। আমরা তো সান্যাল। আর তোমার শিবনারায়ণ কি ওইটি? তা, ওর জন্য যা ভাবনার ভার তা অনেকদিন থেকেই তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি ভেবে দেখো, ওকে লখনৌতে রাখা যায় কিনা। আমার মনে হয়, দিল্লি বা মুর্শিদাবাদে কিছু এখন নেই আর টেবিল ম্যানার্স'।

অনসূয়া বললেন, 'আমি কিন্তু একটা কথা খুব ভাবি। রূপুকে ওরা কালো বলে ঠাট্টা করবে না তো'?

'তা একটু করবে'। সুমিতি বললো, 'আপনার ছেলে তো সত্যি দুধে-আলতা নয়'।

'না হয় রংটা চাপাই হলো,' অনসূয়া বললেন, 'কিন্তু এমন দুটি চোখ, এমন নাক'?

মনসা বললো, 'তুমি ওর হাসির কথাও বলতে পারো। বিলেতের কিশোরীরা হাসি শিখবার জন্য ওকে মাইনে দিয়ে রাখবে দেখো'।

রূপু খিল খিল করে হেসে উঠলো।

সুমিতি বললো, 'নিজের ধনদৌলত দেখিয়ে বেড়ানো কিন্তু—'

রূপু আরও জোরে হেসে উঠলো।

নৃপ বললো, 'জোরে হাসা নাকি ইংল্যান্ডে নিষেধ'।

অনসূয়া এই সুখটুকুকে সঙ্গী করে সংসারের তদ্বির করতে গেলেন। সেদিনই সন্ধ্যার আগে লাইব্রেরি আর নৃপর ঘরের সামনে দূরে এক ব্যালকনিতে মনসা নৃপকে আটক করলো। বললো, 'কথা বলি দাঁড়া। দাদা, তোকে এ পোশাকে ভালো দেখায় না। তুই কি সিল্কের স্যুটও পরবি'?

'বাহ্, খারাপ দেখাবে কেন? সিল্কে খারাপ দেখায়? তুই কড়িয়াল পরে আছিস না? বিয়ের সময়ে বেনারসী পরিসনি'?

'দেখ্, দাদা, ছোটবেলায় মিথ্যা বলার জন্য তোর কাছে বেশ মার খেয়েছি। আমি জানি মিথ্যার উপরে তোর রাগ দিশেহারা। সত্যি করে বল্, তুই এমনকী বিয়ের দিনও সিল্ক পরেছিলি? তা আর হতে হয় না। বউদির নিজের তো খদ্দর। আর সে বলামাত্র তুই সিল্ক পরলি'?

'যা-যা, কি কথা'!

'বল্, খুব ভালোবাসিস বুঝি? সেজন্য এমন সেজে থাকিস? কিন্তু শোন্, এভাবে তোকে শুধু বড়লোকের ছেলে মনে হয়। সত্যি করে বল্, খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তোর এই দশা? এত রাগ'?

'এর মধ্যে খবরের কাগজ কেন? কী থাকবে কাগজে? সিল্কের বিজ্ঞাপন? আজকাল কাদোয়ায় বুঝি খুব খবরের কাগজ পড়া হয়'?

'না হয় আমার ছোট্ট গ্রামে তোর গ্রামের তুলনায় কাগজ খুব কম যায়। তোর গ্রামেও জেঠামশাইয়ের গুলোকে বাদ দিলে কখানা শুনি? তুই আজকাল কথাও কম বুঝিস বুঝি'?

নৃপ মনসার সঙ্গে সিল্কের আলোচনায় একরকম লজ্জা বোধ করছিলো। সে তাড়াতাড়ি গ্রামে আসা খবরের কাগজের সংখ্যাকে চেপে ধরলো। বললো, 'কাগজ না পড়া একদিক দিয়ে ভালো কিনা বল্? গ্রামে রেডিও নেই এটাও ভালো'।

'কেন ভালো'?

'অশান্তি নেই। গ্রামে ঘুরে দেখ্'।

মনসা যেন সিন্ধের কথা ভুলে গেলো। সে তো নিজের মনে আনন্দকে খুঁজে পাচ্ছে না। অশান্তি আর আতঙ্কই আছে সেখানে, যার উপরে যেন হাসি ফুটিয়ে রাখা মুখে, আর তা বাড়ির আর সকলের জন্য। স্বাধীনতা যেন আলোর মতো কিছু নয়, যেন নিছক এক লজ্জায় কিছু দূরে সরা। না, উৎসব কোরো না। যে কথা সে ভাবতে চায় না তাই যেন মনে পড়ে গেলো। সে বললো, 'আচ্ছা, দাদা জানিস, বিপিনবাবু বলছিলো—যারা দাঙ্গা করেছিলো তাদের হাতে ক্ষমতা গেলে দাঙ্গার দর্শনই প্রতিষ্ঠা পায়'।

দু'এক মিনিট নৃপ উত্তর দিলো না। সেই সুযোগে মনসা মনটাকে আবার গুছিয়ে নিলো। বললো তোর এখন মুড নেই। যা। বউদি এখনই গা ধুয়ে এসেছে ঘরে রজনীগন্ধার ঝাড়ের পাশে একটা চাপার মালা রেখে এসেছি। ব্যবহার করিস। যা। আমি কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি'।

একদিন নৃপনারায়ণ অন্য আলাপ করতে করতে কথাটা পাড়লো। রূপুর সঙ্গে কে কে যাচ্ছে?

'সদানন্দ যাবে বন্দর পর্যন্ত'।

'আর কেউ নয়? অবিশ্যি আমি যেতে পারি।

সান্যালমশাই বললেন 'বেশ তো সস্ত্রীক যাও না। ঘুরে আসাও হবে। রূপুরও ভালো লাগবে।

'সুমিতি হয়তো অন্যত্র যেতে চাইবে'।

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা এখন এখানেই থাকবে কিছুদিন। সান্যালমশাই বললেন।

'আমি তোমাদের এর আগে বলিনি—'

'না বলে ভালোই করেছো। নতুবা সব সময়েই মনে হতো তুমি দু'দিনের জন্যে এসেছো। কিন্তু এই সেদিন বেরিয়েছো, এরই মধ্যে আবার কী প্রয়োজন হলো রাজনীতির?

'বর্তমানে কিছু নয়। শাসনভার যে আমাদের হাতেই আসছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

'তুমি কী করতে চাচ্ছো'?

স্টাডির ম্লান স্নিগ্ধতায় এই কথা কয়েকটি নৃপনারায়ণের চোখের সম্মুখে স্থাপিত করলেন সান্যালমশাই।

'ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রাম দেখবো এমনটা সম্ভব নয়। এক একটি বড়ো শহরকে কেন্দ্র করে সেই শহরের রসদ জোগায় যে গ্রাম কয়েকটি, প্রত্যক্ষভাবে যদি সেগুলোর পরিচয় পাই তা হলেই মোটামুটি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে পারবো। তুমি একে পলায়নবৃত্তি বলতে পারো'।

'তোমাকে কি এখনই যেতে হবে'? অনসূয়া প্রশ্ন করলেন।

'এখনই যেতে হবে এমন কথা নয়'।

সান্যালমশাই আবার কথা বললেন। অনসূয়া লক্ষ্য করলেন তাঁর গলা অদ্ভুতরকম একটানা শোনাচ্ছে, উঠছে না, নামছে না।

সান্যালমশাই বললেন, 'কিন্তু তুমি কি পায়ে হেঁটে বেড়াবে'?

'যেখানে যানবাহন আছে সেখানে নিশ্চয়ই তা করবো না। তাই বলে যানবাহনের কোনো আড়ম্বর থাকবে না। অনেকসময়েই আমার মনে হয়েছে কোনো কোনো মতবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কতগুলো মিথ তৈরি করে তাতে বিশ্বাস করছি। কাল্পনিক কিছুকে আমরা মানুষ বলছি। মানুষকে যেন ছুঁয়ে ফেলা যায়। যদি পারি, মানুষ সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা করবো'।

সান্যালমশাইয়ের গড়গড়ার শব্দ শুনে তাঁর পরিচিত যে-কেউই বুঝতে পারতো তিনি গভীরভাবে বিষয়টিকে অনুভব করবার চেষ্টা করছেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি রাজনীতি নিয়েই থাকবে'?

'হ্যাঁ। হয়তো সেটাকেই উপজীবিকা করতে হবে'।

'উপজীবিকা? থামো, থামো'।

'সব দেশেই যেমন পাণ্ডিত্যকে উপজীবিকা করে একদল লোক আছে, তেমনি আছে রাজনীতিকে উপজীবিকা করে'।

'কিন্তু উপজীবিকা হিসেবে রাজনীতি ভাড়াটে সৈন্যের মতো ব্যাপার নয় কি'?

'আমাদের দেশে এখনো হয়নি কিন্তু রাজনীতিতে অগ্রসর দেশে হয়েছে। প্রফেসানল রাজনৈতিক কর্মী না হলে অর্থাৎ পুরো সময়টা রাজনীতিতে না দিলে অন্য সব বিষয়ের মতো এতেও সিদ্ধি নেই'।

'আচ্ছা নৃপ, তোমার যখন টাকা রয়েছে, না হয় অ্যামেচার রাজনৈতিক হয়ে থাকো'।

'টাকা আছে, এ আমি অস্বীকার করি না। বরং সেটাই প্রতিযোগীদের তুলনায় আমাকে বেশি শক্তি দিচ্ছে। আমার আদর্শবাদ তাদের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আশা রাখি। আমরা এখনো কিছুদিন ইংরেজী ধারায় চলবো। ইংরেজের দেশেও রাজনীতিওয়ালারা পৈতৃক সম্পত্তিতে অবলম্বন করে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর প্রফেসানল হয়'।

সান্যালমশাই চোখ তুলে দেখলেন নৃপ তাঁর কথা শোনার জন্য বসে আছে। তিনি বললেন, 'তোমার চিন্তায় সততা আছে ; স্পেডকে তুমি স্পেড বলতে পারো'।

এরপর নৃপনারায়ণ কথা ঘুরিয়ে নিলো। সান্যালমশাই লক্ষ করলেন সেটা এবং সহজ হয়ে রইলেন। রূপুর কথায় পৌঁছলো আলাপটা। রূপুকে ছ-সাত বছর কিংবা তারও বেশি সে দেশে থাকতে হবে। বড়ো জোর মাঝে মাঝে ছুটিতে আসবে।

অনসূয়া এতক্ষণ কথা বলেননি। এবার তিনি বললেন, 'অথচ আমি ভেবেছিলাম, রূপু যখন এবার দূরে যাচ্ছে তুমি আমাদের কাছে থাকছো'।

সান্যালমশাই ভাবলেন, রাজনৈতিক মত পরিবর্তন নয়, রাজনীতির প্রতি অতি পরিচয়ের অবহেলা ছিলো নৃপনারায়ণের কথার সুরে।

স্বভাবতই মনসা আর সুমিতির অনেকটা সময় একত্র কাটে। মনসার দু'একদিনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু তার দেরি হতে লাগলো। তার মনে ছিলো, অন্য আর একদিন সাজিয়ে দেওয়ার কথা বলতে সুমিতির গলাটা ক্লান্ত শুনিয়েছিলো, কিন্তু ক্লান্তির চাইতেও বেশি কিছু ছিলো তার ভঙ্গিতে। গত কয়েকদিনে খুব সাধারণ সহজ কথায় বিষয়টাকে সে বুঝতে চেষ্টা করেছে। তার আর সুমিতির বিবাহ দু রকমের। ভালোবাসা আর বিবাহ নিয়ে সেই পুরনো কথা। সে ব্যাপারে সুমিতির মতো সাহস প্রমাণ করার সুযোগ তার জীবনে হয়নি। কোনটা আদর্শ হওয়া উচিত তা নিয়ে সে তর্ক করেনি, কিন্তু বিশেষ করে সুমিতির ভালোবাসার ব্যাপারটাকে সে সহানুভূতি তো বটেই, শ্রদ্ধা দিয়ে বিচার করেছে।

কিন্তু বাইরের ঘটনা কী এমন প্রভাবিত করতে পারে যে সেই ভালোবাসা ইতিমধ্যে প্রাণহীন? একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, নৃপনারায়ণের মতো একজনের উপর থেকে ভালোবাসা ফিরিয়ে নেয়া যায়।

একদিন মনসার মনে হলো : তুলনা দেওয়া ভালো নয়। তুলনা ছবি তৈরি করে, আর সেই ছবি অবলম্বনহীন আত্মার মতো যেখানে-সেখানে দেখা দিতে পারে। গড় শ্রীখণ্ড ধান আর পাটের হিন্টারল্যান্ড হতে পারে, তাহিতি দ্বীপ নয়। কিছু এক সৃষ্টির জন্য বউদির গ্রামে আসা কি গগ্যাঁর প্যারি-পালানো হয়? এখন এই গড় শ্রীখণ্ডে বউদির পক্ষে কিছু আর গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কী এক শক্তি অথবা প্লাবন এখন দাদপুরকে ভাঙার মতো গড় শ্রীখণ্ডকে ভাঙবে মনে হচ্ছে। তাহিতি সমুদ্রোচ্ছ্বাসে ডুবে গেলে গগ্যাঁকে তো ছবির বদলে শুধু রোগ নিয়ে ফিরতে হতো। কিন্তু তুলনাটা নেহাত অসম। বউদির প্রেমের ব্যাপারটা গগ্যাঁর ছিলো না নিশ্চয়। সেই প্রেম কি যথেষ্ট যুক্তি নয় সবকিছুর?

অন্য একদিন আলাপে আলাপে তারা পুরুষদের পরিমণ্ডল থেকে সরে গিয়ে মেয়েদের নিজেদের ব্যাপার যেন আলাদা করে নিচ্ছিলো। তখন মনসা বললো, 'ঠিকই বলছো। বউদি, আমরা প্রায় দু টুকরো হয়ে যাই। পুরুষদের উচ্চাভিলাষ আর বাস্তব কৃতিতে যে পার্থক্য আমাদের এই টুকরো দুটোতে পার্থক্য তার চাইতে বেশি যেন। আমাদের আত্মা আর শরীর আলাদা হয়ে যায় না? তুমি শরীর না বলে প্রবৃত্তি বলবে? নাকি প্রকৃতি, নিয়তি এই সব? নাকি, সন্তানপরম্পরার বৃত্ত'?

সুমিতি সাড়া দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনসা বললো, 'তুমি অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওনি, বউদি'।

'কথাটা আমিও ভাবছিলাম'। বলে সুমিতি কথাটাকে আঁকড়ে ধরলো।

মনসা বললো, 'তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার স্বাভাবিক জীবনে বেড়ানোর একটা স্থান ছিলো। যা এই প্রাচীরঘেরা প্রাসাদে চেপে যাচ্ছে'।

'আমিও ভাবছিলাম ঘুরে আসা মন্দ নয়। কিন্তু খুব ভালো লাগে যদি তুমি আমার সঙ্গী হও'।

মনসা হেসে বললো, 'এই দেখো, তোমাদের সেই হনিমুনে গেলাম কেন? আচ্ছা, কোথাও আস্তানা করে খবর দিয়ো। চেষ্টা করবো যেতে। যদি তুমি বলো, আমি জেঠিমাকে বলতে পারি, তোমার বাপের বাড়িতে কোনো কৌশলে খবর দিয়ে তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে'।

সুমিতি একটু ভেবে বললো, 'তাই দিও'।

কোনো কোনো দিন কারো মনের অবস্থা রোজনামচা লেখার মতো হয়। সাধারণত যেটা লেখা হয়ে যায় সেটাতে আত্মরক্ষার বুদ্ধি এসে জোটে, অনেক মিথ্যাও রেখে যায়। বরং চিন্তা করার সময়ে কেউ কেউ দুঃসাহসী হতে পারে।

মনসা চলে গেলে সুমিতি যখন আবার একা হলো, সে ভাবতে বসলো। প্রায়ই দেখা যায় চিন্তাটা যখন নিজেকে নিয়ে তখন সেটা একটা কিছুকে কেন্দ্র করে পাক খেতে থাকে, যেন নানা দিক থেকে কেন্দ্রে থাকা সেটিকে দেখা হচ্ছে। সুমিতির মনে হলো এখানে আসল কথাটা আধুনিকতা।

সে অনুভব করলো, সে কি উঁচু দেয়ালে ঘেরা এক কলেজ-হস্টেলে আছে, যার চারিদিকে অর্ধসভ্য গ্রামগুলি! না না। তা হবে কেন? এমন কী এটা মনসার তুলনার তাহিতি দ্বীপও নয়।

আধুনিকতা, যদি বলো তা, দারিদ্র্য দূর না হলে কোনো গ্রাম আধুনিক হয় না।

এই আধুনিকতা, অদারিদ্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করতেই কি তার আধুনিক হওয়া নয়? কিংবা আধুনিক হওয়া আর আধুনিকতা সৃষ্টি করা একই মানুষের সংস্কৃতির দুই প্রকাশ। তার বিয়ের ব্যাপারে প্রথা না মানা, তেমন করে নিজে থেকে এ বাড়িতে আসা কি লজ্জা হয়ে যায় না যদি আধুনিকতা সৃষ্ট না হয়?

এখানে তেমন করে আসতে গিয়ে সে কি নিজেকে মর‍্যাল কারেজের কথা বলেছিলো? না, সে দিক দিয়ে তার তেমন অসুবিধা হয়নি। এই শ্রীখণ্ডের পুরনো গড়ে যেন একরকমের আধুনিকতা আছে। তা যেন এই, সামান্যমাত্র চঞ্চল হয়ে জীবন যেমন চলেছে তাকে সে রকম চলতে দেয়া। যেন বলেছে, তোমার জন্য আমরা পৃথক মহল করে দিতে পারি, একেবারে আধুনিক পৃথক একটা বাড়িও। এদের যতটুকু মধ্যবৃত্ত ততটুকুই কি চঞ্চল হয়েছিলো প্রথার কথা ভেবে? কিংবা বলা যায়, এদের প্রথার আবরণে তার অভিনবত্বকে আড়াল করেছে এরা যাতে তা রগরগে হয়ে চোখে না পড়ে।

একদিন মনসা চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিলো, ও মা সে কী! দাদা কিভাবে রমণী সংগ্রহ করবে, কাকে ভালোবাসবে, তা কি আর কারো ভাবার বিষয়? সেই সময়ে সে হাসতে হাসতে বলেছিলো, তুমি তো বিবাহিতা, বউদি। তুমি বাঈজী হলেই-বা কি করতাম? সেই সময়েই বোধ হয় সে বলেছিলো, পিতার উপপত্নী থাকতে পারে। ছেলেমেয়েরাও তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

মনসা ধারালোভাবে তুলেছিলো কথাটা। কিন্তু এই সহনশীলতা মিথ্যা নয় যেন এদের সংস্কৃতির। মনসা আর রূপুর মতো আর কেউ কি তাকে ভালোবাসে? এই সহনশীলতাকে আধুনিকতা বলা হবে

কি, আধুনিক সংস্কৃতি?

সুমিতির মনে পড়লো, সেদিন টেবল-ম্যানার্সের কথায় দুরকম সংস্কৃতিকেই ঠাট্টা করেছিলো নৃপ। কী উদ্ভট উপমান যে জোগাড় করতে পারে নৃপ!

কিন্তু সুমিতি হাসতে পারলো না। তার মুখ বরং উদাস হলো, বিশীর্ণ হলো। সে ভাবলো : সত্যকে, অহিংসাকে নির্ভর করা, মানুষের জীবনকে সব ধর্ম, সব থিয়োরির চাইতে বেশি মূল্য দেয়া কি আধুনিকতা নয়? অর্থের চাইতে বিদ্যা কি বেশি আধুনিক নয়? মিল ফ্যাক্টরির অজস্র মসলিনের তুলনায় কারিগরের হাতে তৈরি খদ্দরের অপ্রতুলতাকে কি আধুনিকতর বলা হবে না আর?

সুমিতির চোখে বেশ বড়ো দু ফোঁটা জল দেখা দিলো। সে তাকে তাড়াতাড়ি গোপন করে হাসতে চেষ্টা করলো। মনে মনে বললো, এটা ভালোই হচ্ছে তার এই প্রথাসিদ্ধ সাধারণভাবে ফিরে যাওয়া।

'আচ্ছা, নৃপ যখন হলো তখনকার দিনের ফটো-অ্যালবাম যদি একটা থাকতো'? সান্যালমশাইকে অনসূয়া প্রশ্ন করলেন।

'কী হতো তবে'?

'কারো কারো কৌতূহল নিবৃত্তি করতো'।

সান্যালমশাই কথাটায় বিস্মিত হলেন। অন্যের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ফটো তুলে রাখার মতো একটি মহিলা নন অনসূয়া।

অনসূয়া বললেন, 'আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি যে মা না থাকলে নৃপকে আমি বাঁচাতে পারতাম না'? (মা বলে অনসূয়া তাঁর শাশুড়িকে নির্দিষ্ট করলেন)।

'এতদিন পরে এ সমস্যা সমাধানের কোনো সূত্রই যে নেই। কিন্তু এ কথা তোমার মনে হলো কেন'?

কথাটা যেন রায় দেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু। মনে মনে বাক্যটা তৈরি হয়ে গেলেও আবার যেন সেটা পড়ে দেখলেন অনসূয়া ; স্বতোৎসারিত বাক্যটিকে অসংখ্য অর্ধোস্ফুট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার সাহায্যে মার্জিত করে বললেন অবশেষে, 'আমি ছেলে মানুষ করতে জানিনি'।

আবেগের উত্তাপ নিয়ে সান্যালমশাই বললেন, 'এটা তোমার অকারণে আত্মপীড়ন, আমি তোমার পুত্রগর্বে গর্বিত'।

সহসা চোখে জল এলো অনসূয়ার। পরাজিতের মতো, আত্মপক্ষ সমর্থন করা যার পক্ষে সময়ের অপব্যয়মাত্র তার মতো বললেন, 'আমরা তখন হয়তো পরস্পরকে বেশি ভালোবাসতাম। ছেলে গৌণ ছিলো। তাই নৃপ কখনো আমাদের ভালোবাসতে পারলো না'।

কিন্তু পরক্ষণেই অনসূয়া চোখের জল ও চশমার বাষ্প মুছে ফেললেন। একটু গভীর সুরে বললেন, 'তুমি বলবে অনেক দিক দিয়ে নৃপ আদর্শ পুরুষ হয়েছে, তুমি বলবে অনেক দিক থেকে সে আমাদের তুলনায় অগ্রসর, কিন্তু এ কথা স্বীকার করবে কী করে নৃপ আমাদের কেউ নয়? কিংবা এ হয়তো আমার শহরে আচার-আচরণের ফল'।

সান্যালমশাই হাসলেন গড়গড়ার নল সরিয়ে, বললেন, 'আমি জানি না, আমার বা তোমার মন অন্য কারো মন হয় কী করে। তোমার মনের কথা আমি ভাবিনি এমন নয়। আচ্ছা প্রকৃতিঠাকরুণের কথা ভাবো, যার সাধারণ নাম এখন ঠানদিদি। নৃপ জন্মানোর আগে, কতই-বা বয়স তখন তোমার, তুমি তাকে তোমার এই বাড়িতে অন্যান্য পরিজনের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলে। হিসাব সই করতে গিয়ে জানতাম পিতার আমলে মঞ্জুর করা মাসোয়ারাটা যায়। সে তোমাকে বয়সের ভার, দুঃস্থতা জানিয়ে চিঠি দিয়ে থাকবে। তুমি তাকে এই বাড়িতে পৃথক ছোটমহলে নিজের মতো থাকতে দিয়েছো। মনে পড়ছে, বলেছিলে, হতে পারে ঠাকুরের বিবাহিতা নয়, কিন্তু তাকে স্ত্রীই বলা যায়। একেই হয়তো অমধ্যবিত্তদের নব্লেস অব্লিজ

বলে'। হাসতে লাগলেন সান্যালমশাই।

সান্যালমশাই যেন অনসূয়াকে তাঁর আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা করছেন না মাত্র, নিজের অন্তরের স্বরূপও যেন ধরতে পারছেন না। তিনি বললেন, 'তুমি কি বলতে পারো, কিংবা আমি কি নিজেই জানি কোনোদিন আমি নৃপব মতো হতে চেয়েছিলাম কিনা? হয়তো তাকে প্রতি রক্তকণায় বাঁচাতে চাওয়া বলে'।

অনসূয়া একটু চেষ্টা করে দৈনন্দিন কথায় চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো 'সুমিত বাংলো'টায় কনট্রাক্টর এখনো কাচের কাজ করছে বটে, কিন্তু সেটা যেন ফাঁপা কিছু। সান্যালমশাই স্বেচ্ছায় যে স্তব্ধতাব দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেদিকেই যেন কেউ তাঁকে জোর করে ঠেলে দিলো ঠিক যখন সান্যালমশাই অন্য জীবন কামনা করছিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রূপু এবং নৃপ আলাপ করতে করতে তাঁর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো। তাবা দুজনেই 'মা' বলে উল্লেখ করে কী একটা বিষয়ে আলাপ করছিলো। কথাগুলোর সবটুকু কানে গেলো না তাঁব, কিন্তু 'মা' শব্দটা কানে গেলো। ব্যাপাবটা নতুবা হয়তো এমনটা হতো না যেমন হলো। এ কথাও তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর শক্তির চরম প্রকাশ নিজের বিরাগ জানানো, কিন্তু তার কি কিছু মূল্য আছে আর?

নিজের ঘর অন্ধকার ছিলো। সম্বিৎ পাওয়ার মতো ভঙ্গিতে আলো জ্বেলে অনসূয়া ছেলেদের ডাকলেন। ছেলেরা এলে বিছানা দেখিয়ে দিয়ে তাদের বসতে বললেন এবং নিজে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রেসিং টেবিলেব কাছে।

'নৃপ, তুমি শিকারে গিয়েছিলে'!

নৃপ লক্ষ্য করলো প্রচলিত সম্বোধনটা ব্যবহার করলেন না অনসূয়া। তবু সে হাসিমুখেই বললো, 'তাকে শিকাব বলে না, আমার নিজের বন্দুক নেই'।

অনসূয়ার বক্তব্যটা খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝিকিয়ে উঠলো, 'যে-প্রাণীহত্যা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয় সেটা মানুষকে টেনে নামায় বলেই এখনো আমার ধারণা'।

অনসূয়া ড্রেসিং টেবিলে দু হাতের ভর রেখে দাঁড়ালেন, যেন তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। মানুষের নীতিবোধেব তারতম্য, পারিবারিক প্রথার প্রতি মমতা প্রভৃতির কথা বলতে বলতে আকস্মিকভাবে তিনি বললেন, 'মানুষকে সংবেদনশীলও হতে হয়। তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের এই চলে যাওয়াও আর একজনের প্রাণে কত বড়ো আঘাত হয়ে লাগতে পারে—যে শুধু তোমাদের ভালোই বেসেছে, শাসনের জন্যে তিরস্কার করেনি'?

রূপু বললো, 'আমি যাবো না, মা। বাবাকে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়'।

নৃপ হাসিমুখে কী বলতে যাচ্ছিলো। তার মুখটা একবার লাল হয়ে উঠলো।

সংসার স্বাভাবিকভাবেই চলছে, কিন্তু পরদিন সকালে দরজা খুলে দিতে গিয়ে অনসূয়ার মনে হলো, একটি কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন যেন কে পরিয়ে দিয়েছে বাড়িটাকে।

তিনি রান্নার মহলে অন্যদিনের তুলনায় আগে গেলেন। কিছুক্ষণ এটা-ওটা দেখে, এর-তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তিনি দাসীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, একটা বড়ো মাছের দরকার, জেলেদের খবর দেওয়া হোক। সুমিতি ওদের প্রাতরাশ নিয়ে দুজন দাসীকে সঙ্গে করে যাচ্ছিলো অন্দরমহলে। অনসূয়া বললেন, 'সুমিতি, মাছের কালিয়াটার ভার আজ তোমার উপরে রইলো। রাঁধুনীদের তোমার পরামর্শ নিতে বলেছি'।

'আসছি', বলে সুমিতি চলে গেলো।

জেলেরা পুকুরে অন্যদিনের তুলনায় আজ ভালো মাছ পেলো। এতে অনসূয়ার সুবিধাই হলো।

কিন্তু নিজেকে শত কাজে ব্যাপৃত রেখেও তিনি ভুলতে পারেননি, কথাটা যখন তিনি বলেছিলেন, খুব কম সময়ের জন্য হলেও লাল হয়ে উঠেছিলো নৃপর মুখ। সে কি অপমানিত বোধ করেছিলো? ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে সে কি মায়ের শাসনে অপমানিত বোধ করে? সমস্ত দিনে মনে মনে অন্তত পাঁচ-ছ বার

নৃপনারায়ণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে উঠলো। যেন তাঁর বাড়িটার এখানে-ওখানে অজস্র ফাটল দেখা দিচ্ছে, যেন তাঁর সংসারের কোথাও কোথাও পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে, আর তিনি উপযুক্ত প্রতিপক্ষ না পেয়ে নিজের আপনজনগুলিকে আঘাত করছেন। নিজের মনের গভীরে নিয়ে ক্ষোভকে বদলে দিতে পারেননি, নিরুপায়ের হিংস্রতায় তা প্রকাশ হয়ে গেছে। এ লজ্জা তিনি কী করে ঢাকবেন?

সন্ধ্যার পর রূপু এসে যখন খবর দিলো, মা ঘরে নেই, তখন অন্য কাউকে না পাঠিয়ে সান্যালমশাই নিজেই অনসূয়াকে খুঁজতে বার হলেন। কাউকে কোনো প্রশ্ন করলেন না, চটির শব্দ তুলে অন্দরমহলে একটু ঘুরলেন, তারপর রান্নার মহলে গেলেন। দু-একজন তাঁকে দেখে কী করবে ভেবে পেলো না। কিন্তু তিনি অনসূয়াকে আবিষ্কার করলেন। অনসূয়া তখন মন্দিরের বারান্দায় অস্পষ্ট হয়ে বসে আছেন।

সান্যালমশাই বললেন, 'দর্জি এসেছে সদর থেকে। রূপুর কী কী বানাতে হবে বলে দিয়ে যাও'।

অবশ্য দর্জির ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরি নয়।

কিন্তু মনসা এলো পুঁথিঘরে যেখানে সান্যালমশাই ও অনসূয়া ছিলেন। শুধু সিঁথি, কণ্ঠি ও বাজুবন্দে নয়, সে তার মুখের হাসিতেও ঝকঝক করছে।

'কোথায় গিয়েছিলি'?

'দাদার ঘরে একটা পার্টি ছিলো'।

'তা অমন একগাল পান মুখে দিয়ে পাগলিব মতো হয়ে না বেড়িয়ে এমন করে থাকলেই তো পারিস'।

মনসা বললো, 'তা থাকবো। হ্যাঁ জেঠিমা, তুমি নাকি রূপুকে যেতে দেবে না? দাদাকেও নিষেধ করেছো'?

অনসূয়া চট করে উত্তর দিতে পারলেন না ; হাসলেন।

'এ কি তুমি ভালো করলে? দাদাকে আটকাও, কিন্তু রূপুকে যেতে দিয়ো'।

'তা যাবে বৈকি'।

'তাই বলো। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বলবো বউদির বাপের বাড়িতে চিঠি দিতে, যাতে ওরা এসে নিয়ে যায়। এখন সাহস পাচ্ছি না'।

'অনেকদিন একটানা আছে এখানে, তাই নয়'?

'তা বৈকি। তাছাড়া ওদের তরফেও তো ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে হতে পারে'।

'তা পারে'।

'তাহলে কাল চিঠিটা লিখে দিয়ো'।

'মনে করিস কাল'।

'আর তাছাড়া, আমার মনে হয়, দাদারও বাইরে ঘুরে আসা মন্দ নয়। সেই কবে থেকে সরকার ওর পিছনে লেগে ছিলো, ম্যালেরিয়ার মতো ধরেছে পূর্ণিমায়-পূর্ণিমায়'।

অনসূয়া আবার হাসলেন। একটু পরে বললেন, 'রূপু যাবে, নৃপকেও যেতে দেবো। কিন্তু, মনসা, ছেলে বড়ো হলে তুই বুঝবি, কখনো কখনো ছেলেদের সম্বন্ধে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না'।

আর একটি ধানের খন্দ এসেছে এবং চলেও গেছে। ইয়াজ ভেবেছিলো সে খুব একটা কিছু করেছে, কিন্তু জমিদারের ফসল তুলে দিয়ে, লাঙল জোয়ালের জন্য ধার শোধ করে যা অবশিষ্ট আছে তাতে আর এক ধানের খন্দ পর্যন্ত সংসারকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। সংসারটা খুব ছোটো নয়, ফতেমা, সুবতুন, নূরের আলি এবং সে নিজে।

ইয়াজের গায়ে গ্রামের শ্যাওলা পড়েছে। যখন সে শহরের একান্ত দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতো তখনো তার চেহারায় ও অভ্যাসে কিছু শহরের ছাপ ছিলো। তার চুল কাটার কায়দা দর্শনীয় ছিলো, একটা রঙিন সিল্কের ছেঁড়া ছেঁড়া গেঞ্জি সে গায়ে দিতো কখনো কখনো ডোরাকাটা কাপড়ের পায়জামা পরতো, বিড়িটা সিগারেটটা খেতো। এখন তার ধূলিমলিন একমাথা চুলে সেসব দিনের জুলফির কায়দা ডুবে গেছে। পরনে অধিকাংশ সময়ে একটা গামছা থাকে নেহাৎ যদি কোনোদিন দিঘায় যাওয়ার দরকার হয় একটি খাটো মলিন মোটা থান কাপড়ের কয়েক হাত সে ব্যবহার করে।

কিন্তু তার ছনমন করে বেড়ানোর স্বভাব যায়নি। তার সঙ্গে আর একটি ভাব যুক্ত হয়েছে, সেটা হচ্ছে কা করি' 'কাঁ করি'। আলেফ সেখের গোরগাড়ি চালানোর কাজ হয়েছে তার। তার জন্য পারিশ্রমিক কী পায় সে ই জানে। কিন্তু যখন সে দিঘা থেকে ফিরে আসে তখন মনের স্ফূর্তি চেপে রাখতে না পেরে উঁচু গলায় গান জুড়ে দেয়। সে গানের ভাষা দুর্বোধ্য, সুর ভয়াবহ। সে তার এই অপূর্বগঠন পরিবারটিকে একটি জেলের পরিবারে রূপান্তরিত করবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো একসময়ে। এখন সেটা নেই, কিন্তু জলের উপরে এবং তা থেকে জালের দিকে টানটা থেকে গেছে। একটা খ্যাপলা জাল সে নিজেই বুনেছে। গাব দিয়ে সেটাকে মাজবার সময় একটা কলহ হয়েছিলো। সুবতুন বলেছিলো, আমার অকাজের সময় নাই। মনে হলো ইয়াজ একটা খুনই করে ফেলবে। সে জালটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য ঘর থেকে দা হাতে নিয়ে বেরুতেই ফতেমা এসে দাঁড়ালো, তার হাত চেপে ধরলো, দা কেড়ে নিলো। ধমক দিয়ে বললো, 'দূর হও বজ্জাত কোথাকার। তুমি মানুষ কাটবা'।

ইয়াজ রাগের মাথায় চিৎকার করে কী বললো তা বোঝা গেলো না। অত চিৎকার করতে গেলে স্পষ্ট করে চিন্তা করাও যায় না। কিন্তু মনে হলো সে বলছে, 'তুমি কি আমার আপন মা যে অমন করে গাল দিবা'?

কিছুদিন সে সুবতুনের সঙ্গে কথাই বললো না।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর, আকাশে গুমোট মেঘ, ইয়াজ বললো, 'সুবো, আজ মনে কয় মাছ ভাসবি'।

'ধরো গা'।

'তার আগে তোমাক ধরবের চাই। তুমি একটু চলো, একলা ভয় ভয় করে। জালেরা নাকি তুক্ করে রাখে'।

মাছ ধরতে গিয়ে বিপদই হলো সেদিন। প্রথম টানেই জালটা আটকে গেলো এক বাঁশের খোঁটায়। সুবতুনকে নামতে হলো গলা জলে, জালের দড়ি ধরে দাঁড়াতে হলো। ততক্ষণে ডুব দিয়ে দিয়ে ইয়াজ জাল ছাড়িয়ে দিলো খোঁটা থেকে।

কিন্তু আসলে সেদিন কপাল ভালো ছিলো। পাটকাঠির মশাল হাতে বালির পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে ভিজে কাপড়ে সুবতুন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো বটে, ইয়াজ নানা জাতের ছোটো ছোটো মাছে খালুইটা ভরে তুললো।

এমন মাছ সে অনেকদিন পায়নি কিন্তু তার চাইতে অন্য আর একটি কারণে সন্ধ্যাটা গুরুত্ব অর্জন করলো। পাশ দিয়ে গেলে মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু লোক চেনা যায় না অমনি অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দুজনে চলছে। ঠাণ্ডা লাগানোতে জ্বর হতে পারে কিনা তাই নিয়ে কথাটার সূত্রপাত।

'জ্বর হলে আর কী করি, না-হওয়া কালে ভয়। মরতি পারলে সব ফরসা'। বললো সুরতুন।

লঘু পরিহাসের ভঙ্গিতে ইয়াজ সুরতুনকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাসির সঙ্গে মিশিয়ে বললো, 'ষাট, বালাই, মরবা কেন্? কেউ বিয়ে করবের চায় না বলে'?

'বড়ো বলে মানো না, কেন্'?

'ওই দ্যাখো আবার রাগ করলা? ঠাট্টা করলাম তাও বোঝো না? বড়োই তো'। অনুতপ্তের মতো বললো ইয়াজ।

কিছুদূর যাওয়ার পর ইয়াজ বললো, 'আচ্ছা, সুরো, একটা কথা কবা? তুমি মাধাইয়ের ঘরে থাকলা না কেন্'?

'পরের ঘরে থাকবো কেনে'?

'মিয়েমানুষ তা থাকে। এখানে কৈল তোমার বড়ো কষ্ট'।

'কষ্ট আর কী, দুনিয়ায় তা নাই কনে'?

'তাইলেও এমন চেহারা তোমার তখন হয় নাই। যেদিন তুমি আসলা সেদিন যেন রূপ ফাটে ফাটে পড়ে। আর এখন শুকায়ে কী হইছো'।

সুরতুন নিরুত্তর।

'কলে না'?

'কী কবো? তুই একখান শাড়ি কিনে আনিস, পরবো'। সুরতুন হাল্কা কথায় চিন্তা ঢাকতে চেষ্টা করলো।

গোরুগাড়ি হাঁকিয়ে ইয়াজ সপ্তাহে একদিন দিঘায় যায়। একবার সেখান থেকে ফিরে সে বললো, 'মাধাই বায়েনের সঙ্গে দেখা হইছিলো'।

ফতেমা বললো, 'কেমন দেখলি'?

'তা সেইরকম। শিস দিয়ে বাজারের মধ্যে ঘুরতিছিলো'।

'তোকে কিছু কলে'?

'না। আম্মা, তোমার জয়নুল-সোভানেক দেখলাম। তারা তাগরে আব্বার দোকান জাঁকায়ে বসেছে। একজন কলে, কসাই আবার নিকা করছে, কিন্তুক ধরছে ক্ষয়কাশ'।

'জয়নুল-সোভানও তোকে কিছু কলে না'?

'আমি তাদের সামনে গিছি? দূর থিকে দাঁড়ায়ে দেখলাম'।

'এবার গেলি কথা কয়ে আসিস'। ফতেমা বললো।

কিন্তু মাধাইয়ের সম্বন্ধে সে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলো। বাঁশ, নলখাগড়া প্রভৃতির সাহায্যে তার নিজের জন্য যে কুঁড়েটা সে তুলেছে সন্ধ্যার পর সংবাদটা দেওয়ার জন্য সুরতুনকে সেখানে ডেকে নিলো ইয়াজ, কিংবা ছল করে সুরতুনই গেলো সেখানে।

'মাধাই দেখলাম সুখেই আছে। চাঁদমালা না কে একজন তার সঙ্গে ছিলো। দেখলাম মাধাই তাকে বাজার সওদা করে দিলো'।

'আর কিছু কবি'?

সুরতুন উঠে দাঁড়ালো। সে বৃথাই ভেবেছিলো, বাইরেটা শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ক্ষতটিও শুকিয়ে গেছে।

সুরতুনের মনে হয়, অন্য কারো জন্য প্রাণ পোড়া কিছু না। সেটা একটা খেয়ালের খেলামাত্র। কিন্তু অদ্ভুত নেশা তার। একটা পুরনো ঘটনাও মনে পড়ে গেলো সুরতুনের।

বেল্লাল সান্দারের জেবু নামে এক মেয়ে ছিলো। জ্বরে ভুগে ভুগে জীর্ণ-শীর্ণ, মাথার চুলগুলিও তেমন করে আর বাড়েনি। শুকনো চেহারার পনেরো-যোলো বছরের একটি মেয়ে ছিলো সে। পাড়ার মেয়ে স্বজাতীয়দের মেয়ে ছাড়াও সুরতুনের সঙ্গে নিকট-পরিচয় হওয়ার আর একটু কারণ ছিলো। ফসল উঠে যাওয়ার পর সুরতুন-ফতেমার সঙ্গী হয়ে ভোররাতে সে ধান কুড়োতে যেতো।

ধানের কাজ শেষ করে তখন বাঙালরা চলে গেছে, এমন এক সন্ধ্যায় পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে জেবু এসে দাঁড়িয়েছিলো ফতেমার কাছে।

—কেন রে জেবু?

—ও যে চলে যাবি।

—কেডা যায়?

জেবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো—রোমজান।

—তাতে তোর কী? ধানের সময় নানা দেশের লোক আসে যায়। ধান নিয়ে পলাইছে?

—না। আমার কী হবি?

জেবুর একটি ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিলো যে সে প্রজাবতী।

কথাটা শুনে প্রথমে খানিকটা নির্দয় রঙ্গ করলো ফতেমা। তারপর জেবুন্নিসাকে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণগুলি বুঝিয়ে দিতে গিয়ে সে দেখলো, নিজেও সে সে-বিষয়ে অত্যন্ত কম জানে।

সেবার সেসব পূবদেশী বাঙাল এসেছিলো তাদের মধ্যে একজন ছিলো রমজান। বছর কুড়ি বয়স হবে কি না হবে, কিন্তু এত লম্বা যে মানুষ একশো বছরেও তেমনটা হয় কিনা সন্দেহ। সেই দৈর্ঘ্যের ফলে তার হাত দুটো লটপট করতো, পা দুখানা ন্যাকপ্যাক করতো। চটে জড়ানো একটু পুঁটুলি, একটা মাথাল, একটা কাস্তে নিয়ে সে এসেছিলো ধান কাটতে সেই যেবার দুর্ভিক্ষের আগে ধানের বান ডেকেছিলো।

সড়কের ধারে বলে বেল্লালের বাড়িতেই সে তামাক খেতে ঢুকেছিলো। তার সঙ্গীরা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে চিকন্দি ও সানিকদিয়ারের খেত খুঁজে কাজ ঠিক করে নিয়েছে। তখনকার দিনে বাঙালদের অনেকেই বুধেডাঙায় সান্দারপাড়ায় তাদের দাওয়ার আশ্রয় নিতো। এটা একটা প্রথায় দাঁড়ানোর মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছিলো। বাড়ির মালিককে তারা এক কাঠা করে ধান দিতো। রমজান বেল্লালের বারান্দাতেই বসে রইলো। সন্ধ্যার পর একবার বেরুলো সে। কাছে যে খেতটা পেলো তার মালিকের সঙ্গে দর কষাকষি না করে মালিক যা বললো তাতেই রাজী হয়ে আবার বেল্লালের বাড়িতে ফিরে এলো সে।

দেখা গেলো লোকটা ধানের কাজে যতই আলস্য দেখাক, আসলে কাজ না-করে থাকতে পারে না। ধান কাটার পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে এসে একটু জিরোতে না-জিরোতে সে বলে—আজ বুঝি দড়িদড়া পাকান নাই?

বেল্লাল হেসে বলে—তোমাদের দেশে সাঁঝেও বুঝি লোকে বিচ্ছাম করে না?

এমন না হলে জেবুকে ধান কুড়োনোর জন্য ভোররাতে ফতেমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময় পায় সে!

ক্ষেতের ধান ঘরে উঠেছে। নদীর ঘাট থেকে বাঙালদের ধানবোঝাই নৌকাগুলো রওনা হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে এরা, তেমনি চলে যায়। ঝাঁকছাড়া দু-একটা বোকা পাখি যদি পড়ে থাকে, তবে সেটা ডানায় যত না জোর তার চাইতে বেশি তোড়জোড় করে উড়তে, তেমনি করতে লাগলো রমজান।

তখন ফতেমা ইয়াকুবকে বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলো। ইয়াকুব প্রথমে রাজী হয়নি কিন্তু ফতেমা বাপের বাড়ির দিকে চলে যাবে শুনে সে লম্বা লম্বা পায়ে দৌড় দিলো হাঁক দিতে দিতে। কুস্তির প্যাঁচে ঘায়েল করে চোর ধরার মতো রমজানকে সে ধরে আনলো। নিজের আঙিনায় পৌঁছে ইয়াকুব বললো—শালা, পলাও কেন্ চুরি করে?

রমজান ভীত হলো না।

এরপরে ইয়াকুব এবং ফতেমা জেবু ও রমজানের জন্য একখানা ঘর তুলে দিয়েছিলো। বাঁশঝাড় থেকে কুড়িয়ে-আনা কঞ্চি এবং নদীতীর থেকে সংগ্রহ করা কাশ দিয়ে দেখ-দেখ করে ঘর উঠলো একখানা। বেল্লালের বাড়ির বুড়ো কুকুরটা যৌতুকের মতো জেবুর সঙ্গে এসেছিলো।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম পদসঞ্চারে জেবু ও রমজানের মৃত্যু হলো। ডুবন্ত অবস্থায় তারা পরস্পরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলো।

ফতেমার ব্যাপার চিন্তা করতে গিয়েই সুরতুনের এত কথা মনে পড়েছে। ফতেমা জেবু নয়। অনেক অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে এই জীবনে, কিন্তু তবু এবার ধান কাটার দিনে ফতেমার পায়ের তলা থেকে শক্ত মাটি যেন সরে-সরে যেতে লাগলো। এ বিষয় নিয়ে সুরতুন ফতেমার সঙ্গে আলোচনাও করেনি। কিন্তু একসময়ে সুরতুন স্থির করেছিলো ফতেমা যদি তার সঙ্গে চলেও যায় তবুও ফতেমা উধাও হয়ে যাওয়ার এক মুহূর্ত আগেও এ ব্যাপারটির কথা কারো কাছে সে বলবে না।

সেই লোকটির মতো কাউকে এ অঞ্চলে চোখে পড়ে না। সে যেন সান্যালবাড়ির কেউ, এমনি তার গায়ের রং। আর তার চোখ দুটি অবিস্মরণীয়। নীল চোখ, নীলের মধ্যে যেন পাটকিলে রঙের আঁশ। তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মনে হতো, রোজ যাদের দেখা যায় এ যেন তাদের কেউ নয়। ধান কাটতে এসেছিলো। নিতান্ত দরিদ্র ভূমিহীনদের একজন। এদিকের চলিত প্রথা অনুসারে বুধেডাঙার এই বাড়িটাতে দু কাঠা ধান দেওয়ার কড়ারে ধান কাটার দিন পনেরো থাকবে এই ব্যবস্থা হয়েছিলো।

এদিকে সুরতুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো ফতেমা নিজেই, কথা দিয়ে নয়, কাজে। একটা রঙিন তফন কিনে এনে সে সুরতুনের হাতে দিয়ে বলেছিলো—বাঙালেক দিস। দিশেহারা না-হলে এমন দয়া আসে না মনে।

চলে যাওয়ার সময় হলে সে লোকটি বললো—আমি আবার আসবো।

ফতেমা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। খানিকটা চিঁড়ে-গুড় একটা ছোটো পুঁটুলিতে বেঁধে এনে লোকটির সম্মুখে রেখে এই কথাটা সে শুনতে পেলো। অদ্ভুত একরকম নিঃশব্দ হাসিতে আচ্ছন্ন হয়ে ফতেমা বললো—তা আসবের হবে কেন্ যদি কাজ না থাকে?

ইয়াজ বললো—আপনে ঘাটে যান মেঞাসাহেব। আপনের ধানের বস্তাগুলো আমি দিয়ে আসতেছি।

রজব আলি লোকটার সঙ্গে গল্প করতে করতে পদ্মার ঘাটে যেখানে লোকটির দলের নৌকাটা বাঁধা ছিলো সেখানে গিয়েছিলো।

বাড়ির সকলেই যেন লোকটির গুণে মুগ্ধ হয়েই তাকে সমাদর করতে লাগলো।

তফাত এই, ভাবলো সুরতুন, একটা সংসারকে যে চালায়, বহন করে, ধরে রেখেছে, সেই ফতেমা জেবুর মতো হাহাকার করতে পারে না, অনুশোচনাতেও ভেঙে পড়ে না। অন্য কথায়, অর্ধেক ভেঙে ভেঙে পড়তে পড়তে কোনো কোনো গাছ যেমন কোনো গোপন শিকড়ের জোরে সামলে নেয় ফতেমা যেন তেমন কিছু করেছে।

কিন্তু 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করাই যেন যথেষ্ট কষ্ট নয়, তাই এ বেদনাও মানুষকে সইতে হয়।

এখন ইয়াজ বুঝতে পেরেছে, সুরতুন ও ফতেমা একই যৌথ কারবারের অংশীদারের মতো পাশাপাশি চললেও সুরতুন যেন কোনো কোনো ব্যাপারে এখনো সংকুচিত। ইয়াজের উপার্জনের কিছুমাত্র তার ব্যবহারে লেগেছে, এ ভাবতে গিয়ে যেন সে কুণ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে সে এই পরিবারের কেউ নয় এ ভাবটি তার এতদিনেও যায়নি। ইয়াজের ইচ্ছা হয় সে সুরতুনের মনোভাব দূর করবে। তার ইচ্ছাটা হয় এবং সে অনেক সময়ে বলে, 'কী ভাবো সুরো'?

এবং সে দিঘায় গেলে সময়ের একান্ত অভাব না হলে মাধাইয়ের খবর নেওয়ার চেষ্টা করে। মাধাই

এবং সুরতুনের মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারে সে ক্রমশই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাজে ডুবে থাকতে হয় তাকে, কাজেই সব সময়ে সুরতুনের অন্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে সে পারে না। তবু বাল্যে আকাশের মেঘ দেখে যেমন কৌতূহল হতো তার, তেমনি হয় সুরতুনকে নিঃশব্দে আঙিনায় চলে ফিরে বেড়াতে দেখলে।

এরকম মনোভাব থেকেই একদিন ইয়াজ রজব আলিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন্, নানা, সুরো তোমার ভাইয়ের বিটি, তাক বিয়া দিবা না'?

নতুবা এমন অভিভাবকসুলভ আলাপ করার পক্ষে ইয়াজের বয়স যথেষ্ট নয়। বয়সের হিসাবে ইয়াজ সুরতুনের চাইতে ছোটোই হবে।

আবার যেদিন ইয়াজের সঙ্গে সুরতুনের নির্জনে দেখা হলো, দুজনে হাট থেকে ফিরছিলো, ইয়াজ বললো, 'সুরো, আমার মনে হয় তোমার বুকের মধ্যে কী আছে তা দেখি'।

'কেন্, এমন হয় কেন্'?

'আমার যেন মনে হয় তোমার সুখ নাই। তোমাক যেন চিনবের পারলেম না'।

'মানুষ চেনা কি সহজ'? সুরতুন হাসিমুখে বললো। টেপির মায়ের সেই বাবাজির গানের একটা কলি তার মনে এসেছিলো।

'আচ্ছা, সুরো—'

'কও'।

'এমন রূপ তোমার, লোকে তোমাক নিবের চায় না কেন্'?

'ছাই'!

কথাটা মিথ্যা নয়, সুরতুনের রূপ যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেহবর্ণ মলিন হয়েছে, ধানহীন দিনে স্বাভাবিকভাবেই মেদহীন হয়েছে তার দেহ, স্তন শুকিয়ে গেছে চৈত্রের মাটির মতো, তবু সেই করুণ মুখে টিকলো নাকটি আছে, এবং টানা টানা দেখায় চোখ দুটি, আর সেই চোখের কোলে ক্লান্তির কালিমা।

'কও কী'? ইয়াজ বললো, 'আমার মনে কয় তোমার কী কী অভাব জানে নিই। নতুন কাপড়েও তোমার রূপ যেন বাড়ে না, ঢাকা পড়ে'।

সুরতুন বললো, 'এমন কথা কী কয়'?

ইয়াজ দিঘায় গিয়েছিলো এবং সাধ করেই সে মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলো। বাড়িতে ফিরে সে অন্য কোনো কথা বলার আগেই ফতেমার কাছে গিয়ে বললো, 'মাধাইয়ের খুব অসুখ। বাঁচে কি না বাঁচে'।

'কস কী'?

তখন দুপুর। সুরতুন উঠোনের একপ্রান্তে বসে শুকনো ডালপালা কেটে কেটে লকড়ি তৈরি করছিলো। ফতেমা রান্নার জোগাড় করে নিয়েছিলো। রান্না ফেলে সে সুরতুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, 'শুনছো না, সুরো, বায়েনের খুব অসুখ'।

'সে কি যাতে কইছে'? সুরতুন প্রশ্ন করলো।

'কী কস, ইজু'? ফতেমা ইয়াজকে প্রশ্ন করলো।

'না। আমি যাওয়াতেই রাগ করছে'। ইয়াজ বললো।

'তবে'? সুরতুন প্রশ্ন উত্থাপন করলো।

ফতেমা বললো, 'কিন্তুক তার যদি ভারি ব্যারাম হয়'?

সুরতুন অত্যন্ত মৃদুগলায় বললো, 'সে যদি রাগ করে তাইলে আমরা যায়ে কী কবি'?

সে মুখ নিচু করে আবার লকড়ি কাটতে লাগলো।

ফতেমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বললো, 'না গেলি হয় না, সুরো, যাওয়াই লাগে'।

সেদিন ফতেমাদের বাড়িতে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা হলো না। কিছুক্ষণ পরেই সুরতুন ও ফতেমা ইয়াজকে নিয়ে দিঘায় রওনা হলো।

ফতেমারা যখন মাধাইয়ের ঘরে গিয়ে পৌছলো তখন বেলা পড়ে আসছে। মাধাই তার ঘরের মধ্যে শয্যায় বসে উচ্ছ্রিত জানুতে কপাল রেখে করুণ স্বরে হা-হুতাশ করছে।

সুরতুন বললো, 'ভাবি, এখন কী করবা'?

'কী করতে কস'?

ফতেমা আর-একটি মুহূর্ত চিন্তা করলো, তারপর দ্বিধা ত্যাগ করে মাধাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার পিঠে হাত রাখলো।

মাধাই চমকে উঠে মুখ তুললো। একডালি চুল, একমুখ দাড়ি, চোখ দুটি লাল।

ফতেমা বললো, 'কী হলো, ভাই'?

ইয়াজ বলেছিলো মাধাই রাগ করবে, কিন্তু সে দু হাত বাড়িয়ে দিলো ফতেমার দিকে, ভঙ্গিটা যেন শিশুর কোলে উঠতে চাওয়ার মতো। ফতেমা আরও কাছে সরে দাঁড়ালো, মাধাইয়ের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বলতে লাগলো, 'ভয় নাই, ভয় নাই'।

কিছুক্ষণ পরে মাধাই বললো, 'বুন, চলো আমরা বাইরে যায়ে বসি'।

মাধাই বারান্দায় এলো। সে মাটিতে বসতে যাচ্ছিলো, ইয়াজ এগিয়ে এসে একটা চট পেতে দিলো।

ফতেমা বললো, 'ভাই শোও, একটুক্ ঘুমাও ; না হয় শুয়ে শুয়েই কথা কও'।

মাধাই অত্যন্ত বাধ্য একটি কিশোরের মতো শুয়ে পড়লো। ইয়াজ কিছুদূরে মাটিতে বসেছিলো, তাকে দেখিয়ে মাধাই প্রশ্ন করলো, 'আমার ভাগ্না বুঝি'?

সুরতুন বারান্দার উপরে চটের একপ্রান্তে বসেছিলো, মাধাই অনেকটা সময় তার দিকেও চেয়ে রইলো। মনে হলো, মাধাইয়ের দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়েছে, এবার সে একটু ঘুমোলেও পারতো। কিন্তু বকবক করতে লাগলো। পুরনো কথা উত্থাপন করে যেন তার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিচ্ছে। একসময়ে সে বললো, 'আমার কি এত লোক'?

সন্ধ্যার আগে চাঁদমালা এসেছে। সে যেন আরও স্থূলাঙ্গী হয়েছে। একটি রঙিন শাড়ি তার পরনে। এজন্য তার খরচ হয় না। যে কাপড় সে কাচতে আনে প্রয়োজনমতো তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সে পরে। চোখে সে কাজল দিয়েছে। দু হাত ভরা রেশমি চুড়ি। ঘরে ঢুকে একটা ঝোলা থেকে গুটিকয়েক মাটির খুরি, একটা দেশী মদের বোতল নামিয়ে রেখে সে ঘরের মধ্যে ঘুটঘাট করে কাজ করতে শুরু করলো।

মাধাই বললো, 'দেখছো না, ওই আমার চাঁদমালা। বড়ো ভালোমানুষ। সব ব্যবস্থাই ও করে। র‍্যাশন আনে, বাজারে বেশি দামে বাড়তি র‍্যাশন বেচে। ওর কোনো খরচাই নাই। শুধু সাঁঝে এক বোতল ঢকঢক করে খায়ে ঘুমাতে পারলি মহা খুশি। যেন কত কাল ঘুমায় না। ও নিজেও কাপড় কাচে, যে টাকা পায় তাও আমার জন্যিই খরচা করে'।

এসব কথা চাঁদমালার সাক্ষাতেই হলো। প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলা দূরের কথা, যেন সে শুনতেই পায়নি এমনিভাবে ঘরের যে কাজটুকু অবশিষ্ট ছিলো তা করে একটা কালি-পড়া টোল-খাওয়া কেট্‌লি নিয়ে চলে গেলো আবার।

মাধাই বললো, 'ফতেমা, এবার তোমাদের যাওয়া লাগে'।

'কেন? চাঁদমালা কি রাগ করবি'?

'তা করে মিয়েমানুষরা, কিন্তুক চাঁদমালা তা করবি নে। মুখ দেখে মনে হয় আজ সারাদিন তোমাদের খাওয়া হয় নাই। এখন বাড়ি যায়ে সেসব করো গা। যখন কাঁদে কাঁদে ভগোমানেক ডাকতেছিলাম তখন আসে বড়ো ভালো করছিলা। আমাক জানা থাকলো, আমার মড়া শিয়াল-কুকুরে খাবি নে'।

'এমন কথা কয়ো না। চাঁদমালা যদি তোমার বউ, তবে তোমার চিকিচ্ছা করায় না কেন্'?

মাধাই একটু চিন্তা করে বললো, 'চিকিচ্ছা করায়ে কী হবি, তাতে কি আমার চাঁদমালা সাববি'?

বুঝতে না পেরে ফতেমা বললো, 'চাঁদমালার কী হইছে'?

মাধাই যা বলতে চেয়েছিলো সেটা বলার আর চেষ্টা করলো না সে। কথাটা বলেই বরং অকারণে কটু কথা বলার অনুশোচনা হলো তার। চাঁদমালাকে রোগজ্ঞানে পরিত্যাগ করার কোনো যুক্তিই এখন আর নেই তার পক্ষে।

কিন্তু ফতেমা যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে নির্মম ও ভয়লেশশূন্য না হলে চলবে না, এমনি ভঙ্গিতেই সে বললো, 'ভাই, তুমি চাঁদমালায় সুখ পাতেছো না আর। সে তোমার মুখ দেখে বুঝবের পারি। সুরোকে নিয়ে থাকো। দুইজনাই সুখী হবা'।

কথাগুলো শুনে উদ্যত কান্না নিয়ে চোখ-মুখ আড়াল করলো সুরতুন কিন্তু তার মনে হলো যেন বলপ্রয়োগ করা দরকার কোনো কোনো বিষয়ে। ফতেমা ঠিকই বলছে, এখন আর চুপ করে থাকার সময় নেই।

উত্তর দিতে সংকোচ বোধ হয়েছিলো মাধাইয়ের, পরে সে বললো, 'এখন আর তা হয় না'। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো সুরতুনও তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এতক্ষণে একটি কথাও সে বলেনি। সে তখন বললো, 'আয় সুরো, আমার কাছে আয়'।

দিনের আলোয় আর পাঁচজনের চোখের সম্মুখে প্রিয়জনকে আদর করায় রুচিহীনতাই সূচিত হয়। কিন্তু এটা যেন কোনো সন্ন্যাসীর নিস্পৃহতা এবং ঔদাস্য, সাধারণের হিসাবে যা মাপা যায় না। ফতেমা, এমনকী ইয়াজ পর্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহের দৃষ্টি দিয়ে মাধাইয়ের এ ভঙ্গিটিকে সমর্থন করতে লাগলো।

সুরতুনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মাধাই যেন বলীয়ান হয়ে উঠলো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন সে হাসতেও পারে এমন ভঙ্গি করে বললো, 'এক জোয়ানের গল্প জানো না? সারা দেশে সব চায়ে বড়ো জোয়ান হবি বলে সে কী কী খাতো। কিন্তু কোবরেজমশা যা কইছিলো তার চেয়ে বেশি খাতে লাগলো, তার পরে তার মাংস চামড়া খসে খসে গেলো। আমিও খুব সুখ চাইছিলাম, ফতেমা, আমারও তেমন অবস্থা'।

'কী কও বুঝি না'।

মাধাই হেসে বললো, 'দ্যাখো তো কি বোকা আমি! মনকে ভালো করতে চাইছিলাম। শরীল আমাক মারে খুন করছে'।

ফতেমা বললো, 'তোমার এ সকল কথা বুঝি না। কী অসুখ তোমার, তাই কও। আর সুরো যদি যত্ন করবি সে-অসুখ সারে না কেন্ তাই কও'।

'বুনেক তা কওয়া যায় না। ডাক্তার উপর-উপর সারায়ে দিছে, কিন্তুক জানি সারা শরীলে সে-বিষ ছড়ায়ে আছে। রাতে ঘুম নাই। সুরোক সে বিষ দিয়ে কী হবি'?

সুরতুন একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাধাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। তার তখন মনে হলো মাধাইয়ের নাকটি যেন কিছু বিকৃত, তার মুখের ত্বক যেন কোথাও কোথাও সংকুচিত। কিন্তু এ তার চোখের ভুলও হতে পারে। সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে গেছে, এ কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। আর হাসির কথা ভাবো যা একটু আগে মাধাইয়ের মুখে ফুটে উঠেছিলো। সুরতুনের মুখ একটি আকস্মিক হাসিতে ঝলমল করে উঠলো; সে বললো, 'কেন্, বায়েন, সেই ভাসান পালাগানে কার যেন গায়ের চামড়া খুলে খুলে গিছিলো, তারপর তো জোড়া লাগছিলো'।

পালাগানের কোনো চরিত্রের কথা নয়। মাধাইয়ের গল্পটার পাল্টা আর একটা গল্প বলা, যার বীজ মাধাইয়ের কথা থেকেই সংগ্রহ করেছে সে। তবু সুরতুনের মুখের হাসি ও তার গলার সুরে একটা গোটা পালাগানের সবটুকু রস সঞ্চিত।

ফতেমা যেন আশ্বাসে সোজা হয়ে বসলো।

কিন্তু বিমূঢ় ভাবটা সাময়িক। মাধাই বললো, 'যাও, যাও। আমি কি পাথব? অমন করে লোভ দ্যাখাও কেন্? কী লাভ? কী লাভ'?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাধাই কেঁদে কেটে ফুঁপিয়ে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো। শুধু সুরতুন নয়, জীবনও তার আওতার বাইরে চলে গেছে।

৩৭

কী এক অশান্তির সময় এসে পড়লো। রেডিওর সংবাদ, কাগজের সংবাদ, সব যেন অশান্তিতে কাঁপছে। কোথাও কি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হবে? সে আনন্দে কি কান্না জড়ানো থাকবে, কিংবা দুঃখ ঢাকার বেপরোয়া হাসি? এ কি এক নতুন দর্পিত বৈশাখ আসছে তার ঝড়ে পুরনো সব কিছুকে ধ্বংস করে? কারো কারো মনে হতে পারে—পদ্মা নতুন খাত নিতে পারে, সংবাদটা এরকমই যেন। যে প্লাবন পলি আনে তা নয়, বরং যেন কীর্তিনাশা রূপ নেবে। ভয় হতে থাকে, ভয়কে অবিশ্বাস করতে সাধ যায়।

রূপুর মনে হয়েছিলো সংবাদগুলো সকলেরই জানা দরকার। সে সদর থেকে একটা রেডিও আনিয়ে যে ঘরগুলোতে সদানন্দর স্কুল বসতো সেখানে রেখেছে। গ্রামের সকলেই যেন তাদের ইচ্ছা আর সময়মতো শুনতে পারে, এরকম ব্যবস্থা।

বৈশাখের মাঝামাঝি। সুমিতিকে নেবার জন্য তার কাকা এসেছেন চিঠি পেয়েই। মনসা তাঁকে দুদিন থেকে যেতে রাজি করেছে।

তিনি কলকাতার ব্যারিস্টারপাড়ার মানুষ। তাঁর কথা শুনে মনে হয়, রেডিও ও খবরের কাগজে সেসব সংবাদে দিগমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে আসছে পাকা আবহবিদের মতো তার অন্তরস্থিত গতিপ্রকৃতির খবরও তিনি রাখেন। বিভিন্ন মত থাকতে পারে, তা সবেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্যারিস্টাররা। কলকাতাই আসল। তাকে দখলে রাখতেই শলাপরামর্শ। শুনে রূপু সুমিতিকে বলছিলো, 'দেখো, বউদি, এ যেন সেই কনৌজের জন্যই যুদ্ধ আবার'।

সকালে সুমিতির কাকা সদানন্দকে সঙ্গে করে গ্রামের পথে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সান্যালমশাইয়ের লাইব্রেরিতে গ্রামের কথাই হচ্ছিলো।

গ্রামের অনেক পথ আছে যেখানে গত বিশ বৎসরে সান্যালমশাই একবারও পদার্পণ করেননি। সেসব পথের ধারে যে-মানুষগুলি এককালে বাস করতো তাদের বংশধররা এখনো বাস করে কিনা এ খবরও তাঁর জানা ছিলো না। সদানন্দর মুখে বর্ণনা শুনে তাঁর মনে হলো এইসব পথের উপরে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ছোটোখাটো দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে এবং যুদ্ধের এই পর্যায়ে অন্তত মানুষেরই বড়ো রকমের একটা হার হয়েছে। আর সে সব যুদ্ধে তাঁর সংযোগ ছিল না।

এরপরে গ্রামের পুরাতন সমৃদ্ধির কথা উঠলো। কোনো কোনো পথে ধুলোর আস্তরণের নিচে ঘুটিং আছে বলে অনুমান হয়। সুমিতির কাকা এ থেকে গ্রামের সেকালের সমৃদ্ধি নির্ণয় করার উদ্যোগ করছিলেন।

সদানন্দ বললো, 'দরিদ্রের সংখ্যা আগের তুলনায় অবশ্যই বেড়েছে। ধনীদের সংখ্যাও, অন্যদিকে, বাড়েনি তাতে। গ্রামের গড় আয় তখন বেশি ছিলো। কারণ কৃষির সঙ্গে তখন শিল্পও ছিলো, এখন যাঁরা

ধনী আছেন গ্রামে তাঁদের মতো মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই তখন বেশি ছিলো'।

'সেসব পথঘাট ধনীরা কি নিজেদের জন্যই করেছিলেন'?

'সব ধনীরা নয়। পাটের সাহেবরা করেনি। অন্তত দুটি ভালো পথ, যার কিছু কিছু অংশ এখনো মজবুত আছে, নীলকর সাহেবরা তৈরি করেছিলো। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, পথ দুটোর একটা গেছে পদ্মার পুরনো খাতের দিকে, অন্যটা কবরখানায়। সেখানে দু তিনটি কবর আছে। তার মধ্যে একটি এক আর্মেনি বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মুন্সেফের। মনে হয়, এ গ্রামে এক মুন্সেফি আদালত ছিলো'।

এই সূত্রে মুন্সেফি আদালত থাকার গুরুত্ব থেকে গ্রামের আরও নেমে যাওয়ার কথায় স্তরে স্তরে যারা ধনী ছিলো তাদের কথা হলো। সেকালেই সেই ধনী কারিগর আর কুঠিয়াল দালাল থেকে নীলকর হয়ে পাটের সাহেবদের স্তর পর্যন্ত গ্রামের ধন ক্রমশ বেশি করে বাইরে গিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

'তা ছিলো'। বললেন সান্যালমশাই, 'সেরেস্তার পুরনো কাগজের মধ্যে চিকনডিহি মুন্সেফি আদালতের মোহর দেওয়া কাগজ পাওয়া যায়'।

তাদের সকালের ভ্রমণ বুধেডাঙার প্রান্ত ছুঁয়েছিলো। বুধেডাঙার বয়স কম। দেখলে ছায়াসুনিবিড় তার কথা মনে আসে না। সান্দারেরা যৌথ হওয়ার পরে নতুন করে যে চাষীরা বসেছে তারা তাদের জমিতে জঙ্গল হতে দেয়নি। দূর দূর বিস্তৃত তাদের নিরাবরণ জমি যেন জলের তৃষ্ণায় ক্লান্ত। ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর দু একটি বিবলপত্র গাছ। পদ্মা থেকে বুধেডাঙার উপর দিয়ে প্রচুর ধুলো নিয়ে বাতাস এসে লেগেছিলো গায়ে।

ব্যারিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন 'ফসলহীন এ চৈত্র-বৈশাখেই তো খাজনা দেয়া নেয়ার ঝোঁক পড়ে'।

সদানন্দ বললো 'বছর শেষ হয় যে'।

সান্যালমশাই ভাবলেন, বুধেডাঙার বয়েস বাড়তে বাড়তে এমন একসময় আসবে যখন সেটাও প্রাচীন গ্রামের সবগুলি লক্ষণ অর্জন করবে। তার গাছপালাগুলি বেড়ে বেড়ে সূর্যালোক রোধ করবে। চাষের জমির জন্য সেখানকার কৃষকরা অন্যত্র দৃষ্টি দেবে। এমন হতে পারে, এখন যে বয়োজীর্ণ চিকন্দিকে দেখা যাচ্ছে তখন সেটা বুধেডাঙার চাষীদের চাষের জমিমাত্র হবে। তাদের হাতে পড়ে চিকন্দি আবার নতুন হবে, কিন্তু তার আগে কি তার মৃত্যুই অপরিহার্য?

সুমিতির কাকা বললেন, 'আজকাল যেসব গ্রামোদ্যোগের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তার ফলে এসব গ্রামের চেহারা বদলে যাবে'। সদানন্দ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

গ্রামের চেহারা বদলে গেলে ব্যাপারটা কী রকম হয় সেটা কল্পনা করায় কৌতুক আছে। সান্যালমশাইয়ের মনে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে পড়া সীতারাম প্রভৃতির রাজধানীর চিত্রটা ভেসে উঠলো। চওড়া চওড়া মাটির পথে বড়ো বড়ো পাল্কি চলছে। সেই ছবিতে তারপরে লালমুখো নীলকরদের দাদন নিয়ে শামলা-আঁটা দিশি মুৎসুদ্দিরা ঢুকে পড়লো।

অলস অবসর। সদানন্দ কথায় কথায় উন্নীত একটা গ্রামের ছবি এঁকে ফেললো।

সুমিতির কাকা বিলেতি রাবে আহুত হয়েছিলেন। তিনি শহরের উপান্তে স্লেট, সিমেন্ট, কাঠ ও কাচের তৈরি ছোটো ছোটো কটেজগুলোর কথা বললেন, সেই সব বিলেতি গ্রামের বাঁধানো পথ ও ইলেকট্রিসিটির আলোর কথাও।

সান্যালমশাই হেসে বললেন, 'সদানন্দর কল্পনার গ্রামে বিলেতি সেসব গ্রামের ছাপই পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশের কয়েক কোটি কুটিরে খড়ের বদলে স্লেট, নলখাগড়ার বদলে সিমেন্ট ব্যবহার করতে গোটা হিমালয়টাকেই গলিয়ে নিতে হবে বোধহয়। আর সেই কয়েক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সারা ভারতে ছড়াতে একটা নতুন মহাদেশ শোষণ করা দরকার হবে সম্ভবত'।

'এ তোমার অতিরিক্ত পড়ার ফলে কিনা জানি না সদানন্দ', একটুপরে আবার বললেন সান্যালমশাই, 'কিন্তু এখানে তুমি গ্রামোদ্যোগের সাহায্যে ট্রাক্টর রাখার কল্পনাও কোরো না। এ দেশের চাষীরা তো

রেডইন্ডিয়ান নয় যে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে পুরে রেখে এসে মনের আনন্দে শূন্য জমিতে কলের মই টানবে'।

অন্য আর-এক সময়ে অনসূয়ার সঙ্গে সান্যালমশাইয়ের কথা হলো।

সান্যালমশাই বললেন, 'এ অঞ্চলে সান্যালবংশটা রায়দের দৌহিত্র বংশ'।

অনসূয়া এসব কথা জানেন। তিনি বুঝতে পারলেন সান্যালমশাই রায়দের সম্বন্ধে কিছু বলতে চান, এটা তার ভূমিকা।

সান্যালমশাই বললেন, 'রায়দের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য এই, তাঁরা বেহিসেবি ছিলেন। এবং আমার আগেকার সান্যালমশাইরা তাঁদের বেহিসেবি চালে সুখী হতেন, কারণ সম্পত্তি বন্ধক রেখে নগদ টাকা সংগ্রহ করা রায়দের রেয়াজ ছিলো। কলকাতায় যে ফ্যাসন ষাট-সত্তর বছর কিংবা তারও আগে আধুনিক ছিলো, তাকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন রায়েরা। গরমকালেও মোজা পায়ে দেওয়া, তাঁদের ধুতির পাড় ছিঁড়ে পরা, পাঞ্জাবিতে লেস বসানো, এসব ব্যাপারকে তাঁরা সযত্নে লালিত করতেন এই সেদিন পর্যন্তও। কিন্তু দীর্ঘ ও আপাতদৃষ্টিতে বলিষ্ঠ দেহ নিয়েও তাঁরা পঞ্চাশে পৌঁছতেন না। এখন জানি, সেটা অ্যালকোহোলিজমের ফল। শেষের দিকে রায়বাড়ির মেয়ে-বউদের মধ্যেও সুরার প্রচলন হয়েছিলো। আমাদের প্রথা ছিলো মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে স্ত্রী সংগ্রহ করার। পাকাপাকি ভাবে বোহেমিয়ানা সেজন্যেই আমাদের উপরে ভর করেনি। কিন্তু—'

সান্যালমশাই তাঁর কথার মাঝখানে থেমে গেলেন। অনসূয়া বুঝতে পারলেন, সান্যালমশাই 'কিন্তু' বলে কী নির্দিষ্ট করতে চান। এত সতর্ক পদচারণার শেষে আজ সান্যালবাও যেন সেই লুপ্তির কিনারায় এসে পৌঁছলো, এই যেন তাঁর বক্তব্য। অনসূয়া ভাবলেন—জমিদারি প্রথা নিয়ে পিতাপুত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হবে এই আশঙ্কা ছিলো তাঁর। কিন্তু যে ঘটনাগুলো ছেলেদের বেড়ে ওঠার মতো স্বাভাবিক তা যেন একটা পরাজয়ের মতো বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

না-না, তিনি ভাবলেন, তিনি তো সেই অন্ধকার মন্দির-বারান্দায় বসেই স্থির করে নিয়েছেন, সুমিতির এসবই আধুনিকতা, আধুনিক কালে স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কখনো ভাবা উচিত নয় সুমিতির এসব সান্যালবাড়ির ভিত নড়িয়ে দেয়ার মতো কোনো স্রোত। রূপু ফিরে এলে তার চালচলনেও কত য়ুরোপের ঢং থাকবে। নিঃশব্দ সান্যালমশাইকে দেখে নিয়ে তিনি আবার ভাবলেন ; তাছাড়া, দেখো, এই যে কী এক ঝাপটা লাগছে কালের, হয়তো এক প্রচণ্ড ঝড় আসছে, সুমিতিদের এসব হয়তো সেই ঝড়োবাতাসকে কাজে লাগিয়ে বাঁচার আদিম জ্ঞান। সমুদ্রে এরকম পাখি থাকে।

কবোষ্ণ জলে সান্ধ্যস্নান শেষ করে সান্যালমশাই স্টাডিতে গিয়ে বসেছিলেন। কিছুদিন থেকে তিনি কখনো কখনো অনুভব করছিলেন, পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাঁর কারো কারো সঙ্গে। পূর্বের পরিত্যক্ত সঙ্গী রায়দের কথা মনে পড়ছে মাঝে মাঝে। সুমিতি এসেছিলো এবং সে চলে যাবে, এ যেন তাঁর জীবনের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অকালে মঞ্চাবতরণ এবং অন্তর্ধান। নিঃসঙ্গ নয় শুধু, পরাজিতও মনে হচ্ছে নিজেকে। চিন্তার এই পটভূমিকায় নতুন করে বাড়িঘর তৈরি করা হাস্যকর কিছু বলে মনে হলো। দাঙ্গায় যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তা যেন নাটকীয়তার চূড়ান্ততা। লাল কাপড় পেঁচিয়ে পরে যেন-বা যাত্রাদলের রাজা সেজেছিলেন তিনি।

রায়েদের কথাই মনে জাগছে। তাদের সকলের প্রতীকরূপে প্রথম যৌবনে যাকে মধুরতা এবং রূপের কেলাসিত মূর্তি বলে মনে হয়েছিলো তার মুখখানা বারংবার মনে পড়ছে দীর্ঘ দু-তিন যুগের ব্যবধানে। বিরহ নয়, অনুতাপও নয়, একটি বেদনার মতো বিষণ্ণতা।

তাঁর মনে হলো কে যেন লিখেছে—দুদিনে আমাদের কণ্ঠরুদ্ধ হবে, রেহাই দাও। সেই ইংরেজ কবিকে খুঁজবার জন্য তিনি পুঁথিঘরে ঢুকলেন।

সান্যালমশাই কবি সম্বন্ধে মত বদলালেন। কে যেন কানাগলি সম্বন্ধে কিছু বলেছে, তাঁর মনে পড়লো। ভারি লাগসই কথা—বজ্রপাত নয়, হুড়মুড় করে পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়া নয়, ককিয়ে কাতরিয়ে বিদায় নেওয়া। যে কবি রেহাই চেয়েছিলো, এ যেন তার চাইতেও স্পষ্টভাষা।

শিশু যেমন মায়ের প্রতি অন্ধ আবেগে নির্ভরশীল—বই হাতে নিয়ে চলতে চলতে তাঁর মনে হলো—মাটি ও পদ্মার উপরে তিনি তেমনভাবে আর আকৃষ্ট নন, সেজন্যই কি তিনি এখানে নিজের জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। সম্বন্ধটা কৃত্রিম মনে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রর কথা মনে হলো। সে যেন মাটি থেকে জন্মেছে। সুমিতির কাকা চাষী দেখতে চেয়েছিলেন, তার থেকে রূপু নায়েবমশাইকে বলেছিলো, চোপদারকে দিয়ে রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠাতে। মনে হয়েছিল, সে-ই এই মাটির বলবত্তম সন্তান, মাটির মতোই ধ্রুব। খবর এসেছিলো, রামচন্দ্র তীর্থে গেছে। পরে তিনি লজ্জা বোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, রামচন্দ্রকে যেন দ্রষ্টব্য একটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর মতো ব্যারিস্টারি চোখের সম্মুখে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছিলো। কেন যে এখন এমন ভুল হচ্ছে তাঁর! এখন তাঁর মনে পড়লো, নায়েব বলেছিলো—রামচন্দ্র উইল করতে চায়, তাকে দিয়ে জমির শক্ত কাজ আর হবে না। ছিদামের আত্মহত্যার ব্যাপারে রামচন্দ্র জড়িয়ে পড়ার কথাও তিনি জেনেছেন। আকস্মিকভাবে তাঁর অনুভব হলো, একটি বেদনার আর্তিতে বিকল মানুষগুলো একত্র হয়েছে।

না, তিনি ভাবলেন, এ বিষণ্ণতার কারণ অন্য কোথাও। নৃপ গৃহী হবে এখানে—এ আশা তো অযুক্তির। রূপু দীর্ঘদিন কাছে থাকবে না, এ তো তাঁর নিজেরই ব্যবস্থা। কিংবা বলবে, এই এক সূর্যোদয়ের ক্ষণে এই এক মেঘে মেঘে কালো দিন আসছে, যখন চোখের সামনে মেলে না ধরলে নিজের হাতকে যেন দেখা যাবে না, তখন তাদের দূরে যাওয়ায় এমন নিঃস্ব বোধ হচ্ছে?

কয়েকটা আলমারি পাশাপাশি সাজানো. সান্যালমশাই তাঁর পিছন থেকে মানুষের সাড়া পেলেন। সদানন্দ, নৃপনারায়ণ, রূপু, সুমিতি এবং মনসা হাসাহাসি করছে, কথা বলছে।

সদানন্দ ওদের কাছে টাকা চাইছে, গুরুদক্ষিণার কথাও কী একটা বলছে। নৃপনারায়ণ তাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করছে। সকলেই প্রশ্নগুলির রসিকতায় হাসছে। পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার বিনিময়ে মুঘল বাদশাদের কিছু ছবি আঁকা হাতে লেখা পুঁথি কিনতে চায় সদানন্দ। অবশ্য এ কথাও সে বলছে, যদি অনসূয়া, সুকৃতি, মনসা ও সুমিতির পোরট্রেটগুলো তাকে দেওয়া হয় তার মত বদলাতে পারে। রূপু জিজ্ঞাসা করলো, 'একক এগজিবিশান'? মনসা বললো, 'শেষ সামন্ততান্ত্রিক জীবনের নজির'। সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সান্যালমশাই বই হাতে নিজের টেবিলে ফিরে এলেন। হঠাৎ তিনি যেন আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলেন। ইংরেজরা চলে যাচ্ছে তবু তাদেরই এক কবিকে তিনি তাঁর মনের সাময়িক আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করছেন। এটাই তুলনা হতে পারে। দুটি মানুষ একত্র হলে পরস্পরের মনে ছাপ রেখে যাবেই। একটি বিশিষ্ট জীবনপদ্ধতি যেন আর-একটির সঙ্গে মিলিত হয়। তারা লোপ পেয়ে গেলেও কখনো তাদের একটা কথা, তাদের কোনো মন্দিরের একটি কালজীর্ণ স্তম্ভ আমাদের কালে খুঁজে পেয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জীবনের উত্তাপ আমরা অনুভব করি। জীবনের এই পরিণাম, এই একমাত্র লাভ, যদি লাভের কথা তোলো। যে ভাষার মৃত্যু অনিবার্য তার বার্ধক্যের কোনো সাহিত্যিকের প্রচেষ্টা যেন এই জীবন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন? কবোষ্ণ রক্তধারায় যা প্রবাহিত হলো?

রাত হয়েছে তখন। অনসূয়া এসে বললেন, 'খেতে দিচ্ছি'।

সুমিতির কাকা, রূপু, নৃপ এবং সান্যালমশাই পাশাপাশি আহারে বসেছেন। রূপু এবং নৃপর নানা কথায় এটা বোঝা যাচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই প্রবল। সান্যালমশাই তাদের আলাপে যোগ দিচ্ছেন এবং তাঁর আলাপের সুরে মনে হলো সন্ধ্যার কথাগুলি যেন অবান্তর এবং প্রক্ষিপ্ত কিছু। কিন্তু হাসিমুখে পরিবেশনের খুঁটিনাটি নির্দেশ দিয়ে সুমিতিকে সাহায্য

করতে করতে অনসূয়া যেসব আলোচনার অবতারণা করলেন তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাগুলির পার্থক্য থেকে গেলো। হাল্কা নীলে সাদা ডুরে খদ্দর পরেছে সুমিতি। অনসূয়াকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে তাঁর শাশুড়ি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খেতে দেওয়ার সময়ে শুধু পরিচ্ছন্ন নয়, সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষাও কেন করা দরকার। অনসূয়া তখন বালিকা ছিলেন। সুমিতি যেন বলামাত্র বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনসূয়াও শাড়ি পালটেছেন। সুমিতির কাকা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের। এ-রকম আত্মীয়ের সম্মুখে সাদা শাড়ি পরাই অনসূয়ার প্রথা। আজ কিন্তু তাঁর পরনের শাড়িতে ধূপছায়ার ছোঁয়াচ লাগলো। তাঁর অন্তরের সঙ্গে বক্তব্যের মতোই পরিস্থিতির সঙ্গে পরিধেয়ের সচেতন পার্থক্য থেকে গেলো।

অনসূয়া কুটুম্বকে সমাদৃত করার ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করলেন, সান্যালমশাইয়ের মনের অবস্থাটা তাঁব অনির্দিষ্ট আলাপচারিতায় অত্যন্ত নির্দিষ্ট হয়ে ফুটেছে। রূপু চলে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের জন্য। সে যখন ফিরে আসবে তখন এই গ্রাম্য আবহাওয়ার কাছে তার কিছু পাওয়ার থাকবে না। নৃপ স্বভাবতই গ্রামের প্রতি বিমুখ। এসব কারণ থেকেই সান্যালমশাই নিজের পারিবারিক অবস্থাটাকে রায়বংশেব সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সত্যি কি সব হারাচ্ছে?

কিন্তু অনসূয়া বললেন, 'আপনি কিছু খাচ্ছেন না, বেয়াইমশাই ; আমাব মনে হচ্ছে টেবিলে না বসে নিজেকে কষ্ট দিলেন'।

'না না। আজকালকার দিনে এমন সাহেব আর কেউ নেই। সাহেবরাই এ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সুমিতি তোমার সেই কলেজের চাকরির কথা শ্বশুর-শাশুড়িকে বলেছো তো'?

এক মুহূর্ত বিচলিত হলো সুমিতি, মৃদু হেসে বললো, 'চাকবিটা হওয়ার মতো হলে তখন—'

ব্যারিস্টার চোখ তুলে অনসূয়ার মুখের দিকে চাইলেন। অনসূয়ার আশঙ্কা হলো, তাঁর চোখের পাতা কি ঘনঘন পড়ছে? সামলালেন তাকে। বললেন, 'আমার বেটা-বউ ঠিক বলেছে। কী যেন বলেন আপনারা, এখনই অনুমতি চাওয়াটা হাইপথেটিক্যাল হ'তো'।

আহারাদির পর সান্যালমশাই যখন অতিথির সঙ্গে আলাপ করার জন্য স্টাডির দিকে যাচ্ছিলেন, অনসূয়া তাঁর হাতে পান দিতে দিতে বললেন, 'যদি সময় করতে পারো ঘুমোনোর আগে আমার কাছে একটু এসো'।

সান্যালমশাই অনসূয়ার ঘরে এসে দেখলেন তাঁর প্রিয় গড়গড়াটা শয্যার পাশে রয়েছে। ক্ষীণ সুগন্ধির ধোঁয়া উঠছে। অনসূয়া যেন-বা ইতিমধ্যে শাড়ি পালটেছেন। সুমিতি যেমন পবেছিলো কতকটা যেন তেমন শাড়ি বলেই ধোঁকা লাগে। কিন্তু চেয়ে দেখলে বোঝা যায় হালকা নীলের জমিতে হালকা মটিফ তোলা ঢাকাই শাড়ি সেটা। অনসূয়ার কণ্ঠলগ্ন ন-কোনি তারার মধ্যে কাকের ডিমের চাইতে কিছু বড়ো একটা পান্না জ্বলছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে পান্নাটা তুলে ধরে সান্যালমশাই বললেন, 'কোথায় যেন, কার গলায় যেন এমনটা দেখেছিলাম'?

অনসূয়া হাসলেন, তাঁর কানের পাশ দুটি লাল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, 'বোধ হয় সে আমি'।

সান্যালমশাইয়ের হৃদয়ে মধুবর্ষণ করলো অনসূয়ার কথার মধ্যে লুকোনো 'বোধ হয়' শব্দটির মৃদু ইঙ্গিত।

সান্যালমশাই বসলে অনসূয়া বললেন, 'আমাকে যদি কোনো বরের প্রতিশ্রুতি দিতে, আমি বলতাম সে-বর এখুনি চাই'।

'তোমার গলার এই মালাটির জন্যই আমি বর দেবো। কী চাই বলো'?

'কোথাও বেড়াতে চলো'।

'সঙ্গে কে কে যাবে'?

'মনসার শাশুড়ি যদি রাজী হন তবে মনসা যাবে'।

সান্যালমশাই চুপ করে রইলেন।

অনসূয়ার মনে পড়লো হঠাৎ, সুকৃতির সেই ব্যাপারে সান্যালমশাই-এর বিভলবারসমেত হাত দুটোকে চেপে ধরতে হয়েছিল।

কিন্তু সান্যালমশাই হেসে বললেন, 'কী ভাবছো? ছেলেরা এতদিনে রুচিতেও মধ্যবিত্ত হলো'?

অনসূয়া বললেন, 'আগেকার দিনে রাজারাজড়ারা এত হিসেব করতেন না তোমার মতো'।

সান্যালমশাই হেসে গড়গড়ার নলটা সাগ্রহে তুলে নিতে নিতে বললেন, 'তথাস্তু'।

কিছুক্ষণ আলাপ করে সান্যালমশাই যখন নিজের ঘরে ফিরলেন তার কিছুপরেই মনসা এসে ডাকলো, 'জ্যাঠামশাই'।

দরজা খোলা ছিলো। সান্যালমশাই বই পড়ছিলেন।

মনসা বললো, 'জ্যাঠামশাই, বউদির সঙ্গে ধাত্রী যাচ্ছে, তারণের মা যাচ্ছে। তুমি নাকি রামপিরিতকেও যেতে বলেছো'?

'যাবে না। ওর বয়স হয়েছে এখন। দেশ-টেশ দেখুক না। ট্রামে-বাসে চড়ার অভ্যাস করুক। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছিস যে'?

মনসা বললো, 'ওর ভাব দেখে মনে হয়, ও সংকোচ বোধ করছে'।

'বোধহয় ব্যারিস্টারসাহেবের আর্দালির লাল আর সোনালি পোশাক দেখে। ওকে বলে দিয়ো এখানে যেন রঙিন ধুতির কোমরে উড়নি জড়িয়ে হাতে পাকা লাঠি নিয়ে বরকন্দাজী করে সেটাই যেন ও সর্বত্র বহাল রাখে। ওকে বলতে হয় না, বিদেশে গেলে মেরজাই পরে ঠিকই'।

কথাটা আসলে বলেছিলো সুমিতি, সংকোচটা তারই।

মনসা উঠে দাঁড়ালো।

সান্যালমশাই বললেন, 'মণি, টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কী করি বল তো? ধাত্রীদের বেতন, বউমার হাতখরচ, এসব কী করে দেবো, কাকে দেবো? আর তাছাড়া বউমা যদি দীর্ঘদিন থাকেন কলকাতায়, একটা গাড়ি কিনে দেওয়া উচিত নয়? তাছাড়া খোকার ফ্ল্যাটটাই কি যথেষ্ট হবে'?

মনসা হাসিমুখে বললো, 'আচ্ছা, কয়েক রকম প্রস্তাব করে তার একটিতে বউদিকে রাজী করাবো। কিন্তু জ্যাঠামশাই, ইংরেজদের কাছ থেকে রাজনীতির চালগুলো তুমি খুব ভালোই শিখেছো' বউদিরা আপাতত এই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে থাকুক'।

এই বলেও মনসা হাসলো ঝিকমিক করে।

মনসা চলে গেলে সান্যালমশাই কিছুকাল রাজনীতির কথা ভাবলেন। তারপর তাঁর মনে হলো ওরা চলে যাচ্ছে। নৃপ যদি কিছু না করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়ায় তা হলেও অন্যায় হয় না। যে আদর্শটাকে সামনে রেখে প্রথম যৌবনের আনন্দঘন দিনগুলিকে তপস্যার মতো ক্লেশে সে কাটিয়ে দিচ্ছিলো সেটা যদি অর্থহীন বোধ হয় তবে অস্থিরতা আসে বৈকি মনে। সদানন্দ পাসপোর্ট ইত্যাদির জোগাড় করতে পারলে রূপুর কাছে গিয়েই থাকবে। আর তা যদি না হয়, তবে সে নৃপকেই সাহার্য দিক। সাহচর্যের প্রয়োজন নৃপরই যেন বেশি।

অনসূয়া ঘুমোতে পারলেন না সহজে। তিনিও দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। একটা অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠেছে। বারান্দায় তারই আলো। রান্নামহলে দু-একজন লোক এখনো কাজ করছে। বাগানের কোনো গাছ থেকে একটা বক ডাকছে। অন্দরমহলের কার একটি শিশু ঘুমের ঘোরে একবার কেঁদে উঠলো। পাওয়ার-হাউসের শব্দটাও আসছে।

'কে, মনসা? ঘুমোতে যাসনি'?

'রান্নার মহলে এখনো কাজ শেষ হয়নি ওদের। রুপোর বাসনগুলো দিয়ে গেলেই ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে আমি ঘুমোতে যাবো'।

'হ্যাঁ রে মণি, আমি কি ওদের কাল খুব সকালেই কাজে আসতে বলে দিয়েছিলাম? মনে পড়ছে

না'।

'সকালেই আসবে। আমি মনে করিয়ে দিয়েছি সকলকেই'।

অনসূয়া নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরলেন।

শিবমূর্তিটির সম্মুখে যে প্রদীপটি ছিলো সেটার বুক পুড়তে শুরু করেছে। প্রদীপটা নিবিয়ে দিলেন অনসূয়া। ঘরের অতি মৃদু আলোটা গিয়ে পড়লো মূর্তিটির গায়ে। মনে হলো সেটার জটায় শ্যাওলা পড়েছে। শ্যাওলা ঠিক নয়, তামার বাসনে যে কলঙ্ক পড়ে তেমনি কিছু যেন।

কথাটা অনসূয়ার মনে পড়লো। যারা কাল চলে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে গৃহিণীর অনেক কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। একটি সাদৃশ্য কথাটাকে শুধু সোজা পথে মনে এনে দিলো। এবং এ কথাও বোধহয় সত্যি, মনসার বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সেদিনের মনোভাবেরও সাদৃশ্য নয় শুধু, ঐক্যও আছে। সে-রাত্রিতেও অনসূয়া রান্নামহলের তত্ত্বাবধান করে ফিরে আসতে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন মনসা আলসেতে আজকের মতোই হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রূপুর রেডিওর কোনো সুর যেন মনসাকে সংসারের কলরোল থেকে আড়াল করে রেখেছিলো।

'কী হয়েছে মণি'?

অনসূয়া লক্ষ্য করলেন মনসার গালের উপরে অশ্রুর রেখা।

মনসার উত্তর না পেয়ে অনসূয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

অনসূয়ার মনে হয়েছিলো, সেই দাঙ্গার পর থেকেই মেয়েটাকে এমন ভাবতে দেখা যায়। আবাল্য অভ্যস্ত নিরাপত্তার বোধ চলে গেলে তা হয় আর এখন তো পুরুষদের পৃথিবীটাই টলমল করছে। এ অবস্থায় মেয়েদের হাসি আর ঝর্ণার মতো চমকায় না, নদী-প্রমত্ততা অন্তর্লীন হয়, হ্রদের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য হয়ে উঠতে পারে একটা মেয়ে। কিন্তু তার আগে রাতের অন্ধকারকে সঙ্গী করে এমন কাঁদতে হয়।

অনসূয়া আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, দেখলেন মনসা তখনও আলসেতে হাত দুখানা রেখে তেমন দাঁড়িয়ে। মনসার পাশে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো সে কি পুরুষদের কথা ভাবছে? সে তো ভাবনার কথাই। বললেন, 'দাদার কথা ভাবছিস? তুই কি নৃপর খদ্দর থেকে সিল্কে যাওয়াটাকে খুব মনে করেছিস? সদানন্দ ওসব নিশ্চয় খাদি থেকেই জোগাড় করেছে'।

মনসার গাল বেয়ে চোখের জল নামলো। এই অন্ধকারেও সেই জল দূরের কোন দেয়ালগিরির আলোকে ধরলো।

অনসূয়া বললেন, 'মণি, তোর দাদা তো সেই কবে থেকেই—আর তার জন্য সদানন্দই দায়ী সেই যে সামন্তদের পরে বেনেরা এমন সব কী কী,' আবার একটু ভাবলেন তিনি, আবার বললেন, 'কে পড়তিস রে, তুই না নৃপ?—এক বুড়ো বিঁধে দিয়ে ঢিল বেছে ফেলছে, কুশঘাসের স্তূপ থেকে হালকা সাদা ধোঁয়া, সেই যে আ মেইড্ অ্যান্ড হার্ ওয়াইট্ কাম্ হুইস্‌পারিং বাই, সংগ্রামের ইতিহাস মুছে গেলেও, তাদের গল্প ফুরাবে না'।

মনসা বললো, 'কিন্তু ওরা যদি আর ভালোবাসতে না পারে? যদি ছাড়াছাড়ি হওয়ার লজ্জাই তবু ওদের একত্র রাখে'?

অনসূয়া খুঁজে পেলেন না কী করবেন। তাঁর চারপাশ দিয়ে মুহূর্তগুলো এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছে! তিনি নিচের সেই ম্লান আলোর চকটাকে দেখতে দেখতে ভাবলেন, ভালোই যে পুরুষরা এখন ঘুমিয়েছে। বললেন, 'মণি, তাহলে তুই রূপো ভাঁড়ারে তুলেই শুতে যাবি তো? তাই যাস'।

ঘরে ফিরে এলেন অনসূয়া। মৃদু আলো জ্বালা সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলতে গেলেন, আমিও মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছিলাম এই পরিবারে। শিখতে হয়, এখানে এই দেয়ালগুলোর মধ্যে, অনেক ব্যাপারে, 'প্রথা নয়' এই দুটো শব্দই শেষ কথা।

কিন্তু কোথাও যেন কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদলো তার মনের মধ্যে। সুকৃতির জন্য যে আবেগ তাঁর অন্তরে

সঞ্চিত তার সহোদরাকেই যেন তিনি সুমিতির জন্যও অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ তিনি চিন্তা করলেন সবকিছুতে আস্থা হারিয়ে ফেলে নতুন কিছুতে পৌঁছে যাওয়ার দুঃসাহসের এই পরিণাম, সুমিতি? আহা, তোমরা, বোধ হয়, সব কিছুই নিখাদ করতে চেয়েছিলে। যেন আমাদের এই পৃথিবীতে তা সম্ভব! দেখো সুমিতি, পুরুষদের পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে। তুমি না বললেও তারা জানবে তাদের প্রত্যাশা ভেঙে পড়ছে। এখন কি কূলনাশিনী টান দিতে হয়? স্তব্ধ তড়াগের মতো থাকতে হয় না। নতুবা সুপেয়তার আশ্বাস কোথায় পায় তারা?

অনসূয়া বোধহয় নিজেকে মনকে অবগাহনযোগ্য করতে গেলেন। যেন সম্মুখবেগে সংহত করার চেষ্টাতে সেখানে আবর্ত আলোড়ন ঘটে গেলো। আবেগগুলো গলার কাছে চাপ দিচ্ছে। তিনি নিজের চারিদিকে চাইলেন। তাঁর সুবিধা হলো। ঘরটা প্রায়ান্ধকার আর স্নিগ্ধ, তৈজস আসবাব পৃথক হয়ে চোখে পড়ছে না। বরং কাদের যেন স্নেহশীলা আশ্রয়গুহা। তিনি নিজেকে সেই ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা

৩৮

রামচন্দ্রর দিন ভালোই কাটছিলো। তার নবদ্বীপের জীবন চিকন্দির জীবনের তুলনায় সার্থকতর মনে হচ্ছে। মনের সর্বত্র একটা শুচিতার আকাশ বিরাজ করছে। গঙ্গায় স্নান করে চরের শাদা বালির উপর দিয়ে ফিরতে তার একদিন মনে হলো, সূর্যের যে আলোটা তার গায়ে এসে পড়েছে তারও যেন মানুষকে পবিত্র করার শক্তি আছে।

সওয়া-পাঁচ আনা দাম চেয়েছিলো দোকানদার, অনেক কষাকষি করে সাড়ে চার আনায় সে একখানা ছবি কিনেছে। তাতে দেখা যায় মানুষের পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে বৃন্তনাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত কতগুলো পদ্ম আছে। একদিন সে একটি মন্দির থেকে বেরুচ্ছিলো। তখন বেলা আটটা-নটা হবে। রোদটা গায়ে পড়ে কষ্ট দিচ্ছে না কিন্তু সেটা যে দৃঢ় কিছু, তা অনুভব হচ্ছে। সে যে ছবিটা কিনেছে তার মতো কিন্তু আকারে বড়ো একটা ছবি মন্দিরের একটা থামে ঝুলোনো ছিলো সেই ছবির দিব্যকান্তি পুরুষটির দেহের অভ্যন্তর থেকে তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম বিকশিত হয়ে রয়েছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে রামচন্দ্রের মনে হলো, তার বুকের মধ্যেও একটি পদ্ম ফুটিফুটি করছে। সম্ভবত ছবিতে দেখা পদ্মর মতো গোলাপি নয় সেটা, তার হয়তো স্বর্ণাভা নেই, বরং বোধ হয় তার ত্বকের সঙ্গে সামঞ্জস্যে কালচে-লাল রঙেরই হবে সেটা। রামচন্দ্রর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। পদ্মগুলিকে সত্যিই অনুভব করা যায় কিনা, এবং সেগুলিকে আরও জায়গা করে দেওয়া উচিত—এই দুটি অর্ধস্ফুট চিন্তা থেকে রামচন্দ্র গভীর নিশ্বাস টেনে খানিকটা সময় দমটা ধরে রাখলো। তার ত্বক ভেদ করে হু-হু করে ঘাম বেরিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পরে সে চারিদিকের লোকজনদের লক্ষ্য করলো। পিছনে তার স্ত্রী সনকা এবং কেষ্টদাস আসছিলো। চারিপাশের অন্য অনেক লোককে যেমন, কেষ্টদাস ও সনকাকেও তেমনি অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হলো তার। ওদের বুকের পদ্ম স্বভাবতই তার নিজের পদ্মটির তুলনায় স্বল্পপরিসর হবে। কেষ্টদাসের বুকের পদ্মটি দুর্গাপূজার জন্য বহু দূর থেকে তুলে আনা পদ্মকলির মতো হয়তো-বা শুকিয়ে গেছে।

বাসায় ফেরার পর বহুক্ষণ ধরে একটা অব্যক্ত আনন্দ তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলো। নিচু গলায়, তার দরাজ গলা যতদূর নিচু করা সম্ভব, কয়েক মিনিট সে নামকীর্তন করলো। কিন্তু তাতেও যেন তার অনুভবটার প্রকাশ হলো না। সনকাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সনকাকে যেন বিষাদ-মলিন দেখাচ্ছে, আর সেই বিষাদ গাঢ়তর তার ঠোঁটের কোণ দুটিতে। বিস্মৃতপ্রায়

অতীতের বিহ্বল দিনগুলিতে সনকার অভিমান বেদনা দূর করার জন্য যা করতো তেমনি করে সনকাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে যেন নিজের স্বাস্থ্যের সৌরভে তাকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার জন্যই তার ওষ্ঠাধরে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করালো।

অন্য আর-একটি বিষয় হচ্ছে শোক। এখানেও শোকের রাজ্যপাট। তবু মন্দিরে ঘুরে দেবমূর্তিগুলিকে অনুভব করে রামচন্দ্রর মনে হলো কিছুই হারায় না।

সে ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছে বাকি জীবনটা এমনি করেই কাটিয়ে দেবে। একটিমাত্র প্রতিবন্ধক আছে সে-পথে, সেটা হচ্ছে উপজীবিকা সম্বন্ধীয়। কেষ্টদাস কিছু না করেও এ-আখড়া ও-আখড়ায় ঘোরাফেরা করে আহার্য-পরিধেয়, এমন কী একটি বাসস্থান সংগ্রহ করে ফেলেছে। যে কয়েকটি টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো রামচন্দ্র, সনকার অত্যন্ত হিসেবি হাতে খরচ হয়েও যখন সেটা শেষের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো তখন দুর্ভাবনা হওয়ারই কথা। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেলো। শুনে কেষ্টদাস বললো, 'এখানে আসেও জড়ায়ে পড়লেন'? আর রামচন্দ্র তার স্ত্রীকে বললো, 'ভাগ্যমানের বোঝা ভগোমান বয়'।

গঙ্গার ওপারে শ্রীমায়াপুর ধামে গিয়েছিলো রামচন্দ্র। ফিরতিপথে পথচারীদের গল্পে সে যোগ দিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন দুঃখ করে বলছিলো—তার সব জমি বে দখল হয়ে গেলো। আলাপ-পরিচয়ে কথা অনেকদূর গড়ালো। যখন তারা খেয়ার নৌকোয় উঠে বসেছে কেষ্টদাস শুনতে পেলো রামচন্দ্র বলছে: 'বেশ তো, চার-পাঁচ বিঘা আমাকে দেন। বর্ষার আগেই জঙ্গল কাটে বসে যাবো। বর্ষাতে চষবো জমি। চাষের খরচ আধাআধি, ফসল আধাআধি। তাহলে জমিও আপনার দখলে থাকলো'।

চিন্তা করেও সুখ। তার জমির পাশেই থাকবে গঙ্গা, আর গঙ্গা পার হলে নবদ্বীপধাম। আর কী চাই পৃথিবীতে? বাড়িতে মুঙ্লা অর্থাৎ হকদারের হাতে জমিজিরাত—ইহলাকে সুবন্দোবস্ত। আর পরলোকের সুব্যবস্থা করার জন্য পাওয়া গেলো চার-পাঁচ বিঘা জমি।

সনকা বললো, 'সগ্গে যায়েও ধান ভানবা'?

'সে-কাম তো তোমার, সুনু। আমি খানটুক্ জমি পাই, নিবো। সম্নবন্ন অস্মিতের দানা ফলবি সে জমিতে। সেখানে আমি দিবো চাষ, আর তুমি ভান্‌বা ধান'।

রামচন্দ্র সনকার হাত থেকে কল্‌কেটা নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলো।

একদিন কেষ্টদাস বললো, 'শুনছেন মণ্ডল, দেশ বলে ভাগ হতিছে'?

'সে আবার কী'?

'হয়। এক ভাগ হিঁদুর, আর এক ভাগ মোসলমানের'।

'ভাগ কে করে? ইংরেজ? তার নিজের জন্যি কী রাখবি'? রামচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠলো।

'কী আবার রাখবি! মনে কয়, খাসের জমি পত্তনি দিতেছে। মনে কয়, বিলেতে বসে খাজনা পাবি'।

'ধুর, এ হবের পারে না'।

খেয়া নৌকোয় নানা ধরনের যাত্রীর মুখে মুখে অসংলগ্ন ও অসংপৃক্ত চিন্তাধারা কিছুক্ষণের জন্য একত্র হয়। একদিন সেখানেও রামচন্দ্র দেশভাগের কথাটা শুনতে পেলো। কয়েকজন বয়স্ক লোক এই ব্যাপারটার ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করলো। একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক বললো—এর আগে মুসলমানের রাজত্ব ছিলো এ দেশে। তখন কি হিন্দু ছিলো না দেশে? মুসলমান নবাব আর হিন্দু প্রজা মনকষাকষি করেছে, মারপিট করেছে, কিন্তু আবার মিলেমিশেও থাকতো।

অন্য একজন বললো, 'ওদেরই ক্যাডর, ওদেরই পুলিস এমন যদি হয়? অন্যায়ের নালিশ হবে কোথায়'?

রামচন্দ্রর কৌতূহল হলো কিন্তু ভদ্রলোকদের আলাপে যোগ দিতে সাহস হলো না। তার ধারণা হলো এসব আলাপ-আলোচনা তার জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়।

এদিকে রামচন্দ্রর জমি চাষের ব্যাপারটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। রামচন্দ্র নদী পার হয়ে লোকটির বাড়িতে গিয়েছিলো। যে জমি সে দেখালো তার অধিকাংশ ময়নাকাঁটা, পিটুলি প্রভৃতি অকেজো গাছের জঙ্গলে ঢাকা। সে-জঙ্গল দূর করে জমি দখল কিংবা বেদখল করা, দুটিই সমান কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যার পায়ের তলায় মাটি নেই সে ছাড়া এমন মাটিতে কেউ লোভ করে না।

কিন্তু বেদখল হওয়ার ব্যাপার একেবারে মিথ্যা নয়। সেই জঙ্গলের আশেপাশে খেলার ঘরের মতো ছোটো ছোটো ঘর তুলে কয়েক ঘর লোক বাস করতে শুরু করেছে। এদের মুখ চোখ দেখলে মনে হয়, দৃশ্যমানচরাচর এদের চোখের সম্মুখে পাক খাচ্ছে, মস্তিষ্ক কোনো বিষয়ের প্রকৃত ছাপটা নিতে পারছে না।

রামচন্দ্র ভাবলো, এরা কি তেমন সব গ্রামবাসী যারা কলে কাজ পাওয়ার আশায় গ্রাম ছাড়ে?

রামচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কনে থিকে আলে'?

'আইলাম'।

'তা তো আসছোই। কিন্তু এখানে থাকবা কনে, খাবা কী'?

'করণ কী? দ্যাশ যে আমাগোর না। বাগ অইছে'।

'এখানে জমি চষবা'? রামচন্দ্র হাসলো মনে মনে। দেখো কাণ্ড! পৃথিমি কি সানিকদিয়ার জোলা, বাঁধ দিয়ে জমিভাগ করবা'?

'কই পামু'?

'জঙ্গল কাটবা? আচ্ছা, যদি জমিত লাঙল দেই, তোমাক ডাকবো'।

বাসায় ফিরে রামচন্দ্রর দুর্ভাবনার অন্ত রইলো না। সাবধানী মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা সাধারণের চাইতে বেশি আসে। তার মনে এমন কথাও উঠলো—অ্যাঁ, তাই নাকি? মুঙ্‌লারাও এমন কোনো জঙ্গলের ধারে এমন বোকা বোকা মুখ করে বসে আছে নাকি? শিবো, শিবো!

কেষ্টদাসকে রামচন্দ্র তার দুঃস্বপ্নের কথা বললো। এখন কেষ্টদাস যে-কোনো পরিস্থিতির লাগসই গল্প পুরাণাদি থেকে উদ্ধার করে কিংবা নিজেও কখনো কখনো তৈরি করে বলতে পারে। ঘটনাটা এবং রামচন্দ্রর আশঙ্কার কথা শুনে সে বললো, 'লোভে আপনেক বিভীষণ দেখাইছে'।

হতে পারে, অসম্ভব কী! লোভের মতো এত কঠিন নেশা আর কীসের হয়। রাগ বলো, হিংসা বলো, তার তবু কিছু নিবৃত্তি আছে। লোভের শেষ নেই, সারা দিনরাতে এক মুহূর্ত সে-নেশা কাটে না। ঘুমে রাগ দূর হয়, লোভ তখনো বিকৃত মুখে ভয় দেখাতে থাকে।

একদিন তার পাড়ায় ঢুকতে ঢুকতে রামচন্দ্র শুনতে পেলো একজন খাকি-পোশাক-পরা লোক তার খোঁজ করছে। পুলিস নাকি? রামচন্দ্র কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরখানিতে গিয়ে ঢুকলো। সনকাকে বললো, 'কও তো, এ বিপদ আবার কন থিকে আসে'?

লোকটি পুলিস নয়। ডাকঘর থেকে এসে চিঠি বিলি করে বেড়ায়। সে যখন রামচন্দ্রর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো 'চিঠি আছে, চার আনা পয়সা লাগবে' তখন রামচন্দ্র সদ্য-বিপদমুক্তির স্বস্তিতে বললো, 'চার আনা এই চিঠির দাম, আর এই চার আনা নেন পান খাবেন'।

লোকটি চিঠি রেখে চলে গেলে রামচন্দ্র কিছুক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে বসে রইলো। একখানা বড়ো কাগজ চৌকোণা করে ভাঁজ করা, তার উপরে বড়ো বড়ো বাঁকাচোরা অক্ষরে ভুসো কালিতে বোধহয় ঠিকানা লেখা। রামচন্দ্র উল্টে-পাল্টে দেখলো টিকিট নেই কিন্তু ডাকঘরের অনেক ছাপ পড়েছে।

সনকা বললো, 'কে লিখছে চিঠি'?

'কে লিখবি কও? যদি লেখে তো সেই মুঙ্‌লারাই লিখছে'।

এখানে একটু থিতু হয়ে বসেই সে মুঙ্‌লাকে চিঠি লিখিয়েছিলো, 'সগ্‌গে আছি। আমার জন্যি ভাববা না'।

দুপুরে আহারাদির পর সনকাকে সঙ্গে করে দরজায় তালা এঁটে রামচন্দ্র বার হলো কেষ্টদাসের সন্ধানে। কেষ্টদাসকে পাওয়া গেলো তাদের আখড়ার গাছতলায়। কেষ্টদাস বললো, 'বসেন'।

রামচন্দ্রর স্ত্রী গাছটার পিছন দিকে আড়ালে বসলো। রামচন্দ্র কেষ্টদাসের সম্মুখে বসে বললো, 'একখান চিঠি আসছে, পড়া লাগে'।

ভানুমতি চিঠি লিখেছে। বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণ ভুল তো বটেই, হস্তাক্ষরও অনেক জায়গায় দুষ্পাঠ্য। কেষ্টদাস পড়লো :

> বাবা মা আমার পোনাম লইবেন। আমি আপনাদের বউ ভানুমতি লিখতেছি। পরে সমাচার এই চাষবাসের অবস্থা ভালো না। সানিকদিয়ারে এক নুতোন রাজা হইছে তার ভয়ে সেথাকার হিন্দুরা পালাইতেছে। চিকোনদিহিতে নাকি আর এক রাজা, তাব ভয়ে মোছলমানরা পলাবি। আর লিখি আপনাদের ছেলে চাষবাসে মন দেয় না। নায়েবের সাথে ঝগড়া করিয়াছে। সনধায় খোলকরতাল লইয়া গান করে। গোঁসাইয়ের বাড়িতে কোথা হইতে তার তিন-চারজন আপ্তজন আসিয়াছে তারা পদ্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনারা কবে আসিবেন। আসা লাগে। ইতি।

চিঠিটায় আরও কিছু লেখা ছিলো। প্রথমে লিখলেও ভানুমতি পবে সেগুলি কেটে দিয়েছে। কেষ্টদাস অল্প চেষ্টাতেই সেই অস্পষ্ট এবং গোপন করা বক্তব্যটা ধরতে পারলো। সে লিখেছিলো, পদ্ম সাপেব পাকের মতো জড়িয়ে ফেলেছে সংসারটাকে। সারা দিনরাতে মুঙ্‌লা পদ্মর সঙ্গে পাঁচ বার দেখা করতে যায়, ভানুমতির সঙ্গে দুটো কথা বলে কিনা সন্দেহ।

চিঠি পড়া শেষ করে সেটাকে রামচন্দ্রর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে কেষ্টদাস মাটির দিকে চেয়ে রইলো। তার গুরুর আদেশ, খুব রাগেব সময়ে মাটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। এটা রাগের ব্যাপার নয়। মনের চারিদিকে ধুলোমাটির হোক, গঙ্গামাটির হোক, একটা স্তর পড়েছে, কিন্তু তার উপরেও পদ্মর সম্বন্ধে ভানুমতির বক্তব্যগুলি আর রাখা যাচ্ছে না। মনের আবরণ পুড়তে পুড়তে কাঁচা মাংসে যেন তাপ লাগছে। মাটির দিকে চেয়ে থেকে তার মনে হলো এ অবস্থায় কী করা যায় গুরু বলে দেয়নি। সেজন্যই বোধহয় গুরুকে স্মরণ করেও কেষ্টদাস কিছুতেই আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। মনের উপর থেকে অঙ্গারটিকে বাইরে নিক্ষেপ না করলেই যেন নয়।

কেষ্টদাস বললো, 'মণ্ডল, বাড়িতে যান। আমি পারি বৈকালে যাবো। এখন শরীলটা কাহিল লাগতেছে, একটুক্ শোবো'।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রামচন্দ্ররা নিজের বাসায় ফিরে এলো। ভানুমতির চিঠিতে লুকিয়ে রাখা হাহাকারে শুধু কেষ্টদাসের রোগজীর্ণ বুকের দেয়াল যেন ভেঙে পড়ার মতো হলো।

রামচন্দ্র তার স্ত্রীকে পথেই একবার প্রশ্ন করলো, 'কও, সনকা, কও ; তুমি কও আমার কী করা এখন'?

'কী আর করবা। ভানুমতিক চিঠি লেখো ভয় না করে। তার বাপেক লেখো দেখাশুনা করবের'।

তখনকার মতো নির্লিপ্তের ভঙ্গিতে তামাক সাজতে বসলো রামচন্দ্র। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সে প্রশ্নটায় ফিরে এলো। 'এখন কী করা'?

সনকা আমল দিলো না। সে বললো, 'একটুক্ বাজারে যাবা? দু-চার পয়সার আনাজ আনা নাগতো'।

কিন্তু রামচন্দ্র বাজারে গেলো না। সে পায়চারি করতে লাগলো ; কেষ্টদাস আসবে বলেছিলো, তার প্রতীক্ষাতেও দু-একবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। কেষ্টদাস এলো না।

রাত্রিতে রামচন্দ্র বললো, 'সনকা, গাঁয়ে যাওয়া লাগে'।

'কও কী? আবার সেখানে কেন্? জমিজিরাত সব অন্যেক দিয়ে দিছো'।

'সে সব নষ্ট হয় যে'।

'তোমার কী লোকসান'?

রামচন্দ্র যুক্তিটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। সেই অবসরে সনকাও চিন্তা করলো।

রামচন্দ্রকে তার জমিজিরাত এবং মণ্ডলী থেকে পৃথক করে নিলেও যে তার এতকিছু অবশিষ্ট থাকে এ সে কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি। সেজন্য যৌবনেও ধানে এবং ধুলোতে জড়ানো যে রামচন্দ্রকে সে পেয়েছিলো তার চাইতে ঐকান্তিক কিছু পাওয়ার তৃষ্ণা তার ছিলো না, কিন্তু এই প্রৌঢ়ত্বে এসে সে দুদিনে যা পেয়েছে তার লোভ জমিজমা সংসারের চাইতে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু মুঙলার মুখটাও মনে পড়ে গেলো সনকার। ভানুমতি রান্নাবান্না করতে পারে বটে কিন্তু তাহলেও হয়তো মুঙলা সময়মতো আহার্য পায় না। আর, নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া লেগেছে। নায়েববা অত্যন্ত নির্দয় হয়। যদি সে মুঙলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে!

নিজের হক্ রাখবে ষোল আনা, নায়েব জমিদারও খাতির করে, সেই মণ্ডলী-বুদ্ধি ছেলেমানুষ মুঙ্লা কোথায় পাবে?

সনকা অস্বস্তিতে বিছানায় উঠে বসলো।

রামচন্দ্র বললো, 'উঠলা যে'?

'এখন কী করা, তাই কও'। রামচন্দ্রর প্রশ্নটা সনকার মুখে।

'কী করবা? যা দিয়ে দিছি তাতে আর লোভ কেন্'? রামচন্দ্র সনকার যুক্তিটায় ফিরে এলো।

'লোভ না হয় না করলা। কিন্তু মুঙ্লা গান বাঁধে নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে, এ কী কথা, কও'?

রামচন্দ্রও বললো, 'লোভ না হয় না করলাম। কিন্তুক এ জীবনে যা করলাম তা যদি ছিটায়ে-ছড়ায়ে যায়, কষ্ট হওয়া লাগে কি না-লাগে'?

'তা তোমার হউক না হউক। আমার ছাওয়াল-মিয়ে সেখানে, আর তুমি এখানে পলায়ে থাকবা'!

পরদিন সকালে রামচন্দ্র ঘরের মেঝে খুঁড়ে সরা-ঢাকা একটা মাটির হাঁড়ি বার করলো। তা থেকে বার্লির ছবি আঁকা টিনের কৌটো বেরুলো। আপদ-বিপদে সম্বল দেড় কুড়ি টাকা। সনকা রান্নার ফাঁকে ফাঁকে উঠে এলো হিসাবের ব্যাপারে সাহায্য করতে। সে একবার বলে গেলো, বাড়িভাড়া তিন টাকা দিতে হবে; আর একবার এসে বললো, মুঙ্লার জন্য একটা ছিটের জামা আর ভানুমতির জন্য শাঁখার চুড়ি কিনতে হবে।

আহার শেষ করেই রামচন্দ্র বললো, 'কেষ্টদাস গোঁসাই আজ ঠিকই আসবি, তার আগে বারায়ে পড়ি চলো'।

'কেন্? তাক নিলে কেনাকাটার সুবিধা হতো'।

'কিন্তুক সে কবি, কবি এমন কথা নাই, যদি কয় কিছু'?

'তা পারে'।

কেষ্টদাসের চোখে পড়তে না হয় এমন সব ঘোরাপথ ধরে রামচন্দ্র তার সামান্য কেনাকাটার ব্যাপার শেষ করলো। তারপর বাড়িওয়ালাকে ভাড়ার টাকা কটা পৌঁছে দিয়ে সনকার হাত ধরে গ্রামমুখো হলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। পুণ্যাত্মা কেষ্টদাস আজকাল রাত্রিতে অত্যন্ত কম দেখে। পথে দেখা হলেও পাশ কাটিয়ে পালানো যাবে।

খেয়া নৌকায় বসে রামচন্দ্র সখেদে বললো, 'গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আলাম না'।

রামচন্দ্র সস্ত্রীক ট্রেনে চলেছে। গাড়িতে ভিড়। 'এত ভিড় ক্যান্, কোথা যাতিছে এত্ত মানুষ'? দুটি বেঞ্চের তলায় কোনোরকমে মালপত্র রেখে যাত্রীদের পায়ের কাছে কোনোরকমে সনকার বসবার জায়গা করে দিয়ে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার বোকা-বোকা মুখে ও সন্ত্রস্ত চোখ দুটিতে তার মনের ভূত-ভবিষ্যৎ পরিব্যাপ্ত ঝড়ের কোনো চিহ্ন ফুটলেও কারো চোখে পড়ছে না। কিংবা কারই-বা দৃষ্টি আছে তখন অন্য কাউকে লক্ষ্য করার?

বন্দর দিঘার স্টেশন যেন ঠাণ্ডা হিম। শেষরাত্রির এই গাড়িটা থেকে নেমে নিদ্রাবঞ্চিত যাত্রীরা

সোরগোল করলো না। তারা যেন এখানে আসতে চায়নি, কী করে এলো তাও বুঝতে পারছে না। ফিরিওয়ালাবা ঘুমিয়ে রইলো। দু-একজন কুলি ঘুমের ঘোরে 'কুলি' বলে মৃদুস্বরে ডাকাডাকি করলো। আগের দিন প্রায় এরকম সময়েই পাশের প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেক লোকজনের সোরগোলের মধ্যে পাশাপাশি সাজানো কয়েকখানা রিজার্ভ কামরায় সান্যালমশাই যাত্রা করেছেন। সে খবর অবশ্য রামচন্দ্রকে কেউ দিলো না।

রামচন্দ্রব বরং ভয় করে উঠলো। ভোর হওয়ার আগের মুহূর্তের ধূসর রঙের আকাশ আর কালচে নীল পৃথিবী মিলিয়ে যেন এক সুরঙ্গপথ তাব সামনে। এরকম যেন সেই জীবনে এই প্রথম দেখছে।

সনকা বললো, 'এখনই যাবা'?

রামচন্দ্র তার ঝোলাগুলোকে কাঁধে তুলে বুক চিতিয়ে বললো, 'মনে হয়, একটুক সাহস করা লাগবি'।

রূপপুরের কাছাকাছি যখন, মানুষ চেনা যায় কি যায় না। পথের ধারে দাঁড়িয়ে একজন বললো, 'চিকন্দিব মণ্ডল্ না? আল্যোন? সগলে যায়'। রামচন্দ্র গোঁফে হাত রাখলো। সনকা জিজ্ঞাসা করলো, 'কী কয়'? বোঝাটা ভার বোধ হওয়ায় রামচন্দ্র কাঁধ বদলে নিলো, বললো, 'চলো'।

বামচন্দ্ররা যখন বুধেডাঙার কাছাকাছি পৌঁছলো তখন প্রভাত হচ্ছে। দিগন্তেব কাছে পদ্মাব খানিকটায় যেন আলতা গোলা, সেই আলতা ক্রমশ কঠিনের রূপ নিয়ে গোল হয়ে উঠছে।

সনকা বললো, 'ভোর হতিছে'।

'কিন্তু খেতে লোক নাই কেন্'?

'তুমি বাদে সকলেই জানে খেত মাটি, দু দণ্ড পরে গেলে পলায় না, রাগও করে না'।

বুধেডাঙার ঘুম ভাঙছিলো। অল্পবয়সী কেউ একজন একপাল হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে পদ্মার দিকে যাচ্ছে দেখতে পাওয়া গেলো। সে রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে পথের উপরে দাঁড়ালো। 'ছিদামের জ্যাঠা না? আসলেন'?

'হয়। তুমি ইজু না? ভালো'?

'হয়'।

কয়েক পা এগিয়ে রামচন্দ্ররা দেখতে পেলো একটি স্ত্রীলোক পথের ধারে দাঁড়িয়ে শুকনো বাঁশ কঞ্চি কেটে কেটে ছোটো করছে।

সনকা রামচন্দ্রকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলো, 'এমন সুন্দর মিয়ে কার'?

রামচন্দ্র এবার হাসিমুখে জবাব দিলো, 'কার মিয়ে সুন্দর হলো তা বাপেরা টের পায় না। তা এটা রজব আলির বাড়ি। তার এক ভাইয়েব বিটি সুন্দর হইছে, শুনছি'।

এই জায়গাটা পরিচিত লাগছে না? রামচন্দ্র অনুভব করলো, এখানেই তো বিলমহলের এরশাদ, জসিমুদ্দিন, লাবেন, চিকন্দির সীমানায়। এর পরেই দাদপুরী কৈবর্তদের রাবণ, অশ্বিকুমার, মুকুন্দ, চিকন্দিতে পা দিলেই। একেকজনা শয়ে শয়ে মানুষ। আমু আর এরশাদ দাঁড়ালি কয় শ' হয়? সে ফোঁপাতে লাগলো।

পৌঁছে যাওয়ার স্বস্তিটা অনুভব করতে লাগলো রামচন্দ্র।

তারা যখন নিজের বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছলো তখন বেলা হয়েছে। কিন্তু তখনো বাড়ির ভিতরে যাওয়ার সব দরজা বন্ধ। এরকম হওয়া উচিত নয়। রামচন্দ্রর মনে আবার নানা অমঙ্গল চিন্তা ভিড় করে এলো। কিন্তু সনকা তাকে বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে অন্দরে যাওয়ার আগড়টা খুলে দিলো।

ভানুমতি বাড়ির মধ্যে কাজ করছিলো। সে আশা করতে পারেনি প্রায় একমাস আগে যে চিঠি দিয়েছিলো সে তার এত শক্তি হবে যে রামচন্দ্রকে টেনে আনতে পারবে। শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে সে কথা খুঁজে পেলো না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

'কী হইছে? কাঁদিস কেন্? থির হ, সবই শোনবো'। রামচন্দ্র এবং সনকা দুজনে কথা মিলিয়ে মিলিয়ে সান্ত্বনা দিলো।

'মুঙলা কনে? এত বেলায় ঘুমায় নাকি'?

ভানুমতি বললো, 'অনেক রাত্তিরে ফিরছে'।

'হুঁ। আচ্ছা, সে সবই আমি দেখবো। তামাক সাজে আন'।

তামাক খেতে খেতে হৃষ্ট হলো রামচন্দ্র। সে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললো, 'জীবৎকালে আর নড়তেছি না, তা কয়ে দিলাম'।

দুপুরে দিবানিদ্রা শেষ করে আবার তামাক নিয়ে বসে রামচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করবে স্থির করলো। কিন্তু তখন মুঙলার সঙ্গে জনান্তিকে কথা বলার সুযোগ হলো না তার। কয়েকজন প্রতিবেশী এলো। আলাপ-আলোচনার ধারাটা তখনকার মতো রামচন্দ্রর তীর্থবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো। শুধু তাদের একজন দুজন প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করলো কথাটা, 'তুমি তো বিদেশে গিছলে, কী শুনে আলে? দেশ নাকি ভাগ হতেছে'?

'বুঝি না। কোনকার কোন দুই রাজা যুদ্ধ বাধালো একবার, ধান না পায়ে উজাড় হলাম। কনে কোন শহরে দুইজনে বাধালো কাজিয়া, খেত-খামারের কাজ বন্ধ করলাম। আবার দ্যাখো কন থিকে কোন দুই জন আসে দেশ ভাগ করতিছে'।

'ভাগ নাকি হয়ে গেছে'। একজন বললো।

'তাইলে জানতাম'। অপর একজন বললো।

'জানবা কী করে সীমানায় খাল কাটবি, না, বেড়া দিবি'?

'কিছু একটা তো করবি'?

তারা চলে গেলে রামচন্দ্র মুঙলাকে ডাকলো।

মুঙলা এসে বললো, 'কেন্, বাবা, দিঘায় শুনে আলাম দেশ নাকি ভাগ-বণ্টক হবি'?

'তা যাক। দেশ কি তোমার না আমার? তুমি কি নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করছো'?

মুঙলা অপরাধীর মতো মুখ নিচু করলো।

'তাইলে ঝগড়া করছো। তা করলা কেন্'?

'ছিদামের জমি নিয়ে গোল। কেষ্টদাস কাকার কোন কুটুম দাদপুর থিকে উঠে আসছে। আসে ছিদামের ঘরবাড়ি দখল নিছে। নায়েবেক কয়ে জায়গাজমি নিজের নামে লিখাতেছে'।

'কেন্, তা করে কেন্'?

'কয়, চারদিকে গোল, চিকন্দিতে নিশ্চিন্দি'।

'নিচ্চায়। তার বাদে'?

'পদ্মক তাড়ায়ে দিছে'।

'হুম্'।

'পদ্ম কাঁদে আসে কলো—আমি এখন কনে যাই'?

'হুম্। আগো'।

'নায়েবেক কলাম—পদ্ম আছে থাক, খাজনা তার কাছে নেন, বাইরের লোক আনে লাভ অলাভ কী? কয় যে—মিয়েছেলে জমি-বা চষবি কী, খাজনা বা দিবি কী'?

'ন্যায্য। তার পাছে'?

'কলাম—আমি জামিন থাকবো'।

'মণ্ডলের বেটা মণ্ডল হইছো, কেন্'?

'নায়েব শোনে নাই, পদ্মক উঠায়ে দিছে। কেষ্টদাস কাকার বাড়িতে তার কুটুমরা বসছে। পদ্ম মোহান্তর

এক ভিটায় বসছে ঘর তুলে। তা, কোর্টে যায়ে মামলা করবো তা শাসাইছি নায়েবেক'।

'যা করছো, করছো। কোর্টে যাওয়া কাম নি। দেখতেছি'। বললো রামচন্দ্র।

ভানুমতি শক্ত মেয়ে, রামচন্দ্র ফিরে আসায় সে নিজেকে বলিষ্ঠতর বোধ করছে। তার চিঠিতে যে কয়েকটি কথা সে লিপিবদ্ধ করেও কেটে দিয়েছিলো, সেগুলির সে পুনরুত্থাপন করলো না।

দু-চারদিন নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেলো। তারপর অতিক্রুদ্ধ আকাশে যেমন মেঘগুলি ধীরে ধীরে পাকাতে শুরু করে, সেই আকাশের তলে থমথমে পদ্মার মনোভাব বোঝা যায় না, বালি ওড়ে আর বালির পাড়ে আলকাতরা রঙের ছোটো ছোটো ঢেউ আছড়ে পড়ে, তেমনি করেই সংবাদটা আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো।

একদিন সকালে রামচন্দ্র সানিকদিয়ারে গিয়েছিলো তার বেহাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দৃশ্যটা দেখে তার সরসতা শুকিয়ে গেলো, প্রাণ আই ঢাই করতে লাগলো, কথা জুয়ালো না।

তীর্থভ্রমণ নয়, দেশ-পর্যটন নয়, শ্মশান-যাত্রা। রামচন্দ্র ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পারলো। এবং অনুমান করে সে মহিমের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

'কাকা, এ কী দেখি'?

'রাম রে, তুমি আসছো? কও, এ কী হলো? এ কোন পাপ'?

'কিন্তুক যাবেন কেন্'?

পাঁচ-ছটি গোরুগাড়িতে মহিমের পরিবারের সকলের অস্থাবর সম্পত্তি ধরবে কিন্তু তার স্থাবর সম্পত্তির এতটুকুও তার সঙ্গে যাবে না।

রামচন্দ্র আবার বললো, 'না গেলি হয় না'?

'পরে আর যাওয়া যাবি নে! জামাই তাই লিখছে'।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রামচন্দ্র বললো, 'মিয়েক দেখে যাবেন না, কাকা'?

আবার নীরবতা। মহিমের দিক্‌বিখ্যাত জোয়ান ছেলেরা পটুহাতে গোরুগাড়ি বোঝাই করছে। তাদের জোয়ান কিংবা পটু দেখাচ্ছে না। বাড়ির ভিতরে একটা চাপা কান্নার শব্দ উঠছে।

রামচন্দ্র নিজের বাড়িতে ফিরে চললো। তার চিরবিশ্বস্ত পা দুখানা যেন মোমের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। প্রথমেই তার মনে হলো, সে যে কত বড়ো বোকা এতদিনে তা প্রতিপন্ন হলো। এত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ঘটে গেছে এ সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ। দূরে দূরে ছিলো বলেই কি এমন হলো। ঘটনাটা সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করতে চায়, সংবাদটা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত বিমুখ বলেই কি সে এমন চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছে? আর মহিমের গোরুর গাড়ির বহর যখন সানিকদিয়ার চিকন্দির উপর দিয়ে দিঘার দিকে যাত্রা করবে পথের দু-পাশের লোকগুলির মনের অবস্থা কি হবে? আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের সেই ছুটোছুটির মধ্যে বুদ্ধি আবর্তে পড়ে মার খাবে। ঝড়ের মুখে নৌকো বাঁচে না।

রামচন্দ্র বাড়িতে পৌঁছে মুঙ্লাকে খবর দিলো তার শ্বশুর আসছে সপরিবারে। ভানুমতি বললো, 'হঠাৎ যে'?

রামচন্দ্র এই সামান্য প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে আকাশ-পাতাল অন্বেষণ করে গোঁফ চুম্‌রে মাটির দিকে দৃষ্টি আনত করে বললো, 'তীত্থ করতে যাবি'।

ভানুমতি ফোঁপানি গোপন করতে সরে গেলো।

মহিম সরকার তার গোরুর গাড়ির বহর নিয়ে এসেছিলো। একদিন একরাত রামচন্দ্র তার বেহাইকে সপরিবারে ধরে রাখলো। দ্বিতীয় দিন সকালে গাড়ির বহর নিয়ে মহিম সরকার রওনা হলো। ভানুমতি কাঁদলো, সনকার চোখে জল এলো, রামচন্দ্র তার হুঁকো হাতে ঘর-বার করলো। কথাটাও গোপন রইলো না। তার পাড়ার লোকরা বলাবলি করলো নতুন নবাব এসেই মহিম সরকারকে তাড়িয়েছে।

এরপর রামচন্দ্র সঠিক সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায় ছুটোছুটি শুরু করলো। একটি বিষয়ে সে কৃতনিশ্চয়

হয়েছে - এদিকে এক রাজা আর ওদিকে এক নবাব। দেশ ভাগ হয়েছে। দুই নাম হয়েছে, একই ফলের দুটি টুকরোর।

একজন বললো একদিন, 'শুনছো, মণ্ডল, হাজির বেটা ছমির খোনকার রায়দের ভিটা দখল নিছে'?

'কেন্, তা নেয় কেন্'? রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলো। এটাই কি এখন থেকে কী ঘটবে তার উদাহরণ? কে দিলো তাকে দখল?

কিন্তু ঠিক কোথায় কতদূরে সেই রাজসিক সীমারেখা, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাকেও কি দেশ ছেড়ে যেতে হবে? ইতিমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছে সে। যে-অবস্থায় সে বসেছিলো তেমনি অবস্থাতেই সে ছুটলো সান্যাল কাছারির দিকে। ইতিমধ্যে দু-একজন প্রতিবেশী বলেছে বটে, গড়-চিকন্দিতে সান্যালরাই রাজা থাকবে। এখানে কোনো নবাবের অনুপ্রবেশ হবে না। তাহলেও বিষয়টি নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন।

রামচন্দ্র কাছারিতে প্রবেশ করলো দুঃসময়ে। কাছারির অর্ধেক দরজা বন্ধ। সান্যালমশাইয়ের খাস কামরার দরজায় মস্তবড়ো একটা তালা ঝুলছে। কাছারিতে দাঁড়িয়ে অন্দরমহলের দোতলার যে জানালাগুলি চোখে পড়ে সেগুলিও বন্ধ। দুপুরের মতো তাজা রোদে এটা ঘুমের দৃশ্য হতে পারে না। এতক্ষণে অন্তত একজন বরকন্দাজেরও দেখা পাওয়া উচিত ছিলো। বরকন্দাজ এলো না। আমলারা কোথায়? প্রজারা? সব শুনসান্ দিগরের গোরস্থান! নায়েব নিজেই বেরিয়ে এলো কাছারির একটি ঘর থেকে। নায়েবের হাতে হুঁকো, সে যেন বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে। রামচন্দ্রর মনে হলো মুঙলা নায়েবের সঙ্গে যে কলহ করেছে সেটা মিটিয়ে ফেলা উচিত, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটাকে মূল্যহীন বোধ হলো।

নায়েব বললো, 'তুমিও বুঝি সেই খবরটাই চাও? অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে'।

'কী খবর'?

'খবরটা সত্যি। কর্তা আর গিন্নি চলে গেছেন দেশভ্রমণে'।

রামচন্দ্র এত বড়ো নির্দয় সংবাদ আশা করেনি। অভিভূতের মতো সে বললো, 'ছাওয়ালরা'?

'তার আগেই গেছে। দেশ ভাগের কথা শুনলে, রামচন্দ্র'?

রামচন্দ্রর মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেউ তার বুকে চেপে বসেছে।

কিছুক্ষণ পরে নায়েব বললো, 'চৌহদ্দিটা ঠিক কী হলো বুঝতে পারছি না'।

রামচন্দ্র অর্থহীন ভাবে 'আজ্ঞা' শব্দটা উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়ালো। চৈতন্য সাহা, মিহির সান্যাল কিংবা রেবতী চক্রবর্তীর কাছে সে নিজে থেকে কখনো যায় না। কিন্তু এই দুঃসময়ে প্রত্যেকের সাহায্য অন্য সকলের দরকার হয়ে পড়তে পারে।

রেবতী চক্রবর্তী গিয়েছে তার মেয়ের বাড়িতে, কৃষ্ণনগরে, সপরিবারেই। মিহির সান্যাল আপাতত সদরে বাসা ভাড়া করে আছে, সেখানে কালেক্টারের অফিস কাছে, হিন্দুদের সংখ্যার কিছু জোর আছে। অবাক হয়ে গেলো রামচন্দ্র—এসব কী কথা?

রামচন্দ্র লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলো। অভ্যস্ত মুদ্রাদোষের ফলে তার একখানা হাত বারংবার গোঁফটাকে স্পর্শ করছে যদিও শূন্য আকাশের দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে তার মুখখানা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেলো। এ কী হলো, কও?

কথাটা আকস্মিকভাবে একটা যুক্তির আকার নিয়ে মনে ফিরে এলো তার। কাঁচা কাজ কখনো সে করেনি। তার জমির প্রতিটি হাত, প্রতিটি আঙুল কাগজে লেখা, রেজিস্ট্রি করা। তার কি কিছুই মূল্য নেই?

পথে চলতে চলতে তার মনে হলো, এর আগে এদেশে নবাবের রাজত্ব ছিলো, তখন কি মানুষ চাষবাস করে নাই?

কী হবি, কও। কী হবি, অ্যাঁ?

ভক্ত কামার চলে যাওয়ার সময়ে যেমন হয়েছিলো তেমনি করে প্রতিবেশীরা আবার আসতে শুরু করলো তার কাছে।

'কও, রামদাদা, কিসের লোভে তুমি থাকবা'?

'লোভে, না'?

একদিন খবর এলো মহিম সরকারের এক জ্ঞাতির মুখে।

'মুঙ্‌লার শ্বশুরের জমি গেছে অন্যের দখলে। দেখছো না কারা দখলে নিছে'?

'হুঁ'।

'সানিকদিয়ারের সনাভুঁইয়ের জমি তোমার গিছে ধরে রাখবের পারো'।

'হুঁ'।

'তোমার বাড়ির দশ হাতের মধ্যে নবাবের সীমানা'।

'জানছি। আর কত কবা তোমরা, কও ভাই'? আর্তনাদ করে উঠলো রামচন্দ্র।

'কী করা'?

রামচন্দ্র বাক্‌পটু নয়। সে উঠে গিয়ে লোকটির মুখের সম্মুখে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বন্ধ দরজার এপারে দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে তার অত বড় শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। আশ্চর্য! চিকন্দিও কি থাকবে না তবে?

রাত্রিতে সনকাকে সে বললো, 'সব গিছে তোমার। পাঁচ বিঘে ভুঁই আছে চিকন্দির'।

ফিরে আসার পরে একমাসের মধ্যে রামচন্দ্র এই প্রথম তার সঙ্গে জনান্তিকে কথা বললো। অথচ নবদ্বীপে থাকার সময়ে এমন সব রাত্রিগুলি কত কথায় রামচন্দ্র পূর্ণ করে দিতো।

'তুমি যে কইছিলে নবদ্বীপে একটুক্ জমি পাবা'?

'সব যাতেছে তবু তোমার ভয় নাই! রস করো'?

সনকা বললো, 'ভয় করবের শিখাও নাই'।

সনকার কথাটা মনের মধ্যে সঞ্চারিত হলে রামচন্দ্র ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলো। সঘন নিশ্বাস নেওয়ার কথা সে শুনেছে কেষ্টদাসের মহাভারত পাঠের সময়ে। কী করবে সে, আবার সেই পাঁচ বিঘা থেকে জীবন আরম্ভ করবে?

সে ভাবতে চেষ্টা করলো। গত বছরের দাঙ্গায় দাদপুরী রাবণ আর অগ্নিকুমার, বিলমহলী এরশাদ আর লাবেন, এদিকের মুকুন্দ আর ওদিকের জয়নাল খেতে লাঙল জুড়ে নবাবদের দাঙ্গা তাড়িয়েছিলো। তেমন বর্ষা কি নামবে না? হা—হা, বর্ষা!

বাইরের দরজা বন্ধ করে সে নিজের বাড়ির ভিতরে চোখ ফিরিয়ে আনলো।

আর্থিক স্বাধীনতা মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনবে এটা স্বাভাবিক। মুঙ্‌লার ব্যবহারে সেরকম কিছু দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা না দিলেও তার কিছু আছে তাও অস্বীকার করা যায় না।

রামচন্দ্র বললো, 'কোনদিকে আগাই, তা ক', মুঙ্‌লা'।

একটু ইতস্তত করে মুঙ্‌লা বললো, 'শ্বশুর লিখছে—'

'কী লিখছে, কবে লিখছে'?

'কইছে বদ্ধোমানে জমি নিছে। কইছে সকলেক সেখানে যাতি'।

'ভানুমতিকে নিয়ে যাবা'?

'গেলে তাই লাগে। কইছে আমার এখানকার জমির বদ্‌লা দশ বিঘা জমি পাইছে বদ্ধোমানে। এক মোসলমান এখানে আসবি। আপনেকেও লেখছে চিঠি'। মুঙ্‌লা কোমরের কাপড় থেকে একখানা চিঠি বার করে দিলো।

রামচন্দ্র চিঠিটা নিলো, অভিমানভরে বললো, 'যাও তবে'।

মুঙলা কার্যান্তরে গেলে রামচন্দ্র গোয়ালঘরে কাছে গেলে। ভাগ্যে সে কোনোদিনই চিঠি পড়তে শেখেনি। এ কি আর বানান করে ছাপার অক্ষরে মহাভারত পড়ার চেষ্টা? অবাক হয়ে সে দেখলো বলদগুলি ও গাভীটির মুখের কাছে ঘাস নেই। গাভীটি রামচন্দ্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গভীর সুরে একটা চাপা শব্দ করলো। কিছু খড় পেড়ে বলদগুলি এবং গাভীটার সম্মুখে দিয়ে রামচন্দ্র লাঙলগুলির খোঁজ করলো। পাশাপাশি দুখানা থাকবার কথা। রামচন্দ্র লক্ষ করে দেখলো একখানার লোহার রং তখনো ওঠেনি, অপরখানায় মরচে ধরেছে। তখন তখনই এক টুকরো ইট খুঁজে নিয়ে লাঙলের ফলা দুটি এক এক করে ঘষতে বসে গেলো। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর সে যখন উঠে দাঁড়ালো ফলাগুলি তখন অনেকটা উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মাটির ঘর্ষণে যেমন রুপোয় পরিবর্তিত হওয়ার মতো ব্যাপারটা হয় তেমনটা অবশ্যই হলো না।

মুঙ্লার মন বচ্চোমানে গেছে এই তিক্ত চিন্তাটিকে গলাধঃকরণ করার মতো মুখ নিয়ে সে বাড়ির ভিতরে এসে বললো, 'ভানমতি, তোমরা চাষবাস করো নাই, না'?

সনকা বেরিয়ে এসে বললো, 'ভান্ কি বলবি? ছাওয়ালেক জিজ্ঞাসা করো'।

রামচন্দ্র কাঁচুমাচু মুখ করে তামাক সাজতে বসলো।

সারাদিন ছটফট করে বেড়ালো সে, সারাটা রাত জেগে কাটালো।

পরদিন সকালে, সকাল তখনো হয়নি, কিছু রাত আছে, রামচন্দ্র হাঁক দিলো, 'মুঙলা, মুঙ্লা'!

হাঁকাহাঁকি শুনে সনকা ভীতস্বরে বললো, 'কী হইছে'?

'কনে তোমার ছাওয়াল'? রামচন্দ্র গর্জন করে উঠলো।

'ঘুমায়। কী করবি? কাম কই'?

'কী করবি, না? কাম নাই, না'?

মুঙলা চোখ ডলতে ডলতে উঠে এলো।

'তুমি আমার জামাই, না ছাওয়াল'?

তিরস্কারে মুঙলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো।

'লাঙল জোড়ো। দুই লাঙল চাই। নবাবের দেশে চাষ পড়ে, তোমাগের দেশে চাষ হবিনে? কেন্? সময় যায়, না আসে'?

কিন্তু গভীরতর কিছু অপেক্ষা করছিলো রামচন্দ্রর জন্য।

আগের দিন দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভোররাতে মাটিতে পা দিয়ে রামচন্দ্র বললো, 'মুঙ্লাক তুলে দেও'।

সনকা বললো, 'অনেক রাতে আসছে'।

'কেন্, কোথায় গিছিলো'?

সনকা কিছু বললো না। রামচন্দ্র বাড়ির দিকের দাওয়ায় পা দিয়ে দেখলো প্রায়-অন্ধকার বারান্দায় কে একজন শুয়ে আছে।

'কে'?

ভান্মতি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে চলে গেলো।

রামচন্দ্রর খটকা লাগলো। কুয়োতলায় হাত-মুখ ধুতে ধুতে সে প্রশ্ন করলো সনকাকে, 'বউ বাইরে কেন্'?

মনে হলো সনকা কিছু বলবে কিন্তু এবারেও সে কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

রামচন্দ্র ক্ষিপ্তর মতো গর্জন করে উঠলো, 'কেন্, এটা কার বাড়ি? এ কোথায় আলাম'?

সনকা বিপদ বুঝে ফিরে এলো। রামচন্দ্রর এরকম ক্রোধ সে এর আগে দেখেছে বলে মনে করতে

পারলো না। স্বরটা যথাসম্ভব নিচু করে সে বললো, 'এখন যদি জমিতে যাবা যাও। পরে সব কবো'।

নন্দীপ থেকে ফিরে এসে সনকা লক্ষ করেছিলো ভানুমতি যেন আগের তুলনায় বিষণ্ণ। সে স্থির করেছিলো জমিজমাসংক্রান্ত এবং সাংসারিক ব্যাপার, তার পিতৃবংশের আকস্মিক দুর্ভাগ্য, এ সবই তার বেদনার কারণ। আজ সকালের মতো ব্যাপার এর আগেও তার চোখে পড়েছে। ঘটনার কারণটা অনুসন্ধান করা দরকার এ তারও মনে হয়েছিলো। কিন্তু খুব সম্ভব এটা স্বামী-স্ত্রীর কোনো মান অভিমানের ব্যাপার এবং সে ক্ষেত্রে বাইরে থেকে খুব বেশি খোঁজ না নেওয়াই মঙ্গলের হবে কিনা এটাই চিন্তা করছিলো সে।

কিন্তু রামচন্দ্রকে উত্তর দিতে হবে। সনকা অবসর বুঝে ভানুমতিকে প্রশ্ন করলো। ভানুমতি প্রথমে স্তব্ধ হয়ে রইলো, তার পরে কাঁদলো। তারপর তার অন্তর্নিহিত বেদনাটা প্রকাশ করে ফেললো। চিঠিতে লিখেও যা সে কেটে দিয়েছিলো, এখন তা আর গোপন রইলো না।

রাত্রিতে সনকা ভানুমতির আশঙ্কা ও অভিমানের কথা বললো রামচন্দ্রকে। শুনে তার মনে হলো, ঘটেছে, এতদিনে চূড়ান্তটা ঘটেছে, সপ্তরথী ঘিরেছে তাকে। অহহ! ভগোমান! অহহ!

পর পর তিন-চারদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো সে। যেন সে একটা সমাধানের অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন করছে। অন্তরের আত্যন্তিক জ্বালাটাকে ভানুমতি ও সনকার চোখের আড়ালে রাখবার চেষ্টায় বাড়িতে সে সহিষ্ণুতার পাহাড়ের মতো হয়ে রইলো। তারপর আকস্মিকভাবে একদিন সে অশ্রুপাত করার জন্য নির্জনতা খুঁজে বার করলো। শিবমন্দিরের সেই ভগ্নাবশেষে গিয়ে নিঃসঙ্গ দীর্ঘকাল বসে রইলো। তারপর একসময়ে মন্দিরের বাঁধানো চত্বরটায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদলো। এ কান্না তার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। আজকের সূত্রপাতটার জন্যই যেন সে অপেক্ষায় ছিলো। সকালে সে তার বাড়ির সীমায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, নবাবের এলাকায় কে একজন তার সনাভুঁয়ের জমিটুকুতে চাষ দিচ্ছে। এরকমটা হবে সে কল্পনা করেছিলো কিন্তু তাসত্ত্বেও দৃশ্যটা চোখে পড়ামাত্র পুরনো দিন তার অন্তরে গর্জন করে উঠতেই সে অন্যায়কারীর দিকে ছুটে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে শুকনো জোলার খাত পার হতে যাবে এমন সময়ে একজন প্রতিবেশী তাকে সাবধান করে দিলো—ওটা নবাবের এলাকা। চাঁদকে চোখে দেখতে পেলেও সেখানে যাওয়ার কল্পনা করা যায় না, প্রিয়তমার মৃতদেহ চোখের সম্মুখে দেখেও যেমন আর কিছুই করার থাকে না তেমনি হয়েছিলো রামচন্দ্রর।

উঠে বসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চোখের জলে ভিজে যাওয়া গোঁফজোড়া কাপড়ে মুছে কিছুটা শান্ত হলো রামচন্দ্র। এ কী হলো পৃথিবীর! মানুষের এত কষ্ট কেন? কোনো কোনো রোগে রক্তমোক্ষণ করা নিয়ম ছিলো সেকালে। এ যেন তেমনি কোনো চিকিৎসা। কিন্তু রামচন্দ্র গোরুর চিকিৎসা জানলেও নিজে কখনো কোনো পশুর রক্তমোক্ষণ করেনি। এ যেন কোনো অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কৃষকের রোয়ার বেছন বাছাইকরা। মাটি থেকে শিকড়সুদ্ধু চারাগাছগুলিকে টেনে টেনে তুলছে। কিন্তু সে কৃষক যেন সাধারণ কৃষকের চাইতে কম জানে কিংবা অত্যন্ত বেশি জানে। চারাগুলিকে বারে বারে তুলছে আর লাগাচ্ছে, আর লাগানোর আগে চারাগুলির কোমলতম শিকড়ে যে মাটিটুকু লেগে থাকে আছড়ে আছড়ে সেটুকুও ঝেড়ে ফেলেছে। অহহ। একবার না, তিনবার। সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা, তারপর এই দেশভাগ।

ছিদামের কথা মনে পড়লো। ছিদাম, ছিদাম। অহো, অহো। মানুষ যদি চারা হয় এমন চারা আর কে? কিন্তুক তাকে আর একরকম! বছনে ফেলে ছিঁড়েই ফেললো। রামচন্দ্র এই জায়গায় ধর্ম ও সমাজবিধান নিয়ে মনে মনে আলোচনা করলো যদিও কোনো গূঢ় তত্ত্বের কাছাকাছি যেতে সে পারলো না, তার মনে হলো ছিদামকে আলিঙ্গন করে বুকে নেওয়ার মতো সমাজ হলে ভালো হতো। তারপর তার মনে হলো বুধেডাঙার সান্দারপাড়ায় জন্মালে ছিদাম কত সুখী হতে পারতো। কিন্তু তার নিজের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বপ্রকারে বিধিমুক্ত সান্দার-সমাজের তুলনাটা মনে আসতেই তার মনটা গুটিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে সমাজকে ছেড়ে ব্যক্তিকে অবলম্বন করলো। সমাজে যা হয় হোক। ছিদাম কেন সুখী হতে পারলো না। ছিদামকে যে এই সমাজে পাঠালো তার কাছে কি এই সমাজের লোহার বাঁধন অজ্ঞাত

ছিলো? হায়, হায়! সে কি লোহা যে আগুনে তাতানো লোহার বেড় তার গায়ে পরালে সে বেড়টাকে নিজের করে নিয়ে আরও শক্ত হবে?

একটা হিংসা তার মনের মধ্যে জাগতে শুরু করলো। তার ভূত ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করে সহস্র বাধা। সেই বাধাগুলিকে ধ্বংস করার জন্য একটা হিংস্রতা মনের মধ্যে উঁকি মেরে চলতে লাগলো। চতুর্দিকের ঘনসন্নিবিষ্ট অরাজকতার অরণ্যে একক চলতে হবে তাকে। সান্যাল-শাইবাও নেই। একা থাকতে হবে একা যেন তাকে কোনো গড় রক্ষা করতে রেখে গেছে কেউ।

সপ্তাহকাল পরে এক দুপুরবেলায় হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে রামচন্দ্র নতুন ঘরটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'পদ্ম আছো'?

পদ্ম ঘরেই ছিলো, বেরিয়ে এসে রামচন্দ্রর দিকে এগিয়েও এলো। রামচন্দ্র লক্ষ্য করলো পদ্মর স্নান শেষ হয়েছে, চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে। পরনের ডুরি শাড়িটা একেবারে নতুন বলে মনে হয়। আর তার চোখ দুটি দেখে রামচন্দ্রর মনে হলো, যেন সে কাজলও পরেছে

রামচন্দ্র অনুভব করলো এইবার লাঠিটা শক্ত করে ধরা দরকার। কিন্তু পদ্ম তো সত্যি সাপ নয়। সে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে রামচন্দ্রকে প্রণাম করলো। প্রণাম করার সময়ে অনেকটা সময় পদ্মর দুখানি হাত যেন রামচন্দ্রর ধূলিভরা কর্কশ পা দুখানি স্পর্শ করে রইলো।

রামচন্দ্র বললো, 'তোমার সাথে কথা আছে, কন্যে'।

'বসেন'।

'তা বসি'। রামচন্দ্র ঘরের দাওয়ায় উঠে বসে বললো, 'মুঙ্লা আসে'?

'আসে'।

'তার বাড়িতে বউ আছে'।

'তা জানি তো'।

'এ কি ন্যায্য হতিছে তোমার'?

'কী অন্যাই? আমাক সকলেই তাড়াবি'?

রামচন্দ্রর ক্রোধ উদ্বেল হয়ে উঠলো, কিন্তু স্ত্রীলোক যে। সে জোড়হাতে পদ্মর হাত ধরে অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় বললো, 'বাক্সুসি, আমার এক ছাওয়ালেক খাইছো, আর একটাক ফিরায়ে দেও'।

পদ্ম ফিক করে হাসলো।

'তুমি হাসো? তুমি হাসো'।

'ভয় পান কেন্'? এই বললো পদ্ম, কিন্তু তার হাসি হাসি মুখ যেন অপমানে কালো হয়ে উঠলো।

পরাজিত রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। মনের উপরে জোর চলে না। একবার জবরদস্তি করতে গিয়ে ছিদামের ওই দশা হলো। হে ভগোমান। ধনবল জনবল কিছুই কি আর অবশিষ্ট থাকবে না?

পদ্ম বললো, 'বসেন, আপনেক একটা সত্যি কথা কবো। মুঙ্লা এখনো ঠিক আছে। তবে তার মনের কথা আমি জানিনে'। পদ্মর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো।

পদ্মকে সে অবিশ্বাস করেনি। ভানুমতির প্রতি মুঙ্লা যদি অবহেলা দেখিয়েও থাকে এখনো তার সুখশান্তির পথে হয়তো চিরকালের জন্য কাঁটা পড়েনি। রামচন্দ্র কথাগুলিকে ওজন করে দেখার জন্য সময় নিতে লাগলো। একদিন চিন্তা করতে করতে তার স্মরণ হলো, একসময়ে একান্তে পদ্ম তাকে একটি অবিশ্বাস্য এবং অপূর্ব কথা বলেছিলো। এটা তার চিন্তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলো।

সেদিন পূর্ণিমা নয়, এমনকী কোনো বিশেষ তিথি পর্যন্ত নয়। রামচন্দ্র আবার পদ্মর বাড়িতে গেলো।

'কন্যে আছো'?

'আছি'।

'পদ্ম'।

'কন্'।

'পদ্ম, তুমি বিয়ে করবা?'

'না'।

রামচন্দ্র আবার চিন্তা করলো।

'তোমাক এ গাঁ ছাড়তে হবিনে। এখানে আসো আমার কাছে আসে বসো, মনের কথা কও'।

পদ্ম ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

'কই, আসো'।

পদ্ম রামচন্দ্রর সম্মুখে এসে বসলো।

রামচন্দ্র বললো, 'পদ্ম, এখন থিকে লোকে জানুক তুমি রামচন্দ্র মণ্ডলের'।

পদ্ম কথা বললো না, তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

রামচন্দ্র বললো, 'আর একখান ঘর তোলবো আমার বাড়িতে। তখন তোমার নিয়ে যাবো। গাঁয়ের লোক-সকলেক ভোজ দিয়ে জানায়ে দিবো'।

পদ্ম কাঁদতে লাগলো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামচন্দ্র বললো, 'আর এক কথা। রঙিন কাপড় পরবা না। আর চুল কাটে ফেলবা। আর পান—তা পান খাতে পারো। আচ্ছা, চুলও রাখো। আর সন্ধের পর কখনো দেখা করবা না।

ঘটনাটা ঘটিয়ে দেওয়ার পর রামচন্দ্র অনুভব করলো এক কঠিন দুশ্চর পথ ধরে সে রওনা হয়েছে। যত সহজে কথাটা রাষ্ট্র করে দেওয়া যাবে ভেবেছিলো সে তত সহজ নয় বিষয়টি। এ নিয়ে আর যাই করা যাক উৎসব করা যায় না।

সনকাকেও বলা যায়নি, অথচ তাকেই তো সর্বাগ্রে সব কথা বলা দরকার।

প্রায় একমাস হয়ে গেছে। সেদিনের সেই একান্ত অদ্ভুত প্রস্তাবের পর রামচন্দ্রর সঙ্গে পদ্মর একটিবার মাত্র দেখা হয়েছে। সেদিন হাটবার। রামচন্দ্র হাটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময়ে একটি ছোটো ছেলে এসে তাকে বললো, পদ্ম নাকি তাকে ডেকেছে।

রামচন্দ্র যাবো কি যাবো না করতে করতে অবশেষে পদ্মর কুটিরে গিয়েছিলো। এবং একটি অনাস্বাদিতপূর্ব করুণ মাধুর্যে তার অন্তর সিক্ত হয়ে রইলো সমস্তটা পথ।

পদ্ম বললো, 'আমি হাটে গেলি কি রাগ করবেন'?

'না। আমিই যাবো'।

'তাহলে আমার ভাঁড়ার দেখে যান কী কী লাগবে'।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখবের হবি নে'।

পদ্ম তার চুলগুলি কেটে ফেলেছে। অবশিষ্ট চুলগুলি থলো থলো হয়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে। পরনে শাদা থান জোটেনি কিন্তু শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ফেলেছে।

রামচন্দ্র বললো, 'সন্ধ্যার পর সওদা দিয়ে যাবনে'।

পদ্ম কেঁপে উঠলো।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো, 'কী হলে'?

'কিছু না। ছাওয়ালেক দিয়ে পাঠায়ে দিবেন সওদা। আর কাল দুই পরে ভানুমতিকে একবার পাঠায়েন ছাওয়ালের সঙ্গে'।

'তা দিবো'।

রামচন্দ্র ভাবলো, জনবল্লকে সে ক্ষয় থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু সে নিজে কি সবদিক রক্ষা করে চলতে পারবে? বৃষ্টি নামে কই? আকাশ ফাটে বৃষ্টি নামে কই? হা হা।

কয়েকদিন হলো বর্ষা নেমেছে। জল যদি-বা থামে ভিজে ভিজে বাতাস চলতে থাকে। রামচন্দ্র জানে কাছে কোথাও 'সাইকোলোন' হলে এদিকে এমনটা হয়। বর্ষার জলে ভিজে এবার তার শরীরটাও খারাপ করেছে। সে নাকি একবার কোন মাঠে জলবৃষ্টির সোহাগে শুয়ে থেকেছিল একদিন একরাত। বয়স বেড়েছে সন্দেহ কী!

রামচন্দ্র তার ঘরে একটা মাদুরে শুয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলো। তার বাড়ির চৌহদ্দি নির্ণয় করার বড়ো আমড়াগাছটার কচি কচি নরম পাতায় তখনো বৃষ্টির জল দেখা যাচ্ছে। জল থেমেছে কিন্তু পাখপাখালিরা পাতার আড়ালে ঝুটোপুটি করে খেলা করলে যেমন দেখা যায় তেমনি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালিও নয়, পাখিও নয়। ছোটো ছোটো টুকরো বাতাসেই এমনটা করছে। রামচন্দ্রর দৃষ্টি অতঃপর মাটিতে পড়লো। তার বাড়ির সম্মুখে যে জমিটা, তার উপরে জল জমেছে। বিঘৎ পরিমাণ হবে সে-জল গভীরতায়, কিন্তু চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, বন্যার জল। তা বন্যাও হতে পারে।

রামচন্দ্র চিন্তা করলো। অনেকদিন পরে সে আবার তার নিজের মনের সাক্ষাৎ পেয়েছে। নবদ্বীপে যাওয়ার আগে সে কখনোই বুঝতে পারেনি এমন করে নিজের মনকে লক্ষ্য করা যায়।

ইতিমধ্যে রামচন্দ্র এক উপাখ্যান সৃষ্টি করেছিলো। দেশ ভাগ হওয়ার কথা শুনেই সনকা আবার প্রস্তাব তুলেছিলো নবদ্বীপে যাওয়ার। তাকে নিবৃত্ত করার জন্য কিছুটা মিথ্যা, খানিকটা সরসতা, কিছু-বা নিজের কিংকর্তব্যমূঢ়তা মিলিয়ে সে বলেছিলো, 'বুঝলা না, বউ, ধরো যে তোমার মহাভারতে ক্ষত্রিযর ধম্ম লেখা আছে, ব্রাহ্মণের ধম্ম লেখা আছে, কিন্তুক আমার ধম্ম কই লিখছে? তাইলে আমি চাষই করবো'।

এখন সে কথাটা তার মনে পড়লো। কিছুক্ষণ কৌতুকবোধটা অনুভব করে পরে সে স্বগতোক্তি করলো—এ জীবনে ধম্ম করা হবি নে। ভগোমানের ইচ্ছা না। নইলে ফের সেই নতুন করে জীবন আরাম্ভন। এই দ্যাখো কী ব্যাপার! আমরা তো রোপা-ধান একবার ক্ষেত থেকে তুলে আর এক ক্ষেতে বসাই। তুমি তিনবার করলা, কেন্, ভগোমান?

রামচন্দ্র পাশ ফিরলো কিন্তু আত্মগত চিন্তার জের টেনে চললো—ধম্ম তুমি চাও না বুঝছি। আচ্ছা, তাতে আমি চটি না। তুমি পদ্মর ব্যাপারে কিন্তুক আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলায়ো না। সনকা কাঁদবি, তা যেন হয় না। ধম্ম আমি চাই না, যদি না দিবা। কিন্তুক সজ্ঞানে যেন্ যাই। মুঙ্লাক, পরের ছাওয়ালেক ভালোবাসে অন্যাই করছি? আমি তো চুরি করি নাই তাক।

একদিন এমন হবি। পের্‌থম বর্ষার ঢল মারতি মারতি খেতে যখন এক হাত পের্‌মান জল, মুঙ্লা আসে কবি—বাবা ওঠো, আজ ক্ষেতে যাতে হবি। না গেলিই না। ততদিনে মুঙ্লা কাজ শিখছে, কাজেই তাক ফাঁকি দেওয়া যাবি নে। করের হবি, শরীলটা বেজুত, কাল সকালে যাবো, একদিনে আর কী হবি। কাউকে জানান্ নাই। ভান্‌মতি আর মুঙ্লা যখন বাদলার ভরে বেলা টের না পায়ে উঠি কি না-উঠি করতিছে সুখশয়ান ছাড়ে, তখন সনকাকে ডাকে কবো—আমি চললাম, বউ। যাওয়ার আগে তোমাক কয়বার 'সুনু' কয়ে ডাকি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আত্মার যাওয়া-আসা—কেষ্টদাস কইছে। পথে যাতি যাতি পদ্মর সঙ্গে একবার দেখা করবের হবি? তারপরও কি খেতের চারিদিকে কয়েক পাক উড়বি তার আত্মা?

জ্বরের ঘোর ও তন্দ্রার ভাবটা কাটলে ঈষৎ আরক্ত চোখ মেলে দেখলো রামচন্দ্র, তার শিয়রে বসে সনকা।

রামচন্দ্র বললো, 'ভান্‌মতি কই'? তার মনে হয়েছিলো পদ্মর গলার রুপোর চিকটা যেন ভান্‌মতি পরেছে। ভান্‌মতিদের সে কি বদ্দোমানেই যেতে বলবে?

'জল খাবের চালে, খাবা'? সনকা বললো।

'না। জ্বর বেশি আসছে, না'? রামচন্দ্র হাসলো।

এমন সময়ে মুঙলা ঘরে এলো। তার সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত।

'বাবা, ক্ষেতে জল হইছে পেরায় এক হাত। আটকায়ে রাখবো, না কমায়ে দেই বুঝি না। ওদিকে পদ্মাও নাকি কাঁপতিছে'।

'না দেখে কতে পারি নে। কাল দেখবো'। রামচন্দ্র হাসলো। 'কেন, সে আবার ফোঁপায় কেন'? স্বপ্নের কথাটা মনে পড়লো তার। কিছুক্ষণ বাদেই সে শুনতে পেলো মুঙলা ও ভানমতি কী একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করছে। আনন্দ বোধ হলো তার।

সে বললো, 'সুনু, কাঁথাখান্ গায়ে জড়ায়ে দেও'।

মুঙলারা হাসাহাসি করছিলো না, বন্যার ব্যাপার নিয়ে যেসব কথা হচ্ছিলো গ্রামে তা নিয়ে আলোচনা করছিলো। বিপদ নিশ্চয়ই, তাহলেও অভিনবত্ব যেন বিপদটার প্রতি উৎসুক করেছে। কলাগাছের ভেলা বাঁধতে হবে, মাছ ধরবার জন্য একটা জালও চাই, যদিও সেটা হয়তো প্রলয়ের কালো জল।

সুরতুন গহরজান সান্দারের বাড়িতে গিয়েছিলো তার বুড়িবিবিকে অনুনয়-বিনয় করতে। বুড়ি রাজী হয়েছে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে ফতেমাকে সাহায্য করতে। ফতেমা আসন্নপ্রসবা।

বুধেডাঙার পথে কোথাও কোথাও একহাঁটু জল। মাথার উপরে জলভরা আকাশ। পদ্মার দিকে তাকিয়ে ভয় করে। দিগন্তের পরিধি অত্যন্ত সংকুচিত। দিনদুপুরে সন্ধ্যার পূর্বাবস্থা।

ঘরে আহার্য নেই, চাল বেয়ে হু-হু করে জল পড়ে। যেভাবে বৃষ্টির জল জমে যাচ্ছে তাদের বাড়ির উঠোনে হয়তো-বা বিকেল নাগাদ উঁচু ঘরটাতেও জল উঠবে। আর সেই ঘরে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে ফতেমা। বৃষ্টির জল এবার কেন সহসা এত বেশি হলো এ বলা শক্ত। এমন জল থাকলে গহরজানের বুড়ি বিবি কী করে আসবে? সুরতুনের নিজেরই চলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার কষ্টের চাইতে ফতেমার কষ্ট শতগুণ বেশি। ফতেমার মতো সাহসী এবং সহিষ্ণু মেয়ে ভয়ে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

তবে একটা কথা এই, ভাবলো সুরতুন, সব অগাধ জলে মানুষের বুদ্ধি থৈ পায় না। ফতেমার কী দোষ যদি সে নিজে ইচ্ছা করে এই কষ্টে জড়িয়ে পড়ে থাকে। সে নিজেও কী করে জড়িয়ে পড়লো এই সংসারে, তার উত্তর নেই। ইয়াজ, কোথাকার কে? সে এসে কাঁধ পেতে দিলো। আর যেন তার দেখাদেখি সুরতুন নিজেও এই সংসারের নৌকা ঠেলার জন্য কাদায় নেমে দাঁড়িয়েছে। লাভক্ষতির হিসাবে একে ব্যর্থশ্রম ছাড়া আর কী-ই বা বলা চলে?

ফতেমার কথাই বিচার করো। সব চাইতে শক্ত, সব চাইতে বুদ্ধিমান। কী করলো সে? জেবু অলীক ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো, আর ফতেমা জেনেশুনে এ কী ঘটালো? এমন হতে পারে নাকি জেবুন্নিসার ভয়ই তাকে এ-পথের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো? একটা কথা সুরতুন শত চেষ্টাতেও বুঝতে পারবে না—'ছাওয়াল-চাওয়া' কী করে ফতেমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলো। সে সন্তান চাইতো বলেই ফুলটুসির ছেলেদের নিয়ে আতিশয্য করতো কিংবা তাদের সঙ্গে নকল মায়ের অভিনয় করেই 'ছাওয়াল-চাওয়া' জেগে উঠেছিলো তার?

ফতেমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি বুদ্ধিহীনার মতো ব্যবহার করতে পারে তবে পৃথিবীতে বুদ্ধিমতী কথাটাই নিরর্থক। বুদ্ধিমতী হলে সে নিজে কী করতো? মাধাইকে নেয়া তার পক্ষে বুদ্ধিমতীর কাজ হতো এ-কথা শুধু ফতেমা বলে না, ইয়াজও একদিন বলেছিলো, এমনকী সে নিজেও ভেবে শিউরেছিল একদিন। মাঝখানের কয়েকটি দিন। তার দু পারে তার ও মাধাইয়ের জীবন পৃথকভাবে প্রবাহিত, বিস্তৃত। সে প্রবাহ কখনো কাছাকাছি এসেছে, কখনো দূরান্তরে সরে গেছে। শুধু সেই কয়েকটি দিনে জীবনের সম্মিলিত প্রবাহ কী অপূর্ব সব অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু ভাগ্যে তখন ফতেমার মতো কোনো বোকামি সে করে বসেনি, নতুবা আজ বিপন্নতার কোন গভীরতায় তাকে নামতে হতো কে জানে।

সুরতুনের মনে হলো তার পায়ে চলার ছপছপ শব্দ ছাপিয়ে ফতেমার বেদনার্ত কান্না ভেসে আসছে।

মাধাইয়ের শেষ খবর এনে দিয়েছে ইয়াজ। মাধাই এখন আর পথে বেরোয় না। আধা-মাইনার ছুটির পর এখন তার বিনি মাইনার ছুটি চলছে। তাও নাকি আর মাত্র দু মাস চলবে। তারপর? রেল কোম্পানির ঘর ছেড়ে দিয়ে চাঁদমালার ভাঁটিসিদ্ধ করার উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হবে। এসব কথা মাধাই-ই নাকি হাসিমুখে বলেছে। মাধাই নাকি একটা বাঁশি ফুঁকায় আর কাঁদে। সেটাই নাকি এখন তার একমাত্র কাজে দাঁড়িয়েছে। গাঁজা খায়। চাঁদমালা মদ নিয়েও আসে মাঝেমাঝে।

বর্ণনা করতে করতে দুটি বিষয়ের দিকে ইয়াজ সুরতুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। সানাইয়ের বাজনা শুনে প্রাণ কেমন করে, আর তার পায়ের নোংরা ন্যাকড়া বাঁধা-ঘায়ে মাছি ভনভন করে, সেদিকে চেয়ে ঘৃণায় গা শিউরে ওঠে।

শুনতে শুনতে সুরতুনের চোখের সম্মুখে চালের মোকামে দেখা একটি ভিক্ষুকের চেহারা ভেসে উঠেছিলো। দু পায়ের সব আঙুল খসে গেছে। নোংরা চট ও কাপড়ের ফালিতে পা দুখানা জড়িয়ে বাঁধা। প্ল্যাটফর্মে ঘষটে ঘষটে চলে বিকৃত হাত দুখানা তুলে আউ আঁউ করে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চায়।

একটা বিমূঢ়তায় সুরতুন শিউরে ওঠে।

যেন কোনো একটি গর্তে পা পড়েছিলো সুরতুনের। পড়ে যেতে যেতে সে সামলে নিলো বটে কিন্তু ব্যথাও পেলো। বিব্রত হয়ে সে ভাবলো—যে ছাওয়ালের বাপ নাই সে কি বাঁচে? ফতেমার কাছে যে আসছে সে কষ্ট পেতে এবং দিতে আসছে। 'কী বোকা, কী বোকা'।

বাড়িতে ফিরে উঠোনের একহাঁটু জল থেকে বড়ো ঘরটার বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে সুরতুন শুনতে পেলো ফতেমা কথা বলছে রজব আলির সঙ্গে।

'কেমন আছে ভাবি'? সে প্রশ্ন করলো।

'এখন একটুক ভালো'।

রজব আলি বললো 'কেরাসিন একটুক আনা লাগবি। আন্ধার হলে দুই'পরে'।

সুরো বললো, 'কও, এমন চেহারা হলে দিনের, ভাবিক বাচান্ যাবি'?

সুরতুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিলো। দিঘার যে বড়ো সড়কটা আজকাল প্রায় পরিত্যক্ত সহসা সুরতুনের মনে হলো তার উপরে হাট বসেছে। অবাক হয়ে সে দেখছিলো। অনেকটা সময় লক্ষ্য করে তার মনে হলো হাটটা যেন গতিশীল, সেটা এগিয়ে আসছে।

সুরতুন রজব আলিকে বললো, কিন্তু তার দৃষ্টিও সংকীর্ণ। সে দেখে কিছু ঠাহর করতে পারলো না।

ইয়াজ তার হাঁসগুলোকে খুঁজতে গিয়েছিলো, সে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো। বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করলো, 'বান, বান'।

'সে কী! কনে'?

'এখানে, ওখানে, সব জায়গায়'।

চিকন্দি থেকে সোজাসুজি দিঘা যাওয়ার সড়কটা সানিকদিয়ারের পাকা সাঁকোর উপর দিয়ে গিয়েছে। তার একটা শাখা ধরে চরণকাশি ও বুধেডাঙার পাশ দিয়ে দাদপুরের সীমানা ছুঁয়ে মনসার গ্রামে কাদোয়ায় যাওয়া যায়। এই সড়কটি পদ্মার বর্তমান খাতের সঙ্গে সমান্তরাল। রাস্তাটার যেদিকে বুধেডাঙা চরণকাশি প্রভৃতি, তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পদ্মা ও রাস্তাটার মধ্যবর্তী জায়গাটিতে দু-চারটি ছোটো ছোটো কিন্তু কৃষিসমৃদ্ধ গ্রাম আছে। এসব গ্রামে প্রতি বর্ষাতেই পদ্মার জল ঢুকে পড়ে। দুটি মাস কষ্টের, তারপর সেই জলই আশীর্বাদ বলে গণ্য হয়। চিকন্দি উঁচু। সে সড়ক চিকন্দিতে সাধারণ একটা পথ, বুধেডাঙার কাছে এসে সেটা গ্রামের চাইতে ক্রমশ উঁচু করে উঠেছে। তার কারণ সড়কের ক্রমোন্নতি নয়, গ্রামই নিচু। কিন্তু এসব মোটামুটি হিসাব থেকে বলা যায় না রাস্তার ওপারে লবচর, লুপপুর ডুবলে এদিকের বুধেডাঙা বা চরণকাশি বাঁচবে কিনা।

সুরতুন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলে কয়েকটি বিপন্ন চেহারার লোক সপরিবারে বুধেডাঙা

পার হয়ে চিকন্দির দিকে চলে গেলো। তাদের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ বুক চাপড়াচ্ছে আর কাঁদছে। দেখতে দেখতে ভিড়টা বাড়তে লাগলো। এই পথ ধরে যখন এত লোক আসছে, চরণকাশি আর মাধবপুরের মধ্যে দিয়ে দিঘা-সানিকদিয়ার-চিকন্দির পাকা সাঁকোর উপর দিয়ে যে-সড়ক তাতে না জানি কত লোক জমেছে।

ইয়াজ বেরিয়ে গিয়ে আসল খবরটা নিয়ে এলো। সড়কের আর পদ্মার মধ্যবর্তী জায়গাগুলিতে জল প্রতি ঘণ্টায় তিন-চার সুত করে বাড়ছে। তা বাড়ুক। চরণকাশির জোলায় পাকা সাঁকোর তলা দিয়ে হু-হু করে জল ঢুকছে, তা হোক। আসল খবর হচ্ছে, বাঁধটাই ফেটে গেছে। দিঘায় জল ঢুকছে। স্টেশনের উপরে ওঠেনি, বন্দরে একহাঁটু হয়েছে। আর ভয়ের কথা এই, এদিকে যেমন এক সুত দু সুত করে জল বাড়ছে তেমন নয়, কলকল করে সে জল ডাকছে, প্ল্যাটফর্মের গায়ে সে জল ছলাৎ ছলাৎ করে ধাক্কা দিচ্ছে।

বর্ণনা শেষ করে ইয়াজ বললো, 'ওই যে দেখছো, ওর মধ্যে দিঘা বন্দরের ভদ্দরলোকরাও আছে'।

'কিন্তুক দিঘা বন্দর শুনছি নবাবের হইছে'।

'কী কও? সে কথা জিগাইছিলাম। বন্দরের একজন কলে, নবাবি আর যেন্ রাজগি না কী কলে। তা সব সমান। খোদার গজব। রাজগির থিকে নাকি এই ঢল নামতিছে। সাম বণ্টক করে সে সব বাঁধ দিচ্ছিলো এখন সব কাটতিছে। গাং এক বহতা না হলি, এক জায়গা জমলি তালগাছও থৈ পাবি নে'।

'রহমান খোদা'! বললো রজব আলি।

'কী রহম দেখলা'? ইয়াজ ভিজে গা গরম করার জন্য তামাক সাজতে বসলো।

ঘরের মধ্যে ফতেমা এসব শুনতে পেলো কিনা সে জানে। তার অব্যক্ত বেদনার আর্তনাদ মাঝে মাঝে বাইরে এদের কানে আসতে লাগলো। গহরজানের বুড়িবিবি এখনো আসেনি।

সুরতুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বন্যার্ত নরনারীর সন্ত্রস্ত পলায়ন লক্ষ্য করতে লাগলো। যেন কথাটা আকস্মিকভাবেই তার মনে পড়লো এমনি ভঙ্গিতে সুরতুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'ইজু, দিঘার বন্দর ডুবলি র‍্যালের কোঅটর ডোবে'?

'তা হবি'।

'ইজু, তোমার মামু মাধাই সেখানে আছে। তার নড়াচড়ার খ্যামতা নাই'।

'তা নাই'।

সুরতুন একটা খুঁটি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিকেলের দিকে হঠাৎ সে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুতগতিতে হাঁটতে শুরু করলো, অবশেষে ছুটতে। পায়ে পায়ে জলের শব্দ হচ্ছে, জলে গতি আটকাচ্ছে।

পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে ইয়াজ যখন সুরতুনের কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন সুরতুন দিঘা সড়কের এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে পথটা ধসে গিয়েছে, এবং তার উপর দিয়ে একটা জলের স্রোত চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্রোতটার গভীরতা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সেটা অনেকখানি চওড়া এবং অত্যন্ত তীব্র। সুরতুনের সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। ছুটে চলতে গিয়ে পড়েও গিয়েছিলো সে। তার পরিধেয় বস্ত্রের দু-এক জায়গায় ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে।

সুরতুন অন্ধকারে কালো সেই জলস্রোতের মধ্যে নামার জন্য পা বাড়িয়েছে, তখন ইয়াজ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'থামো-থামো। ও জল কি পার হওয়া যায়'?

সুরতুন থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাধাই যে একা আছে'।

'তাহলেও তোমাক যাতে দিতে পারি না'।

কথা বলতে বলতে সুরতুন জলে নেমে পড়েছিলো। স্রোতে দাঁড়াতে পারছে না, তবু অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। ইয়াজ সুরতুনের চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছিলো। কথা বলার সময় সেটা

নয়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সুরতুনের কাছে গিয়ে শক্ত মুঠোয় তার দু হাত চেপে ধরে টানতে টানতে সড়কে ফিরিয়ে আনলো।

সুরতুন প্রথমে তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলো, তার পরে হিংস্র ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'যা চাও, তা তুমি পাবা না। আমাক ছুয়ো না কলাম। হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো'।

দু হাতে সুরতুনকে জাপটে ধরে সরিয়ে আনতে আনতে ইয়াজ বললো, 'আ ছি ছি। কও কী। শোনো, সুরো শোনো। এ পথে যাওয়া যাবি নে। দ্যাখো, চায়ে দ্যাখো জলের ওপারে এপারে লোক থ হয়ে দাঁড়ায়ে আছে। শোনো, সুরো, শোনো, দিঘায় ঘোরাপথে যাওয়া যায় না কি দ্যাখো'।

সুরতুন সম্বিৎ পেলো। কেঁদে কেঁদে বললো 'কেন, ইজু, এত লোক বাঁচে, মাধাই বাচলি কী দোষ'?

'দোষ কী। আসো যাই দেখি।

তিনদিন পরে সুরতুন আর ইয়াজ ফিরে এলো।

অনেক কায়িক শ্রম, ততোধিক সহিষ্ণু দৃঢ়তা অনেক বুদ্ধি ও ততোধিক সাহসের পরিচয় দিয়ে ইয়াজ মাধবপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। সে গ্রামেরও অধিকাংশ প্রায় একটি দিন জলমগ্ন ছিলো। মাধবপুরের পর আরও দুখানা বন্যামগ্ন গ্রাম পার হতে পারলে দিঘার রেলের রাস্তায় ওঠা যায়। কিন্তু সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে তাদের থেমে দাঁড়াতে হয়েছিলো। সন্ধ্যার ধূসর দিগন্ত পর্যন্ত জল, আকাশে যসয়বাসের বিকীর্ণ তেজের মতো মেঘের স্তর চোয়ানো একটা আলো। সেই অস্পষ্টতায় জলকে সজীব কোনো সুবাড়ব প্রাণীর মতো মনে হচ্ছিলো। সেই অকূল পাথারের ওপারে মাধাই, আর এপারে সে। চোরাদায় বসে পড়ে উচ্ছ্রিত জানুতে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে সুরতুন অবশেষে ইয়াজের ডাক শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া দরকার হয়েছিলো। পিছনে ফেরাও সম্ভব নয়। দিনের বেলায় যেখানে প্রাণ হাতে করে চলতে হয়েছিলো সেখানে জল নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে, রাত্রির অন্ধকারে সে পথে যেবার আশা বাতুলতা। এখনো হয়তো জল বাড়ছেই। মাধবপুর গ্রামটির সব চাইতে উঁচু জমি দিঘা চিকন্দি সড়কের এই অংশটুকু, সেইজন্যই হয়তো এখনো সেখানে পায়ের তলায় মাটি ছিলো। অধিকাংশ বাড়িই পরিত্যক্ত। দু-একটিমাত্র বাড়িতে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। তাতে বোঝা যায় অধিবাসীরা ঘর আঁকড়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরও জল বাড়লে খাঁচায় বন্ধ পাখির মতো ডুবে মরবে। ইয়াজের প্রাণও ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলো।

জল, কাদা, কোথাও বা ভিজে ভিজে বালির উপর দিয়ে সন্তর্পণে চলতে চলতে চরণকাশির জোলার ধারে এসে এইমাত্র সুরতুন ও ইয়াজ থমকে দাঁড়ালো। যেখানে জোলা ছিলো, মাধবপুর যাওয়ার সময়ে যে জোলা সাঁতার দিয়ে পার হতে হতে ইয়াজের আশঙ্কা হয়েছিলো স্রোত ঠেলে সুরতুন হয়তো ওপারে যেতে পারবে না, সেই জোলায় এক ফোঁটা জল নেই। কোথাও পলি, কোথাও বালিতে বুঁজে গেছে সেটা। সেখানে দাঁড়িয়ে বুধেডাঙা চোখে পড়লো। কালো কাদার একটি বিক্ষুব্ধ পাথার।

তার মধ্যে মধ্যে কাত হয়ে পড়া কুটিরগুলো, হেলে পড়া কাদামাখা গাছ।

তিনরাত দুদিনের মধ্যে একবারই মাত্র খেয়েছে তারা, একরাতই ঘুমিয়েছে। একটি অপরিসীম ক্লান্তিতে চরাচর আচ্ছন্ন। শুধু চোখে মুখে ছাপ পড়া নয়, সুরতুনের গলার স্বরও বসে গেছে, কথা বলতে গেলে অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে মাত্র। কিছুই মনে পড়ছে না তার, শেষ পর্যন্ত কীভাবে কোথায় তারা আশ্রয় পেয়েছিলো। আশ্রয়টা বোধহয় খুব উঁচু একটা কিছু ছিলো। হয়তো তা কোনো গৃহস্থের পোয়ালের পুঞ্জ, ইয়াজ তাকে সেখানে টেনে ও তে হাঁপাচ্ছিলো। আর হঠাৎ যখন গুমগুম শব্দ হতে হতে আকাশ থেকে আবার বৃষ্টি নামলো ইয়াজ পাশে পাঁজা খড় এনে নিজেকে এবং তাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিলো।

বুধেডাঙার দিকে তাকিয়ে তার ফতেমার কথাই প্রথম মনে পড়লো। তার শরীরের সেই অবস্থায় বন্যার আকস্মিক আক্রমণে সে বেঁচেছে এ আশা করা অযৌক্তিক।

আর মাধাই? মাধাই যদি চাঁদমালার সাহায্যে প্রাণরক্ষা করতেও পেরে থাকে, এখন সুরতুনের মনে হচ্ছে সে বাঁচাটাই নিরর্থক হয়েছে। এই পৃথিবীতে কারো পক্ষেই বাঁচাটা লাভজনক নয়।

ক্লান্তিতে সে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যখন অন্তরে ক্ষোভ বা দুঃখ বলতে আর কিছু নেই। নিজেকেও যেন শরীরের বাইরে অন্য আর একটি শরীর বলে মনে হচ্ছে।

এখন সকাল হচ্ছে—এই অনুভবটা আবার হলো তার। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাদের একটা গন্তব্য স্থান ছিলো, এখানে এসে সেটা মিলিয়ে গেছে। এখন সবকিছুই পদ্মা। আকাশে দ্যাখো, সেখানে পদ্মা প্রতিফলিত শাদা শাদা বালির পাড়ের মতো মেঘগুলিকে ঢেকে ঢেকে দিয়ে ধোঁয়াটে কালো মেঘের প্রবাহ।

আর জীবন কী? সেটাও যেন পদ্মার মতো একটা কিছু। সে না থাকলে কিছুই থাকে না, থেকেও শুধু ভয় আর বেদনা। দিনের আলোয় আলোর চাইতেও প্রখর হয়ে জ্বলে, ঝড়ের সন্ধ্যায় মুখ কালো করে সে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে কোথায়-বা বাঁধ কাটবে। এই জীবন কখন কার কোন প্রতিরোধ ধসিয়ে দিয়ে আবর্তের মধ্যে টেনে নেবে এ কেউ বলতে পারে না। কী সার্থকতা এই নাকানি-চোবানি খাওয়ার?

সুরতুনের অবাক লাগলো ভাবতে, এত ঠকেও মানুষের শিক্ষা হয় না। তখন কিছুক্ষণের জন্য বর্ষণ থেমেছে। ভিজে খড়গুলো সরিয়ে কিছু নতুন খড় এনে ইয়াজ নিজেকে এবং সুরতুনকে আবৃত করে নিতে পেরেছিলো।

ইয়াজ বলেছিলো, 'কেন্, সুরো, আমরা কি বাঁচবো না'?

'বাঁচে কী হয়'?

চিন্তা করার মতো অবসর নিয়ে ইয়াজ বলেছিলো, 'কেন্, আমি চাষ-আবাদ করে তোমাকে খাওয়াবের পারি না'?

কিন্তু এর চাইতেও চূড়ান্ত বিস্ময়ের কিছু আছে। সুরতুনের এই শরীরের ভিতর থেকে এক অচেনা শরীর যেন আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তার বোকামিগুলি যখন ইয়াজের ক্ষেপা কামনার উত্তর হয়ে উঠতে লাগলো, ক্লান্ত আবেগের করুণা নিয়ে তার মন তখনো মাধাইয়ের কথাই ভাবছে। কিন্তু মাধাইয়ের বেদনায় ব্যথাতুর মন নিয়েও তার সেই নতুন শরীরকে খানিকটা স্নেহ না দিয়ে পারেনি সে। এখনো সেজন্য বিষণ্ণ নয়।

আকাশে থেকে থেকে মেঘ ডাকছে। পদ্মা মুখ কালো করে আছে।

ইয়াজ বললো, 'ওঠো, সুরো, চরণকাশির বড়ো সেখের বাড়িত কিছু খাবের পাওয়া যায় কিনা দেখি'।

সুরো বললো, 'তা যেন দেখবা, সে কোন দ্যাশ? দ্যাশ না ভাগ হইছে? আমরা না মোছলমান'?

ইয়াজ বললো, 'হয়! সুরো সান্দারনি এক মোছলমান, আমুও আর এক হেঁদু। ফতেমাকে আম্মা কতাম, বাপ কেডা জানি নে। এই না চরণকাশি'।

সুরতুন কাদামাটিতে আধশোয়া ভঙ্গিতে পা ছড়িয়ে বসে ছিলো। তাদের কিছুদূরে একটা ছোট বেতের কুনকে কাদায় আধডোবা। কোনো গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভেসে এসে থাকবে। কী করে তার তলায় কয়েকটা কলাই আটকে ছিলো। ঘোরের মধ্যে সুরতুন দেখলো সরু শাদা শাদা কিছু সেখানে, কীট যেন, কল যেন। তার ভয় ভয় করলো।

ইয়াজ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। দূরে চিকন্দির সান্যালবাড়ির উল্টানো পিরিচের মতো চূড়াটা চোখে পড়লো। সে বললো, 'দ্যাখো'।

সুরতুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

সুরতুন দেখতে পেলো কে একজন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। খুব ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে

জোলার ধার দিয়ে সে আসছে। একবুক শাদা শাড়ি, একটা অত্যন্ত লম্বা জামায় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। লোকটি এক-একবার থেমে হাতের লাঠিটা বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে তারপর সেটাকে তুলে লাঠির ডগাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কী একটা পরীক্ষা করলো। এ প্রক্রিয়াটি সে অনেকবারই করছে।

ইয়াজ বললো, 'চরণকাশির বড়ো ভাই আলেফ সেখ না? হয়, তাই। ওই যে, সুরো, যার ছাওয়াল কাজিয়ায় মারা গেলো'।

'আহা-হা, পাগল হইছে'?

'না, মনে কয়। চাষ দেওয়ার কথা ভাবে। বালির কত নিচে মাটি তাও বোধায় দ্যাখে'।

সুরতুন তখন চিন্তা করছে ফতেমার হয়তো মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে নিজে রক্ষা পেলো তার কারণ এই ছেলেমানুষ ইয়াজ ফতেমাকে সাহায্য না দিয়ে তাকে সাহচর্য দিয়েছে। শহরের হাল্কা সুখের জীবন ছেড়ে বুধেডাঙার মাটিতে বসে কপাল চাপড়ানো যেমন ইয়াজের খেয়াল, এটাও যেন তেমনি কিছু। নতুবা ফতেমাকে ইয়াজ শুধু মুখে 'আম্মা' বলে ডাকতো না, গভীরভাবে ভালোবাসত তাকে। আপন বোনের চাইতে, দিদির চাইতে কম নয়।

ইয়াজ বললো, 'লোকে কয়, মজিদে আল্লার সাথে কথা কয়। কয়, আল্লা, জমি দিবার হয় দিও, না দেও সেও আচ্ছা। আমাক আর জমির পিছে ছোটায়ো না। আমি অথব্ব। হিঁদুর জমি ধরি নাই। কবা, জমির লোভ খারাপ। কিন্তুক, খোদা রহমান, আমার ছাওয়াল কী লোভ করছিলো? এই কয়ে খুব কাঁদে। তার বাদে চোখ মুছে কয়, তোমাক কলাম তা কাউকে কয়ো না। তা হোক, সুরো, ওঠো আমার কাপড়ের থিকে আর কিছু ছিঁড়ে দিতেছি, বুকে-পিঠে জড়ায়ে নাও। বড়ো সেখ তার পাকামজিদের দিকে যাতেছে। মন কয়, সেখানে আরো লোকজন আছে। কিছু খাবের পাওয়া যাতি পারে'।

বন্যা থেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার আবার পাশ ফিরলো কিনা—এটা তার প্রসাদ কিংবা রোষ।

থেকে থেকে পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে তখনো, ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক। উপরে ড ড ড করে মেঘ ডাকছে। পুরাণটা যদি জানা থাকে হয়তো কারো মনে হতে পারে, কেউ যেন অন্য কাউকে বলছে : দয়া করো, দয়া করো।

প্রমীলার বিয়ে

প্রমীলার বিয়ে হয়েছে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে, সেদিন বৈশাখী নির্মেঘ আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিলো।

প্রমীলা ধনীর মেয়ে, কলেজে পড়েছে; গায়ের রঙ দুধে-আলতা নয়, নাক বা চোখ নয় বলবার মতো বিশিষ্ট কিছু, তবু তাকে অরূপা বললে মিথ্যা বলা হয়। এসত্ত্বেও তার বন্ধুদের চোখে বিয়েটা নেহাত ভালভাবের মতো হয়েছে। দুপক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা হয়েছে অন্তত দু-পাঁচ মাস, তবে সে আলাপের মধ্যে প্রমীলা কিম্বা তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গো-বেচারা ভদ্রলোকটির কোনো অংশ ছিলো না।

কয়েকদিন আগে এক রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারেনি, সেদিন ফুলের বাসর ছিলো। সব মেয়ের মতো তার স্নায়ুগুলি উঁচু পর্দায় চড়ানো সেতারের মতো ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়েছিলো। তার উপরে ছিলো ফুলের গন্ধ আর বৈশাখী গরম। মাখন নামে এ-বাড়ির যে ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে নিমন্ত্রিতরা বিদায় নিলে অনেক রাত্রিতে সে ঘরের দরজায় এসে প্রমীলাকে দেখে থেমে দাঁড়ালো। এতক্ষণ এই উৎসব আয়োজনের অন্যতম জোগানদার হিসাবে তার অংশ মতো সে কাজ করে যাচ্ছিলো, এবার সে ব্যাপারটির নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারলো বোধ হয়। এতক্ষণ সে চিন্তা করেনি, বস্তুত ও জিনিসটা তার চিরদিনই কম। এ-বাড়ির অলিখিত প্রথা অনুসারে যে কোনো কাজে যেমন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস থাকে এ-ব্যাপারটিতে তার টোপর পরে বসাকেও তেমনি সহজ করে সে নিয়েছিলো। ঘরের দরজায় এসে সজ্জিত পালঙ্ক ও লজ্জিতা বধূকে দেখে লজ্জায় সে বোকা বনে গেলো।

যেন কিছু দরকার এটা অনুভব করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—'এই বউদি, শোনো, শোনো, তোয়ালেটা কোথায়? হাত পুঁছতে হবে'।

উঠানের ছত্রাকারে ছড়ানো এঁটোপাতার পাশ দিয়ে, বারান্দায় ঝুলানো লাল হয়ে আসা ডে-লাইটের তলা ঘেঁষে হলুদ-মশলা-মাখা শাড়িপরা মেয়েটি দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেলো রান্নাঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে।

মাখন পুনরপি বললে—'ও বউদি, শোনো, শোনো, এক গ্লাস জল'। প্রত্যুত্তরে ঝনাৎ করে কোণের ঘরটির দরজা বন্ধ হয়ে গেলো এবং বন্ধ দরজার পিছন থেকে খিলখিল করে অজস্র হাসি উপচে পড়লো।

উৎসবের রাত্রিতে এত তাড়াতাড়ি (মাখন নতুন—পাওয়া ঘড়িতে দেখলে রাত একটা বাজে) এমন আরামপ্রদ নিস্তব্ধতা আনতে তার পিছনে পরিকল্পনা থাকা দরকার; এ রকম একটা বোধ হলো মাখনের—ষড়যন্ত্রটা বউদির। কিছু করবার ছিলো না। আত্মীয়স্বজনে ঠাসা ঘরগুলির সব কটির দরজা বন্ধ। রান্নাঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। উঠানের মাটির গ্লাসগুলি মেজে তো জল খাওয়া যায় না যেন সেইজন্যেই মাখন কলতলার দিকে রওনা দিলো।

মাখন যখন ফিরে এলো তখন তার সারা গা ভিজে, চুল দিয়ে ফোঁটাফোঁটা জল ঝরছে। ঘরে এসে আবার সে ফিরে যাচ্ছিলো—'ঐ যা, জল খেয়ে এলাম না'।

তখন প্রমীলা উঠলো। অন্য কেউ এবং আর কোনোসময় হলে সে বলতো কি বোকা, কি নার্ভাস; কিন্তু সে নিজেও তখন কী করা উচিত এবং কী বলা উচিত , বুঝতে পারছিলো না, কাজেই মাখনের

কাজ ও কথার সমালোচনা করতে পারলো না মনে মনেও; বললে—'জল ঘরে আছে, তোয়ালেও আছে; দেবো'?

—'তাহলে তো ভালোই হয়'।

প্রমীলা তোয়ালে দিয়েছিলো, জল গড়িয়ে দিয়েছিলো।

কিছুক্ষণ পরে মাখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আর প্রমীলা জেগেছিলো। রজনীগন্ধার প্রথম ফলন এত কোথা থেকে সংগ্রহ হলো এই ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে যখন তার চোখ বুজে এসেছে খিলখিল হাসির শব্দে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে প্রমীলা বেরিয়ে এসেছিলো।

কালও প্রমীলার ভালো ঘুম হয়নি। কলেজে-পড়া মেয়ে হলেও প্রমীলা রাত জেগে কোনোদিন পড়া করেনি। কাজেই কোনো রাত্রিতে ঘুম না-হলে তার কাছে সে রাত্রিটা বিশিষ্ট হয়ে থাকে অনেকদিন মনে রাখবার মতো। ফুলের গন্ধ নয়, মাখনের সান্নিধ্যের জন্যও নয়, ভাবতে ভাবতে ঘুম হলো না। ফুলশয্যার পরের দিন সকালের ব্যাপারগুলিতে এই ঘুম না-হওয়ার অঙ্কুর ছিলো। প্রমীলার মনে আছে সব। সেই কথাই বলছি।

যার খিলখিল করে উপচে পড়া হাসিতে তার ঘুম ভেঙেছিলো তাকে অবলম্বন করেই দিনের আলোয় সে এ-বাড়ির প্রাঙ্গণে পা বাড়ালো। গত রাত্রিতে হলুদ ও মশলামাখা যে-শাড়িখানা পরে এ বউটি সব কাজে হাত মিশিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো আজ সে-খানা পরনে নেই বটে, মুখের একপাশে নাকের কোণে হলুদের দাগ এখনো লেগে আছে। তার পিছন-পিছন কলতলার লাগোয়া ঘরখানি, সে আন্দাজেই ঠিক করে নিলো সেটা রান্নাঘর। কয়েকটি শিশুর হাসি কান্না ও খাওয়ার কথা শুনতে শুনতে তার মনে হলো: উনুনের পাশে বর্ষীয়সী একজন দুধ জ্বাল দিতে বসেছেন, শিশু ক'টি তাঁকে ঘিরে ছোটো ছোটো পিঁড়িতে ছোটো ছোটো বাটি হাতে কোলাহল করছে। প্রমীলা শিশুদের ভালোবাসে, এ-বাড়িতে সে যেন দ্বিতীয় অবলম্বন খুঁজে পেলো।

গায়ে জল ঢালতে ঢালতে প্রমীলা বুঝলো—রান্নাঘরে কিশোর বয়স্ক কারা এসে ঢুকলো দু তিনজন। কিশোরদের সে শিশুদের চাইতেও ভালোবাসে। এরা যদি তার দেওর হয় তবে খুব ভালো হবে। প্রমীলার ভালো লাগতে লাগলো সকালবেলাটা। ওরা কী নিয়ে খুব হৈ-চৈ করে আলাপ করেছে। প্রমীলা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

একজন বললে—'আসবে না কে বলেছে'?

ছোটো একজন উত্তর করলে—'চিঠি লিখেছে'।

'তা লিখুক। অমন কড়া কথা ও লেখে, শেষ পর্যন্ত কড়া হয়ে থাকতে পারে না কোনোদিন। আসবে দেখে নিস'।

—'আমার বিশ্বাস হয় না'।

—'তবে তুই থাক, যাসনে। আমি স্টেশনে চললাম। কই চা হয়েছে নাকি দাও'।

ভারি মিষ্টি এদের গলা। প্রমীলার নিজের ছোটোভাইদের মতো তরল খুশিতে ভরা। কাপড় পালটাতে পালটাতে প্রমীলা ওদের কথার দিকে কান পেতে রইলো'।

ওরা বোধহয় চা পেয়েছে। কে একজন বর্ষীয়সী বললেন 'অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছিস কেন'?

প্রথম কিশোর বললে—'বাহ্! সতেরো মিনিট বাকি আছে ট্রেন আসতে, যেতে অন্তত পনেরো মিনিট তো লাগবে'।

দ্বিতীয় কিশোরটি বললে—'রোজ বলি দুধটা আগে জ্বাল দিতে, তা নয় আগে চা করবে'।

বর্ষীয়সী বললেন—'দুধ তো দিয়েছি তোকে'।

—'দিয়েছো তো। এত গরম খাওয়া যায়'?

প্রথম কিশোর বললে—'তাড়াতাড়ি করছিস কেন? তুই তো স্টেশনে যাবি না'।

—'যাবো না কেন, শুনি'।

—'তুই তো বললি আসবে না'।

প্রমীলা হেসে ফেললো ওদেব কথা শুনে। হাসি মুখে চোখ তুলে সে দেখলো ঝরোকার ওপাশে দাঁড়িয়ে সেই বউটি আকাশেব দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ভাব বোঝা গেলো না, মনে হলো সেও শুনছে ওদেব কথা, দৃষ্টিতে যেন দুঃখ মিশানো আছে, তবে ওটা তাব স্বাভাবিকও হতে পাবে।

আর একটি কণ্ঠস্বব শোনা গেলো রান্নাঘরে, প্রমীলাব বুকেব গোড়াটা টলমল কবে উঠলো। মাখন বললে—'পিবিচখানা দাও'।

—'তোবও তাড়াতাড়ি নাকি'?

—'তাড়াতাড়ি আবাব কোথায় দেখলে'?

—'তবে ভালো হয়ে বোস, হালুয়াটা নামাই। কাল বাত্রিতে খাসনি কিছু'।

—'ঘুবে এসে খাবো'।

—'তোদেব সবই অদ্ভুত। স্টেশনে যাবি বুঝি'?

নিস্পৃহ হবার ভান কবে মাখন বললে—'যাই একবাব। আসেই যদি, ভাববে বিয়ে কবে মাখনটা বোকা হয়েছে'।

ধুপ-ধুপ করে দুটো শব্দ হলো। প্রমীলা বুঝলো কিশোব দুটি তপ্ত চা ও দুধ কোনোবকমে গিলে চৌকাঠ থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠানে পড়ে স্টেশনের দিকে ছুটলো। পিবিচে কবে চা জুড়িয়ে খেয়ে মাখনও বেবিয়ে গেলো। কোনো এক বিলেতি গল্পে প্রমীলা পড়েছিলো খুশি হওয়াটা বাইবেব জিনিসেব উপর নির্ভর কবে না, খুশি হওয়া মনের একটা ক্ষমতা। প্রমীলাব মনে হলো এবা সকলেই খুশি হতে পাবে সামান্যকে অবলম্বন ক'বে। ভালো লাগলো প্রমীলার।

নতুন জায়গায় গেলে, নতুন কাজ হাতে নিলে মানুষ নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাশা কবে। বিয়েটাব চাইতে নতুন কিছু নেই—বিয়ের আগেব জীবন থেকে মেয়েরা শিকড়সুদ্ধ উঠে আসে যেন নতুন জমিতে, কাজেই নতুন আবহাওয়ায় তার বাধো-বাধো ঠেকলেও নতুনত্বটুকুকে সে প্রতীক্ষা করে। অভিনবত্বগুলি প্রথম শীতের আমেজের মতো শিবশিরে সোহাগে ভরে ওঠে।

স্নান সেরে শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম কবে প্রমীলা ঘরে ফিরে এলো তাব গাইডস্বরূপ বউটিব সঙ্গে। কিছুক্ষণ পবে বউটি এলো, হাতে একবাটি তপ্ত দুধ। প্রমীলাকে বললে—'খাও'।

চায়ের জন্য প্রমীলার মন টলছিলো, কিন্তু আজ সে-কথাটা বলতে তাব সঙ্কোচ হলো, বললে—'দুধ আমি খাইনে'।

—'চা খাও বুঝি? আচ্ছা নিয়ে আসি। দুধটুকু খেয়ে নাও'।

প্রমীলা জীবনে যা করেনি, হাসিমুখে তা করলে: মুখে দুধের স্বাদ পাচ্ছিলো কিনা বোঝা গেলো না, তাব মুখ দেখে বোঝা গেলো কৌতুক ও কৌতূহলের স্বাদ পাচ্ছে।

দুধের বাটি নামিয়ে রেখে প্রমীলা মুখ তুলে দেখলে বউটি হাসছে। খুশি হয়ে প্রমীলা বললে—'তোমরাও সবাই খাও, অনিচ্ছাতেও খাও'?

বউটি বললে—'ঠিক ধরতে পেরেছো, এখন অভ্যাস হয়ে এসেছে'।

প্রমীলা বিয়ের আগের দিনও কল্পনা করতে পাবেনি আহার বিষয়টিতে তার মতো মেয়ের রুচির উপরে আর কারো ছায়া পড়তে পাবে, কিন্তু আজ ছায়া পড়লো। বিয়ের আগে প্রমীলা হয়তো কঠিন নিঃশব্দ হাসির আড়ালে সরে যেতো, আজ এই চাপিয়ে দেওয়া অন্যের রুচি সে যেন উপভোগ করলো। সে এ-বাড়ির একজন হয়ে গেছে নতুবা হুকুমটি তাব উপরে চলবে কেন? প্রমীলার ভালো লাগলো, একটু শ্রদ্ধা হলো যেন হুকুম দেবার মতো লোকটিব উপর। বললে—'থাকগে, চা আর খাবো না'।

একটুপরে প্রমীলা বললে—'কে আসবে আজ'?

কথাটা বলতে সে কুণ্ঠা বোধ করলো কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে, গ্রামের মেয়ের মতো সরল ও সঙ্কুচিতা এ-বউটিকে প্রশ্ন না-করলে কিছুর সঙ্গেই সে পরিচয় করিয়ে দেবে না। সব বলাও যায় একে।

'ওরা অমনি করে। কে আসবে কে জানে'!

প্রমীলার মনে হলো শুনে বউটি যেন উদাসীন প্রকৃতির। তার বলতে ইচ্ছা হলো, শুধু ছেলেমানুষরাই তো নয়, মাখনও যখন এতটা উৎসাহ নিয়ে স্টেশনে গেলো, তখন যে আসবে সে অন্তত প্রিয়জন তো বটে।

প্রমীলার কৌতূহল বেড়ে রইলো আগন্তুকটির সম্বন্ধে।

শ্বশুর খেতে বসেছেন, প্রমীলা তার গাইডের পিছনে রান্নাঘরে গিয়ে বসলো। ঘোমটার আড়াল থেকে প্রমীলা এবার শ্বশুরকে দেখতে পেলো। গম্ভীর প্রকাণ্ড চেহারা, যেমন মর্যাদাবান লোকের হয়ে থাকে, সম্ভ্রম আকৃষ্ট করার মতো দৃষ্টি। প্রমীলার প্রগলভতাটুকু সম্ভ্রমে গুটিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কথার সুরে প্রমীলার মনে হলো বাবাকে যেমন আবদার করে কথা বলা যায়, তেমনি বলা যাবে এঁকে। প্রমীলাব বোধ হলো সার্থক বিয়ে হয়েছে তার।

শ্বশুর বললেন—'এমন দিনেও পরিষ্কার শাড়ি পাওনি মা'?

প্রমীলার গাইড তার আধময়লা মোটা শাড়িটা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লো।

শ্বশুর আবার বললেন—'তুমি যদি এমন করে থাকো তোমার ছোটজায়েরা ভাববে বউদের বড়ো কষ্ট এ-বাড়িতে'।

গাইড খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো—'তা যদি হয় বাবা, আমি এখনই শাড়ি পাল্টে আসছি'।

শ্বশুর বললেন—'তা তুমি পরো যা ইচ্ছা হয়। শাশুড়ির কাছে থেকে হলুদ মাখার একটিনি করছে বড়োগিন্নি একদিন হবে বলে, তাই বলে কিন্তু ছোটো জায়েদের শিখিও না'।

প্রমীলাব দিকে ফিরে বললেন—'এটি আমার বড়ো মা। ওর বাপ-মা ওকে পুতুলের জ্বর হলে মাথায় জলপটি দিতে শিখিয়েছে আরো খিলখিল করে হাসতে। সংসারী হতে ও পারবে না। এখনো ঝোলের কড়ায় আঁচল পড়ে যায় খুলে, রাঁধতে বসলে কড়ার কালি কপাল অবধি লেগে যায়'।

গাইড হাসি মুখে বললে—'কপালে লাগেনি, বাবা'।

প্রমীলা মনে-মনে বললে, নাকে যে লাগে তা আমি নিজেও দেখছি।

শ্বশুরের খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে, পায়ের শব্দ করতে করতে কিশোর দুটি ফিরে এলো। রোদে মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি তোরা'? শাশুড়ি বললেন, 'গাড়ি তো কোন সকালে চলে গেছে'।

—'দ্যাখো না, গাড়ি চলে গেলো, আমি বললাম আসবে না। ছোড়দা বললে, পরের গাড়িটা দেখে যাই, যদি কিছু কেনাকাটা করতে গিয়ে এটা ধরতে না-পেরে থাকে'।

ছোড়দা বললে—'তোকে তো আমি থাকতে বলিনি, চলে এলেই পারতিস'।

—'রোদ মাথায় করে কারোই বসে থাকবার দরকার ছিলো না। সে তো লিখেছেই আসবে না' —শাশুড়ি বললেন।

—'বাহ্! বাবা যে বললেন আসতে পারে'—একজন কিশোর প্রতিবাদ করলো। 'সত্যি আসবে না কে ভাবতে পেরেছিলো, শ্বশুর বললেন—'আসা উচিত ছিলো'।

'হয়তো ছুটি পায়নি'।

শ্বশুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'ছুটি সে পেতো, আমাকে কষ্ট দেবার জন্যই আসেনি'।

ব্যাপারটিতে সকলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, শ্বশুর আহার সম্পূর্ণ না-করেই উঠে গেলেন। পাতের দিকে চোখ পড়তে প্রমীলার মন বিষণ্ণ হয়ে গেলো। কে এই লোকটি যার আসবার কথা নিয়ে

এরা সমারোহ করছে, জানবার জন্য তার কৌতূহল হলো। ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো—কথা বলতে গিয়ে শ্বশুরের ঠোঁটের প্রান্তদুটি বারকয়েক কেঁপে উঠেছিলো।

সকলের আহারাদি শেষ হলে বাড়ি যখন দুপুরের জন্য নিঃশব্দ হলো তখন প্রমীলা ভাবলো এবার তার বড়োজা আসবে, কিন্তু সে যখন এলো না তখন প্রমীলা আশা করেছিলো মাখন হয়তো আসবে। তার ছোটো ছোটো দেওররাও কেউ এলো না। সে ভাবলো যে লোকটির আসবার জন্য এরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলো সে না-আসাতেই এরা মুষড়ে পড়েছে। নতুবা যার ফুলশয্যা হয়েছে কাল, এমন একটি বউকে একা এমন সময় কাটাতে হয় না।

অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে প্রমীলা দেখলে তার ঘরটির ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাখন তার বড়োজার সঙ্গে আলাপ করছে।

মাখন বললে—'তুমি যাও বরং, মাকে থামতে বলো'।

—'আমার কথা কি শুনবেন? বরং প্রমীলাকে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা অন্যমনস্ক হতে পারতেন'।

—'ওসবের মধ্যে বাইরের লোককে নিয়ে কী হবে'? মাখন মুখ কাঁচমাচু করে বললো।

মাখনের বলবার ধরনে প্রমীলার হাসি পেলো, কিন্তু বড়োজার সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ির কাছে যেতেও তার ইচ্ছা হলো। বুদ্ধিমতী প্রমীলা ধারণা করতে পেরেছে বিষয়টিতে নাটকীয় কিছু না থাকলেও তার শ্বশুর শাশুড়ির দুঃখ বা অভিমানটুকু সাধারণ ঘটনার চাইতে গভীর। তার নিজের বাড়িতে এমন কিছু হলে সে ই অনেকদিন গুমোট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রমীলার মনে হতে লাগলো, ভালো গানের মাঝখানে কে কথা কয়ে উঠেছে।

নিভৃত রাতের অন্তরে দুজনের কাছে নতুন পাওয়া দুজন ছাড়া আরো কিছু থাকে না তবু অন্য কথাই মনে হতে লাগলো প্রমীলার। মাখনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হলো কোথায় কী গোলমাল হয়েছে, কেন সুর কেটে গেলো। একটু উসখুস করে সে নিজে থেকে মাখনের দিকে ফিরলো। মাখন মশারির ছাদের দিকে অন্ধকারে চেয়ে আছে হয়তো ভাবছে। প্রমীলা বললে—'আজ কার আসবার কথা ছিলো, দাদার'?

—'হ্যাঁ। তুমি ঘুমাওনি? ছুটি পায়নি তাই আসতে পারেনি মনে হচ্ছে'।

প্রমীলার আর সাহস হলো না একটা সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো , এদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এখনই তার কথা বলাটা সমীচীন কিনা বুঝে উঠতে পারলো না।

মাখনও চুপ করে রইলো। গত রাত্রিতে মাখন একবার প্রশ্ন করেছিলো—'তোমার নাম পূর্ণিমা না হয়ে প্রমীলা হলো কেন'? আজ সারাদিন অন্য কথার মাঝে মাঝে প্রমীলা একটা ছোটো মিষ্টি উত্তর ভেবে রেখেছিলো। কেউ প্রশ্ন করলো না, কেউ উত্তর দিলো না।

কিন্তু জানতে প্রমীলা পারলো। ছোট দেওরের কাছ থেকে নানা কথার ছলে পরের দিন দুপুরে সে আদায় করলো খবরটা। সে বিস্মিত হয়ে শুনলো ঘটনাটা তাকে ও তার বিয়ে নিয়ে। তার সঙ্গে মাখনের বিয়ে হয়েছে বলেই এ-বাড়িতে আসেনি তাদের বড়দা।

প্রমীলার বাবা কনট্রাক্টর। টাকা তাঁর যথেষ্ট, বহুদিন থেকে, যুদ্ধের বাজারে অনেক বেড়েছে তা। পাকা ব্যবসাদার তিনি। সব কনট্রাক্টরদের মতোই তিনি যুদ্ধের বাজারে কিছু কিছু ভেজাল চালিয়েছেন বৈকি, কিন্তু ব্যবসায় ওতো আছেই। আরো ব্যবসায় মিথ্যাও থাকে। দোকানদার যদি বলে—চার পয়সায় কিনেছি ছ পয়সায় ছেড়ে দু-পয়সা লাভ করবো তাতে সত্যভাষণ হয়, দোকানও উঠে যায়। এ বাড়ির বড়োছেলেটি ব্যবসাদারদের, না ঘৃণা করে না, পৃথক স্তরের মানুষ মনে করে। তাদের বর্জন করতে হবে এমন কথা নেই, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে এমন কথাও নেই। রাজবংশীয় অভিজাত পুরুষ জনসাধারণের একজনকে অসম্মান করে না, তার আভিজাত্যই তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যত পরিচয়ই হোক ঐ সাধারণ লোকটির সঙ্গে সখ্য হতে পারে না বা আত্মীয়তা, রুচি এবং অনুশীলনের দুস্তর ব্যবধান থাকবেই। এ-বাড়ির সঙ্গে কোনো ব্যবসাদার স্ববর্ণ হতে পারে না। প্রমীলার যেন অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে।

এ-বাড়ির বধূ হয়ে এসে সে যেন এদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করেছে! ব্যবসাদারের ছলপ্রবণ মন যেন-বা এ-বাড়ির বিশুদ্ধতায় কালিমাখা হাত রেখেছে। প্রমীলার বাবা শুনলে বলতেন—ছেলেমানুষি, আরো একটু বয়েস হোক।

অন্য কোনো উপলক্ষে এসব শুনলে প্রমীলা ব্যাপারটার ভুল খুঁজে দেখবার এবং তা নিয়ে আলোচনা করার মতো সহিষ্ণু হওয়ার চেষ্টা করতো।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম পালা এটা, করুণাহীন জীবনযুদ্ধে মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটছে অর্থ ও ক্ষমতার লক্ষ্যে। এরা কি অশরীরী, গত যুগের স্বপ্নমাত্র? স্বপ্নের মানুষের অকলঙ্ক মন যেন এদের, শুনে রেখেছে পবিত্রতা ভালো, সত্য ভালো, জীবনে সেই শুভ্র অকলঙ্কতা ফুটিয়ে রাখতে চায়।

যে অস্পৃশ্য নয় তাকে অস্পৃশ্য বললে সে অভিমান করে না, অপমানও বোধ করে না যদি তার স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে। প্রমীলা জানে তার পিতৃবংশের সবাই ব্যবসা করেন কিন্তু তাই বলে তারা মানুষ হিসাবে অশ্রদ্ধেয় নয়।

কিন্তু বিষয়টিকে লঘু করে দেখবার জোরও সে পেলো না। লোকটি বুদ্ধিহীন নয়, ক্ষেপাও নয়, নতুবা এ-বাড়ির এতগুলি লোক তার মতামত নিয়ে এমনতরো মাথা ঘামাতো না। মাখন অন্তত হেসে উড়িয়ে দিতে পারতো। কিছুক্ষণের জন্য প্রমীলার যেন সাধ হলো এদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটিকে দেখতে। সত্যি যদি হয় এদের এই বস্তুনিরপেক্ষ মানবিক পবিত্রতা, তাহলেও তার শক্তি কতটুকু? বিশ্বজগতের জনারণ্যের কোথায় মিশে যাবে এরা? কিন্তু প্রমীলা ভেবে কিনারা করতে পারলো না। একবার হয়তো একটা মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিলো—কিন্তু সে তো একটা কল্পনা—পৃথিবীর কঠিন কালো অবিনশ্বর মাটির বুকে চুলের মতো একটা ফাটল থেকে একটা অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু নীলশিখা দেখা যাচ্ছে, হয়তো ওই শিখা একদিন প্রবল আগ্নেয়গিরির রুদ্ররূপে নিয়ে ধরিত্রীকে ভেঙে গড়বে, সেইদিনের প্রতীক্ষায় এ-শিখা বাতাসের মুখে নিভতে-নিভতে জ্বলতে থাকবে।

কিন্তু এ যেন ছায়াবাজি দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা, অপ্রাকৃত একটা কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে নিজের ভিতরটাকে শুকিয়ে তোলা। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রমীলার হাসি পেলো। দুঃস্বপ্নের কুণ্ঠায় গলা শুকিয়ে উঠলে মানুষ যতই আর্ত হোক দিনের বেলায় সে কুণ্ঠার কথা ভেবে বিচিত্র কাহিনীর মতো সেটাকে উপভোগ করে। প্রমীলা হেসে ফেলে ভাবলে, ছুটি না-পেয়ে ভদ্রলোক আসতে পারেননি। ছেলেমানুষ কী শুনতে কী শুনেছে। হারিয়ে যাওয়া মধুর পরিবেশটিকে ফিরে পেয়ে সে দু-হাতে সেটাকে আঁকড়ে ধরলে। বড়োজাকে কলতলায় ধরে সে প্রশ্ন করলো—'আমার ভাসুর কবে আসছেন ঠিক করে বলো তো, দিদি'।

তার ধারণাই সত্য হতে চললো। সেদিন বেলা অনেকদূর গড়িয়ে যাবার আগেই এ-বাড়ির বড়োছেলে এলো। যাকে কোনোদিন দেখেনি, যার কথা কেউ তাকে বলেনি এমন লোককে কল্পনা করা যায় না। কাল রাত্রিতে ঘুমের সঙ্গে জড়িয়ে প্রমীলা তাকে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করেছিলো। বারবার তার মনে হয়েছিলো—ফরসা দৃঢ়কায় একটি পুরুষের কথা, যার গলায় শাদা ওড়না, শাদা পৈতে, কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে যা বলছে এ-বাড়ির সবাই প্রাণপণে তাই করছে।

সাড়া পেয়ে উঠোনে সবাই যখন কোলাহল করে উঠলো তখন প্রমীলাও জানলার পাশে সরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলো তাকে। ধরা পড়লে গর্হিত কিছু করার অখ্যাতি রটবে এ বুঝেও সে কৌতূহল চাপতে পারলো না। কিন্তু তার কল্পনার সঙ্গে কিছুমাত্র যদি মেলে! মাখনের মতোই চেহারা, গাল দুটো শুকিয়ে যাওয়ায় চোখ দুটি একটু বড়ো হয়েছে এই যা। মাখনের চাইতে বরং একটু রোগা, বরং যেন সামনের দিকে নুয়ে পড়া, আধময়লা খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ছেলেমানুষদের সঙ্গে হড়হড় করে কথা বলছে।

বাড়ির গুমোট কোথায় কেটে গেলো। আজ মাখনের গলা শোনা যাচ্ছে। তার বিরাট বুকের জোরালো

ফুসফুসের ভরাট শব্দ বাড়িখানাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে—'শোনো দাদা, শোনো বউদি '

আজ সন্ধ্যায় প্রমীলা রান্না করতে বসেছে। হলুদের ছোপ লাগা শাড়ি পরা বউটিকে নিয়ে শাশুড়ি উঠে পড়ে লেগেছেন। তার রুক্ষ চুলগুলি হয়তো বেণীতে গোছানো যাচ্ছে না, তার আঙুলের ডগায় জমে থাকা হলুদ আর মশলার দাগ হয়তো বা সাবান দিয়েও উঠছে না। প্রমীলা উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলো।

এমনকী মাখন একবার রান্নাঘরের দরজায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রমীলার সঙ্গে কথা বলে গেলো। ওপাশের ঘরখানা থেকে কিশোরদের গলা শোনা যাচ্ছে। তারা বিয়ের গল্প থেকে আনন্দের টুকরোগুলো উদ্ধার করছে। প্রমীলার মনে হলো আজ সে মাখনকে বলবে—একজনের নাম পূর্ণিমা না-হয়ে প্রমীলা কেন হয়েছে।

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রমীলা ঘরে এসে বসেছে। আকাশের একফালি চাঁদ উঠানের ডানদিকের আমগাছটার পিছন থেকে খানিকটা আলো দিচ্ছে। ঝিরঝির একটা বাতাস উঠছে, মুকুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে গাছটা থেকে। বড়োজা প্রমীলার ঘরে পান রেখে চলে গেলো। আলোটা কমিয়ে দিয়ে প্রমীলা বিছানায় গিয়ে বসেছে। উঠোনে পায়চারি করতে করতে মাখন আর তার দাদা কথা বলছে।

একটু শুনে প্রমীলার মনে হলো ওরা যেন বিয়ের কথাই বলছে। মাখন বলছে তার তার দাদা চুপ করে শুনছে।

প্রমীলা শুনতে পেলো মাখন বলছে—আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

কথাটাকে জোরালো করার চেষ্টায় একটা ঢোক গিলে মাখন আবার বললো—তোমার হয়তো মনে হবে কিছু একটা আড়াল করার জন্য আমি বলছি কিন্তু তা নয়, সত্যি আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ওকে না-পেলে আমার চলত না।

পৃথিবীতে সবচাইতে মধুর, মিথ্যা হলেও যা মধুর সে কথাটি এমন আচমকা আঘাত দিতে পারে এ কে জানত? প্রমীলা বিস্মিত হলো। মাখন যদি অস্পষ্ট কণ্ঠে অসংলগ্নভাবে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতো কথাগুলি, অবিশ্বাস্য হলেও প্রমীলার কাছে সবচাইতে বড়ো সত্য হতো সেটা। আর মাখন এখন স্পষ্ট অকুণ্ঠ হয়ে বলছে তবু তার মন মিথ্যা গ্লানিতে সংকীর্ণ হয়ে গেলো।

প্রমীলার মনে পড়লো এ বাড়ির গুমোটের কথা। মনে হলো তাকে এরা সবটুকু মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারছে না। তারপরে দৃষ্টি আবিল হয়ে প্রমীলার দু'চোখ বেয়ে ধারা নেমে এলো।

সে রাত্রিতেও প্রমীলার ভালো ঘুম হয়নি।

মধুছন্দার কয়েকদিন

আপিস থেকে এলো সে, খুটখুট করে অবিরত শব্দায়মান হাল্কা বুট তাকে বহন করে আনছে—ভীতা হরিণীর পা ঠুকবার মতো শব্দ। কিন্তু হরিণীর সঙ্গে তুলনা ঐ পর্যন্তই শেষ; তার চোখ হরিণীর মতো নয়, নয় সে উৎকর্ণা সঙ্গীতের জন্য, ব্যাধের আশঙ্কায় স্পন্দিত হয় না তার নাসাগ্র। কারণ সে স্ত্রী, মানুষের জাতীয় হলেও মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু সে, যেন বেশি মানুষ (ঠিক অতিমানুষ নয়) ; মানুষকে সে সৃষ্টি করে, লালিত করে, তারপরে তার সোহাগের আদরের বস্তু হয়ে ওঠে। মা-মেয়ে-স্ত্রী হয়ে যাদের সে বশীভূত না-করতে পারবে সেই অতি দূরের পুরুষও তার প্রভাব মুক্ত নয় ; অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত কারো-না-কারো দৃষ্টি একাগ্র হয়ে আসে উদ্বাহু হয়ে তার দিকে। বেলগাড়ির জানালায় তার ক্লান্ত মুখখানা দেখবার জন্য, চলতি ট্রামের নিকটতম ব্যবধানটুকু উপভোগ করবার জন্য দীনতা স্বীকার করে কেউ তার কাছে।

মধুছন্দা এইসব ভাবতে ভাবতে আজও আসছিলো। মধুছন্দা তার নাম নয় (এ রকম অদ্ভুত নাম তার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের হতে পারে না) ; একবার একটা নাটকে ঐ নামের নায়িকার অনবদ্য অভিনয় সে করেছিলো, তারপর থেকে ঐ নামে ডাকতো তাকে কলেজের সঙ্গীরা। চাকরি নেবার সময় হঠাৎ কতটা বেপরোয়া হয়ে নিজের নাম ঢাকবার জন্য বলে ফেলেছিলো ঐ নাম। এখন বেশ ভালো লাগে তার, অভ্যাস হয়ে গেছে বলে। এমনকী পর পর তিনটে consonant-এ 'ছ' তৈরি করে সাহেবকে সে থ' লাগিয়েছে। ফাইলগুলিতে সই দেবার সময়ে সে সি (c)-এর পরে এইট (h) দুইটিতে একটু করে প্যাঁচ কষে দেয়। ছোটোসাহেব আজও উচ্চারণ করতে পারে না ; বড়োসাহেব সিভিলিয়ানি তাগিদে বাংলাবিদ হয়েছিলো। সে নামটার দুর্লভতা বুঝতে পারে, তার লেখার পাশে যদৃচ্ছা ব্লু পেনসিল চালায় না। ইংরেজি বাঙলাও রপ্ত হয়ে গেছে। ছোটোসাহেব একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, উচ্চারণ কোথায় শেখা, কোনো ইংরেজ-গভার্নেস ছিলো কিনা তার শৈশবে। হায়রে পরিহাস (ইস্কুলমাস্টারের মেয়ে মধুছন্দা)!

—'কী মনে হয় তোমার'?

—'ছিলো হয়তো, কিন্তু ভালো শেখায়নি'। বলে সাহেব।

সে ভেবে উঠতে পারেনি গভার্নেস রাখবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তাদের ছিলো না এই স্বীকৃতি, কিম্বা কল্পিতা-গভার্নেস ভালো শেখায়নি—এই অপবাদ কোনটি তাকে মানায়, তাকে আর-একটু বিশিষ্ট করে দলের মধ্যে। মধুছন্দা সাহেবকে প্রায় বিদ্ধ করলো দৃষ্টি দিয়ে, তারপরে বললো—এমনি হয় এদেশে।

যারা শুনছিলো ফাইলে দৃষ্টি আনত রাখবার ছলে তারা কী বুঝলো কে জানে। সাহেব বললো—হয়ই তো, এক বিদেশী কখনো আর-একের ভাষা দখল করতে পারে না। সেই থেকে মধুছন্দা গভার্নেস কর্তৃক শিক্ষিতা স্বল্প কয়েকজন অভিজাতের একজন হলো। মধুছন্দা ঘটনাটাকে চাপা দিলো না, দিতে পারতো সে ; অনায়াসে বলতে পারতো—সাহেবকে কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বলো দেখি। বয়ে গেছে মেমসাহেবি উচ্চারণ শিখতে।

কিছুই বললো না সে। এমনকী চাঁদ এসে যখন তার উজ্জ্বল অন্বেষী দৃষ্টি তার মুখে ফেলে প্রশ্ন করলো—'বলো কী, মাধবীদিদি, গভার্নেস ছিলো তোমার'? তখনো মিথ্যার পা শিরশির করা উঁচু চূড়া থেকে নামবার সুযোগ নিলো না সে। ফাঁকি ধরে ফেলবার কারো আগ্রহ তাকে এতটুকু আঘাত করতো

না, চাঁদের লঘু প্রচুর পরিহাসের কোলে লাফিয়ে পড়লে। চাঁদের পরিহাস উদ্বাহু হয়ে তাকে ইসারা করলেও সে শুনলো না, ভুলে গেলো গত বিশ বছরের মধ্যে গভার্নেস রাখবার রেয়াজই শুধু উঠে গেছে নয়, আভিজাত্যের অন্যসব লক্ষণের মতো মেয়েদের শিক্ষার পদ্ধতিও আমূল বদলে গেছে। মেয়েদের ফ্রিল দেয়া জ্যাকেটের মতো, হাতপাখার মতো গভার্নেসও গত হয়েছে।

চাঁদ তথাপি বললো—'বলো কী, মাধবীদিদি, গান্ধিজীর যুগে, গান্ধির দেশে বিলেতি মেমের কাছে পড়তে তুমি আপত্তি করোনি'?

কী সেদিন হয়েছিলো মধুচ্ছন্দা'র চাঁদ হাত ধরে তাকে নামিয়ে আনতে চায় ধাপে ধাপে তবু সে নামবে না, যেন ঐ মিথ্যাচূড়ার চড়ায় সে অচল হয়ে থাকতে পারবে অবিরত সতর্ক হয়ে থাকতে তার অসুবিধা হবে না।

যারা কাজ করছিলো না, কথা শুনছিলো তাদের কাজ করতে বলে মধুচ্ছন্দা ফাইল টেনে নিলো। পাঞ্জাবী লেফটেন্যান্ট দুইজন পর্যন্ত টেবিলে স্তব্ধ হয়ে বসে কলম তুলে নিলো। এইটুকু মধুচ্ছন্দার তৃপ্তি, জাঁদরেল পুরুষগুলিকে কাজ করাতে দুটি কথাই মাত্র প্রয়োজন।

জ্বর মানুষকে অনেকসময় অকারণে অনুতপ্ত করে। মধুচ্ছন্দা জ্বরের ঘোরে একদিন চাঁদকে বলেছিলো—'নিজের আমি এ কী করলাম, চাঁদ? নিজের পারিবারিক গণ্ডি থেকে বাইরে ছুটে এসেও থামিনি, নিজের পারিবারিক চালচলনগুলিকেও অস্বীকার করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছি। আমার বুড়ো বাপ মা আমার শিক্ষাদীক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করবার করেছিলেন, না থাকুক তাতে রংদার কিছু, কিন্তু তবু তাকে অস্বীকারের দেউলেখানায় এনে ফেলেছি। কেন বলো তো? আমাকে কি সব বিষয়েই অসাধারণ হতে হবে, সবদিকেই চমকপ্রদ হতে হবে'?

তখন চাঁদ কিছু বলেনি। আকাশের চাঁদের মেঘলা জোছনা মধুচ্ছন্দার রোগশয্যায় এসে পড়েছিলো, আবেশের মতো দৃশ্য হচ্ছিলো মধুচ্ছন্দার মুখের একটা মুখের একটা পাশ, একটা হাত, বুকের উপরে টেনে দেয়া ব্রান্ত খয়েরি শাড়িটা। চাঁদ হু মাত্র উচ্চারণ করেছিলো ধোঁয়া ছাড়বার অবকাশে। নির্জন বাদলা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেও চাঁদ নাগালের বাইরে বাঁকা করে হাসতে পারে তৃতীয়ার চাঁদের মতো।

তারপরের একদিন চাঁদকে লাঞ্চের সময় চীনে রেস্তোরায় সুস্বাদু অখাদ্যের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে মধুচ্ছন্দা সংশোধন করে নিয়েছিলো—

'মাঝে মাঝে মনে হয়, সাধারণ হতে পারলে, তোমাদের মতো হতে পারলে বেঁচে যেতাম। অসাধারণ হওয়ার ঝামেলা অনেক, অনেকদিকে চোখ রেখে চলতে হয়। রীতিনীতি আদব-কায়দায় বাঁধা আভিজাত্য দুঃসহ হয়ে ওঠে। গালের রং খসে গেলো কখন, কোথায় লাগলো বেনারসীতে আলগা ভাঁজের দাগ, কাকে হলো না প্রত্যভিবাদন করা, প্রতিদান দেয়া হলো না কার সৌজন্যের—প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, বিশ্রাম বিরাম চায় মন। সাধারণ করে দিতে পারো না আমায়। সেদিন জ্বরের ঘোরে—(মধুর করে হাসলো, নিজের দুর্বলতাকে নিজেই করুণা করে প্রশ্রয় দিলো) এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম'।

চাঁদ রা করে না। মুরগির সরু হাড় ছাতু-ছাতু করে চুষতে থাকে।

পদশব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিলো আর্দালি। মিছে কথা নয়, আর্দালিও পেয়েছে মধুচ্ছন্দা। বাড়ি, গাড়ি, ঝি, বোয়, আর্দালি বড়োসাহেব দিয়েছে, কিছু সে নিজে যোগাড় করেছে। ভ্যান্সিটার্ট রোডে তার বাসা। রাস্তার নামের জন্যই বাসা নেয়া এই অফিস সম্বৃত পল্লীতে। ফ্ল্যাট মাত্র নয়, পুরো একটা বাসা, নেমপ্লেট ঝিকিয়ে ওঠা গেটের লতাবিতানসমেত। আর্দালি পোশাক পরে দরজা খোলে, কারণে-অকারণে প্রতিবেশীদের, দূর-প্রতিবেশীদের, রক্ষণশীল কর্তাদের মেমসাহেবদের সেলাম দিয়ে আসে। বোয় রেস্তোরা থেকে খাবার নিয়ে আসে দু'বেলা, দু'বেলা আহার হয় আফিসে। ঝি প্রায় অকাজে কুঁড়ে হয়ে

গেলো। রান্নার পাট নেই, যা দু'খানা বাসন সেগুলি মুছে রাখে বোয় ; পোশাক ধোবাবাড়ি থেকে ওঠে ওয়াড্রোবে, আর্দালিই রাখে গুছিয়ে, ঝি কী করে বুঝবে বুশসার্টের কোন বোতাম কখন সে পরে? ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রয়োজন হয় ঝির—যেদিন পেঁয়াজের স্বাদে বিষাক্ত বোধ হয় মধুছন্দার, হঠাৎ সেদিন স্নান সেরে পিঠময় কালো চুল এলিয়ে দিয়ে লাল শাড়ির ভাঁজে ঢিলেঢালা হয়ে নতুন এনামেলের হাঁড়িতে মুগের ডাল সিদ্ধ করতে বসে মধুছন্দা। কয়লা, ঘুঁটে, এনামেলের হাঁড়ি, ডাল, লঙ্কা, তেলের জন্য হাজারবার ছুটতে হয় ঝিকে।

আর্দালি স্যালুট করে সরে দাঁড়ালো একপাশে। অদ্ভুত একটা কৌশলে কাঁধের উপরের তিনটে সোনালি তারা ঝিকিয়ে দিলো মধুছন্দা আর্দালির চোখ জুড়ে। এই তার প্রাত্যহিক পুরস্কার।

মধুছন্দার মনে হলো আজকের বিকালটিতে তার অবসর। চাঁদ পর্যন্ত আসবে না। অর্থাৎ চাঁদকেও আজ আসতে হুকুম করেনি। মেজরও আসবে না তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে। পূর্ণ অবকাশ আজ। আয়নায় সম্মুখে দাঁড়ালো সে, কানের বাঁ পাশের রুক্ষ চুলগুলি দেখে সহসা তার কেমন মায়া হলো। ক্যাপের খাকি রেশমের সুতো বাঁ পাশের চুলে লেগে আছে, অথচ সহসা চুলের থেকে আলাদা হয়ে চোখে পড়েনি—এ ঘটনাটি চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো তাকে। সঙ্গে-সঙ্গে বহুদিন যেগুলি তার নজরে পড়েনি সেগুলি তাকে আচ্ছন্ন করলো, বিব্রত করে তুললো। আঁধারের স্রোতের মতো চুল তার। কান্না আসে যেন। সঙ্গে-সঙ্গে নজরে পড়লো লাবণ্য পুড়ে যাওয়া মুখের তপঃক্লিষ্টতা। মরি মরি। এ কী তাপসীর মূর্তি হলো তার! তার অন্তর কি তপস্যা করেছে উমার মতো? মুহূর্তপরে রোমান্টিক ভাবালুতা বর্জন করলো সে। ঝিকে ডাকলে চেঁচিয়ে, আর্দালিকে পাঠালো ক্যান্টিনে ফেসক্রিম আনতে। ঝি এলো চুলের ব্যবস্থা করতে। তপস্যাই সে করে যদি, করবে বাঁচার।

বাঁচবে এই প্রতিজ্ঞা তার। আরো বেশি করে বাঁচতে চায় সে। জীবনের প্রথম দশটা বছর হয়তো সে বেঁচেছিলো, কিন্তু ভালো জামা, ভালো একজোড়া জুতো—এই যখন ছিলো তার অপূরণের দুর্লভ সাধ, সে-বয়সে কতটুকুই বাঁচতে শেখে মানুষে? তখন হয়তো চাঁদ ধরবার জন্য আবদার করেছে সে মায়ের গলা ধরে, হয়তো তৃপ্তও হয়েছে রাংতার তৈরি চাঁদ হাতে পেয়ে। তাহলেও, মানুষ অতীত সুখের উদ্‌গার তুলে বাঁচে না। বাল্যের বাঁচার স্বাদ জিহ্বায় জড়িয়ে থাকে না, মধুছন্দারও থাকেনি। খুকুরানী এককালে শোভনা হয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছিলো। নিজের হয়ে বাঁচতে শেখার প্রথমদিনে, কিন্তু জীবন তখনই সরে যেতে শুরু করেছে, বালুচর জাগছে ইতিমধ্যে, কলেজে মৃত্যুর সমারোহে দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার মধ্যে অসহ যন্ত্রণায় বিকৃত কণ্ঠে সে একবার অন্বেষণ করেছিলো—আলো কোথায়, আলো কোথায় পাবো? তার ফলে ঢাকা কলেজ ছাড়তে হলো, কলকাতায় পালিয়ে এলো সে। যে মরেছে তার বাঁচবার চেষ্টা করা কেলেঙ্কারি—এই অভিজ্ঞতা হলো তার।

মেয়ে হয়ে জন্মেছে বাংলাদেশে : সমাজে তার সবচাইতে সম্মানের পরিচয় হবে অমুকের অমুক বলে এই শুধু যথেষ্ট অপমান নয়, ঐ অমুকটিকে যোগাড় করতে হয় উদ্যোগ করে ; লেখালিখি, হাঁটাহাঁটি, দাবার গুটি চেলে-চেলে। কিন্তু এসব ব্যথা এসব বিড়ম্বনা অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়েদের। শোভনা রায় হিসাবেই মধুছন্দা অনন্যসাধারণ ছিলো। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলতে বা ভাবতে লজ্জা হতো। অন্যাকে মোহাচ্ছন্ন রাখবে এ প্রকৃতি যার, সে কী করে মাত্র স্বাধীন হওয়ার জন্য এত কোলাহল করে! স্ত্রী সঙ্ঘের কেউ কিছু বলতে এলে শোভনা এই জবাব দিতো তাদের। তারা বুঝতে না-পেরে তাকে রিঅ্যাক্‌স্যানারি বলেছে। শোভনা দুঃখে-ব্যথায় কেঁদেছে, দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, তার কান্নাকে কেউ আমল দেয়নি, দেবার সাহস ছিলো না বলেই শুধু নয়, তার ভাষা বুঝতে পারেনি কেউ। মূক ব্যথায় সহানুভূতি যোগানো কঠিন নয়। ব্যথা যখন গভীরতায় প্রচলিত ভাষায় নবতর দ্যোতনা দিতে থাকে তখন লোকে বলে বাড়াবাড়ি, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।

আদিম যুগের কথা মনে হতো শোভনার, যখন একজনমাত্র নয় একাধিক পুরুষ একটি নারীকে কেন্দ্র

করে জীবন গড়ে তুলতো। আজও কেন করবে না? নারীর প্রাণশক্তি কি কৃপণ হয়ে পড়েছে আজ, বহুকে সে কি প্রাণ দিতে পারে না আর? তাই বলে বহুভর্তৃকা হওয়ার অভিলাষী নয় মধুছন্দা, বরং বিপরীত। পৃথিবীতে প্রেম চলে পুরুষের পায়ে, এ কথাটা সে ভাবে আর অবাক হয়ে যায়। স্বাভাবিক হবে তখনই ভালোবাসা, যখন প্রেমের পাত্রটি আবার উঠবে নারীর হাতে। ধরা দেওয়া-না-দেওয়া হবে তার ইচ্ছাধীন। সেই ক্বচিৎ-কিরণে উদ্ভাসিত হবে যে-পুরুষ তো সে দুর্লভ সৌভাগ্যবান। সংখ্যায় কী করে একাধিক হবে?

ঝি চুল বাঁধা শেষ করে ঘাড়ে চুলের গোড়ায় পাউডারের সঙ্গে অ্যাস মিশিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। ক্যানটিন থেকে ফেসক্রিম এসেছে গলদঘর্ম আর্দালির হাতে। প্রসাধন শেষ হলো যখন, তখন নতুন রং করা বুড়োয়ার হাল্কা সুগন্ধে ম-ম করছে।

আরো আধঘণ্টা পরে পোশাক পালটানো ব্যাপারটা সমাধান হলো। গল্পকার হয়েও পুনরুক্তি দোষের ভয়ে নারীর রূপবর্ণনা করিনি বহুদিন। আজ করতে হলো। এমনি সুগঠিত বক্ষ, এমনি অবযব বুশসার্টের খাকিতে আড়াল হয়েছিলো কে জানতো? দিনে দশ মাইল মার্চ করে রক্তের রঙ আরো লাল হয়েছে। রুপোলি আদ্দির পাযজামা ও পাঞ্জাবির অন্তর থেকে স্বাস্থ্য দুর্নিবার রূপে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের ছবিতে আয়নায় দৃষ্টি পড়তে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো যোদ্ধ নারী। ঠিক এমন অসতর্ক মুহূর্তে চাঁদ আসতে পারে একথা ভাবা যায় না, কিন্তু তাই এলো সে। নিমন্ত্রিত না-হয়ে রূঢ় কথা শুনবার ভয় না-করে বুড়োয়াবে প্রবেশ করলো।

—চাঁদ যে, অসময়ে?

চাঁদের পক্ষে বলা উচিত ছিলো, গগনপ্রান্তে আমার উদয় একই নিয়মে চলে, যারা প্রতীক্ষায় থাকে তারা ভাবে আমার পথ অতি দীর্ঘ; যার পোড়াচোখে সয় না আমার উৎসব, সে কাঁদে আর বলে—কেন এলে?

চাঁদ একেবারে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

মধুছন্দা নতুন জীবন সম্বন্ধে এখনো পরীক্ষা করছে। সামনে আদর্শ নেই যে অনুসরণ করা চলে, কাজেই সহচরদের উপরে তার চলবার রীতি কী রকম প্রতিঘাত করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হয় তাকে। চাঁদের দৃষ্টির অর্থ সে খুঁজতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলো। যে-কথাটি তার মনে হলো তা এই—অরণ্যের অধিশ্বরী বাঘিনী সাথীর অন্বেষণে চলেছে কান্তার-প্রান্ত উচ্চকিত করে প্রতিধ্বনিত গর্জনে, বাঘের শিশু সে-ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; উল্লাসের চাইতে গভীর বিস্ময়, ভয়ের চাইতে বড়ো মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে দিলো।

কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো মধুছন্দা বললো—'মুডটা বুঝতে চেষ্টা করছি'।

প্রশ্রয় দিয়ে বললো মধুছন্দা—'কেন? বলো।'

—'আজ খেলতে গেলে না টেনিস'?

—'কার সঙ্গে খেলবো বলো, দুর্ভিক্ষে দেশ ছেড়ে যে পালিয়েছে। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে খেলতে জানে এমন লোক দেখিনে'।

—'শুনি রয়েল গোর্খার দু-একজন অফিসার আছে'।

—'আছে হয়তো। সেখানেও অসুবিধা বোধ হয় আমার। স্লিমের কাছে যখন খেলা শিখেছিলাম তখন এদিকটাতে দৃষ্টি পড়েনি। সাধারণ চলতি খেলা ওরা জানে। দৌড়াদৌড়ি করে, লাফিয়ে প্রাণপণে কোনোরকমে পয়েন্ট কুড়িয়ে ওরা সেট দখল করতে পারে, বড়ো চাল ওদের নেই। আঁচরে-আঁচরে ছবি ফুটিয়ে তুলবার মতো খেলাতেও কলার বিকাশ হতে পারে তা জানে না ওরা। ওটাকে শ্রমশিল্প বানিয়েছে'।

চাঁদ বড়ো-বড়ো চোখ করে চেয়ে থাকলো। চাঁদ মধুছন্দাকে পরাজিত হতে দেখেছে। সেটা বিজ্ঞানের কাছে চারুশিল্পের পরাজয় কিনা কে জানে।

চাঁদ অন্যখাতে কথা পাড়লো—'মেজর আসবে না আজ'?

—'না, আসতে বলি নি কাউকে'।

—'তাহলে একান্ত অবসর আমার'?

মধুছন্দা চাঁদকে বিদ্ধ করলো দৃষ্টি দিয়ে, চাঁদের খাকির আস্তরণ ভেদ করে সে-তীব্রতা কোথায় পৌঁছালো কে জানে। মসলিনের মতো শালের ওড়না কাঁধ থেকে বাহুতে নেমে এলো মধুছন্দার।

চাঁদ কথার ভঙ্গি পালটে নিলো—'আবেদন শুনবে না বাইরের কেউ, সুতরাং বলি'।

—'পায়ের কাছে এসে বোসো'।

—'না, টেবিলের কাছে যাই। কাগজ-কলমের দরকার হয়ে পড়তে পারে'।

—'বেশি করে কবিতা পড়োনি বুঝি, মুখে বলবার ভরসা পাচ্ছো না'?

—'সঙ্কোচ হচ্ছে, এমনি রূঢ় চাওয়া আমার। শ'তিনেক টাকা দেবে মাধবীদিদি'।

মধুছন্দার গর্বে আঘাত লাগলো কিনা কে জানে ; চাঁদের সম্বন্ধে তাঁর হিসাবে কোথায় একটু ভুল থাকবেই।

চাঁদ টাকা না-নিয়ে গেলো না, একটু তকরার হলো তাদের ; একটু বাঁকা করে বললো মধুছন্দা।

চাঁদ অকুণ্ঠচিত্তে প্রায় উদাসীনের স্বরে ব্যক্ত করলো টাকার প্রয়োজন। দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর সহায়তায় বলদর্পী হয়ে উঠেছে। একটি ষোড়শী কুমারীকে এবং তা থেকে তার পরিবারস্থ আর-সকলকে বাঁচবার মতো টাকা দিতে হবে। তার নিজের বেতনের শ'কয়েক টাকার প্রায় সবটাই সে পাঠায় দাদাকে, নইলে তিনি অচল—এমনি সব বস্তুতান্ত্রিক কথা। অবশেষে সে স্বীকার করলো ষোড়শী তার কেউ নয়। ব্রহ্মপুত্রের পুবে সেসব ক্যাম্পের এক ক্যান্টিনে এসেছিলো সে আহার সংগ্রহের সুযোগ অনুসন্ধান করতে-করতে। চাঁদ তাকে সুযোগের জালে জড়িয়ে পড়ার অবকাশ দেয়নি। কাজেই বাধ্য হয়ে ক্ষতিপূরণ করছে।

চাঁদ গেলো শুধু টাকা নিয়েই নয়, গত দু-তিন বছরে মধুছন্দা হিসাবে শোভনার মনে বাইরের যে-প্রলেপ পড়ে অন্তর ঢেকে গিয়েছিলো সেখানে খানিকটা আঘাত ক'রেও। খবরের কাগজে রোজই ঐ মহামারী, ঐ দুর্ভিক্ষ কাহিনী—আজকাল ঐ খবর এড়াবার জন্য সে পাতা উল্টে যায়। বহুদিনের কোন অতীতে সারাদিনে কিছু না-খাবার কষ্টে সেও মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো? কিন্তু চাকরির ধাপে-ধাপে পা দিয়ে আজ সে যেখানে পৌঁছেছে তাতে নিজেকে বাঙালি, বুভুক্ষু-মুমূর্ষু বাঙালির সমজাতীয় বলে আর বোধ হয় না।

মধুছন্দা প্যাড টেনে নিয়ে বরিশালের এক গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের ঠিকানায় চিঠি লিখতে বসলো। চিঠিটাকে ভাবলো সে :

মিনতি,

ভেবেছিস তোকে আমি ভুলে গেছি। যাইনি, কেউ কোনোদিন পারে না। আট-ন'মাস মাত্র তোকে দেখিনি, অথচ কতদিন যেন দেখিনি। তোরা ভালো আছিস তো। দুর্ভিক্ষ কি তোদের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে? নিশ্চয়ই পারেনি, বড়দা নিশ্চয় কিছু উপায় করেছে। বড়দাটা একটু ছেলেমানুষ, অন্যদিকে কী অদ্ভুত পরিশ্রম করে আমার কলকাতায় পড়বার খরচ জোগাড় করতো। আচ্ছা রে, বাবা আমার কথা বলেন? মা'র সেই মাথাধরা কি এখনো হয়? তোদের জন্যে মন কেমন করে। আমি যখন ফিরে যাবো তখন তোরা আমায় বাড়িতে ঢুকতে দিবি তো? না দিস তো আমি যে-বাড়ি করবো, তাতেই সবাইকে নিয়ে আসবো।

মিনু, একটা কথা বলি, নিশ্চয় রাখবি আমার কথা। এইমাত্র একজন ভদ্রলোক আমাদের সহকর্মী, বললেন কবে কোন মেয়ে, অল্পবয়সী, অভাবের তাড়নায় মিলিটারির আড্ডায় গিয়েছিলো ভিক্ষে চাইতে। তা যেন তুই করিস নে। কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠেছি। তোর মুখখানা মনে পড়ে গেলো। কিছুতেই তুই কখনো এই মেয়েটির মতো করবি না। জানিস তো পুরুষেরা একরকম বেহিসাবি আনন্দ পায় আমাদের বিপদে ফেলে। অবশ্য সব মেয়ের বেলায় এমনি দুঃসাহস ওদের হয় না।

প্যাডটা সরিয়ে রেখে না-লিখে কী ভাবলো কিছুক্ষণ।

বরিশালের মিনতি এরকম কোনো চিঠি পেয়েছিলো কিনা কিম্বা পেয়ে কী করেছিলো জানি না। এমনকী কিছুদিন মধুছন্দার খবর পর্যন্ত রাখতে পারিনি। তার static formation কখন কাগজে পুরোদস্তুর রেজিমেন্ট হয়ে উঠলো এবং রাতারাতি কতক ট্রেনে কতক প্লেনে আসাম সীমান্ত পার হয়ে ব্রহ্মের পাহাড়ে জঙ্গলে পাড়ি দিতে লাগলো এসব মিলিটারি সিক্রেট। ভ্যান্সিটার্ট রো এর বাসায় আলো জ্বললো না এইটুকুমাত্র জানি। চাঁদ কী করে ওদের আঙুলের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছিলো ওদের সর্বগ্রাসী মুষ্টি থেকে। সে রয়ে গেলো কলকাতায়, মধুছন্দার বাসায়, মধুছন্দার বুড়োয়ার সিগারেটের ছাই-এ ভুক্ত অন্তর খাবারের টিনের কৌটায় জঙ্গলাকীর্ণ করতে লাগলো। ঝি তার রান্না করে দেয় কদাচিৎ, কারণ ও আপত্তি করে না হুজুরবাইনের বাড়িঘর রেমিসিল করায়। আর্দালি তার মনিবের সঙ্গে গেছে জাপানীকে রুখতে, কাজেই চাঁদের নিরুপদ্রব বিশ্রামে কেউ বাধা দিলো না।

খবর পেয়ে চাঁদ বললো—'শালা'। কিন্তু মধুছন্দারে শালা বলে আরাম পেলো না আজ। অফিসে যখন পৌঁছলো সে, তখনো রাত আছে, পথের গ্যাস সাঁ-সাঁ করে জ্বলছে। দরজায় আর্দালিকে স্যালুট ফিরিয়ে না দিয়ে পাসওয়ার্ড না বলে, গুলি খাবার ঝুঁকি নিয়ে পড়ি কি মরি করে হতাহতের ইনফরমেশন ব্যুরোতে গিয়ে উঠলো সে। জমাদার আদিত সিং অবাক হলো তাকে দেখে, দুটো কথা যে খরচ করে না তার মুখেচোখে যেন কথা উপচে পড়ছে। কিন্তু ক্যাজুয়ালটি লিস্টের আট দশ পাতার ক্ষুদে টাইপে লেখা হতভাগ্য নামগুলি বারবার পড়েও মধুছন্দার নাম খুঁজে পেলো না সে। হতের তালিকা আহতের তালিকায় না পেয়ে আদিত সিংকে ডাকলো সে। টেবিলের উপরে আলোর দগদগে বাল্বের নিচে বিছিয়ে নিয়ে দুজনে মিলে নিখোঁজের তালিকাও দেখলো। সেখানেও মধুছন্দার ডাবল এইচ নেই। দ্বিতীয়বার শালা বললো চাঁদ, এবার নিজেকে। তবে কি দুঃস্বপ্ন? না। সুবাদার ধীরেন ব্রহ্ম খবর দিয়েছে মধুছন্দাকে হঠাৎ কদিন থেকে সে দেখেনি। ধীরেন ব্রহ্মকে চাঁদ ছোটোবেলা থেকে চেনে, নিজে সুপারিশ করে তাকে চাকরিতে খানিকটা তুলে দিয়েছে। তবু আদিত সিংকে প্রশ্ন করলো চাঁদ—'ধীরেন ব্রহ্ম বলে কেউ আছে সুবাদার গোর্খা রাইফেলসে'। দুলাখ তেত্রিশ হাজার নামের মধ্যে এক মিনিটে ধীরেন ব্রহ্মের নাম পাওয়া গেলো খুঁজে, যেন না খুঁজেও পাওয়া যেতো। চাঁদ শালা বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মেজরের কাছে ছুটি নিয়ে চাঁদ বেরিয়ে পড়লো। লাকসাম-কুলাউড়া-আখাউড়া-তিনসুকিয়া সিরাজগঞ্জ-দেউলালি ঘুরে এসে মধুছন্দাকে পেলো সে রানাঘাট স্টেশনে ছোটো লম্বা বেঞ্চিতে। আর্দালি তাকে চিনতে পারলো। মধুছন্দা চোখ মেললো, লাল টকটক করছে চোখের সাদা অংশটুকু।

ভ্যান্সিটার্টের বাসায় কোলে করে নামিয়ে আনলো মধুছন্দাকে চাঁদ। ক্যাপ্টেন মধুছন্দা এত লঘু এবং কোমল এ চাঁদ জানতো না। পাছে মিলিটারির লোক এসে হসপিটালে নিয়ে যায় তাই সেবা করবার ইচ্ছায় অসুখের কথা সাফ গোপন করলো চাঁদ। কিন্তু দুদিন-দুরাত কাটলো বমি সাফ করে। চাঁদের মন সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। ছি-ছি, এমন দুর্বল এমন পলকা যার শরীর তার কেন এসব জাঁদরেলি কাজে নামা। সকালের দিকে জ্বর কমতে শুনিয়ে দিলো মধুছন্দাকে। কুইনাইন ইনজেকশন যা পারেনি, ধমক তা পারলো। তিনদিনের পর সকালে উঠে বসে আরো কিছুদিনের ছুটি চেয়ে পাঠালো মধুছন্দা।

চাঁদ নিচের তলায় এক অন্ধকার ঘরে গিয়ে আর্দালিকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিলো পরের দিন সকালের আগে তার দেখা পাওয়া গেলো না। অবশ্য দেখা পাওয়ার জন্য কেউ বড়ো একটা ব্যস্ত ছিলো না। শুধু আর্দালি খইনির ডিবে খুঁজতে এসে বার-দুই ধাক্কা দিয়েছিলো দরজায়; আর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে মাথার কাছে কারো হাত খুঁজে না-পেয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মধুছন্দা। মাথার কাছে যাব হাত খোঁজ করছিলো পাশের খাটখানায় সে লোকটা আছে কিনা এ সন্ধানে তার প্রয়োজন হলো না, করলোও না।

জোড়া খাটের আর-একখানা উঠলো চিলেকোঠায় : ড্রেসিং টেবিলের বার্নিসে শুধুমাত্র ক্ষীণ দাগ রেখে ওষুধের শিশি, ফিডিং কাপ, জ্বরের চার্ট, আইসব্যাগ অদৃশ্য হয়েছে। এখনো ঘর ম-ম করে না বটে সুগন্ধে, ইতিমধ্যে ব্লাউজের ভাঁজে-ভাঁজে বাখা মৃদু চেরির গন্ধ মাঝে-মাঝে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু বর্মা থেকে সে শুধু জ্বর নিয়ে ফেরেনি। দিন সাতেক পরে একদিন কর্তব্যবোধ চাগিয়ে ওঠায় চাঁদ ভ্যান্সিটার্ট রো-তে উপস্থিত হলো। দোতলার হলঘরটিতে (যা এতদিন আসবাব শূন্য হয়ে করিডোরেব কাজ করতো) মধুছন্দাকে পাওয়া গেলো। পবনে আমেরিকান ব্রাউজ আর বর্মানিজ লৌঙ্গি : জাফবান রঙেব ব্লাউজ আর সোনালি সিল্কের লৌঙ্গি। ঘবের মাঝখানটিতে কাচের নাতিবৃহৎ টেবিল, টেবিলের চারপাশে গুটিকয়েক হবিণ-শিঙের চেয়াব, টেবিলে ডিক্যান্টাবে সোনালি বঙের খানিকটা, পাশে একটা ছোটো জারে ডলিমফুলী বঙের খানিকটা বিলেতি সুরা। মধুছন্দাব মুখে চোখে করুণ অনুতাপ আশা করলেও খানিকটা লজ্জা ও কুণ্ঠা আশা না করেছিলো চাঁদ।

মধুছন্দা এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে চাঁদের দুহাত ধরে স্বাগত করলো তাকে; শোবারঘরে নিয়ে গেলো তাকে, বসালো নিজের খাটে, নিজে বসলো তার পাশে, তবু হাত ছাড়লো না। মধুছন্দার চোখ দুটি তীব্র ঝাঁঝালো মিষ্টিতে ভবে টসটস করছে। চাঁদেব অবাক লাগতে লাগলো; ছোট্ট একরত্তি ছেলে নয় সে, দু'বাহুর সাহায্যেই সে মধুছন্দাকে মাটি থেকে তুলে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

মধুছন্দা দু-তিনবার কথা বলবার চেষ্টা করে থামলো; অবশেষে বললো—'এতদিন আসোনি কেন? এখানে জোড়া খাট ছিলো মনে আছে? তুমি যে বাল্ব বদলেছিলে এ ঘরের, এখনো সেইটে আছে; তোমার পছন্দকে নাকচ কবতে পারিনি। আজ হঠাৎ আমাব মনে পড়েছে জোড়া খাট এ-ঘরে বেমানান হয় না'।

চাঁদের বলতে ইচ্ছা হলো—দুদিন অপেক্ষা করে তারপরেও এসব বিদ্যার পরিচয় দেয়া চলতো। শবীরে এখনো রক্ত ফেরেনি।

কিছু না-বলে সিগারেট ধরালো-খানিকপরে বললো 'মাথা ঘোরে না তো? সেইটে খেয়াল রেখো'।

মাথা পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো মধুছন্দা। বললো—'ভাগ্যে তুমি এসেছো। ফ্রন্টে স্বদেশী ছেলের বিচার হয়েছিলো স্পাইয়িং-এর জন্যে। তাকে ওরা গুলি করে মেরেছে। শেষ কথা সে আমার সঙ্গে বলেছিলো। বলেছিলো, 'ভাবতেও পারছিনে আমি থাকবো না, আর কয়েক মিনিট পরে চিরদিনের জন্যে লোপ পেয়ে যাবো'। তার জন্যে এটা ধরেছি, তার জন্যে কেঁদেছি, বড্ড বেশি তোমার মতো দেখতে ছিলো সে'।

অন্য সময়ে চাঁদ বলতো—ইয়া। মধুছন্দার মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেলো— চোখ দুটি ছলছল করলো যেন। গত ছ মাস যাব ডাগ-আউটের স্বল্প পরিসর গর্তে অস্নাত পুরুষের ঘামে-ভেজা-গায়ের গন্ধে গা মিশিয়ে ঘুমুতে হয়েছে, রক্ত-মিশানো-জমাট কাদা যার বুটে এখনো লেগে আছে খাঁজে-খাঁজে, তার এমন চোখ দুটি দেখে অবাক হয়ে গেলো চাঁদ। সন্ধ্যার অন্ধকার তেমন গাঢ় হওয়ার আগে চাঁদ বিদায় নিলো। যাওয়াব সময় অনুরোধ করে গেলো—'হুঁসিয়ার হয়ে থেকো, মাথা ঘুরে পড়ে গেলে

শিরা-টিরা ছিঁড়ে বিপদ হতে পারে'।

কিন্তু মাথাঘোরা অবস্থাতেই একদিন চাঁদকে আসতে হলো, দেখতে হলো এমন ভাগ্য তার।

কে-কে নিমন্ত্রিত হয়েছিলো জানি না। পরে শুনেছি মেজরসাহেব নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, চাঁদ নিমন্ত্রিত হয়নি। সেই হলঘর, কাচের টেবিল, কাটা-কাচের গেলাস, জার, ডিক্যান্টার, কাচ-কড়ির পেয়ালা পিরিচ, বার্নিশ করা রুপোর ট্রে, কাঁটা-চামচ সবগুলি দর্পণধর্মী। বিচিত্র বর্ণের আহার্য পানীয় সবগুলিকে বিচিত্রতর করেছে। মধুছন্দা টেবিলের পাশে কারণে-অকারণে ঘুরছে। সবগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে তার বর্ণাঢ্য অবয়ব, অথবা এইটেই সবচাইতে বড়ো কারণ তার ঘুরে বেড়ানোর।

আর মধুছন্দা নিজে? হায়, আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই যে তার বর্ণনা করি।

মেজর শ্যাম্পেন খেয়েছে সন্ধ্যায়, এখন ক্লারেট খাচ্ছে, খাঁটি ইজিপ্সিয়ান সিগারেটও চলছে। লোকটি একান্ত ভদ্র, নিজের সঙ্গে সে সন্ধ্যা থেকে যুদ্ধ করছে। পুরো আহারের পর ডেসার্টে শ্যাম্পেন যখন সে চেয়েছিলো তখন সকলে অবাক হয়েছিলো। তারপরে যখন সে ক্লারেট চাইলো এবং ম ্ছন্দা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে মৃদু-মৃদু হেসেছিলো তখন তার মনে হলো মধুছন্দার পাশে বসে তার অঙ্গ বিচ্ছুরিত যে-উত্তা প তার সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে গেছে তার দাহ মিটাবার জন্যেই সে ক্লারেট চেয়েছে ডেসার্টের পরে।

সবাই চলে গেছে এখন এই স্মোকিং রুম থেকে। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেমন রাত্রির আবেশকে ছিন্ন করবার ভয়ে গলা নিচু করে কথা বলে তেমনি করে মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করলো—'যাবে না'?

কানে-কানে বলার মতো করে মেজর বললো—'না'।

ফিসফিস করে মধুছন্দা বললো—'কেন'?

তারপরেই চাঁদের উক্ত সেই মাথাঘোরা ব্যাপার, রূঢ় হাতের মার খেয়ে আবেশ ছেঁড়ার ঘটনা। চাঁদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছিলো। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মধুছন্দা ম্যান্টেলপিসে রাখা ক্রোমিয়াম প্লেটেড রিভলবারটি তুলে নিয়ে মেজরের চোখ দুটিকে নিশানার এক্তিয়ারে এনে ফেললো ; তারপর হেসে উঠলো। গোটা একটা কাচের ঝাড় বুঝি-বা আলোর আতিশয্যে চূর্ণ হয়ে গেলো কাছে কোথায়।

কিন্তু চাঁদ যখন এক নিমেষে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—ইয়া. তখন যেন কেঁদে ফেললো মধুছন্দা। একবার ভেবেও দেখলো না নির্বাক চাঁদ আজ মনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পেরেছে। আর চাঁদ? করুণায়, স্নেহে, খোপা-ভাঙা-চুলের ভারে, নারীদেহের কোমলতায় নিজেকে কোথাও খুঁজে পেলো না।

তাকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে চাঁদ যখন দূরের সেটিটাতে বসে সিগারেট ধরালো তখন মধুছন্দা আশায় ভরে উঠলো এইবার চাঁদ তাকে শাসন করবে, তিরস্কার করবে। তার বহুদিনের স্বপ্নে দেখা ব্যাপারটা সত্য হবে, সফল হবে। কিন্তু স্বপ্নে চাঁদের বেত্রাঘাতে জর্জর হওয়ার যে-সৌভাগ্য সে লাভ করেছে তা কি সত্য হয়?

চাঁদ সিগারেট ধরালো, বসে-বসে দুললো। অবশেষে মধুছন্দা বললো—'কেন এসেছো তবে? বলো, বলো। রূঢ় হতে তুমি পারো না, আমি জানি। ভয় করো না আমার মনের কোমলতাকে খাবলে দেবে তোমার কথা। ও তোমার ক্ষমতার বাইরে'।

মধুছন্দার কথার রেশ মরে যাওয়ার অবসর দিয়ে চাঁদ বললো—'কিছু টাকার দরকার হয়েছে আবার'।

চাঁদ ভেবেছিলো মধুছন্দা ঘর থেকে চলে যাবে। গেলো না। ক্লান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো—কাল আপিসে মনে কোরো'।

কথাটা ভালো লাগলো না চাঁদের! বড্ড বেশি দাতার ভাব ফুটিয়ে দিলো মধুছন্দা। চাঁদ বক্তৃতা

দিলো : বিয়ে করবো মাধবী, টাকা চাই, ছুটি চাই। বড্ড ভুল করেছি বিয়ের কথায় রাজী হয়ে, এখন দেখছি বিয়ে করা আর বেকুব হওয়া একই কথা। বাসরঘর ইতিমধ্যে অতীতের ঐশ্বর্যে পরিণত, বধূকে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্লিওপেট্রা বলে বোধ হচ্ছে'।

আমি জানতাম বিয়ের কথায় মেয়েরা বক্তা হয়ে ওঠে, সে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক (পরের হলে বরং কানেও শুনতে পাওয়া যায়) ; আর জানতাম, বেটাছেলেরা বাঁধা পড়তে আনন্দ পেলেও মুখে অন্তত কড়া-কড়া প্রতিবাদ করে। এক্ষেত্রে দেখলাম সেসব কিছুই হলো না। নির্বাক চাঁদ বিয়ের কল্পনায় বাগ্মী হয়েছে, আর মধুছন্দা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের সংবাদ আকস্মিকভাবে পেয়েও এতটুকু উৎসুক হলো না।

বিটারস্, এবসাঁথ বা ফ্রেঞ্চ ভারমাউথ যে জন্যই হোক ককটেলের পর থেকেই মুখ ও তা থেকে সারা দেহ ও সমগ্র মন তিক্ত বোধ হচ্ছিলো মধুছন্দার, অন্তত এই রকম অনুভব করলো সে। হয়তো তার নিস্পৃহতার অন্যতম কারণও এইটি।

পরের দিন আপিসে গিয়ে বেলা এগারোটায় চাঁদকে ডেকে সে চেক দিয়ে দিলো মোটা অঙ্কের। চাঁদ চাওয়ার বেশি পেয়ে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সাদা দাঁত ঝিকিয়ে স্যালুট করলো বুট ঠুকে। তার অপসৃয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে মধুছন্দা কী ভাবলো, তারপর কলমের ঢাকনি খুলে ফাইলের পর ফাইল সই করতে লাগলো। বারোটাতে মধুছন্দার মনে হলো চাঁদকে ডেকে জানিয়ে দেবে তার ছুটি সে মঞ্জুর করবে, এতটুকু দ্বিধা তার হবে না। মিনিট দু'এক দেবো-কি-দেবো না করে খবরটা দেবার জন্য চাঁদকে ডেকে পাঠালো।

—'বিয়ের পর কোথায় যাবে তুমি'?

—'তুমি কি তোমার কাছে এসে থাকতে বলবে না'?

—'তা মন্দ হয় না। নবদম্পতির কপোতলীলার কূজন-প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো'।

—'তাহলে তাই'।

—'কিন্তু আমি হয়তো থাকবো না। কাশ্মীরে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। মনোতোষকে মনে নেই ? হ্যাঁ, সেই ডাক্তার কর্নেল মনোতোষ মিত্তির—সে বারবার লিখছে'।

এই কথাগুলি কিছুক্ষণ পরে বললো মধুছন্দা, একটু ভেবে-চিন্তে ; গল্পকারের মতো কথা ওজন করে-করে, শ্রোতার পরে কথার কাজ লক্ষ্য রেখে-রেখে। চাঁদ এ অবতারণার কারণ বুঝতে না-পেরে ফিরে গেলো।

চাঁদ খুব আশা করেছিলো লাঞ্চে আজ কোনো বাইরের রেস্তোরাঁয় যাবে মধুছন্দা এবং তাকে সঙ্গে নেবে। চাঁদের অনেক পরামর্শ ছিলো তার সঙ্গে ; কিন্তু মধুছন্দা বাইরে গেলো বটে, মোটরের গতি তীব্রতর করলো বটে, চাঁদকে সঙ্গে নিলো না।

বেলা তিনটেতে চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে মধুছন্দা চাপরাশিকে দিয়ে ডেকে পাঠালো চাঁদকে ; কিন্তু চাঁদ ততক্ষণে বরিশাল এক্সপ্রেসে চেপেছে শেয়ালদায়।

কার সঙ্গে বিয়ে, কোথায় বিয়ে, কী রকম মেয়ে, একালের না সাবেকি এসব অনেক কথা জানবার ছিলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা, কৌতূহল থাকা দুর্বলতা কিনা এ বুঝতে না-পেরে মধুছন্দার জানা হয়নি।

আপিস থেকে বাসায় ফিরে সন্ধ্যায় আসা ডাকে তার কৌতূহল নিরসন হলো, একটু-বা আশাতিরিক্তভাবে, একটু-বা প্রয়োজনের অতিরিক্তই হলো।

বরিশালের সেই স্কুলমাস্টার, যিনি শোভনারূপে মধুছন্দার বাবা ছিলেন, তিনি লাল ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছেন মিনতির বিয়ের। মিনতিও একখানা পোস্টকার্ডে তাকে চিঠি লিখেছে, সঙ্কোচ নেই, কুণ্ঠা নেই। বিয়েটাকে মিনতি নেহাত কর্তব্যবোধে করছে যেন, তবু তার মধ্যেও একটা অভিনবের সুর আছে। লিখেছে—তুমি আসবে, দিদিভাই। চিঠিতে সে বরের নামও উল্লেখ করেছে—চন্দ্রাকান্ত সেন তার নাম।

কৌতূহল নিরসন হলো, অতিরিক্ত পাওনাটুকু ছিলো, তা মিললো চাঁদের টেলিগ্রামে। দীর্ঘ বিস্তারিত টেলিগ্রাম, বনগাঁও থেকে করছে :

মাধবীদিদি, তার পেয়ে রওনা হও। মিনতির সঙ্গে আমার বিয়ে। অনেক কথা বলবার ছিলো, আপিসে বলা হয়নি, মুখ ফুটে বলতে পারিনে বলেও বটে। কালকের বরিশাল এক্সপ্রেস ফেল কোরো না। প্রণাম নাও।

মধুছন্দা একসঙ্গে চিঠি দুটি ও তারখানি টেবিলে নামিয়ে রাখলো। একটা কথা মাত্র তার মনে হলো: চাঁদ যখন সে তখন উদাসীন হতে পারে না। একটা কিছু করা দরকার। চাঁদের সম্বন্ধীয় কোনো ব্যাপারে সে নিস্পৃহ থাকবে কী করে? তা কি সম্ভব? মনে পড়লো, চাঁদ ভীরু, নির্বাক চাঁদ।

হঠাৎ সে ফোন তুলে নিলো। সাউথ ফাইভ ও নাইন থ্রি। হ্যালো। মেজর যেন তার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলো, ব্যগ্র হয়ে সাড়া দিলো।

—'আচ্ছা, মেজর, চাঁদ তোমার কাছে ছুটি নিয়েছে'?

—'না'।

—'সে কী, আশ্চর্য! সে তো কলকাতায় নেই। বনগাঁও থেকে তার করেছে আমার কাছে'।

—'তুমি ছেড়ে দিলেই হলো, দু'একদিনের ব্যাপার তো'।

—'তার দরখাস্ত পেয়েছি বটে, মঞ্জুর করিনি। হাসছো তুমি'?

ও, তার বিয়ে?

—'বেশ তো বিয়ে, কিন্তু তাতে কি মিলিটারি আইন ভাঙবার অধিকার জন্মায়? না-না, এরকম নজির ভালো নয়'।

—'কোর্ট মার্শাল বলছো'?

—'নয় তো দেওয়ানি মামলা হবে? না। আমি হাসছি না। কে বলেছে আমি হাসছি?

ফোন ছেড়ে দিয়ে মধুছন্দা ফিরে গেলো সোফাটাতেই। পথে ড্রেসিং টেবিলটা থাকায় তার প্রতিবিম্বটা তার পাশ দিয়ে চলে গেলো এমন মনে হলো—অন্য আর একটি মহিলাই যেন। কিন্তু সে একেবারে চলে যাওয়ার আগে আয়নাটার সামনে একটু দাঁড়ালো মধুছন্দা। ঘেরাটোপ দেয়া আলোর ছায়াটাও পড়েছে। কানের কাছে কালো চুলের গায়ে যেটা চকচক করে উঠলো আজও সেটা খাকি সিল্কের আঁশ—বেরেট ক্যাপ থেকে যা লেগেছে। গালে রেখা পড়লো, অনেকটা হাসির মতোই ভঙ্গি, ঠোঁটের দু'পাশ আকুঞ্চিত হলো।

সোফার সামনে ল্যাকারের কাজ করা টিপয়ে ঝিনুকের তৈরি অ্যাশট্রেটা। তার গায়ে হেলানো ছিলো পাইপটা। মেজর উপহার দিয়েছিলো একদিন ; আর চাঁদ বলেছিলো—ইয়া, একেবারে কলমের মতোই, নিব লাগালে হলো। ড্রয়ার্স থেকে সিগারেট বার করে এনে পাইপে পরালো মধুছন্দা।

আগুন না-ধরিয়ে ফোনের কাছেই বরং উঠে গেলো সে আবার।—'আ, মেজর ; আমিই বটে। আসবে নাকি'? (ঝিলমিল করে হাসলো মধুছন্দা)। 'রাত হয়েছে'? 'হলোই-বা। কত আর? কিম্বা রোসো, আমিই আসছি। হ্যাঁ'।

ওয়াড্রোব থেকে ঝকঝকে ইস্ত্রির বুশসার্ট আর ট্রাউজার্স এলো। আর্দালি যখন জুতোজোড়া এগিয়ে দিচ্ছে, সোফার গায়ে পা রেখে একটু হেলে দাঁড়িয়ে মোজা পরতে-পরতে সিগারেটে আগুন ধরালো মধুছন্দা ; চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে চুলের মতো সরু নীল-নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলো। শ্রাগ করে সে হাসলো রিনরিন করে। আর্দালি জুতোটা একেবারে পায়ের কাছে এগিয়ে ধরেছে।

নন্দরানী

তেমাথার বুড়া বটগাছটার তলে সান-বাঁধানো জায়গাটুকু নাকি গ্রামের কালীস্থান। শুনিয়াছি নানা কারণে লোকে এখানে পূজা দিয়া থাকে। পূজার্থীরা ভক্তির টানে পূজা দিতে আসে কিনা, তাহাও যদি হয় তবে বিশেষ করিয়া এ স্থানটিতে আসিবার কী কারণ তাহা আমার বলিবার বিষয় নয়, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সামান্য-জায়গাটুকু কী করিয়া একদিন এ গ্রামের এবং আশপাশের আরো দু'একটি গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া পড়িলো তাহাই বলিতেছি।

বোধহয় মাঘ মাসে, একদিন গ্রামের লোকেরা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলো তেমাথার বটতলার সেই শানবাঁধানো জায়গাটুকুকে একদল লোক চারিপাশের জঙ্গল কাটিয়া ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া পরিষ্কার করিতেছে। খবরটি কানাকানি হইয়া অল্পকালের মধ্যেই গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িলো . মধ্যপাড়ার হীরেন গাঙ্গুলি রটন্তি পূজা করিতেছে।

মধ্যপাড়ার হীরেন গাঙ্গুলির সাথে সামন্তদের জমিটুকু লইয়া সুরেন মুন্সির বহুদিন হইতে বিবাদ চলিতেছিলো। রেলের কন্ট্রাক্টারি করিয়া গাঙ্গুলি এখন বিস্তর পয়সা করিয়াছে কাজেই এতদিন সহিয়া থাকিলেও এবার পূজার পর আদালত খুলিতেই সে মুন্সির নামে এক নম্বর রুজু করিয়া দিয়াছে। তাহার পক্ষে মামলার তদ্‌দিবর-তদারকে কোনো ত্রুটি হয় নাই, হইবার কথাও নয় কিন্তু গ্রামসুদ্ধ লোক, বিশেষ করিয়া যাহারা মুন্সির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলো, তাহারা সবিস্ময়ে দেখিলো সুরেন মুন্সি যেন ঘুমাইয়া আছে, এত বড়ো একটা অন্যায় সম্বন্ধে তাহার যেন হুঁশমাত্র নাই। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, পরোয়ানা পাইয়া মুন্সি আদালতে হাজির হইলো বটে, একজন উকীল পর্যান্ত নিযুক্ত করিলো না। মামলার ডাক পড়িলে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নাকি সুরেন মুন্সি বলিয়াছে : —দেড় বিঘা জমির জন্য মামলা করিতে তাহার লজ্জা হয়, নতুবা জমিতে তাহার স্বত্ব আছে তাহা সে যে-কোনো মুহূর্তে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে। গাঙ্গুলিমশাই ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে কতগুলি মিথ্যা বলাইয়াও লাভ নাই ; যদি জজসাহেব অনুমতি দেন তবে ঐ জমিটুকু গাঙ্গুলিমশাইয়ের নামে আজই সে রেজেস্ট্রি করিয়া দিবে। জজসাহেব নাকি এ কথায় বিচলিত হন নাই, এবং ছেলেমানুষি করিবার জন্য মুন্সিকে মৃদু তিরস্কারও করিয়াছিলেন, অতঃপর মামলা হইয়াছিলো এবং মুন্সির দয়ায় নয়, জজের ন্যায় বিচারে সামন্তের জমিটুকু গাঙ্গুলিমশাই পাইয়াছেন। রাজার বিচারালয়ে যে-ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বার্তা দেবতাদের কানে তুলিবার জন্যই আজ এই আয়োজন।

আয়োজনটা যে রাজসিক হইবে তাহাতে সন্দেহ কী। বহু কণ্ঠের কোলাহল ও তাহা ছাপাইয়া অন্যূন দশ জোড়া ঢাকের ধ্বনি বহুদূর হইতেই ইহা জানাইয়া দিলো। বিবদমান উভয় পক্ষের হুঙ্কার শোনা গেলো না বটে তবে তাহা যে ঢাকের শব্দের জন্য এরূপই অনুমান হইলো। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎদৃষ্টি খুবই সংকীর্ণ। কালীতলায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখা গেলো তাহা কল্পনা করিবার কোনো সূত্রই গ্রামের কেহ পায় নাই। যাহারা বিবাদে উৎসাহ দিতে আসিয়াছিলো, যাহাদের এতক্ষণ বিবাদ শুরু করিয়া দিবার কথা তাহারা সবাই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্চের ডানদিকে মুন্সি, বাঁদিকে সপারিষদ গাঙ্গুলি, সম্মুখে সিদ্ধতান্ত্রিক পুরোহিত, কিন্তু সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। মুগ্ধ করিয়াছে মুন্সির দু' বছরের মেয়ে নন্দরানী। মঞ্চের যে স্থানে মূর্তি স্থাপন করিবার জন্য তান্ত্রিক নানা বর্ণের শতদল পদ্মাসন রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন ঠিক তাহার পরে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া হাসিতেছে নন্দরানী। ঠিক হাসাও নয়, ঠিক দাঁড়ানোও নয় ; একটা সর্পিল

গতি যেন তাহার পদতলে জাগ্রত হইয়া মুহূর্তে সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িলো ; ভূমিতলে ক্ষুদ্র পা দুটি দিয়া বার দুই লঘু পদাঘাত করিয়া নন্দরানী যেন বায়ুতে ভর করিয়া দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ উচ্ছ্রিত করিয়া দিলো, তাহার পর সহস্রমুখী গতিতরঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র দেহটি শতধা ছড়াইয়া দিতে লাগিলো।

নাচ কাহাকে বলে তাহার একটা ধারণা ছিলো। শুনিয়াছি বর্ষার শিখিণীর নৃত্যের নাকি তুলনা নাই, কিন্তু মালাকরদের বুড়ো জয়রামের ঢাকের তালে-তালে নন্দরানী সেদিন যাহা করিলো তাহা ভাষা দিয়া নির্দিষ্ট করা যায় না। আমার মনে হয় ; তাহার সে লাস্যের যদি উপমেয় থাকে তবে তাহা নৃত্যপরা অগ্নিশিখা।

আর বৃদ্ধ জয়রাম—আজ যেন কী করিয়া সে তাহার রোগজীর্ণ দেহটিকে তেজে ভরিয়া তুলিয়াছে ; আর সব ঢাক অবসন্ন হইয়া থামিয়া গেলেও নাচিয়া-দাঁড়াইয়া-সরিয়া গিয়া-ফিরিয়া আসিয়া সহস্রবার সহস্রভাবে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সে নন্দরানীর লাস্যের সঙ্গত করিতেছে। ঢাকের বাজনায় খানিকটা নেশা আছে, যাহা মোহিত না-করিয়াও আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু তাহা যে অন্তঃস্থলের রক্তপ্রবাহের পর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা কে জানিতো।

নাচ থামিলো, হয়তো ক্লান্তিতে, হয়তো সুসঙ্গত পরিসমাপ্তিতে পৌঁছাইয়া নন্দরানীর ক্ষুদ্র পা দুটি যেন আর তাহাকে বহন করিতে পারিলো না, কালীর আসনের পর তাহার অকিঞ্চিৎকর দেহটি পুষ্পস্তবকের মতো লুটাইয়া পড়িলো।

যাহারা বিস্ময়ে ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছিলো, এবার তাহারা একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উঠিলো, কোলাহল করিয়া জানাইয়া দিলো, নন্দরানীকে কালীঠাকরুণ স্বয়ং আসিয়া ভর করিয়াছেন। অপ্রতিভ সুরেন মুন্সি ভীত বিবর্ণমুখে মেয়েকে কুড়াইয়া লইলো। ক্রোধোন্মত্ত গাঙ্গুলি তীব্রকণ্ঠে বলিলো —আমার প্রতিষ্ঠা করা পূজা তুই ঐ মেয়ের সাহায্য নিয়ে ভেঙে দিলি মুন্সি, তার ফল তুই পাবি. ও মেয়ে তোর বিধবা হবে, বছর পেরোবে না, হাতের নোয়া খুইয়ে ফিরে আসবে'। শাপবাক্য অনিবার্য দণ্ডের মতো মাথা পাতিয়া লইয়া মুন্সি অন্তরে-অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলো। পূজা সেবার হইলো না, তাহার পর বহুদিন হয় নাই, চারিদিকের লতাপুঞ্জ বাড়িয়া-বাড়িয়া আসনটুকুকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলো।

কিন্তু নন্দরানীর কাহিনী যে শুধু নানাভাবে পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাই নয়, তাহার মূল কথাটুকু লইয়া বিতর্ক করিতে আজও গ্রামের লোকে উৎসাহ বোধ করে। একদল প্রমাণ করিতে চায় গাঙ্গুলির পূজা পণ্ড করিবার জন্য সুরেন মুন্সির ইহা একটি চাল, অপরদিকে ঠিক তেমনি আগ্রহ লইয়া বলে ইহা মুন্সীর চাল নয়, দেবতা ভর না-করিলে অমন হয় না। বিতর্ককালে নন্দরানীর নৃত্যপারদর্শিতার কথা উঠিয়া পড়ে : কেহ বলে নন্দরানী পূর্ব হইতেই ও বিদ্যায় সুশিক্ষিত, তাহার 'খৃস্টান' মায়ের নিকট হইতে নাচ শিখিবে এ-আর বেশি কথা কী ; অপর একদল বলে, খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে সেদিন নৃত্যকলায় সুশিক্ষিত থাকা দূরের কথা, আজ পর্যন্ত নন্দরানী নাচ সম্বন্ধে কিছু জানে না। এইরূপই হয়, মানুষ একই বিষয়ে নানা প্রকার অর্থ করিয়া বিশেষ আনন্দ পায়। হয়তো কালক্রমে আর-একদল আসিবে যাহারা উপরোক্ত মত দুইটি উড়াইয়া দিয়া বলিবে, নন্দরানী সেদিন যাহা করিয়াছে তাহার জন্য দায় আর-কিছু নয়, সেদিনের আকাশ বাতাস, পারিপার্শ্বিক সব মিলিয়া তাহার মানসিক অবস্থানটি ; হয়তো জয়রামের বাদ্যকৌশলের সহিতও ইহার একটু যোগ আছে, কিন্তু ইহার বেশি কিছু বলা চলে না।

ব্যাপারটি শুধু কাহিনীর দিক হইতে মূল্যবান হইলো না, মুন্সির পারিবারিক জীবনের উপরও ইহা প্রভাব বিস্তার করিলো। অন্তরালে থাকিয়া নন্দরানীর মা সবই দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন। ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণের অভিশাপ কার্যকরী হয় কিনা, হইলে শিশু নন্দরানীর পক্ষে দূর-ভবিষ্যতে একদিন বিধবা হইবার কষ্ট কতখানি দুঃসহ হইবে তাহা লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার কোনো কারণ নন্দরানীর মা দেখিতে পান নাই। একে তো তিনি 'খৃস্টান' মত ঘেঁসা পরিবারে মানুষ হইয়াছেন, অভিশাপ সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁহার কম, তাহার পরে বাপেরবাড়ির গ্রামের বুড়াশিবের ভরসা রহিয়াছে। বুড়াশিবের কথা মনে হইতে নন্দরানীর মা মনে-মনে হাসিয়া ফেলিলেন। আসলে তাহার নাম কুমারী-শিব, কোনোকালে কোনো এক কুমারী শিবের মতো

বর পাইবার জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলো। সেই কুমারীর হাতের সেবা পাইয়া শিবঠাকুর অন্য কাহারও সেবায় তুষ্ট হন না, গ্রামে বৃদ্ধারা ঠাকুরকে দু-চোখে দেখিতে পারে না, ছোটো মেয়েদের পরে তাহার পূজার ভার। ইহারাই আদর করিয়া বুড়া নাম রাখিয়াছে। কিন্তু সাংঘাতিক লোক এই ঠাকুরটি, অন্যদিন বুড়া, নেশাখোর যাহা বলো আপত্তি নাই, কিন্তু শিবচতুর্দশীর দিন কিম্বা মহাষ্টমীর দিন যদি ভুলিয়াও কোনো কুমারী তাঁহাকে বুড়া বলিয়া উল্লেখ করে তবে আর রক্ষা নাই, বুড়া বর তাহার জুটিবেই। নন্দের মা বিবাহের উৎসবে তাঁহাকে মহাঅষ্টমীর দিন বুড়া বলিয়া ফেলিয়াছিলো, সকলে মিলিয়া দোষস্খালনের জন্য বকুলের মালা ও পদ্মের কলি দিয়া তাঁহাকে খুশি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলো, কিন্তু ঘটিবার যাহা ঘটিলো। বিবাহের বহু পূর্বে রটিয়া গেলো সুরেন মুন্সি সবদিক দিয়া বরণযোগ্য হইলেও বয়স তাহার ত্রিশের কোঠায়, চুলেও নাকি পাক ধরিয়াছে। তখন অভিমান হইয়াছিলো নন্দর মা'র, এখন অবশ্য তিনি বলেন, বুড়াশিব আসলে বদরাগী নয়, রসিক। যাক সে কথা, বুড়া যে জাগ্রত তাহাতে সন্দেহ কী, কোনো একটি ছোট্ট মেয়ে মনের ভুলে তাঁহাকে কী বলিয়াছে তাহাও কানে গিয়াছে। এক বৎসর ধরিয়া যদি নন্দরানী তাঁহাকে পূজা করে তবে ব্রাহ্মণের অভিশাপ তাহার কী করিবে!

কিন্তু শাপের ভয়ে দূর হইলেও নন্দর মা শান্তি পান না, অজানা একটা আশঙ্কা অস্বস্তির মতো বোধ হইতে থাকে। তেমনি সুস্থ সবল দেহ লইয়া, তেমনি চপল গতিতে কাকলিমুখরা নন্দরানী প্রভাত হইতে সারা বাড়িময় ছুটিয়া বেড়ায়, তবু যেন কী একটা পরিবর্তন থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সুরেন ধরিতে পারে না বটে তবে মায়ের চোখকে তাহা এড়াইতে পারে না। কখন কীভাবে তাহা আসিয়া পড়িবে তাহা বলা যায় না, দুদিন দশদিন বেশ কাটিয়া গেলো, সহসা একদিন হয়তো বারান্দার একপ্রান্তে বসিয়া নন্দরানী যখন খেলিতেছে তখনই ইহা আসিয়া পড়িলো। মনে হয় কী যেন একটা শুনিবার আগ্রহে নন্দরানী উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চোখের পাতা স্থির অচঞ্চল, শ্বাস বহিতেছে কিনা বোঝা যায় না, মুখে বিবর্ণ একটা হাসি। কিন্তু এ সবটুকু এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে কাহাকেও ডাকিয়া দেখানোর সময় পাওয়া যায় না। নন্দরানীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অবাক হইয়া যায়, সুরেনকে বলিলে বিশ্বাস করে না। কে বলিবে কোনটা সত্য : নন্দরানীর এই প্রকার পরিবর্তন হয় বলিয়াই মায়ের চোখে তাহা ধরা পড়ে, না মায়ের হৃদয় যে-কাল্পনিক পরিবর্তনগুলি সারাদিন আশঙ্কা করিতে থাকে তাহাই একসময়ে তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া দেয়!

কিন্তু ইতিমধ্যে যাহা একদিন ঘটিলো তাহার পর সুরেন স্ত্রীর কথা আর উপেক্ষা করিতে পারিলো না। বিকালের দিকে সুরেনের হাতমুখ ধুইবার জল-খড়ম-গামছা গুছাইয়া রাখিয়া স্বামী বাড়ি ফিরিবার পূর্বে চুল বাঁধাটা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইবার জন্য শোবারঘরে ঢুকিয়া নন্দর মা অবাক হইয়া গেলো। সারা বাড়ি যেন নিথর নিস্তব্ধ, দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতে চায়, নন্দরানী জন্মিবার পর হইতে রাত্রি দশটার পূর্বে এমন নিস্তব্ধতা তাহার বাড়িতে হয় নাই। ঘরের পিছনে বাগানের দিকের বারান্দায় খোঁজ করিতে গিয়া মা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বারান্দার একপাশে সুপরিসর খাঁচাটার ভেতরে মস্ত সাদা সারসটি এক পায়ের পরে দাঁড়াইয়া বাঁ পায়ের সাহায্যে বাঁ ডানাটি ছাতার মতো বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, আর তাহার সম্মুখে ঠিক তাহার মতো ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে নন্দরানী : ডান পায়ের আঙুলগুলির অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া সমগ্র বাম অঙ্গ একটিমাত্র তরঙ্গে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে, মাথাটি সুঠাম গ্রীবার 'পরে পশ্চাতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে, না-দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

কতক্ষণ এরূপ অবস্থা ছিলো, তাহা নন্দর মা হলফ করিয়া বলিতে পারে না, সুরেন আসিয়া স্বচক্ষে সবই দেখিয়াছিলো তাহা তাহার মনে আছে। সুরেন নন্দরানীকে কোলে করিয়া বসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলো—'কী হচ্ছিলো, রানু'?

নন্দরানী অতি সহজভাবে বলিলো,—'তুমি কিছু জানো না বাবা, ওটা সারাদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বলে আমার খুব রাগ হয়েছিলো, তাই অমন করেছিলাম'।

ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে আর জিজ্ঞাসা করিয়াও লাভ নাই। গল্প বানাইয়া বলিতে নন্দরানীর জুড়ি সারা গ্রামে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, আর তাহাও যদি না-হয় তথাপি জিজ্ঞাসা করিয়া ফল হইবে না ; অতটুকু দুধের মেয়ে কী করিয়া এসবের অর্থ জানিবে। সেদিন রাত্রিতে সুরেনের পায়ে মাথা কুটিয়া মরিবার ভয় দেখাইয়া সে সুরেনকে গা ছোঁয়াইয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলো যে সুরেন ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা করিবে।

ইহার পর অনেকদিন নন্দরানীর সংবাদ ভালো করিয়া জানা যায় না। হয়তো তাহার সে ব্যাধি সারে নাই, ভবিতব্যতা মানিয়া লইয়া তাহার বাবা মা-ও হয়তো ইহা লইয়া আর উচ্চবাচ্য করে না। একটু খবর লইলে জানা যাইতো বটে কিন্তু সুরেন মুন্সির দিকে চাহিলে মনে হইতো কেন জানি না তাহার মুখখানি মলিন হইয়া রহিয়াছে, মনে হইতো কী যেন একটা দুঃখ সে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নন্দরানীর কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতো না।

খবর লওয়া হয় নাই বলিয়া কিন্তু নন্দরানী বসিয়া ছিলো না। গ্রামের আর-দশজনের মতো সেও নানা প্রকার অভিজ্ঞতা কুড়াইতে কুড়াইতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলো। বিভিন্ন ঋতু হইতে অল্প-অল্প সঞ্চয় করিয়া সে কী নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এ খবর কেহ রাখে নাই। সহসা যেদিন নজর পড়িলো সকলে ভাবিয়া পাইলো না, সেদিনের মেয়ে নন্দ আপনাব মনে হাসিবার এত কী পাইয়াছে।

অতঃপর নন্দরানী জৌগ্রামে আসিয়াছে। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে, এমন অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে পড়িয়া থাকিবার কথা নয় তথাপি নন্দর মা'র মনে হইলো জৌগ্রামের বুড়াশিবকে ইহার মধ্যে না-টানিলে চলিবে না। পাত্র জুটাইতে এমন ঘটক আব কে আছে। আর তাহা ছাড়া গাঙ্গুলিমশাইর অভিশাপ ; এতদিন পরে তাহার তেজ কিছু অবশিষ্ট হয়তো নাই কিন্তু তাহা হইলেও মঙ্গল কাজে নামিতে হইলে সবদিকে বাঁধিয়া নামাই ভালো। বুড়া শিবের পূজাও চলিতেছে। অগণিত পূজার্থিণীর মধ্যে নন্দকে বিশেষ করিয়া তিনি চিনিয়াছিলেন কিনা জানি না, সিদ্ধিলাভ কিন্তু নন্দরানীর ভাগ্যেই সর্বাগ্রে ঘটিলো। জৌগ্রামের রায়বাড়ি হইতে তাহার বিবাহের কথা উঠিলো এবং লাখ কথা খরচ হইয়া মাত্র স্থির হইয়া গেলো। যোগেশ রায় মহাশয়ের একমাত্র সন্তান, একটি পাশ দিয়াছে, মোট কথা পাত্র নন্দর মা'র মনের মতন হইয়াছে। নন্দর মা'র ইচ্ছা মাঘে শিবচতুর্দশীর পূজা দিবার পর ফাল্গুনের দিকে বিবাহ হয়। বিবাহ ফাল্গুনেই স্থির হইয়াছে।

নন্দর মামাবাড়ির অদূরে কয়েকঘর পটুয়া বাস করিতো। দেবদেবীর প্রতিমা গড়া, শ্রাদ্ধাদিতে দান গ্রহণ করা, বর্ষফল পাঠ করা, বার ব্রতের পাঁতি দেয়া, ঠিকুজি কোষ্ঠির ফলাফল বিচার করা প্রভৃতি ইহাদের কাজ ও উপজীব্য। হরিশ এই পটুয়াদের ছেলে। বাল্যকাল হইতে সে গ্রামে ছিলো না, নন্দরানীর জৌগ্রামে যাইবার মাস দু-তিন পূর্বে কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। একা আসে নাই, আসিয়াছে এক বন্ধু লইয়া, অপূর্ব ইহাদের বেশভূষা, তেমনি অদ্ভুত ইহাদের চালচলন, গায়ে সস্তা সিল্কের ব্যবহার-জীর্ণ কামিজ, পরনে লাল নকশাপাড় ধুতি, পায়ে চীনাবাড়ির কাঁচা চামড়ার জুতা। উভয়ে সর্বদা একত্রে থাকে, গ্রামের কাহারো সাথে এ পর্যন্ত মুখ খুলিয়া কথা বলে নাই। শোনা যায় ইহারা নাকি একটি কবির দল গড়িবার চেষ্টায় আছে কিন্তু তাহার বেশি আর জানা যায় না।

বহুদিনের পরিত্যক্ত পিতৃপিতামহের ভিটায় হরিশ একখানি ঘর তুলিয়াছিলো। ঘরখানি উঠিবার পূর্বে যদি-বা হরিশ ও যতীনকে দেখা যাইতো, এখন তাহাদের দেখা পাওয়া ভার। সারাদিন তাহাদের ঘরে জানালা দরজাগুলি বন্ধ থাকিতো যেন তাহারা সূর্যালোকের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়াছে। সন্ধ্যার পর প্রকাশ হইতো তাহাদের আর-এক রূপ। রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া প্রায়ই দেখা যাইতো যতীন কেরোসিনের আলোয় বসিয়া একটা স্বরবিহীন হারমোনিয়াম লইয়া গলা সাধিতেছে ; অদ্ভুত তাহার সে-সুর, প্রচলিত রাগ-রাগিণীর শুদ্ধ মিশ্র কোনো অবস্থার সহিত তাহার সে-সুর মিলে না। শুনিয়া মনে হয় কী-একটা দুর্বোধ্য করুণতা ব্যক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কিন্তু সপ্তস্বরের কোনোটি দিয়াই তাহার

প্রকাশ হইতেছে না, বরং সুর কাটিয়া গিয়া তাহার চেষ্টাটুকুকেও হাস্যকর করিয়া তুলিতেছে ; সম্মুখে বসিয়া হরিশ পরম আহ্লাদে একান্ত তৃপ্তমুখে মাথা দুলাইতেছে।

মাঝে-মাঝে যতীনের গান বাজনা বন্ধ থাকিতো, সেদিন প্রকাশ পাইতো হরিশের স্বরূপ। দেখা যাইতো খালি তক্তপোশের পরে যতীন কুণ্ডলী করিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে আর হারিকেনের আলোয় একটা কাঠের বাক্সের উপর উবু হইয়া বসিয়া একটা তক্তপোশের উপর কাগজ রাখিয়া হরিশ ঘাড় গুঁজিয়া কী লিখিয়া যাইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কী জানি কেন ছোটোঘরখানির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বারংবার ছুটাছুটি করিতেছে, লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতো তাহার পরই হাসিয়া ফেলিতো। গ্রামের সকলেই বুঝিলো এবং একবাক্যে রায় দিলো ইহারা অপ্রকৃতিস্থ, হয়তো-বা উন্মাদ হইতে এখনো কিছু বাকি আছে।

সময়টা বোধ হয় কার্তিকের শেষের দিকে হইবে ; একশো আট বেলপাতা দিতে নন্দরানীর তখন প্রায় গোটা ত্রিশেক বাকি আছে। কিছুক্ষণ পূর্বে ভোর হইয়াছে, পদ্ম আসিয়া ডাক দিতেই নন্দরানী পূজার উপকরণ হাতে বাহির হইয়া পড়িলো। একটু শীত পড়িয়াছে, স্নান করিবার ভয়ে আর-কেহ আসিবে না, কাজেই তাহাদের জন্য অপেক্ষা না-করিয়া দুজনে বুড়াশিবের মন্দিরের দিকে রওনা দিলো।

এতক্ষণ তাহারা কথা বলিতে-বলিতে আসিতেছিলো। সম্মুখে তরফদারদের কাছারি, তারপরে একটুখানি ফাঁকা জমি, তারপরই পটুয়াপাড়া। গ্রামের আর দশজনের সাথে নন্দরানী ও তাহার সঙ্গীরাও ইহাদের কথা জানিতে পারিয়াছিলো। অন্য পথ নাই বলিয়াই হরিশদের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহাদের বুড়াশিবের পূজা দিতে যাইতে হইতো। অন্য সঙ্গীদের মতো নন্দরানীও পথে বাহির হইয়া প্রতিজ্ঞা করে, আজ কিছুতেই হরিশদের কথা ভাবিবে না, তথাপি হরিশদের বাড়ির কাছাকাছি আসিতেই কী করিয়া তাহাদের কথা মনে পড়িয়া যায়। ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠে। অত ভোরে হরিশদের ঘুম ভাঙিবার কথা নয় তথাপি পাছে কথাবার্তার শব্দে তাঁহারা জাগিয়া উঠে এই ভয়ে নন্দরানী হরিশদের বাড়ি পার না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গীকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

পদ্ম ও নন্দরানী কথা বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিলো। তরফদারদের কাছারি পার হইয়া তখন তাহারা ফাঁকা জায়গাটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সহসা দুজনে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলো। কোথা হইতে একটা ভারি মিষ্টি শব্দ আসিতেছে। একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া পদ্ম বলিলো 'বাঁশি'। নন্দরানী নীরবে মাথা দুলাইয়া জানাইলো—'হ্যাঁ'। তাহারা আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলো।

ভোরের কোকিলের মতো দ্বিধায় পড়িয়া বাঁশিটি এতক্ষণ মৃদুস্বরে থামিয়া থামিয়া বাজিতেছিলো, সহসা গোটাকয়েক টান দিয়া বাঁশির শব্দ এবার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পূর্ণ হইয়া উঠিলো। মুখ তুলিয়া পদ্ম দেখিলো হরিশদের জানালা খোলা, খোলা জানালার পাশে বসিয়া যতীন বাঁশি বাজাইতেছে নন্দরানীর আঁচল ধরিয়া টান দিয়া আর্ত চাপা গলায় পদ্ম বলিলো—'পালা'। নন্দরানী শুনিলো না। পরমুহূর্তে পদ্ম পিছন ফিরিয়া ছুটিয়া পালাইলো।

নন্দরানীর মনে হইলো কে যেন বলিষ্ঠ মুষ্ঠিতে তাহার হৃৎপিণ্ডটি চাপিয়া ধরিয়াছে। একটা অস্বাভাবিক ব্যথায় বুকটি ফাটিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে সে ফাঁকা জায়গাটুকু পার হইয়া যতীনের জানালার গোড়ায় যাইয়া দাঁড়াইলো। পা দুটি তাহার অবশ হইয়া আসিতেছে, শক্ত মুঠিতে নন্দরানী যতীনের জানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলো। পদ্ম ফিরিয়া না আসিলে ব্যাপারটি কতদূর গড়াইত বলা যায় না। উন্মাদের ভয়ে পদ্ম পালাইয়াছিলো বটে কিন্তু বেশি দূর যায় নাই, নন্দরানীকে সে সত্যই ভালোবাসিতো। তরফদারদের কাছারির কাছে দাঁড়াইয়া সে সব দেখিতে লাগিলো। যখন বুঝিলো উন্মাদ হরিশ বা যতীন কেহই তেমন ক্ষতি করিবার মতো লক্ষণ দেখাইতেছে না তখন সে সাহস করিয়া ফিরিয়া আসিলো একেবারে নন্দর পাশে এবং প্রাণপণ বলে নন্দকে জানালার কাঠ হইতে ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া পালাইলো। শিবপূজা সেদিন হইলো না।

বাড়িতে ফিরিয়া পদ্ম নন্দরানীর সহিত ইহার জন্য অনেক ঝগড়া করিয়াছে, নন্দরানীর মৃত্যু কামনা করিয়াছে, সে মরিলে যে তাহার হাড় জুড়ায় তাহাও জানাইয়া দিয়াছে—নন্দরানী উত্তর দেয় নাই, শেষে পদ্ম যখন কানুর বাঁশি লইয়া কী একটা ইঙ্গিত করিতে যাইতেছিলো তখনই নন্দরানী একবার শুধু ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকাইয়া ছি-ছি করিয়া উঠিয়াছিলো।

ইহার পর কিছুদিনের কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, বড় দুঃখের কথা সেগুলি। শুনিলে মনে হয় দুঃখ-দুর্দশাগুলি যেন তাহার জন্য লাইন বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলো, সময় হইতেই একটির পর একটি করিয়া নামিয়া আসিয়াছে। নন্দের বিবাহের পরের ঘটনা।

নন্দর বিবাহের বৎসর পূর্ণ না-হইতে তাহার শ্বশুরবাড়িতে বিপদ ঘনাইয়া আসিলো। তাহার শ্বশুর হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া উঠিয়া ঘরে আসিয়া নন্দর স্বামী যখন ক্লান্তি জানাইয়া শয্যা আশ্রয় করিলো তখনই কাছে আসিয়া নন্দ দেখিলো তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। জ্বরের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে অবশ্য অধিক সময় লাগিলো না, কিন্তু জ্বরের অল্প অবশেষটুকু যেন খুঁটি গাড়িয়া বসিল। সন্ধ্যা হইতেই সেই সামান্য জ্বরটুকু রোজই প্রকাশ হইতে লাগিলো। প্রথমে ডাক্তার, তারপরে কবিরাজ, তাহার পর মুষ্টিযোগ। অবশেষে স্থির হইয়াছিলো পাত্রপাত্রীর ঠিকুজি মিলাইয়া দেখিতে হইবে, একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাও দরকার।

ঠিক এ রকম সময়ে কী করিয়া কোথা হইতে সেদিন সকালবেলার বাঁশি শুনিবার ব্যাপারটি একটি কুৎসিত কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়া গেলো। অনেকে ইহার জন্য জৌগ্রামে বাদলীর মাকে দোষী করিয়াছে, কেহ কেহ বলিয়াছে পদ্মর নির্বুদ্ধিতাই ইহার জন্য দায়ী। অতীতের দিকে চাহিয়া আমি শুধু নন্দর দুর্ভাগ্যকে দেখিতে পাই। নতুবা নন্দরানীকে বধূবেশে সাজাইতে-সাজাইতে সমবয়স্কা আর দশজনের সামনে হাসিতে-হাসিতে বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় পদ্ম যে-রসিকতা করিয়াছিলো তাহার এমন কুৎসিত পরিণতি হইবে কেন। কৌতুকরসে তখন তাহারা উন্মাদ। হায়রে, এই রসিকতাটুকু করিবার জন্য কতই না অনুতাপ পদ্ম করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যদি পদ্মকেই ইহার জন্য দায়ী করিতে হয় তবে তাহার পক্ষে অন্তত একটি কথা বলিবার আছে, নন্দরানীকে পিশাচগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিলো তাহার পদতলে ত্রিশূলের ছাপ আছে কিনা প্রকাশ্যে তাহা প্রমাণ করিবার যে আয়োজন হইয়াছিলো সেসবের সহিত পদ্মের কাহিনীর কিছুমাত্র যোগ ছিলো না।

নন্দরানীকে নির্যাতিত করা গেলো, অপমান করা গেলো, খাঁচায় আবদ্ধ অদ্ভুত একটি জীবের ন্যায় গ্রামের সকলের কৌতুক ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাকে অনেক কাঁদিতে হইলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলো না। গাঙ্গুলির অভিশাপ ফলিতে বাকি ছিলো, তাহাই ফলিলো। বৎসর শেষ হইবার অল্পপরেই শিশু কন্যাটিকে কোলে লইয়া একবোঝা কলঙ্ক মাথায় করিয়া বিধবাবেশে নন্দ বাপের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলো।

তখন নন্দর মা'র মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন দুর্বল লোক থাকে যাহারা দুর্দশা ও কলঙ্ক সহ্য করিতে পারে না। মানসিক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিলো, আমার এরূপই ধারণা। মা নাই, হাহাকার কাঁদিয়া উঠিবার কেহ ছিলো না। সুরেন বৈঠকখানায় বসিয়া চোখ বুজিয়া ফুরসি টানিতেছিলো, পদশব্দে চোখ মেলিয়া বলিলো—'এই এলি? আয়'। 'বাবা' বলিয়া ডাক দিতে গিয়া নন্দ হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো।

কিন্তু শক্ত মেয়ে এই নন্দরানী। সংসারে দুঃখের কথাটা পর্যন্ত বলিবার কেহ নাই। সমবয়সীরা প্রায় সবাই গ্রাম ছাড়িয়া শ্বশুরের ঘর করিতে গিয়াছে। শুদ্ধ অন্তঃপুরগুলিতে যেসব বিদেশের মেয়ে বধূরূপে আসিয়াছে তাহারা অনেকেই নন্দর সমবয়সী, তাহারাও এ বাড়িতে কেহ পা দিলো না, নন্দের কুৎসা তাহারাও শুনিয়াছে। নন্দ মায়ের জন্য শোক করিলো বটে, কিন্তু গ্রামের সকলে যে ত্যাগ করিয়াছে তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিলো না। সারাদিনে এত কাজ জমিয়া থাকে যে এসব ভাবিবার অবসরই তাহার হয়

না। এই তো সেদিন মা চলিয়া গিয়াছেন, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবারের শ্রীটুকুও লোপ পাইয়াছে. ধানের মরাইগুলির গায়ে বড়ো বড়ো ফুটা, উঠানটি কতদিন নিকানো হয় নাই, মাটির ভিতগুলিতে হয়তো এক বৎসরের মধ্যে একটি দিনও কেহ হাত দেয় নাই, এ সবই তাহাকে করিতে হইবে। সুরেন বারণ করিলে সে শুনে না, দুধের জন্য মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিলে তাহার হুঁশ হয়। মেয়েকে ভালোবাসিয়া, সুরেনের সেবা করিয়া, যেটুকু অবসর সে পায় সংসারের খুঁটিনাটি দেখিতে দেখিতে তাহা ফুরাইয়া যায়।

নন্দরানী সব গুছাইয়া লইয়াছে। নন্দরানী যা হোক করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতে গিয়া গোটা সংসারটিকে যেন বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। একটি শান্তির আশ্বাস পাইয়া সুরেন মুন্সি ফর্সির নলটিকে আঁকড়াইয়া ধরিলো।

কিন্তু এই শান্তির মধ্যেও একদিন একটু অসন্তোষ দেখা দিলো। কয়েকদিন হইতে নন্দরানীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অন্যায়ের নালিশ সুরেনের কানে আসিতেছিলো. সেদিন বৈকালে সুরেন গাঙ্গুলিমশাই-এর নিজের মুখে নালিশ শুনিয়া আসিয়াছে। বাড়িতে ফিরিয়া একটু বিরক্ত হইয়া সুরেন জিজ্ঞাসা করিলো—'এসব তুই কী করছিস, নন্দ'?

তুলসীমঞ্চের পাশে বসিয়া নন্দরানী প্রদীপের সলিতা তুলিতেছিলো, হাসিয়া কী একটা বলিতে গিয়া সুরেনের মুখের দিকে চাহিতেই বুঝিলো সুরেনের প্রশ্ন আজ অন্যান্য দিনের মতো গৃহস্থালীর কোনো ছোটো বিষয় লইয়া নয়। উঠিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বলিলো—'কী বলছো'?

—'তুই গাঙ্গুলির সাথে আর একটা মামলা বাঁধাবি'?

—'আমি? কই, না তো! গাঙ্গুলিমশাই বলছিলেন, মণ্ডলদের দরুন ডোবাটি নিতে হলে মামলা করে নিতে হবে। তাই আমি বলে পাঠিয়াছি, আমি মেয়েমানুষ আইন-টাইন বুঝিনে, হারান আর গোলামকে আজ পাঠালাম ধানের জন্য চাষ দিতে। তুমি কিছু ভেবো না বাবা, মামলা আমি সহজে করবো না।

সুরেন মুন্সি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো। সেদিনের মেয়ে নন্দ দুর্দান্ত মামলাবাজ গাঙ্গুলিকে এমন করিয়া জব্দ করিবার মতো বুদ্ধি তাহার মাথায় কোথা হইতে আসিলো। বুঝিতে পারিলো পত্নীবিচ্ছেদের পর হইতে সে যেখানে সংসারের হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলো ঠিক সেইখানে নন্দরানী দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা চাপিয়া ধরিয়াছে। সুরেন মুন্সি ফুরসির নলে মুখ দিয়া ভাবিলো, অবশেষে স্থির করিলো—তাহার যাহা কিছু আছে সবই একসময়ে নন্দরানীর হইবে, সেক্ষেত্রে নন্দ যদি এখন হইতেই তাহা গুছাইয়া লইতে থাকে তবে তাহাতে দোষের কী আছে! এতদিন তবু সংসারের দিকে একটু-একটু চাহিতে হইতো এবার হইতে তাহারও আর প্রয়োজন হইবে না। নূতনতর একটা মুক্তির আস্বাদে সুরেন মুন্সি খুসি হইয়া উঠিলো।

ইহার কিছুদিন পর লোকে প্রকাশ্যে বলিতে আরম্ভ করিলো : মুন্সিদের নাম আগেও ছিলো বটে তবে মুন্সিরা নিজে যাহা করিতে পারে নাই সেদিনের মেয়ে নন্দরানী সামান্য কয়েক বৎসরেই তাহা করিয়াছে। অত টাকা সত্ত্বেও সুরেনের বাবা যাহা করিতে পারে নাই সেই চণ্ডীমণ্ডপের ইট গাঁথার কাজ গত বৎসর নন্দরানী শেষ করিয়াছে, যে হুসেনপুরের বিল দখল করিবার জন্য সুরেন ঘরের অর্ধেক টাকা বৃথা অপব্যয় করিয়াছিলো নন্দরানী তাহাও দখলে আনিয়াছে, চাষ হয় নাই বটে তবে তাহার অদ্ভুতকর্মা হারান ও গোলামের কথা কে না জানে।

কিন্তু এতসব কাহার জন্য? গ্রামের লোকরা কিছুদিন হইতে মুন্সিবাড়ির এ দিকটাও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাদের একদল অবশেষে গ্রামের স্কুলের তরফ হইতে নন্দরানীর কাছে দরবার করিতে গিয়াছিলো, সহরের কোনো লেখককে দিয়া একটা অভিনন্দনও লিখাইয়া আনিয়াছিলো—কিন্তু বিশেষ আর কী লাভ হইলো, নন্দরানী হাসিতে হাসিতে চাহিবামাত্র হাজার টাকা তাহাদিগকে দিয়াছে কিন্তু পরে শত অনুরোধেও আর একটি পয়সা দেয় নাই। আপাতত গ্রামের হাসপাতালটিকে নন্দরানীর মায়ের নামে উৎসর্গ করিলে কিছু হয় কিনা তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে।

অভাববোধটি নন্দবানীবও ছিলো। একটি উত্তবাধিকাবীব অভাব তাহাকে কখনো কখনো অন্যমনস্ক কবিতো বৈকি। সুবেন মুন্সিবও এমন একটি খেদ ছিলো।

মনে হইলেই কাজ কবিতে হইবে ইহা নন্দবানীব অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গ্রামেব লোককে ঈর্ষাপবাযণ কবিয়া নয, পবিতুষ্ট কবিযাই খেদ মিটাইবাব ব্যবস্থা কবিলো নন্দবানী। বাপ ও মেয়েতে পবামর্শ কবিযা কিশোবী চপলাব বিবাহ দিযাছে। নন্দবানীব মেয়ে চপলা মাযেব মতোই সে সুন্দবী হইযাছে। ববটিও তাহাব জুটিযাছে বাজপুত্রেব মতো, দুটিতে একসাথে দাঁড়াইলে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয।

আব একটি গোপন সখ ছিলো নন্দবানীব—বাধেব জন্য একটা পাকাঘব তুলিযা দিযা তাহাব সংস্থানেব ব্যবস্থা কবিযা দেওযা। ব্যাপাবটা একটু বুঝাইযা বলি গত বৎসবেব কথা। মহাপ্রভুব বাৎসবিক মেলা উপলক্ষ্য কবিযা নন্দবানী সুবেনেব সাথে তিলজোড়ায গিযাছিলো। মেলা ভাঙিবাব দিন প্রায সকল গ্রামেব দলই চলিযা গিযাছে, তাড়াতাড়ি কোনো প্রযোজন ছিলো না বলিযাও বটে, পথেব ভিড় এড়াইবাব জন্যও বটে, নন্দবানীব গাড়ি দুখানি তখনো মেলাব একপ্রান্তে অপেক্ষা কবিতেছিলো এমন সমযে চপলা ছুটিযা আসিযা খবব দিলো— মা মাসিমা ডাকছে তোমাকে।

নন্দবানী যেন আকাশ হইতে পড়িলো। চপলা বুঝাইযা বলিলো— সে একটা ভিখেব আলা ওদিকে বসে বসে কাঁদছিলো আমি গিয়ে যেই জিজ্ঞাসা কবেছি অমনি বললো আমি তোমাব মাসিমা হই খুকি শিগগিব তোমাব মাকে ডেকে দাও'।

অতঃপব চপলাব সঙ্গে যাইযা নন্দবানী বাধেকে আবিষ্কাব কবিযাছিলো। আলাপেব প্রথমক্ষণেই নির্লজ্জ বাধে মুখ টিপিযা হাসিযা চিবাইযা চিবাইযা বসভবে তাহাব যৌবনেব যে ইতিবৃত্ত নন্দবানীকে শুনাইযা দিলো তাহাতে বৈষ্ণবীজীবনেব যত বসেবই সন্ধান থাক ঘৃণায নন্দবানীব দেহমন গুটাইযা উঠিলো। নূতনতম বৈষ্ণবটি তাহাকে ছাড়িযা যাইবাব সমযে পাথেয ভিক্ষালব্ধ চাউলগুলি, এমনকী দ্বিতীয বস্ত্রখণ্ডটি পর্যন্ত লইযা গিযাছে, দুবন্ত ব্যাধিতে তাহাব নিজেব একাকী চলিবাব মতো শক্তি ও যে নাই এসব শুনিবাব মতো ধৈর্য নন্দবানীব বহিলো না। ফিবিযা আসিযা গাড়ি ছাড়িযা সে গ্রামেব পথে ফিবিতেছিলো, কিন্তু বাধেব সাথে আবাব দেখা হইযা গেলো।

গ্রামেব কাছাকাছি গাড়ি আসিযা পৌঁছিযাছে, আকাশেব কালো কাটিযা তখন পুবেব দিকে বং ধবিযা উঠিতেছে। কাছে কোথায একদল অতিলোভী মৌমাছি বাত থাকিতে উঠিযা মধুসঞ্চযে লাগিযা গিযাছে ওদিকে কোথায একটা পাখি দীর্ঘ একটানা শিষ দিযা সাথীকে জাগাইবাব চেষ্টা কবিতেছে। সাবাবাত্রিব অনিদ্রা ও গাড়িব ঝাঁকুনিতে নন্দবানী ক্লান্ত অবসন্ন হইযা নিদ্রিত চপলাব পাশে মোহগ্রস্তেব মতো পড়িযাছিলো। সহসা স্বপ্ন দেখিবাব মতো নন্দবানী ধড়মড় কবিযা উঠিযা বসিলো। এবাব সে জাগ্রত অবস্থাতেও শুনিতে পাইলো—ঐ দূবে কোথা হইতে গানেব শব্দ ভাসিযা আসিতেছে। বাত্রিশেষেব ধোঁযাটে অন্ধকাবেব আববণ ভেদ কবিযা আলোকতবঙ্গেব মতো সে সুব অন্ধকাবকে স্তবে স্তবে বাঙাইযা তুলিযাছে, প্রভাতেব শিশিব বাতাসেব মতোই তাব স্নিগ্ধতা, নূতন আলোকে ক্রমদৃশ্যমান পৃথিবীব মতোই তাহা স্বপ্নময।

গান গাহিতেছিলো বাধে—পথ চলিতে চলিতে একতাবা বাজাইযা। এবাব তাহাকে পথেব বাঁকে দেখা গেলো। প্রথমে গান শুনিবাব জন্য গাড়ি থামাইযা, পবে অপসৃযমান বাধেব কাছে পৌঁছিবাব জন্য অস্বাভাবিকভাবে গাড়ি ছুটাইযা নন্দবানী বাধেকে ধবিযা আনিযাছিলো।

বনের পাখি ধরিয়া আনিযা খাঁচায পুবিলে যাহা হয তাহাই হইলো। আহার্যেব প্রাচুর্যে বাধেব কুৎসিত মুখেও খানিকটা সজীবতা ফিবিযা আসিযাছে, কিন্তু গান আব সে কবিলো না। ভোব হইবাব ঠিক পূর্বক্ষণে মতিচ্ছন্ন কোনো এক পাখিব ডাকে অনেকদিন নন্দবানীব ঘুম ভাঙিযা গিযাছে। দুযাব খুলিযা বাগানেব দিকেব বাবান্দায় আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে। যূথী ফুলেব কেযাবিব আড়ালে খড়েব ছোটোঘবখানিব দিকে

চাহিয়া চাহিয়া সে কীসের প্রতীক্ষা করে কে জানে! সূর্যের প্রথম আলো লাগিয়া আকাশের প্রান্ত লাল হইয়া না-ওঠা পর্যন্ত এ মোহ তার টুটে না। ভাবিতে গেলে নিজের কাছেই তাহার বাড়াবাড়ি লাগে, নিজের কাছেও সে স্বীকার করিতে পারে না ; রাধে আর-একদিন কবে তেমনি করিয়া গাহিয়া উঠিবে সে তাহারই প্রতীক্ষা করে।

তথাপি রাধের কুটিরের ভিত্তি সে পাকা করিয়া দিয়াছে। আর কিছু করিবার মতো নন্দরানীর চোখে পড়ে না। একদিন পিতাপুত্রীতে পরামর্শ শেষ করিলো, এবার তাহারা তীর্থের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িবে। ফিরিবে কিনা তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, তবে তাহাদের যে ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই ইহা তাহারা অন্যের কাছে না বলিলেও নিজেরা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছে।

গৃহত্যাগের উদ্যোগে বিষয় আশয়গুলি চপলার নামে রেজেস্ট্রি করিবার জন্য সুরেন সদরে গিয়াছিলো ; দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া নন্দরানী সংসারের সব কিছু সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিয়াছে, এখন শুধু চপলার হাতে ধরিয়া দেয়ার যা দেরি। এমন সময় অপ্রত্যাশিত দুঃখ আসিয়া তাহাদের সকল পরিকল্পনা নষ্ট করিয়া দিলো। একটি বিরাট বৈরভাবাপন্ন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা শুধু নিজের শক্তি ও তেজের পর নির্ভর করিয়া বাস করিতে হইবে, ইহাই বোধ করি নন্দরানীর ভাগ্যলিপি।

সদরে যাইবার চতুর্থ দিনে সুরেন প্রবল জ্বর লইয়া ফিরিয়া আসিলো। গোরুর গাড়ি হইতে নামিবার সময়েও সুরেনের জ্ঞান ছিলো। ঘরে আসিয়া সুরেন আরক্ত চোখ মেলিয়া নন্দরানীকে বারংবার খুঁজিয়াছিলো বটে, কিন্তু এক হাতের মধ্যে নন্দরানীকে দেখিয়াও তাহাকে চিনিতে পারে নাই। গ্রামে ফিরিয়া একদিন—একরাত্রি সুরেন জীবিত ছিলো।

সুরেনের শব উহারা লইয়া গিয়াছে। বেদনার প্রথম আঘাতে শবের অনুসরণ করিয়া টলিতে-টলিতে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলো নন্দরানী সেখানে স্থির নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো।

বহুদিন পরে সেদিন নন্দরানীকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিলো। আধময়লা নরুনপাড় একখানা ধুতি পরনে, পরিবার ধরনেই হক, ছোটো বলিয়াই হোক সে ধুতি হাঁটুর কাছে উঠিয়া আসিয়াছে। কপাল জুড়িয়া বৈষ্ণবীদের মতো করিয়া নীলবর্ণের উল্কি, গলায় তাহাদের মতো করিয়া পরা তুলসীর মালা। খাটো করিয়া ছাঁটা চুলগুলি কাঁধের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দেহের সে বর্ণ আর নাই, শোকে-দুঃখে পুড়িয়া তামাটে হইয়া গিয়াছে। কানের কাছে কয়েকটি চুলে পাক ধরিয়াছে। আজ তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিবার কিছু নাই। প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্যে মুখের সে হাসিটুকুও মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে যেখানে বেলা পড়িয়া আসিতেছে সেদিকে চাহিয়া নন্দরানী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারাদিনের মধ্যে সে একবারও হাহাকার করিয়া কাঁদে নাই। রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত চোখের কোণে এককোঁটা জল কোনোসময়ে আসিয়া জমিয়াছিলো, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের কোণ দুটি বার বার কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলায় কিম্বা নিরুদ্ধ অভিমানের অশ্রুবেগ সম্বরণ করিবার জন্য তাহা জানি না।

তীর্থে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই, সংসারও করিতে হইবে, কিন্তু মনে যেন আর কিছুতেই বসিতে চাহে না। বাহিরের দিকে ততটা নজর পড়ে না; এই তো সেদিনও তাহার শোকাচ্ছন্নতার সুযোগ লইয়া ষোলরশির চরের জমিতে জোর করিয়া ধান কাটিতে গিয়া গাঙ্গুলিমশাই নন্দরানীর বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে না-পারিয়া অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথাপি নন্দরানীতে পরিবর্তন আসিয়াছে। বাড়িসংলগ্ন পুকুরের পাড়টি পূর্বে বারোমাস পরিষ্কার থাকিতো। এবারের বর্ষার পরে তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই ; আগাছা বাড়িয়া পূর্বের ও উত্তরের পাড় দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে নাটমন্দির গড়িবার জন্য সদর হইতে ইট, চুন, সুরকি আসিয়াছিলো—ইটগুলিতে শ্যাওলা পড়িয়া গিয়াছে, চুন-সুরকির স্তূপে বর্ষার জল পড়িয়া সেগুলি বরবাদ হইয়া গেলো, তথাপি সেগুলিকে কেহ ঢাকিয়া দিতেছে না। ঠাকুরের ভোগ, আরতি, অতিথি-অভ্যাগতের আদর যত্ন কোনোটিতে কোনো ত্রুটি

দেখা যায় না। ভিনগ্রামের যে ছেলে কযটি তাহার বাড়িতে থাকিয়া গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করে তাহারা খাইতে বসিলে আজও নন্দরানী স্বযং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তদারক করে। তথাপি এসবেরই আড়ালে কোথায একটি বড়ো ফাঁকি রহিয়া গিয়াছে তাহা নন্দরানীর নিজের কাছেও ধরা পড়িয়া যায।

মাঝে-মাঝে নন্দরানী নিজের জীবনের কথা ভাবিতে বসে। ভগবানকে সে বিশ্বাস করে। সে-বিশ্বাসকে সহাযতা করিবার জন্য যুক্তিতর্কের প্রযোজন হয না। তথাপি নিজের ভাগ্যকে ভগবানের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। লোকের মুখে শুনিয়াছে বাল্যে নাকি কী করিয়া একবার সে অতি জাগ্রত কালীঠাকুরকে অপমান করিয়াছিলো, তাহার জীবনের দুঃখগুলি নাকি সেই পাপের ফল। কালীর অভিশাপ নাকি তাহার ভবিষ্যৎ, ভাগ্য এমনকী মতিবুদ্ধিকেও গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু ভালোমন্দ বিচার বুদ্ধি জন্মিবার পূর্বে যদি সে কোনো অপরাধ করিয়াও থাকে তাহার জন্যই তাহাকে সমস্ত জীবন ভরিয়া প্রাযশ্চিত্ত করিতে হইবে দেবতাকে এতখানি নিষ্ঠুর ভাবিতে তাহার প্রবৃত্তি হয না। বিরুদ্ধ অভিমানে তাহার চোখের প্রান্ত বহিয়া একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

নূতন করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা আর হয না। শ্রীপতি চপলা আসিলে তাহাদের হাতে সব কিছু বুঝাইয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট। কথা আছে সপ্তমীর পূজার দিন শ্রীপতি আসিবে, তাহার হাতে গোছাইয়া তুলিয়া দিয়া নন্দরানী পূজার গোলযোগ মিটিলেই বাহির হইয়া পড়িবে। তাহার পরই আসিবে মুক্তি। ভবিষ্যতের সে আনন্দের আস্বাদ দুঃখের মধ্যেও নন্দরানীকে আনমনা করিয়া দেয।

অবশেষে সেদিনটি আসিয়া পড়িলো। নন্দরানীর তীর্থে যাইবার সংকল্পের কথা চপলার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছিয়াছিলো। মাযের আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া চপলা কাতর হইয়া পড়িয়াছিলো বলিয়া শ্রীপতি তাহাকে কিছুদিন আগেই মাযের কাছে রাখিয়া গিয়াছিলো। আজ সকালে সে নিজেও আসিয়াছে।

বাহিরে মণ্ডপে পূজার ঘট স্থাপিত হইতেছিলো, সেখানে দাঁড়াইয়া নন্দরানী নিজের করা আযোজনগুলির ত্রুটি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া সংশোধন করিতেছিলো। বৃদ্ধ পুরোহিত পাছে ত্রুটি হইয়া যায এই ভযে অতি সাবধানী হইতে গিয়া সাধারণ ব্যাপারগুলিও গুলাইয়া ফেলিতেছে, নন্দরানী সেগুলির দিকে অবিরত তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এইমাত্র আগামী বৎসরে এই দিনে কী হইবে তাহার কথা উঠিয়া পড়িয়াছিলো।—নন্দরানী হাসিতে হাসিতে পুরোহিতকে বলিযাছে, তাহার ফাঁকি ধরিবার জন্য সে অবশ্যই তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবে। এমন সময শ্রীপতি আসিয়া দাঁড়াইলো। কোথায রহিলো ঘটস্থাপন, আর কোথায রহিলো পুরোহিতের ত্রুটিবিচ্যুতি, আনন্দের আতিশয্যে শ্রীপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলো।

মুক্তির আনন্দে নন্দরানী সকল কর্মে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু শুধু নিজের আনন্দ লইয়া থাকিলেই তো চলিবে না। চপলা ও শ্রীপতিকে বিষযসম্পত্তি যেখানে যাহা আছে সর্বকিছু বুঝাইয়া দিযাই ক্ষান্ত হয নাই , সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া পূজার খুঁটিনাটি আযোজনগুলিও বুঝাইয়া দিযাছে , প্রজাদিগকে কর্মচারীদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া শ্রীপতির সাথে সকলের আলাপ করাইয়া দিযাছে, শ্রীপতির সাথে তাহারা সদ্ভাবে চলিবে এ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছে। শ্রীপতি ও চপলা আরো কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়াছিলো, শোনে নাই।

খবরটি বহিয়া আনিলো রাধে। প্রতিবারেই এ সমযে একদল বেদে এ গ্রামে আসে। তাহাদের মধ্যে একদল গ্রামের পথে পথে টিপ, লকেট, কার ইত্যাদি ফিরি করিয়া বেড়ায, আর একদল ছোটো একটি তাঁবু খাটাইয়া গুটি দু'এক বাঁদর, একটি রামছাগল, একটা অজগর সাপ লইয়া খেলা দেখায, এবারও তাহারা আসিয়াছে। গাঙ্গুলিমশাই এর যে পতিত জমিটুকুকে ইহারা প্রতি বৎসরে আশ্রয লইতো এবার তাহাতে চাষ হওযাতে তাহারা আশ্রয লইযাছে সন্নিকটস্থ মুন্সিদের জমিতে এসবে বিশেষত্ব কিছু নাই। রাধে আসিয়া বলিলো, বেদেদের সাথে নাকি একজন বাঁশিআলা আসিযাছে , এক চোখ তার কানা, কী একটা রোগে তাহার বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গিযাছে, আঙুলগুলিতে বিশ্রী ক্ষত, তবু বাঁশি সে অদ্ভুত

ভালো বাজায়। তাহার পরে গলা নিচু করিয়া রাধে বলিলো—লোকে বলাবলি করছে ওর নাম নাকি কানা যতীন, ওকে নাকি একসময়ে চিনতে।

কথাটা শুনিয়া নন্দরানীর মুখ একেবারে রক্তহীন হইয়া গেলো—পরমুহূর্তে কিন্তু সে হাসিয়া ফেলিলো। তীর্থপথযাত্রীর নিঃশঙ্ক নির্ভরতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। শুধু রাধের কৌতূহল নয়। গ্রামের লোকের কানাকানিও সে উপেক্ষা করিলো। এমনকী পূজা দেখিতে আসিয়া অনেক কৌশলে পরিচয় দিয়া গ্রাম্যলোকের নিন্দা গাহিবার প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিবার ছলে গাঙ্গুলিগিন্নি যখন কুৎসা-কাহিনীকে টাটকা খবরের মতো সজীব করিয়া তুলিলেন তখনও নন্দরানী বিচলিত হইলো না। একটা আশঙ্কামাত্র তাহাকে আকুল করিলো—তাহা চপলাদের কানে এ কলঙ্ক কথা পৌঁছিবার। হে ঠাকুর, তাহার যাইবার দিন আসিয়া পড়িয়াছে, সন্তানের সম্মুখে যেন তাহার মাথা নীচু না-হইয়া যায়।

কিন্তু মনোবল দিয়া ভাগ্যকে জয় করা যায় না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত যতীন তাহার বিক্ষত আঙুলগুলি লইয়া কেন সেদিন গভীর রাত্রের বাঁশি বাজাইতে বসিলো কেহ জানে না। কোনোদিনই কেহ জানিতে পারে নাই। হয়তো তাহার কন্যাস্থানীয়া সেই বেদের মেয়েটা আজ তাহার আহার্যের সংস্থান অন্যদিন অপেক্ষা ভালো করিতে পারিয়াছিলো, হয়তো গাছগাছড়া বাঁটিয়া তাহার আঙুলে যে প্রলেপ দিয়া দিয়াছে তাহাতে আজ যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইয়াছে। হয়তো-বা বহুদিনের পুরাতন এমন অনেক পূজার দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া তাহার মনকে উদাস করিয়া দিয়াছিলো।

শ্রীপতি ও চপলা শুইতে গিয়াছে, দিনের হিসাব শেষ করিয়া সরকারমশাই এইমাত্র বিদায় লইয়াছে। সেজ জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া নন্দরানী সকালের ডাকে আসা চিঠি দুইটি আবার খুলিয়া বসিয়াছে। যে কয়টি বিদেশী ছাত্র তাহার বাড়িতে থাকিয়া গ্রামের স্কুলে পড়ে চিঠি লিখিয়াছে তাহারা। হয়তো তাহাদের শিক্ষকদের ইঙ্গিত আছে ইহাতে, হয়তো ইহার অনেক কথাই শিখাইয়া দেয়া, তথাপি চিঠি পড়িতে পড়িতে তাহাদের একান্ত নির্ভরশীল স্নেহপ্রত্যাশী মুখগুলি বারবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নন্দরানী চিঠি দুখানি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া উঠিতেছিলো, বাঁশির আকুতি আসিয়া নিরুদ্ধ কান্নায় তাহার পায়ের উপরে ভাঙিয়া পড়িলো। স্খলিত অঞ্চলে নন্দরানী উঠিয়া দাঁড়াইলো। উদ্‌গত অশ্রুতে তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিলো।

ঘোর কাটিলে নন্দরানী দেখিল চপলা তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ঘরের ওদিকে শ্রীপতি মাথা নিচু করিয়া নিঃশব্দে পায়চারী করিয়া ফিরিতেছে। চপলা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলো—'কোথায় যাচ্ছিলে মা'? নন্দরানীর মনে পড়িলো কোথায় যেন সে যাইতেছিলো, কে যেন তাহাকে অন্ধকারের মধ্যে ডাকিয়া লইতেছিলো। বোধ হয় সদর দরজার কাছে কাহারা তাহার পথ আটকাইয়া রাখিয়াছিলো। তাহার পর আলো আসিলো, শ্রীপতি, চপলা, দাসদাসী, অতিথি-অভ্যাগত সকলে মিলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। চপলা আবার প্রশ্ন করিলো—'বললে না, মা'?

নন্দরানী বলিলো—'বোধ হয় বাঁশি শুনতে'। কিন্তু কথাটা বলিয়াই কেমন যেন অসংলগ্ন ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইলো। বিরক্ত হইয়া নন্দরানী পাশ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলো।

তাহার পরের দিন আসিলো। নন্দরানীর কিছুই মনে পড়ে না দিনের কথা। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে পড়ে। কানা যতীনকে শ্রীপতি ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহখানিতে নির্মম বেত্রাঘাতে সে জর্জর করিয়া দিতেছে, একপাশে দাঁড়াইয়া গাঙ্গুলিমশাই তাহাকে নিরস্ত করিবার ছলে নন্দরানীকে বিঁধিয়া বিঁধিয়া বলিতেছেন—'থাক, থাক ওর দোষ কী বলো, স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা, দুর্বল—মনুতেও এ কথা আছে'।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দেয়ালে মাথা রাখিয়া নন্দরানী ভাবিতেছিলো ; ভাবিবার শক্তিও তাহার যেন নাই। মনে পড়িতেছে আজ সারাদিনে চপলাও একবার কাছে আসে নাই, নির্লজ্জা রাধেও কোথায় মুখ লুকাইয়া আছে।

ভোরের হাওয়া বহিতেছে। রাত্রিশেষের শুকতাবাটি দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। সহসা একতারার দু-একটি মৃদু শব্দ শোনা গেলো। তাহার পর রাধের গান। উৎকর্ণা হরিণীব মতো নন্দরানী আবার উঠিয়া দাঁড়াইলো। নীরবে সে তাহার বারান্দা হইতে নামিয়া আসিলো, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া চোরের মতো শ্রীপতির ঘর পাব হইয়া আসিয়া বাগানের দিকের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইলো।

গাহিতে-গাহিতে প্রদীপেব ম্লান আলোয় কপালের রসকলিটি আরো একবার ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া আয়না ও মাটি ঝোলায় পুরিয়া ছোটো পুঁটুলিটি ও একতারা হাতে করিয়া রাধে উঠিয়া দাঁড়াইলো। গাহিতে গাহিতে দরজার অন্ধকাবে আসিযা নন্দবানীর ঘরের দিকে মুখ করিয়া একবার সে দাঁড়াইলো। কী ভাবিয়া আবার নিজের ঘরে ঢুকিয়া ফুঁ দিয়া প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া আসিলো। তাহার পর নিঃশব্দে বাহিরের আম গাছগুলির ছায়ায় মিলাইযা গেলো।

তাঁতী বউ

সব দেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ, আর একটি আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাঙলা দেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙক্ষাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প একটা বলছি:

অভিমন্যু বসাকের ছেলে গোকুল বাপের ব্যবসায়ে উন্নতি যতটা করলে অবনতি তার চাইতে কম করেনি। অভিমন্যুর ছিলো আটপৌরে ঠেটি আর বচকানা কাপড়ের ব্যবসা, পয়সা যা পেতো তাতে দিন চলে যেতো, এমনকী শেষ পর্যন্ত সে তাঁতী বউয়ের নামে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছে। যতদিন পারা যায় গোকুল কাঁধে লাল গামছা দুলিয়ে খসবু-দেওয়া পান খেয়ে নিছক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু করলো না। বাপের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে সে যন্তরপাতিগুলি নিজের মতো করে গুছিয়ে নিলো; লোকে অবাক হলো দেখে, যে-গোকুল অপদার্থ হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে সে বাপের আসনে বসে বাপের মতো ঠেটি আর বচকানা বুনে যাচ্ছে যেন কতদিনকার অভ্যাস।

লোকে বলে পরিবর্তন তারপরে যেটা হলো তার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলো, কাজেই বাপের শোক গা-সহা হতেই গোকুল একদিন তাঁত ঘরে সব উল্টে পাল্টে ভেঙে চুরে ফেললো যখন, তখন তারা আদৌ অবাক হলো না। তবু গোকুল তাদের অবাক করলো। তিন গুরুবার পার হয়ে যাবার পরে চারের বারে গোকুল বিকেলবেলায় কচি কলার পাতায় কী একটা মুড়ে নিয়ে গ্রামের জমিদারবাড়ির দিকে রওনা হলো। সে জমিদারের কাছে গেলো না, গিন্নিমার কাছে গেলো না, সোজা গিয়ে উপস্থিত কাজলার (দীঘি) ঘাটে যেখান জমিদারের নতুন আনা বেটার বউ আর নতুন-বিয়ে-হওয়া মেয়ে ইশারায় স্বামীর গল্প করছে। গোকুল যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে বেটা-বউয়ের হাতের দু'গাছা রুলি। এই হচ্ছে গোকুলের মসলিন বুনবার প্রথম কথা। গঞ্জে পাঠাবার মতো সরেস জিনিস তার তাঁতে উৎরাত না, বিশেষ করে ফুলের কাজগুলোতে সোনার আঁশ খাটাতে সে পারতো না, বড়ো জোর শাদা সুতোর বুটি উঠতো; আর বহরে সেগুলো শাজাদীর দরবারী শাড়ি হতো না, কাজেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া বড়ো বেশি কারো চোখে পড়ত না তার কারিগরি; বড়োজোর সকালে কোনো স্বামী দেখতে পেতো রাত্রির শুকনো মালাগাছির সঙ্গে বিছানায় পড়ে আছে মাকড়সার শাদা জালির মতো কী একটা।

গোকুল মাঝারি গোছের গুণী কিন্তু বড়ো রকমের খেয়ালি ছিলো। বড়ো গুণীর বড়ো খেয়ালে যা ঘটে খেয়াল মিটবার পর তার জের থাকে না। কিন্তু মাঝারি গুণী বড়ো খেয়াল ধরলে, কিম্বা মেজো গুণী মেজো খেয়ালে হাত বাড়ালে খেয়ালের জের অত সহজে মেটে না। সাধারণ ঘরের মেয়ে একরাতে মসলিনের সাতপাক পড়লে সকালে বিছানা ছাড়বার সময়ে স্বামীকে না-জানিয়ে বিছানার একপাশে আলগোছে মসলিন খুলে রেখে যেতে পারে না এও তেমনি আর কি। গোকুল তার খেয়ালে জড়িয়ে পড়লো।

শীতের গোড়ায় ইদিলশাহীতে পরগনার হাট বসতো একমাসের জন্য। সব হাটেই সেকালে নানা ধরনের পণ্য আসত, পরগনার হাটে কতগুলি বেশি দামী জিনিস আসতো। সেসবের জন্য এ হাটের

একটা দিক আলাদা করা থাকতো। অন্য সব দোকানের পসরা ফুরিয়ে যাবার পর হাটের এদিকে ভিড় লাগতো। জমিদারেরা নিজে আসতেন, এমনকী উজিররাও কেউ কেউ আসতেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এদিকে বাঁদী-বান্দার দোকান। টাকা দিয়ে বান্দা পাওয়া যেতো জোয়ান, বুদ্ধিমান, কৌশলী, পাঠান, মোগলা, খোজা, হিন্দু যার যে রকম চাই। বাঁদীও পাওয়া যেতো মুলতানি, গুজরাটি, আফগানি, শাদা, গোলাপি, শ্যামলা, কখনো বসরা থেকেও আসত। এসব দোকানের বর্ণনা ইতিহাস যা দিয়েছে তার চাইতে ভালো বলা যায় না। আনারকলি, নূরজাহাঁ এসব দোকানের বেসাতি।

গোকুল মসলিন ক'খানা বেচে ফেলেছে, দোকান ছেড়ে সে মেলায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কী-কিনি কী-কিনি ভাব। অন্য যে দু'একজন গুণী এসেছে তারাও ঘুরেছে। কিন্তু হাটের একটা দিকে সে কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছে না। লাঠি-বল্লম নিয়ে এক এক দল লাঠিয়াল তো আছেই, খোলা কিরিচ হাতে পাহাড়ের মতো উঁচু ঘোড়ায় চেপে ঝকঝকে সাঁজোয়া পরা সিপাইও আছে কয়েক দলে। গোকুল ভাবলো, বোধ হয় রাজা-মহারাজেরা কেনাকাটা করে এখানে। কিন্তু ভয়ে কৌতূহল চাপা যায় না। মেলার শেষ দিন এসে গেলো, গ্রামের সঙ্গীরা চলে গেলো কিন্তু গোকুলের যাওয়া হলো না। ওদিকের সব দোকান উঠে গেছে, এদিকেরও দু'একটা মাত্র অবশিষ্ট। প্রথমে সিপাইরা গেছে, তারপরে গেলো লাঠিয়ালরা। একদিন গোকুল দেখলো এবার এগোনো যায়।

একটামাত্র দোকানই খোলা ছিলো, দোকান ভেঙে চলে যাবে বলে একটা চাকর গালিচা, পর্দা জড়ো করে গাঁটরি বাঁধছে। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না অবশেষে সাহসে ভর করে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কীসের দোকান গো'?

বুড়ো দোকানি ফুর্রসি টানতে টানতে বলল—'মাল তো নেই বাপু আর তুমি কিনবেই-বা কী'?

—'যা হয় কিছু, খালি হাতে মেলা থেকে ফিরবো'?

—'তা দ্যাখো, বাপু, এদিকে এসো। আমার দুর্নাম গেয়ে বেড়িও না, ভালো মাল নেই, বেছে নিয়ে যাবার পর না পছন্দ এর-আরটা আছে'। এই বলে ঝানু দোকানি দোকানের ওঁচা, ভাঙা মাল হাতখালি করবার জন্য যে কোনো দামে ক্রেতাকে গছানোর ভঙ্গিতে গোকুলকে ডেকে নিলো।

পর্দা তুলে গোকুল দেখলো কোনো মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয় মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলো দেখা যায় সারা গায়ের শ্যামল চামড়ার নিচে। গোকুল বুঝলো কীসের দোকান এটা, কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসলো—'আমি কিনবো'।

কেন বললো একথা গোকুল সেদিনও বলতে পারেনি, কোনোদিনই বলতে পারবে না। তার একার সংসারে ঝি বাঁদীর কী বা কাজ। গ্রামের লোকেরা বলে সে খেয়ালে এ কাজ করেছিলো। মসলিন বিক্রির টাকা বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বললো—'আমার কেনা হলো'।

পথে দুর্বল রোগা মেয়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে কষ্ট যত না হলো তার চাইতে বেশি হলো রাগ। সে যে ঠকেছে, গ্রামের লোকেরা আর একবার তাকে বোকা তাঁতী বলবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। সমস্ত শরীরের হাড়গুলো নড়বড়ো করছে। আধময়লা ডুরে ঠেঁটি পরবার ধরনটাই বা কী। চোয়ালের হাড়গুলোর নিচে চোখ ডুবে গেছে, কাঁধের হাড়ের জোড়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কঙ্কালই হোক, কঙ্কালের গড়নের মধ্যেও একটা ছন্দ থাকা উচিত। যেন কোমর নেই এত সরু জায়গাটা, গোকুল ভাবছিলো, মচ্ করে একটা শব্দ হবে, তারপর দু টুকরো হয়ে যাবে মেয়েটি। সে বললে—'আস্তে চলো, বাপু'। তার মনে হতে লাগলো, মুচিরা মাঝে মাঝে যেমন বুড়ো গোরু হাঁটিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে এও যেন তেমনি। হাতে করে তুলে ফেলে দেবার মতো হলে সে ছুঁড়ে ফেলে দিতো তার বোকামির নিশানা কারো চোখে না-পড়ে এমন জায়গায়।

পথে ঘাটে বেরুলে লোকে ঠাট্টা করবে এই ভয়ে গোকুল ঘরে বসে তাঁত বোনে, আর কিছু কাজ যাতে হয় সে উদ্দেশ্যে মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সবল করে তোলার জন্য যখন তখন তাকে ধমকে-ধমকে

খাওয়ায়। মেয়েটা কাঁদে আর খায়, আর মাঝে-মাঝে রোদে রাখা লাটাই ঘরে তোলে, ঘরের লাটাই রোদ্দুরে দেয়। গোকুল তার দিকে চেয়েও দেখে না। চোখের কোনায় যদি হঠাৎ কখনো পড়ে, সারা শরীর ঘিন-ঘিন করে ওঠে : কি বিশ্রী, কি বিশ্রী।

মানুষ যেমন হঠাৎ একদিন মরতে পারে, তেমনি হঠাৎ একদিন বাঁচতেও পারে।

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার পর থেকে পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো বর্ষা নেমেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গোকুল ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় হিসাব দেখছে। আজকাল সে বুড়িয়ে গেছে যেন, বাঁদীটাকে কিনে যে লোকসান হয়েছে তাই উশুল করতে গিয়ে সেই-যে সে টাকা-পয়সার হিসাবে নেমেছে ক্রমশই তাতে জড়িয়ে পড়ছে।

মেয়েটি চট পেতে বারান্দায় শোয়। কদিনের বৃষ্টিতে মাটির দাওয়া কাদা-কাদা, তবু তারই মধ্যে সে শুয়ে থাকে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেলে ক্রমে দেয়ালের কাছে সরে আসে। সারা শরীর জলে ভিজে যায়, হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে ঘুমের আশা ছেড়ে কোনো-কোনো রাত্রিতে সে দাঁড়িয়ে কাটায়।

গোকুলের চোখে তন্দ্রা এসেছিলো। পর-পর তিন-চারবার প্রবল বজ্রগর্জনের সঙ্গে ঝাঁ-ঝাঁ করে বৃষ্টি নামলো। বারান্দার দিকের জানালা দিয়েও বৃষ্টির ছাঁট এসে গোকুলের গায়ে লাগছিলো। সেটা বন্ধ করার জন্য উঠে এগিয়ে যেতেই তার কানে কান্নার শব্দ এলো। কে-বা কাঁদছে, ভয় পেয়ে ছেলেমানুষের মতো, অসহায় অব্যক্ত কান্না। অদ্ভুত লাগলো গোকুলের। অথচ তেমন লাগবার কথা নয়, বাড়িতে আর একটি প্রাণী আছে, এই তিমির ঘন দুর্যোগের রাতে বাইরে বৃষ্টির নিরাশ্রয় ধারার মধ্যে। বাঁদী কাঁদে এমন করে মানুষের মতো?

দরজা খুলে দিলো গোকুল তবু নড়ে না বাঁদী। অন্ধকারের মধ্যে নজর ঠেলে দিয়ে গোকুলের লজ্জা বোধ হলো। ঘরে ঝুলানো সকালে তাঁত থেকে নামানো শাড়িখানা হাত বাড়িয়ে বাঁদীর দিকে এগিয়ে দিয়ে গোকুল ঘরের অন্ধকারে সরে গেলো। সেখান থেকে হুকুম করলে বাঁদীকে ঘরের ভিতরে আসতে।

বিছানায় বসে সে ভাবতে লাগলো কী বিড়ম্বনায় সে পড়েছে খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে। মানুষ, হোক সে বাঁদী, এমন নির্বোধ হয় কী করে? লাথি আর মিষ্টি কথার তফাত বোঝে না। অবশ্য গোকুল পরখ করে দেখেনি, লাথির অপমান বুঝতে হলে খানিকটা বুদ্ধি থাকা দরকার। খিদে পেলে যে খায় না, খিদে না-থাকলেও খাও বললেই যে খায়, গোবর ঘেঁটে হাত ধোবার ইচ্ছা হয় না যার, পায়ের নখ উল্টে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলেও যাকে বলে দিতে হয় হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করো—সে যে কি পরিমাণ নির্বোধ। শুধু নির্বোধ নয় নির্বাকও।

গোকুল রাগ করে বললো—'কাপড় পরেছো, তবে ঘরে আসছো না কেন? ঘরে এসে দরজা দাও, ঘর ভিজে গেলো জলে। কী আপদ'।

বাঁদী ঘরে গিয়ে দরজা দিলো।

গোকুল রাগ চড়িয়ে বললো—'এবার ওই কোণটায় শোও, শুয়ে চোখ বোজো, চোখ বুজে ঘুমাও। আরো বলে দিতে হবে'?

বাঁদী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো, অন্ধকারেও মনে হলো কী যেন বলতে চায় সে।

গোকুল বললো—'যাও, শোওগে যাও'। কিন্তু একথার পরও বাঁদী যখন নড়লো না বরং হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো দরজার পাশে গোকুলের মনে হলো বাড়ির কুকুরটির মতো বাঁদীটিও তার। উঠে গিয়ে প্রদীপ তুলে সে দেখলো বাঁদীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। একটা মিষ্টি কথা বললে তার প্রভুত্ব বোধ হয় খর্ব হবে না, বললে সে—'কেঁদো না, বাপু, সবার জীবনই সুখের হয় না'।

বাঁদী উঠে দাঁড়ালো। প্রদীপের আলো তার সর্বাঙ্গে পড়েছে। সবজে মোটা মসলিনের অন্তরালে বাঁদীকে দেখে গোকুল নির্বাক হয়ে নিজের থুতনি চুলকাতে লাগলো। হাড়ের কাঠামোর উপরে মেদমাংস লেগেছে এ খানিকটা গোকুল প্রত্যাশা করেছিলো। কিন্তু কী বিশ্রী কী বিশ্রী করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া

অভ্যাস হয়ে গেছে বলে সে কোনোদিনই এ পরিবর্তনের আভাস পায়নি। বক্ষের বৃত্তাভাস, নিতম্বের বিস্তৃতি, উরুর মসৃণতা, আর সব ছাপিয়ে তার চোখ দুটি।

গোকুল কিছু ভেবে না-পেয়ে বাঁদীর হাত ধরে বললো—'ভয় নেই তোমার'। তার মনে হলো এত করুণ, এত কিশোর! এ কি কখনো ভাবা গেছে এ এত অল্পবয়সী। গোকুলের মনে হলো এত স্নেহ দিতে পারে একে, তবু না হয় স্নেহের শেষ, না হয় তা জানানো। বিছানায় বসে গোকুল তাকে পাশে বসালো। বারে বারে বললো—'কাঁদিসনে, কাঁদিসনে'। কোথা থেকে সাহস পেয়ে বাঁদী দু-হাতে গোকুলকে আঁকড়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

সকালে তাঁতঘরে গিয়ে গোকুল প্রথমে কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করলো যা জীবনে করেনি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানতো? শিরা-উপশিরাগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেতচন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হলো বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠেছিলো, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিলো তার একবার অনুভব হলো সেটা শুভ্র উরুদেশের ছায়া। ঘরে ফিরে এসে সে দেখলো তার শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাঁদী। রাত্রির স্বপ্নের সঙ্গে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক হলো একটু। গোকুল ফিরে গেলো খানিকটা বাদে আবার ফিরে আসবার জন্য।

গোকুলের তাঁতঘর থেকে দিবারাত্রি গান শোনা যায়, যে গান গলা নিরপেক্ষ, সুর নিরপেক্ষ, চাষী হলুদে ধান কাটতে যে গান গায় কতকটা তেমনি।

অল্পবয়স যতদিন থাকে মানুষ প্রবীণ গৃহস্থের অনুকরণ করতে ভালোবাসে, যেমন ছোটোছোটো মেয়েরা করে খেলাঘরে। গৃহকর্তা হয়ে একদিন রাত্রিতে গোকুল বাঁদীর কানের কাছে মুখ দিয়ে বললো—'শোন্ বলি তোকে। একটা জিনিস আমাদের নেই। একটা ছেলে না হলে যেন চলছে না, তাই নয়। বড়ো খালি-খালি, শুধু দুজন'। বাঁদী বড়ো-বড়ো চোখ মেলে রইলো মাত্র।

দু-চারদিন বাদে গোকুল কথাটা আবার বললে তাকে, বাঁদী শিউরে উঠে বললে—'না'।

—'নয় কেন'?

বাঁদী গোকুলের কাছে সরে এসে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

কথাটা গোকুল ভুললো না। কখনো বাঁদী না শুনবার ভান করে অন্যদিকে চেয়ে থাকে, কখনো গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক মিনতি করে।

বাঁদীর ছোটোখাটো শরীরটার মধ্যে একটা ছোটো মন আছে সেটা গোকুলের গলা শুনলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। দোকানির তাঁবুতে যত মেয়ে ছিলো সবার চাইতে সে ছিলো ভীরু। মানুষ দেখলে তার জিভ জড়িয়ে আসে, কথা ফোটে না, স্তম্ভিত হয়ে যায় ভিতরটা।

এক রাত্রিতে বাঁদীর করুণ দৃষ্টিতে মন ভিজলো না গোকুলের, সে পাশ ফিরে শুয়ে রইলো। বাঁদী জানাতে চায় গোকুলকে সুখী করতে না-পেরে সে দুঃখী, সেটুকু জানানোর জন্য বাঁদী শব্দ করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। গোকুল ধমক দিয়ে উঠলো, 'কি আপদ ঘুমাতে দেবে না'।

সারা রাত বাঁদী বসে রইলো, সারা রাত তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। নিজের উপরেও রাগ হচ্ছিলো তার।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে গোকুল পরের দিন রাগ করলো না। শুধু বললো, 'আমার মনে হয়, ও তুই পারবিনে, সব মেয়ে পারে না'।

মিষ্টি কথায় বাঁদী অভিমান করে পাশ ফিরে রইলো। সামান্যমাত্র, বেশি করতে সে ভয় পায়।

একদিন গোকুল নরম করে বললো—'এই দ্যাখ কী এনেছি, এইটে হাত বেঁধে দিই আয়, সিদ্ধিথানের

মাটি আছে এতে, দেখি তারপরে কী হয়'।

বাঁদী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—'হবে'?

—'হ্যাঁ রে হ্যাঁ'।

কিছুদিন পরে বাঁদী গোকুলকে নিজে থেকে বললো—'ফকির এসেছে ও গাঁয়ের মাঠে, যাবো'?

'যাবি কেন! ও বুঝেছি। তা তোর বুঝি ভরসা নেই করচে। কিন্তু কী করে যাবি? সে নাকি সন্ধ্যার পরে একা-একা এলোচুলে নতুন শাড়ি পরে যেতে হয়। ভয় করবে রে। ও মাঠে রাতের বেলা গাঁয়ের লোক যেতে ভয় পায়। তা আমিও না-হয় কিছু দূর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে পারি'।

—'না, যেতে হয় না'।

—'তাই বলেছে ওরা? যাস তবে তাই'।

বাঁদী গিয়েছিলো। নতুন শাড়ি পরে, কপালে খয়ের-টিপ এঁকে, চোখে কাজলের রেখা দিয়ে। যে রকম লোকে বলেছিলো ঠিক তেমনি করে এলোচুলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিলো। যদিও বাড়ি থেকে সাত পা যাবার আগেই সে ভয়ে ঘামে নেয়ে উঠেছিলো।

ভোরবেলার একটু আগে সে ফিরে এলো। গোকুল আলো নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। সে বাঁদীকে দেখে চমকে উঠলো। কোথায় খয়েরের টিপ, কোথায় চোখের কাজল। পরিক্লান্ত সর্বহারা দৃষ্টি।

আশঙ্কার সঙ্গে কিছুটা পরিহাস মিশিয়ে গোকুল বললো—'ডাকাতের হাতে পড়েছিলি নাকি রে'?

—'না'।

—'ভয় না হয় নাই পেলি, পেয়েছিস কিনা আমি জানছি। আহা হা পড়ে গিয়েছিলি সাঁকো থেকে। ঠিক তাই, ঠোঁট কেটে গেছে, এই তো কাপড়ও ভিজে।

—'না'।

—'রাগ করেছে পাগলি। সত্যি রে আমার জন্য এত কষ্ট হলো তোর'।

—'না'।

গোকুল বাঁদীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলো; নতুন গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছিয়ে শাড়ি পালটিয়ে বিছানায় বসালো তাকে।

—'আমি জানি। অভিমান হওয়া তোর অন্যায় নয়। আমাকে সুখী করার জন্যে তুই যে সাহস দেখালি, যে কষ্ট করলি তারপর তোকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। তুই বলেই পেরেছিস। আর কেউ তাঁতীর জন্য এতটা করতো না'।

—'না-না'।

বাঁদী দু-তিন মাস কথা বললো না, ভালো করে বাঁধলো না, খেলো না, চুল বাঁধলো না। শুধু আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে দিন কাটালো। গোকুল দূরে-দূরে থেকে ভাবলো অভিমান করবেই তো বাঁদী, সে কি সোজা কথা! রাত করে ওই ভয়ের মধ্যে যাওয়া।

একদিন পাড়া থেকে বেড়িয়ে ফিরে গোকুল বললো—'শুনেছিস, তাঁতীবউ, তোর সেই ফকিরটা মরে গেছে। গলায় বাঘে না কিসে কামড়েছিলো, তার ঘাতেই দু-তিন মাস ভুগে-ভুগে মারা গেলো। ভেবেছিলাম একদিন ভালো করে সিন্নি দিয়ে আসবো, হলো না তা'।

বাঁদী দপ করে জ্বলে উঠলো—'গোরে দেয়নি বোধহয়,যাও যাও, এখনি দিয়ে এস সিন্নি'।

'রাগ করলি তুই? দ্যাখ তো কত বড়ো দয়া করেছে ফকির আমাদের। মন্তরে ফল হতেও পারে তো'?

চৌকাঠ চেপে ধরে বাঁদী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন তার নিজের স্বরের তীব্রতার প্রত্যুত্তরে গোকুলের রোষের আশঙ্কায় তার মুখ বিবর্ণ হয়েছে।

কিন্তু গোকুল রাগ করলো না। এমন হয় সংসারে, অনুগৃহীতার একটিমাত্র আত্মদানের ফলে তার

স্থান অনুগ্রহিতার সমপর্যায়ে উঠে যায়। গোকুল অপ্রতিভ হয়ে পালিয়ে গেলো।

একদিন বাঁদী কথা বললো। নিজে থেকে গোকুলকে ডেকে লজ্জায় মুখ লাল করে বললো—'হবে, পাবে তুমি এতদিনে'।

তারপর একটু কাঁদলো বাঁদী। সারা মুখ বিকৃত হয়ে দুর্বার লবণাক্ত অশ্রুর বন্যা নেমে এলো।

গোকুল বললো—'কাঁদ, কাঁদ। আনন্দে কান্না পায়'।

তাঁতীদের মধ্যে যারা গোকুলকে খাতির করতো তার ওস্তাদীর জন্য তারা এলো। ওপাড়া থেকে জেলেদের রহিমবুড়ো এলো জনকয়েক সাকরেদ নিয়ে, যে দোকান থেকে মাঝে-মাঝে গোকুলের মসলিন বিক্রি হয় ধনীদের মধ্যে এলো সে।

রাঙাপাড় কোরা ধুতি পরে বাঁদী (এখন সে তাঁতীবউ) বসেছে ঘরে। কোলে ছোট্ট ফুটফুটে, টুলটুলে একটা ছেলে। গোকুল সকলের সামনে জোড় হাত করে দাঁড়াচ্ছে। সকলে এগিয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করছে। গোকুল কারো কথা শুনলো না রহিমবুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে ছেলের মাথায় বারবার মাখিয়ে দিয়ে বললো—'দোয়া করো চাচামিঞা তোমার মতো হাত হয়'। একমুখ হেসে বুড়ো বললো, 'হবে রে হবে বাপের বেটা হবে'।

সকলে চলে গেলে গোকুল ঘরে গিয়ে বসলো। শোবারঘরের ওদিকটায় একখানা নতুন কাঁঠালকাঠের চৌকি পড়েছে—সোনার মতো রং তার। একরাশ রঙিন কাঁথার ভাঁজ স্তরে স্তরে সাজানো। গোকুল পাড়ার অনেককে বানাতে দিয়েছিলো আজ নিয়ে এসেছে। তাঁতীবউ তখনো বাইরে বসে ছেলে কোলে করে গোকুল ডাকলো—'ঘরে এস বউ, খোকনমণির ঠাণ্ডা লাগবে'।

তাঁতীবউ হাসে, তাঁতীবউ কথাও বলে।

একদিন সে ছেলে শুইয়ে এসে বসলো গোকুলের পাশে।

—'খুশি হয়েছ তুমি'?

—'হ্যা'।

—'আমাকে, এখন আর তেমন করে মনে পড়বে না তাই নয়'।

—'বাস রে, কত কথা শিখেছিস তুই'।

তাঁতীবউ হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো, বললো—'তুমি খুশি হলেই হলো'।

দিন যায় রাত্রি যায় গোকুল ছোটো চৌকিখানার কাছে ঘোরে আর ছেলেকে দেখে আর ষাঁড়ের মতো চেঁচায়—'বউ দ্যাখ সে দুধ তুলছে'। কখনো বলে, 'দেয়ালা কাটছে দেখে যারে দেখে যা।' কখনো নিজেই রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বলে, 'একটা কথা বলি, হাসবি না। খোকা আমাকে চেনে। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়ে'।

রাত্রিতেও ওই একই কথা হয়। গোকুল বলে—'এই তো উঠে বসবে, চাঁদির একটা গোট বানিয়ে দেবো। কিন্তু তোর ছেলে কি ভদ্রলোক ভেবেছিস? ফোকলা মুখের নালে নালে বুক ভরে রাখবে'।

সোহাগের বুক থেকে তাঁতীবউ অনুযোগ করে—'দিনরাত তোমার ওরই কথা'।

গোকুল বলে—'যার জন্যে ওকে পেলাম সে বুঝি ফেলনা'।

চাঁদির গোট গড়ালো গোকুল, ছেলে কিন্তু উঠে বসবার কোনো লক্ষণই দেখালো না। পাঁচ মাস গেলো, সাত মাস গেলো, বছর ঘুরে এলো, ছেলে বাড়লো না পর্যন্ত। দেখলে মনে হয় যেন কত কালের বুড়ো, হাসে না পর্যন্ত।

গোকুল বউকে ডেকে বলে—'এ কী হলো রে'?

তাঁতীবউ প্রবোধ দেয়ার সুরে বলে—'সেরে যাবে বুড়ো হলে দেখো'।

রাতে ছেলে ঘুমায় না। কী একটা কষ্টে সারা রাত কাঁদে, সারা রাত কাতরায়। তাঁতীবউ বাইরে নিয়ে পায়চারি করে বেড়ায়। তাঁতীও উঠে আসে।

তাঁতীবউ বলে—'এ কী হলো ছেলে'?

তাঁতী বলে—'কপাল'।

ওঝা এল। কবরেজ-হেকিম এলো। চিকিৎসা হলো, কিন্তু সবাই যেন ছেলের ভ্রূকুটি দেখে ফিরে যায়। শেষে অনেক ধরনা দিয়ে অনেক কষ্টে গোকুল সিদ্ধস্থানের ঠাকুরানীকে নিয়ে এলো। অনেক কথা, অনেক মন্ত্র, অনেক তুক সারা সকাল, সারা দুপুর চললো। সারাদিন না-খেয়ে আগুনের কাছে ঠায় বসে থেকে তখন গোকুলের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে, তাঁতীবউ ঢলে পড়েছে দেয়ালের গায়ে। সন্ধ্যা লাগা-লাগা সময়ে সিদ্ধা মুখ খুলে বললো—'তুই বউ বদলা গোকুল। এ বউয়ের রিষ্টি যোগ আছে। এর কাছে ভালো ছেলে তুই সাতজন্মেও পাবি না'।

গোকুল বোধ করি ঝিমিয়ে পড়েছিলো, প্রথমবারে তার কানে যায়নি কথাগুলো। সিদ্ধা স্পষ্ট করে বলবার জন্য আবার বললো বউ বদলানোর কথা। এবার লাল চোখ মেলে গোকুল সিদ্ধার দিকে চাইলো, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলো—'বেরো, বেরো। ভণ্ডামি করার জায়গা পাওনি'।

সিদ্ধা চলে গেলো। সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি তবু সে-রাত্রিতে খাওয়ার জন্য কেউ উঠলো না। গোকুল যজ্ঞস্থান থেকে একটু সরে এসে মাটিতেই শুয়ে পড়লো। চূড়ান্ত আশাভঙ্গের এমন মূর্তি আর দেখা যায় না। তাঁতীবউ মাটির মূর্তির মতো বসে রইলো। ছেলেটা রাত্রিতে কতবার কাঁদলো, কেউ উঠেও দেখলো না।

ব্যাপারটা গোকুলের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। প্রথমে সে নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, তাই যা দেরি হয়েছে—তাঁতীবউ আবার বাক্‌হীনা হয়ে পড়েছে। দিন-কে-দিন যেন সে বোকা হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগের পীড়াটাই তার ফিরে এসেছে।

তাঁতী একদিন ডেকে বললো—'তুই কি আবার আগের মতো শুধু বোকা হয়ে থাকবি, শুধু কাঁদবি নাকি'?

তাঁতীবউ একটু হেসে পাখাটা নিয়ে বাতাস করত লাগলো।

'সারা রাত বসে-বসে বাতাস করবি নাকি? তার চাইতে ঘুমো না হয়। তোর মনও তো ভালো নেই। শুয়ে থাক আমার পাশে'।

তাঁতীবউ চুপ করে শুয়ে পড়লো।

গোকুল বললো—'কেমন যেন আগের মতো, তোর নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই, শুতে বললাম আর টুপ করে শুয়ে পড়লি'।

তাঁতীবউ শত অনুরোধেও মুখ তুললো না; গোকুলের বুকে মুখ গুঁজে প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রইলো।

দিন-কে-দিন তাঁতীবউ শুকিয়ে যাচ্ছে। গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠে চোখ দুটিকে আগের চাইতে বিস্তৃত করে দিয়েছে। চলে যেন না-চললে নয়, বলে যেন না-বললে নয়।

একদিন গোকুলের মাথায় খুন চেপে গেলো, রাগের মাথায় সে চিৎকার করে উঠলো—'নিকুচি করি তোর চোখের, কথা বলিস না কেন? জিভ ক্ষয়ে গেছে? চুলের মুঠি ধরে বের করে দেবো পাজি কোথাকার'।

তারপর কোঁচার খোঁটে চোখ মুছতে-মুছতে নিজেই বেরিয়ে যায়।

এক রাত্রিতে গোকুল শেষ চেষ্টা করবার জন্য তাঁতীবউকে ডেকে নিলো। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

তাকে কোলে করে বসলো। দুহাতে মুখ তুলে ধরে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকলো। তার পরে বললে—'অন্য বউদের মতো কথা বলতে তুই জানিস না, তা জানি। তবু যেমন বলতিস তুই নিজেব তৈরি একটা দুটো কথা তেমনি বল, বলতে হবে তোকে। বল আমাকে, সত্যি করে বল আব ভালো লাগে না আমাকে'?

—'লাগে'।

—'লাগে তো? তবে কেন অমন করিস? এ ঘর-সংসার কি তোর নয়'?

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কেঁপে উঠলো।

গোকুল ব্যাকুল হয়ে বললো—'বল যা বলতে চাচ্ছিস, বল'।

তাঁতবউ বললো—'বউ বদলাও'।

প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো, খুব হাসিব কথা যেমন বাববাব আবৃত্তি কবে তেমনি ক'রে গোকুল বলতে লাগলো—'বউ বদলা, বউ বদলা .. ঘুমা তুই, বদলাতে হয় কিনা সে আমি জানি। এই ভেবে বুঝি দিন-কে-দিন বোকা হয়ে যাচ্ছিস'।

আর-একবাব কবরেজ, গুণিন, ওঝা নিয়ে মেতে উঠলো গোকুল। একে পায তো ওকে ছাড়ে, ওব খ্যাতি শোনে তো ছুটে যায়, ওব একটু দুর্নাম শোনে তো ছাড়িযে দেয ওকে। ছেলেটাব দিকে চেয়ে-চেয়ে আর বউকে ডেকে বলে 'একটু উন্নতি হয়েছে, না বে'? বউ সাড়া দেয় না; সাড়া না দিলেও সে নিজেই বুঝতে পাবে উন্নতি কিছুমাত্র হয়নি।

এমনি করে ছেলেকে দেখতে দেখতে একদিন গোকুলেব খুন চেপে গেলো মাথায় আবার। 'হারামজাদা পাজি, ভাগাড়েব শকুন, বাঁদরেব বাচ্চা কোথাকাব। যেমন দেবতা তার ববও তেমনি। অমন মরকুটে ফকির না-হলে এমন ফল হয় তার মন্তরে'।

ক্ষুদ্র প্রাণীটিব জ্বালাময় নিদ্রাহীন আলো অন্ধকাবের অভিজ্ঞতার হয়তো সে-দিনই শেষ হয়ে যেতো, যদি নিজেব কথাগুলি কানে যেতে কানে আঙুল দিয়ে গোকুল ছুটে না-পালাতো।

সারাদিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে গোকুল সন্ধ্যার পবে ফিরে এলো। একটুখানি জোছনা উঠেছে সেদিন। উঠানে দাঁড়াতেই তাঁতীবউকে দেখতে পাওয়া গেলো। জোছনার এক ফালির মাঝখানে সে বসে আছে, শান্ত স্থির পটের ছবির মতো। স্নিগ্ধতাব আশ্বাসে পায়ে-পায়ে গিয়ে গোকুল বসলো তাব পাশে। সকালেব তাণ্ডবের জন্য তার অনুতাপের অবধি নেই।

—'ও বউ, কথা বল, তোর পায়ে ধরি। আমার দোষ—সব, বুঝতে পেরেছি। তোব দিকে আমি চেয়েও দেখিনি'।

—'কী বলবো বলো'।

—'কিছু কি তোর বলবার নেই? আমি কাছ এলেই তোব এত কষ্ট? আচ্ছা আমি যাই'।

—'না, যেও না। আজ একটা কথা বলবো তোমাকে। ও কোনোদিনই ভালো হবে না। ওব দোষ নয়, তোমার দোষ নয়। বোধ হয়—

—'কী বোধ হয়'?

—'বোধ হয় আমার রিষ্টি যোগ আছে'। কথাটা বলতে গিয়ে অস্ফুট কান্নায় তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো।

কথাটা নতুন নয়। অনেক আড়ম্বর করে, এর চাইতে অনেক দৃঢ়স্বরে সিদ্ধা বলেছিলো। কিন্তু বাক্‌বিহীনার স্বরে এমনসব আশা নষ্ট হওয়ার সুর ছিলো যে গোকুল আহতের মতো খাড়া হয়ে বসলো।

—'বলিস কী রে'?

'হ্যাঁ সত্যি। ওরা বলে—আমার মনে হয়...'

—'ওরা ভুয়া দেয়। তাহলে আর আমি জানতাম না'?

—'না জানতে না। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, যে-দিকে দু-চোখ যায় চলে যাবো'।

—'তুই চলে যাবি'?

—'হ্যাঁ'। তাঁতীবউ উঠে দঁড়ালো যেন সে তখনই যাত্রা শুরু করবে।

পরদিন সকালে উঠে গোকুলকে দেখা গেলো না, তার পরদিনও না, তারপরও না। তাঁতীবউ বড়ো কান্নাই কাঁদলো। দুদিন সে উঠলো না, রাঁধলো না, খেলো না। মাঝে-মাঝে শুকিয়ে-ওঠা স্তনটা শিশুর মুখে গুঁজে দিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করে। অনাহারের অবসাদে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে তাকে, তাও যেন সে বুঝতে পারে না। গোকুলে-মুখ মনে পড়ে আর সবকিছু অন্ধকার হয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখে পাথর হয়ে যেতে যেতে তাকে একসময়ে নড়ে উঠতে হলো। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে বলেই রান্নাঘরের দরজা খুলতে হলো তাকে। কিন্তু গোকুল নেই, কে তাকে বলবে রান্না করতে যেতে, কখন কী করতে হবে। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো ভয়ে নিচুস্বরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

দুঃখের গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন সে আঁ-আঁ করে কাঁদে। এক-এক দিন সন্ধ্যায় বর্ষা নামে। বর্ষার শব্দের মধ্যে তার বোবাকান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে এমন দু'একজন তার কান্না শুনে তাড়াতাড়ি হেঁটে গোকুলের বাড়িটা পার হয়ে যায়।

তারা বলাবলি করে কোনোদিন—'গোকুলের বাঁদীটা বুঝি? গোকুল গেছে বিয়ে করতে শুনলাম। তা হবে। বেচারার বড়ো কষ্ট। একা-একা, ভয়-ভয় করে বোধ হয়'।

গোকুলের নাম শুনে তাঁতীবউ উঠে যায় ভালো করে শুনবার জন্য। শুনতে পায়—গোকুল গেছে বিয়ে করতে।

আকস্মিক আঘাত পাবার মতো একটি অস্ফুট শব্দ করে তাঁতীবউ সরে আসে জানালা থেকে।

এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় গা ধুয়ে সে গোকুলের দেয়া ভালো শাড়িগুলো বার করে পরে। কপালে টিপ আঁকে, বিনুনি করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয় চুল। খোঁপা বাঁধে না, গোকুল পছন্দ করতো না। তারপর বাবান্দায় গিয়ে বসে প্রতীক্ষায়। গোকুল হাটে যাবার সময়ে এমনি করতে বলে যেতো তাকে। কাজ করতে করতে থেকে গিয়ে সে ভাবে—গোকুল কোন কাজটা কী রকম করতে বলে দিয়েছিলো। ঠিক তাই করে সে।

কোনো-কোনো দিন সে ভাবে শুয়ে-শুয়ে, যদি কোনো দেবতা বর দিতো তাকে। এমন কি হয় না, কোনো গুণিন এসে দু-হাতে তুলে একটা সন্তান তাকে দিয়ে যায়, একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটা ছেলে! দু-হাত ভরে নেয় সে তাহলে। বুকের মধ্য টনটন করে ওঠে তার। ঘুমন্ত রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেটাকে তুলে নিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়। কিন্তু সেও যদি ফকিরের মতো হয়! কথাটা মনে হতেই তাঁতীবউ আড়ষ্ট হয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে, গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ছেলেটাকে দুম করে বিছানায় ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মরেছে, মরেছে—বেশ হয়েছে। বাঘের কামড়ে গলা ফুটো হয়ে মরেছে। তাঁতীবউয়ের চোখ দুটি শ্বাপদ হিংসায় চকচক করে ওঠে। রক্তে মুখ ভরে উঠলো ভেবে—থু-থু করে উঠলো তাঁতীবউ। না, দরকার নেই। কোনো গুণীর কাছে সে বর চায় না। শুধু গোকুল ফিরে আসুক। সে যদি বউ নিয়ে আসে, তাও আসুক।

তবু এক-একদিন স্বপ্নে দেখে সে একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটি ছেলেকে।

রাত্রির উঠোনে তাকাতে তার ভয় করে, তবু খুট করে একটু শব্দ হলেই সে উঠে যায় দরজার কাছে। মাঝরাতে উঠে বসে একদিন তার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো। যদি তাঁতী ফিরে গিয়ে থাকে তার সাড়া না-পেয়ে। সেদিন থেকে সে দরজা খুলে রাখলো। বিছানায় শুয়ে সে সারা রাত ঘুমোতে পারলো না। দরজা বন্ধ ঘরে গোকুলের পাশে শুয়েও যার ভয় যায় না, সেই আজ দরজা খুলে রেখেছে।

একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। গোকুলের প্রত্যয় বসে থেকে-থেকে মাঝরাতে ঘুমে গা এলিয়ে

এসেছে, বসে-বসে ঢুলছে তাঁতীবউ—এমন সময়ে উঠোনে পায়ের শব্দ হলো যেন। তাঁতীবউয়ের মনে হলো সে বলবে—এসো, আমি তোমার জন্যে জেগে আছি দ্যাখো। আজই শুধু নয়। পাছে ফিরে যাও বলে প্রদীপ জ্বেলে রেখেছি, দরজা খুলে রেখেছি। কিন্তু কথা বলা হলো না। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে দম বন্ধ করে দিলো যেন। মনে হলো কাঁদতে না-পারলে সে মরে যাবে, তবু কাঁদলো না। দেখবে সে প্রথম মুহূর্তেই তার তাঁতীকে, পোড়াচোখ বারবার করে মুছতে লাগলো।

কিন্তু পায়ের শব্দ যখন একেবারে তার পাশে এসে থামলো তখন সে মুখ তুলতেও পারলো না। একটা সুন্দর সুবাস আসছে, তাঁতীবউ ভাবলো—সুখে ছিলো গোকুল তাই। কিন্তু অভিমান সে করবে না, মান করা তার সাজে না—কী আছে তার গরবী হওয়ার।

মুখ তুলে তাঁতীবউ বিস্ময়ে অভিনবত্বে দিশেহারা হয়ে গেলো। স্বপ্নের মধ্যে যেন সে ভাবলো—তুমি দেবতা, তুমি এলে। আমার দুঃখ, তাঁতীর দুঃখ, ওই ছেলেটির দুঃখ সব মিলে তোমাকে টেনে এনেছে। তাই এত সুবাস, তাই এত সুন্দর তুমি। তোমার মুখের দিকে চাইবার সাহস নেই আমার। তুমি তো আমার মনের কথা জানো।

অনভ্যস্ত কথা বলার পরিশ্রমেই যেন তাঁতীবউ হাঁপাতে লাগলো। 'শোন, তাঁতীবউ, গোকুল ফিরবে না। তুই এত দুঃখ করবি কেন? আর গোকুল যদি ফেরেই কখনো, যা দিয়ে তোকে সে কিনেছে তার চাইতে দশগুণ আমি তাকে দিয়ে দেবো। বুঝতে পেরেছিস আমার কথা? আজই নয়...। চিনিস তো আমাকে, রাজবাড়িতে দেখেছিসও বোধ হয়'।

দেবমূর্তি সাপ হয়ে কামড়ালেও তাঁতীবউ এতটা শিউরে উঠতো না। পলকে দূরে সরে গিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পৃথিবী তখনো পায়ের তলায় দুলছে। তীব্র রূঢ় দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রাগ করে কী বলতে গেলো সে, কিন্তু অসীম ঘৃণায় সে বারবার বললো—'ছি-ছি, তোমাকে দেবতা বলেছি, ছি-ছি-ছি'!

—'শোন্, তাঁতীবউ ভেবে দ্যাখ। সময় নে'।

—'ছি-ছি-ছি-ছি'।

আগন্তুক কখন চলে গেলো, কে তাকে তাড়িয়ে দিলো এসব কিছু মনে নেই তাঁতীবউয়ের। প্রথম সাধারণ বোধ ফিরে আসতেই ভয়ের একটা আর্তশব্দ করে উঠে গিয়ে দরজার খিলগুলো এঁটে দিলো সে।

এর বোধ হয় প্রয়োজন ছিলো। এমন বেহুঁশ হয়ে, এমন কোমল প্রাণ নিয়ে যারা চলে, তারা না-পারে নিজে বাঁচতে-না-পারে অন্যকে প্রাণ দিতে। ভয় যতক্ষণ না, আসে ততক্ষণ তার আশঙ্কা এমন আড়ষ্ট করে রাখে যে নিজেকে পিঁপড়ের মতো তুচ্ছ মনে হয়। ভয় এসে চলে গেলে আশঙ্কাটা কমে যায়, কিছুটা আত্মবিশ্বাসও আসে।

প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁতীবউকে তার উঠোনের পৃথিবীর বাইরে পা দিতে হয়েছে। হঠাৎ কারো কথা শুনলে যার প্রাণসুদ্ধ আড়ষ্ট হয়ে যেতো এখন সে হাটে যায়। অপরিচিত দোকানির সঙ্গে দামদস্তুর করতে হয়। পয়সা উপার্জনের ফিকির সে নিজেই বার করেছে। জোলারা আসে তার কাটা সুতো নিতে। পাকা কারবারির মতো সে বাকিতে মাল দেয় না, কথার খেলাপ করে না।

কখনো-কখনো সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গোকুলকে নিয়েও আলাপ হয়। মেয়েদের কাছে সে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে, এরকম অবস্থা হলে তাদের স্বামীরা কী করতো। কেউ বলে—ফিরবে একদিন, এই রূপ ফেলে কেউ থাকতে পারে। সেদিন রাত্রিতে গোকুলের দেওয়া মসলিন পরে আরসি ধরে নিজেকে দেখে তার অবাক লাগে—তা কি হয়, এর জন্য কখনো কেউ ফেরে যদি এতদিনের এত কান্না তাকে ফেরাতে না-পেরে থাকে অন্যদিন কেউ বলে—দেখো, কোথায় আবার বিয়ে-সাদি করেছে। সেদিন রাত্রিতে আরসির সামনে বসে সে ভাবে—কিছুই তো বদলায়নি। যেদিন প্রথম গোকুল তাকে

বলেছিলো—তোকে না হলে আমার চলবে না, সেদিনকার মতোই তো সব আছে। সে ভাবে—এসবের জন্যই দায়ী সে। গোকুলকে সে নিজে ঠেলে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। কিন্তু সে তো তখন বুঝতে পারেনি তাঁতী আর-কাউকে বিয়ে করলে কত কষ্ট। আর কী বোকা ছিলো সে। গোকুল কথা বলতে যত অনুরোধ করতো তাকে, তখন সে নির্বাক হয়ে যেতো। এখন যখন মেয়েরা বলে রাত্রিতে কে কী বলেছে স্বামীকে তখন সে শোনে আর অবাক হয়ে যায়—এদের চাইতে অনেক মিষ্টি কথাই তো গোকুলকে সে বলতে পারতো, গোকুলের কাছে গেলে মনেও হতো।

তার ছেলেটা এখন হামা টানতে শিখেছে। হোক অনেক দেরিতে তবু শিখেছে তো। পাড়ার সব ছেলেমেয়েগুলি এমন কিছু সুন্দর নয়, সবলও নয় সবগুলি। গোকুল এলে এসব সে বুঝিয়ে বলবে, গোকুল তো বোকা নয়, সে বুঝবে। সুন্দর ছেলেমেয়েও আছে। এই তো সেদিন গাজনের মেলা থেকে সন্ধ্যার একটু আগে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে ফিরতে-ফিরতে দুটি ছোটো-ছোটো ছেলেকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিলো।

কার ছেলে গো? নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেও সাধ মেটে না তার। ঠিক এমনি চেয়েছিলো গোকুল। এগিয়ে গিয়ে ছেলেদুটির সঙ্গে ঝিটিকে জিজ্ঞাসাও করেছিল সে। কিন্তু নাম শুনবার পর তার মনে হলো যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। রক্তহীন মুখে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো সে।

সেদিনকার রাত্রির কথা মনে পড়লো। তেমনি চোখ, এখনি যেন তেমনি ক্ষুধাতুর হয়ে জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সত্যি দেবশিশুর মতো দেখায় ছেলেদুটিকে।

সহযাত্রীর প্রশ্নে উত্তরে সে বললো—'কী যেন লাগলো পায়ে'।

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষের মন। সেখানে একটা ক্লেদাক্ত আবিল সম্ভাবনা কী করে বাসা বাঁধলো কখন। তাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁতীবউ সারা পথ সারা মন দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো—চাই না, চাই না, ছি-ছি-ছি। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করলো।

একদিন গোকুল ফিরে এলো। তাঁতীবউ উঠে দাঁড়লো, কাঁদলো না, বোকার মতো চেয়ে থাকলো না, একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বললো—বোসো, হাত ধুয়ে আসি'।

হাত ধুয়ে আসতে একটু দেরি হলো। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে হয়তো-বা একটু কেঁদেছিলো সে, অনেকদিনের অভ্যাস তো। মুখেচোখে জল দিয়ে ফিরে এসে পাখা নিয়ে তাঁতীর পাশে বসে বাতাস করতে-করতে সে জিজ্ঞাসা করলো—'কোথায় ছিলে এতদিন, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? খাওয়া-দাওয়া ভালো হতো না'?

কিছুক্ষণ পরে বললো—'ভালো মন আমার, এতদিন পরে এলে প্রণাম করতেও ভুলে গেছি'।

নিচু হয়ে তাঁতীর ধুলোভরা পা বুকের পরে চেপে ধরলো। গোকুল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, অন্ত খুঁজে পায় না।

তাঁতীকে সেধে-সেধে খাইয়ে ঘরে নিয়ে এসে বসলো সে, যেন তার বাড়িতে গোকুল অতিথি। একসময়ে হাসতে হাসতে সে বললো—'আমারই জিত হলো দ্যাখো। কই পারলো ডাকিনীরা ধরে রাখতে আমার তাঁতীকে'? তাঁতী মুখ নিচু করে থাকে। দু-হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে তাঁতীবউ, যেমন গোকুল এককালে তার ধরতো।

কাজ করতে-করতে ফিরে এসে তাঁতীবউ বলে—'কিন্তু ওরা কী লোক গো'!

—'কারা'?

—'তোমার সেই ডাকিনীরা যারা তোমাকে ধরে রেখেছিলো। তারা কি শুধু ছলাই জানে? পুরুষটাকে কি খেতেও দিতে নেই'।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে দেরি করে তাঁতীবউ ঘরে এলো। গোকুল দেখে অবাক—মসলিন পরেছে তাঁতীবউ, চোখে কাজল। অথচ এসবের জন্য অনুনয়-বিনয় করে-করে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি

করেছে এককালে। তাঁতীবউ মুচকি হেসে গোকুলের কোলে গিয়ে বসলো, নিজে সেধে মুখের পরে মুখ নামিয়ে আনলো।

—'একি গা পুড়ে যাচ্ছে যেন, জ্বর হয়েছে তোমার'?

—'হয়'।

—'রোজ হয় জ্বর? কী সর্বনাশ! কী করে হলো'?

—'জানিনে, রোজই হয়, বড়ো কষ্ট হয রে'।

তাঁতীবউ লজ্জায় যেন মরে গেলো, সজ্জা তার গায়ে পুড়ে উঠলো। মসলিন ছেড়ে ঠেটি পরে সে ফিরে এলো বিছানায়। তাঁতীকে নিজের পাশে শুইয়ে বললো—'কষ্ট হচ্ছে মাথায'?

—'হ্যাঁ'।

তাঁতীবউ ভেবে পায় না কী করবে। বুকের মধ্যে তাঁতীর মাথাটা টেনে এনে বললো, 'এখানে চোখ বুজে থাকো, ঘুমিয়ে পড়বে।'

—'আমি কি বাঁচব না বউ', গোকুল ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ছোটো ছেলের মতো তাঁতীকে টেনে নিয়ে তাঁতীবউ বলে—'ষাট, ষাট'।

একটু হাসি পায় গোকুলের, বলে—'তুই যেন মা হলি। আমি সেরে উঠবো। তোর কাছে থাকলে সেরে উঠবো'।

কবরেজের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে ওষুধ এনে দেয তাঁতীবউ, সারাদিন চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁতীকে। অবোধ শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে রাখে বুকের কাছে। কিন্তু জ্বর তবু কমলো না, সন্ধ্যা হতেই জ্বর আসে। হাড্ডিসার হয়ে গেছে তাঁতী। তাঁতীবউ ভেবে পায় না—কী করে এমন হলো কীসে সারে।

মাঝেমাঝে মনে হয তার মনের দুঃখেই এমন গা পুড়ে যায। গত দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তাঁতীর কোনো সাধই সে পূরণ করতে পারেনি। ভাবে, তাঁতী যদি না-ই বাঁচে?

একদিন রাত্রিতে ঘুম ভেঙে তাঁতী দেখলো বউ বসে-বসে নিঃশব্দে কাঁদছে।

—'কাঁদছিস তুই'?

—'দূর, কই না, কাঁদবো কেন'?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে তাঁতীবউ। বলে—'ঘুমাও লক্ষ্মীটি, আমি হাত বুলিয়ে দিই'।

—'কত তো দিলি'।

—'সে কি বেশি কথা নাকি? তোমার তো কোনো সাধই মিটলো না আমাকে দিয়ে'।

—'সব মিটেছে এতদিনে'।

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কাঁপালো—একটা ছেলে চেয়েছিলো, তাও পারলাম না দিতে। নীরবতার ফাঁক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

তাঁতীবউ ভাবে—এর চাইতে অনেক ভালো হতো যদি গোকুল আগেকার মতো গঞ্জনা দিত তাকে। গোকুলের প্রভাহীন চোখ দুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে সে ভাবে চোখের চারিদিকের ওই কালো ও যেন গোকুলের মনের ছাপ, সেখানে আশা নেই, শুধু অন্ধকার। শুধু একটা মূক অভিযোগ। সংসার করার সামান্য সাধও মেটেনি। গোকুল মুখ ফুটে তো বলেই না, জিজ্ঞাসা করলেও অস্বীকার করে পাছে তার মনে ব্যথা লাগে। সে ভালো বলেই না এত কষ্ট তার জন্য তাঁতীবউয়ের।

চার-পাঁচদিন খুব বেশি জ্বর হওয়ার পর সে-রাত্রিতে গোকুলের জ্বর কম।

—'আজ ঘুমাতে পারবো, তুইও ঘুমিয়ে নে একটু'—এই বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁতীবউয়ের ঘুম এলো না।

বাইরে ভাদ্রমাসের আকাশ থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে-থেকে বাতাসের সঙ্গে ঝরঝর করেও

পড়ছে। ওপাশের বিছানায় ছেলেটা কেঁদে উঠলো। গোকুলের মুঠি থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁতীবউ উঠে দাঁড়লো। ছেলেটাকে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। একটা সুস্থ সবল ছেলে কেন তার কোলে এলো না? গাজনতলার হাটে দেখা ছেলেদের মতো একটা পেলে গোকুল হয়তো বাঁচবার জোর পেতো। এত নিবিড় করে সে গোকুলকে সুখী করতে চায় তবু কেন পারবে না। তাঁবুর অন্ধকারে গোকুলকে দেখবার প্রথমদিন থেকে সবগুলো দিনের ছবি একটার পর একটা যেন বাইরের নিবিড় অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠতে থাকে। কত সাহস তার হয়েছিলো যেদিন অন্ধকারের আড়ালে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিলো মন্তর আনতে। সে কি তার সাহস—সে তো প্রাণপণে গোকুলকে সুখী করার চেষ্টা। তারপর একদিন গোকুল চলে গেলো। গোকুলের জন্য প্রতীক্ষার দিবারাত্রিগুলির কথা ভাবতে গিয়েই মনে হলো তার সেই রাত্রির কথা যার স্মৃতিতে পৃথিবী ঘৃণায় ভরে গিয়েছিলো। ছি-ছি, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কী অদ্ভুত মানুষের মন : গাজনতলার হাটে দেবশিশুর মতো ছেলে দুটিকে দেখবার পর তাদের পরিচয় পাবার পর মুহূর্তের জন্য যে-সম্ভাবনার কল্পনাতে ঘৃণায় শিউরে উঠেছিলো তার মন, আজ তেমনি সম্ভাবনার ইঙ্গিতটিই তাকে দিশেহারা করে দিলো। ছি-ছি-ছি, তবু তেমনি ফুটে উঠতে লাগলো কল্পনাটা।

কোথা থেকে কী হয়ে গেলো। অন্ধকারের বুকে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কি এমন করে চোখে দেখবার মতো হয়ে ফুটে ওঠে? যেন ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, বাকিটুকু ঘটবেই। ভবিষ্যতের তাঁতীবউ যেন অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠেছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে তাঁতীবউ ঠেঁটি পালটে মসলিন পরলো, কপালে টিপ দিলো, চোখে আঁকলো কাজল। আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের বুকে ফুটে ওঠা ভবিষ্যতের ওই অর্ধপরিচিত মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করলো। রুক্ষ ভাস্বর রিক্ততায় সে যেন জ্বলতে-জ্বলতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো তাঁতীবউ। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ঝরঝর করে উঠলো উঠোনের পারের আম গাছটার মধ্যে। তাঁতীবউ উঠোন পার হলো, সদর পার হলো, সদরের দরজা ঠেলে বন্ধ করে দাঁড়ালো পথে। অন্ধকারে সামনে-পিছনে একাকার হয়ে গেছে। সামনে তবু নজর চলে। পিছনের যে দরজাটা এইমাত্র সে বন্ধ করে দিলো হাতড়েও সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঢ় অন্ধকারে আর-সব অনুভূতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, একটা অনির্দিষ্ট প্রাবল্যে উদরের অন্ত্রগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে বারে বারে।

জমিদারবাড়ির বাগান পার হয়ে এলো তাঁতীবউ। গ্রামের বউঝিদের কৌতূহল ও আতঙ্কের গল্প শুনে-শুনে সে জানে কোথায় সে ঘরটি। প্রতিবার পা ফেলতে সারা গায়ের স্নায়ুগুলো রিন-রিন করে উঠছে। রুদ্ধ দরজার ফাঁকে, আধ খোলা জানলায় একটু আলো চোখে পড়লো। দরজা ধরে দম নিতে লাগলো তাঁতীবউ। তার একবার মনে হয়েছিলো কেঁদে ফেলবে সে। একটা অস্ফুট অর্ধজান্তব আকৃতি যেন দরজায় করাঘাত করলো তার মনের মধ্যে। কি করে দরজা খুলে গেলো তাঁতীবউয়ের মনে নেই। প্রবল প্রতিরোধে হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে উঠতে না-দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

বর্ষণক্লান্ত আকাশে ভোরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এলো। ঘরে তখনো প্রদীপটি জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিলো। ছেলেটি এখনই জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হলো তার। ঘুমটা আজ ভালোই হচ্ছে গোকুলের। কয়েক বিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলো তাঁতীবউ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে-দেখতে তাঁতীবউ ঘুমিয়ে পড়লো।

সান্যালদের কাহিনী

আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে মানুষ পুরো জয়লাভটা কোথাও করতে পারেনি। প্রকৃতির নানা চর-অনুচর কোথায় কে লুকিয়ে রইলো এমন পাকা যোদ্ধা মানুষের চোখেও পড়ে না ; হঠাৎ একদিন দেখে প্রাসাদ-ভিত্তির পাথরের জোড়ার মুখে কী করে একগাছা দুর্বা গজিয়ে উঠেছে। অথচ আমরা বিনীত এবং নীচ বলতে দুর্বার সাথে উপমা দিই, শক্ত বলতে বলি পাথর।

রূপপুর গ্রামেব সান্যাল বাড়িতে প্রকৃতি ও মানুষের যুদ্ধেব একটা বড়ো রকম মারপিট হয়ে গেছে, বলা বাহুল্য মানুষ এখন পরাজয়ের কোনঠাসা অবস্থায়। শুধু সান্যালবাড়ি বলি কেন রূপপুর গাঁ-খানা গোটা ধরলেও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হবে। হয়তো বলবো জুডিয়ার জ্বির কথা কিম্বা জেট-প্রপেল্ড প্লেনের কথা, কিন্তু ওদিকে খানিকটা সুবিধা করেছে বলেই মানুষেব জয়ের কথায় বিশ্বাস কোরো না। হায় রে মানুষ!

ভেবেছিলাম বনা পাশব-বৃত্তিগুলিকে জয়ই করেছি, বলেছিলাম প্রীতির কথা স্নেহেব কথা ; প্রথমে ওরা যখন বললো আমার সকল প্রকার ভালোবাসার মূলে আছে আদিম রিরংসা তখনো (ওদের আমি চিরদিনই ছেলেমানুষ ভাবি) ভেবেছিলাম কী বলতে কী বলছে ; সবাই মিলে যখন বললো ঠিকই বলেছে ওরা মনস্তত্ত্বের খাতে তখনো বোকার মতো মুখ করে দলে-ভারি ওদের দিকে চেয়ে বলেছিলাম—তা হোক, তা হোক, মনের মধ্যে পশুগুলি থেকেও যদি থাকে তাদের বেশ মোটা শিকের শক্ত গারদে পোরা গেছে। কিন্তু আমি বোকা এটাই প্রমাণ হলো—দেখলাম, বশ করা দূরের কথা পশুগুলি শুধু গজরায় না, বেরিয়ে এসে বুকেও চেপে বসে, তার উন্মুক্ত ব্যাদান থেকে আদিম হিংস্রতার দাঁতগুলি মানুষেব হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করতে থাকে, তার লোল-জিহ্বা রিরংসার ঘৃণ্য লালা-স্রাবে মানুষের সর্বাঙ্গ ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে।

কী কথায় কী কথা উঠে পড়লো। মানুষের পরাজয়ে বড়ো কষ্ট হয় আমার তাই এমন করে বলি, বিষয়বস্তুর কথাও ভুলে যাই।

বলছিলাম রূপপুর গ্রামের কথা। পদ্মানদীর তীরে ছিলো এই গ্রাম, এই গ্রামের ঘাটে নৌকায় চেপে কাশিমবাজারের রেশমকুঠিতে যাওয়া যেতো, আর মুর্শিদাবাদকে বাঁয়ে রেখে যাওয়া যেতো পূর্ণিয়ায়। তখন এ গাঁয়ের চওড়া মাটির পথে ধুলো উড়িয়ে টুং-টাং করে গোরুর গলায় ঘণ্টা বাজতে বাজতে অনেক গাড়ি যেতো, মসলিন-পরা না-হলেও দামি রেশমি-পরা বউদের নিয়ে হুঁ-হুঁ করে পাল্কিও যেতো। তারপরে পদ্মা সরে গেলো, লক্ষ্মীও সরে গেলো, কে আগে গিয়েছিলো এতদিন পরে জানা যায় না। পদ্মা শুধু প্লাবন দিয়ে ডুবায় না, সরে যেয়েও ডুবায় ; এ গ্রামের বাণিজ্যের ভরাডুবি হলো শুকনো ডাঙায়।

সান্যালবাড়ির বৈঠকখানায় ঝাড়ের আলো বাড়ির সামনের বিঘে-পরিমাণ জমি আলো করে রাখতো ; সৈয়দ ঘুলাম মর্তুজার আলোও কম যেতো না খুব, রায়বাবুদেরও না। একগ্রামে তিন জমিদারের সদর। ইংরেজ-আমল না-হলে এদের মধ্যে যে ভুইঞা হবার জন্য যুদ্ধ হতো তা প্রায় ধরেই নেয়া যায়। একেবারেই হয়নি তাও নয়। ছোটোখাটো জমিসংক্রান্ত দাঙ্গার কথা বলছি না, একটা মিঠেকড়া বড়োগোছের ব্যাপারই ঘটেছিলো রায়বাড়ির সাথে সান্যালদের।

সান্যালকর্তার মৃত্যু হয়েছে, বছর বাইশ বয়েসের এক সান্যাল তখন গদিতে। রায়বাড়িতে কলকাতার কবিযাত্রা এসেছে, সান্যাল গেছে শুনতে। বেশ আটপৌরে ব্যাপারে হয়ে যাচ্ছিলো ; হঠাৎ এক দাসী ওদিকের চিকের পর্দার আড়ালো থেকে এলো সান্যালের সামনে। হাতে রেকাবি, রেশমি রুমালের ঢাকনা,

তার নিচে ঝাড়ের আলোর নিচে ঝিকিয়ে ওঠা রাংতায় মোড়া একজোড়া পানের খিলি। খুশি হয়ে সান্যাল পান নিতে যেয়ে হাত গুটিয়ে নিলো। সান্যালের চোখজোড়া তার বাপের মতোই লাল ছিলো, এখন কাছে কোনো ডাক্তার দেখলে বলতো লোকটি এখনি পড়ে মরে যাবে, সারা দেহের রক্ত মাথায় এসে উঠেছে। সান্যাল বেশ দেখতে পেয়েছে একটি পানে ছোটো ছোটো একপাটি দাঁতের চাপের হাল্কা দাগ। উচ্ছিষ্ট। সান্যালের মনের অবস্থাকে ক্রোধ বললে কম বলা হয়। মুহূর্তে কী হয়ে গেলো। চিকের পর্দার আড়ালে রায়বাড়ির আর-সব মেয়েদের সাথে রায়ের নিজের মেয়েও ছিলো। (কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না রায়ের মেয়ে নিজেই চিকের বাইরে অপেক্ষা করছিলো, কিম্বা সান্যাল তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে এনেছিলো দলের মধ্যে থেকে, একথাও বলা কঠিন কী করে এমন দুষ্টবুদ্ধি খেলে গ্রামের একটা মেয়ের মাথায়)।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ঢালীরা লাঠির সর্দার রফাৎ বুড়োর সাথে—রায়বাড়ি থেকে চুরি হয়। মেয়ে চুরি হয়!

সান্যালের সাথে লাঠিয়াল ছিলো না, ছিলো তাদের কালীবাড়ির পূজারীর ছেলে কালীপ্রসাদ আর ছিলো সান্যাল নিজে। তুমুল গোলমালে আসর ভেঙে গেলো। দেখা গেলো একটা ঘূর্ণির চারিদিকে রায়দের সবগুলি লাঠিয়াল পাগলের মতো ঘুরছে আর নাচছে আর হুঙ্কার দিচ্ছে। ঘূর্ণিটা ঘুরতে ঘুরতে চলতে চলতে সদর দরজা পেবিয়ে রাস্তায় এলো।

ঘরে এসে হিসাব নিতে বসলো সান্যাল ; কালীপ্রসাদের বাঁ হাতের দুটি আঙুল গেছে আর সান্যালের একটা কানের গোড়া দিয়ে তখনো রক্ত পড়ছে। ও পক্ষের আট নয় জন গেছে, না-জেনেও বলা যায়। সান্যালবাড়ির সব দরজা তখন বন্ধ। প্রাচীরের ওপারে রায়বাড়ির লাঠিয়ালদের হুঙ্কার স্পষ্ট হয়ে কানে পৌঁছাচ্ছে। সান্যালবাড়ির সব লাঠিয়ালরাই বেরিয়েছে, কিন্তু প্রাচীরের ভেতরে তারা ; হুকুম নেই বাইরে যাবার, ভেতরে তারা গুমগুম করছে।

রায়ের মেয়ে মুখ নিচু করে মাটিতে বসে, দুঃখে কিম্বা অপমানে কিম্বা লজ্জায় ; দুঃসাহসিকার যে-লজ্জা হয় পথের শেষে এসে হয়তো তাই।

যাক সে-কথা। এই থেকেই শুরু হয়েছিলো সান্যাল ও রায়দের প্রণয় ও দ্বন্দ্ব। দুপক্ষের লোকক্ষয় হলো, অর্থক্ষয় হলো, সান্যালের গোটা দু'এক তৌজি গেলো, রায়ের গেলো নগদেই বেশি, বেশি মানে আমার তোমার নয়, রায়ের পক্ষেও সেটা বেশি।

সে-রায় গেছে, রায়ের ছেলেরাও গেছে, নাতিরাও। তারপরের রাজত্বে রায়বাড়ির অবশিষ্ট কাঠের দরজাগুলি, আর ভিটেজমিটুকু বিক্রি হয়ে গেছে। এখন নাকি তারা কলকাতায় থাকে মস্ত ব্যবসায় তাদের কয়লার। এত তাড়াতাড়ি গেলো বংশটা।

সান্যালদের ইতিহাসও কতকটা তাই। সাদা চুলে লাল সিঁদুর পরে রায়ের মেয়ে সান্যালকে ডেকে বলেছিলো—আমি যাই, একটু পায়ের ধুলো দাও। সান্যাল ছেলে বউয়ের সামনে, নাতি-নাতবউয়ের সামনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো। বুড়ো বয়সে রায়ের মেয়ের এমন যশ হয়েছিলো সে-ই ডাকাতে সান্যাল তাই-বা কে জানত।

কিন্তু সান্যালের বংশ লোপ পায়নি। ঐ যে লোকটিকে দেখছো ডাবাহুঁকোয় তামাক টানছে, (না সান্যালের কর্মচারির বংশ নয়, তার নিজের বংশেরই) ঐ হচ্ছে বর্তমানে সান্যালের আমমোক্তার বল বা ওয়ারিশ। ওয়ারিশ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, নইলে সান্যালের বৈঠকখানায় বসে এমন নিবিষ্ট হয়ে তামাক খাবে কে আমিরি চালে। আর আম-মোক্তার বলা যায় এই জন্যে যে সান্যালের করণীয় কাজগুলি সে-ই করে, যেমন ছোটো একটা দুর্গাপূজা, গ্রামের অন্ত্যজদের দাঙ্গা হাঙ্গামায় সালিশি বা এমন সব কিছু।

এঁর নাম ইন্দুমৌলি সান্যাল। আসল মূলের নাম ছিলো মকরমৌলি (অদ্ভুত নামটা, তা লোকটাও তো অদ্ভুত ছিলো)। নামের মিলটুকু ছাড়া, ফ্রেনোলজিস্টরা একটু ভালো করে দেখলে আর-একটু মিল

পায় হয়তো যেমন নাকের সরল ঢালটির কোণে একটু ঐক্য কিন্তু মিলিয়ে দেখতে গেলে অমিলগুলিই বেশি করে নজরে পড়ে। তামাটে গায়ের রং, রোগাটে চেহাবা, নাকের নিচে মস্ত বড়ো সাদাটে গোঁফ, আধ-ময়লা মোটা কাপড়।

তামাক নামিয়ে রেখে সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। সকাল থেকে আজ মেঘ কেটে গেছে, বোদও উঠেছে চনচনে। কাল বড়ো দালানের ছাদ ধ্বসে গেছে বৃষ্টিতে, কাঁঠাল কাঠের পুরনো আলমারির ভেতরে রাখা চারপুরুষেব পুবনো কাগজপত্তরগুলি ভিজে গেছে, সেগুলি বোদে দিতে হবে। দবকারি কাগজ যে খুব তা নয়। যেসব তৌজির সম্বন্ধ সেসব কাগজের সাথে সেগুলি ইতিমধ্যে দু-তিনবার হাত বদলেছে। তবু অন্তত বাপ বড়োবাপের নাম তো আছে। সান্যাল অন্দরের দিকে রওনা হলেন। তার পায়ে হাতির দাঁতের খড়ম নয় যে কর্তাব পায়ের শব্দে অন্দবমহলে সাড়া পডবে। (মকরমৌলিব খডমের একখণ্ড সেবাব রান্নাঘরের পেছনে ডাঁটার খেত করতে যেযে পাওয়া গেছে, নিজের কোঁচার খোঁটে মুছে সেটাকে সযত্নে তুলে বেখেছেন ইন্দুমৌলি)। ইন্দুমৌলির বড়োছেলে কলকাতায় আইন পড়ে আর রেলেব অফিসে কী একটা চাকরি করে। সে-ই পাঠিয়েছে বাপের জন্য লাল চামডার বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথম পবে ইন্দুমৌলি হেসেছিলেন, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, তাছাড়া চামডাটাও বেশ নরম।

হলদে খসা-পচা কতগুলি কাগজ দু'হাতে ভবে এনে বোদ্দুবে দিয়ে সান্যাল আবাব বৈঠকখানাব বারান্দায় বসলেন। কাগজগুলি বোদ্দুবে দিতে যেতে হস্তান্তবের একটা দলিল চোখে পড়েছে—দাত' মকবমৌলি, গ্রহীতা শ্রীমতী রাশেশ্বরী। সান্যাল মনে মনে হাসলেন—গোটা জমিদারি ঘুস। বসিক ছিলো বটে।

নিভন্ত হুঁকোটায় গোটাকতক টান দিয়ে সান্যাল আব-একটু হাসলেন—দিন কী করে যায়। অদ্ভুত লাগে ভাবতে গেলে, যেন আজই নজরে পডলো। শুধু মকবমৌলিব দিন গেছে তাই নয, তাঁর নিজেব জীবনেব বেশিব ভাগ দিনই গেছে। মকরমৌলির দিনের তুলনায কিছু নয, তবু কী দিন সেসব।

ইন্দুমৌলির বাবাকেও লোকে জমিদার বলতো, অবশ্য তাঁকেও বলে—তবে ইন্দুমৌলি নিজেও জানেন কিছুদিন আগেও যাবা জমিদাব বলতে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাব পাত্র বুঝতো, এখন তাবাই কথাটায বোঝাতে চায় খানিকটা অবজ্ঞামিশ্রিত তাচ্ছিল্য।

আর শ্রদ্ধাই বলো বা সম্ভ্রমই বলো কেন বা লোকে তা করবে? কী আছে তাব? সহায় সম্পত্তি ধনজন কিছু নেই, থাকবার মধ্যে নিচের মাঠে কিছু ধানেব জমি, একটা ছোটো মৌজার একটুকরো, আব সামান্য কিছু লগ্নি কারবার।

বাড়িটাকে এখনো লোকে জমিদারবাড়ি বলে—সে তো উঁইর ঢিপিকেও লোকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বলে।

ইন্দুমৌলির কখনো মনে হয় ছেলেমানুষী এসব, কখনো কিন্তু অভিমানে চোখে জল আসে। হাসি পায় যখন তখন ধ্বংসের দিকে হেলে পড়া বাড়িটার দিকে তিনি দেখেন আর ভাবেন হাত গুটিয়ে কেবা বসেছিলো সেই সুযোগে জঙ্গল আসল ঘাঁটিগুলি দখল কবে ফেলেছে, এখন যুদ্ধ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাবাব নীতিটা গ্রহণ করা যায় ; অন্য আর-একটা ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখা ওদের তোড়কে। হুড়মুড় করে পালাতে গেলে হার তো হবেই, চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। কখনো দু'তিন মাস একনাগাড়ে এরকম হালকা মনে হয় তার। এ বকম একটা অবস্থাতেই একবার তাঁর মনে হয়েছিলো, চকমিলান দালানে বাস করা ভালো, কিন্তু তার চাইতেও ভালো খড়োঘরের পরিচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। এরকম একটা অবস্থায় তিনি বৈঠকখানা ঘবেব পেছনে গোটা দু-তিন খড়ের চৌরি তুলে ফেললেন, সেই থেকে সান্যাল পরিবার এই নতুন বাড়িতে থাকে। ইট নেই, পাথর নেই, নেই আস্ত শালের গুঁড়ি বসানো কড়ি-বরগা, তবে পরিচ্ছন্ন, মনে হয় না মাথার উপরে ছাদটা ভেঙে পড়বে।

এরকম মনের অবস্থায় তিনি যেন বেশ জোর পান, অনেক কিছু সহ্য করতে পারেন। '৪৪ খৃস্টাব্দ যখন এলো তখনো তাঁর এরকম মনের অবস্থাই ছিলো। '৪৩-এর মন্বন্তর থিতিয়ে যেতে যেতে চিতে সা ও মহিম সরকার যখন গ্রামে থাকবার পক্ষেও বড়ো হয়ে উঠলো তখনো তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—ওদের টাকা অন্যায়ের টাকা, ওদেরকে হিংসা করা সান্যালের সাজে না। ওরা বড়ো হয়ে উঠেছে গ্রামের লোকেরা সান্যালদের চাইতে ওদের যেন বেশি সমীহ করছে, তা করুক, গ্রামের লোকরা আগে জমিদার কথা জুড়ে নিলেও সকলেই জানে আসলে সে ময়দা, চাল ডাল এসব নিয়ে কী কী সব করে।

এমনকী যেদিন অত্যধিক বিনয় দেখিয়ে এসে মহিম খাজনা চাইলো সান্যালের কাছে (মহারানীর খাসের প্রজা সান্যালের কাছে) সেদিন কেমন লাগলো একটু তাঁর, কিন্তু নির্বিবাদে খাজনা এনে দিলেন তিনি, এমনকী মহিম যে-দাখিলায় নিজের নামের আগে জমিদার কথাটা বসিয়েছে ছাপার অক্ষরে এ দেখেও দাখিলাখানা তিনি নিজের হাতেই নিলেন। মনে মনে একবার অবশ্য ভেবেছিলেন—যে-সামান্য জমির ফালিটার জন্য মহিমকে খাজনা দিতে হবে এখন থেকে সেটা ছেড়ে দিলেও হয়, মানে ঠিক কোথায় বোঝা না-গেলেও আটকায় যেন এরকম-ভাবে স্বীকার করে নিতে।

আমরা যারা সহরে বাস করি আমাদেব কাছে সান্যালের চিন্তাধারাটা খানিকটা হাস্যকর মনে হবে। জমি যে কিনেছে সে যদি ট্রামের একটা চাকা হয় কিম্বা একটা লাইটপোস্ট আমাদের তাকে খাজনা দিতে একটু আটকায় না। সান্যালদের হিসাব অন্যরকম। চেষ্টা করলেও মানুষ অভ্যাসের বিপরীত কাজ সবসময়ে করতে পারে না। মহিমের খাজনার ব্যাপারে পরপর চিতে সা'র ব্যাপারটা ঘটলো।

বাজারে আলুর দাম বেড়েছে, আর কতদূর বাড়বে লেখাজোখা নেই। জমি মানে আলু। আলু মানে সোনা। সোজা হিসাবে চিতে সা একদিন সান্যালবাড়ির সদর দরজার সামনের খালি জমিটা কিনে নিলো! কিনে নেয়াতে খুব বেশি আপত্তি সান্যালের ছিলো না, দু'পুরুষ আগেই ও-জমিটা তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। চিতে সা' জমি কিনেই থামলো না, একটা বেড়া দিলো, চাষ করলো জমি। সান্যাল ছোটোবেলা থেকেই জানেন জমিটা তাদের নয় তবু ছোটোবেলা থেকেই জানেন সান্যালদের খাতিরেই হোক, বা অভ্যাসবশেই হোক মালিকরা জমিটাকে খালি ফেলে রাখে। একটু খচ করে উঠলো সান্যালের মন।

খবর পেয়ে বেরিয়ে যেয়ে সান্যাল বললেন 'জমিটাকে নষ্ট করলে, চিত্তসুখ'?

'আজ্ঞে নষ্ট নয় তো, আলুর চাষ হবে যে। চিতে বিনয় সহকারে বললো।

'কিছু যে হবে তা বুঝেছি, জমিটা অন্যরকমে সকলে ব্যবহার করত কিনা তাই'। অধিকতর বিনয়ী হয়ে চিতে বললো 'আজ্ঞে শুনেছি পূর্বে আপনাদের ঘোড়া টালানো হতো এখানে, এখন তো বোধ হয় সেসবের দরকার নেই।

মুখের উপরে দাঁড়িয়ে এমন ঠাট্টা সান্যালকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি, তিনি বললেন 'প্রাচীরের সবটাই পড়ে গেছে, কিন্তু সান্যালবাড়ির থামওয়ালা পাথরের সদর দরজাটা দাঁড়িয়ে আছে, এখনো দেখতে পাচ্ছো তো'।

কিন্তু এ পর্যন্ত বলেই তিনি থামলেন, অর্থাৎ অন্তত সেই পুরনো পাথরের খাতির একটু করা উচিত ছিলো একথা তিনি বলতে পারলেন না মুখ ফুটে।

বৈঠকখানায় ফিরে নিজেই তামাক সেজে বসলেন সান্যাল। অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়েও মনের ধোঁয়াটে ভাবটা গেলো না। টাকা হয়েছে চিতের বলতে পারে সে—এ ভেবেও শান্তি পেলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সান্যাল টের পেলেন, অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় পায়চারি করছেন তিনি, পায়ের কাছটায় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। তিনি ভাবলেন—আবার তেমন হয় না, আবার ওঠে না পাথরের থামের উপর চকমিলান বাড়ি, কিন্তু উপড়ি-পথে চলতে শুরু করলে নাতিদের সময়ে কিছু হতে পারে হয়তো।

পরদিন সকালে মজুর ডেকে দালানগুলির দেয়াল থেকে অশ্বত্থ কেটে নামাতে লাগলেন, মজে-যাওয়া

পুকুরপারের জঙ্গল কাটা হতে লাগলো। দুঃখে জমানো চার-পাঁচশো টাকা খরচ করে দম নেবার জন্যে থামলেন, চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সান্যাল। জঙ্গল খানিকটা সরে গেছে, দেয়ালের অশ্বত্থের শিকড় উপরে ফেলতে যেয়ে দেয়ালের বড়ো বড়ো হাঁ-করা ফাটলগুলি বেরিয়ে পড়েছে, পুকুরের ধারের জঙ্গল কেটে ফেলতে অন্দরের অনেকটা বে-আব্রু হয়ে পড়েছে, কারণ সেদিকের প্রাচীরের অভাব পূরণ করছিলো জঙ্গলগুলি। এসব কি আবার নতুন করা যাবে? ঐ ফাটলগুলিকে ভরে দেওয়া যাবে কিম্বা পুকুর ঘিরে অন্দর ঘিবে যে প্রাচীর ছিলো আবার যাবে সেটাকে তোলা? অভিমান অনেকটা কেটে গেছে তখন। সর্বনাশ! একি কখনো সম্ভব? নিজের বাড়িটা না-হয় বুক দিয়ে পড়ে বাসযোগ্য করলেন ; কিন্তু গ্রাম? ব্যাধি অশিক্ষা দাবিদ্র্য কিম্বা তাদের স্থূল প্রতীক যে জঙ্গল পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাগুলিকে গ্রাস কবে ক্রমে এগিয়ে আসছে অপরিত্যক্ত আঁকড়ে-ধরে-থাকা স-মানুষ ভিটাগুলির দিকে? রাবণবাজা দুহাতে পৃথিবী উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন—সান্যালেব হাতে কি গ্রামখানার দিকে এগিয়ে আসা জঙ্গলের জোয়ার ঠেলে রাখবাব জোর আছে?

সান্যাল স্ত্রীকে ডেকে বললেন—'নিষেধ করলে না, টাকাগুলি লোকসান দিলাম'।

স্ত্রী মনে মনে হাসলেন, হয়তো বললেন—'তবু যদি রায়ের মেয়ে হতাম। প্রকাশ্যে বললেন—নষ্ট হলো কোথায়, আমাব কত ভালো লাগছে'।

এরপরে অনেকদিন সান্যাল আব অভিমান কবেননি। ১৯৪৬-এর গোড়ায় এসে তিনি যা করলেন সেটা বোধ হয সান্যালদেব বহু প্রমাণিত নির্ভীকভাব ফল। একদিন গ্রামের চাষীরা দেখলো সান্যাল খালি গায়ে মাথায একটা গামছা চাপা দিয়ে নিচের মাঠের দিকে যাচ্ছেন। চাষীদের মধ্যে দু-একজন বুড়ো ছিলো, তারা সান্যালদের সেকাল দেখেছে, ফলে সান্যালকে এখনো খানিকটা সমীহ কবে, তারা এ বেশে তাঁকে দেখে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—'কোথায যাচ্ছেন কর্তা'?

—'মাঠে'।

—'মাঠে? সেখানে কী জরিপ হচ্ছে'? (হাঁ, তা জরিপের সময়ে জটিল অবস্থা হলে সান্যালকর্তারা এর আগেও মাঠের দিকে গেছেন এক-আধবার)।

—'না, কিছু ঢাঁড়স গাছ লাগিয়েছি, বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, একটু নিড়িয়ে দিতে হবে'।

—'নিড়িয়ে দিতে'!

নিজে হাতে না-হয় নাই হলো তাই বলে সান্যালবাড়ির কর্তা যায় খেতের তদারক করতে, সে তো চাষীর কাজ। একজন বুড়ো সহ্য করতে না-পেরে বললো—'বাড়ি যান কর্তা রোদে কষ্ট হবে'।

সেদিন অপ্রতিভ হয়ে ফিরে গেলেও, পরে অনেকদিনই সান্যাল মাঠে গেছেন, এমনকী গাছে ফল নামলে সেগুলি বিক্রির জন্য বাজারেও পাঠিয়েছেন। লোকে কথাটা এ কান-ও কান করেছে। উপায় কী!

আমার ভাষায় বলা যায় সান্যাল বাস্তবকে ধরেছেন। সেকালের প্রতাপের ছায়ালোক থেকে নেমেছেন একেবারে রোদে-ভরা মাটিতে। একটু কষ্ট হয়েছে তাঁর, তবু হাসিমুখে ধরবার চেষ্টা করেছেন, জঙ্গলা লতা-টতা যেমন পাক দিয়ে ধবে কোন গাছকে। তিনি স্থির কবেছেন মামলা মোকদ্দমা আর নয়, সেলাম কেউ না-দেয় নাই দিল। অবশ্য আমরা বলতে পারি সেলাম আশা কবাই বোকামি, কিন্তু তাহলেও অনেকদিনের অভ্যাস।

ছোটোছেলে এসে বললো—'দেখে এলাম বাবা, ভারি সুন্দর সুন্দর সব কাপড় এসেছে, ছিট এসেছে এবার মহিম সরকারের দোকানে। আমাদের র‍্যাশান কার্ডখানা পাঠিয়ে দাও না। একজোড়া ভালো ধুতি যদি দিতে পরতে তুমি'।

সান্যাল বললেন—'থাক গে ও রকম চাইতে যাওয়া ভালো নয়'।

—'তুমি তো মোটা কাপড় পরতে পারো না, আনিয়ে নাও একজোড়া'।

দুর্বলতা ছিলো এককালে। হয়তো ছেলেটা তার মা'র মুখে গল্প শুনেছে। এখন আর নেই।

সান্যাল বললেন—'এই যে পরে আছি দেখছিস না'।

অনেক বলে সান্যালকে রাজি করিয়ে ছেলে গিয়েছিলো কাপড় আনতে। দুপুর কাটিয়ে খালি হাতে ফিরে এলো সে, কান দুটি লাল হয়ে উঠেছে অপরিসীম লজ্জায়। সান্যালের সামনে ধপ করে র‍্যাশান কার্ডখানা ফেলে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিলো, সান্যাল বললেন—'কী হলো'? চোখের চেহারা আড়াল করবার জন্যে ছেলে ঘুরে দাঁড়ালো।

সান্যাল একটু রাগ করে বললেন—'চাওয়াটাই ভালো হয়নি। কিন্তু কে বলে উঠলো ভিক্ষা নয় তো, অন্যায় কিছু তো চাইনি'।

সান্যাল অনেকক্ষণ একা বসেছিলেন বৈঠকখানায়, কী ভাবতে কোন সময়ে চোখের কোণে দু-এক ফোটা জল এসেছিলো গাল বেয়ে পড়লো, তারপরে শুকিয়ে গেলো।

কিন্তু হঠাৎ এক একটা ঘটনা ঘটে যায় যাতে সান্যালের বদরাগ বিসদৃশভাবে গ্রামের কাছে ধরা পড়ে যায়। আগেকার দিনে যখন সান্যালদের রাগকে লোকে তেজ বলতো তখন যে তিনি এর চাইতে অনেক বেশি রাগ করতেন, এখন বুড়ো হয়ে করেন না, এই আপেক্ষিক উন্নতি কেউ দেখেও দেখে না, প্রশংসা করা দূরে থাক।

সান্যালদের বাড়ির পেছনে সাত-আট বিঘে ভুঁইয়ে দশ-পনেরো ঘর বাগদী প্রজা বাস করতো সান্যালদের। প্রজা ঠিক নয় সান্যালদের লাঠিয়ালদের ক্ষয়াবশেষ বংশধর। এখন এরা লাঠি খেলে না, ম্যালেরিয়ায় ধোঁকে, না-খেয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে অন্যায় কাজ করে, বড়ো ধরনের অন্যায় নয়, ছোটোখাটো ইতর কাজ। পূর্বপুরুষদের কথা মনে করেই হোক কিম্বা খানিকটা অভ্যাসের বশে এটা এখনো মাঝে মাঝে সান্যালদের ফাইফরমাস খেটে দেয়। এদের মধ্যে ছোকড়া বয়সি যারা তারা আপত্তি জানায় তবে এদের মোড়লস্থানীয়েরা তাদের যুক্তি সমর্থন করলেও সান্যালের কান পর্যন্ত কথাটাকে পৌঁছতে দেয় না। সান্যালও খুব কৌশলে খোলাখুলি অবাধ্যতার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলেন, ইদানীং কাজকর্মে এদের প্রায় বলেন না, বললেও বকশিসের নাম করে সাধারণ চলতি মজুরি মিটিয়ে দেন।

এদের এক বুড়ি ছিলো, সে সান্যালদের উঠোন ঝাঁট-টাট দিতো, এঁটোকাঁটা যা হয় খেতো। বুড়ি নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ। তার আবার কানেও কম শোনে। লোকে গালি দিলেও রাগ করবার কিছু নেই তার।

এই বুড়ির একদিন কী দুর্মতি হলো। সাত বছরের কালে বউ হয়ে যখন সে গ্রামে এসেছিলো তখন থেকে প্রায় প্রতিটি দিনই সান্যালদের পুকুরে (পাথরে বাঁধানো ঘাট ছিলো যখন) স্নান করেছে। আজ সে গেলো মাঠের ধারে বড়োপুকুরটায় স্নান করতে।

আধঘণ্টা বাদে বুড়ি অর্ধস্নাত অবস্থায় ফিরে এলো কাঁদতে কাঁদতে।

—'কী হলো বুড়ি'?

আরো খানিকটা কেঁদে বুড়ি বললো—'স্নান করতে জলে নামতেই মহিম সরকার যমের সরকারের মতো এসে দাঁড়িয়েছিলো, তাকে জল থেকে তুলে এনেছিলো : বলেছে, যাকে জমিদার বলিস সেখানে না-যেয়ে আমার পুকুরে এসেছিস কেন মরতে'। ঠ্যাং ভেঙে দেবে বলেছে এবং ভাঙবার আগাম স্বরূপ একটা চড়ও মেরেছে বুড়ির গালে।

সান্যালগিন্নি মুখ লাল করে ঘরে গেলেন। ডাকে-আসা কাগজ থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর মুখ দেখে শঙ্কিত হলেন সান্যাল, বললেন—'কী হলো আবার'?

—'গ্রামে কি পুরুষ নেই'?

—'নেই আবার ; এখনো মরিনি তো'।

'রসিকতা রাখো' এই বলে সান্যালগিন্নি বুড়ির মার খাওয়ার কাহিনী ব্যক্ত করলেন।

'কী করবো বলো' বলে সান্যাল কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়লেন। চিরদিনের সহিষ্ণু সান্যাল-গিন্নির আজ যেন সহ্য হলো না : কেঁদে ফেলে তিনি বললেন—'চড়টা যে সান্যালদের গালে পড়েছে তাও বুঝবে

না'?

সান্যাল খানিকটা হাসলেন, তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তেমনি হঠাৎ দেয়ালে ঝুলানো বহুদিনের পুরনো ধুলিমলিন চাবুকটা হাতে করে সান্যালগিন্নি কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে গেলেন। এবার সান্যাল-গিন্নির ভয় হলো : হা ভগবান, কী লোকের হাতে পড়েছেন, ত্রিশ বছর পরে আবার তাঁর মনে হলো কথাটা। ছোটোছেলেকে খুঁজে বার করে পাঠালেন তাকে সান্যালের পেছনে—'যা বাবা যেমন করে পারিস ধরে নিয়ে আয় ; আমারই দোষ, সব কথা পুরুষদের কানে তুলতে নেই'। ছেলে চলে গেলে ভাবলেন, কিন্তু কী করে সহ্য করা যায় এমন অন্যায়। বিনা কারণে এই হিংসা দ্বেষ কেন হয় মানুষের।

কিছুক্ষণ পরেই ছেলের সাথে সান্যাল ফিরে এসেছিলেন অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে, হাসি নয় ঠিক।

কথাটা যে ওদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে সান্যাল বেত হাতে বেরিয়েছিলেন মহিম সরকারকে মারবার জন্যে। একটা মীমাংসাও ওরা করেছে—সেটা বোঝা গেলো যখন বুড়ি পরের দিন কাজ করতে এলো না। রাখাল ছেলেটা গিয়েছিলো বুড়ির খবর করতে। সে শুনে এসেছে—বাগদীবা বলেছে, যার কাছে থেকে অন্যলোকের হাতে মার খেতে হয় অত কেন তার ফুটোনি।

সান্যাল গিন্নি বললেন—'হাসি পায় তোমার'?

লজ্জাও হচ্ছে সান্যালের, তিনি যেন লাল কাপড় ফেরতা দিয়ে পরে যাত্রার রাজা সেজে বেরিয়েছিলেন পথে ; লজ্জা মানে অনুতাপ নয়, জ্বালা করছে মন , নিজের উপরে রাগ হচ্ছে, সান্যাল-গিন্নির উপরে। সান্যালগিন্নি যখন খেতে ডাকতে এলেন, সান্যাল রাগ করে বললেন 'যাও যাও খাবো না'।

আসল কথা পরে জানা গেলো—মহিম সরকারকে এরা কেউ বাবু বলে না, দাদা, কাকা এমন সব গ্রাম সম্বন্ধে (পূর্বে যা বহাল ছিলো) ডাকে, বাবু বলতে গ্রামের লোকরা অভ্যাসবশে সান্যালকে বোঝে। সান্যাল শুনে হেসে ফেলেছিলেন—তা তোরা একটু বাবু বললেও পারিস, যদি তাতে খুশি হয়।

কিন্তু এতদিন তবু কাজে-অকাজে ওদের দু'চারজন চলাফেরা করতো সান্যালদের সদরের সামনে দিয়ে এখন তাও বন্ধ হয়েছে, সকালের হাল্কা অন্ধকার থেকে সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার পর্যন্ত সান্যাল একাই বসে থাকেন বৈঠকখানায়। মাঝে মাঝে তামাক খান, ভেঙে-পড়া নাটমন্দিরের উপর দিয়ে সারবন্দি নারকেল গাছগুলির মাথার উপর দিয়ে আকাশের দিয়ে চেয়ে থাকেন যেখানে একটামাত্র বাজপাখি পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

একজনমাত্র লোক এখনো মাঝে মাঝে আসে সে হচ্ছে গ্রামের সনাতন বৈরাগী। বেঁটেখাটো ফরসা চেহারার মানুষটি। হাসছে আর বিনীত হচ্ছে, এছাড়া আর কিছু মনে হয় না তাকে দেখলে।

বৈঠকখানার বারান্দায় উঠেই বলে—'একটু চরণধূলি দিন দাদা, খাঁ-খাঁ করছে প্রাণ'। সান্যালের কথা বলবার দরকার হয় না। যতক্ষণ বৈরাগী থাকে অনবরত কথা বলে, অনবরত মিষ্টি করে 'দাদা' বলে আর কথায় কথায় জিভ কেটে হাতজোড় করে।

একদিন সনাতন বললো—'আজ ঝগড়া করতে এলাম দাদা, একা একা কেন? গরীবের বাড়িতে গেলেই হতো। (এইখানে জিভ কাটলো) ছোটোলোকের মুখের আস্পর্ধা দেখলেন, দাদা, সান্যাল যাবে কিনা বৈরাগীর বাড়ি। আমার অন্যায় হয়েছে, আমারই আসা উচিত ছিলো। এখন থেকে রোজ আসবো'।

'নিজের কাজ ফেলে তোকে রোজ আসতে হবে কেন'?

'বলেন কী! আপনার কাছে আসবো'?

'তা বেশ করেছিস, বস'।

'আজ একটা কথা বলতে এলাম, দাদা'।

'কি রে'?

'এমন দরকারি কথা নয়, বলছিলাম আপনি কিছুদিন গ্রাম ছেড়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে।

'কেন রে'?

'শরীর ভালো হবে, আবার কেন'?

'বুড়ো বয়েসে শরীর দিয়ে আবার কী হবে, আসল কথা বল'।

'ছেলেটার পড়াশুনাও তো দেখতে হয়। গ্রামের স্কুলে আর কতদিন থাকবে'।

বৈরাগী চেষ্টা করেও বলতে পারলো না—আর কেন, ঝড়ে উপড়ে-যাওয়া গাছের শুকনো গুঁড়ির মতো পড়ে থেকে আর কী লাভ। তার চাইতে নতুন জায়গায় যেয়ে আবার বাঁচবার চেষ্টা করলে হয়। কিন্তু সান্যাল নিজেই বললেন, 'এখন মানে মানে সরে যাওয়াই ভালো'।

'তা নয় দাদা, তা নয়। মানের কথা নয়। এদের পরে এই অন্ত্যজদের পরে রাগ করে যাওয়া আপনার চলে না। যাবেন নিজের তাগিদে। মনে করুন না আপনার পূর্বপুরুষের কথা, তাঁরা কী এ গ্রামে আসবার সময়ে নিজের গ্রামের উপরে রাগ করে এসেছিলেন? বাঁচতে হবে, সান্যালের বংশ রাখতে হবে, সেই তাগিদে। জল শুকিয়ে এলে একশো বছরের পুরনো রুইও যেমন লাফিয়ে ওঠে জলের খোঁজে তেমন করে বেড়িয়ে পড়তে হবে। একটা বট পুরনো হলো, পুরনো গুঁড়ি রস টানলো না বলেই কী বটের মৃত্যু হবে? অনেক দূরে অন্য কোথাও তো ব' বনেছে, সেই ব' থেকে আবার নতুন বট বেরুবে, ছায়া দেবে'।

এমন সব কথা বৈরাগী দেখা হলেই বলে। চুয়াল্লিশে বলেছিলো, পঁয়তাল্লিশে বলেছিলো, এখনো বলছে। হয়তো এ বাড়িতে এসে এর পুরনো আবহাওয়ায় নিজেরই দম বন্ধ হয়ে আসে তাই বলে ফেলে। কিন্তু কলকাতা থেকে ও যখন ঘুরে আসে তখনই পর পর কয়েক দিন খুব বেশি করে বলে। কলকাতায় রায়দের স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দেখেই বোধ হয় সান্যালদের অস্বচ্ছলতার কথা ওর মনে পড়ে।

বৈরাগী চলে গেলে সান্যাল ভাবলেন, শুধু ভাবা নয় স্ত্রীব সাথে বৈরাগীর কথাগুলি নিয়ে আলোচনাও করলেন। বৈরাগীর কথাটা গ্রহণ করবার জন্য বোধ হয় তাঁর অজ্ঞাতে অনেকদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিলো তাঁর মন।

ভূমিকা না-করে বললেন সান্যাল-রায়রা চলে গেছে, এবার আমরা যদি যাই কী রকম হয়'? কথাটা আচমকা বলে সান্যাল গিন্নি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—'কোথায় যাবো'?

'রায়দের মতো গ্রাম ছেড়ে। আজ সনাতন বলছিলো ; আর ভেবেও দেখলাম কথাটা মিথ্যা নয়। এক ছেলে থাকলো কলকাতায় আর একজন বড়ো হয়ে কোন ফরক্কাবাদে যাবে কে জানে। ওরা হয়তো কোনোদিনই গ্রামের বাড়িতে ফিরবে না। বড়োছেলে জমিদারের গন্ধই সইতে পারে না, ছোটোটিও হাকিম-টাকিম হবে বোধ হয়। তবে আর এসব কেন আগলে রাখা'।

'ঠাট্টা যতই কর কথাটা মিথ্যা নয়'।

'সত্যি। এখন আমাদের দুজনকে বাদ দিয়ে চলতে হবে। ওদের দুজনকে স্থাপিত মতো একটা কিছু করতে হবে তো। আর বলতে কী মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় নতুন করে জীবন আরম্ভ করুক ওরা। সনাতন মরা গাছের গুঁড়ির সাথে তুলনা দিচ্ছিলো। আমারও মনে হয় নতুন মাটি পেলে পুরনো বংশটা আবার একটু জোর পায় হয়তো'।

'দুটো ছেলেকে যদি আমার কাছে রাখবার ব্যবস্থা করে দাও তাহলে তো আমার সাধই মেটে'।

কিন্তু দুশো বছরের শিকড় এক কথায় মাটি ছাড়তে পারে না। এমনকী সান্যালগিন্নিও থাকবার পক্ষেই এক এক সময়ে যুক্তি দেখান। '৪৩-এও সান্যাল মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। সহরে যাবার কথায় বলেছিলেন—কে চেনে আমাকে, কার সাথে কথা বলবো। কিন্তু '৪৬-এ এসে সান্যাল আর পারছেন না। শিকড় নড়ছে। একটা ধাক্কা বড়ো গোছের দরকার ছিলো, সেটাও এলো, আর এলো অদ্ভুতভাবে। ঘটনাগুলি ঘটলো যেন সান্যালকে আর কিছুদিন থাকবার জোর দেবার জন্য ; ফল দাঁড়ালো অন্যরকমের।

১৯৪৬-এব আগস্ট এসে পড়েছে। ১লা আগস্টের ভয় করে উঠলো সান্যালগিন্নির। ১৯৩৮-এর আগস্টে জেলও খাটলো, মাথাও ফাটলো ; ১৯৪২-এর আগস্টে জেলের মধ্যে নতুবা পুলিশের গুলিতে

প্রাণ যেতো ; ছোটোবেলা থেকেই ছেলের মুখে—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, তারপর পর-বছরের মাথায় আগস্ট আসছে। তুমি লিখে দাও বাপু বাড়িতে আসুক, লেখো আমার খুব অসুখ।

সান্যাল চিঠি লিখেছিলেন, আশঙ্কা তাঁরও হয়েছিলো, রসিদ-দিবসে কলকাতা লাল হয়েছিলো রক্তে এবার আগস্টে কী হবে কে জানে।

কিন্তু কোথায় কী হলো : মানুষ ভুলে গেলো মেরুদণ্ড সোজা করে চলা, সূর্যের দিকে তীক্ষ্ণ করে তাকানো ; ভুলে গেলো নিজেকে সে অমর করেছে ; ভুলে গেলো তার সবচাইতে বড়ো পরিচয় সে দেবশিশু নয়, মানুষ। সাপের মতো লুকিয়ে থেকে মানুষ মানুষকে ছুবলে খাচ্ছে। কলকাতার রাজপথে রক্তস্রোত বইছে কিন্তু মানুষের রক্তবীজ—আত্মার রুধিরোৎসব নয় ; কলকাতার পথ কাদা হয়ে উঠেছে হিংসার, লোভের, রিরংসার কদর্যতায়।

বাগদীদের যে-ছেলেটার মুখ দিয়ে সবসময়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, সবসময়ে মুখ হাঁ হয়ে থাকে, জিভটাকে সরিয়ে হাসতে হাসতে সে বললো—'খুব লেগেছে কইলকাতায়'।

'কি লেগেছে রে'?

'মারামালি, হেঁদুমোছলমালে'। উল্লাস সহকারেই সে বললো।

দুঃসংবাদের দ্রুতগামিতায় কোনো সন্দেহ করতে নেই তা বোঝা গেলো। এমন কী গ্রামের মুসলমান পাড়ার কোন কোন ছেলে কলকাতায় মার খেয়েছে, খুন হয়েছে তা পর্যন্ত।

বিশ তারিখে খবরের কাগজ এলো, সংবাদ পড়ে সান্যালগিন্নি কেঁদে ফেল্লেন। সান্যাল আর-একবার তামাক লাগিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ছোটোছেলে বললো—'আমাদের গাঁয়ে লাগে যদি'?

'আমাদের গাঁয়ে? লাগবে কেন রে? তাছাড়া আমার মনে হয় সৈয়দরা থাকতে লাগবে না। অনেকদিনের ঘর, আমাদের মতোই পুরনো'।

'কিন্তু শুনলাম সৈয়দদের বড়োছেলে নাকি হিন্দুদের হাতে মারা গেছে কলেজ থেকে ফিরতে। এ রকম হলে সৈয়দরা শোকে বেসামাল হয়ে পড়তে পারে'।

'কিন্তু কলেজে পড়বার মতো অত বড়োছেলে সৈয়দদের কারো নেই'।

কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হলো—সৈয়দদের ছেলেটা মারা গেছে, হিন্দুরা এ রকম করছে কেন? সব দোষ মুসলমানের না? শিক্ষার একটু দরকার হয়েছে প্রভৃতি কথা গ্রামের বাইরে গুঞ্জরিত হতে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শুধু কথা নয়। আশঙ্কাও এলো।

সকালে ঘুম ভেঙে প্রথম কলকের তামাক টানছেন সান্যাল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কচি মেয়েছেলের কান্না ভেসে আসতে লাগলো কানে। কী হলো কার ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, সান্যালগিন্নি অন্দর ও সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

'কী হলো'?

'বিপদই হয়েছে। এখন রাখি কোথায় বলো'।

'কে'?

'বুড়ির নাতনি। কাল রাতে এরা শুধু ভয় দেখতে এসেছিলো, আজ রাতে যদি দরজা খোলা না পায় আগুন দেবে।

সান্যাল ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—'আমি কী করবো বলো, আমার কী ক্ষমতা আছে'।

'তাই বলে ওরা চলে যাবে ; আহা, মানুষের মেয়ে তো'।

বুড়ি আর বুড়ির নাতনি সবুজ গাছের পাতা-টাতা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে খেয়ে আসে দিনের বেলায়। বিকেল থেকে সান্যালদের পুরনো অন্দরের কোনো ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। আর যা

হোক, সান্যালদের পাথরের ভিতে আগুন দেবার কসরৎ গ্রামের ওস্তাদরা জানে না।

কিন্তু এত সহজেই রেহাই সান্যাল কোনোদিনই পান না। দু-তিন দিন পরে একজন অচেনা লোক এসে উপস্থিত। কালো ময়লা গায়ের রং, পরনে একখানা লাল ছেঁড়াখোঁড়া পাটের কাপড়, গলায় কালচে ময়লা সুতোর একটা ফের আর অসংখ্য রুদ্রাক্ষের একটা মালা, কোলে লাল গামছার মোড়া একটা কী।

'কে। থাক থাক'।

প্রণাম শেষ করে লোকটা বললো—'আমি, কর্তা, নন্দীপুরের বিষ্টু আচার্যি। দশখানা গাঁয়ের লোক আমাকে গুরুগোঁসাই বলে জানে। জাতিতে ব্রাহ্মণ'।

'নমস্কার, আপনার কী করতে পারি আমি'?

'আজ্ঞে আপনি নয় তুমি . আমার বাবা আপনার বাবার বিশেষ ভালোবাসা-ছোদ্দার পাত্র ছিলেন। অগতির গতি আপনার কাছে এলাম, এটাকে ছে-চরণে রাখুন, এই কাষ্টখানাকে'।

এই বলে গামছায় ঢাকা জিনিসটা সান্যালের পায়ের কাছেই নামিয়ে দিলো।

ঢেঁকির মতো চেহাবার একখানা ছোটো কাঠ, সূঁচালো মাথার দিকে একটা ছোটো ত্রিশূল লম্বভাবে পোঁতা, এটার গায়ে হেলান দিয়ে একটা বড়ো ত্রিশূল, দু-তিনটে সরু সরু বেতের কোঁড়া। তেল সিঁদুরেব একটা পুরু স্তর পড়েছে কাঠখানার উপরে। সান্যাল চেনেন, একে এটা 'পাটবান' বলে—মহাদেবের প্রতীক। চড়কেব দিন এর পুজো হয় , একে খুশি করবার জন্য এরা না-খেয়ে থাকে, কাঁটাব জঙ্গল সারা গায়ে বিঁধিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বেন্টিঙ্কেব প্রণীত আইন উপেক্ষা করে জিভ ফুঁড়োয়, পিঠ ফুঁড়োয়, তাড়ি খায়, অশ্লীল চীৎকার করে ; এর কাছে গোপনে সলজ্জ মানত করে গ্রামের নতুন বউ ; রুগ্ন মৃত্যুমুখী সন্তানের মা কান্নায় ভেঙে পড়ে এর সামনে। মানুষের বর্বর অমার্জিত মনের প্রতীক, তবু মানুষের ধ্যানের প্রতীক।

'ছি ছি এ তোমাদের ঠাকুর, আমার পায়ের কাছে নামালে'।

লোকটি অবশ্য আশ্রয় চায়। বললো—তার গাঁয়ের লোকরা বড়ো ভয় পেয়েছে, এই কাঠখানা ওদের কামড়ায় কিনা জানা যায় না কিন্তু এর পরেই ওদের রাগ। গ্রামের লোকরা বলেছে—ঠাকুব নিয়ে পালাও গোঁসাই, গাঁয়ে শান্তি আসবে।

সান্যাল শুনেছিলেন নন্দীপুর গ্রামে নমশুদ্র, কৈবর্ত জেলে মিলে পাঁচ ছশো ঘর হিন্দু আছে, শুনেছিলেন ওরা সাহসী। বিরক্ত হয়ে বললেন—'যাদের ঠাকুর তারা যদি ভয় পেয়ে কাছে না-রাখে, আমি রাখতে গেলাম কেন?

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলে ঘুম ভেঙে উঠে সান্যাল তামাকের চেষ্টায় বাইরে এসে দেখেন লোকটা যায়নি। বারান্দায় উঠে বসে কাঠের থামে গা ঢেলে দিয়ে ঢুলছে।

এরপর চাল ডাল নিয়ে সান্যালগিন্নিকে রান্নাঘরে যেতে হলো। উপায় কী, একটা লোক না-খেয়ে থাকে।

সান্যাল বুঝতে পেরেছেন বিশ-পঁচিশ জন যারা এসে তাঁর পুরনো ইটের স্তূপে আশ্রয় নিচ্ছে তারা ঠিক তাঁর আশ্রয় চায় তা নয়, তারা হিসাব করছে খড়ের ও বাঁশের তৈরি ঘরে আগুন যত তাড়াতাড়ি লাগে ইটের বাড়িতে তত নয়, হোক ভাঙাচোরা সাপের আড্ডা।

একদিন ওদের কয়েকজন বললো—'লাঠি বানাই, কর্তা, হুকুম দেন তো সড়কি ফালাও বানাই। মরতে হয় লড়ে মরি'।

—'ওসব এ গাঁয়ে কিছু হবে না'।

—'পোস্তুত হই'।

—'তা যা ইচ্ছা হয় কর'।

দু-তিন দিনের মধ্যে বিশ-পঁচিশ জন মিলে বাঁশের ঝোঁপগুলি সাবার করে ফেললো। অনবরত বাঁশই

কাটছে, বাঁশই চাঁচছে, কিন্তু বাঁশ চাঁছার চাইতে বোধ হয় ওদের আনন্দ হল্লা করায় ; রাস্তায় মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হল্লা করে আলোচনা করে কোনটায় সড়কির কলম হবে, কোনটায় ধনুকের কামানি হবে।

বাইরে ইতিমধ্যে রটে গেছে সান্যাল পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবী আনিয়েছেন, লড়াই-এর জন্যে ভালোভাবে তৈরি হলেই মুসলমানের পরে হামলা দেবেন। সান্যাল শুনে হেসেছিলেন—পাগল, ওরাও পাগল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাটাই ভাবছিলেন, তাঁর মনে হলো এ রকম আতঙ্কিত হওয়া ভালো নয়। আতঙ্কে মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। গ্রামের খুলু নসির শা' যাচ্ছিলো তেলের ভাঁড় হাতে, সান্যাল ডাকলেন—'নসির শুনে যা'।

নসির শুনলো না, দৌড়ে পালালো না বটে লম্বা লম্বা পা দুটি এমন অস্বাভাবিক করে ফেলতে লাগলো যে সান্যালের হাসি পেলো। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ! পাগল।

কিন্তু পাগল নয় তার প্রমাণ দুদিন না-যেতেই হ্যাটকোট পড়া ছোটো হাকিম দারোগাকে সাথে কবে গ্রামে এলেন ; সোজা সান্যালের বাড়িতে গেলেন।

'লুক হিয়ার সান্যাল'।

দারোগা একটু গলা নিচু কবে বললেন—'সান্যাল নয়, ইন্দুবাবু বলুন'।

হাকিম ভয়ঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললেন—'হোয়াট'! (অর্থাৎ হাকিমকে হিসাব করতে হবে কথা বলতে)।

যাক সে-কথা, হাকিম বললেন—আমি শুনতে পেয়েছি You are fomcntıng trouble. গ্রামেব ছোটোলোকদের জোট করে লাঠিসোটা তৈরি কবে মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায় আছেন। **I definitely give you to understand** এসব আমি সহ্য করবো না।

'আপনি ঠিক সঠিক খবরটা পাননি। জিজ্ঞাসা করুন ওদের উদ্দেশ্য কী'।

'হ্যাঁ, ওরাই আমাকে বলেছে'।

'ওরা? ওরা বলেছে ওরা লাঠি তৈরি করছে? তৈরি হয়তো করছে, কিন্তু কেন'?

'আমি জানতাম জেরার মুখে মিথ্যা টেঁকে না। বদমাইস কোথাকাব'।

হাকিম চলে গেলেন, গ্রামের লোকরা ফিরে গেলো, আশ্রিতরা অন্দরে গেলো। সান্যাল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বসে আছেন, ফরাসের উপরে। বদমাইস। সান্যাল হাঁফাতে লাগলেন, বদমাইস! গ্রামের লোকরা বলছে, আশ্রিতরা বলেছে তিনি লাঠি নিয়ে তৈরি হচ্ছেন দাঙ্গার জন্য। তিনি? আতঙ্কে মানুষ দিশেহারা হয়, অবক্তব্য কথা বলে অকর্তব্য কাজ করে ; কিন্তু বদমাইস!

খবর পেয়ে সান্যালগিন্নি ছুটে এলেন, সান্যালের সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া-মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরলেন, ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে বলে লজ্জা হলো না, বললেন—'দৌড়ে পাখাটা নিয়ে আয়, বাবা'।

গ্রামের থেকে সরে যাবার পক্ষে এই যথেষ্ট ধাক্কা . কিন্তু যা ঘটে সে আরো বেশি সান্যালকে আর-একটা আঘাত পেতে হলো। মানুষে তাঁর বোধ হয় তবু খানিকটা বিশ্বাস অবশিষ্ট ছিলো, সেটাও নিভে গেলো।

সেই বুড়ির নাতনি একদিন রাত্রিতে কেঁদে উঠলো আবার ; এবার সান্যালবাড়ির নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই। সান্যাল শুনলেন, বললেন—'বাইরের কেউ এসেছিলো'? কে বললো—'না'।

ভগবান গ্রামকে রক্ষা করুন সান্যালদের রাগের হাত থেকে, যে রাগ একশো বছর ঘুমিয়েছিলো, ঘুমিয়ে থাকো। সান্যাল ঘরে ফিরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন—ভগবান, ভগবান, মানুষ হেরেছে, হার স্বীকার করেছে, আর কেন।

আগস্ট গেলো, সেপ্টেম্বর গেলো, গোটা '৪৬ খৃস্টাব্দ গেলো · বিহারের জন্য হোক বা অন্য একশো কারণের যে-কারণেই হোক গ্রামে দাঙ্গা হয়নি। লোকগুলি যেমন ছিলো তেমনি আছে কিন্তু একটা বিষয় স্থির হয়ে গেছে সান্যালরা গ্রাম ছাড়ছেন।

সেদিন সনাতন বৈরাগী এসে বললো—'আর কত দেরি, দাদা'?

'হয়ে এলো'।

'এতদিন পরে অন্তরীণ থেকে মুক্তি পাবেন'।

'আমি গেলে তুই যেন বাঁচিস'।

'সত্যি তাই, অন্তত কথা বলার লোক এক-আধজন পাবেন'।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ৫ই জুলাই চিঠি লিখলো বড়োছেলে :

> বাবা, তোমার বাড়ি তৈরি শেষ। এখন আমরা অনায়াসে সুভাষনগরেব বাসিন্দা বলতে পারি নিজেদের! জমিদার নয়, জলে-ভেজা-পচা গুঁড়ি নয় গাছের, সবুজ বেতের গাছ, সাধারণ মানুষ। আমার মনে হয় তুমি এখানে এলে ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান না হোক অন্তত একজন কমিশনার হতে পারবে। আর-একটা কথা, আমার মা'র কষ্ট বোধ হয় এতদিনে গেলো ; আর বোধ হয় ওঁকে বন্দিনী লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে না। আলো বাতাস, মানুষ সবাই আছে। তোমার বাড়ির সামনে ছোটো একটা বাগান আছে, বাগানের ভেতরে একটা বেদী বাঁধিয়ে নিয়েছি। হঠাৎ কোনোদিন রাত্রি শেষ হবার আগে যদি তুমি সেথায় বসে সেতার বাজাও। আমাব মনে হয় তোমার পুবনো সেতারের খোলটা আনা ভালো যতই পুবনো হোক, রঙচটা হোক। এবার আমি শিখবো। বিশ বছর আগে আমি আনন্দ পেতাম না, জোর কবে তুমি শেখাতে চেয়েছিলে বলেই হয়তো। এখন আর বুরুং বুকং বলে হাসবো না, শিখবো।
>
> দ্যাখো আসল কথাই বলা হয়নি, বলেও শেষ হয় না। আমরা স্বাধীন হবো! স্বাধীন—যে স্বাধীনতা পাবার জন্য তুমি কলেজ ছেড়ে ছিলে ছোটোবেলায় ; সেই আশা। একটা ব্যাপাব যেন ভালো হলো না ; বাংলা দেশ ভাগ হয়ে গেলো। তা হোক, স্বাধীনতা আসুক আবাব বাংলা এক হবে। যদি পারো শ-পাঁচেক টাকা পাঠিও, কন্ট্রাক্টর একটু তাগাদা দিচ্ছে।

সান্যাল পড়ে হাসলেন, খুশিও হলেন, সকালেব হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ যেমন খুশি হয়। বহুদিনের পুরনো ম্যালেরিয়ার আসবার দিন কেউ যদি বলে আজ জ্বর আসেনি, তেমনি।

২৮-এ জুলাই ছেলে এসেছে নিয়ে যাবার জন্যে—স্নান আহারের পরে গল্প হচ্ছে। ছোটোছেলে বললো—'আচ্ছা, হিন্দুস্থান-পাকিস্থান তো হলো, আমাদের এ গাঁ তো পাকিস্থানে পড়লো'।

'না, তা হলো না। হলো ভারতবর্ষ আর পাকিস্থান, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি রচনা হচ্ছে'।

'পাকিস্থানেও তো হিন্দু থাকলো, তারা কী করবে'?

'কী আবার করবে'।

হাসতে হাসতে ছোটোছেলে বললো—'বসে বসে থাকবে, না-খাওয়ার মতো খাবে, শেষ পর্যন্ত মুসলমান হবে'।

'বলিস কিরে নিজের ধর্ম, নিজের কৃষ্টি কেউ ত্যাগ করে'?

'কৃষ্টি'!

ছোটোছেলে হাসতে হাসতে কোন কোন মাল গুড্‌সে বুক করা হবে তার ফর্দ করতে বসলো। বড়োছেলে চট দিয়ে আসবাবপত্র প্যাক করার বন্দোবস্ত করছে। ছোটোছেলে সারা মুখে দুষ্টুমির চিহ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালো কাছে, বললো—'আচ্ছা এইসব মূক সহায়হীনদের তোমরা রেখে যাচ্ছো কাদের দিকে চাইবে এরা, এই দেড় কোটি পাকিস্থানের বাঙালি হিন্দু ; তোমরাও যাচ্ছো সহায়হীন যাদের প্রাণ, দুর্গত যাদের চোখের মণি'।

বড়োছেলেও হাসলো—'যা, যা, এসব পরে হবে। এখন রসিকতা রেখে বাসনগুলি গুছিয়ে দে গে'।

পরদিন সকালে বড়োছেলে বললো—'আচ্ছা মা, বাবা নিজের খাটখানা রেখে যেতে বলছেন কেন? অমন সুন্দর খাট, সেকেলে মেহগ্নির জিনিস'।

'উনি বললেন, ওঁর বাবার খাট নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই'।

'তাহলে বদ্ধঘরে উঁইয়ের গহ্বরে যাবে ধীরে ধীরে'?

'কী জানি বাপু, যার জিনিস সে যদি ফেলে যায় তোর কী মাথাব্যথা'।

"মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"

'বলো না-হয় বাবাকে'।

'না রে ওঁর মনটা এমনি ভালো নয়, মুখটা থম থম করছে বলে মনে হয়'।

'কেন, পুরনোকে ছাড়বার মায়া'?

'তা যেন নয়'।

তার পরদিন দুপুরবেলায় বড়োছেলে সান্যালকে বললো—'আপনি নাকি আজ যাওয়া নিষেধ করেছেন'?

'হ্যাঁরে, দিনটা ভালো নয়'।

'বাহ্, আপনি তো বলেছিলেন, মাহেন্দ্রযোগ আছে'।

কেমন একটু হেসে সান্যাল বললেন—'তুই কী মাহেন্দ্রযোগ মানিস? কাল গেলেই হবে, বোস'।

বড়োছেলে বসলো। অনেকক্ষণ ধবে তামাক টেনে সান্যাল বললেন—'ভাগটা এ রকম হলো কেন বুঝলাম না যেন রে। শরৎবাবু যা বলেছিলেন তাও কী করা গেলো না'।

'কী করে হলো। প্রস্তাবটা যে খুব বেশি যুক্তির বলে মনে হল না লোকের কাছে'।

'তোরাও তো কোনদিন আর এসব দিকে আসবি না, তাই নয়'?

'আমরা লিখে দিয়েছি, ভারতীয় ইউনিয়নে চাকরি করবো'।

'আচ্ছা, নড়াল নাটোর এসব জমিদার, মুক্তাগাছা সুসঙ্গ এঁরাও যাবেন'?

'কে যাবেন, কে যাবেন না, বলা কী করে যাবে, তবে সবাই তো স্বাধীনতার স্বাদ চায়, সেটাই স্বাভাবিক'।

সান্যাল উঠে ঘরের কোণে যেয়ে তামাক সাজতে বললেন।

'আচ্ছা এখনই না-যেয়ে, ধর, যদি দু-একদিন পরে যদি যাই, এ যেন

—'পালানো হলো? কিন্তু থেকেই-বা তুমি কী করবে? উপকার'?

সান্যাল তামাকে ফুঁ দিতে দিতে ভাবলেন, না যেতে হবেই। এই কদর্যতার অপরিসীম এই অমানবতার গহ্বরের বাইরে। ছেলে যখন উপকার কথাটা বললো তখন সেটা ঠাট্টার মতো শোনালো যেন।

বড়োছেলে এসে দাঁড়ালো কাছে তখন সবে সকাল হয়েছে—'শুনলাম, এবেলা যাওয়া হবে না, বলেছো'।

'হ্যাঁ। বোস। তোর মাকে রান্নার যোগার করতে বলেছি। সন্ধ্যাবেলা যাবো'।

সান্যাল ছেলে আসবার আগে কী ভাবছিলেন, বললেন,—'দ্যাখ, আসলে ওরা বোকা, লোক খারাপ নয়। ওদের ব্যবহারের কথা বলছি, তা দোষ ওদের নয় সবটুকু। আমাদের মনের গর্বটা আঘাত পায়। জমিদার নই, অথচ জমিদারের প্রাপ্য সম্মান আশা করি খানিকটা, তাই অপমান বোধ হয়। সাধারণের পর্যায়ে নেমে গেছি অনেকদিন পূর্বে, ওরা সাধারণ হিসাবে ব্যবহার করে সেটা খুবই স্বাভাবিক। আর খারাপ ব্যবহার ওরা তো সকলের সাথেই সকলে করছে। আত্মাভিমানে আঘাত লাগে বলে ওদের ব্যবহারকে বিদ্বেষ বলে মনে হয়। কী ছেলেমানুষ দ্যাখো, চোখের সামনে জমিদারের পরিণতি দেখেও মহিম নতুন করে জমিদার হবার চেষ্টা করছে।

দুপুরবেলায় সান্যালকে বাসায় পাওয়া গেলো না। সান্যাল তখন গ্রামের রাস্তায় খুব ব্যস্তভাবে ঘুরছেন। বাগ্‌দীপাড়ায় এসে একজন মোড়লকে পাকড়াও করে বললেন, 'তোমরা বড়ো বেকুব। বাড়ির বেড়া পড়ে গেছে দ্যাখো না? মেয়েছেলে নিয়ে বাস করো, এত বেআব্রু কেন? বিপদ হতে কতক্ষণ? তা দরকার হলে আমার বাড়িতে যেয়েও থাকতে পারো'।

ওরা জানে সান্যাল যাচ্ছেন, মোড়ল পায়ের কাছে বসে পাওনা-প্রণামটা দিল।—'আর দেখো, মোড়লের বেটা, যদি নন্দীপুর থেকে বিষ্টুঠাকুর পাটবান নিয়ে আবার আমাদের বাড়িতে এসে ওঠে, তাড়িয়ে দিও না যেন'।

সান্যাল কেমন করে হাসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গোরুর গাড়ি দুটি স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। গাড়ি অনেকক্ষণ থামবে! ভিড় বলতে কিছুমাত্র নেই কাজেই সকলে সহজ হয়ে কথাবার্তা বলছে।

'এতদিনে বোধ হয় শাপমুক্তি হলো'—বড়োছেলে বললো।

সঙ্কোচের স্বরে সান্যাল বললেন—'কিন্তু ওরা একা থাকল রে'?

গাড়িটা হুই শব্দ করে একটা একটানা হুইসল দিয়ে ঝম ঝম শব্দ করে স্টেশনে ঢুকলো।

বড়োছেলে সান্যালের কথা শুনতে পায়নি ; বললো—'কিছু বললে'?

তারপর কুলিদের ডেকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

ইতিহাস

বস্তুত গুহগিন্নির এ রকম মনোভাব বহুদিন পরে ধরা পড়লো। বড়োছেলেটা হারিয়ে যাবার পর স্বামীর মৃত্যুতে নিশ্চয় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে-ঘটনা তাঁর বাড়ি ভরা লোকজনের কেউই নিজের চোখে দেখেনি। এমনকী মেজোছেলে পুলিনও (এখন সেই বড়োছেলে) না-ভেবে বলতে পারে না কবে তার মা এতটা বিচলিত হয়েছিলেন।

বলতে পারা যায় গুহবাড়িতে এখন যে যুগটা চলছে সেটা ও গুহগিন্নির পূর্বজীবনের যুগটা এক নয়। কথাটা অশ্রদ্ধেয় শোনালেও সত্য যে গুহগিন্নির বাড়িতেও যুগ বদলেছে বউদের হাতে-হাতে। একটি করে বেটা-বউ এসেছে আর তার সঙ্গে একটা অদৃশ্য অথচ বোধগ্রাহ্য দ্বন্দ্ব হয়েছে গুহগিন্নির। গুহগিন্নি হার মেনেছেন কিম্বা স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেই পরিত্যক্ত স্থানটুকু দখল কবে বেটা-বউবা নিজেদের যুগের মিনার স্তম্ভ প্রভৃতি তুলেছে।

বড়োছেলে পুলিনের বিয়ে দিয়ে রাঙাবরণ ছোটো একটা বউ ঘরে এনেছিলেন গুহগিন্নি। তখন পর্যন্ত পুলিনের রুমালের ভাঁজটুকু পর্যন্ত গুহগিন্নিকে নিজের হাত করে দিতে হতো। ছেলে কী ভালোবাসে, ছেলের কোন বিষয়ে অরুচি-রান্নাঘর থেকে আবম্ভ করে শোবারঘর পর্যন্ত বউকে সঙ্গে ক'বে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁব উদ্দেশ্য ছিলো ছেলের জীবনের প্রতি মুহূর্তকে স্নেহসিক্ত ক'রে রাখার গুরু দায়িত্বটা বউ বুঝুক। বউকে ডেকে বলতেন—'ঐ যে লোহার কবাটের মতো বুক দেখছো বড়ো, স্নিগ্ধ জিনিস দিয়ে এগুলি তৈরি। তুমি কি ভেবেছ বেটাছেলে ঘা খেয়ে-খেয়ে শক্ত হয়? তা হয় না। মা, বউ, মেয়ে এদের স্নেহ-ভালোবাসার এতটা পায় বলেই বেটাছেলেদের এত বড়ো বুক'। তিরস্কৃত হয়ে পুলিনের বউ পুলিনের কামিজের ইস্ত্রি, ধুতির পাড় গিলে করায় বেশি করে মন দিতো। রাত্রিতে খাবার জল ঠাণ্ডা রাখবার জন্য বরফ আনতে আর ভুল হতো না। কিন্তু পুলিনের বউ চারুশীলা জলের মতো ঠাণ্ডা মেয়ে, জলের মতোই তার নিঃশব্দ আত্মবিস্তারের ক্ষমতা ছিলো। সেটা টের পেলেন গুহগিন্নি অনেকপরে।

তখন চারুশীলা ষোলো বছরের হাল্কা গড়ন ছিপছিপে মেয়েটি আর নয়, ত্রিশ বছরের স্থিতযৌবনা মেদমতী। চোখে সোনার চশমা উঠেছে, কথার সুরে গভীরতা এসেছে। পুলিনের ছোটোছেলের জ্বর বাড়াবাড়ি করছে এ খবর পেয়ে উঠোনটা পার হয়ে পুলিনেব শোবারঘরের পাশে তার ছেলেদের শোবার ঘরে গিয়েছিলেন গুহগিন্নি, ফিরতি পথে পুলিনের ঘরে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিন কেমন থাকে এ খোঁজ করতে গিয়ে তাঁর অভ্যস্ত চোখ ঘরের দেয়াল থেকে শয্যা, জল ও পান রাখবার ছোটো টেবিল, তা থেকে চারুশীলার দেহে গিয়ে পড়লো।

—'দেয়ালের ফটোখানা কোথায়, চারু'?

—'বিবেকানন্দের ছবিটার কথা বলছেন? বোধ হয় বসবার ঘরে—'

—'ছবি নয় মা, ফটো। বাইরের ঘরে গেছে'!

নিজেই অপ্রিয় আলোচনা পাল্টে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন গুহগিন্নি, দৌড়-বারান্দার উপর দিয়ে চারুশীলা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ সুর নিচু করে বললেন—'বিকেল পার হলো এখন একটু চুলটুল বাঁধলেও তো পারো; পুলিন কি আর ঝোলানো বেণী পছন্দ করে না'?

বিব্রত হয়ে চারুশীলা অভ্যস্ত কৈফিয়তটি দিয়ে ফেললো—'এই তো এবার গা ধুয়েই—'

দৌড়-বারান্দার যেখান থেকে চারুশীলা ফিরে গেলো সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে মেজোবউ বিনতার ঘরগুলি। ছেলেদের বসবার ঘর, বিনতার ঘর, মেজোছেলে বিপিনের ঘর, তাদের বসবার ঘর, লাইব্রেরি; ঘর বেড়েই যাচ্ছে এ দিকটায় বাগানের আয়তন চুরি করে-করে; তা হোক ওরাই থাকবে।

নাতির অসুখের সংবাদে যেমন পুলিনের ঘরে যেতে হয়েছিলো, তেমনি নাতির কান্নার শব্দেই গুহগিন্নি বিপিনের মহলে ঢুকলেন। গুহগিন্নি নাতিকে কোলে করে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখলেন না অথচ গল্প শুনতে পেলেন বিপিনের, তার বউয়ের। একবার গুহগিন্নি ভাবলেন, ডেকে পাঠাবেন বিনতাকে; নাতিকে কোলে করে ভারি পর্দাটা ঠেলে তিনি ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলের সম্মুখে বিপিনের মারাঠি বন্ধু, বিপিন, তার বউ। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুহগিন্নি বললেন—'ছেলে কাঁদছে মেজোবউ, মনে করে দেখো কোনো-মা বুকে করে ছেলে মানুষ করে না-দিলে আই. সি. এস. স্বামী পাওয়া যায় না'। কথা কয়টি একটু অতিরিক্ত স্পষ্ট উচ্চারণ করে গুহগিন্নি নাতিকে কোলে করেই ঘর ছেড়ে গেলেন। বিনতা ভেবেছিলেন মারাঠি বন্ধু এমন অভব্য ব্যবহারের পর রাগ করবে। কিন্তু কিছু সে মনে করেনি, এটা বোঝাবার জন্যই যেন বিপিনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে বরং অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি বসে রইলো। বিপিন ভেবেছিলো এইবার সে ক্লাবে পালাবে, রাত অনেকটা গড়িয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। কিন্তু তাকেও বসে থাকতে হলো। বিনতা ভেবেছিলো একটু কাঁদবে, বলবে, এমন অপমান না-হলে কি তার চলছিলো না, যে বিপিন তাকে বিয়ে করেছিলো। বলবার সুযোগ সুবিধা হলো না। সারাবাড়িটা যখন রাত বারোটায় থমথম করছে নিজেকে গিয়ে শাশুড়ির ঘর থেকে ছেলে কোলে করে আনতে হলো বিনতার। ছেলে রাখবার ঝিকে ছাড়িয়ে নেপালি আয়া রাখবার কথাও ভেবেছিলো বিনতা; আভাসে জানতে পারলো ঝিকে ছাড়ানো যাবে, বাড়ি থেকে তাড়ানো যাবে না।

কিন্তু এক এক দিন এক একটা ঘটনা নিজের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়ে দিয়ে গুহগিন্নি তাঁর মহলের গভীরে ডুবে থাকেন। সেখান থেকে তিনি বহু নতুন আয়োজনের আমদানি, পুরাতন প্রথার পরিবর্জন সংবাদ জানতে পারেন। ক্ষোভ করবার মতো মেয়ে নন তিনি। বরং একটা আনন্দও বোধ হয় তাঁর কোনো-কোনো দিন, যেমন হয়েছিলো নতুন কেনা পিয়ানোর ঝংকারের সঙ্গে-সঙ্গে বিনতা শিউরে-শিউরে গান করে উঠতে। বাড়ির শুভ বউদের হাতে-হাতে—তারা যেখান যাবে শুভটাও সেখান যাবে এইটুকু শুধু প্রত্যাশা করেন তিনি।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিলো পাঁচ-সাত বছর আগে। '৪২ খৃস্টাব্দে এসে মাত্র একবারই একটা ছোটো ঘটনা ঘটেছিলো। সেটার চারদিকে সস্নেহ পরিহাস ছিলো বলে বরং সেটা সকলে উপভোগই করেছিলো, এমনকী বিনতাও হেসে বলেছিলো—'কী যে বলেন, মা'। ব্যাপারটা সূত্রপাত করেছিলো পুলিনের বড়োছেলে। নতুন টেনিস র‍্যাকেটের জন্য দুদিন বাবা-মাকে বলে ফল না-পাওয়ায় রাগ করে আছাড় দিয়ে টেনিস র‍্যাকেট ভাঙতে গিয়ে পড়বার ঘরের আলমারির দু-একটা শার্সি ও একটা টাইমপিস চূর্ণ করে ঠাকুমার ঘরে এসে তাঁর বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তাকে নিয়ে যেতে এসে পুলিনের বউ বলেছিলো—এমন করে আসকারা দিলে কী করে মানুষ হবে বলো, মা'।

—'হবে না'? বলতে যাচ্ছিলেন গুহগিন্নি, 'মার কাছ থেকে ছেলে পালিয়ে আসে কেন বলো চারু।' বলতে গিয়ে থামলেন, মেঘটার একপাশে ডুবন্ত সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠলো, একটু হেসে বললেন—'ওর দাদুর মতো যদি হয়, আমরা কী করবো; পুলিশের ডাকাতধরা চাকরি করে দিও'।

ঠিক তখন-তখনই টের না-পেলেও কিছুদিন পর থেকেই লোক আন্দাজ করেছিলো গুহগিন্নির মস্তিষ্কটা নরম হয়ে আসছে বৃদ্ধত্বের দরুন। অবশ্য দেহের দিক থেকে এ পরিবর্তনটা আগেই সূচিত হয়েছিলো। গালের দুপাশের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে যাওয়ায় কথা বলবার সময়ে একটু বেশি নড়তো চিবুকটা; চোখের উপরের পাতাটা একটু ফুলো-ফুলো, চোখের কোলেও মাংসল ছোটো-ছোটো ভাঁজ

উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ, যখন প্রয়োজন হতো, তখন শিথিলতার উপর দিয়ে তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পর্দাটাই চোখে পড়তো। বড়োছেলে পুলিন, মেজোবউ বিনতা, সরকার মাধব সেন এরা কেউ-কেউ কোনো না কোনো সময়ে সেটা অনুভব করেছে।

মস্তিষ্ক নরম হওয়ার সবচাইতে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিলো অনভ্যস্ত সংবেদনশীলতায়। আজকাল এক-এক সময়ে মনে হয় তিনি যেন সকলের মনের কথা জানবার অপেক্ষা করেন কোনো বিষয়ে নিজের হুকুম ধার্য করবার আগে। সরকার মাধব সেনের চোখে সর্বাগ্রে পড়েছিলো বিষয়টা। দু-চারজন প্রজা দুর্ভিক্ষের অজুহাতে ঝি-চাকর মারফত আর্জি পাঠিয়ে প্রায় দু বছর করে খাজনা মাপ আদায় করে নিলো। সেদিন রাত্রিতে মাধব সেন অনেক রাত অবধি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলো বিষয়টা, বললো—'কী হবে আর গুহবাড়ির সরকারি করে, আর কে সম্মান করবে বলো'। মাধব সেন ভাবলো, ঝি-চাকর যাতে আর্জি পৌঁছে না-দেয় তার ব্যবস্থা একটা করা দরকার। কিন্তু ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে গিয়ে মাধব সেনের মনে হলো—গুহগিন্নি সম্বন্ধীয় কোনো ব্যাপারে তাঁকে গোপন করে ব্যবস্থা! রাতে ফিরে এসে অনুভবটি স্ত্রীকে বললো—'ওরে এ কি গায়ের জোরে চলে, চলে শীলমোহরের ছাপে'।

বস্তুত ব্যাপারটা আজকাল দাঁড়িয়েছে তাই। কলেজদিনের মতো হাতাকাটা ব্লাউজ পরে সিনেমা যাবার প্রস্তাব করেছিলো বিনতা, মোটরের হুড মাথার উপরে রাখতেও তার অনিচ্ছা ছিলো। শুনে চারুশীলা বললো-'ভালো কী'?

বিনতা প্রবল কতগুলি যুক্তি দিলো, সেগুলিতে মোহগ্রস্ত হয়ে চারুশীলা বলেছিলো, 'যাও'। এমনকী বিপিন শুনে একটা ব্লাউজ পছন্দই করে দিলো। শাশুড়ি তার যাওয়া বা ফেরা কোনোটাই দেখতে এলেন না, তবু দেখা গেলো বিনতা পুরো-হাতার একটা ব্লাউজ পরেছে, স্বামীর হাল্কাগড়নের নতুন মডেলের পরিবর্তে পুলিনের পুরানো কালো এবং পর্দা-আঁটা বড়ো গাড়িটায় করে ফিরে এসেছে।

কথাটা প্রথমে শুনেছিলো চারুশীলা। তার খাস ঝি এসে বাসি জল ও রাতের ছাড়া কাপড় বার করে নিয়ে যেতে-যেতে বললো—'কাল সারা রাত দিদিমার ঘরে আলো জ্বলেছে—' তারপর স্বর নিচু করে বললো—'আজকাল বোধ হয় ভুলটুল হচ্ছে একটু'।

কিন্তু বাইরের ঝির চাইতে ঘরের বউ শাশুড়িকে বেশি চিনবে বলা বাহুল্য; চারুশীলার আশঙ্কা হলো, ঘর থেকে বেরিয়ে শাশুড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললে—'অসুখ করেনি তো, মা'?

খুব বেশি সর্দি হলে যেমন চোখ-মুখ ছলছল করে, এমন মুখ তুলে গুহগিন্নি বললেন—'কে, চারু? না, অসুখ করেনি বোধ হয়'।

—'রাতে ঘুম ভালো হয়নি'?

—'বোধ হয় তাই'।

তারপর বিনতা এলো।

—'চোখ-মুখ ছলছল করছে, সর্দি হয়েছে খুব'?

—'না, তেমন কিছু হয়নি'।

—'না-হলেই ভালো। আজকাল যা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে ঘরে-ঘরে'।

পুলিন এলো, বিপিন এলো পুলিন চলে যাবার আগেই। বিপিন ও পুলিন মা'র খাটের উপর বসলো জোড়া আসন করে। বিপিন পুলিনের চা, জলখাবার এলো মা'র ঘরে। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ট্রেতে দুই কর্তার খাবার কী করে নেয়া যাবে, কে নিয়ে যাবে, অনভ্যস্ত বলে সাব্যস্ত করবার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত চারু বড়োবউ হিসাবে ট্রে নিয়ে গেলো শাশুড়ির ঘরে। ট্রেটা নামিয়ে দিতে হাতটা কেঁপেছিলো চারুশীলার। বিনতা জানলার আড়াল থেকে দেখেছিলো খাটের উপর থেকেই দু-ভাই খাচ্ছেন ট্রে থেকে খাবার নিয়ে; হঠাৎ মনে হলো তার, এবার কি ওরা দু-ভাই বই গুছিয়ে পড়তে বসবে। বিনতা মনের কল্পনায় নিজে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

বাইরে মাধব সরকারের কানে খবরটা পৌঁছলো। সুমারও জমার খাতাগুলির আড়ালে অধস্তনদের কৌতূহল চাপা দিয়ে মাধব বাইরে এসে দাঁড়ালো তামাক খাবার অজুহাতে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবলো—হা-হা, বাঁচবেন না তাহলে? সময় হয়েছে বটে, তাহলেও। বস্তুত এমন বিচলিত গুহগিন্নিকে এরা কেউ দেখেনি। রাতে তাঁর ঘুম হয়নি, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো দেখাচ্ছে যেন কান্নার পরে।

বাড়ির আবহাওয়া যখন স্তম্ভিত হয়ে আসছে তখন অবশ্য গুহগিন্নি নিজেও টের পেলেন তিনি বিচলিত হয়েছেন। এরপরে তিনি লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বামুনমেয়ে নিরামিষ ঘরে রান্নার জোগাড়ে গেলো। ক্ষীরো ঝির বদলে চারুশীলা নিজেই এলো শাশুড়ির মাথায় তেল দিতে।

বেলা দশটার মুখে হাতে থান ও গামছা নিয়ে স্নানের ঘরে যাবার জন্য যখন গুহগিন্নি উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন রোদে মুখ লাল করে ঘামে চিটমিটে গা নিয়ে পুলিনের সে ডাকাত-ধরা ছেলেটা ফিরে এলো। বললো—'সব মিছে কথা, বুড়িয়া, ওরা হাসলো শুধু'।

এমন অশ্রদ্ধেয় কথাবার্তা বলার অধিকার নাতিকে যে দিয়েছেন এটা চারুশীলার সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ায় খানিকটা এবং কোনো বিষয়ে কৌতূহলের আছে তাঁর স্থৈর্য হার মেনেছে এ দুর্বলতা প্রকাশ হলো বলেও আরো খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়লেন গুহগিন্নি। একটু অপ্রতিভ হয়ে চেয়ে রইলেন।

ডাকাতে-ছেলেটি কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করে ঠাকুমার খাটে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো। গুহগিন্নি সিঁড়ি দিয়ে প্রায় উঠোন পর্যন্ত নেমে গেলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে একনজর যেন দেখলেন কেউ আসছে কিনা, তারপব আবার ফিরে এলেন নাতির সম্মুখে—'কাকে তুই জিজ্ঞাসা করলি'?

—'কেন গণেনদাকে, বুঝতে পারোনি বোধ হয় চিটাগং আরমারি রেইডে ছিলো'।

—'কী জিজ্ঞাসা করলি'?

—'আমি বললাম, বলুন তো গণেনদা, আমার দাদু অমুক গুহকে গুলি করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো কিনা আপনাদের। গণেনদা হো-হো করে হেসে উঠে বললো—'তিনি বোধ হয় অনেকদিন আগেকার লোক'। গণেনদার হাসি দেখে ওরা ভাবলো আমি মিছে দাম বাড়াতে গিয়েছিলাম'।

গুহগিন্নি বললেন—'তা তো বলবেই, তুই যাস কেন'?

—'বাহ্, যাবো না। মুখুজ্যে, রায়, চৌধুরী সকলে বোমা বানাতে পারে, রিভলবার ছুঁড়তে পারে আর গুহরা বুঝি চিরকাল বোকা হয়ে ছিলো। আমি ওদের বললাম—তোমরা বড়ো বড়ো ওস্তাদী জানতে আর আমার দাদু তোমাদের উপরের ওস্তাদী জানতেন। গণেনদা আবার হেসে বললেন—কিন্তু বোমা বানাতে জানতো না দাদু। আমি বললাম, দাদু না-হয় না-জানতেন আর কোনো গুহ হয়তো জানতো তোমার চাইতে পুরনো রিভলবারওয়ালা কাউকে পেলে জেনে নিই। মন্তি, মুখুজ্যে কিনা তাই সে বললো গণেনদাকে যে বাঘা যতীন তাদের কে যেন হতো। মন্তি একটা চালিয়াত। আমি বললাম মন্তিকে—যোগেন চাটুজ্যে আসছেন কলকাতায়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঠিকই বলতে পারবেন গুহরা ছিল কিনা তাঁদের সময়ে'।

মন্তির কাছে হার মানবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে নাতি বললো—'দেখো, তুমি-আমি খুঁজে বার করবোই। পুলিশের গোপন কাগজপত্তর সব লোককে দেখানোর জন্যে যাদুঘরে রাখা হয়েছে, সেগুলি না-হয় পড়ে ফেলবো'।

নাতি এমন উত্তেজিত হবে সেটা দোষের কিছু নয়। কাল রাত্রিতে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে নাতির সঙ্গে গল্প আরম্ভ হয়েছিলো। ডাকাতে নাতি হাত-পা ছুঁড়ে জিভ দিয়ে টাক্‌রা আঘাত করে রিভলবারের গর্জন অনুসরণ করে বাংলার অগ্নিযুগের গল্প বলছিলো, তখন তিনি অতীতকালের দু একটা কথা বলেছিলেন। তখন উঠেছিলো অমুক গুহ পুলিশের জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনারের কথা।

উত্তেজিত নাতি একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু তাঁর ঘুম হলো না, অনেকদিনের কথা মনে হয়ে চোখ জ্বালা করলো, চোখের কোণগুলি ভিজে উঠলো। সকালে উঠে কাল রাত্রির ঘটনাগুলি ও চিন্তাগুলি

একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিলো, আচ্ছন্নের মতো হয়েছিলেন তিনি; অনেকক্ষণ বুঝতেই পারেননি তাকে কেন্দ্র করে বাড়িটা কৌতূহলী ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কল দিয়ে ছলছল করে জল পড়ছে, গুহগিন্নি ভাবলেন :

১৫ খৃস্টাব্দে কিম্বা ১৬তে হবে, তখন গুহ ইউ পি-তে। কুম্ভমেলাও নয়, হরিহর ছত্রও নয়, সাধারণ একটা শহরের একটা ছোটোখাটো উৎসবের মেলায় হারিয়ে গেলো ছেলেটা। ঝকঝকে হাসিমুখে আঠারো বছরের ঠাসা-ঠাসা ভরে-ওঠা বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলেছিলো, খিচুড়িটা নামিয়ে নাও, দেখে আসি কিমা পাওয়া যায় কিনা। খোঁজা হয়েছিলো, পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের ছেলে, চোখ লাল করে সারা রাতের পরে ফিরে এসে ছোটো একটা ছেলের মতো কেঁদেছিলো ডেপুটি কমিশনার। দু-দিনের মধ্যে জেলাটার বনজঙ্গলের মধ্যে মানুষের পায়ের দাগ পড়ে গেলো, বহুদিনের ফেরার চার-পাঁচটা রাক্ষুসে ডাকাত ধরা পড়লো, ছেলে পাওয়া গেলো না।

মলিন বস্ত্রে রুক্ষ চুলে গুহজায়া দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। দেশের বাড়িতে ফিরে শোকটা কিন্তু সহজে নিবারিত হলো। ফলন্ত গাছগুলি দেখেই বোধ করি গুহজায়া নিজের মনকে বোঝালেন একটি ফল অকালে খসে গেলো বলে গাছটাই যদি শুকিয়ে ওঠে অন্য ফলগুলিও যে শুকিয়ে যাবে। সে হয়তো হিমালয়ে আছে। ভারতবর্ষে এমন কত হয়। কত লোকের ছেলে মা'র কথা মনে রাখতে পারে না, উখী মঠ স্থাপন করে তারা। তাদের জন্য শোক করতে নেই, আত্মার অধোগতি হয়।

কিন্তু তারপর গাঁয়ে এলো সেই সন্ন্যাসীর ছেলেটা।

গুহগিন্নি গায়ে জল ঢালতে গিয়ে থামলেন।

একদিন বিকেলে ডেপুটি কমিশনার বাড়ি ফিরে এসে বললেন—'গুহজায়া, একটা সন্ন্যাসীকে স্থান দেবে তোমার বাড়িতে'?

গুহজায়া (এখনকার গুহগিন্নি) হাসিমুখে কী একটা বলতে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের শুকনো মুখ দেখে বলেছিলেন—'কী ব্যাপার বলো তো'।

—'কিছু নয়', বলে ডেপুটি উঠে গিয়ে বৈঠকখানায় বসে অনেকক্ষণ তামাক টেনেছিলেন কিন্তু নিজের অন্তর যখন বুদ্ধিবৃত্তির পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে তখন স্ত্রী ছাড়া পুরুষের চলে না, কাজেই ফিরে এসে বললেন—'বউ, সন্ন্যাসী ঠিক নয়। উস্‌কোখুস্‌কো চুল—মুখে অল্প-অল্প দাড়ি, ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা কাপড়, একটি অল্পবয়সী ছেলে'।

গুহগিন্নির হৃৎপিণ্ডটা ছলকে উঠে খালি হয়ে গেল যেন, গুহগিন্নির মনে আছে তিনি কান্নাকাতর হয়ে বলেছিলেন—'কার ছেলে, কে সে, বলো'।

ডেপুটি কমিশনার বলেছিলেন—'কেমন যেন দেখতে, যেন কী-কী মিল আছে'।

টেবিলের কোণটা চেপে ধরে গুহগিন্নি সামলে নিয়েছিলেন।

—'গায়ে কতগুলি ঘা বিষিয়ে উঠেছে'।

—'বিষাক্ত ঘা, খারাপ লোকদের যা হয়, না, ও ছেলে আমার নয়'।

পুলিন কাছে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে গুহগিন্নি বললেন—'বিষাক্ত ঘা কি আমার ছেলের গায়ে হয়'?

চলে গিয়েও গুহগিন্নি আবার ফিরে এসেছিলেন, বিষাক্ত ঘা যার গায়ে সেই লোকটার কথা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

—'কোথায় আছে সন্ন্যাসী'?

—'গ্রামের পাশে, কাশের জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে ছিলো, গ্রামের কয়েকজনে একটা চালা তুলে দিয়েছে'।

—'আহা, কার-বা ছেলে। ওর মা কি কখনো ভেবেছিলো এমন বিপথে যাবে ছেলে'।

সন্ধ্যার আলো দিতে এসে গুহগিন্নি দেখলেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে গুহ একটু মদ খাচ্ছে। কাছে

সরে এসে গুহের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন গুহগিন্নি—'এত মনমরা হয়ে আছো কেন? কী ভাবছো বলো'?

—'না কই'। চুরুট ধরিয়ে গুহ উঠে দাঁড়ালেন।

—'আচ্ছা, ছেলেটার ঘাগুলি কি সত্যি বিষাক্ত'?

—'মনে হয়। গ্যাংগ্রিনের মতো বাঁ হাতটা পচতে আরম্ভ করেছে', একটু পরে বলেছিলেন, 'তুমি যাবে নাকি একবার'?

—'আমি, কেন? ও রকম করে বোলো না'। আশঙ্কায় অন্তরটা ধক্ করে উঠলো গুহগিন্নির।

পরদিন সকাল গড়িয়ে গেলো, দুপুর গড়িয়ে গেলো, বিকেলবেলায় আর থাকতে না-পেরে গুহগিন্নি স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন—'যদি সন্ন্যাসীকে কেউ দেখতে যায় নিন্দা হয় নাকি'?

মুখ থেকে কড়া চুরুট, চোখের সম্মুখ থেকে কড়া ক্রাইম নভেল সরিয়ে ডেপুটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কোথায়? ও, সে বেঁচে নেই। কাল রাত্রিব অন্ধকারে শেয়ালরা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু (বলতে গিয়ে গলাটা কাঁপলো) দুধ খেয়েছিলো বটে মায়ের। রোগশীর্ণ গায়ে কী শক্তি, একটা জানোয়ারও পাশে পড়েছিলো, কে যেন পাঁচ আঙুল দিয়ে সেটার গলার শিরাগুলি চুপসে দিয়েছে'।

—'আহা, কে সে মা গো'।

গুহগিন্নি মাথায় জল ঢালতে লাগলেন।

এর বহুদিন পরে স্বামীর পুরনো চিঠি ঘাঁটতে গিয়ে একটা চিঠি পেয়ে কেমন লেগেছিলো গুহগিন্নির। পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে সেই সন্ন্যাসীটার গ্যাংগ্রিন হওয়া হাতের মধ্যে থেকে বেরিয়েছিলো শিসের কয়েকটা টুকরো, যা রিভলবারের গুলিও হতে পারে। চিঠিটা লিখেছিলো সদবের সিভিল সার্জন। খবরটা জানিয়ে লিখেছিলো—আপনার অনুরোধে খবরটা গোপন রাখা হলো। অনাহার, গ্যাংগিন, সর্বোপরি বন্যজন্তু বলে সার্টিফিকেট দেয়া হলো। কিন্তু গোপন করতে বলছেন কেন কৌতূহল হচ্ছে, দেখা হলে আলোচনা হবে।

স্বামী বেঁচেছিলেন না তখন, কাজেই গুহগিন্নির কৌতূহল মনের মধ্যে থিতিয়ে গিয়েছিলো। হয়তো কোনো ফেরারী ডাকাত, কাজ বেড়ে উঠবার ভয়ে স্বামী গোপন করেছিলেন। কিন্তু কোন-বা সে মা, যার বুক জুড়ে মানিক হয়ে ছিলো এই ছেলে।

একবার একটা অদ্ভুত কল্পনা মনে এসেছিলো, শিউরে উঠে পুলিনের ও বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, তা কী করে হবে, তাঁর ছেলে ডাকাত হবে! মানুষ মারবে! ছি-ছি। এরপরে কয়েকদিন ধরে গুহগিন্নির মনটা করুণায় কোমল হয়ে উঠেছিলো।

হঠাৎ কী হলো কাল রাত্রিতে, এইসব পুরনো অনুভূতি মনে হতে লাগলো। স্বামীর পুরনো চিঠি বার করতে গিয়ে সিভিল সার্জনের চিঠিটাও চোখে পড়লো। হাতের গ্যাংগ্রিনের মধ্যে বেরিয়েছে রিভলবারের গুলির টুকরো আর-একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, মনে হয় দেশী মতে অশিক্ষিত হাতে চিকিৎসা করতে গিয়ে, উন্ড সারেনি, পচন ধরেছে।

না, স্বামী তাঁকে কিছুই বলেননি। ছেলে হারাবার পর কড়া চুরুট, কড়া মদ ও কড়া ক্রাইম নভেলে ডুবে থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন অত বড়ো বুকের ভেতরে হার্টটা থেমে গেলো।

খবরের কাগজে কাল রাত্রিতে গুহগিন্নি পড়ছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের কথা। বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়দের কথা পড়ে বেদনাবোধ হচ্ছিলো। খবরের কাগজে তাদের মায়েদের মনের কথা একটাও নেই। কত না নীরব জল পড়েছে তাঁদের চোখে অন্ধকার রাত্রির গোপনে।

ফোঁপানোর মতো মনে হলো : বুকের কাছে তুলে ধরে মানুষ-করা ছেলেটির দেহ যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায়...তখন? তখন মনে হলো তাঁর সেই ছেলেও হারিয়ে গেছে। ভাবতে গিয়ে হু-হু করে চোখ ছাপিয়ে এলো গভীর রাত্রির আড়ালে। মা'র মন সহজেই ছেলেদের অশুভ কল্পনা করে বসে, রাত জাগলে

আরো বেশি হয়। একবার তাঁর মনে হলো তাঁর ছেলেও কি ওদেরই একজন। বুকটা তোলপাড় করে উঠলো গুহগিন্নির, ডেপুটির বন্ধু সেই সাহেবটি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গেই প্রায় গ্রামে এসেছিলো, সঙ্গে অনেক লোক, অনেক গুলি বন্দুক নিয়ে সে কি এসেছিলো ঐ মানুষের ছেলেটিকে শিকার করতে? শিকারকে আহত ভূমিশায়ী দেখে ঝানু শিকারী যেমন বিশ্রাম নেয় তেমনি বিরাম ভোগ করছিলেন গুহবাড়ির প্রাচুর্যের মধ্যে। জানালার বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে মনে হলো—যেন সেই সন্ন্যাসীটি তাঁর ছেলে। বিপ্লবী হয়েছিলো, আহত হয়ে হয়তো সারা ভারতের তৃষ্ণার্ত গোপন পথে রাত্রির কাঁটাগুলির উপর দিয়ে গ্রামে এসেছিলো, মা'র কোলের কাছে আসবার জন্যে, মা'র হাতখানা কপালের উপর পাবার জন্য। কী অসহ্য বেদনা হয়েছিলো হাতের, কী দুঃসহ তৃষ্ণা। লোককে লুকিয়ে বেড়াতে হতো বলে হয়তো অনাহারে দিন কেটেছে। ভেবেছিলো, যে মা'র ছেলে হারিয়ে গেছে তার সদাজাগ্রত অন্বেষী দৃষ্টি কাশের জঙ্গল থেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাবে। দেখা হয়েছিলো পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের বর্ম চড়ানো বাবার সঙ্গে। হয়তো ভূমিতে শায়িত অবস্থায় ভীত পাংশুমুখে সে প্রার্থনা করেছিলো : হে ভগবান, হে দেশজননী, উনি যেন আমাকে চিনতে না পারেন। কালই আমি চলে যাবো। তারপর যখন রাত অন্ধকাব হলো তখন হয়তো মাকে পাবার লোভ বড়ো হয়ে উঠেছিলো, চলে যেতে পারেনি। হয়তো-বা অনুচ্চস্বরে কেঁদেছিল—মা, মাগো।

ঢোক গিলে চোখের জল মুছে গুহগিন্নি ভাবলেন—বহুদিন আগে ছুরি দিয়ে হাত কেটে ফেলে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কেঁদেছিলো—মা, মাগো। চাপা ছেলে চিরদিনের। হয়তো মা বকবেন এই ভয়ই হয়েছিলো তার—গ্রামে এসেও সামনে আসতে পারেনি।

কিন্তু স্নান সেরে গুহগিন্নি ঘরে ফিরে এলেন, কালকের অনিদ্রার গ্লানি অনেকটা দূর হয়েছে।

আসন পেতে পূজা করতে বসে মনে হলো—তাই কি হয়, সে হয়তো হিমালয়ের কোথায় নিজের আত্মার কথা ভাবছে। এখন কি মা'র কথা মনে পড়ে তার? অনেক বড়ো মা পেয়েছে সে।

তবু আর একবার মনে হলো—তখনকার দিনে এতটা অগ্রসর ছিলো না সমাজের অবস্থা। কেলেঙ্কারির ভয়েই কি তার স্বামী নিজের ছেলেকে বুকে তুলে নেননি, তিনিও যাননি একবার চোখের দেখা দেখতে। তাই যদি হয়ে থাকে কী তার প্রতিকার? কী করেই-বা জানা যাবে আদৌ সত্য কিনা তাঁর কল্পনা। নাম বললেই-বা কে চিনবে। বাপ-মা'র দেয়া নাম তো ওরা দলের খাতায় লেখে না। বরং পুলিনের ছেলেটার মতো হাস্যাস্পদ হতে হবে হয়তো।

বম-বম করে গাল বাজিয়ে শিবের মাথায় বেলপাতাটা দিতে-দিতে আবার তাঁর মনে হলো—সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমার কাছে এলে না, আমার চোখের জল পড়ছে, সে জলে যেন তোমার অমঙ্গল না হয়।

চারুশীলা নিজে ভাত নিয়ে এলো। বিনতার হাতে জলের গেলাস, আসন।

হাসিমুখে গুহগিন্নি বললেন—'কী বাড়াবাড়ি করো চারু, কী শুরু করলে বিনতা'।

খুশিও হলেন গুহগিন্নি।

গারদ

আমাকে একদা এক পাগলের সঙ্গে কাটাতে হয়েছিলো, একঘরে, এক বিছানায়, এক মশারি অবলম্বন করে। সেই গল্পটা বলি।

সদ্য ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছি কলেজ থেকে। বাড়ি থেকে দূর এক শহরে প্রাকটিশের অর্থমূল্য যাচাই করতে গিয়েছিলাম। আলাপী লোক পেলে সুবিধা হবে কাজের এজন্য বাবা কয়েকজনের নামে পত্রাদি দিয়েছিলেন। একদিন সকালে তাঁদেরই একজনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

শহরের একান্তে দোতলা বাড়ি, একটু পুরনো কিন্তু মধ্যবিত্তদের থাকার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়।

খুব সহজেই চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভালো খাওয়া থাকার চিহ্ন শরীরে, একটু ভুঁড়ি, মাথার উপরে একটা ছোটো টাক। নাক মুখ ইত্যাদিতে বৈশিষ্ট্য, চোখে গম্ভীর রঙের চশমা। মার্জিত সৌজন্য ও বিনয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন। কয়েকজন লোক ছিলো, তারা চলে গেলে পরিচয় দিলাম।

চন্দ্রবাবু উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন—'আরে, বলো কী! তাই কিনা পরের মতো দূরে-দূরে বসে আছি। তোমার বাবা আমার চাইতে বড়ো ছিলেন বয়েসে। কিন্তু শোয়া-বসা-খেলাধূলা সেই ন্যাংটা বয়স থেকে একসঙ্গেই হয়েছে। কবে এসেছো? বিছানাপত্তর কোথায়? কোথায় উঠলে তবে'?

সংক্ষেপে আমার এ শহরে আসার কারণাদি বললাম।

'এটা তুমি অন্যায়ই করেছ বীরেন। ছি-ছি। আর দাদার কি উচিত ছিল না আমাকে প্রথমেই জানানো'।

চা ইত্যাদির পর আরো একটু গল্পগুজব করে বেলার দিকে ইঙ্গিত করে উঠবার অনুমতি চাইলাম। চন্দ্রবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। এসেছে যখন একটা দিনও না-থেকে যাবে! আমি ভেতরে খবর দিয়েছি। পদ্মা বোধ হয়, এখনো লাইব্রেরি থেকে নামেনি, নতুবা লুফে নিয়ে যেতো এতক্ষণ। আমি বরং কাজটা সেরে আসি চট করে। চলে যেয়ো না যেন'।

চন্দ্রবাবুর ছোটোভাইয়ের সঙ্গে তারপরে আলাপ হলো। চন্দ্রবাবুর চেহারায় খানিকটা অভিজাত-ব্যবধানের ছাপ আছে, সূর্যবাবুর তাও নেই। মন ও দেহ সমান সাদাসিদে, সরলতা দিয়ে তৈরি। গায়ের ফতুয়াটা আধময়লা, পরনের কাপড়ও তাই। অন্য কেউ হলে বসবার ঘরে এ পোশাকে আসতে সঙ্কুচিত হতো।

এটায়-ওটায় আলাপের জড়তা ভাঙলে সাহিত্যের কথা উঠলো। একসময়ে সূর্যবাবু বললেন, 'সাহিত্য তাহলে তোমার ভালোই লাগে'।

—'ও ছাড়া বাঙালির আর কী-ই-বা আছে'।

—'তোমার ভালো লাগার যুক্তিও আছে। আজকাল সাহিত্যটা ডাক্তারদের হাতেই গেছে। এই তো সেদিন রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার হলেন, পদ্মা বলে শরৎবাবু না কে একজন ডাক্তার আছেন'।

রহস্যটা একটু স্থূল। সেকালের লোকেরা অবশ্য স্থূল রসিকতাই করে থাকেন। আমিও বললাম—'বনফুল ডাক্তারও ভালোই লিখছেন আজকাল'।

—'তাই নাকি'। সূর্যবাবু হাসলেন। 'সকলেরই দেখছি ডাক্তার হওয়া উচিত'।

আমাদের আলাপের মাঝখান সদু নামে একটি মেয়ে এসে ডাকলো আমাকে। সূর্যবাবু বললে—'যাও ভেতরে, লজ্জা কী। বাড়িরই ছেলে তুমি। পদ্মার সঙ্গে আলাপ করগে। খুব ভালো মেয়ে। খুব ভালো লাগবে তোমার'।

দোতালার একটা ঘরে পৌছে চেয়ার টেনে দিয়ে সদু বলল—'বসুন, আমি পদ্মাকে খবর দি'। এদের সঙ্গে যখন সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে বারবার একজনের মুখে অপরের সঙ্গে পরিচিত না-হয়ে সদুকে ধরে বরং জেনে-শুনে নেয়া ভালো। বললাম—'তুমি বোসো, আসবেখন পদ্মা। ততক্ষণ তোমার সঙ্গে আলাপ করে নিই'।

সদুর বয়স হয়েছে, সদ্য ষোলো পার হওয়াদের মতো লজ্জিত মুখে সে বলল—'আমি কী আলাপ করবো আপনার সঙ্গে, একদম লেখাপড়া জানি না'।

—'আমি বুঝি তোমার মাস্টারমশাই, আলাপ মানে বুঝি পড়াব কথা? আচ্ছা বলো দেখি তুমি ছাড়া তোমাদেব বাড়িতে আর কে-কে আছে'?

প্রশ্নটায় বোধ হয় সদুকে খুব ছেলেমানুষ কল্পনা করা হয়েছিলো, সে হাসতে-হাসতে বলল, 'জেঠামশাই আছেন, বাবা আছেন, জেঠিমা, জগা, টুবলু'।

—'চন্দ্রবাবু তোমার জেঠামশাই? তাহলে সূর্যবাবু? তোমার বাবা, ঠিকই ধরেছিলাম। বলো দেখি এবার লক্ষ্মীমেয়ে, জগা আর টুবলু কে'?

—'জেঠামশাইয়ের ছেলে'।

'ঠিকই ধরেছিলাম। একজনের নাম বলেছো, পরিচয় দাওনি এখনো। পদ্মা বুঝি তোমাদের ছোট্ট বোন, খুব ছোটো, আর খুব মিষ্টি একজন, না? তোমরা সবাই খুব ভালোবাসো যাকে'?

—'না, পদ্মা আমাদের পিসিমা। আমার চাইতে অনেক বড়ো, জেঠিমাদের মতো'।

—'তবে পদ্মা বলছে কেন'?

—'তাই শিখিয়েছে বলতে'।

সদুর জড়তা কাটলে দেখা গেলো বেশ আলাপী মেয়ে। গড়গড় কবে অনেক কথা বলতে পারে না, যেমনটা হলে শিষ্ট বলা যায় তেমনি।

কিছুক্ষণ পরে সদু বললে—'আপনি বসুন, পদ্মাকে ডেকে আনি আমি'।

পদ্মাবতী-যাকে এরা সংক্ষেপে পদ্মা ও পদ্ম-বলে তার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিলো না আমার, তবু বলা যায় সে আমার কল্পনার সঙ্গে মিললো না। প্রথম দৃষ্টিতে ঝলমল করে ওঠার মতো সৌন্দর্য। পদ্মাবতী ঘরে এসে হাত তুলে নমস্কার করে বললো—'অনেকক্ষণ একা বসে আছেন তো'?

—'না, সদু ছিলো'।

—'দাদার ঐ স্বভাব। আত্মীয়জনকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দেন, তখন হয়তো আমরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকি, কষ্ট হয় তাদের। আপনারও হয়েছে'।

—'না-না'।

আর দু-একটা কথার পর পদ্মাবতী বললো—'দাদার বোধ হয় একটু দেরি হবে আসতে, তার চাইতে চলুন লাইব্রেরিতে গিয়ে বসি। যাবেন'?

এদের বাড়ির লাইব্রেরি ঘরটা খুব বড়ো নয়, তাহলেও সাধারণত লাইব্রেরি বলতে মধ্যবিত্তদের বাড়িতে যে-রকমটা হিজিবিজি বইয়ের আলমারি আর বসবার চেয়ার ছড়ানো ঘর একটা কল্পনা করা যায় তার চাইতে ভালো। ঘরের একদিকের দেয়ালে কয়েকখানি তেলরঙের প্রতিকৃতি। আর-একদিকের

দেয়ালের গায়ে খাড়া করা একটা অর্ধ-প্রত্নতাত্ত্বিক দেবীমূর্তি।

—'আজকের কাগজ পড়েছেন'?

—'কেন বলুন তো? খবর আছে'?

—'না, যদি পড়তে ইচ্ছা হয়ে থাকে। এনে দেবো'?—পদ্মাবতী উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্কুচিত হয়ে বললাম—'আপনারা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—যেন। আসলে কিন্তু আমি ততটা উঁচুদরের কিছু নয়'।

—'নিকটজন! এর চাইতে উঁচু আর কী হতে পারে'। পদ্মাবতী হাসলো মিষ্টি করে।

—'নিকটজন! এতদিন তো কোনো খোঁজই নিইনি আপনাদের, কাউকেই চিনতাম না'।

—'না-চেনাকে দোষ দেয়া যায় না। দাদার যা মনে আছে, আমার ততটুকু মনে পড়ে না। অথচ সম্বন্ধটা এতটুকু দূরের নয়। বুড়োরা গেলে বোধহয় ভাইও ভাইকে চিনবে না'।

—'আজকাল সে-রকমটাই হয়েছে, আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থায় সব ছড়িয়ে পড়েছে'।

সদু যা বলেছিলো পদ্মাবতীব বয়স সম্বন্ধে সেটা ঠিক নয়; তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ পার হয়েছে তা বোঝা যায় রূপের স্থৈর্য দেখে, কিন্তু পার হয়ে কতদূর গেছে ধরা যায় না। দরকারমাত্র সে ঝকঝকে হাসি হাসতে পারে কিন্তু চঞ্চল-রঙের শাড়িটিকে সম্বৃত করে বসবার ভঙ্গিতে সবটাই গাম্ভীর্য।

বললাম—'লাইব্রেরিটা ভালো'।

খিলখিল করে হেসে পদ্মাবতী বলল—'না-দেখেই বলছেন'।

—'দু'একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকার দেখছি'। আঙুল দিয়ে বইগুলি দেখিয়ে দিলাম।

—'ওগুলি পাওয়া একটু কষ্টকর বটে'।

—'আপনি বোধ হয় খুব পড়াশোনা করেছেন, সূর্যবাবু বলছিলেন'।

—'ছোড়দার ঐ রকম। কী যে মনে করে আমাকে ঠিক নেই'।

—'আমারও খুব সাধ ছিল পড়ার, হলো না'।

—'কম হলো কী? শুনলাম ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন এবার'।

'সে-রকম নয়'।

—'ও, বুঝেছি। কিন্তু সেটা কি বেটাছেলের জীবনে হয়, অত অবসর কোথায়? এমন ফাঁকা দিনরাত তারা কোথায় পাবে'!

এসব ব্যাপার চট করে ঠাহর হয় না আমার, এতক্ষণে দেখলাম পদ্মার কপালে মাথার কোথাও সিঁদুর নেই। হয়তো ভুল, তবু ধারণা হলো অবসর যাদের একান্ত ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে তাদের মতো খিন্নতার সুর ছিলো পদ্মাবতীর এইমাত্র বলা কথাগুলিতে। অথচ খুবই সুখী হবার উপাদান ছিলো তার গঠনে। কিন্তু পদ্মা বললো—'অবশ্য শুধু অবকাশ মানেই লাইব্রেরি নয়, ওটা আমার একটা রোগ। ভালো লাগার ব্যাপার বোধ হয়'।

এমন সময়ে দরজার পাশে কার পায়ের শব্দ হলো। পদ্মাবতী মুখ তুলে বলল—'ছোড়দা নাকি, কাকে খুঁজছো'?

পদ্মার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, দরজার কাছে সূর্যবাবু দাঁড়িয়ে।

সূর্যবাবু বললেন—'বীরেন কি চলে গেছে'?

—'না, এই তো আছি এখানে'।

—'আচ্ছা, বোসো, বোসো'।

—'আসুন না'।

—'না, থাক এখন, পরে হবে খন'। সূর্যবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন।

পদ্মাবতী বললো—'আলাপ হয়েছে ছোড়দার সঙ্গে? কী রকম লাগলো আপনার'?

—'ভালো লেগেছে'।

—'আমাদের ভাইবোন তিনজনের মধ্যে ও-ই সবচাইতে ভালো লোক। সাতে-পাঁচে নেই, একটেরে পড়ে থাকা মানুষ। আমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু বলতেন, যমজ সন্তানের মধ্যে একটি সবল হলে অপরটির যা হয় তাই হয়েছে ছোড়দার। দাদা যেন নিজের জায়গা করে নিতে গিয়ে ওকে চেপে ছোটো করে দিয়েছেন'।

দ্বিপ্রহরের আহারটি গুরুতর হয়েছিলো। লাইব্রেরির খোলা জানালার পাশে বই হাতে আরাম-কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙবার পরও অলসভাবে শুয়েছিলাম। বোধহয় পদ্মার কথা ভাবছিলাম। মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিলো। নিঃসঙ্কোচ আলাপ করার শক্তিটি মেয়েদের মধ্যে এখনো দুষ্প্রাপ্য, নেহাত যদি চোখে পড়ে তবে সে-আলাপ, দেখেছি, হয় প্রগলভতা কিংবা অতিবিক্ত বাকচাতুর্যে সহজ ভাবটা হারিয়ে আড়ষ্টতার বিকৃতরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্মা এদিক দিয়ে খুঁজে পাওয়াব মতো অনন্যা।

কিন্তু এই ভালো লাগার বোধটার মূলে শুধু সে-ই নয় , এদেব আর সকলেরই হৃদ্যতাও ছিলো। এদেব এ ব্যাপারটা এমন নিখাদ যে চিনে নিতে দেরি হয় না। নিখাদ বস্তুমাত্রই সহজ হয়, অনাড়ম্বব হয়।

চোখ মেলে দেখলাম বেলা পড়ে এসেছে। লজ্জিত হয়ে উঠলাম, এতক্ষণ যাবাব প্রস্তাব তোলা উচিত ছিলো। হৃদ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ নেয়া একই ব্যাপার।

ঘব থেকে বেবিয়ে দু'পা নামতে দেখা হলো বাড়ির চাকবের সঙ্গে; দেখি, আমার জুতোজোড়া খুব মন দিয়ে পরিষ্কার করছে। বললাম—'আর করতে হবে না, হয়েছে দাও। তোমাদের বড়োবাবু কোথায়'?

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হলো বৈঠকখানায়। একরাশ কাগজপত্তরে ডুবে ছিলেন। আমি যেতে মুখ তুলে চাইলেন—'এসো, ঘুমিয়ে পড়েছিলে শুনে ডাকিনি'।

কয়েকটা কাগজে সই করে চন্দ্রবাবু বললেন—'গরমে কষ্ট হয়নি তো? এদিকে আবার ইলেক্‌ট্রিকের কোনো ব্যবস্থা নেই'।

—'না, কষ্ট আর কী? আমি তবু তো ঘুমোচ্ছিলাম, আপনি তো তার মধ্যেই কাজ করছেন'।

চন্দ্রবাবু হাসলেন—'কাজ না করলে খেতে দেবে কে, বাবা? একটু অন্যমনস্ক হয়ে বিশ্রাম কবতে গেলে কি আর কিছু থাকে। বাপ-মা-মরা ছোটো ভাইবোন দুটিকে নিয়ে সেই যে সাগরে ভেসেছিলাম এখনো কূল পেলাম না'। চন্দ্রবাবু আর-কতগুলি কাগজে ঘসঘস কবে এক-আধ লাইন লিখে-লিখে কখনো-বা সই করে সরিয়ে রাখলেন। 'এ ক'খানা হলেই হয়, কথা বলি তোমার সঙ্গে'।

এত কাছে বসে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে কাউকে কোনোদিন দেখিনি। আমাদের দেখার পেছনে প্রায়ই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে। দৃষ্ট ব্যক্তিটির স্বরূপ সবসময়ে বুঝতে পারি না সে জন্য চন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার কিন্তু মনে হলো লোকটির আপাতদৃশ্য সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গিতে কী একটা সূচিত হচ্ছে। ক্লান্তি? অসম্ভব নয়। একটু আগেই উনি সংসারের কূল না পাওয়ার কথা বলছিলেন। হয়তো তাই। অল্পবয়সে সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে কাঁধে ভার তুলে নিয়ে নিজের দিকে তাকাননি। নিজের মনকে অনুভবকে গোপন করে চলতে হয়েছে, হাসিমুখে চলছেন এখনো, তবু এমনি অসতর্ক সময়ে হয়তো গোপন করে রাখা ক্লান্তিটা প্রকাশ পায়।

কিন্তু এসব ভাবলে তো চলবে না। সঙ্কোচ কাটিয়ে বললাম—'এখন আমি যাবো ভাবছি। রোদ পড়ে গেছে, যেতে কোনো কষ্ট হবে না'।

কথা শুনে চন্দ্রবাবু সকালবেলার মতোই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। পরে বললেন—'বলো কী, আমি তো ভেবেছি দু'একদিন অন্তত তুমি থেকে যাবে। কাজের ক্ষতি হবে কিছু, থাকলে'?

মিছে কথাটা চট করে মুখে এলো না।

চন্দ্রবাবু চোখ থেকে চশমা সরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'অসুবিধা হচ্ছে কি কিছু'? তাঁর কুণ্ঠিতস্বরে বিড়ম্বিত বোধ করলাম। এরপরে আর কী-বা বলা যায়। একটা চব্বিশ ঘণ্টার দিন এদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলে যদি এত আনন্দ হয় এদের আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি থেকে গেলে চন্দ্রবাবু আনন্দিত হবেন। মানুষের কাছে তার বাল্যের স্মৃতির চাইতে মধুর কী আছে, আমি তাঁর বাল্যের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত : ঠিক আমি না হলেও আমাদের পরিবার বটে।

চন্দ্রবাবু চেয়ারটাকে আমাব দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—'আমি একটা কথা ভাবছি বীরেন, তুমি আসবার পর থেকে। আমাদের দুটো পুরনো পরিবারের বাঁধনটা যেন একটু ঢিলে হয়ে গেছে, একটু নতুন করে বাঁধলে হয় না? তোমার মেজদা শুনেছি মুন্সেফ হয়েছে এদিকে কোথায়'?

—'এ তো খুব ভালো কথা, বাবাকে বলবো'।

চন্দ্রবাবু হাসলেন—'ভালো পাত্রী খুঁজে পাই তবে তো, দেখি তোমার কাকিমার সঙ্গে শলা করে'।

চন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে কাগজ টেনে নিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

বৈকালটা কাটলো নিছক আনন্দে। সদু খোঁজ নিতে এসে বললো—'বিকেলে স্নানের অভ্যাস আছে'?

—'অভ্যাস নেই, ইচ্ছা আছে'।

—'বিকেলের চায়ের আগে, না সন্ধ্যায়? ঘরে-না পুকুরে'?

—'তুমি যা ভালো বলো, যদি বিকেলের চা-টা শুধু সন্ধ্যায় নিয়ে যেতে'।

সদু হাসলো—'তাহলে পুকুরে করুন'।

টুবলু এসে নিয়ে গিয়েছিলো। দিনটায় গুমোট ছিলো, পুকুরের জলও ভালো। টুবলুরা ভালো সাঁতার দেয়। দলে মিশে হৈ-হৈ করা গেলো জলে।

জল ছেড়ে উঠতে পদ্মার সঙ্গে দেখা। সে কখন জলে নেমেছিলো টের পাইনি। পদ্মার আর-একটা পরিচয় পেলাম। তার মুখ তবু বয়সেব শাসন মেনেছে, দেহ নয়। তাতে লাবণ্য আছে, বন্যা আছে। সিক্ত বাসের কুহক নয় মাত্র। অবশ্য আর-একটুক্ষণ জলে গা ডুবিয়ে থাকলে আমি একথার উল্লেখ করতে পারতাম না।

বাগানে চা দেয়া হয়েছিলো। ঝিরঝির হাওয়ায় একটা শিশুবটের তলায় কয়েকটি বেতের চেয়ার দুখানা বেতের টেবিল ঘিরে। বাড়ির সবাই নয়—চন্দ্র, সূর্য, পদ্মা আর আমি। প্রথম টেবিলে আমি আর চন্দ্রবাবু, পদ্মার টেবিলে সে আর সূর্য। এটা-ওটা চলছিলো। কথাটা বলছিলাম আমরাই বেশি, সূর্য ও পদ্মা শুনছিলো।

একসময়ে সূর্যবাবু বললেন, বোধ হয় আমার উপস্থিতি মনে ছিলো না, বললেন—'আমার সে-কাজটা কিন্তু হলো না'।

—'কোনটে, সেই গ্রীনহাউস তৈরির? সে কি আর এ ভাঙাবাড়ির পাশে মানায়'?

—'তা নয়', একটু ইতস্তত করে সূর্যবাবু বললেন—'সেই যন্ত্রটা দেখে এসেছিলাম'।

—'টাইপরাইটার'?

—'হ্যাঁ, বলো কবে দেবে'?

—'ভেবে দেখি'।

সূর্য যে কোনো একটি শিশুর মতোই বললেন—'অনেকদিন থেকেই ভাবছো'।

চন্দ্রবাবু সস্নেহ হাসির অভিনয় করে বললেন—'ভাবতে সময় লাগছে'।

দুজনের কথাই তাঁদের বয়সের সঙ্গে মানায় না। দু'ভাইয়ে এরকম আলাপ হওয়া অসম্ভব নয় তবে সেটা লাটিম-প্রিয়তার বয়সে হতে পারে।

সূর্যবাবু খুবই উদ্বিগ্ন বিষযটিতে, মনে হলো। পদ্মাব টেবিল থেকে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চন্দ্রকে স্পর্শ কবে বললেন—'অনেক ভেবেছো, এবার আব শুনছি না'।

—'আঃ। থাম, সূর্য'।

সূর্যবাবু এবার থামলেন। চন্দ্রবাবুর স্বরে প্রভুত্ব ছিলো। কথাটা বলে কিন্তু চন্দ্রবাবু লজ্জিত হলেন। কুণ্ঠিত আমিও কম হইনি। একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অপবের কাছে ছেলেমানুষি করাব জন্য কড়া কথা শুনতে হলে আসর ফেঁসে যায়।

আলাপকে অন্য খাতে নেবাব জন্য আমি বললাম—'সূর্যকাকা আমাকে কী বলবেন বলেছিলেন'।

সূর্যবাবু মুখ নিচু করে চা খাচ্ছিলেন, কথাটা কানে যেতে মুখ তুললেন, হাসি হাসি মুখে বললেন—'তোমার মনে আছে? বলবো বৈকি'।

এ যেন অন্য মানুষ। আমাব প্রচেষ্টা সূর্যবাবুব উপবে অপ্রত্যাশিত কাজ করলেও, আসরটা আড়ষ্ট হয়েই বইলো। চন্দ্রবাবু অবশ্য হাতেব সিগাবেটটা শেষ কবেই উঠলেন, তবু মনে হলো যেন বিশ্রী ব্যাপাবটাব জন্যই তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হলো।

আমি আবার বললাম—'বলুন না, এখন তো আমাদের কোনো কাজ নেই'।

সূর্যবাবু চন্দ্রবাবুব অপসৃযমান চেহাবাটা দেখছিলেন, একটা যেন উদ্যত নিঃশ্বাস চাপলেন, তাবপরে বললেন—কী বলছিলে? সেই কথা, নয? আব 'একটু সন্ধ্যা হোক, বলব'।

অতঃপব সূর্যবাবুও চলে গেলেন, বাগানে বইলাম আমি ও পদ্মা। সকাল থেকে যে সহজ আনন্দেব সাবলীলতায় আমাদেব আলাপ চলছিলো তার মধ্যে সূর্যবাবুদের এই ব্যাপারটা কাদার মতো এসে পড়েছে। এ বুঝতে পদ্মাব বাকি ছিলো না, বললো সে—'খাবাপই হয়েছে ব্যাপারটা, বীরেনবাবু, আমি ওদেব হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি'।

আমি প্রতিবাদসূচক কিছু বলাব আগে সে আবাব বললো—'ভেবেছিলাম এটা প্রকাশ পাবে না, কিন্তু বলতে হলো। ছোডদা একটু বাতিকগ্রস্ত। অবশ্য দাদাব ওটা উচিত হতো না, যদি না প্রযোজনেব হতো। দাদা ওবকম সুবে কথা না বললে, ব্যাপাবটা আরো গড়াতো'।

সংবাদটা সহজে আদান প্রদান কবার মতো নয। পদ্মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম— 'ওতে আব বিমর্ষ হবাব কী আছে, অমন বাতিক কতজনের কত থাকে'।

পদ্মা যাকে মার্জিত ভাষায বলেছিলো বাতিক, আসলে সেটা পাগলামি। পদ্মাব অতটা কুণ্ঠিত হবাব কাবণও তাই। সেটা বুঝলাম সন্ধ্যার পবে।

সন্ধ্যাব অন্ধকাব গাঢ় হলে সূর্যবাবু প্রায় ধবে নিয়ে যাবার মতো কবে নিযে গেলেন নিজেব ঘরে। বাড়ির অন্যসব ঘরের মতোই একখানা ঘব। ঝাঁটপাট হয না, ধুলিমলিন, মালিন্যগন্ধি। শোনা গেছে সহসা প্রকাশিত অসামঞ্জস্য হাস্যরসেব মূলে আছে। এবং হাস্যরসটা মানুষের এত প্রিয় যে সংবেদনশীলতাকে সে নিমজ্জিত করে দেয়। সূর্যবাবুর ব্যাপাবে দুঃখ হতো যদি আমার, হযতো নিজেকে সংবেদনশীল বলে প্রশংসা করতে পারতাম, কিন্তু প্রশংসার লোভেও হাসি সম্বরণ করতে পারিনি।

আমাকে ঘরে বসিয়ে সূর্যবাবু একটার পর একটা মোটা খাতা খুলে কবিতা শোনাতে লাগলেন। খাতাব শেষ নেই, কাজেই খাতার পাতা ও কবিতার সংখ্যা অসীম বললেও চলে। শুধু কবিতা পড়া নয়, মাঝে-মাঝে স্বকীয় মতামতও জানাচ্ছিলেন তিনি। সূর্যবাবুর ধারণা ঐ কবিতাগুলিই প্রমাণ করছে তিনি বড়ো কবি। ববীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, সে তো দেশের গৌববেব ব্যাপারই কিন্তু একবার গৌরব লাভই কি একটি দেশের পক্ষে যথেষ্ট আবার কি চেষ্টা করা উচিত নয়। আমি বললাম—'ও তো আর চেষ্টার ব্যাপার নয। ভারতবর্ষের সব কটি কবি একত্র বসে একটা কবিতা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ হয় না'।

সূর্যবাবু হাসলেন। দুষ্টুমিতে চোখ পিটপিট করে উঠলো, বললেন—'তা নয় বীরেন, তা নয়। আমার কবিতাগুলি শুধু ছাপিয়ে দাও। তোমরা তো ডাক্তার, তোমাদের সাহিত্যবোধ আছে'।

পাগলামি দেখে হাসা আর পাগলামির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলা এক নয়। আমি খুঁজছিলাম কোন কথায় সূর্যবাবুকে নিরস্ত করে ছুটি নেয়া যায়। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার এই, যে-কোনো কথা থেকেই সূর্যবাবু নিজের কথায় ফিরে যেতে পারেন দেখা গেলো। আমার বক্তব্যের সঙ্গে সেটার আদৌ সম্পর্ক আছে কিনা সেটা যেন বিবেচনার বিষয়ই নয়।

আমি যদি বলি—'পদ্মাকে অনেকক্ষণ দেখছি না—'

সূর্যবাবু বলেন—'তাকে দিয়ে আর কী হবে বলো। সে তো অনুবাদ করে দিতে পারবে না, আর অনুবাদেই-বা কী হবে? দরকার নেই'।

আমি বললাম—'মিছে নয় কথাটা। কবিতা লিখবার জন্য কবিতা লেখা, মানের জন্য নয়। দেশের লোকরা না চিনলেই বা ক্ষতি কী'?

সূর্যবাবু বলেন—'অনুবাদে কি আর রস থাকে? আমি তো অন্য এক কায়দা করবো ভেবেছি। ইংরেজি অক্ষরে বাংলা কবিতা ছাপবো।'

'সেটা ইংরেজদের কাছে আরো কঠিন হয়ে উঠবে না? ওদের কষ্ট হবে। টি ও এম এ আর 'তোমার' কথাটা ডিক্‌শেনারিতে খুঁজে না পেলে চটেও যেতে পারে। ইংরেজদের চটানো ভালো নয়'।

সূর্যবাবু একটু ভেবে বললেন—'না-না, তা কেন হবে। তার পরের লাইনে এ এম এ আর থাকলেই কানে মিষ্টি লেগে যাবে'।

—'তা যায় বটে। ওরা আবার মিষ্টিটা পছন্দ করে না কিনা তেমন'।

সূর্যবাবু ভাবলেন খানিকটা সময়। তারপরে হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে বললেন—'ওহো, তোমাকে সে কবিতাটা শোনানো হয়নি। রসগোল্লা সম্বন্ধে আমার একটা ভালো কবিতা আছে'।

হা ভগবান!

ভগবানের সাড়া পেলাম। চাকর এসে বলল—'লাইব্রেরিতে দিদি ডাকছেন আপনাকে'। সূর্যবাবুকে বললাম—'এখন উঠলে হয় না'?

—'এখনি? দরকার আছে কিছু'?

—'না, তেমন নয়, পদ্মা বোধ হয় ডাকছেন'।

—'ও পদ্মা? তাহলে তো যাওয়াই উচিত। যাও'।

উঠতে পেরে বাঁচলাম। দেখলাম সূর্যবাবু খাতাগুলি ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে রাখছেন।

লাইব্রেরিতে খোলা জানালার কাছে পাশাপাশি দুখানা আরামকেদারা। পদ্মা হেসে বলল—'আসুন, ছোড়দা আটকেছিলো'?

পদ্মার হাসিতে ক্ষমা চাইবার কুণ্ঠাও ছিলো। হ্যাঁ-না করে আসন গ্রহণ করলাম।

—'এখন বোধ হয় আমার, ছোড়দার মাথাটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আপনি তো ডাক্তার, কী মনে হয় আপনার, সারানো যায় না চিকিৎসা করলে?'

—'ঠিক বলা যায় না, পরীক্ষা করানো দরকার'।

পদ্মা আমাকে অনুরোধ করলো আত্মীয়তার সহানুভূতি নিয়ে একবার পরীক্ষা করতে। কিন্তু এ ব্যাধির কার্যকারী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই ছিলো না, বললাম তাই। বললাম—'আমরা জানি ওষুধ ব্যবস্থা আর শল্যবিদ্যা। কেন যে মনটা ঠিক আগের মতো কাজ করে না, এটা মৃতদেহ দ্বিখণ্ডিত করেও বোঝা যায় না, কাজেই এর চিকিৎসা আমাদের নাগালের বাইরে থেকে গেছে'।

দেখলাম পদ্মা তার ছোড়দার বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছে, পড়াশুনাও কম করেনি।

বললে সে—'সেদিন একটা ইংরেজি জর্নালে পড়ছিলাম কিনা তাই মনে হলো এসব কথা'।

পদ্মা সেই পরীক্ষামূলক থিয়োরিটির কথা বলছিলো। প্রাচ্যদেশে কয়েকজন শারীরতত্ত্ববিদ বলছেন,

মস্তিষ্ক পদার্থটির বিভিন্ন অংশ আমাদের বিভিন্ন ধী ও চিন্তাব ক্ষেত্র। মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশ ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে ওরা নাকি প্রতিপন্ন করেছেন, মানুষের বিশেষ একটা বৃত্তি বা প্রবৃত্তির হানি ঘটানো যায়। এমনি করে গায়ককে অগায়ক করা যায়, বৈজ্ঞানিককে অবৈজ্ঞানিক করা যায়। তা যদি যায়, মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশকে সতেজ কবে তুলবার কৌশলও ওরা হয়তো আবিষ্কার করেছে। যে অংশের শৈথিল্যের জন্য পদ্মার ছোড়দার এই ব্যাতিকগ্রস্ততা সেটাকে সতেজ করতে পারলে হয়তো আবার সে স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষাটা এখনো গিনিপিগেব স্তর পার হয়নি। মস্তিষ্কের কোন অংশের কাব্যে অধিকার, কোনটির-বা গণিতে এ যদি নির্ধারিত হযেও থাকে, সে অংশগুলি বিকৃত হলে শল্যবিদ্যায় কিছু করতে পারে এমন শোনা যাযনি। বললাম তাই।

পদ্মা কিছুক্ষণ ভেবে বললো—'অবশ্য ছোড়দাব পাগলামি বীভৎস নয়, ক্ষতিকারকও নয়। তাহলেও বড়ো কষ্টের ব্যাপার। ভাবুন ঐ মেয়েটির কথা, কী রকম লাগে ওর'।

সদুর কথা মনে হতে আমারও কষ্ট হলো।

একসময়ে বললাম—'এ রকমটা কতদিন হয়েছে'?

'ছোটোবেলায় লিখতেন-টিকতেন কিন্তু নিজেকে অনন্যসাধারণ কবি ভাবা এটা কয়েক বছর হলো হয়েছে'।

—'কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিলো কঠিন'?

—'না, কোনো কারণই পাওযা যায় না। যদি না শোকটাকে মানে ওর স্ত্রীর শোকটাকে না বলি'।

—'সদুব মায়ের মৃত্যু'?

—'হ্যাঁ। বিশ্বাস কবতে প্রবৃত্তি হয় না, শুধু দুবছরে মানুষ মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে'।

—'একটু অসাধারণ বৈকি, কিন্তু অসম্ভব নয়'।

খানিকটা চুপ করে থেকে পদ্মা আবার বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার বিশ্বাস আছে মনোবিকলনে'।

—'অবিশ্বাস কববাব মতো জ্ঞান নেই, কাজেই বিশ্বাস করতেও আপত্তি নেই'।

পদ্মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—'হয়তো হয। শোকের যে সূত্রটি হারিয়ে গেছে সেটার একটা প্রান্ত ওকে কেউ যদি ধরিয়ে দিতে পারে খানিকটা কেঁদে আবার ও প্রকৃতিস্থ হবে'।

এ বিষয়েই আবো খানিকটা আলাপ হলো পদ্মার সঙ্গে। একটা বিষয় প্রায় আশ্চর্যজনক বোধ হলো। দেখলাম পদ্মা মনোবিশ্লেষণ বিষয়টিতে অনন্যসাধারণ জ্ঞান রাখে। সে-জ্ঞানটা অলস মুহূর্তে অস্ট্রিয়ান মনোবৈজ্ঞানিকের বইয়ের অনুবাদ থেকে সংগ্রহ নয়। মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা-স্নায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান ডাক্তারির ভালো জ্ঞানের চাইতে কম নয়। মনোবিশ্লেষণের শুধু নয়, মনস্তত্ত্বেব সর্বদিকে জ্ঞান তার আছে।

কিন্তু পদ্মা হাসলো আবার, বললো—'মনোবিশ্লেষণটা কিন্তু ভয়ের ব্যাপার, ভয় ঠিক নয়, লজ্জার'।

—'বিজ্ঞানের কাছে লজ্জা নেই, যেমন নেই উজ্জ্বল আলোয়'।

'আপনাদের অপারেশন থিয়েটারের মতো'? —পদ্মা যেন কী ভেবে শিউরে উঠলো, 'কী সাংঘাতিক'।

রাত্রির আহারপর্ব সুনির্বাহ হতে চন্দ্রবাবুকে অনুসরণ করলাম। যেতে-যেতে লক্ষ্য করেছিলাম সূর্যবাবুর বাঁ হাতে আমার পূর্বদৃষ্ট খাতাগুলির একটা রয়েছে। তার দিকে চোখ পড়তে মনে হলো তিনি যেন চোখ দিয়ে আমার চোখকে খাতার দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে বিষযটি। তাছাড়া পদ্মার সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপের পর থেকে সদুর মায়ের কথাটা খুব মনে হয়েছে, পৃথিবীতে সবচাইতে সহনীয় যা সেই প্রেমের এই বিকৃত রূপ দেখার ইচ্ছা আমার ছিলো না।

চন্দ্রবাবুর শোবারঘরে বসা গেলো। শোবারঘর সাধারণ বাড়ির অন্য ঘরগুলির চাইতে ভালো হয়,

এখানাও তাই। এ ঘরখানির আর-একটু লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিলো, সেটা হচ্ছে এর রুচি। শোবার ঘর কখনোই শিল্পভারে আড়ষ্ট হওয়া উচিত নয়, এটিও নয় তা। বরং শিল্পকর্মের একান্ত অভাবই যেন এর বৈশিষ্ট্য। দুপাশে দুখানা খাট, মসৃণ কাঁঠালিরঙের কাঠে তৈরি, কোথাও এতটুকু রঙিন সুতো নেই। অথচ যত্নার্জিত শুভ্রতা। ছবিহীন দেয়াল কল্পনা করা কঠিন, অনেকদিন পরে দেখলাম। দু'মিনিট যেতেই মনে হয় রুচির পেছনে যথেষ্ট যত্ন না-থাকলে এমনি একটি আশ্রয় তৈরি হয় না।

সংসারে যাদের দৌড়ঝাঁপ কম করতে হয় তাদের চালে ও কথায় একটি আয়েস ভাব থাকে। সেটা ছিলো চন্দ্রবাবুর। দিনের বেলা ততটা নজরে পড়েনি। তুলনা দিতে হলে বলা যায় গানের আগের স্বরবিস্তারের মতো যেন আয়েসের ভাবটি আনার চেষ্টায় আছেন চন্দ্রবাবু। বিছানার অফুরন্ত কোমল শুভ্রতায় ঢেলে দেবার জন্য নিজেকে ও চারপাশকে কোমল করে তুলেছেন।

সেকালের লোকদের বোধ হয় গল্প বলতে শেখার একটা অলিখিত সামাজিক নির্দেশ ছিলো। আমরা পড়ে ও লিখে যে-অভাবটা মেটাই ওরা বোধ হয় বলে ও শুনে সেটা করতো। চন্দ্রবাবু ছোটোবেলার কথা বলছিলেন, কবে তাঁরা স্টিমারের গায়ে নৌকা ভিড়িয়ে উঠে স্টিমার ছেড়ে দিতে কী মুশকিলে পড়েছিলেন। কবে তাঁরা গ্রামের পাঠশালার পেছনে অন্ধকার-সন্ধ্যায় কী দেখেছিলেন। নতুনও নয়, অসাধারণও নয়। মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতো করে বলেছিলেন চন্দ্রবাবু। বাল্যের স্মৃতিতে অবগাহন করার আনন্দ তাঁর স্বরে ছিলো। ফিরে গিয়ে বাবাকে একবার কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কিন্তু সভা ভাঙতে হলো। বড্ড মশা ধরছিলো। তাছাড়া লক্ষ্য করলাম চন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে নিদ্রা নেমে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেয়ালঘড়িটায় দেখলাম বারোটা বাজে! এবাব শুয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এদেব একজনকে আর-একটু অসুবিধায় ফেলতে হবে। চন্দ্রবাবুর কাছে শুনে আসিনি আমার শোবার ব্যবস্থাটা কোথায় হয়েছে।

সিঁড়ির গোড়ায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হলো এরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও হাই উঠছে। ওদের ডেকে আর কী হবে এসব করেই কোথাও একটা বিছানা করা আছে আমার জন্য। খুঁজে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে-ঘরের দরজা নিশ্চয়ই বাঙালি কায়দায় আধখোলা থাকবে, এবং থাকবে একটি পরিচ্ছন্ন অতিথি-অনুরূপ বিছানা, যার মশারি ফেলা হয়নি। খুঁজে বার করার ব্যাপারটায় কৌতুকই অনুভব করলাম।

বৈঠকখানার পাশেরটিতে ঢুকলাম, দিনের বেলায় জেনেছি এটা টুবলুদের ঘর। ঘরের দুপাশে দুখানা খাট পাতা। একটিতে ময়লা বিছানা, সেটায় টুবলুর দাদা। অপরটি পরিচ্ছন্ন, মশারিও ফেলা হয়নি, কিন্তু সেটিতে টুবলু নিজে মাথাকে কেন্দ্র করে সর্বাঙ্গ দিয়ে বৃত্ত রচনা করছে ঘুমের ঘোরে।

নিচের তলায় সূর্যবাবুর ঘরখানিতে একবার উঁকি দিলেই বোঝা যাবে শোবার ব্যবস্থা দোতালায় আছে। সূর্যবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম একটিমাত্র বিছানা সে-ঘরে, এবং সেটি দখল করে সূর্যবাবু ম্লান আলোকে কী করছেন মাথা হেঁট করে। আর দাঁড়ালাম না, দোতলার সিঁড়ি ধরলাম।

কিন্তু ফিরে আসতে হলো। চন্দ্রবাবুর ঘরটি নীরব নিস্তব্ধ, হাতড়ে-হাতড়ে অন্য দরজাগুলি দেখলাম, সেগুলি তালাবন্ধ। মনে হলো পদ্মাকে একবার লাইব্রেরির কথায় সে-ঘরের হাওয়ার কথা বলেছিলাম। সম্ভবত সে-ঘরের খোলা জানালার ধারে আমার বিছানা হয়েছে। উৎসাহ করে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম তা নয়। বাড়ির সবচাইতে বড়ো তালাটা ঝুলছে সে-দরজায়। অন্ধকারে একা-একা হেসে ফেললাম। কায়দা করতে গিয়ে খুব বেকায়দায় পড়া গেছে। জিজ্ঞাসা করে নিলে গোল চুকে যেতো।

নিচে নামতে-নামতে সূর্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নেয়ার কথাই ভাবছিলাম, ভয়-ভয়ও করছিল, সারা রাত কবিতা শুনতে না-হয়। কিন্তু তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা বটে, সূর্যবাবু আলো

নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

মানুষ এরকম সময়ে ভাবে হাসবো না কাঁদবো। ব্যাপারটার কারণ বোঝা কষ্ট নয়। ওরা সকলেই মনে করেছে সে ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয়ই আমাকে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেখানেই আমার এখন মাঝরাত। কিম্বা অন্য সব ব্যাপারে যেমন পদ্মার অখণ্ড প্রভুত্ব এ বাড়িতে, হয়তো এ ব্যাপারের ভারও তার 'পরেই ছেড়ে দিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কিন্তু এত রাত্রিতে পদ্মাকে ডেকে তোলা বাড়াবাড়ি মনে হলো।

বারান্দা ঘুরে পদ্মার ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। ওদের দরজাও খোলা, আলো জ্বলছে। একটা বিছানায় বসে পদ্মা, পায়ের কাছে মাটিতে বসে সদু, সম্ভবত আলতা পরিয়ে দিচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে পদ্মা আমাকে দেখতে পেলো।

বোকার মতো মুখ করে ওদের ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরেও দুটি বিছানা। দরজার ঠিক পাশেরটি ঝকঝক তুলতুল করছে। বিছানার উপরে বসে পড়লাম, মনে হলো বিছানা থেকে একটা আকর্ষণ অনেকগুলো অদৃশ্য আঙুল দিয়ে মেরুদণ্ডটাকে টানছে। বালিশে কনুইয়ের ভর দিয়ে হাসলাম কুণ্ঠায়। পদ্মা পাশে এসে বসে বললো—'ঘুমোননি'?

নিজের বোকামি স্বীকার করতে হলো।

পদ্মা হেসে বললে—'এখানেও শুতে পারেন'।

'কিন্তু'?

—'তার চাইতে চলুন, টুবলুদের ডেকে দিয়ে আসি'। পদ্মাব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চললো।

—'না-না, থাক। একটা রাত বইতো না'। পদ্মাকে সঙ্গী করে এত রাতে কারো দরজায় দাঁড়াতে ইচ্ছা ছিলো না।

পদ্মাদের বিছানা থেকে বালিশজোড়া ঢাকনাসমেত তুলে নিয়ে সূর্যবাবুর ঘবে এসে ঢুকলাম। ঢাকনাটা বিছিয়ে বালিশ দুটি সাজিয়ে মেঝেতে শুয়েও পড়লাম।

কিন্তু সাপ কামড়ায়নি, কামড়েছিলো মশা। সারা দেহের জ্বালা নিয়ে তখন-তখনি উঠে বসলাম। চোরের মতো সন্তর্পণে সূর্যবাবুর বিছানায় উঠে তার মশারির আশ্রয় নিতে হলো।

সূর্যবাবু জেগে ছিলেন।

'কে, বীরেন'?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঘুমোননি, আমি তো দু'মিনিটেই'।

কেশে গলা সাফ করলেন সূর্যবাবু, বললেন—'এরকম হবে, আমি জানতাম'।

—'কী হবে জানতেন'?

—'তুমি বোধ হয় লাইব্রেরিতে শোবে ভেবেছিলে'!

—'কই না তো, যে-কোনো জায়গা হলেই হতো।'

—'কোনো জায়গাতেই হয়নি? হবে না আমি জানতাম'।

—'টুবলুদের ঘরেই নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হয়েছিলো। আমি যেতে দেরি করেছিলাম ওরা শুয়ে পড়েছে'।

সূর্যবাবু হাসলেন—'বলেছিলো তোমাকে দাদা? বলবে না আমি জানতাম। ছোটোবেলা থেকেই জানি। খাওয়া হলেই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দির্তো। বাড়িতে আর সকলে জায়গার অভাবে রাত জেগে বসে থাকলেও ও নিজের শোবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবে। সেই অভ্যাস থেকে গেছে'।

—'তা নয়, এ সামান্য ব্যাপারগুলির জন্য বাড়ির কর্তার ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই, টুবলুদের উপরেই ভার ছিলো, তারাই ভুলে গেছে'।

সূর্যবাবু হাসলেন আবার—'কিছুমাত্র বোঝো না। আমি ছোটোবেলা থেকে দেখছি, না তুমি দেখছো? পাছে নিজের ঘরে জায়গা দিতে হয় তাই শোবার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। আর এসব ব্যাপার পদ্মাও

জানে'।

—'আপনি ঘুমোন, অনেক রাত হলো। আমিও ঘুমিয়ে পড়বো'।

এমন অবিশ্বাস্য ছেলেমানুষি স্বার্থপরতা চন্দ্রবাবুতে আরোপ করা যায় কি? এ যেন শালগ্রামের ছিদ্র, কলির প্রবেশপথের নিশানা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ে মশা কামড়াচ্ছিলো, সাপের স্বপ্নে ভয়ে ঘুম চটে গেলো। আবেশ কেটে যাবার পরও মনে হলো কে যেন সাপের বিষে মুহ্যমান হয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। আলোর ব্যবস্থা ছিলো না। বিছানা থেকে সন্তর্পণে নেমে দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েও কান্নাটা শুনতে পেলাম।

দু'পা এগিয়ে মনে হলো পদ্মার ঘর থেকেই আসছে কান্নাটা। দ্বিধা করেও সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ম্লান আলোয় ঘরের ভেতরটা নজরে পড়লো। সদু কাঁদছে বিছানায় বসে। ক্রিশ্চানদের ক্রুশ করার কায়দায় হাতদুটি বুকের উপরে আড়াআড়ি করে রাখা। কথা বলা উচিত কিনা ভেবে উঠবার আগে বললাম—'কী হয়েছে সদু'?

পদ্মা দরজা খুলে দিলো।

—'কী হয়েছে ওর'?

সদু সামনেব দিকে আব-এটু ঝুঁকে পড়লো।

পদ্মা বললে—'দেখা না কী হয়েছে, বীরেনবাবু ডাক্তার তা তো জানিস'।

পদ্মা সদুর আড়াআড়ি রাখা হাত দুটি আলগা করে দেবার চেষ্টায় টানাটানি করলো। বললো—'কি বোকামেয়ে তুই সদু, ডাক্তারকে আবার লজ্জা কী'?

সদু মুখ তুললো না। ব্লাউজের বুকের কাছটা ছিঁড়ে গেলে ঢাকবার জন্য যেমন করতে পারতো তেমনি করে আঙুল দিয়ে কাঁধেব কাছে ব্লাউজের কাপড় কুঁচিয়ে ধরলো। যেন কেউ ওব লজ্জাব অবমাননা করেছে।

—'তেমন কিছু নয় বোধ হয়' বলে বেরিয়ে এলাম।

পদ্মা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিলো, গলা নিচু কবে কানে-কানে বলার মতো বললো—'কি লজ্জা'।

দিনের কয়েকটা ঘণ্টা হয়তো-বা একটিমাত্র; প্রাতঃরাশ নয়, প্রথম চায়ের কাপ অবধি। বিনিদ্র রাত্রির গ্লানি চোখ জুড়ে থাকলেও সূর্যবাবুর কথায় ভয় পেলাম না।

সূর্যবাবু বললেন—'তুমি বুঝতে পারছো না ঠিকঠাক'।

—'কোনটা'?

'কালকের সেই কবিতাটা। সেই ইংরেজি হরফে ছাপানো, সেই এইচ আর টি কে এ এম এ এল্'। কথাটার সুর যেন করুণ মনে হলো।

কাল সন্ধ্যার সেই ভয়ঙ্কর কবিতাপুঞ্জের একটি ছিলো হৃৎকমল বলে। যতদূর মনে পড়ে একটা সরোবরের বর্ণনা, একটা দাঁড়কাকের বর্ণনা, একটা পদ্মহীন বৃন্তের বর্ণনা, একটা সরু কাঠির সঙ্গে তার তুলনাও ছিলো; সবটাই লঘু ত্রিপদীতে। হাসি চাপা কষ্টসাধ্য হয়েছিলো। এখন মনে হলো সামান্য বস্তু হারিয়ে শিশু শোক করে, তখন কি আমরা বুঝতে পারি তার ব্যক্তিগত জগতের কতটা জুড়ে ছিলো ঐ বস্তুটুকু, কত গভীর স্পর্শ দিতো তার মনে, কত বিপুল অনুরণন ছিলো তার? একটা বোবা মায়ের কথাও মনে হলো, সন্তান হারিয়েও সে শোক করতে পারলো না বলে তার লাঞ্ছনা হয়েছিলো। তার বুকের ভেতরটা কি কেউ দেখেছিলো তখন? হয়তো তাঁর শোকের অব্যক্ত শব্দে হাসিও পেয়েছিলো। কে জানে সদুর মা বৃন্তটিকে কতটুকু সার্থক করেছিলো। কী বিপুল স্থান পূর্ণ করেছিলো এ বোবা মস্তিষ্কের।

বসবার ঘরে চায়ের কাপ শেষ হলো। চন্দ্রবাবুর স্নানাদি হয়ে গেছে। সৌম্য গাম্ভীর্যে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন—'এখনি যাবে'?

—'আমাকে আজ ফিরে যেতে হবে'।

—'কিছু একটু মুখে দিয়ে যাও বরং'।

—'আর একবার এসে হবে তখন'।

পদ্মা এলো। ঝলমল করে উঠলো ঘর।

—'এখনি'?

—'সকালে-সকালে বেরিয়ে পড়ি'।

পদ্মা হাসলো যেমন করে পদ্মাই শুধু পারে।

চন্দ্রবাবু কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'তোমার বাবাকে আসতে বলবে। ভুলবে না'।

—'হ্যাঁ বলবো'।

পথের ধারে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সূর্যবাবু।

একটু ইতস্তত করে বললেন—'বীরেন, তোমার যদি এখানে আসা হতো এই হস্‌পিট্যালে—একটা টাইপরাইটার আছে ওদের, বেশ ছাপিয়ে নেয়া যেতো'।

সূর্যবাবুর কাছে বিদায় নিলাম।

সদুকে দেখলাম না।

সুনীতি

লেখকের মন্তব্য—'গল্পটি অশ্লীল। যারা অশ্লীলের কাদা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সরোজ উপহার দিতে পারেন শেষের লাইন-পঙ্ককে তাঁদের মতো কোনো উদ্দেশ্য নেই আমার। কিছুর প্রমাণ নয়, কোনো প্রস্তাবও নয়, শুধু বর্ণনা। এর বেশি আমার দাবি নেই'।

আমি প্রথম স্তবক শুনে মন্তব্য করলাম—'তাহলে যতটা সফেন হয়েছিলো উর্মিল হয়েছিলো, আসলে গভীরতা ততটা ছিলো না বিষয়টিতে? সময় নিলেও একসময়ে থিতিয়ে গেলো সেটা, দেখা গেলো সুনীতি তলিয়ে যায়নি এই তো'?

—'তা সত্যি। কিন্তু কেন হলো'?

—'কত শত কারণ থাকতে পারে। শুধু উপমায় নয়, ঘটনাটিতেও প্রত্যক্ষত তুমুল জলধারার সংযোগ ছিলো হয়তো। হয়তো-বা শ্রাবণ মাসের সারাদিনের বর্ষণোন্মুখতা ভাসকল্পিত কাজলবর্ষণে পরিণত হলো রাত দশটায়। বাতাসের ফুৎকারে তড়িৎকম্প মৃৎপ্রদীপের শিখার মতো কাঁপতে লাগলো। সিমেন্ট ও ইঁটের দৃঢ় আশ্রয়ে থেকেও মানুষদের মনে হলো আদিযুগের গাছতলায় অসহায় হয়ে রয়েছে তারা। হয়তো সুনীতি দ্বিজুবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে বলেছিলো—'কী রকম শব্দ, এরই মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন? বসবার ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে এলাম; ছাট আসছে'।'

—'তুমি বলতে চাচ্ছো, বাইরের জলধারা তাদের রক্তকে উত্তাল করে তুলেছিলো'?

—'তার কোনো প্রমাণ নেই বোধ হয়। হয়তো সেটা ছিলো চৈত্রের কোনো রাত। অস্পষ্ট আলো ছিলো আকাশে। সারা পৃথিবীতে বাতাস ছিলো না। নিঃশব্দ পুকুরের জলের মতো নিঃস্ব রাত্রি থৈ-থৈ করছিলো, পাতা পড়লে শব্দ হবে এমন অদ্ভুত উত্তাপ ছিলো চরাচরে। বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে সুনীতি আর দ্বিজুবাবুর দেখা হলো। কার্নিশের উপরে একটা পায়রার কাছে আর-একটা সরে গেলো, এ রকম কোমল শব্দ এলো কিনা কানে কে জানে। সুনীতি সম্ভবত আস্তে-আস্তে বলেছিলো—অদ্ভুত রাত্রি'।

—'হতে পারে', স্ত্রী বললেন, 'সুনীতির নিজেরই মনে নেই আর কী-কী কথা হয়েছিলো। চূড়ান্ততায় গিয়ে পৌছানোর কী-কী সোপান ছিলো। আমার মনে হয় কোনো যুক্তি কোনো কারণই ছিলো না'।

—'তারপরে কী হলো, বলো। কেনই-বা এমন গোপন কথাটা অনুপমকে বলে দিলো সুনীতি'?

—'অনুপম দু-তিনদিন পরে ফিরলো। আদর করার সময়ে সুনীতিকে কাছে নিয়ে বললো, অন্য অনেক কথার মধ্যে, রাত জেগে থাকতে বুঝি? রোগা হয়ে গেছো যেন।'...বয়ে গেছে—প্রায় চিরাচরিত চটুল সুরে বলেছিলো সুনীতি। অনুপম বলেছিলো—'ওকি আর গোপন থাকে? নিশি জাগরণ মসী আঁকা আছে কলঙ্কী নয়নে। মেয়েদের প্রেমবৃত্তিটা অতি ভয়ানক, গোপনের কোনো উপায়ই নেই'।

—'এবার বুঝতে পেরেছি,' বললাম আমি, 'কেন সুনীতি প্রকাশ করে ফেলেছিলো ব্যাপারটা অনুপমের কাছে। আমি যেন মেয়েটিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। একটি দীঘল গড়নের মেয়ে, তাই নয়? উচ্চতার মাপযন্ত্রে দাঁড় করালে দেখা যাবে বাংলাদেশের সাধারণ পুরুষের চাইতে উচ্চতায় সে খাটো তবু উচ্চতার ভুল ধারণাটা হয়। এটা হেঁয়ালি নয়, মেয়েদের বেলায় এমন ভুল হয়; এর জন্য দায়ী তাদের বিভিন্ন অঙ্গের একটা অনুপাত সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু তারই ফলে তাকে শুঁটকি না-বলে বলতে হয় দীঘল। অবক্তব্য শোনালেও সত্য, এদের নিরাবরণ দেহের ছবি আঁকা যায়, আর

সে-ছবি হয় অপ্রগল্‌ভ বাংলার পট। এরকম একটা মেয়ে যদি হয় সুনীতি তবে তার মনে হতে লাগলো (সেটা যে তার নিছক কল্পনা এ কিছুতেই সে বুঝতে পারলো না), অনুপম দুচোখ মেলে তার মুখে তীব্র দৃষ্টিতে কী খুঁজছে। প্রথম রাত্রিটা গোপন করে থাকা গেলো। দ্বিতীয় দিন সারাক্ষণ আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুনীতি ভাবলো, তার চোখের কোণে চরিত্রহীনার দাগ পড়েছে, উপন্যাসে যেমন থাকে। নিজেকে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রাত্রিতে সে বলে ফেলেছিলো—'আমাকে ছুঁয়ো না'।

স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'অনুতাপ নয়? অনুতপ্ত হয়েই বলেনি তাহলে স্বামীকে'?

—'শেষ অবধি না শুনে বলা যাবে না। গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাও'।

—'এরপরে সর্বনাশকে অবিশ্বাস করে হেসে উড়িয়ে দিতে কী-কী বলেছিলো অনুপম, কতটা কাঁদলো সুনীতি, কিম্বা আদৌ কান্নাকাটি ছিলো কিনা ব্যাপারটায় এ জানা যায়নি। কোর্টে নালিশ করে না অনুপম, সন্ন্যাসী হয় না, রিভলবার হাতে ভয় পর্যন্ত দেখায় না। বরং যেন সহৃদয়তার চূড়ান্ত করলো। সুনীতির নামে বাড়ি লিখে দিলো, ব্যাংকের খাতায় মোটা একটা অঙ্ক। দ্বিজুবাবুকে বললো সে—সুনীতির পক্ষে একা একটা বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, তোমাকেই তার বাড়িতে থাকতে হবে। হয়তো দ্বিজুবাবুর অসহ্য বোধ হতে বললো সে—শোনো অনুপম, তুমি নিরুপম ব্যবস্থা করেছো, কিন্তু মামলাটায় তোমার রায় আমি মানব না, কোর্টে চলো। অনুপম বলেছিলো—ভদ্রঘরের মেয়েছেলেকে স্পর্শ করলে দায়িত্ব এড়ানো যায় না কোনোক্রমে।...সুনীতির বাপেব বাড়ির লোকরা জানলো, শ্বশুরবাড়ির লোকরা জানলো। ছি-ছি-ছি। পাড়ার পরিচিতরা হৈ-হৈ করলো; কিন্তু যতটা হতে পারতো হলো না। ঢেউটা থিতিয়ে গেলো। তা যাক, কিন্তু সুনীতি সান্ত্বনা পেল কী করে? এ অবস্থায় কি কেউ পায় সান্ত্বনা কোনোদিন'?

—'এ তো বোঝাই গেলো সুনীতি শক্ত জাতের মেয়ে ছিলো। তার সম্বন্ধে কল্পনা করা কঠিন নয়। ধরো, প্রথম সন্ধ্যায় দ্বিজুবাবু বলেছিলো—সুনীতি তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। সুনীতি বলেছিলো—আমি উপন্যাসের নায়িকা নই, বিষয়টিও লজ্জার।.. কিন্তু শেষের দিকে সেই সুনীতিই হয়তো একদিন দ্বিজুবাবুকে বললো—বেঁচে থাকার প্রয়োজন তোমারও আছে। কেন মরবে বলো, কী গুরুতর অন্যায় তুমি করেছো?...আসলে গল্পের ও জীবনের পরিধি সমান বিস্তৃত নয়। গল্পের ঘটনাকে পুঞ্জীভূত করতে হয়, সংহত করতে হয়, পাঠককে একমুখী ক'রে রাখতে হয় সুনীতির প্রেমের দিকে। কিন্তু সে তো মানুষ। ওরই মধ্যে কী ক'রে সে দৈনন্দিন খবরের কাগজটা পড়তো, সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে চোখ রাখতো, পা ছড়িয়ে বসে হিসাব লিখতো সংসারের, এসব বেরঙা ব্যাপার নিয়েও দ্বিজুবাবুর সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করতো। আর শুনতে তোমার অবাক লাগলেও একথা সত্যি সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে দুজনে হেসেও ফেলতো একসঙ্গে। হাসা খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু দুজনে একসঙ্গে হাসা যে-কোনো বিষয় নিয়ে মানে কতখানি কাছাকাছি যাওয়া এ তো সহজেই বোঝা যায়'।

—'কিন্তু এমন ঘেন্নার ব্যাপারেও? সুনীতি বুঝতে পেরেছিলো তার জীবনের কুগ্রহ এই দ্বিজুবাবু, তবু? কত বড়ো শান্তি, সুখ ও প্রতিষ্ঠা থেকে এই দ্বিজুবাবু তাকে বঞ্চিত করেছে'।

—'এ যদি মেনে নিতে হয় তাহলে তো সুনীতির চরিত্র বুঝেই ফেলা গেলো। তার এ রকম বোধ হয়েছিলো মানে অনুতাপ গ্রাস করেছিলো। তাই কি মনে হয় তোমার'?

—'আমার মনে হয়' স্ত্রী বললেন, 'ও পোড়ামুখী সবই পারে। ও দ্বিজুবাবুকে বলে উঠেছিলো একদিন—আমাকে আর দূরে রাখবার কী যুক্তি তোমার? বিয়ে করো, বিয়ে করলে যদি ভালোবাসা যায়; যে-কোনো একটা নামমাত্র দেশাচার হোক, ভালোবেসে বাঁচি'।

—'আশ্চর্য নয়! জাহাজ ডাঙায় মার খেলে মানচিত্রে অলিখিত দ্বীপের নির্জনতায় দুটি নাবিকের এমন হয়ই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, কিম্বা এ-উপমা ছাড়াও হতো। বিবাহের প্রথম রাত্রি প্রভাত হলে বরকনের মধ্যে প্রেমের স্মৃতিও থাকে না, সুনীতিদের ব্যাপারে তার চাইতে অগভীরতা ছিলো না এ-বাড়িতে অন্তরীণ হবার আগে'।

বললাম আমি—'সুনীতির একটি মেয়ে ছিলো'?

—'ছিলো এ বাড়িতে এসে পেয়েছিলো সে'।

—'তাহলে এটাই তার স্থিরতার কারণ, আর স্থিরতা থেকে শান্তি অনেকসময়েই পাওয়া যায়। মেয়েরা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ভয়গুলোকে দূর করার ফন্দিফিকির করতে-করতে বাকি দিন কয়েকটি এরকম ক্ষেত্রে কাটিয়ে দেয় দেখা যায়'।

'যায় হয়তো। পারলো না সুনীতি। আবারও পদস্খলন হলো তার। আর সেটা হলো অনুপমকে জড়িয়ে। আমি বলতে গিয়েছিলাম এটা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো গল্পের গোড়াতেই নতুবা অনুপম যে-ব্যবস্থা করেছিলো, সেটা করতো না। কিন্তু ভেবে দেখলাম তার উল্টোও খুব সম্ভাব্য। যারা হৈ-চৈ করে, চেঁচামেচি ক'রে, নিজেকে উপহাসের লক্ষ্য ক'রে তোলে তাদের আসক্তিটা যে তাদের মনের অন্যান্য বৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে এ বোঝা যায়। কিন্তু অনুপমের গোড়ার কাজগুলো দেখে তো সে-রকম মনে হয়নি'।

কিন্তু স্ত্রী যা বললেন, সেটাই বলি—

একদিন দ্বিজুবাবু বাড়ি ফিরে এসে বলেছিলো—'অনুপম তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সুনীতি'।

'আমার সঙ্গে? কেন? কী বলব তাকে'?

বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে আবার একদিন তার মনের কাছে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের শর্তটি ভেঙে যাবার পর দেখা হলে কী করে তারা? এ তো মান-অভিমানের বিচ্ছেদ নয়, বিবাহের পূর্বের প্রেমাস্পদকে দেখাও নয়।

সেদিনই সন্ধ্যার পর অনুপম এলো। চাকর এসে খবর দিলো—বাইরে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে।

—'বসতে বলো গে। তোমাদের বাবু বাড়ি নেই'?

সুনীতি যখন বাইরে এলো ঝকঝক করছে সে। আটপৌরের মধ্যে একটু বিশেষ যেটা সেটা তার পরনে। কপালে সিঁদুর দগদগ করছে। চুড়িগুলোর পাশে বিয়ের রাতে পরা ঘড়িটি অবধি। অনুপম উঠে দাঁড়ালো, মাথা নিচু করে বললো—'তোমার কাছে এলাম সুনীতি, একটা দরকার আছে'।

'বলুন'—সুনীতি অভ্যর্থনাসূচক হাসলো, ঠোঁট দুটি একটু তির্যক হতে আলো ঠিকরে পড়লো।

—'বসতে বললে না'?

—'বাহ্, বসুন!'

অনুপম বসলো, সিগারেট ধরালো, কিন্তু কথা খুঁজে পেলো না। তবু হয়তো কথা বলতো সে। সুনীতির মুখে ব্যবধানসূচক 'আপনি' ও 'অনুপমবাবু' শুনবার পরও সাহস ছিলো তার। শেষের দিকে একরাশ ফেনার মতো সাদা ফ্রকের ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মধ্যে সুনীতির মেয়ে দরজার কাছে চাকরের হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। একটু যেন লজ্জার লক্ষণ দেখা দিলো সুনীতির মুখে।

—'আমার মেয়ে'।

'খবর দাওনি তো'—বললে অনুপম।

—দেয়া যেতো হয়তো—ভাবলো সুনীতি এই কথাটা বলে।

কিন্তু একদিন সকালে অনুপমের বাড়িতে যেতে হলো তাকে। অনুপম চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলো।

—'কী ব্যাপার'?

—'বোসো। খুব একটা জরুরি দরকারে ডেকে পাঠিয়েছি'।

অনুপম উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করলো, দরজা বন্ধ করে দিলো, খুললো; তারপরে একসময়ে বললে—'আমার ভরাডুবি হয়েছে নীতি'।

—'কী হয়েছে'? (পুরনো সম্বোধনে মনের বিকার হয় নাকি?)—

—'ব্যবসায় ফেল করেছি। আমি মদও খাইনি, তোমার পরিবর্তও খুঁজে বেড়াইনি। তবু ফেল করলাম।

(একটু হাসলো অনুপম) বোধ হয় আমেরিকায়ানায় পেয়েছিলো, একেবার তলিয়ে গেলো মধুকর। ব্যাংকের টাকা ওভারড্রাফট্ করতে-করতে কোথাও আর কিছু নেই। নিজের ব্যাংকের টাকা ওভাবে ফুবিয়ে দিলে লোকে কী বলে জানো? তাই বলছে'।

—'এসব আমাকে বলছেন কেন? কী করতে পারি আমি'?

—'দান করার মতো কিছু সম্পত্তি আছে তোমার। সেইটি—'

সুনীতি দানপত্র লিখে দিয়ে এসেছিলো। লিখে দেবার সময়ে অনুপমের মুখে সে শুনেছিলো এ-সম্পত্তিটা সুনীতিকে দিয়েছিলো তার শ্বশুর বিবাহরাত্রির আশীর্বাদ হিসাবে। সুনীতি কলমটা হাত পেতেই ঘসঘস করে সই ক'রে দিলো।

কয়েকদিন পরে সুনীতি চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে অনুপমকে ডেকে পাঠিয়েছিলো।

অনুপম এলে বললো—'হোটেলে খাচ্ছো বোধ হয় আজকাল'?

—'কী করে জানলে'?

—'আন্দাজে। কেউ ভাত নিয়ে বসে থাকবে না, স্নান করো, খাও, গড়িয়ে নাও'।

—'তারপর '?

—'আমার সঙ্গে একটু ব্যাংকে যেতে হবে, টাকা তুলবো'।

—'সঙ্গে যেতে হবে কেন'?

—'অনেক টাকার দরকার হয়েছে, ওভারড্রাফট্ও করতে হতে পারে'। হাসলো সুনীতি।

সুনীতি কাছে বসে খাওয়ালো অনুপমকে। ভাত নামতে চায় না অনুপমের গলায়। সুনীতি বললে—'কষ্ট হচ্ছে খেতে, ওঠো, ঘরে গিয়ে বসবে। বেরিয়ে হোটেলে খেয়ে নেবে'। অনুপম লজ্জায়-অপমানে কেঁদে ফেলার মতো মুখ করে বসে রইলো।

ব্যাংকের কাজ শেষ করে, ব্যাংকবাড়ির বাঁধানো চত্বরটুকু দ্রুতগতিতে পার হয়ে এসে হাতব্যাগটা সিটের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে একেবারে পড়লো যেন সুনীতি সিটের গভীরতায়। অনুপম কথা বলতে গেলে সে বললো—'এখন নয়, বাড়ি গিয়ে শুনবো'।

বাড়িতে ফিরে অনুপম বললো—'এখন আমাকে যেতে হবে। মনে হচ্ছে কাজটা বিবেচনা করলে না। অবশ্য একটু দাঁড়িয়ে গেলে তোমার সব টাকা ফিরে পাবে'।

আঙুলে কপাল চেপে ধরে সুনীতি বললে (ব্যাংকে যে অস্বাভাবিক তরল সুরে কথা বলছিলো সেটা এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে)—'একটা কথা তুমি বুঝতে পারোনি। তোমার দারিদ্রের পাশে আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকাটা একটা অশ্লীল স্থূলতা, মদের মহাজনের ঐশ্বর্যের মতো'।

অনুপমের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য জানা ছিলো সুনীতির, একরোখা ছেলেদের নিজের বেদনার কথা কাউকে না-বলার মতো, ঠিক তা নয় অবশ্য। কী রকম চরিত্রের লোক এ বলার চাইতে অনুভব করা অনেক সহজ। যদি বলা যেতো মনের অন্তঃস্থলে সুনীতিই তার একান্ত আত্মীয়, যার জন্য এই পাঁচ বছরের পাহাড়ের ব্যবধানের পরও পরম দুঃখের সময়ে অনুপম সুনীতির কাছেই এসেছিলো? কিন্তু এরকম ভাবালুতা অনুপমে আরোপ করা যায় না। এ যেন ব্যর্থপ্রেমে ছবি আঁকছে সে সুনীতির কিম্বা হুইস্কির বিলাসে জড়িয়ে-জড়িয়ে বিলাপ করেছে—এসব বলারই সামিল, অন্তত তার চাইতে কম অসহ্য ছি-ছির ব্যাপার নয়।

শুধু টাকার জন্যই অনুপম আসতে পেরেছে এটাই যেন আকর্ষণীয়, এই একান্ত বস্তুতান্ত্রিকতা, উপন্যাসে যাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় নায়করা। এই স্বার্থপরতার নজিরই যেন তাকে বেশি জীবন্ত করেছে।

কিন্তু এসব চিন্তারই-বা কী সার্থকতা ভাবতে গিয়ে সুনীতি অনুপমের পাশে গিয়ে বসলো। ছি-ছি অতটা ভাবপ্রবণ হয়ো না বলে অনুপমের কপালে হাত রাখলো। জোর করে রহস্যের সুর এনে বললে—'তোমরা পুরুষরা অর্থনীতির চাকায় বেঁধে সমাজ চালাবে। স্ত্রী আর তার সন্তানদের জন্য বাড়ি তুলবে। সেই ব্লুপ্রিন্টে চোখ বাঁধা তোমাদের, আর কিছুর খোঁজ নিও না। এতদিন কত লোকের সঙ্গে কত লেনদেনের ব্যবসা করেছো এও তেমনি। দেখলে কী রকম বকবক করছি? বড্ড বকা আমার স্বভাব হলো যেন'।

এরপরে সহসা চোখের দৃষ্টি আর্ত হলো সুনীতির, বললো সে—'মুখ তোলো...মনে করো সেসব নৈকট্য, সেসব আলিঙ্গন কোনো পুরুষবন্ধুর। পুরুষবন্ধু তো বিয়ে করে, তারপরেও তো তাকে কাছে আনা যায়'।

স্ত্রী থামলেন।

আমি বললাম'এরপরে কী কথা হয়েছিল সেটা বলা কঠিন নয়। কিন্তু এমন একটি অনন্য বাক্য যে গড়ে তুলতে পারে আবার পদস্খলন হলো তার'?

—'হ্যাঁ হলো। একদিন বঙ্কিমের লরেন্স ফস্টরের গল্প পড়েছিলো সুনীতি ঘুমানোর আগে। স্বপ্ন দেখেছিলো বজরায় চলেছে সে অনুপম-নামা এক দুর্ধর্ষ জমিদারের সঙ্গে নিশীথ রাতে যে বন্দুকেব আওয়াজে ঘুমন্ত জলচর পাখিদের শুধু ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে না, রক্তাক্ত মৃত্যুও এনে দিচ্ছে। এ বকম স্বপ্নাবেশ দিয়েই কি বিশ্লেষণ হয় সুনীতির এই দ্বিতীয়বার আছড়ে পড়ার? অনুপমের হয়তো এক ধরনেব রুক্ষ পৌরুষ ছিলো। তার আকর্ষণ কি দুর্বার? আর ভাবো দেখি, এর চাইতে অন্য কারো মোহে ঘর ছাড়া কি অনেক সুসহ হতো না? এটা কি নিলাজ অশ্লীলতার চমক নয় এই পূর্ব-পরিত্যক্ত স্বামীকে গোপনে আবার গ্রহণ করা'?

—'নিলাজ বৈকি। সমর্থন করার যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিজুবাবু ও অনুপমের চরিত্র উল্টেপাল্টে দেখেও না। তাদের চরিত্র আছে বলেই মনে হয় না। বাহ্যত সুনীতির জীবনে তারা প্রভাব বিস্তার করলেও মনে হয় সুনীতি নিজেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে নিচ্ছে। সংসারে একরকমের মেয়ে থাকে যাদের কাপড়চোপড় এটায়-ওটায় বেধে গিয়ে বিভ্রাট ঘটায়। এ অভ্যাস অনেক দুঃখেও তাদের যায় না। নতুবা সুনীতি আবার কেন অনুপমের মোহে জড়িয়ে পড়বে'!

স্ত্রী বললেন—'তারপরে কী হলো বলতে পারো'?

—'শান্তি পাওয়া মুশকিল হলো এবার'?

—'না। আবার পদস্খলন হলো। এই তৃতীয়বার'।

—'উঃ, অসহ্য'।

স্ত্রী বললেন—'রাখাল তার নাম। বয়সে সে সুনীতির চাইতে পাঁচ বছরেরই ছোটো হবে'।

অনেকদিন পরে ছেলেটি এসে দাঁড়লো। একটু-বা টেরা, কিন্তু সেটা এত সামান্য যে বিরস বোধ হয় না। একটু-বা রোগা-রোগা। গোঁফ উঠেছে। আজ বড়ো-বড়ো রাখে, কাল ক্রেটে বাদ দেয়, পরীক্ষা চলছে এখনো। মোটা টুইলের সার্ট হাতা গুটিয়ে পরা। হাসতে গেলে ঠোটের মাঝখানটায় উঁচু হয়ে ওঠে।

প্রথমটায় খানিকটা অপমান বোধ হয়েছিলো সুনীতির রাখালের কথাবার্তায়, রসিকতায়। কিন্তু রাখাল চলে গেলে কৌতুক বোধ হলো। পুরুষরা যে মাঝে-মাঝে কী পরিমাণ বোকা হতে পারে, ভাবলো সে। মুখে যা বলতে আটকায়, কী ক'রে সেসব লেখে চিঠিতে? কিন্তু কী মনে ক'রে চিঠিখানা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে না-ফেলে আলোর সামনে খুলে বসলো সুনীতি।

লেফাফা খুলে ভালোবাসার কথা বেরুলে যতটা ছেলেমানুষ বোধ হতো তার চাইতেও ছেলেমানুষ রাখাল। মাত্রাহীন রসিকতা করেছে সে। চিঠিতে শুধু হিজিবিজি আঁকা, কিন্তু পড়তে-পড়তেই সহসা একাগ্র হলো সুনীতির দৃষ্টি। কে যেন কাকে হুকুম করছে রেললাইন উপড়ে ফেলার, ব্রিজ উড়িয়ে দেবার, সমাজের

সর্বাঙ্গীন ধ্বংসের প্ল্যান! সুনীতি উঠে গিয়ে তখনই বাক্স খুলে গোপন করে রেখে দিলো কাগজটা।

হঠাৎ যেন করুণা এলো তার—কী বোকা, কী অসাবধান!

মাঝে-মাঝে গভীর রাতে আসতো রাখাল, মেলোড্রামার সুরে কথাও বলতো। চাওয়ার তার শেষ নেই। নেই বললে বলে, গলার হারটা খুলে দাও। শিউরে ওঠে গা কথা শুনে, না-দিলে নাকি গভীর রাত্রিতে এসে চুরি করে নিয়ে যাবে।

এরই মধ্যে একদিন রাখাল এসে বললো—'একটা দামী স্যুট দিতে পারো'?

—'কোথায় পাবো'?

—'তুমি যে শ্ল্যাকস পরো না তা আমি জানি, বোকামেয়ে। মাপ রেখে যাচ্ছি, পরশুর মধ্যে বানিয়ে রাখবে, খেলো না-হয়'।

—'কেন'?

—'অত শত জবাবদিহি যদি করতে হয় চাই না তোমার প্যান্ট আর কোট'।

একদিন দুপুরে রাখাল কাঁদলো সুনীতির ঘরে বসে। সোফাটায় বসে আছে রাখাল, সুনীতির মেয়েটা তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বকবক করছে আর রাখালেব চোখ থেকে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সুনীতি বলেছিলো—'স্যুট নিতে এলে না কেন'?

'দরকার হলো না'।

—'প্ল্যান বদলে গেলো'?

—'যার জন্যে, গুলিতে ঘায়েল হয়ে গেলো সে'।

দুপুবের বোদে চা চেয়েছিলো রাখাল, চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলো সুনীতি তাকে কাঁদতে।

কিন্তু অনেকদিন পরে হঠাৎ যেদিন এলো বাখাল, সে-কথা বলি।

—'কী খবর'?

—'জেলে যাবার ইচ্ছা ছিলো না, কাজও এগোলো না। দেখি এবার ডাক্তার হতে পারি কিনা'।

—'পড়ছো তাহলে আবার'?

—'ইচ্ছা আছে, ঘটে উঠলে হয়'।

—'মন বসছে না'?

—'খুব বসছে, বসালে না-বসে কে? বইগুলি বেচে খেয়েছি এখন সেটা বুঝতে পারছি'।

—'টাকা চাই তো'?

—'তার ভূমিকা এতসব, এ কী করে বুঝলে'? রাখাল মেয়েদের মতো হেসে উঠলো।

টাকা নিয়ে সে ফিরে গেলো।

একদিন সন্ধ্যার পর যুদ্ধের সাজে রাখাল এসে উপস্থিত, কাঁধের দুপাশ থেকে দুটি ঝোলা ঝুলিয়ে।

—'এ বেশে আবার'?

—'এলাম তোমার কাছে'।

—'তা বেশ করেছো'।

—'শোবারঘর দেখিয়ে দাও'।

—'সে কী'।

রাখাল যা বললে তার অর্থ, সে পড়তে চাইলেও তারা পড়তে দিচ্ছে না। তাদের নাকি নিয়ম একবার নাম লেখালে আমরণ দল ছাড়া যায় না। তার কাঁধে ঝোলানো ঝুলিতে বোমাও নেই, ডাণ্ডাও নেই। একটায় কিছু হাড় আছে মানুষের, অপরটিতে গুটিকয়েক বই। সুনীতি যদি তাকে মুরগি-মায়ের মতো ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে পরীক্ষাটা সে দিতে পারে হয়তো।

কিন্তু তাই বলে বাড়িতে তো আর রাখা যায় না।

প্রায় দু-তিনমাস আবার রাখালের খবর নেই। চাকরের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সুনীতির মেয়ে একদিন আবিষ্কার করল রেললাইনের ওপারে টালির ছোটো একটা ঘরে থাকে রাখাল।

দুপুরে একদিন রাখালের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো সুনীতি।

—'কী করছো'?

রাখাল ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলো, থমকে দাঁড়িয়ে হেসে ফেললো, বললে—'এ একরকমের খেলা। মনের জড়তা টিকটিকি পুলিসের মতো পিছু নিয়েছে, বাঁকাচোরা পথে চলে তাকে বিপথে বে নিশান ফেলে পালাবার চেষ্টা চলছে'?

—'বড্ড রোগা দেখাচ্ছে যেন, অসুখ-বিসুখ নয় তো'?

—'এ বয়সে ও-রকম হয়। আমাদের বয়েসের হরিণ দেখেনি? শরীর হাল্কা রাখার জন্য গাছ গুঁতিয়ে বছরে দুবার শিং ভেঙে ফেলে দেয় তারা'।

কিন্তু রসিকতার সুর ধরে রাখতে পারলো না রাখাল। বললে—'কী হয়েছে জানি না, ঘুমুতে পারছি না। রাত্রিতেও পায়চারি ক'রে বেড়াতে হয়। বড়ো একলা বোধ হয়, ভয়-ভয় করে। বোধ হয় দল ছাড়ার অভিশাপ'।

—'নিজেকে কাপুরুষ মনে করার ভূত বুঝি'?

—'হাসির কথা নয় দিদি, মনে হয় যদি তুমি কাছে থাকতে কোথাও হয়তো ঘুমুতে পারতাম। তোমার ঘরের পাশে একটু জায়গা হয় না'?

কথা দিয়ে অনুভব মাপা যায় না। অনুভব পরিবহনের জন্য নীরবতা সৃষ্টি করতে হয়।

—সুনীতি বললো—'এদিকে এসো, ঘুমাও তুমি, আমি বসে থাকবো'।

প্রস্তাবটির আকস্মিকতা, অসম্ভাব্যতা, নিজেদের বয়সেব বস্তুজ্ঞান, এসবের দ্বন্দ্ব কাটাতে সময় লাগলো রাখালেব; কিন্তু একসময়ে এসে সুনীতির কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো ডান হাতখানা দিয়ে সুনীতির একটা বাহুও জড়িয়ে ধরলো।

ঘুম যখন ভাঙলো তার রাত হয়েছে। বলল—'চলো এগিয়ে দিয়ে আসি'।

সেই রাখালের অসুখের খবর পাওয়া গেছে কয়েকদিন হয়। রাত্রিতে উঠে ঘরের জানালার গরাদ ধরে ভাবলো সুনীতি। নেমে এসে সদর দরজার পাইকগুলি ধরে দাঁড়িয়ে আর একটু ভেবে হাসিমুখে অন্ধকার পথে সে বেরিয়ে এলো। স্নিগ্ধ জলে-ভেজা-হাওয়ার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সুনীতি এগিয়ে চললো ভাবতে-ভাবতে।

হয়তো-বা আবার সে কোলে মাথা রেখেই ঘুমুতে চাইবে। হয়তো সে এতক্ষণ ক্লান্ত চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। গভীর রাত এখন, কাল রাত্রিতেও হয়তো ঘুম হয়নি তার। চোখের তলে খোলা বই, আলোটা লাল হয়ে আসছে। না-পারছে ঘুমুতে, না-পারছে বইয়ে মন দিতে। তার মনের মধ্যে কি আশা নেই, খুব ক্ষীণ একটা আশা, একখানি স্নিগ্ধ হাতের? কিন্তু কী ছেলেমানুষ ওরা, কী বিপদ যে এ রকম আসায় মেয়েদের তা কল্পনাও করতে পারে না। শুধু নিজের নীরব দাবি জানিয়ে খালাস।

সুনীতি মনে-মনে হাসলো। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একসময় দলছাড়া হয়ে পড়েছে এমন একটা শিশু। পাগলামি কোরো না বলে হাসতে-হাসতে যাদের চারিদিকে দু-বাহু বাঁধা যায় তেমনি।

একটা কিছু আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না ওরা। অত যে শক্ত ওদের চেহারা তার পেছনেও আছে কোনো না কোনো মেয়ের নিজেকে ভুলে যাওয়া আত্মোৎসর্গ। মায়ের মতো একজন ওদের চাই শেষদিন অবধি। সব অভাব পূর্ণ করতে পারে এমন একজন সাথী, ময়নামতীর মতো কোনো মেয়ে শিশু-স্বামীকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলো যে গভীর অরণ্যে।

এই ছবিটি মনে হতেই সুনীতির মন থমকে দাঁড়ালো নিজের মুখোমুখি।

—আচ্ছা, বলতো সুনীতি, এসব চিন্তা কেন হচ্ছে অসুস্থ একটা ছেলেকে দেখতে যেতে। রাত্রি বলে? দিনের আলোর অভাব, তাই? নিজেকে সমর্থনের এ চেষ্টা কেন? রোগীকে সাহায্য করা, একটি শিশুকে মানুষ করে তোলা এত ভালো কাজ যে তুমি নিজেকে সমর্থন না-করলেও ক্ষতি নেই, পৃথিবীর সবাই করবে।

কী দরকার তার চিন্তার তাহলে, এই স্থির ক'রে দ্রুতপদে হেঁটে চললো সুনীতি। কিন্তু নিজেকে সমর্থন করা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ যে বলেছিলো তার কথা তখনো শেষ হয়নি।

—স্ত্রী বললেন—'আহা মনের দ্বৈত অবস্থা কি এমন হয়? এ-পক্ষ যা চিন্তা করছে সেটা অপব পক্ষের কাছে সম্পূর্ণ অজানা থাকে? এমন অজানা যে কী কথার পর কী কথা সে বলবে এ-পক্ষ তা জানতে পারে না কথাটি উচ্চারণ হওয়ার আগে।'

—'সুনীতির মনে খুব একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিলো'?

—'তাই স্বাভাবিক নয়? সুনীতির মনে যে চিন্তাগুলোর উদয় হয়েছিলো আমার তো মনে হয় সেগুলো দুপক্ষের তর্কাতর্কির মতো। ও-পক্ষ বলে উঠলো—নিজেকে সমর্থনের চেষ্টায় কি পায়ের কাছে যে বাধা জমা হয়েছে সেগুলোক দূর ক'রে দেয়ার ইচ্ছা নেই! এসব বিশ্লেষণ শুধু সেজন্যই। নতুবা এসব কথা মনে আসার কী যুক্তি? অন্য কথা ছেড়ে দাও, তোমার বুকের কাছে যে অনুভবটা তার দরুনই তো তোমার তুলনাটা মনে পড়েছে নতুবা পুরনো গ্রাম্য কবিতার তুমি এত ভক্ত পাঠক নও যে হামেশা মনে হয় সেগুলি। ঐ ময়নামতীর কথা। ওটা কি অপূর্ব ও অসাধারণ অনুভব নয়? স্বামী ও সন্তান একত্রে এক দেহে-বুকে রাখার আনন্দ নয়, বলছো? ছি-ছি সুনীতি। কত ছেলেমানুষ রাখাল, কত অনভিজ্ঞ সে। মনে মানুষের অনেক কিছুই হয়—এই যেন সুনীতির নিজের বক্তব্য। কিন্তু ও-পক্ষ ততক্ষণে স্কুলমিস্ট্রেসের মতো থাবা দিয়ে তার দু-কাঁধ চেপে ধরেছে। অনেক অভিজ্ঞতায় কঠিন সে, তার সামনে কোমলপ্রাণ একটা মেয়ের চোখের জলের প্রত্যুত্তর দেয়া ছাড়া আর কী করার আছে। ও-পক্ষ বললে—মানুষেব মনে অনেক দুর্বল মুহূর্তে অনেক অলস কল্পনা জড়ো হয়, কিন্তু তুমি কি অতটা বিশ্বাস করো নিজেকে? বলো না হয়, তাই বলো'।

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো সুনীতি। গুমটিঘরের ভেতর থেকে তার সে-ফোঁপানো কান্না নাকি শুনতে পেয়েছিলো রেলের গেট-পাহারাওয়ালা।

সুনীতির পায়ের তলায় রেলওয়ে শ্লিপার জুড়ে তৈরি ক্রসিং একটা। এদিক-ওদিক থেকে অনেক জোড়া রেললাইন এই ক্রসিংটার কাছে এসে মিলেছে, পৃথক হয়েছে পথ বদলে। ঝকঝক শব্দে একটা আলো এগিয়ে আসছে। দিনের আলোর মতো আলো হয়ে উঠেছে ক্রসিং-এর কাঠগুলি। সুনীতির শাড়িটা বোধ হয় সিল্কের। আঁচলাটা কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের একপাশ দিয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। বাতাস লেগে দুলছে আঁচলটা, চুলগুলিও।

গাড়ি একটা তীব্রধ্বনি করে উঠলো।

যেন-বা দিনের আলোয় নেমে এলো সুনীতি। এই সেই ক্রসিং যাকে এ অঞ্চলের লোকেরা বলে স্যুইসাইডিং। একের পর এক অনেক হতভাগ্যের রক্তে লাল হয়ে গেছে এই কাঠগুলি। গাড়ির সময়ে এখানে এসে দাঁড়ালে নাকি নিরাপদ জায়গায় আর ফিরে যাওয়া যায় না। ধাঁধার পথের মতো লাইনগুলি, ঠিক বিপদটিতে গিয়ে পৌঁছায় হতভাগ্য।

সুনীতি শিউরে উঠলো। হঠাৎ যেন মেয়েটার কথা মনে পড়লো সুনীতির, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে

সে। দ্বিজু ভালোবাসে মেয়েকে, অনুপমও ভালোবাসে, রাখালও। যে কেউ একজন তাকে লালিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

সুনীতি চোখ তুললো। যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। রাখালের ঘরে খোলা জানালায় আলোর পাশে বইয়েব (ঠিক ঠাহর করা গেলো না, আন্দাজ করা গেলো) উপরে ঝুঁকে পড়ে আছে রাখাল।

ক্রসিংটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। গাড়িটা এবার সুতীব্র আর্তনাদ করে উঠলো। শাড়ির আঁচলটা উড়ছিলো বাতাসে। সিগন্যালের তার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আঁকশির মতো গলা-বাঁকানো ছোটো-ছোটো লোহার খোঁটা থাকে লাইনের পাশে, তার একটায় আটকে গেছে আঁচল। নিচু হয়ে আঁচ্‌লাটা খুলতে গিয়ে ফেঁসে গেলো সেটা। ভারি জরির কাজ-করা অনেকটা চওড়া আঁচ্‌লা।

গরম বাতাসের হল্কা লাগছে গায়ে।

রাখালের খোলা জানালাটার দিকে চাইলো সে। চিবুকটি একটু উত্তোলিত। একটা হাসি ফুটে উঠলো সুনীতির মুখে; দুরন্ত ছেলে অভিমান ক'বে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে মা যেমন হাসেন, স্বামী অভিমান ক'রে টেবিলেব কাজে ডুবে গিয়ে অভিমান ভুলে গেলে, পেছনে এসে দাঁড়িযে স্ত্রী যেমন নিঃশব্দে হাসে, কতকটা মেশানো হাসি।

গল্প শেষ হলো। সিগারেট ধরালাম।

স্ত্রী বললেন—'তোমার কি মনে হয় আত্মহত্যা করেছিলো সুনীতি দ্বন্দ্বের সমাধান না কবতে পেবে'?

উত্তর প্রতীক্ষার স্বাভাবিক সময়টা চুপ করে রইলাম।

পরে সারাদিন ধরে মনে হতে থাকলো—অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়েছে সুনীতি সাবা জীবন।

নাটক

দা গড অন মাউন্ট সিনাই

আবির্ভাব

মোজেসের তাঁবুর (tabernacle) অভ্যন্তর।

সিনাই পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গায় তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁবুটি বেশ বড়ো। মোজেস যে গোষ্ঠীপতি তাহা তাঁহার তাঁবুর আকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিচে সমতলভূমিতে অন্যান্য ইজরায়েলদের তাঁবু।

তাঁবুর সম্মুখে একটি বারান্দার আকৃতিতে আচ্ছাদন। রাত্রিবেলায় এটা নামাইয়া দিয়া সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়া হয়। তাঁবুর বাঁদিকে আরেকটা দরজা। এই দরজা দিয়া পাহাড়ের ধূসর চূড়ার অনেকটা দেখা যাইতেছে। তাঁবুর পেছনদিকে একটা জানালা। জানালা ও দরজা দুটিই খোলা আছে। জানালার পাশে তাঁবুর দেয়ালে একটি ঢাল ও একজোড়া বর্শা টাঙানো আছে।

তাঁবুর অভ্যন্তরে মাঝামাঝি জায়গায় একটা টেবিল-জাতীয় আসন। তাহার তিনদিকে খানকয়েক বসবার চৌকা টুল।

এখন অপরাহ্ণ। সূর্যের প্রখরতা নাই কিন্তু উত্তপ্ত বালুকার তাপে চারিদিক জ্বলিয়া যাইতেছে।

আরন ও যোশেফ কথা বলিতে বলিতে মঞ্চের ডানদিক হইতে প্রবেশ করিল। উভয়ের পরনে টাসকান চিত্রকরদের পরিকল্পিত মেষপালকের লম্বা ঝুল-দেয়া আলখাল্লা জাতীয় পরিচ্ছদ। এক টুকরা কাপড় দড়ির মতো করিয়া পাকাইয়া পরিচ্ছদটি কোমরের কাছে জড়ো করিয়া বাঁধা। আরনের হাতে একটি লম্বা লাঠি, তাহার মাথাটি গোল করিয়া বাঁকানো। ইংরাজিতে ইহাকে ক্রুক বলে। সাহিত্যে ইহার পরিচিত নাম আরন্‌স রড। এই রড দিয়া আরন একবার নীল নদকে শাসন করিয়াছিল।

যোশেফ ও আরনকে সহসা দেখিলে সমবয়সী বলিয়া বোধহয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরন বয়োজ্যেষ্ঠ।

আরন। সব তো নিজেই দেখলে? চেষ্টার কিছু ত্রুটি হলো? পেলে কিছু?

যোশেফ। আশ্চর্য, এতটুকু ঘাস পর্যন্ত কোথাও নেই। আর দু-একদিন, তারপর ভেড়াগুলো সব মরবে।

আরন। শুধু ভেড়াগুলো।

যোশেফ। আমাদেরই যখন এত কষ্ট না-জানি মেয়েদের কত ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে।

আরন। আর শিশুদের।

যোশেফ তাদেরও হচ্ছে। কিন্তু মোজেসের যে বুদ্ধি ফ্যারাওয়ের চোখ এড়িয়ে, সমুদ্র পার করে আমাদের এতদূর নিয়ে এল হাত ধরে, তা গেলো কোথায় বুঝিনে।

আরন। সকলেরই ঐ এক প্রশ্ন। বোসো বড় খিদে পেয়েছে। সমস্ত শরীরে যেন হাতুড়ি পিটিয়ে দিয়েছে। উপবেশন করিয়া হাত পা ছড়াইয়া দিলো)। রুথ, আরে, মেয়েটা সারাদিনই কোথায় যায়। রুথ, আছিস নাকি ঘরে?

যোশেফ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমারও দুর্বুদ্ধি হয়, এখান থেকে তাঁবু সরিয়ে নিয়ে এর চাইতে আর কোথাও চলে যাই না কেন সকলে।

আরন। মোজেস বলেন যা পাবার এখানেই পাবো।

যোশেফ। এই বালিতে—যেখানে ঘাস পর্যন্ত হয় না!

আরন। মোজেস তাই বলেন। তুমি নাদাবকে দেখেছো কাল পরশুর মধ্যে?

যোশেফ। না, কী হলো তার?

আরন। মরুভূমির যেখানটায় সবচেয়ে বেশি বালি সেখানে কাঠি পুঁতে তার খেতের চৌহদ্দি করে রেখেছিলো। সারাদিন ঘুরে ঘুরে তার ভবিষ্যতের খেতখামারের কথা সকলের কাছে গল্প করে বেড়াতো। কদিন থেকে একেবারে ক্ষেপে গেছে। যায় যায় আর মরুভূমির বালি হাত দিয়ে দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দেখে তার তলে মাটি আছে কিনা।

যোশেফ আহা!

আরন। নাদাব বলে—হতেই হবে ঠিক, মোজেসের কথা কখনো বৃথা যায় না।

যোশেফ নিশ্চয়, ঐ তো আমাদের ভরসা। কিন্তু তিনি গেছেন কোথায়?

(ম্লান হাসিয়া) পাহাড়ের দিকে। ওপারে কিছু আছে কিনা দেখতে। শুধু খুঁজেই বেড়াচ্ছেন। কী খুঁজছেন তা নিজেও জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন—পাবো বৈকি রে। এত আশা যে কোথায় পান, জানিনে।

রুথ প্রবেশ করিলো। সারা মুখচোখ রুক্ষ। চুলগুলিতে ধুলা জড়াইয়া তাহাদের স্বাভাবিক রঙ আর দেখিবার উপায় নাই। তথাপি ভরিক মেয়েদের গাউন-এর মতো একটা পরিচ্ছদে তাহাকে সুন্দর মানাইয়াছে। বুকের উপর একটা সাদা ভেড়ার বাচ্চা চাপিয়া ধরিয়া আদর করিতে করিতে সে প্রবেশ করিলো, কিন্তু যোশেফকে দেখামাত্র রাঙাইয়া উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

আরন। আরে শোন শোন। ও যে যোশেফ, আমার বন্ধু। ওকে দেখে লজ্জা পাচ্ছিস নাকি তুই!

যোশেফ। থামো থামো। তুমি বড্ড ফাজিল।

আরন। (হাসিয়া উঠিল) সব বদলেছে, মোজেস পর্যন্ত বদলে গেছেন, কেবল তোমরা দুটি বদলাওনি। মনে হয় চাঁদ উঠলে এখানেও তোমরা দুজনে বসে বসে সারারাত গল্প করতে পারো। পায়ের নিচে যে শুধু বালি তাও তোমাদের খেয়াল থাকবে না। বেশ লাগে আমার।

যোশেফ। আর নিজে তুমি? সারাদিন ঘুরে ঘুরে একফোঁটা জলের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে না-পেয়ে যখন ফিরে আসছি, শুনি যে বাঁশি বাজে। ছুটলাম শব্দ শুনে। কী-কী? না, সেই খেজুর গাছটার তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে বাঁশি বাজায়। কে? না আমাদের আরন।

এবার তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলো।

রুথ। তুমি ও বেচারাকে খুঁজো না। ওটা আমার দাদা নয়, ছোটোভাই।

আরন। তাই তো বলবি। কোলে করে যখন মানুষ করেছিলাম তখনই বুঝি তোর দাদা ছিলাম।

কথ। তা নয় তো কি? সবাই যখন খেতে না-পেয়ে, ঘুমাতে না পেরে কাঁদবে উনি গেলেন বাঁশি বাজাতে। আবার জায়গাটাও দেখতে হবে। কোথায়, না বালির উপরে, শুকনো মরা একটা খেজুর গাছের তলায়।

আরন। তোরা বুঝিসনে কেন। আমি গেলাম একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে ভাবতে।

যোশেফ। তাই শুয়ে শুয়ে বাঁশিতে মুখ দিয়ে ভয়ানক ভাবনা ভাবছিলে।

কথ। তোমরা বোসো, আমি খাবার নিয়ে আসি।

কথ চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোশেফ হাই তুলিয়া নড়িয়া বসিল।

যোশেফ। সত্যি ব্যাপারটা যে একরকম দাঁড়াবে তা মনে করিনি।

আরন। আমি তো আগেই বলেছিলাম।

যোশেফ। তাই বলেছিলেন। ভরসা এই এখনো মোজেস আছেন। কিন্তু কিসের জোরে এত স্থির হয়ে আছেন তা বুঝিনে। আচ্ছা, তারা থেকে কবে বৃষ্টি নামাতে পারবেন মনে হয় তোমার?

আরন। সে কি? তারা থেকে বৃষ্টি নামাবে কি হে?

যোশেফ। নাও, নাও। আমার কাছে আর গোপন করতে চেষ্টা কোরো না। ইজরায়েলের সবাই এ জানে।

আরন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আরন। জানে যে মোজেস আকাশ থেকে ইচ্ছামতো বৃষ্টি নামাতে পারে এই তো।

যোশেফ। তাতে হাসির কি হোলো?

আরন। তোমার যে খিদে পায় সে কি তোমার ইচ্ছা মতো, গরম বালিতে পা পুড়ে যায় সে কি তোমার ইচ্ছা মতো? না। তবে? তুমিও আর সকলের মতোই নিরেট। শুধু যুদ্ধই জানো।

যোশেফ। বাহ্। প্রতিবার কী হতো মনে নেই? তোমাদের গম। গতবারের কথাই ধরো। নীল নদের পুরোহিত সকলকে ডেকে বললেন আমি মন্ত্র দিয়েছি এবার গম বোনো। অনেকেই রাজি হলো। কিন্তু মোজেস সবাইকে ডেকে বললেন—এখন বুনো না, বৃষ্টি হবে। কেউ কেউ তার কথা শুনলে। বাস্তবিক মজার ব্যাপার হলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই পবিদ্যার আকাশ কালো হয়ে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে মনে হয়েছিলো পাহাড় ভেঙে নেমে আসবে। সব গমের চারা মরে গেলো। তখন ইজরায়েলরা পুরোহিতের উপর চটে গেলো। তারা বললে আমরা মোজেসের কথা শুনবো। মোজেস হবে বললে বৃষ্টি হয়। সেই কথাই তো এখনো বলে এরা। তাই যদি না হবে, বৃষ্টি হবার কথা মোজেস কি করে আগে থেকে বলতে পারে।

আরন। আকাশের তারা চিনতে জানলে তুমিও পারতে। তারা দেখে বলা যায় বৃষ্টি হবে কিনা।

যোশেফ। (একটু ভেবে) কিন্তু শুধু তাই করে হবে। আসলে তুমিও জানো না। তারা দেখে বৃষ্টির কথা না হয় বলা গেলো। ভেড়ার মড়ক কী করে আটকাবে শুনি।

আরন। শোনো তবে। সেবার যখন ভেড়ার মড়ক লাগলো, একদিন বাড়িতে যখন সন্ধ্যাতারা ডুবে গেলো মোজেস আমাকে ডেকে নিয়ে বনে গেলেন। গভীর অন্ধকার বন। আমার ভয় করলো। আমি বললাম, মোজেস আমার ভয় করছে। মোজেস বললেন, ভয় পেয়োনা, ভেড়াদের বাঁচাতে হবে। তারপর একটা গাছ থেকে অনেক পাতা

কেটে নিয়ে মোজেস বললেন, এই গাছটা চিনে রাখো, ভেড়াদের অসুখ করলে এর পাতা খেতে দিও। আর এই গাছটার একটা ডাল কেটে রাখো তোমার কাছে, তাহলে ভেড়াদের যখনই অসুখ করবে, তখনই তোমার সেই ডাল দেখে আজকের কথা মনে হবে। তারপর যে ভেড়াদের অসুখ করেছিলো সারারাত ধরে সেই পাতাগুলি খাওয়ালাম আমি আর মোজেস।

যোশেফ। (মুখ মুচকিয়া হাসিল) আর কাউকে বোলো না, তোমাকে পাগল বলবে।

আরন বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো। সহসা নেপথ্যে—দাদা দ্যাখো সে কি হয়েছে।

আরন ও
যোশেফ। (উঠিয়া) কী হোলো?

রুথ প্রায় তার সমবয়স্ক মেয়ের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলো। তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না সে বুভুক্ষু। তাহার একহাতে একখানা অর্ধভুক্ত রুটি তখনো ধরা আছে। বালিকাটি তখনো হাঁপাইতেছে। পুরুষের সম্মুখে এভাবে আনীত হইয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেলো।

রুথ। দেখেছো এই হতভাগীর কাণ্ড। একখানাও কি রেখেছে? ছি-ছি মেয়েমানুষের এত লোভ।

যোশেফ। কী হোলো, কী করেছে ও?

রুথ। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) হয়েছে আর কী? কী দেবো খেতে, কিছু কি আছে আর?

যোশেফ। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) এইমাত্র, এর জন্যেই ওর পেছন পেছন ছুটেছিলে। আমি ভাবি আরো কিছু হয়। কি রে (বালিকাটিকে কাছে টেনে নিয়ে) সব খেয়েছিস।

বালিকাটি ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো।

যোশেফ। (তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া) আরে তাতে কী হয়েছে। খিধে পেয়েছিলো খেয়েছিস। হ্যাঁরে বোকামেয়ে।

আরন। কিছু একটা দে না রুথ, ওকে। গায়ে দিক।

রুথ মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলো—

যোশেফ। তোর মা কোথায় রে? জুডিথের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না?

বালিকা। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) চলে গেছে।

আরন। কোথায়?

বালিকা। উই ওদিকে।

যোশেফ। হতভাগিনী! মেয়েটাকে ফেলে গেলো।

আরন। ভালোই করেছে, বাঁচবে ও।

যোশেফ। হঠাৎ একথা বলছো যে! খবর পেলে নাকি ওদের?

আরন। সকালের দিকে একজন ফিরে এসেছে মোজেসের কাছে। জুডিথের স্বামী।

যোশেফ। কী বললে?

আরন। বললে দুদিন পথ চলেও কোথাও জল পাওয়া যায়নি। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। একটা খেজুর গাছ পর্যন্ত নেই। ফিরবার পথে সে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো সামনের দল চলছে চলছেই। দিনের শেষে ছোটো ছোটো কালো বিন্দুর মতো হয়ে দিগন্তের বালির সমুদ্র ডুবে গেলো।

যোশেফ। ইস্, সেখানেও যদি জল না-পায়।...তারপর

আরন। কতজন যে পথের ধারে লুটিয়ে পড়েছে তার সীমা নেই।

যোশেফ। আহা...কিন্তু আমি ভাবি হতভাগারা গেলো কেন।

আরন। (একটু হেসে) এখানে থেকেই-বা কী করতো?

রুথ একটা ঘাগরা লইয়া ফিরিয়া বালিকাকে পড়িতে দিলো

আরন। ভালো জামাটাই নষ্ট করলি!

রুথ। বয়ে গেছে আমার নষ্ট করতে।

যোশেফ। এখানে তবু তো দুপুরবেলায় দু'দণ্ড দাঁড়াবার জায়গা আছে।

আরন। তা আছে। কিন্তু দুপুরে এদিকটায় বোধ করি তুমি কোনোদিন আসোনি, না? পাহাড়টার দিকে কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছো?

যোশেফ। না।

আরন। অথচ এই পাহাড়টার দিকে তাকানোর ভয়ে এদিক থেকে সবাই সরে যেয়ে দূরে তাঁবু ফেলেছে। সমস্ত দুপুরবেলা পাহাড়টা যেন দাঁত মেলে হাসতে থাকে। মনে হয় নীল নদের মাঝে ফেলে দিলে এক মুহূর্তে সমস্ত জল শুষে নিতে পারে। এমন শুকনো।

রুথ। আমারও খুব ভয় করে, দাদা।

আরন। তা কি হয় রে। ভয় করলে চলবে কেন।

যোশেফ। কিন্তু যাকে বিশ্বাস করে এতদূর এলো, শেষ পর্যন্ত তার কাছে থাকাই কি উচিত ছিলো না?

আরন। উচিত অনুচিতের কথা কি সবসময়ে এত সহজ বলা যায়? মনে হয় ওরা যেয়ে ঠকেছে।

আরন। তাঁর মনের কথা মুখে বুঝবার উপায় কোনোদিনই নেই। তারার দিকে চেয়ে চোখের চারিদিকে গভীর হয়ে কালি পড়ে গেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু চেয়েই আছেন। মনে যে কী হচ্ছে জানবার উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন হবে বৈকি? একদিন না একদিন বৃষ্টি হতেই হবে। রুক্ষ্ম পাহাড়ের উপর বসে বিকেল থেকে আরম্ভ করে সারারাত আকাশের একদিকে চেয়ে বসে আছেন স্থির অবিচল। কখনো হয়তো একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। তখন তাঁকে দেখে মনে হয় প্রাণমন সব যেন তারার দেশে চলে গেছে।

যোশেফ। এইজন্যেই লোকে বলে মোজেস তারার কথা বোঝেন, পাখির ভাষা জানেন।

আরন। তা বলে। আমি শুধু ভাবি সত্যি যদি বৃষ্টি না-হয়, তারা দেখতে যদি একদিন ভুলই হয়ে যায় কী ভয়ানক লাগবে মোজেসের বুকে। আরে!

যোশেফ। কী?

আরন। শোনোনি? শুনিসনি রুথ?

রুথ। কী দাদা? (দূর হইতে একটা কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল)

আরন। কে যেন কাঁদছে!

যোশেফ। হয়তো বাতাসের শব্দ।

আরন। বাতাস আসবে কোথা থেকে? এদেশে বাতাস আছে নাকি?

আরন উঠিয়া তাঁবুর পশ্চাৎ দিকে গেলো, ফিরিয়া আসিলো

রুথ। কি দাদা?

আরন। তাই হবে বোধহয়। বাতাসই হবে। একটু বইলো যেন।

যোশেফ। (হাই তুলিয়া) যাই বলো আরন, ইজিপ্টে কষ্টেই ছিলাম, কিন্তু বাতাস বইলো কিনা জানার জন্যে উঠে বাইরে যেতে হতো না।

বালিকা। বাতাস নয়। বালি কাঁদছে। আমি রোজ দুপুরবেলা শুনতে পাই। প্রথম প্রথম মনে হতো আমার সেই ছোট্ট বোনটা কাঁদছে। তোমরা দেখনি তাকে। জল খাওযার জন্যে খুব কাঁদতে কাঁদতে আর কাঁদলো না। একেবারে চুপ করে গেলো। ও আর কোনোদিনই কাঁদবে না। ওই যে উঁচু জায়গাটা ওর তলে ওকে রেখে দিয়েছে বাবা আর দাদা মিলে। তারপর রোজ মনে হতো দুপুরবেলা ও রোজ কাঁদছে। কিন্তু এখন আমি বড়ো হয়েছি কিনা বুঝি। বালি কাঁদে। আমার সেই বোনটা তো ঘুমিয়ে আছে, বাবা বলেন ওর আর তেষ্টাও পায় না।

আরন। ঐ শোন আবার।

যোশেফ। কোথায়?

আরন। শুনিসনি রুথ?

রুথ। ও কী দাদা? আমার খুব ভয় করছে।

আরন। কে কাঁদছে না?

যোশেফ। কী যে বল তোমরা! কান্না কোথায়? এই রাত্রিতে কে কাঁদবে আবার।

আরন। শোনোনি তুমি?

যোশেফ। না। ঐদিকে দ্যাখো; তাঁবুর ঐ দিকটা কেমন নড়ছে। এবার বুঝতে পারলে তো ওটা বাতাস?

একটা ঝিরঝিরে বাতাসে তাঁবুর একটা পাশ একটু নড়িয়া উঠিল

মরুভূমিতে ওরকম হয়। বাতাসে বালিতে ঘসা লেগে কান্নার মতো শোনায়। ঐ মেয়েটা যা বোঝে তাও তোমরা বোঝো না দেখছি!

রুথ। (আরনের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল) ঐ শোনো দাদা, এবার আরো কাছে। এদিকেই আসছে।

কান্নার শব্দটি প্রবল হইয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে আবার দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। যোশেফও এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। চারজনেই বিস্মিত হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

আরন। (রুদ্ধকণ্ঠে) এবার শুনলে যোশেফ?

যোশেফ। অদ্ভুত তো। ঠিক যেন কে কাঁদছে। ছেলে মরে গেলে মা যেমন কাঁদে তেমনি।

রুথ। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমার এসব ভালো লাগে না। কোথায় যে কী হবে বুঝিনে। সবসময়ে প্রাণটা ছাঁৎ করে ওঠে।

আরন। ভয় কিরে? ঐ শোন দূরে চলে যাচ্ছে।

যোশেফ। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! যাক, চলে গেছে।

রুথ। এখনো আমারে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

যোশেফ। এইবার নিয়ে তিনবার হলো, তাই না রুথ?

আরন। তোমরা কি আগেও শুনেছো না কি?

যোশেফ। হ্যাঁ, প্রথম শুনি একদিন রাত্রিতে। আমি আর মোজেস বেরিয়েছিলাম পাহারা দিতে। মনে হলো কে যেন কাঁদতে কাঁদতে আমাদের পেছনে পেছনে চলেছে। তারপর, একদিন আমি আর রুথ ফিরছিলাম সন্ধ্যার পর। কোথাও কেউ নেই। রুথের হাসি থামতেই কারা যেন কান্না শুরু করে দিলো। যেন কয়েকটা ছেলে ক্ষুধায় কাঁদছে।

আরন। আমার মনে হয় মরুভূমি আমাদের দুঃখে কাঁদছে।

যোশেফ। (হাসিয়া উঠিলো) এ তোমার বাঁশি নিয়ে ভাবতে বসবার মতো হলো। কিন্তু যাই বলো রুথ, কিছু খাবার দরকার এখন। পেটে খিদে থাকলে তোমাকে চিনতেই পারিনে যেন।

আরন ও রুথ একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলো

রুথ। যাচ্ছি, বাপু। একটু দেরি করো, তখনই আবার চিনতে পারবে।

রুথ চলিয়া গেলো

যোশেফ। আমরা তো তবু খেতে পাই। আর জুড়িথের দল?

আরন। কী হবে বলো? মানুষ ভবিষ্যৎ না-ভেবে পারে না। মরতে যদি হবেই, দুদিন নিরাপদে বসে থাকবার চাইতে তবু একবার বাঁধবার চেষ্টা করাই কি ভালো নয়।

যোশেফ। কিন্তু জুডিথের অনুকরণ করে একে একে সবাই যদি চলে যায়?

আরন। গোষ্ঠী ভেঙে যাবে, এই তো? যাক না। গোষ্ঠী ভেঙে যদি বাঁচা যায় তার চেষ্টা করাই ভালো।

যোশেফ। মৃত্যু আসন্ন বলেই কি তোমার মত বদলে গেলো?

আরন। এখানকার দুর্দশা দেখবার পর এছাড়া আর কী বলবার আছে?

মোজেস হাসি হাসি মুখে প্রবেশ করিলো। সৌম্য প্রিয়দর্শন বৃদ্ধ। সাদা সাদা দাড়ি বুক পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। উজ্জ্বল গভীর দৃষ্টি। দেখে সহসা শিশুদের বইয়ের মহামানবের ছবির কথা মনে পড়িয়া যায়। একান্ত সাধারণ মেষপালকের পোশাক। পোশাকের আড়াল থেকে শরীরের দৃঢ় বাঁধন দেখা যাইতেছে। বুকের উপর শায়িত একটা মেষ

মোজেস। (মেষটিকে লক্ষ্য করিয়া) অত ভাবিসনে। তোর পা আমি কালই সারিয়ে দেবো। একেবারে সেরে যাবে, এতটুকু ব্যথাও থাকবে না, দেখিস। আরে, তোরা এরকমভাবে গম্ভীরভাবে? একটু আনন্দ করতেও কি তোরা জানিস নে? রুথ, ওরে রুথ।

রুথ ছুটিয়া প্রবেশ করিলো

রুথ। বাবা?

মোজেস। হ্যাঁরে? (রুথ মোজেসকে আলিঙ্গন করিলো) দ্যাখো পাগলিটাকে। ছাড়, ওর লাগবে। এই দুষ্টুমেয়েটা ছুটোছুটি করতে যেয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। যা তো মা, কিছু পশম আর একটু কাপড় নিয়ে আয়।

রুথ। তুমি কান্নার শব্দ শোনোনি, বাবা?

মোজেস। কান্না?

রুথ। হ্যাঁ, মনে হলো কে যেন কাঁদছে।

মোজেস। তা কাঁদুক, তুই যা পশম নিয়ে আয়। আর খানিকটা কাপড়ও আনিস।

রুথ চলিয়া গেলো

কী ব্যাপার আরন। কান্না কিসের? ভয় পেয়েছো নাকি তোমরা?

আরন। পাবারই কথা। কোথাও কেউ নেই অথচ মনে হলো কে যেন হাহাকার করে কাঁদছে।

বালিকা। আমি বললাম বালি কাঁদছে, তা এরা বিশ্বাস করে না। বালি কাঁদে না ভাইয়া?

মোজেস। আরে তুই এখানে?

যোশেফ। ওর মা ওকে ফেলে রেখে গেছে। সেই কথাই আমরা বলছিলাম।

মোজেস। জুডিথের স্বামী ফিরে এসেছে। অদ্ভুত শক্তি, অলৌকিক সাহস মেয়েটার। যদি তাব একটু বিবেচনা থাকতো! কিন্তু, এদিকের নতুন কিছু খবর আছে?

যোশেফ। যা স্বাভাবিক তাই। খেতে না-পেয়ে কতক মরছে। কিন্তু তার চাইতেও বেশি হয়েছে জলের কষ্ট। এব্রাহামের পাগল ছেলেটা আজ দুপুরে জল জল করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায়। যেন জল দেখতে পেয়েছে এমনি।

মোজেস। (রুদ্ধনিঃশ্বাসে) তারপর?

যোশেফ। সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি করে যখন তার কাছে যাওয়া গেলো, দেখলাম একটা বালির ঢিবিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দু'কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মোজেস। (বুক মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিয়া পড়িল). .খুব হুঁশিয়াব যোশেফ। পাহারা আরো সতর্ক করো। এ ব্যাধি যখন এসে পড়েছে তখন আরো দুযেকজনেব যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রুথ পশম আব কাপড লইযা প্রবেশ কবিলো

মোজেস। আচ্ছা এইবার এটাকে শক্ত করে ধরে থাকো দেখি, আমি ওর পাটা বেঁধে দি। শক্ত করে ধরিস, খুব দুষ্টু কিন্তু!

রুথ ও যোশেফ মেষটিকে চাপিয়া ধবিয়া রাখিলো, মোজেস পশম ও দড়ি দিয়া সামনের একটি পা বাঁধিতে লাগিলো]

(বালিকাকে) তাহলে তোর মা তোকে ফেলে গিয়েছে?

যোশেফ। তাই তো বলছে।...আচ্ছা, বৃষ্টি যদি হয় তবে ওরা ফিরতেও পাবে হযতো, তাই না?

মোজেস। পথ চিনে ফিরে আসা একটু কঠিন বৈকি।

রুথ। তবে ওদের কী হবে?

মোজেস। কী করে বলবো, মা? হয়তো কোনো ভালো জায়গাতেও পৌঁছে যেতে পারে, কিম্বা...

রুথ। কিম্বা কি ফিরতে কোনোদিন নাও পারে?

মোজেস। তাই তো হয়। আমরা যখন প্রথম ফারাওয়ের দেশে যাই তখন শুনেছি এমন হয়েছিলো। কয়েকজন আসল দল ছেড়ে রাগারাগি করে চলে গিয়েছিলো।

যোশেফ। তারপর?

মোজেস। অনেকদিন পরেও তারা যখন ফিরলো না তখন তাদের খোঁজ নেওয়া নেয়া হয়েছিলো। খুঁজতে খুঁজতে একদিন দেখা গেলো তাদের তাঁবু পড়ে রয়েছে। সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে শুধু বালি আর বালি। তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না।

মেষটির পা বাঁধা শেষ করিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া

যা এবার ঘরে। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

যোশেফ। জলের কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।

মোজেস। বুঝতে পারি। উপায় কী বলো? একটু বৃষ্টি হলেই বাঁচা যেতো।

রুথ। বৃষ্টি হবে, বাবা? উঃ কতদিন যে স্নান করিনি।

মোজেস। মনে হলো হবে। পাহাড়ের উপরে বসে দেখলাম দূরে আকাশের দক্ষিণ দিকটা কালো হয়ে উঠেছে। তারাগুলি সব হারিয়ে গেলো। ওটা যদি ওদিকে আসে তবে বৃষ্টি নিশ্চয় হবে।

রুথ। যারা চলে গেলো তারাও বৃষ্টি পাবে? (মোজেস নীরব হইয়া রহিলেন) উত্তর দিলে না, বাবা?

মোজেস। কী করে বলবো, মা? পাবে হয়তো।

রুথ। না-পেলে ওরা কেউ যে বাঁচবে না। (মোজেসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এলো) ওরা যেয়ে ভালো করেনি, না?

মোজেস। ওদের ভালো হওয়াই তো ভালো। তা যাক, আমায় কিছু খেতে দিবিনে? আছে কিছু?

রুথ। ছিলো সব ঐ রাক্ষসটা খেয়েছে।

বালিকা লজ্জিত মুখ নামাইল

মোজেস। কিরে ভাইয়া, মোজেসের রুটি খেয়ে ফেললি?

বালিকা। আমার খুব খিদে পেয়েছিল যে।

মোজেস। শুনলি রুথ! ও জানে মোজেসের কাছে যে থাকে, খিদে পেলে সে মোজেসের খাবারই কেড়ে নেবে।

বালিকা। কেড়ে নিইনি।

রুথ। এবার থেকে তাই নিস।

রুথ। আমি যাই, তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করি।

রুথ চলিয়া গেল

যোশেফ। কী হবে ভাবাই যায় না।

মোজেস। দেখাই যাক না কী হয়। সবাই মরব না, এ নিশ্চিত।

যোশেফ। তবু তো আমাদের আপনি আছেন, কিন্তু জুডিথদের ..(কিছুক্ষণ নীরব)

মোজেস। জুডিথ আমার গোষ্ঠী ভেঙে দিয়ে গেল। দলের সেরা পুরুষগুলোকেই নিয়ে গেছে, তবু যদি ফিরে আসে—

বাহিরে তখন ভৈরবী তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। প্রচণ্ড বাতাসে বালি উড়াইয়া যে অন্ধকার রচনা করিয়াছে, তাহাকে আঁধি বলিলে কিছুই বর্ণনা করা হয় না। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সহিত তাঁবুর দড়ি ছিঁড়িবার শব্দ ও নরনারীর আর্তনাদ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে।
বাহিরে তো এই অবস্থা, এদিকে মোজেসের তাঁবুর অভ্যন্তরেও ক্ষুব্ধ প্রকৃতির আর এক স্তম্ভিত রূপ। রুথ ও আরন দণ্ডায়মান। তাহাদের সম্মুখে জুডিথ বসিয়া আছে। ধূলিধূসর শতছিন্ন অঙ্গাবরণ ভেদ করিয়া, রোগ-শোকে কৃশ যে চেহারা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া ভয়ঙ্কর দুরবস্থার কথা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না। মুখে শোকের কালো ছায়া গভীর হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু চোখে জলের চিহ্ন মাত্র নাই। যেন তাহার গভীর বেদনায় অশ্রুর উৎস শুকাইয়া গিয়া তাহাকে প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে।

আরন। উঠে এসো জুডিথ। ঝড় বইছে। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভেবে তো আর প্রতিকার করা যাবে না। দল ছেড়ে মোজেসের কথা না-শুনে চলে যাবার জন্যেই

এত বড় ক্ষতি তোমার হবে এও ভাবা যায়নি। জানি, তোমার যে-বেদনা তাতে কোনো কথা দিয়েই তোমাকে সান্ত্বনা দেয়া যাবে না। কিন্তু, বিশ্বাস করো, তোমার এ শোকের অংশ আমরাও নিয়েছি। তোমার সুখের দিনে গর্বিতা, রূপ-ঐশ্বর্যময়ী জুডিথকে যারা হিংসা করতো, যারা তোমার সম্মুখে নিজেদের দাবী গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, তারাও আজ এতটুকু দ্বেষ তোমাকে করবে না। জানি তোমার সব গেছে, তথাপি যা আছে তাও তো কম নয়। এখনো তোমার স্বামী আছে, সন্তান আছে। কিন্তু যারা তোমার কথায়, যারা তোমার রূপে বশীভূত হয়ে, যারা তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার সাথে গিয়েছিলো, তারা তো কেউ ফেরেনি। একবার ভাবো তাদের কথা। তৃষ্ণায় জল পায়নি, ক্ষুধায় অন্ন পায়নি, কী যন্ত্রণায় তারা একে একে লুটিয়ে পড়েছে। কেউ ফেরেনি, কোনোদিন আর তারা ফিরবে না। এই পৃথিবী আবার একদিন সবুজ হয়ে উঠবে, আবার একদিন ইজরায়েলরা আনন্দ করবে, কিন্তু তারা?

জুডিথ। উঁ (এবার জুডিথের চোখ বাহিয়া একটা ধারা গড়াইয়া পড়িল)

আরন। কাঁদো একটু জুডিথ। আজও দর্প নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকো না। দুঃখকে ছড়িয়ে পড়তে দাও।

যোশেফ ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল। আজ তাহার যোদ্ধবেশ। ম্লান আলোকেও তাহার বর্শাফলক ঝক ঝক করিয়া উঠিল

রুথ। কী হোলো যোশেফ?

যোশেফ। মোজেস কোথায়?

আরন। হোলো কী তোমার। এই তৃণহীন দেশে যুদ্ধ কার সাথে? ঠিক যেন ফ্যারাওয়ের সেনাপতিবেশে আবার ইথিওপিয়া জয় করতে চলেছে।

যোশেফ। মোজেস কোথায়?

রুথ। বলো না কী হয়েছে? ভালো লাগে না আমার।

আরন। মোজেস পাহাড়ে গেছেন, ফেরেননি।

যোশেফ। এই ঝড়ের মধ্যে পাহাড়ে —(যোশেফ পথের দিকে পা বাড়াইল)

রুথ। কোথায় যাচ্ছো তুমি।

যোশেফ। মোজেসকে নিয়ে আসি। ঝড়ে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

আরন। না যোশেফ। তোমার মতো মোজেস ভক্তের মুখে একথা শুনতে আমি রাজি নই। তুমি নিজে অন্তত জানো মোজেস নিশ্চয়ই কোথাও আশ্রয় পেয়েছেন।

রুথ। তুমি গোপন করছো কেন? কী হয়েছে বলো না গো।

যোশেফ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) এখনি ফিরে আসবো আমি, ভেবো না রুথ।

যোশেফ বাহির হইয়া গেল

রুথ। কী হবে দাদা? তোমাদের ব্যবহারে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।

আরন। ভয় কি রুথ, যোশেফ, মোজেস—সহজে এদের বিপদ হয় না, তা তুমি দেখেছ।

রুথ। এই ঝড়ের মধ্যে—চমকে উঠলে কেন দাদা?

আরন। কিছু না, ঝড়ের শব্দ।

রুথ। কিছু শোনা গেলো নাকি?

আরন। না। হয়তো শোনার ভুল।

যোশেফ পুনবায প্রবেশ কবিল। প্রবল উত্তেজনায তাহাব চোখ জ্বলিতেছে মুখেব পেশীগুলি দৃঢ় হইয়া উঠিয়া তাহাব ভ্রূকুটিকে ভযানক কবিয়া তুলিয়াছে।

কথ। যোশেফ, তুমি অমন ভযঙ্কব কবে আছো কেন? বলবে না কী হলো?

কথেব কণ্ঠস্বব কান্নায ধবিয়া গেল।
পর্বতেব ঝড়েব শব্দ ছাপাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠেব চাপা গুঞ্জনেব শব্দে এবাব স্পষ্ট হইযা উঠিল। এবং কিছুক্ষণ পবেই কযেকজন পুরুষ ইজবায়েল প্রবেশ কবিল। যোশেফেব মতো তাহাবাও যেন আজ যুদ্ধং দেহি মূর্তি ধবিযাছে। দেখিযা বুঝিবাব উপায নাই ইহাবাই সেই নিবীহ মেষপালক। সম্মুখেব কযেকজনেব পশ্চাতে আবো নাবীপুরুষেব মূর্তি দেখা যাইতেছে। সবগুলি দৃষ্টি হিংস্র। দেখিলে মনে হয ভযঙ্কব কা একটা কবিবাব জন্য ইহাবা উদ্যোগ কবিযাছে।

যোশেফ। থামো। কি চাও তোমবা?

উচ্ছৃঙ্খল জনতা এক মুহূর্ত থামিয়া বহিল তাহাব পব গর্জন কবিযা উঠিল।

জনতা। মোজেসকে চাই।

পশ্চাৎ হইতে ইহাবা সকলেই তুমুল চীৎকাব কবিযা উঠিল—মিথ্যাবাদী মোজেস।

যোশেফ। মিথ্যাবাদী? মিথ্যাবাদী?
জনতা। হ্যাঁ। মিথ্যাবাদী মোজেস, তুমি আব মোজেস আমাদেব ঠকিয়েছ।
যোশেফ। অনেক হযেছে। এবাব তোমবা যাও।
জনতা। যাবো, কিন্তু মোজেসকে না নিযে নয।
যোশেফ। অপ্রকৃতিস্থদেব প্রলাপ শুনবাব আগ্রহ আমাব নেই। তোমাদেব এখান থেকে যেতে হবে।
জনতা। জোব কবে তাড়িযে দেবাব ভয দেখাচ্ছো
যোশেফ। মূর্খদেব শাসনেব তাই নিযম।
পশ্চাতেব জনতা। ওকে, ওকে, প্রথমে ওকে নিযে এসো।
যোশেফ। ইজবাযেলেব বিরুদ্ধে দাঁড়াবাব ফল তোমবা স্বজাতি হযে দেখতে চাও। এখনো ফিবে যাও, ফিববাব সময এখনো আছে।
আবন। (সম্মুখে অগ্রসব হইযা) কী হোলো যোশেফ? কী হোলো ইজবাযেলবা। কেন তোমাদেব মোজেসকে চাই? কেন আজ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো?
জনতা। জানো। তোমবা নিজেবাই জানো।
আবন। না জানি না। আমি জানি না, ঐ কথ জানে না কি তোমাদেব ক্ষোভের কাবণ।
পশ্চাতেব জনতা। মোজেসেব ছেলে ও, বিশ্বাস কোবো না ভাইসব।
আবন। যাবা পেছনে দাঁড়িযে বযেছে, সামনে এসে মুখে মুখে দাঁড়ানোব যাদেব সাহস নেই, তাবা ইজবাযেল হওযাব অনুপযুক্ত। তুমি বলো, কেইন। আমাদেব কষ্টেব শেষ নেই জানি। চাবিদিক দিযে নানা বিড়ম্বনায় আমাদেব গোষ্ঠী আজ মবতে বসেছে, তবুও আত্মকলহ না কবে এব প্রতিকাব হতে পাবে।
কেইন। তোমাকে আমবা বিশ্বাস কববো কী কবে?
আবন। নীল নদেব বন্যা থেকে যে তোমাদেব বাঁচিযেছিলো আমি সেই আবন। বিশ্বাস কবা, না-কবা তোমাদেব হাতে।
পশ্চাতেব জনতা। তুমি, তুমিও এব জন্যে দাযী।

আরন। তোমরা সত্যি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছো। বুঝলাম, আমি দায়ী, যোশেফ-রুথ দায়ী, মোজেসও এর জন্য দোষী। কিন্তু কী দোষ, কী আমাদের অপরাধ, তাও বলবে না!

পশ্চাতের জনতা। ভয় পেয়েছে, ওর মিষ্টি কথায় ভুলো না।

কেইন। তোমাকে দোষী করতে আমরা আসিনি। আমরা মোজেসের বিচার করতে এসেছি।

যোশেফ। বিচার? এতবড় স্পর্ধা তোমাদের মোজেসের বিচার করবে?

পশ্চাতের জনতা। হ্যাঁ, তাই করবো আমরা।

আরন। আঃ, থামো যোশেফ। শোনো ইজরায়েলরা, মোজেসের অপরাধ না-বলতে চাও, নাই বললে। জানি, অপরাধ তাঁর হয় না। তবুও যদি কিছু তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে থাকে, তার প্রতিকার তিনি নিজেই করবেন। কিন্তু বাইরে এই ভয়ানক ঝড়, এই তাণ্ডব এর মধ্যে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো আগে। বিচারের সময় পরেও পাবে।

কেইন। বাঁচবার চেষ্টা বৃথা। তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা ফ্যাবাও-এর রাজ্য ছেড়ে এসেছি, তোমাদের কথায় বিশ্বাস কবে আমাদের নীলনদের সাথে শত্রুতা করেছি। আর এখন আমাদের পাযেব নিচে সর্বনাশ। সবশুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সর্বনাশে যেতে হ'লেও তোমাদেরই আগে যেতে হবে। কি বলো, সেই তো নিয়ম।

দিনের পর দিন আমরা কষ্ট সহ্য করেছি। জল নেই, আহার নেই। তবু আমরা তোমাদের পর বিশ্বাস রেখে চলেছি। আর আজ? মোজেস বলেছে, বৃষ্টি হবে? আর আজ এই ধুলোর ঝড়ে আমরা সবাই মরতে বসেছি। যা জানে না, যা তার সাধ্যের বাইরে তার মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই মরবো। নীলনদের অভিশাপ এড়াতে পারব না, কিন্তু তার আগে, তোমাদের সুখের পথও বন্ধ করে যাবো।

আরন। কিন্তু মোজেসের বিরুদ্ধতা করার ফল যে ভালো হয় না, এ তো তোমরা বহুবারই দেখেছো। আর তা যদি মনে না-থেকে থাকে, তবে একবার জুডিথকে চেয়ে দেখ। জুডিথকে নিশ্চয়ই তোমরা ভোলোনি। রূপে, ঐশ্বর্যে, বুদ্ধিতে দ্বিতীয় গোষ্ঠী রচনা করার ক্ষমতা ছিলো যার, এই সেই জুডিথ। আজ ওর দুর্দশা শুনে তোমাদেরও চোখের পাতা ভিজে উঠবে।

ও তোমাদের মতোই মোজেসের কথা না-শুনে বহুলোক নিয়ে যাত্রা করেছিলো, কিন্তু কী নিয়ে ফিরে এসেছে দ্যাখো। কোথায় ওর তেজ, কোথায় ওর দর্প।

জনতা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া জুডিথের দিকে চাহিল।

পশ্চাতের জনতা। আর আমরা? আমরা যারা যাইনি?

আরন। তোমাদেরও কষ্ট হয়েছে। কিন্তু উপায় কি বলো...

নেপথ্যে—উপায় আছে। জনতা শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বিস্মিত হইয়া চারিদিক চাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে জনতার পশ্চাদ্ভাগে একটা কোলাহল উঠিল। কৌতূহল লইয়া সম্মুখের জনতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মোজেস প্রবেশ করিলেন। জনতা দুইভাগ হইয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। বাহিরের প্রাকৃতিক তাণ্ডব, জনতার বিক্ষুব্ধ ক্রোধ, কিন্তু মোজেসের মুখের অবিচল শান্তিতে এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার আপাদমস্তক ধূলি-আচ্ছন্ন। শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রুতে ধূলি লাগিয়া ধূসর হইয়া উঠিয়াছে।

জনতা পূর্বাভ্যাসবশত একমুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই স্তব্ধতার অবসরে বাহিরের দুর্যোগের শব্দ এবার আরো প্রবল হইয়া শোনা গেল। রুথ ছুটিয়া আসিয়া মোজেসকে জড়াইয়া ধরিল।

মোজেস। কী ব্যাপার—কী রে রুথ। তোরা সবাই এমন সাজগোজ করে কোথায়?

রুথ। বাবা, ওদের সাথে তুমি আজ কথা বোলো না। ওরা তোমায় অপমান করতে এমন দল বেঁধে এসেছে।

মোজেস। অপমান? (নিঃশব্দে হাসিলেন) না রুথ। তাদের কোথায় ভুল হয়েছে। ছেলে কখনো বাপকে অপমান করতে পারে।

যোশেফ। অথচ তাই এরা করতে চায়? ভেবেছে মোজেস বুড়ো হয়েছে, তাই এত সাহস। জানে না, ইথিওপ-জয়ী যোশেফ এখনো তার বল্লম ত্যাগ করেনি।

মোজেস। (তথাপি হাসিয়া) সে কি? বাইরে এই মরা বাঁচা নিয়ে খেলা চলছে, আর তোরা ঘরে বসে এইসব করছিস নাকি? ও কে, জুডিথ না? ফিরে এসেছিস? আহা, কত মানা করলাম তখন শুনলি নে।...হ্যাঁ, ইজরায়েলের ছেলেরা, বলো তোমাদের কি বলবার আছে? মনে হচ্ছে কিছু না-বলে তোমরা থামবে না।

কেইন। আমরা জানতে চাই আমাদের দুঃখের জন্যে দায়ী কে?

মোজেস। আমরা নিজেরাই।

কেইন। আমরা নয়, তুমি, তুমি মোজেস। মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে আমাদের এর মধ্যে টেনে এনেছ। তার কৈফিয়ত দিও।

মোজেস। থামো যোশেফ, অত উতলা হয়ো না। শোনো কেইন, শোনো ইজরায়েলের ছেলেরা—আমাদের এই দুঃখের জন্যে আমাকে দায়ী করে যদি তোমরা সুখী হতে আমার আপত্তি ছিলো না। কিন্তু এসবের উত্তর যদি তোমরা একদিন নিজে থেকে না পাও, আমি দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকবো। কিন্তু আজ নয়। দেখতে পাচ্ছো, এ তাঁবুর দড়িও কেঁপে কেঁপে উঠছে। এর মানে কি বুঝতে পাবো? নিজেদের তাঁবু ছেড়ে আসবার সময় বুড়ো মোজেসের ক্ষতি করার ইচ্ছাই তোমাদের বড়ো হয়েছিলো, অন্য কিছু ভাববার সময় ছিলো না। কিন্তু এখানে জটলা না-করে নিজেদের সর্বস্ব বলতে যা আছে বাঁচাবার চেষ্টা করলেই ভালো করতে।

নিচের সমভূমিতে একবার তাকিয়ে দেখলে ভালো করতে। কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই। সব গেছে। এই বালির ঝড়ে তোমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। তবু প্রাণ আছে।

জনতা একবার ফিরিয়া চাহিল।

—দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো তোমরা? ওদিকের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা প্রচণ্ড বাতাসে তাঁবু কাঁপিয়া উঠিল। শব্দ একটু কমিলে মোজেস আবার বলিলেন

মোজেস। বালির মরুভূমি সমুদ্রের মতো খেপে উঠেছে। সমুদ্রে জোয়ারের মতো সমুদ্রের সব গ্রাস করছে। কিন্তু এখানেও আর নিরাপদ নয়।

আরন। বাঁচবার কি কোনো পথই নেই?

মোজেস। হাল ছেড়ে দিলে তো উপায় হয় না আরন। কিন্তু আমার আর দেরি করারও সময় নেই। যে ক'জন ইজরায়েল অবশিষ্ট আছে, তাদের নিয়ে বাঁয়ের উৎরাই দিয়ে যত শিগগির পার সিনাই এর আড়ালে পালিয়ে যাও। এর এপারের পৃথিবী আজ বোধ করি ধ্বংস হয়ে যাবে।

জনতা উন্মত্ত অবস্থায় নিজেদের বিপদের কথা বুঝিতে পারে নাই। এইবার বুঝিবামাত্র ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেল।

মোজেস। যোশেফ, তোমার ভেরি বাজাও। ঝড়ে হয়তো শোনা যাবে না। হয়তো তার উত্তর দেবার মতো আজ আর কেউ অবশিষ্ট নেই, তবু একজনও যদি শুনতে পায়।

তাঁবুর সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আশ্চর্য আরন, আমার এই এত বয়সেও এত বড়ো ভয়ঙ্কর জিনিসের কথা শুনিনি। বালির ঢেউ তাঁবুর সমান উঁচু হয়ে জলের মতো গড়িয়ে আসছে।

মোজেস তাঁবুর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রুথ। (আর্তকণ্ঠে) তুমি কোথায় যাচ্ছো, বাবা?

মোজেস ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মোজেস। একবার দেখতে হবে মা, সত্যি কি মৃত্যু ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তবু আমার জানতে ইচ্ছা করছে বৃষ্টি হবে কিনা। আমার সবই কি আগাগোড়া ভুল হয়ে যাবে? শুধু কি ধ্বংসের জন্যেই এই বাতাস এসেছে?

রুথ ও আরন। তুমি যেয়ো না।

মোজেস। (হাসিয়া তাহাদের মিনতি এড়াইয়া গেলেন) শোনো ইজরায়েলরা, যদি ফিরতে আমি না-পারি, আমার চাইতেও শক্তিমান নেতা তোমাদের রইলো।

অর্ধপথে আবার ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন

আর যোশেফ, তোমার সজ্জা আজ উপযুক্তই হয়েছে। দলের কেউ যদি অবাধ্য হয়, পাহাড়ের আড়ালে যেতে রাজি না-হয়, তখন তোমার ইথিওপ জয়ী বল্লম ব্যবহার করতে কার্পণ্য কোরো না।

মোজেস বাহিরের আঁধিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।
কয়েক মুহূর্তের বিরতি। প্রবল বাতাসে তাঁবু উড়াইয়া লইয়া যাইবার মতো হইল। দেখা গেল ইজরায়েলরা আরনের চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যোশেফ ভেরি লইয়া প্রাণপণে আঘাত করিতেছে। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টায় যে শব্দ উঠিল তাহা ঝড়ের তীব্র শব্দে ঢাকিয়া গেল। তাহার ভেরির শব্দের উত্তর দিবার মতো হয়তো কেহ ছিল না। শুধু একজন অর্ধমৃত ইজরায়েল পুরুষ টলিতে টলিতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল।

আরন। (নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া) এবার প্রস্তুত হও সবাই। যেতে হবে। রুথ, জুডিথের হাত ধরে নাও, আমার পাশে পাশে থেকো। যোশেফ, তুমি আর-সকলকে নিয়ে এসো।

কেইন। না-না। আমরা বাইরে যাবো না। (আর্ত, ভীতকণ্ঠে)।

আরন। ছিঃ। এই সাহস নিয়ে মোজেসের কৈফিয়ত নিতে চেয়েছিলে, কেইন। যোশেফ, তোমার বল্লম সঙ্গে রেখো। ওটা সত্যি কাজে লাগবে মনে হচ্ছে।

এইবার দমকা বাতাসে তাঁবুর একদিকের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়া সেদিক নিচু হইয়া পড়িল

আরন। সবাই প্রস্তুত? আমরা রওনা হচ্ছি। পেছনে এসো।

আরন জুডিথ ও রুথের হাত ধরিয়া তাঁবুর দরজার দিকে পা বাড়াইল।

রুথ। একটু দাঁড়াও, দাদা। দম নিতে পারছিনে বাতাসে।

আরন এক মুহূর্ত থামিল। তাহার পর আবার যাইবার জন্য পা বাড়াইল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কাছে কোথাও বজ্রপাত হইয়া গেল। তাহার তীব্র আলোকের শিখায় অন্ধ হইয়া অগ্রবর্তী দল পিছাইয়া আসিল।

আরন। কী ভয়ানক।

জনতা। আমরা যাবো না। মোজেস অভিশাপ দিচ্ছে। দোহাই আরন, আমাদের বাইরে নিয়ে যেয়ে মেরে ফেলো না।

আরন। না, যেতে হবে। এখানে একজনও বাঁচবো না। এসো।

আবার বজ্রপাতের পুনরভিনয়। এবার বিদ্যুৎ শিখা অবিরত জ্বলিয়া জ্বলিয়া দীর্ঘকাল স্ফূর্ত হইয়া রহিল।

যোশেফ। এ অসম্ভব, আরন। রুথ বোধ হয় মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

আরন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না? (ম্লান হাসিয়া। রুথ মরণাচ্ছন্নের মতো আরনের বুকে লুটাইয়া পড়িয়াছিল) ওঠ দিদি, মোজেসের মেয়ে তুই।

পশ্চাতের জনতা। পাহাড় জ্বলে উঠেছে। মোজেসের অভিশাপ। আমরা সবাই পুড়ে মরবো।

প্রথমে আরন, তারপর যোশেফ ফিরিয়া চাহিল। [illegible] দরজা দিয়া সিনাই পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়, সেদিক আলোয় আগুনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যতদূর দেখা গেল মনে হইল আকাশ হইতে অগ্নিশিখা পাহাড়ের চূড়ার উপর নামিয়া আসিয়াছে, তার সেই শিখায় সমগ্র পাহাড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

যোশেফ। (সহসা) আরন, দেখেছো, দেখেছো।

আরন। কী?

যোশেফ। আগুনের মধ্যে কে একজন মানুষ।

আরন ফিরিয়া চাহিল। সেই মুহূর্তে আলোক নিভিয়া গেল।

জুডিথ। মানুষ? (আশঙ্কায় গলা কাঁপিয়া গেল)

যোশেফ। মোজেস নিশ্চয়ই নিরাপদ জায়গায় আছেন।

আবার বজ্রপাত। আবার সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সহসা আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। আরন, যোশেফ, রুথ, জুডিথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

যোশেফ। দেখছো, আরন।

আরন। মোজেস বলে মনে হচ্ছে (আশঙ্কায় তাহার স্বরও কাঁপিয়া গেল)

যোশেফ। ভালো করে দ্যাখো তো। হায়, হায় এ কী করলেন মোজেস!

পশ্চাতের জনতা। (সহসা) জল, জল, জল, জল হচ্ছে—বৃষ্টি।

আরন যোশেফ আদি তাহাদের চিৎকারে বাহিরের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

জনতা। আরন, বৃষ্টি হচ্ছে। জল অনেক—

জুডিথ। বৃষ্টি? জল?

তাঁবুর একপাশ দিয়া জল ছিটিয়া আসিতে লাগিল।

জনতা। জল—এবার বাঁচবো। সবাই বাঁচবো।

আরন। রুথ, মুখ তোল, দ্যাখ বৃষ্টি হচ্ছে।

রুথ মাথা তুলিতে পারিল না, শুধু একটু ক্ষীণ হাসি তাহার মুখে। চারিদিকে আবার বজ্রপাতের শব্দ। আবার সিনাই পাহাড়ের চূড়া বিদ্যুতে ভরিয়া তীব্র আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যোশেফ। দ্যাখো, দ্যাখো।

আলোকে দেখা গেল, একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর মূর্তিটি ধীবে ধীবে জানু পাতিয়া ঊর্ধ্বে দুই বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল যেন কাহাকে হৃদয় ভরিয়া ধন্যবাদ দিতে, তাহার ভাব ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যোশেফ। বেঁচে আছেন। মোজেস বেঁচে আছেন, আরন।

জনতা। মোজেস!

আরন। হ্যাঁ, ইজরায়েলের ছেলেরা, মোজেস। দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো।

জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। একটা বিচ্ছুবিত আনন্দ তাহাদেব মধ্য দিয়া ঢেউ তুলিযা গেল। কিন্তু অদ্ভুত অলৌকিক ইহার সম্মুখে তাহারা ভীত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইযা বহিল। বাহিবে ঝড়েব গর্জনেব সহিত মুষলধারায় তখনো বৃষ্টি হইতেছে।

রচনাপ্রসঙ্গ

লেখা অত্যন্ত সুখের। আমার দরকার তিনটে জিনিসের—তায়গাটা, মানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন, অর্থাৎ আমার ভাঙা চেয়ারটা। আমার গায়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে। যখন আমার পায়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার মস্তিষ্ক সজাগ, তখন কাগজ আর কলম চাই, আর কিছু চাই না। আমি রাত্রিতে লিখি না'। আবার, অন্যত্র আসলে লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিলো নিজেকে বাঁচানোর তাগাদায়। কলেজি আবহাওয়ায় মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু লেখা first love হবে তা ভাবিনি। বর, পড়া। ১৯৪৩-এ গিয়ে মনে হলো লিখলে কী হয়। এই ভাবতে ভাবতে লেখা শুরু হলো। এখন লিখি নিজের সুখের তাগিদে। সে যে কী intense delight তা কী করে বোঝাবো'।

সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে এভাবে বিবৃত করেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার বারেবারেই। কিংবা এমন বলেছেন 'আমি লিখি তার অর্থ এই নয়, আমার সাবকনসাস আমাকে লেখায়। I m forced to dream I consciously create dreams—সেটাই আর্ট সে অনির্বচনীয় তায় আশ্রয় পায়। এই অনির্বচনীয়তাই মানুষ মানুষকে কেউ expl ain করতে পারে না। সে একটা রাব্য।

নিজের কথা। লাল নক্ষত্র, ১০ বর্ষ ২০ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, ২০০১-এ পুনর্মুদ্রিত 'উজ্জ্বল উদ্ধার পুস্তিকামালায়

নানা আলাপচারিতায়, সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ আত্মপ্রসঙ্গে বারেবারে বলেছেন। নিজের কথা র আগে 'আমার সম্বন্ধে' প্রকাশিত হয় কৌরব পত্রিকার ২৫ সংখ্যায়, ১৯৭৯ তে। তাই, অরুণেশ ঘোষ কথিত 'যদ্দুর জানি অমিয়ভূষণ আত্মজীবনীমূলক কোনো রচনা লেখেননি'—এই দাবি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না কবিতীর্থ পত্রিকার ২০ বর্ষ ৩২, আশ্বিন ১৪০৮ (অমিয়ভূষণের মৃত্যুর পর) সংখ্যায় ১ ৯ ২০০১ তারিখে অরুণেশ ঘোষ স্বাক্ষরিত সাক্ষাৎকার অমিয়ভূষণ এ বিস্তারিত জানা যায় অবশ্যই। রচনাসমগ্রের অন্যতম উৎসসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে তবুও এই সাক্ষাৎকারের আগেই অমিয়ভূষণ বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতায় আত্মপ্রসঙ্গ র কথা বলেছেন।

উপন্যাস

'তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ মজুমদারই এমন একজন লেখক যিনি বহুবিধি কোণ থেকে জীবনকে দেখতে জানেন। তাঁর রচিত গল্প ইতিপূর্বে সাহিত্যপিপাসুদের তৃপ্তি দান করেছে। 'গড় শ্রীখণ্ড' তাঁর প্রথম উপন্যাস। আমাদের আশা আছে- এ রচনাটিও তাঁকে বাংলা উপন্যাসের আসরে একটি সম্মানের আসন দান করবে'।

পূর্বাশার জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ১৬ বর্ষ ২ সংখ্যা থেকে গড় শ্রীখণ্ড ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কালে লেখক পরিচিতি হিসাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন।

গড় শ্রীখণ্ড পূর্বাশায় ১৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ থেকে ১৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন চৈত্র ১৩৬১ সময়সীমায় প্রকাশিত হয়। মাঝে ১৭ বর্ষ ৬ সংখ্যায় মাত্র প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের তথ্য

গড় শ্রীখণ্ড। কলকাতা নাভানা, ১৩৬৩ ১: ৭৭। দাম আট টাকা। পৃষ্ঠা ৬৯০

প্রচ্ছদচিত্র পূর্ণেন্দু পত্রী।

উৎসর্গপত্র : 'আমার সব চাইতে পরিচিত পুরুষ-চরিত্র/বাবাকে উৎসর্গ করলাম'।

সংস্করণ

কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭। দাম : ষাট টাকা। পৃষ্ঠা : আট + ৫৪২

প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন।

অরুণা প্রকাশনীর গড় শ্রীখণ্ড-এর একেবারে শেষের দিকে লেখক সংযোজন করেন, যা-কিনা নাভানা সংস্করণে ছিল না। বর্তমান রচনাসমগ্রে লেখকের জীবিতকালে শেষ সংস্করণ অর্থাৎ ১৯৮৭ অরুণা সংস্করণের ভিত্তিতে। যে অংশটুকু সংযোজিত হয়েছে, শেষের কয়েকটি প্যারাগ্রাফ আগে, যেখানে ইয়াজ বলছে—'ওঠো, সুরো, চরণকাশির বড় সেখের বাড়িত কিছু খাবের পাওয়া যায় কিনা দেখি', তারপরের অংশটুকু :

> সুরো বললো, 'তা যেন দেখবা, সে, কোন দ্যাশ? দ্যাশ না ভাগ হইছে? আমরা না মোছলমান'?
>
> ইয়াজ বললো, 'হয়! সুরো সান্দারনি এক মোছলমান, আমুও আর-এক হেঁদু। ফতেমোকে আম্মা কতাম, বাপ কেডা জানি নে। এই না চরণকাশি'।
>
> সুরতুন কাদামাটিতে আধশোয়া ভঙ্গিতে পা ছড়িয়ে বসেছিলো। তাদেব কিছুদূরে একটা ছোটো বেতের কুনকে কাদায় আধডোবা। কোনো গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভেসে এসে থাকবে। কী করে তার তলায় কয়েকটা কলাই আটকে ছিলো। ঘোরের মধ্যে সুরতুন দেখলো সরু সাদা সাদা কিছু সেখানে, কীট যেন, কল যেন। তার ভয়-ভয় করলো।
>
> ইয়াজ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। দূরে চিকন্দির সান্যালবাড়ির উল্টানো পিরিচের মতো চূড়াটা চোখে পড়লো। সে বললো, দ্যাখো'।

আমরা সাময়িকপত্রের প্রকাশকাল অনুসারে 'রচনাসমগ্রে'র বিন্যাস করতে চেয়েছি। সে-কারণেই গড় শ্রীখণ্ড প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হল। এই খণ্ডে 'নিজের কথা' দেখুন।

বাংলা উপন্যাসে গড় শ্রীখণ্ড অন্যতম আলোচিত। উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক নানা পত্রপত্রিকায় বলেছেন। সে-সমস্ত থেকেই নির্বাচিত অংশবিশেষ :

১

আমার নীল ভুঁইয়া, গড় শ্রীখণ্ড বই দুখানি প্রকাশক গোপালবাবুর উদ্যোগেই agreement হয়। তার আগে আমি নভানার নামও জানতুম না।

২

. .ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে নাভানার বিরামবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ধূর্জটিবাবুও তখন ক্যানসারে আক্রান্ত। ধূর্জটিবাবুর আমার লেখা ভালো লাগে জেনেছিলাম। আমি এরকম জানতে পেরেছিলাম আবু সয়ীদ আইয়ুব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় আমার লেখা গল্প উপন্যাস পড়েন এবং তাঁদের তা বিশেষ ভালো লাগে। অন্যদিকে নাভানার বিরামবাবু আমাকে বলেছিলেন তাবৎ বাংলার রসিক চূড়ামণি রাজশেখরবাবু নাকি আমার 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'কী ভাষা! পড়া যায় না'। সত্যতা আমার জানা নেই। বিরামবাবু যদি এখন বলেন 'না' তবে সাপের বিষ নেই।... তবে কারো ভালোমন্দ লাগায় আর-কিছু এসে যায় না তখন শচীন সেনগুপ্ত মশায় এক দীর্ঘ পত্রে 'গড় শ্রীখণ্ডে'র সম্বন্ধে এমনসব লিখেছিলেন যে তাতে উৎসাহ হয় বটে।

৩

আমার 'গড় শ্রীখণ্ড'তে যে- ডায়ালগ দেওয়া আছে, মনে হবে পাবনার ডায়ালেক্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা পাবনার নয়।

৪

যেমন গড় শ্রীখণ্ডের শেষে সুরতুন। সুরতুন তো প্রেমে পড়ার মুখেই ছিলো, তার অবচেতনে একটা ভয় ছিলো পুরুষের প্রতি—সেই জন্যে যাকে ভালোবাসতো সেই মাধাই বায়েনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারলো না। কিন্তু ইয়াজ তাকে তাকে উইন করছে কীভাবে? চ'লো আমি তোমাকে তোমার প্রেমিকের কাছে নিয়ে যাবো, মাধাই বন্যায় ডুবে যেতে পারে, তুমি একলা যেতে পারবে না—এই বলে তার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে বন্যার জলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় সে-ও তো যুবক, সে-ও তো সুরতুনকে কামনার চোখে দেখে এসেছে—যেহেতু ঠিক জীবনের পরিপোষক নয়, সে মরবিড হয়ে গেছে, সেখানে জীবন ইয়াজের চেহারা নিয়ে সুরতুনকে ফিরিয়ে এনেছে। তারা ফিরে আসছে। যে-চরে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে আদিগন্ত সেই চর থেকে জল সরে গেছে, শুধু কাদার পাথর, কিছু দেখা যায় না। শুধু দেখা যাচ্ছে, চরণকাশির আলেফ সেখ—তারও তো কলকাতার দাঙ্গায় ছেলে গেছে, যে-ছেলে জীবনকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছে : ডাক্তার ছিলো, ফুটপাথে রোগী পড়েছিলো, তুলে আনতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। তা, সেই আলেফ সেখ এই বন্যা-ছেলের মৃত্যু-দেশভাগ-রাজনীতি কিছু ভাবছে না : সে লাঠি হাতে দেখছে উপরে যে-বালি পড়েছে তার কত নিচে পলিমাটি, অর্থাৎ পলিটা সরিয়ে সে চাষ করবে—এই দেখছে। এই দেখে সুরতুনকে ইয়াজ বলছে যে আমি আমার কাপড় থেকে আর-একটু ছিঁড়ে দি, তুই গায়ে জড়িয়ে নে। ওই দ্যাখ আলেফ সেখ, মনে হয় ওর কাছে গেলে কিছু খাবার পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সেখানে কী' জীবন সৃষ্টি হচ্ছে সুরতুনের মধ্যে—প্রতিষ্ঠা করছে ইয়াজ। দেখছে, এই লাইফটা আমরা হাতে পেয়েছি, দ্যাখো ওই মসজিদটা। এবং সে সময়ে লেখকের একটা কথাই মনে হয়, সেটা হচ্ছে, উপরে মেঘ ডাকছে, পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে। পদ্মাকে বলছে : হে কাল—পদ্মা যেন কাল, কালের প্রতিমা—তুমি দয়া করো। এই যে কালপ্রবাহ, পদ্মার মতো এদিক-ওদিক টার্ন নিচ্ছে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, বুঝতে পারছি না এর মধ্যে ক্যারাকটার তৈরি হয়ে গেছে। তাই কাল, তুমি দয়া করো, অর্থাৎ ধ্বংস কোরো না। জীবনে যারা সবচাইতে বঞ্চিত, সেই শ্রেণী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তুমি দয়া করো। ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে আমরা জীবনের আয়োজন করছি—এটা কিন্তু চিরস্থায়ী, কালকে সারপাস করে যাচ্ছে।

৫

এখানে আমার রচনা সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। চোখে ব্যবহার দেখে, কানে কথা শুনে যে মনকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা হয়, মন তার চাইতেও অনেক গভীরে ক্রিয়াশীল, সুতরাং সেই ক্রিয়াকর্মও উপন্যাসে ছড়াতে থাকে। মানুষকে অর্ধেকের চাইতে বেশি আঁকতে গেলেই তার অবচেতন, নির্জ্ঞান, প্রাক্-মুখর মনকেও আঁকতে হয়। আমার এরকম বিশ্বাস আছে, নানা কারণে যেমন প্রাকৃতিক প্রভাব, ডি এন এ, সামাজিক বিবর্তন এগুলির সামান্যর ফলে কৌমগত অবচেতন থাকা সম্ভব। আমার এ মশ এরকম প্রত্যয় হয়েছে, আমাদের এক কৌমগত ইড/লিবিদো আছে যার নাম মনসা। অনেকদিন আগেই, তার অস্তিত্ব অনুভব কর তার নাম দেয়া হয়েছে। আর আমরা তা স্বীকারও করেছি বলে, সে মিথেও স্থান পেয়ে গিয়েছে। এই মনসা সকলের মধ্যে, তা স্বীকৃত। কৌমগত অবচেতনের এক শক্তিমতী অংশ সে, বিষময়ী ও বিষহারিণী। সে কাম-রতি ও আদিজননী। তার পূজায় Psycho-analysis-এর চাইতে ভালো ফল দেখা যায় কিনা, তা অন্যসময়ে আলোচনা করা যাবে। বুদ্ধিতে যখন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সেভাবে পথ খুঁজতে গিয়ে যখন বার বার প্রতারিত হতে হয়, যখন বিশুদ্ধ চেতনার চাইতে আবেগকেই পথ প্রদর্শক স্বীকার করতে হয়, সচেতন মন তো তখন নিঃসাড়, তখন হয়তো মনসার উপরেই সকলে নির্ভর করে, তার সেই বিষহারিণী অতুল শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এমন বলা যেতে পারে, সেই তো পাতালের শিকড়। সুতরাং গড় শ্রীখণ্ডের মতো হতাশ পরিস্থিতিতে, সেই মনসা যে কোনো বাঙালির মনে এসে যেতেই পারে। তাহলেও কিন্তু, এই মিথ যাতে আমাদের অবচেতনের স্বরূপ অনেকটা প্রকাশিত তাকে ইচ্ছে করে আনা যায় না। রামচন্দ্রর স্ত্রীর নাম সনকা, সান্যালবাড়ির আদরিণী কন্যার নাম মনসা, বা এক গ্রাম্য মেয়ের নাম পদ্ম, পদ্মাপারের উপন্যাসে এগুলো অতর্কিতে এসে গিয়েছে। গড় শ্রীখণ্ডের ভিশনের অংশ হিসাবে এসে গিয়েছিলো। মৃত্যুকে জয় করার অন্য উপায় ছিলো না, কি সান্যালরা, কি রামচন্দ্ররা—জাতিটাই তো লোপ পেতে বসেছে,

এমনটা হয়তো আমার নির্জ্ঞান মনও উপলব্ধি করেছিলো। তারই ফলে ভাষার পূর্বে যার অস্তিত্ব সেই মনসা (মনঃ স্বার্থে টাপ) কখনো নদী হয়ে, কখনো কেষ্টদাসের শেষ পক্ষ হয়ে, কখনো বা সান্যালদের আদরিণী কন্যাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপন্যাসে ছড়িয়েছে। উপন্যাস ছাপা হয়ে হাতে এলে আমিও অবাক—এইভাবে শিকড় খোঁড়ার চেষ্টা হয়েছে তাহলে।

এখন, এতে পাঠকের নান্দনিক চেতনা বিস্তৃত হয় কিনা, তার নান্দনিক আনন্দ ভাষাহীন গভীরতায় পৌঁছায় কিনা, তা অবশ্যই আমার বিচারের বিষয় ছিলো না। এটা বরং একটা প্রমাণ কৌমগত অবচেতনের, যে ক্রমশ রামচন্দ্র সুবতন মাধাইদের হয়ে কেঁদে কেঁদে যখন মনের গভীর অন্ধকারে ডুবে খুঁজছি, তখন কৌমগত অভ্যাসেই, পদ্মা তো চোখের বাইরেও ভয় দেখিয়ে ভালোবেসে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিতই, তখন হয়তো আমার নির্জ্ঞান মন অবচেতনের সেই দারুণ শক্তিকে খুঁজে পেয়েছিলো। নতুবা গড় শ্রীখণ্ড, অবশ্যই, চাঁদবেনের গল্পের আধুনিক রূপ নয়।

গড় শ্রীখণ্ড প্রকাশের কি লেখার আগে—প্রকাশের আগেই তো—অন্তত দুটি সূত্র জানা যায় যা কিনা উপন্যাসের মানুষজনদের নিয়ে উত্তর-গড় শ্রীখণ্ড পাঠ। কিন্তু এ দুটি সূত্র উপন্যাসের সময়কালকে ধরে পরবর্তী সময়ের আখ্যান। সূত্র দুটির একটি 'সান্যালদের কাহিনী' এই খণ্ডে প্রকাশিত, অপরটি 'উদ্বাস্তু'—যার সম্পূর্ণ অংশ এখানে তুলনামূলক পাঠের জন্য মুদ্রিত হল। এই খণ্ডে 'সান্যালদের কাহিনী'র রচনাপ্রসঙ্গে লেখকের ভাবনায় বলা হয়েছে, আসলে যা 'উদ্বাস্তু'তে লেখকের মন্তব্যের নির্বাচিত অংশ। 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৬৯-এ, গ্রন্থের ভূমিকায় অমিয়ভূষণ লিখেছিলেন। রচনাসমগ্রের পরবর্তী যে-খণ্ডে 'উদ্বাস্তু' মূল পাঠ হিসাবে ফিরে আসবে সেক্ষেত্রে রচনাপ্রসঙ্গে যথাযথ তথ্য পরিবেশিত হবে। বর্তমানে 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার জন্যই প্রাসঙ্গিকবোধে সংযোজিত হল।

রামচন্দ্রের দলটা কলকাতার কাছে এই সহরের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সব যাত্রীদলের যা হয়েছে—শেষের পোয়া পথটুকুতে তেমনি এদেরও অনেকে ভেঙে পড়েছে, অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে চলেছে ক্ষতদীর্ণ পা নিয়ে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে রামচন্দ্রের ছোটো দলটিকে একা চলতে হয়নি, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব থেকে আগত ধূলিমলিন পূতিগন্ধি কালো কালো মানুষের ছোটো ছোটো দল একত্রিত হয়েছে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, সবাই এগিয়ে এসেছে দক্ষিণে।

সহরের প্রান্ত থেকে এ বাড়িটার কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে তাদের একদিন লেগেছিলো, সকাল থেকে রাত দশটা প্রায়। বাড়ির সামনে কারা একটা কুপি জ্বেলে রেখেছিলো। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখলো তাদের মতোই, শুধু যেন একটু কম পরিশ্রান্ত, একদল সর্বহারা ঘর-বারান্দা আঁকড়ে ধরে দম নিচ্ছে। কিছুক্ষণ তারা দাঁড়ালো, তারপর তারা বসে পড়লো ফুটপাতের উপরে ; তারায় ভরা আকাশের নিচে গোল হয়ে আর-একটি রাত্রি যাপনের জন্য।

তারপরে নিদ্রা এলো। ফুটপাতের এক প্রান্তে শুয়ে পড়বার আগে রামচন্দ্র বললো— 'হে ভগোমান, তুমি আমাকে বাঁচালে, কোনো গুণই নাই আমার, তবু বাঁচালে'।

রামচন্দ্র যা কথায় প্রকাশ করতে পারলো না শিক্ষিত লোকের মুখে সে-মনোভাবটি হয়তো ঋকের মতো অপৌরুষেয় হয়ে উঠতো।

এখন হয়েছে কি, বাংলা দেশে চিকন্দি নামে যে-একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এই মানুষগুলির এর আগে খানিকটা করে জমি, একটা করে বাড়ি ছিলো। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পিঠের ছোটো পুঁটলিতে যথাসর্বস্ব, চোখের কোলে

কালি ও জল নিয়ে এরা গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়েছিলো। ধুলোর ঝড়ের মুখে পড়ে ঘরফিরতি ভেড়াগুলির শুধুমাত্র থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে যেমন নির্বাক আর্ততা প্রকাশ পায়, সম্মুখের অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ ও পিছনের ভয়ের মাঝখানে এদের দাঁড়ানোর মধ্যেও তেমন কিছু ছিলো। সম্মুখে, বরং একটু বাঁয়ে, দাম্ভিক রামচন্দ্রের বাড়ি। গত রাত্রির এক পশলা বৃষ্টিতে উপরের মসৃণ গোবরমাটির প্রলেপ ধুয়ে গিয়ে নিচের কাদামাটির প্রলেপ বেরিয়ে পড়েছে ; হঠাৎ কী করে ক্ষত মুখের কথা মনে পড়ে যায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখছিলো, জেলেদের চর পড়ে আছে। জেলেদের আশ্রয় বলেই পদ্মার এই চরটির এই নাম। নৌকা নেই, জলপ্রাণী নেই, সূর্য এইমাত্র ডুবে গেছে ; বিষণ্ণ একটা কপিশ কালোয় লেপে যাচ্ছে, খুব মনোযোগ করলে হয়তো-বা একটানা একটা জলের শব্দ কানে আসে। জেলেরা এর আগেও এসেছে, চলেও গেছে। মাছের স্রোতের উপরে তাদের আসা-যাওয়া নির্ভর করে, কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ করে, এমন কলিজা গুঁড়িয়ে তারা যায় না কখনো। আর কলিজা এদের গুঁড়িয়ে গেছে এক আঘাতে নয়, বার বার একটির পর একটি আঘাত এসে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এরা কেঁদেছিলো হাহাকার করে, বুক চাপড়ে, মাটিতে মাথা কুটে কুটে ; গ্রামের কয়েকটা পাড়া জনশূন্য হয়ে গিয়েছিলো, সেগুলি আর ভরে ওঠেনি। রামচন্দ্রের বাড়িতে একটা বড়ো রকমের অঘটন ঘটেছিলো। তার মেয়েটা বোধ হয় তার মতো শক্তজাতের ছিলো না, শুকিয়ে শুকিয়ে সে একদিন ঝরে গিয়েছিলো। সংখ্যায় তারা অনেক কমে ছিলো বটে, আরো একটা পুরুষ ধরে যেন বয়েসের একটা পর্যায় ডিঙিয়ে বৃদ্ধ হয়েও পড়েছিলো, কিন্তু দেখতে দেখতে কৃষকরা তাদের বাপ ঠাকুরদাদের মতোই দুর্ভিক্ষের চোটটা সামলে নিয়েছিলো।

কৃষকরা জানতে পারেনি এবারকার দুর্ভিক্ষটা অন্য অন্যবারের মতো নয়। রামচন্দ্রের মতো চাষীরা যখন মুঙলার মতো জামাইকে বুকে চেপে ধরে কন্যার শোকটাও ভুলতে যাচ্ছে তখন এলো দাঙ্গা। খবর এলো নদীর ওপার পর্যন্ত এসেছে ; শিশুদের বল্লমের ফলায় বিঁধে মারছে, মায়েদের বুক কেটে নিচ্ছে শিশুদের মুখ থেকে ছাড়িয়ে, লোহার খিল হাতুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে অল্পবয়সী মেয়েদের উরুতে।

ফুটপাতের শয্যায় একটা অব্যক্ত কান্না নিয়ে উঠে বসলো রামচন্দ্র। কিন্তু চারিদিকে অস্পষ্ট আলো, শূন্যপথ আর ফুটপাথ। ভয়ে যেন গা ছম ছম করে উঠলো তার। অহো, অহো! কিন্তু এ কোথায় সে? তারপর তার আবার সব মনে পড়লো।

দেখতে দেখতে গ্রামের চেহারা বদলে গিয়েছিলো ; খেতগুলি ন্যাড়া ন্যাড়া, গত ফসলের গোড়াগুলি পৃথিবীর সব রস যেন শুষে নিচ্ছে। কলাপাতাগুলির উপরে ধুলোমাটির প্রলেপ জমে গেছে। এমনটা শুধু বৃষ্টির অভাবে হয় না। মড়ক-টরকের আগে যেমন হয় তেমন যেন একটা অন্ধ বুড়ো শকুন বসবার জায়গা হদিস করতে না-পেরে পাখসাট মেরে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে গ্রামের উপর দিয়ে। তার পাখার ছায়া পড়ছে, অন্ধকার হয়ে উঠছে কৃষকের মুখ। এরপর থেকে দুঃখের স্রোতটা অপ্রতিহত হলে ততটা কষ্টের বোধহয় হতো না ; কিন্তু ঢল নামলো, কৃষকদের শুকনো প্রাণ বয়ে, কলাপাতাগুলির গায়ের মাটির প্রলেপ, দাগদাগালি ধুয়ে নামলো ; ভাদ্রের শুকনো দিনগুলির পর, আশ্বিনের গোড়া থেকে ঢল মারতে মারতে হলুদ হলুদ জমি সাদা হয়ে গেলো বিঘৎ পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে। তারপর যে-দিন জল ধরে আকাশ ঝিকিয়ে উঠলো, দেখা গেলো ছেলে-বুড়ো, হিন্দু-মুসলমান নুয়ে নুয়ে যেন ভূমিকে সাধছে।

মাঝখানে রামচন্দ্রের খেত, তার একদিকে হাজীর বেটা ছমির মুন্সির খেত, ওদিকে কেষ্টদাস বৈরাগীর একফালি ভুঁইটুকু।

কতকগুলি কালো কালো মানুষ নিচু হয়ে বাঁ-হাতে-ধরা রোয়া ধানের চারাগুলো বিঘৎ পরিমাণ জলের নিচে বুনে বুনে দিচ্ছে।

রামচন্দ্রের চওড়া পিঠের পাশ দিয়ে মুঙলার লালচে চুলে ভরা মাথা দেখা যাচ্ছে। রামচন্দ্রের পিঠ ও মুঙলার চুলগুলি ঘামে ভিজে চকচক করছে আশ্বিনের রোদে।

কেষ্টদাসের হাঁপানির টানটা সেদিন বেড়েছে, তার খেতে খাটো গাঢ় রঙের শাড়ি পরা তার নতুন আনা বৈষ্ণবী, গ্রামের একটা অল্পবয়সী ছেলে তাকে সাহায্য করছে। সাদা ছাতা মাথায় ফিরোজি লুঙ্গি পরে হাজীর বেটা এসে দাঁড়িয়েছে তার নিজের খেতে। ছ-জন কৃষাণ কাজ করছে তার জমিতে। মাথায় ছাতা দিয়ে আজকাল জমিতে আসে ছমির মুন্সি।

ছমির বললো—'কে রামচন্দ্র না'?

রামচন্দ্র মুখ তুললো, বাঁ হাতের ধানের ঘাসগুলি ডান হাতে নিয়ে বললো— 'আলাম ভাই নিজেই, মুঙলাক কলাম দুডে কিষাণ নিয়ে যা, বোনা কাটা শেষ করেক, ও ক'লে একেই নাবলা (দেরিতে) বোনা, মাটি রাগ করবি অঙ্কার দেখে'। হাসলো রামচন্দ্র এই বলে।

বস্তুত এটা মিথ্যা। ছমির আর রামচন্দ্রের বয়স প্রায় সমান। এর আগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করেছে তারা : অনেক চৈত্রের রৌদ্র, অনেক আষাঢ়ের ঢল গায়ে নিয়েছে তারা একসঙ্গে। হাজীর বেটার খেত জার্মানির যুদ্ধ লাগবার পর থেকে আলের পর আল ডিঙিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা ছোঁয়া ছোঁয়া হয়েছে। আর পক্ষান্তরে রামচন্দ্রকে দুর্ভিক্ষের উন্মুক্ত গ্রাসে জমিগুলিকে নিজের দেহের বিনিময়ে গুঁজে দিতে হয়েছে। কাজেই হাজীর বেটা ছাতা মাথায় খেতে এলে রামচন্দ্রকে একটু মিথ্যা করে বলতে হয় তখন, যেমন বাল্যে হাজীর বেটা তার বিশেষ একটি খেলনা আছে বললে রামচন্দ্রকেও মিথ্যা করে বলতে হতো আমারও আছে।

কিন্তু সেই বুড়ো শকুনটার পাখ্‌সাটের শব্দ আর শুনতে পাওয়া যায় না ; বর্ষার জলে সব পাখিই কাহিল। আর এবার আশ্বিনের রৌদ্রে কী ছিলো কে বলবে, ধানের পুঁয়ে-পাওয়া শিষগুলি এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে যে তাদের মন রাখা দায়। নিড়ানি বিঁদে নিয়ে ছুটোছুটি করছে কৃষকরা এরই মধ্যে।

শুধু ভুলে যাওয়া নয় দাঙ্গার কথা, দুঃখের পর স্বস্তিটা বড়ো বলে অনুভব হওয়াতে কৃষকেরা ধুলোর ঝড়ের পরে জলের জন্য চারাগাছগুলির আকুল হওয়ার মতো, আরো গভীর করে বাঁচবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলো। 'বিঁদে' দিয়ে জমির চটা ভাঙবার সময়ে, রামচন্দ্র বলেছিলো—এ সনটা তাদের কষ্ট করে থাকতে হবে ; কিছু টাকা হাতে করে দুর্ভিক্ষের সময়ে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জমিগুলি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে তখন মুঙলার ভয় ভয় করে উঠেছিলো। দুর্ভিক্ষের সময় জমিগুলি তখনকার ন্যায্যদামে কিনেছে ছমির হাজীরা, ছমির, চিতেসা ; জমি কি এখন তারা আপসে ফিরিয়ে দেবে!

কিন্তু ধানটা যখন ঘরে উঠেছে, তখন একদিন সন্ধ্যার দিকে গাড়ি করে ধান এনে উঠোনে ঢালতে ঢালতে খানিকটা দম্ভ হয়েছিলো মুঙলারও। বুক ভরা ধানের গন্ধ ও ধুলোভরা বাতাস নিঃশ্বাসে নিতে নিতে ভয়টা কোথায় চলে গেলো! ঘরের দাওয়ায় উঠে নজরে পড়েছিলো রান্নাঘরের মৃৎপ্রদীপের আলোতে বসে প্রথম ওঠা ধানের চালে সরাপিঠে ভাজছে শাশুড়ি। মনটা যেন জুড়িয়ে গেলো। সববকম ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজে ডেকে বললো শ্বশুরকে—'কই জমি কিনবেন না? সকলের ধানবেচা সারা হলি জমি কি আর পাবেন'?

এমনকী আকাশে চাঁদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো ঘটনাও ঘটলো। পথের উপরে চাঁদের আলো যেখানে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়েও যাচ্ছে না সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো কেষ্টদাসের অল্পবয়সী বৈষ্ণবী। মুঙলার মনে হয়েছিলো বৈষ্ণবীকে বুকের উপরে টেনে না-নিলেই নয়। তারপরে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফিরে যেতে যেতে মুঙলা দেখেছিলো, পাশের খেতের অস্পষ্ট আলোয় হাতড়ে হাতড়ে ঝিঙে পটল সংগ্রহ করতে করতে গুনগুন করে গানও করছে যেন বৈষ্ণবী।

রামচন্দ্র জমি ফিরে পেতে চেয়েছিলো মাত্র, জমি বাড়ানোর সুযোগটাও যেন জুটে গেলো তার। আর সে সুযোগটিও এলো যেমনটি কল্পনা করা যায় না তেমনভাবে। জমি কিনবার প্রস্তাব নিয়ে, সহায়তার আশ্বাস নিয়ে এলো ছমির মুন্সি নিজে, যে নাকি এদিককার মাঠে সবচাইতে বড়ো প্রতিপক্ষ তার। কথার শেষের দিকে আনন্দে গলা ধরে আসছিলো রামচন্দ্রের ; মাঝের ছ-সাত বছরের ব্যবধান পেরিয়ে তার মন ফিরে গিয়েছিলো সেই সব অতীতে যখন দুজনে সন্ধ্যার পরে বসে জমি কিনবার শলা-পরামর্শ করতো।

কিনবো কথাটা বলতে গিয়ে রামচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে উঠেছিলো সেদিন। টাকার অভাব ছিলো তার। কিন্তু জমিজমিই, টাকা না-ই থাকলো। যা আছে তার সব বন্ধক দিয়ে নতুন জমি কিনবে সে। বছরের পর বছর ফসল উঠবে, ঋণশোধ হতে কতক্ষণ? সব কৃষকই বোধ হয় এরকম চিন্তা করে, যদি-বা রামচন্দ্র তাদের মধ্যে একটু বেশি দুঃসাহসী। অনেক ছোটোবেলায় যখন সে মাথায় লাল গামছা বেঁধে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দুপুর-রোদেও খেত চষতো তখন একদিন সে একটা তৃপ্তির সন্ধান পায় নিজের দেহকে পীড়িত করবার, কাজ করার তৃপ্তি। তারপরেও অনেকদিন তখন বিয়ে করেছে সে তার স্ত্রী দুপুরে ভাত নিয়ে গিয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে দেখছে ভুঁইটুকু ফালি ফালি করে চষেও আশা মেটেনি, পাতালের রস তুলে আনবার চেষ্টাতেই যেন বলদ দুটি আর তাদের মালিক অতি পরিশ্রমে থর থর করে কাঁপছে। অভ্যাসের ফলে এরপরে নিজের পৈতৃক জমিটুকু চষে

রামচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত ক্লান্তিটুকু আর অনুভব করতে পারতো না, এবং কোথায় ক্লান্তি খোঁজ করতে গিয়ে একটু একটু করে জমি বেড়ে চলতে লাগলো।

একদিন বউ জিজ্ঞাসা করেছিলো—

'কী করবা গো জমি দিয়ে'?

বালক মুঙলাও প্রশ্ন করেছিলো আরো একদিন— 'এখন তো খামার করছো, এরপর বুঝি জমিদার হবা সান্যালদের মতো'?

'আরো বড়ো খামার হবি, তুই আর একটু বড়ো হ, একখানা হাল ধরতি পারলি হয়'।

'তা জানি হবি, তারপরে কী করবা'?

'তারপরে চরে খানটুক জমি নিবো'।

'তা যেন নিলা, তারপর'?

'তোকে আদ্ধেক দিবো, আমি আদ্ধেক নিবো'।

'তা যেন দিলা, তারপর কী হবি'?

'ধান হবি'।

ধান হবে এর চাইতে বেশি রামচন্দ্র কখনোই বলতে পারেনি।

কিন্তু জমি বাড়ানোর নেশা বলতে পারা না-পারাব উপরে অপেক্ষা করে না। মকসুদপুরের তারিণী গোঁসাই জমি বিক্রি করবে শুনে রামচন্দ্র গিয়েছিলো সেই গ্রামে। একবারও সে ভাববার সময় পেলো না, তারিণী গোঁসাই জমি বিক্রি করে কেন? অন্যসময় হলে রামচন্দ্র নিজেই বলতে পারতো, বড়োছেলেটা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে দমে গেছে লোকটা।

কিন্তু, জমি তাই নাকি আবার কেউ বিক্রি করে?

ঠিক এ সময়ে জমির চাইতে বড়ো কোনো অনুভব তার কিছু ছিলো না। ছমির মুন্সি স্বরটা নিচু করে বলেছিলো জমি বেচবে তারিণী গোঁসাই। কিন্তুক এখন যাবানা, চিতে সাও যাবে না, বলা আছে তাকে।

তারপরে একসাথে তিনজনেই যাবো।

তখনো ছমির মুন্সির কৌশলটাকে ষড়যন্ত্র বলে বোধ হওয়া উচিত ছিলো ; অন্তত চিতে সা, যে নাকি যুদ্ধেব বাজারে মানুষের হাড় চালান দিয়েছে বিলেতে, তার সঙ্গে নিজের নামটা যুক্ত হওয়াতে সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবিক হতো, কিন্তু কিছুই হলো না ; শুধু জমি বেচা-কেনার সময়ে ঝানু ব্যাপারীর মতো গোঁফ চুমরে মাথাটা দোলাতে দোলাতে সে ভেবেছিলো—দাম বুঝি কমাবি, ক্যান্?

খেতে মই দিতে দিতে গোরু মুখ বাড়িয়েছে রস-ভরা-ধানের কচি গাছগুলির দিকে, তখন তার চোয়ালে লাঠির বাড়ি এসে পড়লে সে যেমন করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তেমনি ফিরে এসেছিলো রামচন্দ্র।

তারিণী গোঁসাই বললো—'সবই ছেড়ে যাব'।

রামচন্দ্র শুনে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেছিলো—'ইস, কন্ কী'?

এই ভদ্রাসন, এইসব (কথাটা শেষ করবার ভাষা এলো না, 'এইসব' বলতে ভদ্রসন নয় শুধু, স্নেহমমতায জড়ানো যে-কোনো ভাষার চাইতেও বড়ো চিন্তার অগম্য একটা অনুভূতি)।

'উপায় কী? যেতেই হবে'!

'চিতে সা, সে তো থাকবি'। এই বলে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছিলো রামচন্দ্র।

কিন্তু তারিণী গোঁসাই বেশি কথার মানুষ নয়, উঁচু করেও কথা বলে না। বলেছিলো—'থাকবে তাহলে'।

মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যেতে যেতে রামচন্দ্র কথা খুঁজছিলো, বলে উঠেছিলো—'গান্ধীও কি হার মানছে তাইলে? সুবাস বোস, তিনি তো বেঁচে আছেন। তাতেও কি গান্ধী সাহস পায় না'?

আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাওয়া যখন ভাগ্যলিখন তখন কোথাও সাহস পাওয়ার নয়।

পথে দাঁড়িয়ে বিশ্লথ পা দুখানা টলছিলো, বারবার ঝেড়ে নিয়েও স্বাভাবিক হলো না গতি। যেটুকু যা জমি আছে তার সবই রেজিস্ট্রি করা এ ভেবে যেমন সাহস ফিরে পেলো না সে তেমনি হলো না এদেশে মুসলমানের রাজ্যেও হিন্দুরা বাস করতো এই ঐতিহাসিক তথ্যে।

ভয়ের চূড়ান্ত অবস্থার যা হয় সেটাও ঘটে গেলো। তার বাড়ির কাছাকাছি বাঁকটায় পৌঁছে সে দেখেছিলো—

ধবধবে রং রোদে লাল হয়ে উঠেছে, হাঁটু পর্যন্ত পথের ধুলো মাখা, তৃষ্ণায় মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে, ছাতায় মুখ আড়াল করে হনহন করে হেঁটে চলেছে একটা লোক। চিনি-চিনি মনে হলেও চিনতে পারলো না রামচন্দ্র। এমন চেনা অথচ যেন সব চেনার বাইরে। ছোটোবেলায় যা শুনেছে, তাই মনে হলো নাকি? হঠাৎ একদিন এক শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ক্ষুধাখিন্ন ব্রাহ্মণকে দুপুরের রোদে গ্রামের শুকনো মাঠ পার হয়ে যেতে দেখা যায়। প্রথমে মনে হয় গ্রামেরই একজন। পরে কেউই তাকে চিনতে পারে না। কারো সঙ্গে কথাও বলে না সে, শুধু কোনো গ্রামের গাছতলায় সে একটু দাঁড়ায় হয়তো, আর তারপরে চারপাশে লাগে অমঙ্গল, অনাহার, মড়ক।

পরে অবশ্য ব্যাপারটার অনৈসর্গিক দিকের নিরসন হয়েছিলো। কিন্তু হায়, সে কি সমাধান! মুণ্ডলা ফিরে এসে বলেছিলো শাশুড়িকে, 'ওমা এ কী হলো, সান্যালদের ছাওয়াল আসছে কর্তাকে নিয়ে যাবেন, গ্রামে আর থাকবি নে ওরা'।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রামচন্দ্র বলেছিলো— 'যাতি হবি, ক্যান, যাতি হবি তাইলে'?

অভ্যাসের বশে গোঁফ চুমরে দিলো সে তখন। কাঁদো কাঁদো মুখে গোঁফ চুমরে দিলে যে হাস্যকর মুখভঙ্গিটি হয় তাতে ভগবানও হাসেন কিনা কে জানে! শুধু একবার নয় আঘাতের পর আঘাত দিয়ে মাটি থেকে শিকড় ছাড়িয়ে কৃষকদের নতুবা কে ভূমিহীন করবে?

বলেছিলাম সহরের উপান্তে একটা আশ্রয়-শিবিরের সম্মুখে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়বার আগে উদ্বাস্তু রামচন্দ্রের মন ভগবানের প্রতি ধন্যবাদে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। শুধু ঘুমিয়ে পড়বার আগেই নয়, সকালে উঠেও এই ভাবটি ছিলো তাদের মনে। দেখা গেলো ভক্ত কামার, রামচন্দ্র ইত্যাদি কয়েকজন মিলে সংকীর্তন শুরু করে দিয়েছে। এ যশোকীর্তন তাদের সুখ-দুঃখের মালিক কারো কাছে পৌঁছায় কিনা বলা যায় না। ভক্ত কামার সব হারিয়েও মৃদঙ্গটি সঙ্গে এনেছে, সে বাজাচ্ছে। ভক্তির আতিশয্যে কোমল হয়ে ওঠেনি তার মুখ, বরং একটা ক্লান্তির ভাবই ফুটে উঠেছে। কেষ্টদাস হাঁপানির টানে ব্যতিব্যস্ত। আর হতবুদ্ধি রামচন্দ্র অবিরত গোঁফ চুমরে যাচ্ছে। তবু এরই মধ্যে কোথায় কী করে বোবার মনোভাব প্রকাশের মতো একটা হাস্যকর অথচ অকৃত্রিম আবেগ এক একবার জেগে উঠছিলো।

কীর্তনের শব্দে তাদের আগে যে-দলটা এসে ঘরটাকে আশ্রয় করেছিলো, তাদের কেউ কেউ বেরিয়ে এসেছিলো পথের এদের দেখতে। পথে লোক চলাচলও সুরু হয়েছিলো। তারাও কৌতূহলী হয়ে দলটিকে দেখছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এদের গান করা ভিখারি মনে করে কিছু কিছু পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো ওদের সামনে।

কীর্তন থামিয়ে রামচন্দ্র পয়সাগুলি দেখে অবাক হয়ে গেলো। বললো— 'পয়সা দিতেছেন ক্যান্'?

কথাটা অপ্রত্যাশিত হলেও খুব একটা গুরুত্ব দিলো না কেউ। রামচন্দ্র যখন এই নতুন ধরনের পরিস্থিতিতে বোকার মতো এদিক ওদিক চাচ্ছে তখন সুনন্দা নামে যে-মেয়েটি বেরিয়ে এসেছিলো আশ্রয়-শিবির থেকে সে একটা চকচকে সিকি পায়ের পাতার তলে চেপে ধরেছে। আশেপাশে যখন কেউ লক্ষ্য করলো না তখন সুনন্দার ঝকঝকে নখশুদ্ধ পা-টা এগিয়ে গিয়ে আর-একটা এক আনি চেপে ধরল।

কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো, সুনন্দার খয়েরি রঙের চোখজোড়া টলমল করছে টোপাজ মণির মতো জল ও জ্যোতিতে ভরে, বুকজোড়া থর থর করে কাঁপছে।

ভিড় কমে গেলেও সুনন্দা যেতে পারেনি। পা-খানা তার সিকি ও আনের টানে মাটির সাথে জুড়ে গেছে। পা দিয়ে চেপে ধরা সিকি হাত দিয়ে তুলে নেওয়া কত কঠিন সুনন্দা জানতো না। এবার সুনন্দা হাসলো। সে হাসি বড়ো মর্ম নিঙরানো।

বললো—'কেমন, বাবাজিরা, ঠিক পাওনি তো'?

সুনন্দা পা সরিয়ে নিলো। সিকিটা পায়ের চাপে ঘষে গিয়ে আরো চকচক করছে।

রামচন্দ্র মুখ তুলে বললো—'মাঠান, সিকির কথা কতিছেন নাকি'?

'হ্যাঁ, তোমরা বড়ো বেহিসাবি, সেইজন্যই তোমাদের উপার্জনের পয়সা হাতে থাকে না'।

'মাঠান, এ পয়সা তো আমাদের না'।

সুনন্দা আলাপের একটা পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে পালাতে চেয়েছিলো, এরা তার পা-এর তলা থেকে পয়সা বেরনোর ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছে সেটা না-জানলেও নয়। কিন্তু সে যেতে পারলো না।

ভগবানের নামে আসা পয়সা তাঁর নামেই ব্যয় করা উচিত এই ভাবলো রামচন্দ্র, এবং ভগবানের নামে যদি ব্যয় করতে হয় তবে সেটা নিজেদের ধূলিমলিন অস্নাত অবস্থায় না-করে এই রূপময়ী ঠাকরুণের হাত দিয়ে করা ভালো। আট-দশ আনা পয়সা কুড়িয়ে রামচন্দ্র সুনন্দার হাতে দিয়ে যখন এ রকম অনুরোধটা করলো তখন সুনন্দা কারো উপরে রাগ করার কারণ না-পেয়ে ভিতরে-বাহিরে রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

তবু সেদিন সন্ধ্যায় সেই পয়সা দিয়ে একটা ফিতে কিনলো চুল বাঁধবার, আর আমেরিকান প্লাস্টিকের একজোড়া কর্ণভূষণ। তারপর দাঁড়ালো আয়নার সামনে। বহুদিন পরে আজ সে দাঁড়ানোর জোর পেয়েছে, নিজের গ্রাম থেকে এই দুশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসতে আসতে পাড়াপড়শি যে-মেয়েটা বেটাছেলে দেখলে কাতর হয়ে পড়ে ; তার ঢলে পড়া ভাব থেকে স্বামীকে বাঁচানোর অন্য কোনো উপায় না-পেয়ে একটু আড়াল পাওয়ামাত্র নিজের দিকে তাকে আকর্ষণ করেছে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সম্মুখে সে দাঁড়ালো। সোনার রেখায় পরিবর্তিত হলো তার চোখের তারা।

এখন এমন হতে পারে ব্যাপারটা, কৃষকদের তাদের নিজেদের ভূঁই থেকে ছাড়িয়ে এনে সহরের মাটিতে রোপন করা তাদের ভগবানের ইচ্ছা ; ভালো মালীর মতো এই শিকড়ছেঁড়া গাছগুলিকে তিনি যত্ন করতে লাগলেন।

মুঙলা একদিন এসে ফিসফিস করে বললো—'ঘরটার পেছন দিকে একটুক বারান্দা পড়ে আছে, যাবা'?

দুদিন আগে দুপুরবেলায় ভজু কামারের একটা ছেলে ঘরের বারান্দায় উঠতে গিয়ে তাড়া খেয়ে এসেছিলো। তখন দুপুর-রোদে খোলা আকাশের নিচে থাকা অসম্ভব ছিলো।

রামচন্দ্র বললে— 'থাকুক না কেন, বেশ আছি তো'?

কেষ্টদাসের বুকের ভিতর একটা কষ্ট হচ্ছিলো ; ঠাণ্ডার রাত সামনে, আজ যেন ভয় হলো তার। তার ভয়ের জন্যই হোক, মেয়েদের একটু আড়ালের ব্যবস্থা করার জন্যই হোক, রামচন্দ্রের দল সেদিন অনেক রাতে নীরবে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দেয়াল-ভাঙা ইট জঞ্জাল ও কাঠ-কাটরার গুদামের মতো সেই বারান্দায় আশ্রয় নিলো। যে-কুকুরটা ঘুমিয়েছিলো সেখানে এতগুলি লোক দেখে সেটা নিঃশব্দে নেমে গেলো।

যে-ঘরটায় রামচন্দ্ররা উঠেছিলো সেটা এ সহরের উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী আশ্রয়-শিবিরগুলির তৃতীয় শ্রেণীর একটি। পৃথিবীর সব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যেমন প্রভেদ থাকে এক্ষেত্রেও তা ছিলো।

কিন্তু ভগবান যেমন বড়োমানুষের ব্যবস্থা উল্টে পাল্টে দেন বড়োমানুষ তেমনি অপেক্ষাকৃত ছোটোমানুষের ব্যবস্থা উল্টে দিতে পারে। কথা ছিলো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিবিরগুলি দেখেই এই বড়োমানুষটি ফিরে যাবেন।

হঠাৎ কী মতি হলো তাঁর, তিনি এলেন এই আশ্রয় শিবিরটি দেখতে। সাজ সাজ রব উঠলো। রামচন্দ্ররা যেদিকে বসে কিছু ছাতু সংগ্রহ করে উদরপূর্তি করছিলো সেদিকে শিবির ঝাঁট দেওয়া ময়লা নিজেদের হাতে করে তুলে ফেলতে গিয়ে ভদ্রঘরের সুবেশ তরুণ ছেলেগুলি রামচন্দ্রদের দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলো যেন।

অতঃপর বেটাছেলেদের স্নান করবার জন্য এলো গামছা, মেয়েদের রুক্ষচুলের জন্য এলো তেল ; বড়ো বড়ো গামলা করে খিচুড়ি এলো।

এতদিন নজরে না-পড়লেও, আশ্রয় শিবিরের ভেতর থেকে হরিশচন্দ্র সেদিন সন্ধ্যার পর বেরিয়ে এসেছিলো। ভিতরে দু-চারজন ভদ্রলোক ধমকে দেয় বলে সে সন্ধ্যার নেশাটুকু করার জন্য প্রায়ই একটু আড়ালে যায়, কলকেটা হাতে করে সে আজ বেরিয়ে এসে বসলো রামচন্দ্রদের কাছে।

হরিশ বললো—'তা ভাই, বললে কী হবে, এ শালাদের চোখ যেন এতদিনে খুললো। দুঃখী দেখেই যদি দান করবি তবে আমাদের মতো গরীব কে? আমি তো সব কটা আড্ডাই দেখে এলাম। ওদিকে সব ভদ্রলোকদের দল থাকে। তাদের তো টাকা আছে, তাদের মাথাতেই কেন তেল ঢালা'?

হরিশ এখানে প্রায় দু'মাস হলো এসেছে। ইতিমধ্যে সহরের প্রায় সব কয়েকটি শিবিরই দেখা হয়েছে তার, এর আগে সে অন্য আশ্রয়-শিবিরেও ছিলো। খোঁজখবর নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থা বলে এ শিবিরে এসেছে।

বহুদিন পর গুরু আহারের ফলে আজ উদ্বাস্তুরা অসুস্থের মতো সন্ধ্যার পরই ঘুমিয়ে পড়লো।

আশ্রয়-শিবিরের কর্তৃপক্ষ শুধু গুরু আহারের ব্যবস্থা করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না. উদ্বাস্তুদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর ছিলো। দেখা গেলো অন্যান্য শিবিরের মতো এখানে আশ্রয়প্রার্থীরা নানা রোগে পরস্পরকে সংক্রামিত করছে না, বরং অনাহারজাত ছোটোখাটো রোগগুলিও সেরে যাচ্ছে তাদের। গোল চেহারার একটা কল এনে উদ্বাস্তুদের তার উপরে একে একে দাঁড় করিয়ে নোটবুকের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা গেলো, একেবারে বুড়ো ছাড়া আর সকলেরই ওজন যেন বেড়ে গেছে।

একদিন হরিশ এসে বললো— 'আজ শালারা বেগুন ভাজা দেবে ডালের সাথে'। আর-একজন আশ্রয়প্রার্থী জিজ্ঞাসা করলো—'বেসম দিয়ে ভাজবে না'?

হরিশের মাথায় বোধ হয় কোনো ফিকির খেলা করছিলো, সে অন্যমনস্কভাবে বললো— 'তাও হয়। চারটে করে পয়সা দিলে ফুলুরি দেবে বেগুন ভাজার বদলে'।

আশ্রয়প্রার্থীরা সেদিন যখন দুপুরের ভাত সম্মুখে করে বসেছে শাঁখের মতো শব্দ হলো। কয়েকখানা ঝকঝকে মোটর এসে থামলো। রামচন্দ্র দ্বিতীয় গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে পদশব্দে মুখ তুলে দেখলো সুবেশ একদল দেবকন্যার মতো তরুণী তাদের ছোটো দলটির চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আহা কতদিন পরে এরা খাচ্ছে!

হঠাৎ কোথা থেকে কী একটা কুণ্ঠা এলো ; রামচন্দ্রের ভাতের থালা থেকে হাত আর মুখে উঠলো না। তার চারপাশে সবাই নানারকম শব্দ করে খাচ্ছে ; আগন্তুকদেব নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। কিন্তু কী একটা লজ্জা এসে রামচন্দ্রের মাথাটা নিচের দিকে ঠেলে রাখলো।

এ রকম ছোটোখাটো দ্বিধা ছাড়া আর কোনো কষ্টই হয় না রামচন্দ্রের এখানে। হরিশ সাধারণ আশ্রযপ্রার্থীদের মতো নয়। শিবিরের পলিটিকসে সে শুধু স্পেশ্যালিস্টই নয়, ঐ পলিটিক্সটুকুর অনেকখানি তার তৈরি। কর্তৃপক্ষরাও এটা যেন বুঝতে পেরেছেন, ফলে খাদ্যাদি পরিবেশনের ভারও অনেকসময়ে তার উপরে ন্যস্ত হয়। হরিশ সেসব দিনে ডালের হাতাটি নিয়ে উদ্বাস্তুদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু হরিশের একটি গুণ ছিলো আশ্রিত পালন। রামচন্দ্র তাকে একদিন 'হরিশদা' বলেছিলো, সেই থেকে রামচন্দ্রের দলটির জন্য একটি চোখ সে সদাসর্বদা খুলে রেখেছে। এরই ফলে একদিন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো। রামচন্দ্রের স্ত্রীর অসুখ করেছিলো, রামচন্দ্র লোকটার চেহারা যত বড়ো এসব ব্যাপারে অন্তত মনটা তত শক্ত নয়। হরিশের কাছে গিয়ে বলেছিলো, 'দাদা একটা ডাক্তার দেখে দাও'।

'ডাক্তার, সে তো অনেক পয়সা'!

অতঃপর হরিশ চটপট করে সুনন্দাকে ডেকে এনেছিলো।

রোগিণীকে দেখে, রোগের বিবরণ শুনে সুনন্দা ফিরে গিয়ে নিজের বাকসো খুলে একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে দিলো।

রামচন্দ্রের একটা সংস্কার ছিলো : ওষুধের কিছু মূল্য না-দিলে রোগ সারে না। সে সুনন্দাকে সুতরাং ওষুধের দামের কথা জিজ্ঞাসা করলো। সুনন্দা ফিরে যাচ্ছিলো, কথাটা শুনে থামলো, একটু দ্বিধা করে বললো— 'আট আনা দিও'।

রামচন্দ্র পয়সা দিতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ হরিশ হাত বাড়িয়ে নিষেধ করলো—'আট আনা দেবে? এই চারটে সরষে দানার দাম আট আনা হয় কোনোদিন'।

সুনন্দা আহত সুরে একটা গ্রাম্যকথা বললো। হয়তো হরিশ একটু কটু পাল্টা জবাব দিত ; কিন্তু হরিশের কথাগুলি রামচন্দ্রের ভালো লাগেনি। সে বললো— 'দামটা কি সরষের দানার? দাম হাতের গুণের'।

তখনকার মতো ব্যাপারটা এখানে শেষ হলো বটে। কিন্তু হরিশের বলবার অনেক কথা ছিলো। কাজেই সে সন্ধ্যার পর ফিরে এলো, এবং নিন্দা করবার গরজ থাকলে যা হয় তেমনি শ্রোতা নিরপেক্ষভাবে সুনন্দার চরিত্র বর্ণনা করলো বসে বসে। সুনন্দা দেমাকী, সকলে যখন চেয়ে-চিন্তে খাবার যোগাড় করে নেয় তখন সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলে ঢালা বিছানা করে নিয়েছে কিন্তু তার একটা পর্দা দিয়ে শোবার জায়গাটা পৃথক করে নিতে হয়। এসব তো বটেই, এমনকী তার ছোটোখাটো অভ্যাস বা মুদ্রাদোষও হরিশের চোখ এড়িয়ে যায়নি তাও বোঝা গেলো। শেষে সে বললো—'রাম, রাম, পয়সার কী লোভ। এক পয়সা এক পয়সাই সই, তাই নেবে লোকের কাছ থেকে। আর তাই কি সৎ ব্যয় করে পয়সার? একদিন তো পাঁচ-ছ আনার ফুলই কিনে আনলো। শোনাই তো যায় সব কথা, পর্দা টাঙালে কী হবে? একদিন এক মলাট ছেঁড়া বই কিনে এনেছে। স্বামীটি ভালো,

সে বললে—এত দাম দিয়ে কিনলে। সত্যি কথা, ধরগে, একটা টাকার খাবার আনলেও তো হতো। তা নয়, এক মলাট-ছেঁড়া বই কিনে এনেছে'।

এমন হতে পারে দাম বলতে সুনন্দার স্বামী এক টাকা বোঝেনি, রোদে ঘুরে বইটি সংগ্রহ করতে সুনন্দার যে-কষ্ট হয়েছে তাই বুঝেছিলো।

হরিশের তদ্বিরের গুণেই সম্ভবত রামচন্দ্রের দলটি আশ্রয়-শিবিরে একটু বিশেষ যত্ন পাচ্ছিলো। লোকে যখন শুনলো রামচন্দ্রের বিষয় নিয়ে হরিশের কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে সুনন্দার সঙ্গে, তখন যেন রামচন্দ্রের খাতির আর-একটু বেড়ে গেলো তাদের কাছে।

ঘরে বসে সময় কাটে না, রামচন্দ্র বেরিয়েছিলো অনির্দিষ্টভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। যে-মাঠটুকু তাদের আশ্রয়-শিবিরকে সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে পৃথক করেছে রামচন্দ্র সেটার সীমানার বাইরে যায় না। অলীক শোনালেও সত্য যে আর বেশি দূর যেতে রামচন্দ্রের ভয় করে। কিছুটা দূর এসে সে ফিরে দেখে আশ্রয়স্থলটা চোখের আড়লো হলো কিনা। এমন হতে পারে বহুদিন আশ্রয়হারা হয়ে থাকার ফলে আশ্রয় এই বিষয়টার স্থায়িত্বেই খুব বিশ্বাস আর নেই তার। রোদটা আজ খুব কড়া নয়। মাঠের শেষে এসে রামচন্দ্রের আর একটু এগিয়ে যাওয়ার সখ হলো। পায়ে পায়ে মাঠের শেষের বস্তি এবং বস্তির পাশের বাজারটায় গিয়ে দাঁড়ালো সে। লোকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপকরণ স্বাভাবিকভাবে সংগ্রহ করছে। পথে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা বাড়ির সম্মুখে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে খেলছে। এসব দেখছিলো রামচন্দ্র, কাজ না-থাকলে যেমন দেখে মানুষ। একান্ত আটপৌরে দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ রামচন্দ্রের মনে হলো একটা কথা। শুধু মনে হওয়া নয়, একটা চমকের মতো অনুভব হলো। একটা বলিষ্ঠ কালো রঙের লোক কেনাকাটা শেষ করে একটা ঝাঁকা কাঁধে তুলছে—এই দৃশ্যটা দেখে রামচন্দ্রের মনে হলো : বাড়ি যাবে বুঝি? বাড়িতে বোধহয় ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে? তাই না?

বাড়ি ফেরার কথা মনে হতেই রামচন্দ্র আশ্রয়-শিবিরে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। সেদিন শিবিরে ফিরে স্বস্তি পেলো না সে। বারবার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে থাকলো তার। এর কিছুদিন আগেও অনুরূপ অনুভূতি তার হয়েছিলো। মাঠের সীমার কাছে গাছতলাটার ছায়ায় বসে সে দূরের সহরের অস্পষ্ট দৃশ্যগুলির দিকে চেয়েছিলো। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো একটি মহিলা মাঠের দিকে আসছে। মাঠটা পার হচ্ছে। কাছে আসতে সে চিনতে পারলো সুনন্দা, ক্লান্ত চেহারা, হাতে একটা ভারি চটের থলে ঝুলানো। সেদিনকার ওষুধের দামের ব্যাপারটার পর রামচন্দ্র সুনন্দার খোঁজ করতে পারেনি, কেমন একটা লজ্জা বোধ হয়েছিলো। হরিশকে জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি, কয়েকদিন ধরে একে-ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, পয়সা কটা কী করে দেওয়া যায়। দেওয়া উচিত এখনই—এই ভেবে উঠে দাঁড়ালো সে, বললো— 'মাঠান, এসব কী আনলেন'? সুনন্দা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, বললো— 'রামচন্দ্র, ভালোই হলো, এগুলো একটু বয়ে নাও তো, পারছি না আর'।

রামচন্দ্র ভেবেছিলো সুনন্দাও তাকে দেখে কুণ্ঠিত হয়ে পড়বে, কাজেই সুনন্দা যখন নিঃসঙ্কোচে বরং খানিকটা সহজভাবেই তাকে হাতের থলিটা বইতে বললো— খুসি হলো সে।

থলিটা বয়ে নিয়ে পাশে পাশে চলতে রামচন্দ্র বললো— 'পয়সা আপনাকে দেওয়া হয়নি'।

'কিসের পয়সা, ও সেই চিকিৎসার'?

'হাঁ, মাঠান, বউ বেশ সেরে গেছে'।

'তা হোক পয়সা তোমাকে দিতে হবে না'।

রামচন্দ্র লক্ষ্য করল সুনন্দা যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো। কথাটা পাল্টে নেবার জন্য সে বললো— 'বেশ ভারি দেখছি, কী এত এতে'?

সুনন্দা বললো— 'বাসনপত্র, টুকিটাকি, কষ্ট হচ্ছে না তো'?

—'নতুন কিনলেন'?

—'হ্যাঁ, চলে যেতে হবে, সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছি একটু একটু করে'।

—'কোথায় যাবেন'?

—'দেখি কোথায়, হয়েই যাবে একটা জায়গা ঠিক'।

রামচন্দ্রের মনে হলো হয়তো হরিশের দুর্ব্যবহারে সুনন্দারা চলে যাচ্ছে। বললো— 'মাঠান, বুদ্ধিমানী তুমি,

হরিশের কথা ধর্তব্য করো কেন'!

সুনন্দা একটু হাসলো, একটু-বা লজ্জিত হলো, বললো— 'হরিশের জন্য নয়, রামচন্দ্র। চিরকালই কি এমন করে থাকা যায়? একটা আশ্রয় ঠিক করে নিতে হবে তো'।

অভ্যস্ত দৃষ্টি হলে রামচন্দ্র বুঝতো সুনন্দার কথার ভঙ্গিই শুধু বদলে যায়নি, আশ্রয়-শিবিরে বাসের যে-লজ্জা এতদিন তার রুক্ষতার মধ্যে ডুবে ছিলো সেটাও স্বভাবতই ফিরে এসেছে।

রামচন্দ্র জানতে পেরেছিলো সুনন্দা এবং তার স্বামী সহরে কোথায় একটা বাসা করবে, আর সেই বাসার ব্যবহারের জন্য টুকিটাকি এটা-ওটা সংগ্রহ করছে সে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একা বসে থাকতে থাকতে বারবার রামচন্দ্রের মনে হয়েছিলো সুনন্দার বাসা করার কথা।

একদিন হরিশ এসে পরামর্শ করবার ভঙ্গিতে বললো— 'শুনলে ভাই, শালারা বলতেছিলো আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে হেড ভলান্টার করবে'।

'কে সে'?—একজন প্রশ্ন করলো।

'বোঝো নাই? এখানকার ব্যবস্থা যার হাতে থাকে তাকে হেড ভলান্টার কয়। ওরা কেবল টাকা দেবে, আর আমরা সব ব্যবস্থা করবো'। হরিশের চোখ আনন্দে চকচক করছিলো। বললো— 'বুঝলে ভাই রামচন্দ্র, তোমাকে মানাবে সাদা কেপ মাথায় দিয়ে'।

ভক্ত কামার আর কেষ্টদাস সমস্বরে বলে উঠলো—'সে ভালো হবি, রামদা তুমি হও'।

রামচন্দ্র বললো— 'না ভাই'।

ওরা প্রশ্ন করলো— 'কেন'?

রামচন্দ্র সহসা বলবার মতো যুক্তি খুঁজে পেলো না, একটু পরে বললো— 'ভালো লাগে না'।

হরিশ পৃষ্ঠপোষকের মতো বললো— 'ভাল না-লাগার কী আছে? আমাদের ব্যবস্থা আমরা করে নেবো তার চাইতে ভালো আর কী হতে পারে? কী বলো'?

'সে তো ভালোই'।

'তবে'?

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ বোকার মতো মুখ করে বসে রইলো, তারপর একটা অন্যায় কথা বলবার মতো নিচু স্বরে বললো—'আমার যেন কেমন বাসা করবার ইচ্ছা করতেছে'।

হরিশ হো-হো করে হেসে উঠলো। রামচন্দ্র নিজেও লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলো।

হরিশ বললো— 'বাসা, বাসা না-হয় করবে, কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন শুনি! সোজা নাকি বাসা করা'?

বাসা করার প্রস্তাবে কেষ্টদাসও চমকে গিয়েছিলো। এ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা ছেড়ে অনির্দিষ্ট কোথায় যাওয়া যেতে পারে এ সে ভেবে পেলো না।

একটুপরে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে হরিশ বললো— 'ওসব পাগলামি করো কেন। এখানে কী কষ্টে আছো? নিজের চেহারা দেখলেও তো বুঝতে পারো। আর কী হবে বাসা করে তাই বলো তো'।

সেদিন বোকার মতো মুখ করে বসে থাকলেও একদিন রামচন্দ্র ধীরে ধীরে হরিশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো— 'না ভাই, বাসাই করবো'।

হরিশ ভেবেছিলো সেদিনের সন্ধ্যার পাগলামি রাত পোহালে শেষ হয়েছে। আজ সে অবাক হলো, বললো— 'বাসা করবে, বলো কী? কী অসুবিধাটা হচ্ছে এখানে তাই বলো না, হরিশ থাকতে তোমার ভয় কী'?

রামচন্দ্র বললো— 'তুমি থাকতে আমার কোনো ভয়ই নাই'।

'তবে। রয়ে সয়ে করো, যদি করতেই হয়। দু-দশ মাস যাক। আড্ডা উঠে গেলে তো যেতেই হবে'।

শুধু হরিশ নয়, আশ্রয় শিবিরের আরো দুচার জন এরককমটাই বললো।

তাদের কথার যুক্তিতে রামচন্দ্রের মনের জোর উবে গেলো, কিন্তু বালক যেমন গুরুজনের নিষেধ শুনেও এবং প্রায় বুঝতে পেরেও অকল্যাণকর ব্যাপারটির জন্য তবু একবার কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, তেমন করেই যেন রামচন্দ্র বললো— 'আমার যেন ভালো ঠেকে না। বেশ তো বাসা করে কী করবে, তাই বলো না'? যুক্তির মতো করে বললো ওরা, যেমন গুরুজন মঙ্গলকামীরা বলেন।

রামচন্দ্র বললো— 'কী আবার করবো, হাট করবো, বাজার করবো, বউ রাঁধবি'।

ওরা হাসতে গিয়ে হাসতে পারলো না, রামচন্দ্রের কথাটি বালসুলভ হলেও তার চোখ ছলছল করে উঠেছিলো। হরিশও বুঝলো রামচন্দ্রকে রাখা যাবে না। যাওয়ার দিনে ওরা অনুযোগ করেছিলো, এখানে এনে তাদেরকে একলা রেখে রাম পালাচ্ছে। হরিশ বোধ হয় কল্পনায় রামের বাড়িটা কী রকম হবে ভাবতে বসেছিলো। একটা ক্ষীণ আকর্ষণ ওই রকম একটা আশ্রয়ের জন্যই অনুভব করছিলো কিনা কে জানে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে স্থানচ্যুত করে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—'যাবে যাও, কষ্ট হলে ফিরে এসো'।

বাসা ঠিক করে রামচন্দ্র আশ্রয়-শিবির ত্যাগ করেনি, কিন্তু ভাগ্য জুটিয়ে দিলো আশ্রয়। বাসাটা বস্তিতেই বটে, কলকাতা সহরের বস্তিতে যেমন হয় তেমনি ভাঙা কাঠ-কাঠরা, মর্চে-ধরা-টিনের তৈরি নিচু দুখানা ঘর। রামচন্দ্রের স্ত্রী পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে, খোলামেলা জায়গায় বাস করার ফলে. কিন্তু বাতিকগ্রস্তা নয়। একদিন গোবর জল দিয়ে দেখেছিলো, শুকায় না, তারপর থেকে অবসর সময়ে ঝাঁট দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে ঘর দু'খানিকে।

শুধু আশ্রয় নয়, আশ্রয়কে স্থায়ী করার উপায়ও জুটে গেলো। একটা বিড়ির দোকানে কাজ পেয়েছে মুঙলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বিড়ি বাঁধে সে : সন্ধ্যায় আসবার সময়ে কোনো কোনোদিন তেলে ভাজা জিলিপি কিনে আনে সে।

রামচন্দ্র বেশ আছে। বসে বসে তামাক খাওয়া ছাড়া বড়ো একটা কিছু করে না সে। করবার আছেই-বা কী?

একদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে রামচন্দ্র দেখলো তার ঘরের সামনে দু-তিন হাত পরিসর মাটিতে সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। চেয়ে চেয়ে সে যেন বিস্ময়ে ভরে গেলো। পিঁপড়েরা আনাগোনা করছে যেন মাটির মধুর খোঁজে। কী করে কোথা থেকে একটা ধান পড়েছিলো মাটিতে। দ্যাখো কাণ্ড, একটা হাল্কা সবুজ লম্বাটে ঘাস জন্মেছে সেখানে। আর ঠিক তখনই কিনা একটা নিড়ানি হাতে নিয়ে মুঙলা ঢুকলো বাসায়। রামচন্দ্রের বুকে কিছু-একটা চমকে উঠলো। সে বললো— 'কী হবে ও দিয়ে কী হবে'?

মুঙলা বললো— 'ঘরের পিছনে জঙ্গল। পোকা থাকবের পারে'।

রামচন্দ্র লজ্জিত হয়ে মুখ নামালো। সে অনুভব করলো একটা ধানের ঘাসে রোদ পড়ে ছেড়ে আসা জমির কথা মনে হয়েছিলো তার। সে বোকার মতো মুখ করে হাসতে লাগলো।

রামচন্দ্রের বাসার উল্টোদিকের খুপড়ির ভাড়াটে একদিন বললো— 'তোমরা বুঝি পাকিস্তান থেকে এসেছো'?

'আজ্ঞা হ্যাঁ'।

'আচ্ছা তোমরা এত কাপুরুষ কেন, পরের ভয়ে নিজের ঘরদোর ছেড়ে এলে'?

কথাটা মিথ্যা নয়, রামচন্দ্র মাথাটা নিচু করে রইলো।

'তা এখানে দিন চলছে কী করে'?

'চলে আর কই আজ্ঞা? চালাতে হয়, তাই চালাই'।

'ছাওয়ালডা একটা চাকরি করে'।

'তোমরা বাঙালরা বড়ো হুজুগ প্রিয়। কী হুজুগে পরে কথা নেই বার্তা নেই দেশ ছাড়লে? এখন হয়তো ভিক্ষে-শিক্ষে করে সংসার চালাতে চাইবে; এই তোমাদের ঢাকায় মারামারি হলো, গেলো কতগুলি টাকা; এই চাটগাঁয়ে প্লাবন হলো দিলুম কতগুলি। আজ আবার তোমরা এসেছো'।

লোকটি নিজের দুরবস্থার সঙ্গে দান করার গুরুতর কর্তব্যের সামঞ্জস্য করতে না-পেরে বিপন্ন মুখে থামলো। রামচন্দ্রের কিন্তু বড়ো ভালো লাগলো লোকটিকে এবং ভালো লাগলো বলেই তার কথাগুলিতে মনে দাগ কাটলো। ভিক্ষা করা তো অন্যায়ই, ভাবলো সে—নিজে হয়তো সে করছে না। তাহলেও কীই-বা করছে সে।

লোকটি আবার বললো— 'তা যখন এসেই পড়েছো, তখন এদিকেই একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে নাও।'

'তাতো করতেই হবি আজ্ঞা'।

লোকটি ঘরে ঢুকে লোহার একটি বড়ো ঝাঁঝর এবং একটি বড়ো হাতা নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলো।

সেদিন রাত্রিতে রামচন্দ্র বউকে বললো— 'ক্যানরে আমি কী হইছি? কাজ কাম কিছু করিনে, তামাক খাই শুধু'?

'কী করবা'?

'কী করব? (যেন বউ তাকে নিষেধ করছে)—কি তুই কি আমাকে বুড়ো বাগ্দী পালি'?

তাদের গ্রামে এক বৃদ্ধ বাগ্‌দী বাতজরাগ্রস্ত হয়েও অনেকদিন বেঁচেছিলো। সে সারাদিন রোদে বসে থাকতো। এক নাতনী তাকে খাবার দিয়ে যেতো। কিছু সে খেতো কিছু ছড়াতো। খাবারের মাছিগুলো তার মুখে হাতে এসে বসতো। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে বসে বসে সে যেন মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকতো।

'বারে তা হবা কেন? মুঙলা কি তোমাকে কাজ করাবে দিবি'?

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তারা মুঙলার কথা আলোচনা করলো। মুঙলা পরের ছেলে। জামাই। তাও সে মেয়ে নেই বেঁচে। ধরতে গেলে কোনো সম্বন্ধই নেই, তবু লোকের ছেলে যা করে না তাই করেছে সে। সংসারটাকে হাসিমুখে বয়ে নিচ্ছে, অভাব-অভিযোগের একটা কথাও জানতে দেয় না রামচন্দ্রকে।

একদিন কিন্তু একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করলো রামচন্দ্র। বাড়িওয়ালার লোক ভাড়া চাইতে এসেছিলো। দরজার কাছে রামচন্দ্র বসেছিলো। বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো— 'মুঙলা কোথায়?

সমবয়সী লোক দেখলে বিশেষ করে সে যদি প্রায় সমশ্রেণীর হয়, এবং হাতে যদি কাজ না-থাকে আলাপ করার ইচ্ছাটা অস্বাভাবিক নয়। বোধ হয় এই রকম একটা তাগিদ থেকেই রামচন্দ্র বলে থাকবে—'মুঙলা বাড়িতে নেই। বসেন, তামাক খান'। লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলো না তার কথায়। তথাপি রামচন্দ্র বললো— 'কেন ভাড়ার টাকা বুঝি'?

লোকটি সম্ভবত ভাড়ার টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলো। চলে যেতে যেতে বললো— 'মুঙলা এলে বোলো, আমি এসেছিলাম'।

'কী জন্য বললেন না'?

লোকটা পিছন ফিরে বললো— 'বললেই বুঝবে'। লোকটি আসবার আগে, (অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকলে মানুষের মন অনেক দিকে চলে বেড়ায়) রামচন্দ্রের মন স্বভাবতই অতীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। সে-সময়ের যত চিত্র, যত ঘটনা সবগুলিতে সেই প্রধান অংশ নিচ্ছিলো স্মৃতিতে। আর এখানে একটা ঘটনা ঘটছে, সংসার চলছে, আর সে বসে রয়েছে—এ অনুভবটা স্মৃতির পিছনে উঁকি দিচ্ছিলো। ঠিক এমন সময়ে বাড়িওয়ালার লোকটি তার উত্তর না-দিয়ে মুঙলার খোঁজ করে চলে গেলো। বুড়ো বাগ্‌দীর ছায়াটা সম্পূর্ণ না-এলেও খানিকটা যেন মনে এলো। সে তাহলে কিছু নয়, অস্তিত্ব নেই তার এরকম অনুভূতি হলো তার। ঘরের ভিতরে ঢুকে সে বউকে চেঁচিয়ে বললো— 'শালার অহঙ্কার দ্যাখো। কথাই কবের চায় না'।

'কী হলো'?

'হবি আবার কী? মুঙলাক কয়ো আমি না-দিলে ভাড়া যেন সে না-দেয়'। কঠোর শুনালো কথাটা।

পরে একসময়ে অবশ্য ভুলটা বুঝতেও যেন দেরি হলো না তার। বাড়িওয়ালা মুঙলাকে চেনে, বরাবর তার কাছ থেকেই ভাড়া নেয়। কাজেই সব দিক দিয়ে দেখলে লোকটি কোনো অন্যায় করেনি। কিন্তু মুঙলাকে একদিন সে বললো—কেনরে, তুই যে কাম করিস, আমি বুঝি পারিনে'।

'পারবা না কেন? করবা? যায়ো কাল সকালে'।

কিন্তু পরের দিন রামচন্দ্র যায়নি। মুঙলার কাজের জায়গা ইতিপূর্বেই সে দেখে এসেছে। কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে গান করে আর বিড়ি বাঁধে। কেমন যেন হাল্কা ধরনের কাজ, মনে ধরে না। মুঙলা ফিরে এসে বললো— 'ধুর, ওটা কাজই না'। আর একদিন মুঙলা বললো— 'কাজ করবা একজন কতেছিলো।'

'কি কাম রে'?

'দারোয়ানের কাম'।

'দারোয়ান? দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবি'?

'হাঁ'।

'ধুর'।

'ধুর ক্যান? ও কাম বুঝি খারাপ? ও তো আর হাল্কা কাজ না'।

'মাথায় ফ্যাটা বান্ধে দরজায় দাঁড়ায়ে থাকবো, না'? হাসতে হাসতে বললো রামচন্দ্র।

'দোষ কি তাতে? তোমার বাবাও তো মাথায় পাগ্‌গো বান্ধে সান্যালদের বাড়িতে পাহারা দিতো। সে বুঝিন সান্যালদের বাড়ি'?

'তা না তো কী'?

কথাটা মুঙলাও জানে। সান্যালদের পাইক হওয়া আর সহরের নিঃসম্পর্ক একজনের বাড়িতে দারোয়ান হওয়া এক কথা নয়। সান্যালদের পাইক ঠিক টাকার চাকর নয় যেন। কাজেই সেও হাসলো।

কিন্তু এ বিষয়টার অন্যদিকও আছে যা নিতান্ত কটু হয়ে উঠতে পারে। মুঙলাই সংসার চালাচ্ছে। উপার্জনকারীর মনে এক রকমের আত্মপ্রত্যয় জন্মায় যার বহিঃপ্রকাশ দম্ভের মতো তার আশ্রিতকে আঘাত করতে পারে। মুঙলার মনে কি এমন একটা দম্ভ দেখা দিচ্ছিলো তখন?

একদিন সে বললো— 'কাম-কাম করো...'

রামচন্দ্র বললো— 'নইলে হাত দুখান দিছে কনে ভাগোমান'।

'তা মিষ্টির কাম ভালো'?

'মিষ্টি'?

'হাঁ, মিষ্টির দোকানে কাম! লোকে খায়ে গেলে বাসন ধুতে হবি'।

'কী কস্'? রামচন্দ্র বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

'আমি তো করতেছি। তাতে সংসার চলে'।

'বাসন মাজতে হব'? রামচন্দ্র রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। কথা বলতে কথা জড়িয়ে জড়িয়ে গেলো। বললো সে—'কী কলি? বাসন মাজবেব কস্? শ্বশুর শাশুড়িকে খাতে দিয়ে তোর এত অহঙ্কার মুঙলা'?

মুঙলা জিভ কাটলো। কিন্তু এ লজ্জার তাতেই শেষ হয় না। এ পরিণাম সে আশা করেনি। কেঁদে ফেললো সে।

ক্রুদ্ধ বিমূঢ় রামচন্দ্র বারবার বললো—'এইটুক, এইটুক'!

সে যেন বলতে চাচ্ছে এইটুকুই বাকি ছিলো!

রামচন্দ্র ভাবলো দুখানা হাত যদি একসময়ে ভগবান দিয়েও থাকে এখন ফিরিয়ে নিয়েছে।

রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে কোমর ধরে আসে না শুধু মনও ধরে আসে, অসাড় হয়ে যায়।

শুকনো মুখ দেখে স্ত্রী বলে—'কী হলো'?

রামচন্দ্র বলে—'ধুর'।

আর-একদিন একটা দুঃখের ব্যাপারে রামচন্দ্র রেগে উঠলো। অনেকসময়ে রেশনের চালে কম পড়ে যায়। সেদিন খেয়ে উঠে যেতে যেতে হঠাৎ হাঁড়ির দিকে দৃষ্টি পড়লো রামচন্দ্রর। শূন্য হাঁড়ি দেখে সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো—'তুমি খাবা কী'?

বউ হেসে বললো— 'উপোস আজ'।

—'ক্যান? আর মুঙলা'।

মুঙলার নামে থতমত খেয়ে মিথ্যাটা কেমন করে সাজাতে পারলো না সনকা। কিন্তু হেসে হেসে বললো— 'চাল ছিলো না। মুঙলা না-খায়ে গেছে। দুপুরে সে চাল নিয়া ফিরলে রান্না করি খাবো দুজনে'।

মুঙলার শুকনো মুখটাই রামচন্দ্রের মনে হচ্ছিলো। দুঃখও হচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করলো—কী আশ্চর্য! বাড়ির মধ্যে কী ব্যাপার ঘটছে তাও কি এরা জানতে দেবে না তাকে! রাগে দুঃখে পুড়ে পুড়ে গেলো তার মন।

প্রায় চিৎকার করে সে বললো— 'তা আমাক পিণ্ডি গেলাস কেন'?

'বা রে, সকলেই না-খায়ে থাকে কী হবে?'

রামচন্দ্র ফেটে পড়ল রাগে— 'বলি বাড়ির ভাত আমার নাকি'?

বউ রামচন্দ্রকে ভয় করতো, সে মুখ নিচু করে বললো— 'তোমার কি কষ্ট সহ্য হয় অত'?

'হয় না, না? বলি অকালের সময় না-খায়ে মুঙলাক খাওয়াছিলো সে কেডা? তখন আমার সাথে শলা করতা? আর এখন মায়ে-বেটায় পরামর্শ হয় আমি জানবেরও পারিনে'।

দম দম করে পা ফেলে রামচন্দ্র বাইরে চলে গেলো। রাগ আর গ্লানি ঠেলাঠেলি করতে লাগলো তার বুকের মধ্যে। কিন্তু রাগ বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না, স্নেহটাও ফিরে এলো। কী কষ্ট করেছে মুঙলা! না-খেয়ে না পরে সংসারটা বয়ে বেড়াচ্ছে, আর সে চুপ করে বসে আছে। টাকা আছে তার—জমি বিক্রি করা টাকা, সে-টাকা থেকে কিছু দিলেও তো মুঙলার সাহায্য হয়। মুঙলাই-বা চায় না কেন? এত কী তার দেমাক।

কিন্তু একটুপরেই সে ভাবলো : কী করে সে দেবে সেই টাকা? আবাল্য প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যে-জমি তারই বিনিময়ে একমুঠো টাকা। চিন্তাগুলো উল্টোপাল্টে পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো। এর চাইতে পরিষ্কার করে চিন্তা করতে গেলে রামচন্দ্রের চাইতে বেশি ধীশক্তি দরকার। ঘরের সম্মুখে রোদ চকচকে মাটিতে মুঙলার আনা খুরপি দিয়ে খোঁড়া শুকনো মাটি মুঠো মুঠো করে হাতে তুলে গুঁড়ো করতে লাগলো রামচন্দ্র। এ কী হলো তার? সংসারের অনেক বিপাকে পড়ে নিজের লাঙলে জমির পাশে বসে সে মাটিকে স্পর্শ করে মন সুস্থ হতো তার। এ কি সেই মাটি?

কারো কারো চোখের তারা থাকে খয়রা। সে-তারা ছলছল করে না হয়তো জলভরে ; তাই বলে স্বামীকে সে মেয়ে কী কম ভালোবাসে? বরং যেন একটু ক্ষুধাতুর একটু-বা উদগ্র সে-ভালোবাসা। এখন আসল ব্যাপার হচ্ছে এই, তার চোখের তারার সঙ্গে তার ভালোবাসার কোনো সম্বন্ধই সম্ভবত নেই। আর যদি-বা থাকে তাহলে এইজন্য আছে : তার এই তারা দুটি একটু বিশিষ্ট হওয়াতে তার বাল্য থেকেই আমরা কারণে অকারণে তার চোখের তারার দিকে লক্ষ্য করেছি, আর সে বাধ্য হয়েছে মুখ নামিয়ে মনের তলায় খুঁজতে ; কিছু খুঁজে না পেয়ে তার ধারণা হয়েছে তাহলে অনন্যসাধারণ সে।

রামচন্দ্রের কপাল দোষে গোটাকয়েক এমন বৈশিষ্ট্য যেন জুটে গিয়েছিলো। একটি তার গোঁফ চুমরে কথা বলা। সবসময়ে সেটা বিশিষ্ট দেখায় না। অনেকসময়ে হাস্যকরও দেখায় যেমন দেখিয়েছিলো যখন গ্রাম ছাড়বার মুখে কাঁদতে গিয়ে সে গোঁফ চুমরে গিয়েছিলো। সেবার যখন সদরওয়ালা হাকিম সদলবলে গ্রাম ছাপ করতে গিয়ে পানা সারাবার উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছিলো, রামচন্দ্র হঠাৎ তার সামনেই গোঁপ চুমরে বলেছিলো, 'ও হাত দিয়ে তুলে ফেলবার কাম নয় বাবুমশাই, পদ্মা মজে গেছে। সবুর করেন, বুড়িগাঙের মুখে দু কোদাল আমিই মারবো'।

সেবার প্লাবন এসেছিলো কিনা পদ্মায় রামচন্দ্রের কোদাল মারার ফলে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু কথাটা তার মতো একটা সাধারণ কৃষকের মুখে শূন্যদম্ভের মতো শুনিয়েছিলো। তেমনি হাঁটা-চলার কথা। কত লোক কত রকমে হাঁটে। রামচন্দ্রও হাঁটে বইতো নয়। কিন্তু পায়ের একটা শিরা ছোটো বলেই হোক, কিম্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, পা দুটিকে সাধারণভাবে ফেলতে যেন পারে না সে। গোড়ালি দুটো পিছন দিকে একটু ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। ফলে সে যখন তেল কিনবার দুশ্চিন্তা নিয়ে হাটে যাচ্ছে, তখনো মনে হয় লোকটি মল্লযুদ্ধের পাঁয় তাড়া কষছে। এগুলোর সঙ্গে তার জীবনের ঘটনাগুলির হয়তো যোগ নেই, কিন্তু মনে হওয়া বিচিত্র নয় চোখের তারা খয়রা বলে সুনন্দা যেমন তার স্বামীকে একটু ক্ষুধাতুরা দৃষ্টিতে দেখে তেমনি রামচন্দ্রও এগুলোর ফলেই খানিকটা দলছাড়া হয়ে পড়েছে।

সংসারটা যদি ঘরের কোণের ছোটো ছোটো হাঁড়িকুড়ি, কাপড়ের টুকরোর পরিধেয়, ঘাস সুড়কির আহার্য, এসব উপাদানে তৈরি পুতুল খেলার আসরটি হতো, রামচন্দ্রকে তবে তার সঙ্গিনীদের বাড়ির কর্তা মানতে হতো। ঘন ঘন বাজারে পাঠাতে হতো তাকে ; নতুবা দুরন্ত ছেলের মতো সে অসুখী হয়ে খেলার সরঞ্জাম ভেঙেচুরে উল্টেপাল্টে দিতো। এরকম একটা ছেলেকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করো—কেন ভেঙে দিলি রে খেলা! সে কিছু বলতে পারবে না , অথবা বড়োজোর বলবে—ও কেন আমাকে ঘাস তুলে আনতে বলছে না অনেকক্ষণ থেকে। ছেলেটা নিজের অসন্তুষ্টির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়তো।

তেমনি হয়েছে রামচন্দ্রের। আমরা হলে হয়তো উপমার সাহায্যে অনুভবে ফুটিয়ে তুলতে চাইতাম, হয়তো বলতাম ঠিক যেখানটায় শূন্যমূল-তরুর মতো দাঁড়িয়ে আছি, সেখানটায় এসে বাঁক খেয়ে খানিকটা চর ফেলে জীবন সরে গেছে। রামচন্দ্র রাগ করেছে, পরমুহূর্তে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখেছে : হাট বাজার করা, বাড়ি ভাড়া দেওয়া, সংসার চালানো সব তো মুঙলাই তার হয়ে করছে। নিজে হাতে না-করলেই-বা কী এসে গেলো। তবু একটা বিমর্ষতা আসে। সে কারণ খুঁজে পায় না তার। মনে হয় আশ্রয়-শিবির ছেড়েই-বা কী হলো?

একদিন সুনন্দার সাথে দেখা হলো রামচন্দ্রের। মনটা ভার ভার ছিলো বলে প্রথমেই নজরে পড়েনি। কাপড়ের দোকানের দুটি সারির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত গলার শব্দ শুনে সে থেমেছিলো। দেখলো প্রায় সমবয়সী আর-একটি মেয়ের সঙ্গে দোকানে বসে কেনাকাটা করছে সুনন্দা। রামচন্দ্র শুনতে পেলো সুনন্দা বলছে—'না-না, ওটা তুলে রাখুন'।

সঙ্গিনী বললো—'নাও না ভাই, না-হয় আমিই কিনলাম'। সুনন্দা অনর্থক একটা ঝিলমিলে হাসিতে তার

কথাটা ডুবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। যে-জিনিসটা কিনেছিলো তার দাম দিয়ে রাস্তার এসে দাঁড়ালো।

সঙ্গিনী বললো– 'বেশ লোক যা হোক, শালটা না-হয় আমি দিলুম মাস্টারমশায়কে জন্মদিনে'।

সুনন্দা বললো– 'তোমার ভাইটি মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ছে না সম্প্রতি, অথচ নিয়মিত টাকা দিয়ে যাচ্ছো তোমরা। সেটাই তো উপহার হচ্ছে'।

'কিন্তু তা নয় ভাই তোমার দেবার যা দিও তুমি, কিন্তু এটাও তুমি দিলে জিনিসটাই দেয়া হবে 'আমার দেয়া' হবে না'।

ঠিক এই সময়ে রামচন্দ্রকে দেখতে পেলো সুনন্দা, যেন তাকেই খুঁজছিলো এমনি করে সুনন্দা বললো– 'এই যে রামচন্দ্র, তুমিই বলতো নিজের উপার্জনের পয়সা দিয়ে কোনো জিনিস কিনলে যে-সুখটা হয়, অন্য কেউ সেটা দিলে কী তা হয়'? এই বলে রামচন্দ্রকে কথা বলার অবসর না-দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো–'কেমন আছো? বউ ভালো? মুঙলা, তোমার ছেলেই বুঝি, সে তো ভালো আছো'?

'ভালো মাঠান, আপনি ভালো আছেন'?

'হাঁ, ভালো আছি'। এই বলে সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললো সুনন্দা– 'তুমি আমাকে, না আমাকে ঠিক নয়, তোমার মাস্টারমশাইকে শাল উপহার দিতে চাও। তা না-দিয়ে রামচন্দ্রকে একটা ঘর করবার মতো ব্যবস্থা করে দিতে পারো? ঘর মানে তোমার আশ্রয়ে সে থাকবে তা নয়। সে-ঘরখানি তারই হবে। সেখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকবে। তোমার দয়ার কথাটা ভুলেও মনে আসবে না তার'।

এরপর অবশ্য আর-একটু রামচন্দ্রের কুশল কামনা করে খুশির এলোমেলো একটা বাতাসের মতো সুনন্দা খরবা চোখের ইসারায় সঙ্গিনীকে কী একটা ইঙ্গিত করে সঙ্গিনীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলো।

তার সঙ্গিনীও সবসময়ে তার দৃষ্টির গভীরে কী অর্থ আছে বুঝতে পারে না। একসময়ে মনে হয় সঙ্গিনীর . মাস্টারমশাইকে কিছু দিতে গেলেই সুনন্দা হেসে হোক, কথার কৌশলে হোক দেওযাটা বন্ধ করে দেয়। সুনন্দার কী ধারণা হয়েছে অন্য অনেক ছাত্রীর মতো মাস্টারমশাইকে প্রেমে বাঁধবার চেষ্টায় আছে? ছি– বলতে গিয়ে সঙ্গিনী ভাবলো সুনন্দা নিজেই বলেছিলো বটে–আমার এই ঘরখানার চৌহদ্দিতে তুমি বেড়াতে তো আসবেই ; কিন্তু আমি যখন বাস করবো তখন কারো ছায়াই আর আমার ঘরের মাঝখানে এলে চলবে না। সেজন্য ওরা যতই বলুক আমার শোবারঘর আমার মনের মতো ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাশানেই সাজানো চলবে না। শুধু ঘর নয় স্বামীও , শুধু ঘর আর স্বামী কেন পৃথিবীতে তার যা কিছু সব সম্বন্ধেই বোধ হয় এই মত সুনন্দার। তার জীবনের উপাদান এবং সেগুলি অনুভবের মধ্যে অন্যের রুচির ছায়াটুকুও সে রাখতে চায় না, যেন তাতেই ব্যাঘাত হবে ভোগের, এমন উগ্র জীবন-লালসা তার। সুনন্দার ঝলমলে খুশির ভাবটায় খুশি হয়ে বাসার দিকে ফিরতে ফিরতে রামচন্দ্র ভাবলো : এই তো সুনন্দাও আশ্রয়-শিবিরে ছিলো। কত দুঃখে সেদিন তার সারা মুখ কালো হয়ে থাকতো। আজ কত সুখী সে। আর তার কপালে সুখ নেই। প্রায় বাসার কাছে এসে রামচন্দ্রের একথাও মনে হলো–নিজের উপার্জনের পয়সা দিয়ে জিনিস কিনলে সুখ হয়। কথাটা সে বারেবারে ভাবলো। কিন্তু তার দুঃখের কারণও যে নিজের উপার্জনের পয়সায় সংসার করতে না-পারাও খানিকটা বটে, ঠিক এই কথাগুলোর সাহায্যই তা যেন সে বুঝতে পারলো না।

সেদিন অনুভূতিটা স্পষ্ট হয়ে না-উঠলেও, আর একদিন হলো : তার প্রতিবেশী সনাতন চাটুয্যে বাজে কথার লোক নয়। একদিন সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ছাতা-কাপড় বাসায় রেখে রামচন্দ্রকে ডেকে নিলো ; বললো– 'টাকা পয়সা বোধহয় কিছুই নেই তোমার? এ অবস্থায় সহরে থেকে কী করবে? তার চাইতে এদিকের কোনো গ্রামে চলে যাও। সেখানে কৃষকদের মধ্যে কাজ-টাজ পেতে পারো হয়তো'। একটু ভেবে সে আবার বললো– 'আচ্ছা রোসো আমি যাবো কাল-পরশু নাগাদ গ্রামের দিকে নিয়ে যাবো তোমাকে'।

রামচন্দ্র বললো– 'ইদিকে অনেক খেতখামার আছে'?

'তা নেই? বলো কী। এদিকের এত লোক খাচ্ছে কী তবে'? রামচন্দ্র কথা বললো– কিন্তু বলবার ঠিক আগে তার কানের পাশদুটো গরম হয়ে উঠলো রক্তের উচ্ছ্বাসে। বললো– 'একটু-আধটু, এই এতটুকু জমি কিনবের পাওয়া যায়'?

'তা যায়। কিনবে নাকি? টাকা আছে বলো'?

'যায়? জমি কিনবের পাওয়া যায়'? রামচন্দ্রের মুখ যেন অচেনা হয়ে উঠলো।

পরের দিন সনাতনের ঘুম ভাঙবার আগেই রামচন্দ্র গিয়ে তার দরজায় আঘাত করলো।

'কী, এত সকালে'?

পুরনো ময়লা কাপড়ের ছোটো একটা পুঁটুলি বার করে রামচন্দ্র সনাতনের পায়ের কাছে রেখে বললো— 'এই আছে আমার। একটু কিছু কিনে দিতে হবি'।

'তার জন্য এমন করছো কেন, সে হবে'।

টাকাটা সনাতনের হাতে তুলে দিয়ে রামচন্দ্র পথে বেরিয়ে পড়েছিলো। দুপুরে সে আসছে না দেখে তার স্ত্রী দুশ্চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলো, এমন সময়ে সে বাসায় ফিরলো। একটা নতুন ফতুয়া কিনেছে সে, কাঁধে রাখবার একটা লাল গামছা ; একটা ঠোঙায় করে জিলিপিও এনেছে কিনে। রামচন্দ্র ভাবলো এখন নয় সব ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়ে বলবে তারপরে ; কিন্তু গোপন করতে পারলো না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে সকালে ঘুম ভাঙতেই স্ত্রীকে এবং মুঙলাকে ডেকে তুললো, বললো—'কেন্‌রে জমি খানটেক কিনব নাকি'? তারপর সেই অনুভবটা এলো, বললো, একটু-বা লজ্জিত মুখে— 'তোমাদের উপর রাগ যে করছি, সে যে কেন্ তা এখন বুঝি, জমিজিরেত না-থাকে মনে হতেছিলো মরে গেছি যেন্'।

সনাতন টাকাটা আত্মসাৎ করলো না। নির্দিষ্ট দিনটিতে রামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো গ্রামের দিকে। বেশি দূরে নয় গ্রাম, খানিকটা ট্রেনে যেতে হয়, খানিকটা পায়ে হেঁটে। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে সনাতনের বাড়িতে পৌঁছে গেলো তারা ; সনাতন বড়োমানুষ নয়, তবু আদর যত্ন করলো অতিথিকে।

পরদিন সকালে প্রথমে গেলো তারা লোকের মুখে সন্ধান পাওয়া জমিগুলোর খোঁজে। গল্পগুজবের যা পরিণতি হয় তাই হলো খানিকটা ; সেসব জমি মোটেই বিক্রির নয়, কিম্বা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। সনাতন দমবার পাত্র নয়, পাশের গাঁয়ে যে-জমিটুকু তার এক আত্মীয় বিক্রি করবে বলেছিলো এবং যেটা সম্বন্ধে সে কৃতনিশ্চয় ছিলো তার উদ্দেশে চললো। বেলা যখন প্রায় দুপুর, তখন গ্রামে পৌঁছে আত্মীয়ের বাড়ি খুঁজে বার করলো সনাতন। দুজনেই ক্লান্ত হয়েছিলো। সনাতন বললো, এবেলা জিরিয়ে নিয়ে ওবেলায় কথা বলা যাবে। কিন্তু রামচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে কথাটা তখনই পাড়লো।

মামুলি দু-চার কথাতেই জানা গেলো একশো কারণের যে কারণেই হোক জমি সে এখন বিক্রি করবে না। তার মধ্যে একটি কারণ রামচন্দ্র ভিনদেশি, এবং তার মতো অন্য অনেক ভিনদেশি এসে সামন্তিনী গ্রামের পড়ো জমিগুলো দখল করে বসেছে— 'তুমি ঘাবড়িও না রামচন্দ্র, জমির একটা ব্যবস্থা করে দেবো। ওই যে বললো সামন্তিনীতে তোমাদের দেশের অনেক লোক আছে, সেখানে অনেক জমি অনেকদিন থেকে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। সামন্তিনীর মালিকদের আমি চিনি, নিয়ে যাবো তোমাকে'।

রামচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো। পথের রৌদ্র, শ্রম, অনাহার, আশাভঙ্গে লোকটার চেহারাও যেন বদলে গেছে। ভাঙা ভাঙা গলায় রামচন্দ্র বললো— 'সামন্তিনী যাবেন'?

'এখন? পাগল। দু'খানা বড়ো মাঠ পার হতে হয় সে-গ্রামে যেতে। গাছ একটা নেই সে-মাঠে দাঁড়াবে একদণ্ড'।

স্নানের যোগাড়ে সনাতন বাড়ির ভিতরে গিয়েছিলো। এসে দেখলো রামচন্দ্র দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তখনো সনাতন ভাবতে পারেনি কতদূর হঠকারী সে। সনাতন বললো— 'তেল নাও, স্নান করে আসি চলো পুকুর থেকে'।

মাথায় তেল মেখে যন্ত্রচালিতের মতো রামচন্দ্র সনাতনের পিছন পিছন চললো।

পুকুরপাড়টা একটু উঁচু। সেখানে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র দিগন্তের অদৃশ্য-প্রায় গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে বললো— 'সামন্তিনী কোন দিকে হবে'?

হাতের ইশারায় দশ-বারোখানি গ্রামের পরিস্থিতির কোনো একটা অনির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে সনাতন বললো— 'হবে ওদিকটায়। দুপুরের পর বেরিয়ে পড়লে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবো'।

রামচন্দ্র একটু লক্ষ্য করেই যেন বুঝতে পারলো পুকুরের পর থেকে যে-মাঠ আরম্ভ হয়েছে, মস্ত বড়ো মাঠ সেটি। একটি গাছও চোখে পড়ে না। সে মাঠের শেষেও আর-একটি মাঠ ধু ধু করছে দূরে। তারপরেই বোধ হয় সামন্তিনী, আর সেখানে পৌঁছতে পারলে।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো—'সামন্তিনী যেতে হলে এমন মাঠই পারি দিতে হয়, না'?

'হ্যাঁ, এ রকমই দুখানা মাঠ'।

সনাতন জলে নামলো। রামচন্দ্র মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলো সামন্তিনী যদি ওই গ্রাম হয় আর এই রকম দুখানা মাঠই যদি পার হতে হয় তবে একবেলা কেন লাগবে।

সনাতন স্নান শেষ করে পিছন ফিরে দেখলো রামচন্দ্র তখনো জলে নামেনি। সে ভাবলো আহা দুঃখীলোক, আঘাত পাওয়া লোক। দুটো সান্ত্বনা বাক্য বলে রামচন্দ্রকে সে স্নান করাতে নামাবে। এই ভেবে পারে উঠে দেখলো রামচন্দ্র নেই। সনাতন একবার পুকুরের দিকে একবার চারিদিকে তাকালো। পুকুরে ডুবে মরবার মতো জল নেই। এবার নজরে পড়লো সনাতনের—মাঠের প্রায় মাঝামাঝি কে হন হন করে চলেছে। কী সাংঘাতিক। এই দুপুর রোদে এই মাঠে নেমেছে। সামন্তিনী যাচ্ছে নাকি? সে তো নিজেও জানে না এ মাঠের ওপারে কোনো [illegible] আছে কিনা। ধক করে উঠলো তার বুকের মধ্যে। তাহলে সেই কি জমি কিনে দেবে বলে এনে লোকটার [illegible] কারণ হলো নাকি? রামচন্দ্রের মনে হয়েছিলো এই সময়ে—মাঠ, জমি, বলদ, চাষ, বেঁচে থাকার অনুভবটা [illegible] ছুটে পালাচ্ছে। ধরবার জন্য রামচন্দ্র গতি বাড়িয়ে দিলো। সনাতনও মাঠের উপর দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গেলো। মনে হলো—আহা, বুড়োলোকটা যে গো। যতই শক্ত হোক বয়স হয়েছে। সত্যিসত্যি দেহ যখন ঘামে [illegible] গেছে তখন সনাতন দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকলো।

রামচন্দ্র যেন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কী বললো স্বরটা ভেসে এলো, অর্থ বোঝা গেলো না।

সুনন্দা সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখলো স্বামী বাসায় নেই। তার চোখ দুটি আবার সেই টোপাজ মণির মতো ঝলমল করে উঠলো জল ও জ্যোতিতে ভরে। এমন উপযুক্ত মানুষ না পেলে তাকে মনের মানুষ করা যায় না। সেই মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ কেঁদে উঠলো স্বামীর জন্য, যেমন করে তবু না পাওয়া মানুষটির জন্য কাঁদে।

এরপরে সে ভাবলো, মাথাটা কেন ধরে রেচারার? চোখটাই কি আবার খারাপ হলো? আজ না-গেলে চলতো না এমন নয়। কিন্তু পর পর চারদিন যায়নি পড়াতে। গত মাসেও আট দশ দিন কামাই হয়েছিলো। অথচ তার জন্যে মাইনে ওরা কাটেনি। গত মাসে কামাই করা দিনগুলোর টাকা নিতে হয়েছে সংসার চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে। এ মাসেও টাকাগুলোর প্রয়োজন তেমনি কটু, কিন্তু এ মাসে কামাই করা দিনের ছাপ দেয়া টাকা সে নিতে পারবে না।

রাতে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে সে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে বসলো, চোখের পক্ষ্মগুলো মেয়েদের মতো দীর্ঘ ও কোমল করে ছাপ ফেলেছে চোখের কোলে। আহা কত কৃশ লাগছে মুখখানা। প্রায় সোচ্চার হলো তার ভাবনা তুমি তো জানো না, তোমাকে রুগ্ন দেহ নিয়ে অর্থ উপার্জনে পাঠাতে কেমন করে ওঠে তোমার নন্দিনীর বুকটা।

দিনের বেলায় ঘটনাটার কথা মনে হলো। রান্নাঘর থেকে সে দেখতে পেয়েছিলো স্বামী বুকের কাছে আঙুর আঁকা তার নতুন কেনা চাঁপা রঙের ব্লাউজটা দেখছেন।

সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুনন্দা বলেছিলো—'তোমার হাত ধরে বেড়াতে যাবো বলে কিনেছি। তুমি আমার বাহুকে আলিঙ্গন করে চলতে গেলে তোমার হাতটা যেখানে থাকবে, ঠিক সেখানে আঙুরগুলো কেমন থলো থলো এঁকেছে বলতো? কী ভাবছো—টাকা গেলো কতগুলো?

স্বামী হেসে বলেছিলো— 'তা কতকটা বটে, তাও নয়। ভাবছি তোমার এত লোভ জীবনের, না জানি কত কষ্ট হয়েছে তোমার পথের দিনগুলোতে'।

'খুব বলেছো। বোসো তরকারিটা নামিয়ে আসি'।

রাত্রিতে সুনন্দা জানালার কাছে উঠে গেলো। বাড়ির পাশের খোলা জায়গাটুকুতে খানিকটা আলো পড়েছে। দিনের বেলায় অনেকটা সময় রোদ থাকে এ জমিটুকুতে। একটা হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি পশ্চিমা মেয়ে রুগ্ন স্বামীকে মাদুর পেতে সে রোদে শুইয়ে রেখে রাশি রাশি গোবর জড়ো করে ঘুঁটে দেয়। একটা ছোটোছেলে গোবর মাটি দিয়ে খেলা করে। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। কচি কচি হাতে মায়ের মুখখানি নিজের মুখের দিকে ফিরিয়ে কী বলে ছুটে পালায়। কত অল্প আয়োজনে কত সুখী এরা। সুনন্দা একবার ভাবলো সেও কি এমন করে সুখী হতে পারতো। না, পারতো না। সে মনে মনে বললো - অল্পে সুখ নেই। বিয়ের রাতে স্বামী তাকে বলেছিলো—নন্দিনী, অসম্ভবের দুরাশা আর রইলো না, তোমাকে পেলাম। জীবন কি থেমে যাবে? না, যাবে না দেখো। আর চিনাংশুক কেন সৃষ্টি হয়েছিলো, যদি না মানুষ সেটা উপভোগ করবে?

সুনন্দা একটু জোর পেয়ে বিছানার ফিরে এলো। স্বামীর কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে হাসিমুখে তাব গা ঘেঁসে শুয়ে পড়লো। তার হাসিব উত্তাপটা ঘুমন্ত স্বামীর দেহে সঞ্চারিত হয়ে যাক এ রকম একটা অস্ফুট কামনা হলো মনে।

এর কিছুদিন পরে রেলগাড়ির একটা থার্ড ক্লাস কামবায় ধুলোমাটির মধ্যে হাঁটু দুটির মধ্যে মাথা গুঁজে বসে চলেছিলো রামচন্দ্র। অস্নাত রুক্ষ মস্তিষ্কের চিন্তা করার মতো অবস্থা ছিলো না। কালিমাখা হাঁড়ি-কুড়ি, পোঁটলা পুটলি, কাঁথা-কোদালের মধ্যে আর কতগুলি নারী-পুরুষ তার মতোই গাড়ির মেঝেতে বসে চলেছে। তাদের হাসিভরা মুখ দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছিলো, আহা, বেশ সুখী ওরা। বাসার ছোটোঘরটির কথা বারবার মনে পড়তে লাগলো তার। সুনন্দাব যেমন হয়েছিলো ঘুঁটেওয়ালীর সংসার দেখে।

সন্ধ্যার পরে সহরে পৌঁছালো রামচন্দ্র। সন্ধ্যায় এদিকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, সেটা রামচন্দ্রের মুখে-চোখে লাগলো। বউটাব কথা মনে হলো—আহা, না-জানি কত ভেবেছে বেচাবা এ কয়েকটা দিন। মুঙলাব কথা মনে হলো। সে না-জানি কত উৎকণ্ঠা নিয়ে খোঁজ কবেছে তার।

বাসার কাছে এসে সে দেখলো আলো জ্বলছে না। রামচন্দ্র ভাবলো, একা মুঙলা, তেল আনতে পারেনি যোগাড করে , কিম্বা সে হয়তো কাজ থেকে ফেরেনি ; বউ বোধ হয় আলো জ্বালেনি তেলেব অভাবে।

কিন্তু অনুমান করতে যে-সময়টা লাগে সত্যটা অনুভব করতে ততটা লাগে না।

'অ বউ, অ বউ' বলে বারদুয়েক ডেকে রামচন্দ্র শূন্য অন্ধকার থেকে ছুটে বেবিযে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়ালো সনাতনের ঘরেব সম্মুখে।

'দাদাবাবু, অ দাদাবাবু'।

সনাতন দরজা খুলে রামচন্দ্রকে দেখে প্রায় চমকে উঠে বললো—'বেঁচে আছো তুমি? অ্যাঁ, বেঁচে আছো'?

'বউ কই? মুঙলা'? রামচন্দ্র যেন আছড়ে পডলো সনাতনেব পায়েব কাছে।

'আরে, আবে ওঠো। বেঁচে আছে তারা'।

সনাতন বিশেষ বিব্রত বোধ করলো। ফিরে এসে রামচন্দ্রের সামন্তিনী যাওযার কথা সে মুঙলাকে বলেছিলো। তাব মৃত্যুর যে-আশঙ্কা সে করেছিলো, সেটাও সে গোপন করতে পাবেনি। খবরটা শোনার পব দু-তিন দিন বউটা বুক চাপড়ে কেঁদেছিলো। মুঙলা বারংবার আসতো আর প্রশ্ন ক'রে ক'রে রামচন্দ্র বেঁচে আছে এই আশ্বাস পাওয়াব চেষ্টা করতো। তারপর একদিন সকাল থেকেই তারা দুজনে কোথায় চলে গেছে।

সনাতন খানিকটা নির্বাক থেকে অবশেষে বললো—'আজ রাত্রিতে থাকো, কাল সকালে দুজনে মিলে খোঁজ করা যাবে'।

রামচন্দ্র ততক্ষণে দরজার বাইরে অচেনা সহরের তলহীন অন্ধকারে নেমে গেছে।

সকালে পথ চলতি লোকের পায়ের শব্দে চোখ মেলে রামচন্দ্র দেখলো তার গায়ের কাছে দু-তিনটে শালিক একটা খাবারের ঠোঙা নিয়ে কিচকিচ কবছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে মনে হলো মুঙলা যে-দোকানে বসে বিড়ি বাঁধতো তারই কাছে এসে কাল বাত্রিতে সে বসে পড়েছিলো একসময়ে।

সনাতন যেমন পারেনি বিড়ির দোকানদার তেমন পারলো না তাদের খোঁজ বলতে। সারাদিন কাটলো পথে পথে। সনাতন কী করে দেখতে পেয়ে ধরে-পাকড়ে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। রামচন্দ্র ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—'খবর আনবের কথা ছিলো, জানো নো তো? আচ্ছা একটু খোঁজবো তাগরে'।

তারপর সনাতনের দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো সে। সনাতন দেখলো মেরুদণ্ডটা যেন বেঁকে আছে, সাদা-চুলে-ভরা মাথাটা সম্মুখে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। তবুও কী দম্ভ-ভরা চলন!

দুঃখের প্রথম আঘাতটা মানুষকে ব্যথার অভিনবত্বে খানিকটা বশীভূত করে ফেলে। অভ্যাসের ফলে সে বোধটা চলে গেলে মানুষ মস্তিষ্কেব সাহায্যে প্রতিকারে নামে। কিন্তু সম্পূর্ণ একা এত বড়ো সহরে রামচন্দ্রের পক্ষে মস্তিষ্ক চালনা করে লাভ কিছু হতো না ; ববং তার চেহারা যেমন হয়ে উঠেছিলো তাতে মনে হয় তার গ্রামের লোকগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে, কেষ্টদাসের বৈষ্ণবীর সঙ্গে যদি দেখা না-হতো দু-চার দিনের মধ্যে লোকটি পাগল হয়ে যেতো।

মুঙলা মাঝে মাঝে যে-দোকান থেকে জিলিপি কিনতো একদিন সন্ধ্যায় রামচন্দ্র সেই দোকানে খোঁজ করলো। দোকানদার অবশ্য তার মুখে মুঙলার বর্ণনা শুনে কিছুই বলতে পারেনি। কিন্তু কেষ্টদাসের সঙ্গে দেখা

হয়েছিলো রামচন্দ্রেব। তাকে কেষ্টদাস নিজের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলো সকলে মিলে খুঁজবে এই আশ্বাস দিয়ে। সেখানে গিয়েও লাভ হলো না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো কেষ্টদাস খোঁজ করতে সাহায্য করা দূরের কথা, গ্রামের লোকগুলো কোথায় আছে তাও জানে না। খোলা খাটালের পাশে এই বস্তিতে যে তারা কেউ নেই এটুকুই সে বলতে পারে।

কিন্তু খানিকটা আশা পেলো রামচন্দ্র, যার মূল্য অনেক। রামচন্দ্রকে বলে-কয়ে এ বেলাটা থেকে যেতে রাজী করিয়েছে বৈষ্ণবী। উনুনের উপর ফুটন্ত জলের দিকে প্রায় সব বাঙালি মেয়ের মতো সে চিন্তা করতে বসেছিলো। প্রথমে মনে করেছিলো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না-পেরে মুঙলারা পালিয়েছে। কিন্তু আর-একটু ভেবে মনে হলো রামচন্দ্রের মতো লোককে ফেলে পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা, চিন্তাও করতে পারে না কোনো বউ। (হয়তো চিন্তার সময়ে নিজেকে সে রামচন্দ্রের স্ত্রীব পবিবর্ত ধরে নিয়েছিলো) তার খুব বিশ্বাস হলো রামচন্দ্রর স্ত্রী মুঙলাকে সঙ্গে নিয়ে তাকেই খুঁজতে গিয়েছে। যদিও তাদের পক্ষে সেটা খুবই দুঃসাহসের হবে।

কেষ্টদাস আব বামচন্দ্র স্নান করে ফিরে এলে বৈষ্ণবী কেষ্টদাসকে বললো—'আমি যেন কতে পারি কনে গেছে মুঙলারা। কও তো কনে গেছিলো বামচন্দ্র'?

'সামন্তিনীতে'।

বৈষ্ণবী এবাব একটু বসিকতা কবে বললো—'তবে তারাও গেছে সেখানে'।

বামচন্দ্রেব সামনে একটু সংযত হযে সে বললো-'আপনি যেখানে গেছিলেন সেখানে যদি মুঙলারা যেয়ে থাকে'।

কথাটা একেবারে নতুন নয়, কোনো কোনো সময়ে রামচন্দ্রেরও মনে হয়েছে। সনাতনের মুখে শুনে তারা হযতো গেছে তাকে খুঁজতে, কিন্তু যারা হারিয়ে গেছে তাবা কোনো এক বিশেষ জায়গায় আছে এ যেন লোকেব মন মানতে চায না। তখন আশ্বাসটা অন্যের মুখে শুনে বুকে জোর পাওয়া যায়।

কেষ্টদাসেব বাসা থেকে বেবিয়ে এসে রামচন্দ্রের মনে হলো, এখন একবার সনাতনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার সামন্তিনীতে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবার জন্য আয়োজন করতে হলে।

ঠিক এখানটায় এসে আমার একবার মনে হয় মানুষ এবং তার স্থান-কালের অবস্থান পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত কবে। তাব ফলে তার জীবনের ঘটনাগুলো সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অন্য কোনো বহিঃশক্তিরও হাত আছে যেন এ ব্যাপারে। চেতন কিম্বা অচেতন হোক সে-শক্তিটি যেন মাঝে মাঝে একটি ঘটনাব সূত্রপাত করে দেয় অলক্ষ্য থেকে।

বামচন্দ্র সামন্তিনীতে অবশ্যই যেতো। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর বৈষ্ণবীর দুশ্চিন্তা হলো। কেষ্টদাসকে ডেকে বললো—'আচ্ছা ওরা যদি সামন্তিনীত না-যায়ে থাকে'।

'না, মনে কয় গেছে'।

বৈষ্ণবী রামচন্দ্রের মুখে সামন্তিনীর দুর্গমতার কথা শুনেছিলো, বললো—'গেলেই-বা কী? তারা হয়তো বেঁচে নাই'।

বৈষ্ণবীর আশঙ্কা হলো, রামচন্দ্র সেখানে আশ্বাস ভরা প্রাণ নিয়ে ছুটে গিয়ে যদি না-পায় তাদের? এ আশঙ্কা যেন তাদের মৃত্যুর চাইতেও বড়ো বোধ হলো। আরো-একটু ভেবে সে কেষ্টদাসকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় রামচন্দ্রের বাসায় গেলো। একটু আড়ালে থেকে সে কেষ্টদাসকে দিয়ে রামচন্দ্রকে বলে পাঠালো, ওরা হয়তো এতদিন রামচন্দ্রকে না-পেয়ে সহরের দিকে ফিরছে। যদি ফিরে এসে রামচন্দ্রকে না-পেয়ে অন্য কোথাও চলে যায়? কাজেই এখানেই প্রতীক্ষা করা উচিত।

এমন করে রামচন্দ্রের যাওয়া বন্ধ হলো সামন্তিনীতে।

এরপরে দুচোখে প্রতীক্ষা নিয়ে সহরেব পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো রামচন্দ্র। কড়া রোদে পিচের পথ যখন তেতে ওঠে তখন সে বাসায় ফিরে যায়। চাল-ডাল, কোনোদিন-বা শুধু চালই ফুটিয়ে খায় সে। রোদ পড়তেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নিরুদ্দিষ্টভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। জনতার মধ্যে যে-উদ্দাম জীবনস্রোত থাকে মাঝে মাঝে সেটাও তাকে টেনে নেয়। কখনো দেখা যায় ট্রামলাইন যেখানে মেরামত হচ্ছে তার কাছে উবু হয়ে সে বসে আছে, কখনো দেখা যায় তাকে পথের ধারে কোনো গোশালায় বিচুলির দাম নিয়ে গোয়ালাদের সঙ্গে আলাপ করতে, কোনো কোনো দিন সন্ধ্যায় সনাতনের কাছে গিয়ে বসে সে। যে-আশ্বাসের কথাগুলো সে

নিজেই বলেছে সনাতনকে, সেগুলোই সনাতন তাকে একটি একটি করে বলে। সে বসে বসে শোনে। মাঝে মাঝে মনে হয় সনাতনের দুমাস হতে চললো, কী আশ্চর্য ধৈর্য মানুষটার।

ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিতে বাসায় থাকতে না-পেরে সে পথে বেরিয়েছিলো। মাঝ রাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফুটপাতে শুতে গিয়ে পাহারাওয়ালার তাড়ার মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিলো—'কেন্, মানুষ যাতে যাতে পা দিয়ে হাঁটে, আমি তাতে শুলি পরেই ক্ষয়ে যায়'?

আর-একদিন রাত্রিতে, সেদিন ঘুম এলো না কিছুতেই, প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকতে থাকতে নিজে থেকেই মাথাটা নুয়ে এলো বিছানার উপরে, আর চোখ ফেটে সে কী জল।

পরদিন সকালে কেষ্টদাসের বৈষ্ণবীর কাছে গিয়ে বললো সে—'কেন্‌বে উরা আসে না কেন্'?

বৈষ্ণবী উত্তর দেয়ার আগে সে নিজেই বললো, গলাটা কেঁপে গেলো তার, 'আমার মন কী কয় জানিস, উরা বাঁচে নাই। বউ মরেছে, মুঙলা পাগল হয়ে গেছে'।

বৈষ্ণবী কী বলবে? তারও কান্না পেতে লাগলো, কিন্তু মেয়েদের একটা বিশেষ শক্তি আছে বেটাছেলেকে সান্ত্বনা দেয়ার। বুদ্ধি যখন হার মানে বিশেষ একটা বৃত্তি হয়তো তাকে ভাষা যুগিয়ে দেয়।

বৈষ্ণবী বললো, 'কী কন। ভগোমানের আপনে কী করছেন যে তারা মরবি? একখানা চিঠি লিখে দাও'।

যারা সচরাচর চিঠি লেখে না বা পায় না চিঠির মূল্য তাদের কাছে অনেক। 'হয় হয়, বুড়া হয়ে খোকা হয়ে যাতিছি'।—এই বলে রামচন্দ্র ফিরে গিয়েছিলো সনাতনের কাছে। মুঙলাদের খোঁজ নিতে বলে সার্মন্তিনীতে কয়েকজনকে চিঠি লেখালো তাকে দিয়ে। তারপরে নতুন পর্যায়ে প্রতীক্ষা করতে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো সে।

রাস্তায় সে এখন শুধু হেঁটেই বেড়ায় না। এখন ফিরিওয়ালার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। রাস্তার ধারে বসে সে ছোটো ছোটো জামা, প্যান্ট, গামছা এসব বিক্রি করে। রামচন্দ্র শুনেছে এতে তার দিন গুজরান হয়। লোকটার সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করা যায়। সময়টা কাটে। ফিরিওয়ালার দুঃখ যেন তার নিজের দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত বোধ হয় রামচন্দ্রের। যেন চুরি করেছে, এমন একটা কুণ্ঠিত ভাব লোকটার সব সময়ে। একদিন সে সারাদিনের বিক্রির টাকাটাই তুলে দিলো একটা পুলিসের হাতে কাঁদো কাঁদো মুখে। রামচন্দ্র কাছেই ছিলো।

রামচন্দ্র বললো—'কে ওকে দিলা, খাবা কী'?

ফিরিওয়ালা বললো—'নইলে যে রাস্তায় বসতে দেয় না'।

'রাস্তা তো সবকারের'।

ফিরিওয়ালা শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখে চেয়ে রইলো।

খুব বিরক্ত হয়ে রামচন্দ্র ভাবলো : এ লোকটা এরকম করে বেঁচে থাকে কেন? মরে গেলেও তো পারে। জমিদারের নায়েব একবার অন্যায় জুলুম করে খাজনা আদায় করবে বলাতে জেদ করে সে বহুদিন মামলা করেছিলো লোকসান দিয়ে দিয়ে। সেই জেদের ভাবটা মনে এলো তার।

একদিন ফিরিওয়ালার কাছে বসে থাকতে থাকতেই সে দেখলো একটা জোয়ান ছেলে মাথায় এক বস্তা কয়লা নিয়ে যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়ো ঘামের সঙ্গে মিশে কালির মতো বুক-পিঠ বেয়ে গড়াচ্ছে তার। কালিতে মুখ মাখা হলেও রামচন্দ্র চিনতে পারলো ভক্ত কামারের ছেলে বোঁচা। রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো—'বোঁচা যে'। লোকটি মুখ ফিরিয়ে দেখলো তাকে। খুশি হয়ে হাসলো। মাথার ভারে কথা বলতে পারলো না। কিন্তু কাছেই কোথাও কয়লা নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসে রামচন্দ্রকে নিয়ে গেলো যে-কয়লার গুদামে সে কাজ করে সেখানে। রামচন্দ্র জানতে পারলো, ভক্ত কামার আর তার আর-এক ছেলে নদীর ধারে পাটের কলে কাজ পেয়েছে। বাসাও পেয়েছে তারা কারখানা থেকে। আর সে বাসাও ভালো। বোঁচার বোধ হয় আরো কয়লা পৌঁছে দেবার ছিলো, সে চলে গেলো।

বিকেলে নদীর পারে লোহার কারখানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রামচন্দ্র। তখন কলের কাজ হয়ে গেছে, কুলিরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসছে। ছোটো ছোটো দলে চলেছে।

রামচন্দ্র দলছাড়া একজনকে পেয়ে বললো—'ভক্ত কামারকে চেনো'?

'চিনি। ঐ যে কীর্তন গায়, সে তো'।

এরপরে লোকটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো ভক্ত কামারের খুপরি পর্যন্ত। টিনের একটা লম্বা ব্যারাকের অন্ধকার খুপরিতে (খানিকটা ময়লা কাদাজল পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে হলো) উনুনে আগুন জ্বলছে। আগুনের আভাটা রামচন্দ্রের মুখে এসে পড়ায় তাকে চিনতে পেরে সকলে সমস্বরে চীৎকার করে অভিনন্দন জানালো। ভক্ত কামার নিজে উঠে গিয়ে একটা দড়ির চৌপায়া এনে বসতে দিলো তাকে।

দু-চারটে মামুলি প্রশ্নের লেনদেনের পর রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ভক্ত বললো—'ভালো ভাই, ভগবান যেন ভালোই রাখেছে। দেশে তো কাম ছিলো না। ধরো যে, গোরুর গাড়ির চাকা বানান, তাও-বা কত হত? ধরো যে, সংসার চলতি চায় না'।

উক্ত অনর্গল 'ধরো যে' কথাটা এখানে ওখানে বসিয়ে ভক্ত কামার তার বর্তমান স্বচ্ছলতার কথা বলে গেলো। দুটি ঘরও পেয়েছে ভক্ত, দেশে তার ঘর একখানাই মাত্র অবশিষ্ট ছিলো। যতদূর মনে পড়ে রামচন্দ্রের, দ্বিতীয় ঘরটির টিন একখানা করে বিক্রি করে শেষের দিকে ভক্ত কামার তার ডুবন্ত সংসারটাকে ভাসিয়ে রাখবার বৃথা চেষ্টা করতো।

ভক্তর একটা ছেলে ফরফর করে বলে উঠলো—'আমরা ইস্টাক্ করব'।

ভোলাবাবু কইছে। 'ঘর দিবিনে যাবি কনে? ঘরও দিবি দরমাহাও বাড়াবি'।

ছেলেটির বক্তব্য অবশ্য মজুরদের সাধারণ বক্তব্য স্ট্রাইক অর্থাৎ ধর্মঘট।

ভক্ত ঘা-খাওয়া লোক। অনেক কষ্টের আশ্রয় পেয়েছে। একটু ভয় ভয় করে তার। বললে—'থামেক। দিনরাত তোর ইস্টাক'।

রামচন্দ্র কথাটা বোঝেনি, ভাবলো অন্যায় কিছু হবে।

ভক্ত নিজেই কিন্তু একটুপরে বললে—'তা ভাই, ধরো যে, ভোলাবাবু অন্যায় কয় না। খাটব আমরা, আর টাকা নিবি ওরা। ছাওয়ালরা জোর-জার করে টাকা কেড়ে নিতে চায়, তা নিউক'।

রামচন্দ্র ভাবলো : আহা, ভগোমান মুখ তুলে চেয়েছেন। অন্ধকারের মধ্যে এই ছোট্ট ঘরখানিতে পৃথিবীতে মানুষ যা-কিছু কামনা করে, সব গুছিয়ে নিয়েছে ভক্ত। কত শান্তি, কত আরাম। আর-একটু ভাবতে গিয়ে মনে হলো, যে-ভক্ত মুখ তুলে কথা বলতে পারতো না, দারিদ্র্য যে জোর করে তার মাথা নুইয়ে দিতো, সেও এখন নিজের দাবি জানানোর মতো খানিকটা শক্তিও সঞ্চয় করেছে।

কিন্তু নিজের কথাই বলে যাবে এমন হৃদয়হীন নয় ভক্ত। সে যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো রামচন্দ্রর সংসারের কথা ইতিপূর্বে জিজ্ঞাসা না করায়। বললো—'তোমার কথা কও রামুদা। বউ কনে, মুঙলা কী করে'।

কী বলবে রামচন্দ্র। এদিক ওদিক চাইলো সে। তারপর বলে বসলো—'সামন্তিনী গাঁয়ে জমি কিনছি। সেখানে গিছে মুঙলা আর বউ'।

খুশি হয়ে ভক্ত বললো—'আ, রামুদা, তোমার মতোন কে।'

পথে বেরোলো রামচন্দ্র। কিছুক্ষণ সে ভক্তর সুখের সংসারের কথা ভেবে সুখী হওয়ার চেষ্টা করলো। তারপর তার মনে পড়লো সে মিথ্যা করে বলেছে—সামন্তিনীতে জমি কিনেছে সে আর সেখানে গেছে মুঙলা আর সনকা।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ভগবান নাকি মিথ্যার শাস্তি দেন। যদি তার মিথ্যা বলার শাস্তিস্বরূপ (রামচন্দ্র জিতেন্দ্রিয় সত্যবাক্ নয়, প্রয়োজন অপ্রয়োজনে সে মিথ্যা এর আগে অনেক বলেছে আজ সে ভীত হয়ে উঠলো।) যদি তারা না-ফেরে। বউটার মুখ মনে হতে লাগলো, আর চোখে-উঠে-আসা জল রোধ করবার জন্য গোঁফ চোমরাতে লাগলো রামচন্দ্র।

ভক্তর সঙ্গে, কেস্টদাসের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করতে গিয়ে সারা রাত ঘুম এলো না চোখে।

একদিন, বড়ো সুপ্রভাত সেদিনের, কেষ্টদাস এসে বললো—চিঠি এসেছে। সামন্তিনী নয়, মেদিনীপুরের ওদিকের এক সহর থেকে। লিখেছে মুঙলা। লোকের কাছে খোঁজ করেছে রামচন্দ্রের চেহারার বর্ণনা করে, আর তারা যে-রকম ইঙ্গিত করেছে তেমনি ঘুরেছে পথে বিপথে দুজনে। অবশেষে তারা ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছে

কেষ্টদাস চিঠি পড়েও শোনালো। চিঠির শেষ দিকে মুঙলা লিখেছে : বাবার দেখা নাই। মা পাগলা হয়ে যাতিছে। একা তাকে আটকান যায় না। সেই জন্যে তারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে।

রামচন্দ্র চেষ্টা করেও কান্না গোপন করতে পারলো না। বললো—'হবি নে কেন, আমিই যে হইছি বেটাছাওয়াল হয়ে'।

রামচন্দ্র সেদিন রান্না করলো না, সনাতনকে খবর দিলো, ভক্তকে খবর দিলো। পরদিন সে গেলো আশ্রয় শিবিরে। বোধ হয় সুখবরটা হরিশকেও দেবার ইচ্ছা হয়েছিলো।

আশ্রয়-শিবিরটা যেন আর একটু বড়ো হয়েছে। বড়ো ঘরখানির সম্মুখে কতকগুলি তাঁবু পড়েছে। হরিশকে না-পেয়ে সে চলে আসছিলো এমন সময় হরিশই তাকে ডেকে নিলো।

হরিশের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে, পরনে ফরসা কাপড়, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় একটা সাদা টুপি। গলার উঁচু কণ্ঠা ডুবে গেছে মসৃণ মাংসে। রামচন্দ্রকে একটা তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালো। হরিশ বললো—'ভালো খবর, ভাই? তোমার শরীর যেন ভালো দেখায় না। বাসা করেছে? সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে বলেছিলাম এখানে থাকতে, থাকলে না। দ্যাখো আমি কতটা শান্তিতে আছি'।

খবরটা একটু নিচু করে সে বললো—'এখানকার সব চাবিই আমার হাতে এখন। কে কী খাবে, কার কী ব্যবস্থা হবে আমাকে জিজ্ঞাসা না-করে বাবুরাও করে না'।

রামচন্দ্র চলে আসবার সময়ে সে বললো—'বাসাটা আর করলাম না, এখানেই থেকে গেলাম। ভগবান যা করেন তাতেই সুখী'।

এটা অবশ্য না-বললেও অনুভব করা যেতো ; গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নয়, খানিকটা স্বস্তিও অর্জন করেছে হরিশ। কিছুদিন থেকে একটা অস্পষ্ট চিন্তা যাওয়া-আসা করছে রামচন্দ্রের মনে। ভক্ত, কেষ্টদাস, সবশেষে হরিশকে দেখে তাদের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করাটা স্বাভাবিক। আর চিন্তাটা শুরু হয়েছে সে-তুলনা থেকেই।

মনটা এতদিন প্রতীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, মুঙলার চিঠি পাওয়ার পর তার উদগ্রতা একটু কমেছে, সেইজন্যেই হয়তো এখন চিন্তাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে ; কিম্বা হয়তো হারানোর চাইতেও পেয়ে হারানোর ভয় বড়ো বলে রামচন্দ্র দুঃখের কারণগুলি ভাবতে বসেছিলো, কারণ খুঁজছিলো যাতে আর ভুলটির, ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে, পুনরাবৃত্তি না-হয়। কিম্বা এমনও হতে পারে মানুষের চরিত্রের মতো তার মনেরও বিবর্তন হয় স্তরে স্তরে। তারপরে বর্তমান স্তরটি হঠাৎ একদিন জেগে ওঠে।

ওরা সব গুছিয়ে নিয়েছে, আর সে পারলো না একথা যতবারই মনে হলো কারণ খুঁজবার চেষ্টা করলো সে। ভক্ত সংসার স্থায়ী করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেষ্টদাস, গ্রামে যে মরে যেতে বসেছিলো সহরে এসে সে যেন বেঁচে উঠলো। ফিরিওয়ালা যতই সে মাথা নিচু করে চলুক তবু সন্ধ্যাবেলায় হাসিমুখে ফিরে যায় প্রিয়জনের কাছে। এমনকী হরিশ যে পরের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আর-কিছু করলো না, সেও সেই কৌশলটুকু অবলম্বন করে উঠে বসেছে। যতবারই কারণ খুঁজতে গেলো, তার মনে হলো ওরা যখন শুধু বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে তখন সে শুধু বসে থেকেছে, তামাক খেয়েছে, আর জীবনের অতীতকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেধেছে মনে মনে।

দু-দিন আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। মনের স্বাভাবিক রীতি এই : অপ্রিয়কে সে সহজে ভুলে যেতে চায়। ঘটনাটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে সেবার সংকল্পই যেন করেছিলো রামচন্দ্রর মন। নিজের জীবনের অথবা চিন্তার অংশ করতেও তার বিশেষ আপত্তি ছিলো। অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিলো তার কাছে। কিন্তু একই ঘটনা থেকে মানুষের মন তার বিভিন্ন অবস্থায় কত বিভিন্ন অর্থই-না খুঁজে পেতে পারে। এখন সেই ঘটনা পরম্পরাকেই সে তার মনে ফিরিয়ে আনলো।

প্রায় সন্ধ্যা তখন গাছতলাটায়। এখানেই সে প্রতীক্ষার অনেকদিন ব্যয় করেছে।

সেই গাছতলায় বসে সে ভাবছিলো মুঙলার কথা। তখন মনে হয়েছিলো আহা কত কষ্ট করে মুঙলা সংসার চালিয়েছে। আর জমি বিক্রির টাকাগুলি সে ধরে রেখেছিলো যখের মতো, এমনি মায়া তার। আর এখন? টাকাগুলো বার করে সে চোখের সামনে মেলে ধরলো। এখন যদি মুঙলা ফিরে না-আসে। রামচন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। এমন সময়ে পিছন থেকে কে কথা বলে উঠেছিলো—'অনেক টাকা ভাই তোমার'।

চমকে উঠে রামচন্দ্র টাকাটা বেঁধে ফেলেছিলো কোমরের কাপড়ে।

লোকটা আবার বললো—'ছোঁ মেরে না-হয় না-ই নিলাম, কিন্তু পুলিশ তো আছে'।

রামচন্দ্র বলেছিলো—'কেন্ চুরি করছি নাকি'?

বিশ্রী হেসে লোকটা বলেছিলো—'না-না-তা করবে কেন। পুলিশেরা বড়ো ছোটোলোক। বিশ্বাস করতে চাইবে না ও-টাকাগুলো তোমার। ভর সন্ধ্যায় পাগলের মতো যে-লোকটা গাছতলায় বসে থাকে তার এত টাকা থাকতে

পারে, এ ওরা মানবে না। দেখবে প্রমাণ'।

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছিলো। অপরিচিতের মুখে চোরের সঙ্গে তুলনায় যে রাগটা হচ্ছিল, তা ভয়ে পর্যবসিত হলো। রামচন্দ্র কয়েক পা তাড়াতাড়ি হেঁটে নিয়ে দেখলো লোকটা তখনো পেছন পেছন আসছে। একবার তাঁর মনে হয়েছিলো ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটার মাথা গুঁড়ো করে দেয়, কিন্তু পুলিশের কথা মনে হতেই দৌড়তে আরম্ভ করলো সে।

কেষ্টদাসের বাসায় ঢুকতে পেরে সে যেন বেঁচে গিয়েছিলো। একটা আগুনের কড়ার উপরে একটা বাটিতে বোধ করি পুরনো ঘি গরম হচ্ছে, ঘরদোর তার গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। একটা মাদুর পাতা। কেষ্টদাসই বোধ হয় শুয়ে ছিলো, এইমাত্র উঠে গেছে।

কয়েকবার ডাকবার পর কেষ্টদাস বেরিয়ে এলো। ঘটনার কথাটা বলে রামচন্দ্র বললো—'টাকাটা নিয়ে মুস্কিল হয়েছে, করি কী বলো'। কিন্তু নিজে যা পারছে না কেষ্টদাসকে সে বিষয়েই অনুরোধ করতে দেরি হতে লাগলো তার। একটুপরে বৈষ্ণবী এসেছিলো। বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে সে। রামচন্দ্রকে প্রবোধ দেবার জন্য বৈষ্ণবী বলেছিলো—'কত টাকা নিয়ে জমি রেজিস্টারি করতে যাও তুমি সহরে। এ তো সামান্য টাকা'।

রামচন্দ্রের মনে পড়েছিলো, এই তো সেদিনও অন্তত এর দ্বিগুণ টাকা নিয়ে সে সারারাত হেঁটে সহরে গিয়েছিলো সোনা বাগ্‌দীর দরুণ ভুঁইটুকু রেজিস্ট্রি করতে। তখন সে বুক ফুলিয়ে পুলিশের দঙ্গলের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছারিতে ঘুরেছে, আর এখন চুরি না-করেও চোরের মতো ভয় পেতে হচ্ছে। পার্থক্যটা চোখে পড়েছিলো বটে, তখন তার মনে হয়েছিলো : লক্ষ্মী ছাড়ে গেছে আমার তাই।

বৈষ্ণবী বলেছিলো, চলেন আমি সঙ্গে যাবো।

এই কথাতেই সাহস পেয়ে রামচন্দ্র সেদিন বাসায় ফিরে যেতে পেরেছিলো। কিন্তু পরে কথাটাও মনে হয়েছিলো, (সেদিন ঘটনাটি যেভাবে ফুটে উঠেছিলো মনে আজকের চিন্তার সঙ্গে কত তফাৎ তার) পুরানো ঘি- এর কটু গন্ধ, কেষ্টদাসের রোগজীর্ণ দেহের, ঘরের একপাশে রাখা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলির পাশে ফুটে উঠেছিলো বৈষ্ণবীর কাজল আঁকা চোখ, পানে রাঙা ঠোঁট, কালোপাড় ধোপদুরস্ত শাড়ি। চিত্রটির অসামঞ্জস্য থেকে মনের যে-দ্বিধা এসেছিলো একসময়ে তা থেকে সবটাই ক্লেদাক্ত হয়ে উঠলো। রামচন্দ্রের মনে হলো, কথা বলার সময়ে বৈষ্ণবী হেসেছিলো কেমন যেন জড়ানো অথচ ভীষণ সে-হাসি, চোখের দৃষ্টিটিও কেমন যেন আচ্ছন্ন অথচ জ্বল জ্বল করছিলো। নেশা করে বুঝি? চিন্তাটা শেষ করতে গিয়ে একটু কষ্ট হচ্ছিলো রামচন্দ্রের। বৈষ্ণবী তার দুঃখের সময়ে আশ্বাস দিয়েছিলো একদিন, যার মূল্য অনেক। কিন্তু পুরানো ঘি-এর কটু গন্ধের মধ্যে কেষ্টদাসের মৃত্যুভীত মুখের পাশে বৈষ্ণবীর মদসিক্ত দৃষ্টি এক অনির্বচনীয় বিমুখতা এনে দিতে লাগলো তার মনে।

কিন্তু আজ রাত্রির এই অন্ধকারে চিন্তাটার তলদেশেও যেন ছুঁয়ে গেলো সে একবার। সে যেন দেখতে পেলো বৈষ্ণবীকে হাসিমুখে। তার কাজল আঁকা চোখে, পানে রাঙা ঠোঁটে শুধুই হাসি ছিলো না। রামচন্দ্রের মনে হলো, কথাটা ঠিক জানা ছিলো না তার কিন্তু অর্থটা অনুভূত হলো, দেশে নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে জিনিসটি তার ছিলো, আজ যা তার নেই, আর এখনো যার পিছনে সে ছুটে চলেছে, সেটাই যেন ছিলো বৈষ্ণবীর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে। কথাটা কি প্রতিষ্ঠাজাত আত্মপ্রত্যয়? সহসা তার মন যেন, অতি সাধারণ মন হয়েও, অসাধারণ নিগূঢ় সত্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলো।

মনে মনে সে বললো : বেশ আছে বৈষ্ণবী, হাটবাজার করে, খায়-দায়, কারো মুখ চেয়ে থাকে না। তেমনি হঠাৎ পৃথিবীর সব মানুষ যেন দু-দলে ভাগ হয়ে দাঁড়ালো তার চোখের সামনে। আর সেই দুই দলের মধ্যে বৈষ্ণবীকে এবং নিজেকে একই দলে দেখতে পেলো সে। একই দলের হলে লোক যেমন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মমত্ব বোধ করে তেমন একটা অস্পষ্ট নৈকট্য বোধও হতে লাগলো তার। অর্দ্ধস্ফুট একটা বাক্যের মতো প্রায় উচ্চারিত হলো তার মুখে, ও খারাপ না-হলে টাকা কেউ দিতো? টাকা না-হলে কেউ বাঁচে?

শুধু বৈষ্ণবী নয় ফিরিওয়ালাও এসে দাঁড়ালো তার মনে। একদিন পুলিশের হাতে সে টাকা তুলে দেয়াতে রাগ হয়েছিলো তার। আজ যেন পুলিশের সামনে সে রুখে দাঁড়ালো দুর্বল ফিরিওয়ালার বড়োভাইটির মতো। হরিশ, ভক্ত, ভক্তর ছেলে সকলেই আনাগোনা করতে থাকলো মনের মধ্যে। আর মাঝে মাঝে নিজের শূন্য মন হু-হু করে উঠতে লাগলো। হবেই তো, এমন দুর্মতি না-হলে এমন দুর্দশা হয়। নিজের ছেলে-বউকে সুখে রাখবার চাইতে বড়ো আর কী আছে? তার জন্য সব করা যায়। আর সে কিনা! উল্টেপাল্টে যেতে লাগলো চিন্তা কান্নার

ধমকে। হে ভগোমান, হে ভগোমান, তাদের ফিবায়ে দাও। আর কখনো ললাটের লিখন উল্টাতে সে যাবে না।

এরপরে কৃষকদের যা হয়ে থাকে, সেই পুরনো কাহিনী মনে পড়ে গেলো তার। হরিশচন্দ্র বাজা শুয়োর চরাতো ছেলে বউ পালন করতে। আর সে তো তৃণাদপি তৃণ। মনের এই অবস্থায় সে প্রতিজ্ঞা করলো, সে কাজ করবে, যে কোনো কাজ। অন্যের বাড়িতে দারোয়ানও হবে। রামচন্দ্রের সেই কর্মহীন অসূয়াভরা দিনগুলোত মুঙলা ঠাট্টা করে বলেছিলো, তুমি কাজ খুঁজছো, একটা মিষ্টিব দোকানে কাজ খালি আছে। বাসন মাজতে হবে'। রামচন্দ্র রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, শ্বশুর শাশুড়িকে খেতে দিতে তোর এত অহঙ্কার। বাসন মাজবের ক'স'। সেদিন পরিণতিটা কী হতো ভাবতেও আতঙ্ক হয়। শুধু মুঙলা রসিকতার এই পরিণাম দেখে কেঁদে ফেলেছিলো, আর সে চোখের জল যেন বিমূঢ় করে দিয়েছিলো রামচন্দ্রকে।

আজ রামচন্দ্র ভাবলো সেই মিষ্টির দোকানেই না-হয় কাজ নেবে সে। পরদিন সকালে সে গেলো ভক্তর বাসায়। বললো—'একটা কাম দিবের হবি, ভাই'।

'কী কাম করবা'?

'তুমি যা করো'।

'তুমি কি পারবা? সে কুলিব কাম'।

বহুদিন পবে গোঁফ চুমরে রামচন্দ্র দম্ভভবে তাকালো। এই সে দম্ভ যা দশ ক্রোশ দূরেব ভিনগ্রামের হাটেও চিরুদিব কৃষকদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়াতো। ভক্তর এসব মনে পড়াব কথা। বামচন্দ্র বললো—'কেন্ ব্যাটা ছাওয়াল বলে মনে হয় না বুঝিন'?

সন্ধ্যায় সে কেষ্টদাসের বাসায় গেলো। দুঃখের সময়ে কেষ্টদাস সাক্ষী। রামচন্দ্র বললো—'বুঝলা ভাই, কী বোকামি করছি এতদিন। তোমাদের দেখেও শিখবের পারলেম না। আমি কনে কনে গেলাম, কি করলাম, আব তোমরা পরে আসেও সংসার গুছায়ে নিলা। কত আরাম পাতিছো তোমরা'।

রামচন্দ্রের বক্তব্য এই রকম : বাঁচবার এত বড়ো ব্যাকুলতা তার যে নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে সে মৃত্যুর লক্ষণ বলে ভেবেছে। মুঙলা যখন সংসারের বোঝা একা বইতে চাইতো তখন খেলাঘরের বাইরে দাঁড়ানো অসূয়াপরায়ণ বালকের মতো তার মন অবুঝ ক্রোধে ও ক্ষোভে ভরে উঠতো। মৃত অবযবের মতো অতীতের জীবনপদ্ধতি তার মনে লেগে থাকাতেই বোধ হয় সমস্ত মনটাতে ধীরে ধীরে পচন প্রসার লাভ করেছিলো। কিন্তু আজ সে দেখতে পেয়েছে বাঁচার অদ্ভুত পদ্ধতি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চাইতে বড়ো কথা আর নেই। খেলাঘরে ফিরে যেতে হলে যে কোনো ছুতোয় ভাব করে নিতে হয় আবার। আর বাঁচবার আয়োজন করতে গেলে নির্মম হতে হয়। ছোটোখাটো পছন্দ-অপছন্দ থেকে শুরু করে ভালো-মন্দের অনেক বাছবিচারকেও আহুতি দিতে হয়।

অবশ্য এসব কিছুই সে বলেনি, বলবার ভাব থাকলে আর-একটু সুস্থির হতো মন। অন্য কথার মাঝে মাঝে কাজ করবো তুমি দেখে নিও, একথা বারবার বলে শিশুর দেয়ালা কাটার মতো মুখভঙ্গি করে বসে দুলতে লাগলো।

ওদিকে মুঙলার দ্বিতীয় চিঠি এলো একদিন। আসবার তারিখটি স্থির করে সে লিখেছে : মা যেন একটু ভালো। বাবা সহরে আছে শুনে ভালো হয়ে যাতিছে।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লড়াই করা তো এই নতুন নয় রামচন্দ্রের। চৈত্রের তপ্তদিন ছাড়াও, অন্য অনেক মেঘহীন দিন এসেছে এর আগে। মাটি ফেটে উঠেছে। পা টলেছে, রামচন্দ্র তবুও পরাজিত হয়নি, চারিদিকের রুক্ষরস শোষণ করে বরং নিজেকে পুষ্ট করেছে। তখন যে-শক্তিটি তাকে জয়ী করেছে, বাঁচবার সেই সহজ গভীর প্রয়াসটি হয়তো একসময়ে ভূমিহীনদের দলে তাকে পথ দেখিয়ে আনতো। মুঙলাকে বউকে হারাতে না-হলেও, গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা না-হলেও এমনি তাকে নামতে হতো হয়তো। হয়তো আরো একটু বিচিত্র হতো সে নামা। আর-একটু বিচিত্র হতো সে-আঘাত। যে কোনো ভূমিহীনকে অবলম্বন করে তার জীবনে ঘটনা ঘটতই। রামচন্দ্র না-জানলেও মানুষের জীবনে এমনি ওঠাপড়া চলছে। ঘা খেয়ে মানুষ শক্ত হয়, তখন তার আত্মা ভাস্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়, মানুষ নয় কাল্পনিক ফিনিক্স যে ডাঁটসার পাখা আগুনে পুড়িয়ে আকাশে ওঠবার নতুন পাখা ফিরে পাবে। যে-দহনে তারা আত্মাভাস্বর হয়ে ওঠে তারই জ্বালায় লুটিয়ে পড়ে সে প্রতিকারহীন কান্নায়। তার

জীবনে সবচাইতে বড়ো ট্র্যাজেডি বোধ করি এই যে তার বুদ্ধি ও অন্তরে পদে পদে দ্বন্দ্ব চলছে দৃশ্যত কিম্বা গোপনে। বুদ্ধি যে অনুভবের সমষ্টিকে বলছে মোহ, অন্তর তাকেই বলছে আমার সর্বস্ব।

সুনন্দা আরো কিছুদিন তার স্বামীকে ধমকে যেন খাড়া করে রাখতে চেয়েছিলো। ধমকে সেও কম কাঁদেনি। বলেছিলো—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, সন্ধ্যার ছাত্র পড়ানোটা ছেড়ো না। সেও কি কম চেষ্টা করেছে। লোকে ম্যাট্রিক পাশ নয় শুনলে দু বছরের মেয়েটির শিক্ষার ভারও তার হাতে দিতে রাজী হয় না। মিথ্যা করেই সে বলেছে ম্যাট্রিক পাশ করেছে সে। তারপরে সে গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে এই বুড়ো বয়সে পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষাটা পিছিয়ে গেছে দুমাস। তার মানে আরো মাসছয়েক তার স্বামীকেই কষ্ট করে পড়াতে হবে সন্ধ্যার ছাত্রটিকে। তারপরে সুনন্দা নিজেই হয়তো কোনো অফিসে চাকরি নেবে।

কিন্তু পরীক্ষার ঠিক দু-চারদিন আগে ম্যালেরিয়ার মতো চেহারা নিয়ে জ্বর এলো। ডাক্তার এসে বললো—লাঙ্‌স খারাপ। সুনন্দা ভাবলো আরো খানিকটা যুদ্ধ। টাকার প্রয়োজন, কিন্তু অনেক কষ্টে কেনা হাতঘড়িটা বিক্রি করতে সে পারলো না। সবসময়ে এ রকমটা মেলে না। দু-চারদিন আগে শুধু ডাক্তার নয়, রোগীও বললো—গলা দিয়ে রক্ত উঠছে সুনন্দা, একটু কাছে এসে বোসো শুধু। এ ম্যালেরিয়া নয়।

ওষুধ আনতে গিয়ে সুনন্দা নদীর ধারে লোহার রেলিং ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তার আবার মনে পড়লো ঘুঁটে দেয় যে-মেয়েটা রুগ্ন স্বামীকে পাশের রোদটুকুতে শুইয়ে রাখে তার কথা। বাতাসের শব্দের মধ্য থেকে যেন কথাটা উঠে এলো : 'এ কী করলে, সুনন্দা, আর-একটু কম খরচ করলেই তো হতো। আর-একটু সাধারণ ভাবে চললে স্বামী হয়তো বাঁচতেন। আর-একটু সাধারণ, শুধু আর-একটু অনাড়ম্বর জীবন'।

সুনন্দার সঙ্গে রামচন্দ্র দেখা হওয়াটা এখন আকস্মিক। কিন্তু তাই হলো। সে গঙ্গার দিকে এসেছিলো। পতিতকে উদ্ধার করে যে মায়ের মতো নদী। দোকানটা ওষুধের তা রামচন্দ্র জানতো না। আলোয় ঝলমল করছে এমন এক দোকানের সম্মুখে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো সুনন্দাকে সেই দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে। সুনন্দার পরনে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শাড়ি। খুব দামী কিছু হয়তো নয়, ভাবলো রামচন্দ্র, কিন্তু দ্যাখো তাসত্ত্বেও এই সুনন্দার মধ্যে কি আর কখনো শিবিরের সেই অবসন্ন মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। রামচন্দ্র অজ্ঞাত কারণে একটা গর্বের মতো কিছু অনুভব করলো সুনন্দার জন্য। হ্যাঁ, ঠিকই করেছিলো সুনন্দা। একেই জীবন বলে। পদ্মার চরের মতো ব্যাপার। চর যখন প্রথম পড়ে, মনে হতে পারে আহা জলের ধারা শুকিয়ে গেলো। তারপর চাষীরা আসে। সেই বালির পাথারে তারা যখন চলে বেড়ায় দেখে মনে হয় কী বোকা এই চাষীরা। তারপর সেই চর একদিন ধানে ধানে ভরে যায়, আর তখন মনে হয় জীবনে আর কোথাও ফাঁকি নেই। রামচন্দ্রর মনের তলদেশে এরকম একটা জন্মালো যেন যে সুনন্দাকে জানাবে তার সেই আবিষ্কারের কথা—বাঁচা, বাঁচাই—তার চাইতে বড়ো কিছু আর নেই। এই আবেগের প্রকাশটা কথায় হলো না। রামচন্দ্র সুনন্দার চোখে পড়ার মতো স্পষ্ট হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো। সুনন্দাও তার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলো।

তখন রামচন্দ্র একটু বিস্মিত হলো। এ তো সেই সুনন্দা নয়। যাকে সে কয়েকদিন আগে হাল্কা আনন্দে সঙ্গিনীর সঙ্গে চলতে দেখেছিলো। সেদিন যেন আলোর মতো ঝকঝক করছিলো সুনন্দার মুখের হাসি। রামচন্দ্রর মনে আবার পদ্মার প্রবাহের উপমাই ফুটে উঠলো। সে যুক্তি দিলো নিজের কাছে—হয়, তাও হয়। কখনো কখনো আলো নিবে আসে পদ্মার উপরে। কিন্তু রাত পোহালেই সেই হাসাহাসি।

সুনন্দার ঠোঁট দুটো কাঁপলো। সে দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তাটার সঙ্গে সেখানে অন্য আর-একটি রাস্তা এসে মিশেছে। সেখানে পথের ধারের বাড়িগুলো একটা কোণ তৈরি করেছে। সেখানটায় যেন দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালো সুনন্দা। সে যেন হাঁপাচ্ছে। রামচন্দ্র মনে মনে বললো আই, দ্যাখো। অসুখ নাকি মিয়েডার।

রামচন্দ্র এগিয়ে গেলো, কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মোড়লি করা তার মজ্জাগত। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সে প্রকৃতি নির্বাচিত অভিভাবক হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো গ্রাম ছাড়ার আগেকার সেই দিনগুলোতে। এখানেও যেন একটা তেমন কিছু তৈরি হচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে তার আবিষ্কার দিয়ে আবার সে কি এখানে যারা অল্পবয়সী তাদের পিছনে দাঁড়াবে?

সুনন্দা কথা বললো, অদ্ভুতভাবে ফিস ফিস করে, যেন আর কাউকে সে শুনতে দিতে চায় না। সে বললো—'রামচন্দ্র, তুমি কী জানো সেই শিবিরে আবার ফিরে যাওয়া চলে'?

একি অদ্ভুত কথা? রামচন্দ্র উত্তর খুঁজে পেলে না।

সহরের পথের ভিড় এই সন্ধ্যাতেই যেন বেশি উত্তাল। সেই মুখর জনস্রোতের মধ্যে যেন একটা ফেলে যাওয়া খাড়ি। স্রোত নেই, অন্ধকাব নেমেছে।

রামচন্দ্র নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সুনন্দা অবশ্য দাঁড়িয়ে রইলো না। একটা মোটর এসে থামলো। সুনন্দাব চোখের জল দেখেই হোক কিম্বা আগে থেকেই তার মন প্রস্তুত ছিলো বলেই হোক যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো তা থেকে মোটরে ওঠার এই সামান্য দূরত্বটুকু পার হতেই সুনন্দার প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোক সুনন্দার হাত ধরে সাহায্য করলো ; চলতে চলতে সুনন্দার কাঁধের উপরে হাত রাখলো। মোটরটা গঙ্গাব দিকে চলে গেলো।

ভদ্রলোক এরপরে অনুতাপ করবেন কিম্বা তাঁর বাহুর আশ্রয়ে সুনন্দা সম্মানও পাবে তাব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুনন্দা তখন কাঠ হয়ে গেছে। তার চাইতেও বেশি। গঙ্গাব তলদেশ কিম্বা পৃথিবীব যে কোনো অন্ধকারে নামতে হলেও আর কিছু এসে যায় না তার।

কিছুই করাব নেই রামচন্দ্রর এই সন্ধ্যায়। এখন সে বাসায ফিবরে। ফুটপাথের প্রান্তে বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে সে চলতে লাগলো।

এই ভদ্রলোক কিন্তু সুনন্দার স্বামী নয়—এই বাক্যটা একবাব তার মনে গঠিত হলো। এটা একটা বিষণ্ণতাই। এখন সন্ধ্যা বলেই যেন তা আরো গভীর।

কিন্তু কিছুদিন থেকে রামচন্দ্র যেন সাধনা করেছে। পথের জনস্রোতেব একান্তে অবস্থান কবে যেন তপস্যার মতোই কিছু কবেছে সে। দুঃসাহসী চিন্তার জন্ম হয়েছে তাব মনে। কথাটা নতুন নয়, গ্রামে অনেকবাব আলোচনা হয়েছে এ রকম ধবনের কথা। কৃষক জমি নিয়ে বহু কথাই আলোচনা কবে থাকে বলা যেতে পারে জমির কথাই সেখানে আসল কথা। অশক্তের অলসের হাত থেকে জমি অন্য হাতে চলে যায়। ভাগ্যহীনের জমি ভাগ্যবান সংগ্রহ করে। সেখানে দযা মায়া কিছু নেই। জমিকেও কুলটা বলে গাল দিয়ে লাভ হয় না। যেহেতু রামচন্দ্র বস্তুকে অবলম্বন না-করে ভাবতে শেখেনি জীবন সম্বন্ধে, তার আবিষ্কারের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা সুনন্দাকে যুক্ত কবতে গিয়ে তার মনে এই জমি হস্তান্তরের তুলনাটাই দেখা দিলো। জমি সংগ্রহের ব্যাপারে কোনোদিনই দুর্বলতাকে স্থান দেয়নি মনে। এখন তেমনি একটা নির্মমতাই যুক্ত হলো তার দুঃসাহসে। সে স্বগতোক্তি করলে : কেন, মিয়েমানুষ জমির চাইতে কমি যে হাজাপতিত পড়ে থাকবি তোমার চাষী যদি তাক দেখাশোনা না করে?

কিন্তু এ তো শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে চলা। হৃদয়কে রূঢ় শাসনে নির্বাক করে দেয়া।

একদিন রামচন্দ্র ভক্তব বাসায় গেলো। সেটা কলের ছুটির দিন বলেই রামচন্দ্র জেনেছিলো।

ভক্ত সাড়া দিলো না, অন্য কেউই নয়। দূর থেকেই ডেকেছিলো রামচন্দ্র। ভাঙাভাঙা মরচে-পড়া টিনের সেই ঘরটার সম্মুখে জল কাদা নোংরা রোজই থাকে। আজ যেন তার কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। ভক্তকে আরো কাছে থেকে ডাকার জন্য সে নোংরা জাযগাটাকে পার হতে গেলো।

ভক করে একটা পচা গন্ধ এলো নাকে। কৃষক রামচন্দ্র যে পচা গোবর তুলে জমিতে সার দিয়েছে তার কাছেও অসহনীয় যেন গন্ধটা। ভক্তকে আরো দু-একবার ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেলো না তখন রামচন্দ্র জলকাদাটা বাঁচিয়ে একটু ঘুরে একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে ভাবলো, তাহলে ভক্ত দিনের বেলায় ঘুমোচ্ছে। ভক্ত গ্রামেও ঘুমাতো, দারিদ্র্যের জন্য তার ঘুমও খানিকটা দায়ী।

রামচন্দ্র ফিরে এলো মনে এক অনির্বচনীয় ভাব নিয়ে। সে-ভাবটা কাটতেই ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ গুলিয়ে উঠলো। অনাবৃত রিরংসা। জলকাদা, পচাগন্ধে রামচন্দ্র ভক্ত থেকে খানিকটা দূরে সরে এসেছিলো। এবার ছুটে চললো রাস্তায়।

এক কথায় শত কথা মনে হয়, এক বেদনায় শত বেদনাকে নিয়ে আসে। যে-আবহাওয়ায় রামচন্দ্র শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছেছে সেটা অপাপবিদ্ধ ছিলো না, রামচন্দ্র এমন পুরুষ নয় যে মনকে ফাঁকি দেবে। কেষ্টদাসের স্তরে নামবার সময়ে সে চোখ খুলেই নেমেছিলো, তাদের বাঁচবার ঐকান্তিকতা উপাসনার দৃষ্টিতে দেখে। বৈষ্ণবীয চোখের কাজল, পানে রাঙা ঠোঁট তার বাঁচবাব যে-দিকটা ইঙ্গিত করেছিলো রামচন্দ্র প্রথমে শিউরে উঠে পরে দু চোখ মেলে সোজা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিলো। একটা অব্যক্ত তৃপ্তিও বোধ করেছিলো যেন নীতিবোধহীন অর্ধপশুগোষ্ঠীর কোনো পিতার মতো বৈষ্ণবীয় স্বাবলম্বন দেখে। এ অসামঞ্জস্য কেন এলো মনের গতিতে আজ?

সেই গাছতলায় গিয়ে বসলো সে আবার। দেশের সেই বাড়িটার জন্য শূন্য হাহাকারে কেঁদে উঠলো মন।

মনে হলো তার পালাবে সে মুঙলাকে, বউকে বুকের আড়লে নিয়ে।

তার দুঃসাহস যেন ভেঙে পড়বে মনে হলো . তার আবিষ্কারের মাটি পদ্মার উল্টো টানে কেটে যাচ্ছে।

সুনন্দা বুদ্ধি দিয়েও ঠিক পথ চিনে নিতে পারেনি। নিচে যারা তারা যদি যে-কোনো উপায়ে বাঁচবার চেষ্টা না-করে, হোক সে-পদ্ধতি দীনতায় সংকীর্ণ, উঁচুস্তরের জীবন শুরু হয় না। এই যুক্তি বুদ্ধিই সব নয়। আবাল্যসঞ্চিত অনুভবের সমষ্টি কোনো বুদ্ধি দিয়েই কি বেঁধে রাখা সম্ভব? রামচন্দ্রর বুদ্ধি যখন বাঁচবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে কৃতনিশ্চয় হয়েছিলো, ততক্ষণে মনের জন্য একটি অংশে ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিলো। ভক্তর বাসায় অভাগা এই নারীটি শুধুমাত্র নিমিত্তি। যে-কোনো উপায়ে তার জীবন-তর্পণের প্রয়াসে রামচন্দ্র বৈষ্ণবীর সাহসিকতাকে খুঁজে পেলো না। কদর্য হয়ে রামচন্দ্রের চোখে এই গ্লানি ধরা না-দিলেও রামচন্দ্রের মনে অন্য কোনো অগর্হিত বিষয়কে অবলম্বন করেও এ বেদনাটি অনুভূত হতো।

রামচন্দ্রবসে বসে ভাবে, কেষ্টদাস কী তাহলে সুখী? মনে করবার চেষ্টা করে, কোনোদিন কোনো দুঃখের আঁধার দেখেছে কিনা কেষ্টদাসের মুখে। কিন্তু জন্মদুঃখী কেষ্টদাসের মুখে দুঃখের দাগ ভগবানও দেখেছেন কিনা সন্দেহ, এমন একরঙা সে-মুখ।

আর মুঙলা কী করবে? ভাবলো রামচন্দ্র। মুঙলার কি ভালো লাগবে ওদের মতো করে বাঁচতে? তার মনে হলো : অল্পবয়সে মুঙলাও কি বাঁচতে চেষ্টা না-করে পারে। ও ঠিক ওদের পথেই যাবে। একদিন হয়তো কেষ্টদাসের বৈষ্ণবীকে দেখে ওর খুব ভালোই লেগে যাবে। বাবুদের মেয়েরা যেমন পরে তেমনি হয়তো একখানা শাড়ি কিনে দিতে চাইবে। কিন্তু তেমন টাকা পয়সা পাবে কোথায়? হয়তো খুব বেশি খাটবে। খাটতে খাটতে একদিন আর উঠে দাঁড়াবার শক্তিও হয়তো থাকবে না। তারপর ভক্তর সেই ইস্টাক বলা ছেলেটা এসে দাঁড়াবে। সে তো জোর করে টাকা কেড়ে নিতে চায়। নেবেও হয়তো তাই।

তাহলে সে কি একা নাকি?

নিরুপায় অসহায় বোধ হতে লাগলো তার। মুঙলাকে কী করে সে বলবে বাঁচার যে-পথ দেখতে পাচ্ছো, যেয়ো না সে-পথে। মনে হলো ইতিমধ্যেই তারা যেন বিভিন্ন পথে চলতে শুরু করেছে। শিশু যেমন বেদনার কারণ নির্ধারণ করতে না-পেরে বেদনায় ও বেদনার চাইতে গভীর বিস্ময়ে আকুল হয়ে ওঠে তেমনি হলো রামচন্দ্রের। উদগ্র প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নেই আর, তারা আসবে তাতেই-বা ব্যস্ত হবার কী আছে, আসুক তারা, সংসারের একপাশে সে আশ্রয় নেবে শুধু। হঠাৎ এ বিমুখতা কেন এলো সর্ব বিষয়ে? খুঁজতে গিয়ে রামচন্দ্রের মনে হলো বুড়ো হয়েছে সে, জীবনকে ধরার আর-কিছুই নেই।

বলিষ্ঠ মানুষ সহজে বার্ধক্যের কথা ভাবে না। যেদিন তার মনে হয়, জীবনে শক্তির মূলও সেদিন ছিন্ন হয়ে যায়। জীবন হারিয়ে ফেলার জন্য যে ব্যথায় ভরে উঠেছিলো দৃষ্টি একসময়ে, সে-বেদনা থেকে জেগে ওঠে ঔদাস্য। আত্মসমাহিত হয়ে যায় সে।

একদিন দুপুরে গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে মনে হলো তার মহাভারতের কথা। কেষ্টদাস গ্রামে থাকার সময়ে মহাভারত পড়তো সন্ধ্যায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। বেশ লাগতো শুনতে, সন্ধ্যার ম্লান শান্ত আলোকে।

যেদিন মুঙলাদের আসবার কথা সেদিন এই ব্যাপারটা ঘটলো কিন্তু। চালডাল কিছু কিনতে হবে, কিছু কিছু অন্যান্য সওদাও করার আছে, কাঁধে করে ঝুলিয়ে আনতে সুবিধা হবে বলে রামচন্দ্র লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলো। ফেরিওয়ালা সঙ্গে গিয়ে কিনে-কেটে দেবে বলে যে-জায়গাটায় ফিরিওয়ালা তার দোকান নিয়ে বসে সেখানটায় পথের ধারে লাঠির উপরে দেহের ভার রেখে সে দাঁড়িয়েছিলো। এমন সময়ে দেখলো খালি গায়ে, কেউ কেউ ফতুয়া গায়ে, ময়লা কাপড়পরা ধূলিমলিন একদল লোক এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তাদের মাথায় মাথাল ছিলো না। তবু হরিণ যেমন তার স্বজাতীয়কে অন্ধকারেও চিনতে পারে তেমনি রামচন্দ্র চিনলো এদের। হায়, হায়। এরাও কি, এতগুলো লোকেও কি তার মতো হয়েছে, এই যখন ভাবছিলো রামচন্দ্র, একটি স্কুলের ছেলে এগিয়ে এসে বললো—'*এসো ভাই, আমাদের মেদ দিয়ে যে জমি মেদিনী হয়েছে, আজ আমরা জানতে চাইবো সে জমি আমরা পাবো না কেন*'?

এমনসব কথা। রামচন্দ্র সব বুঝলো না। কিন্তু যখন ছেলেটি বললে—'তুমি জানতে চাওনা, তোমার জমি তুমি পাবে না কেন'? রামচন্দ্রের নাসা বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, গরম হয়ে উঠলো কান, তোলপাড় করতে লাগলো বুকের গোড়া। শরীর এবং মন দুই-ই যেন আঁটোসাঁটো হয়ে উঠলো আবার। ডান হাতে লাঠিটা শক্ত করে ধরে

বাঁ হাতে ছেলেটিকে টানতে টানতে সম্মুখের গতিশীল ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো সে।

এরপরে দলের গতিরোধ হলো। থেমে পড়া দল দুহাতে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সে দেখলো শোভাযাত্রার মাথায় ভদ্রলোকের ছেলেদের দলটির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন অল্পবয়সী কৃষক। কে একজন বললো— 'বুড়োমানুষ যাচ্ছো কোথায়'?

কিন্তু সম্মুখে চেয়ে সে দেখলো জন দশ-বারো কৃষক আর গুটিকয়েক ভদ্রলোকের ছেলে একদল পুলিশের দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। পুলিশ ঘিরে ধরেছে তাদের।

থেমে দাঁড়ালো। দলটা আর পুলিশের কাছে পৌঁছানোর ব্যবধানটুকু রামচন্দ্র দৌড়ে পার হয়ে গেলো। অবাক কাণ্ড! পুলিশেরা জমির জবাবদিহি করছে না। বেঁটে বেঁটে লাঠি দিয়ে মারছেও যেন কৃষকদের। সামনে একজন পুলিশকে পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো—'কেন্, ভাই, আমার জমি ফিরৎ পাবার কী হবি কও'। (কোথায় গেলো তার জীবনবিমুখিতা!)।

'এ শালা'—বলে পুলিশ হিন্দী সুরে ধমকে উঠলো।

'শালা কও কেন? উত্তর দেও না ভাই'। বললো রামচন্দ্র।

এবার পুলিশ ধমক দিলো—'হঠো'।

ক্রোধে-অপমানে, পুঞ্জীভূত নালিশে হাঁপাতে হাঁপাতে রামচন্দ্র বললো—'কেনরে, আমি কি রাস্তার গরু, যে যার মনে কয় সেই মারবি'?

রামচন্দ্রের গোঁফ, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাতের লাঠি এসব মিলে তাকে হঠে যাওয়ার মতো লোক বলে মন হলো না, যতই সে বুড়ো হোক। মনে হলো বরং পাঁয়তাড়া করছে সে।

পুলিশ অন্যগতি না-পেয়ে লাঠিটা তুলে মারলো রামচন্দ্রকে। দুর্জয় ক্রোধ, আর বাঙালে রোখ ঠেলে উঠলো তার বুকের মধ্যে।

'ওরে, শালারে, শালা'—বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো সে।

জমি সংক্রান্ত বহু দ্বন্দ্বে তার এই হুঙ্কারে আট-দশজন প্রতিপক্ষ একসঙ্গে থেকেও বিপদ গুণেছে, কিন্তু মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোলেও ফিরে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে অন্তত দু চার ঘা মারবার যে-শক্তি সেটা রামচন্দ্রের অবশিষ্ট ছিলো না। বসে পড়লো সে। কে একজন তার হাত থেকে লাঠিটা সরিয়ে ফেলার জন্য কনুইয়ের কাছে লাঠি মারলো। কুস্তির আখড়ায় মল্লের মাটি ধরে বিশ্রাম নেযার ভঙ্গিতে রামচন্দ্র ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

সহরে অস্বাভাবিক বলদের গলার ঘুন্টির টুং টাং শব্দে পাড়ার ছেলেরা জুটেছিলো। তাদের কলরবেও বটে, গাড়ির চাকার অপ্রত্যাশিত গ্রাম্যশব্দে আকৃষ্ট হয়েও বটে সনাতন দরজা খুলে দেখলো মুঙলার হাত ধরে রামচন্দ্রের বউ নামছে গাড়ি থেকে। সনাতন একটু বিস্মিত হয়েছিলো। সামান্য যা মালপত্র ছিলো নামাতে একটু বেশি হাঁকাহাঁকি করলো সে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে।

গল্প

'আসলে লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিলো নিজেকে বাঁচানোর আনন্দে।...পড়া আরো পড়া ; সাদা কাগজ পেলে টুকিটাকি লিখে ভাষাকে দোমড়ানো মোচড়ানো ; তা ইস্পাত না ঢালাই লোহা তা পরখ করা—এইরকম দিয়ে সময় কাটাতে শুরু করেছিলাম।.. একদিন স্ত্রী বললেন—টুকিটাকি কী লেখো উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি, একটা গল্প লেখো না। খেলার মতো মন দিয়ে ছুটির দিন পেয়ে গল্প লিখলাম। হঠাৎ কী করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকা পূর্বাশার একটি কপি বাড়িতে এসেছিলো। গল্পটা শেষ করে পরেরদিন সকালে গল্পটা সঞ্জয়বাবুর নামে পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক পনেরোদিন পরে এক কপি পূর্বাশা এলো। দেখি, আশ্চর্য, আমার সেই গল্প প্রায় দশ-পনেরো পৃষ্ঠা জুড়ে। এই শুরু ; কিন্তু শুরুটা ভালো হলো'।

অমিভূষণের প্রথম গল্প 'প্রমীলার বিয়ে'। এই সংক্রান্ত তথ্য :

প্রমীলার বিয়ে। পূর্বাশা, ৯ বর্ষ : ৭ সংখ্যা ; কার্তিক ১৩৫৩। কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৩৭২-এ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র অন্তর্ভুক্ত।
প্রথম গল্প প্রকাশের আরও-এক প্রায়-কাছাকাছি সন্ধান পাওয়া যায় সুবিমল মিশ্রকে লেখা প্রশ্নাবলির উত্তরে :

'তখন সম্ভব আশ্বিন মাস। আমার ছোটোভাই কলকাতা থেকে ফিরবার সময়ে এক সংখ্যা 'পূর্বাশা' পত্রিকা এনেছিলো, গৃহিণী যিনি আমার ছেঁড়া কাগজের খবরদার অনুযোগ করায় টেবিলে যে-গল্পটা তখন সেটার শেষ লাইন লেখা মাত্র হাতের কাছে 'পূর্বাশা' পত্রিকা থাকায় তার ঠিকানায় গল্পটাকে পাঠিয়ে দিয়ে একমাসের মধ্যে পত্রিকাস্থ হয়ে গল্পটা আমার কাছে ফিরে আসে এবং সম্মানমূল্য বাবদ ১৫.০০ টাকায় এক মনিঅর্ডারও পৌঁছায়। বলা বাহুল্য তখন সঞ্জয়বাবুকে চিনতাম না। পরে সঞ্জয়বাবুর ভাগিনেয় অনিল চক্রবর্তী মশায়ের কাছে শুনেছিলাম পূর্বাশা দপ্তরে গল্পটা যাওয়ার তিন দিনের মধ্যে গালিপ্রুফে তৈরি অন্য এক গল্পকে সরিয়ে আমার সেই গল্প 'প্রমীলার বিয়ে'কে স্থান করে দেয়া হয়'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় : 'মনে আছে 'প্রমীলার বিয়ে' আমার প্রথম কলকাতায় ছাপানো গল্প। ঐ গল্প লিখতে আমার এক রাত লেগেছিলো। এক রাত মানে সন্ধেবেলায় চা খাওয়া থেকে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত। গল্প শেষ'।

মধুছন্দার কয়েকদিন। পূর্বাশা, ৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা ; পৌষ ১৩৫৩। কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৬২-তে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চকন্যা'-র অন্তর্ভুক্ত।
'নয়নার মতো মন নিয়ে' নয়, পূর্বাশায় 'প্রমীলার বিয়ে' প্রকাশিত হওয়ার পর 'সিরিয়াসলি লিখতে আরম্ভ করি পূর্বাশায়'।

নন্দরানী। চতুরঙ্গ, ৯ বর্ষ : ৩ সংখ্যা ; চৈত্র ১৩৫৩।
এযাবৎকাল অগ্রন্থিত।
তাঁতী বউ। পূর্বাশা, ১০ বর্ষ : ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৪।
'তাঁতী বউ তিন-চারদিন লেগেছিলো' লিখতে।

'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র অন্তর্ভুক্ত। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৮৬ ও 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪—দুটি সংকলনেরও অন্তর্গত।

সান্যালদের কাহিনী। পূর্বাশা, ১০ বর্ষ : ৫ সংখ্যা ; ভাদ্র ১৩৫৪।
এযাবৎকাল অগ্রন্থিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করার পাঠক, যখন গড় শ্রীখণ্ড পড়বেন, সে-সময়ে তুলনামূলক পাঠ হিসাবে বর্তমান গল্পটি পড়ে নিতে পারেন। অন্যত্র এক জায়গায় অমিয়ভূষণ জানিয়েছিলেন—যদিও এই গল্পের সূত্রে নয়—'বড় ক্যানভাসে যাওয়ার আগে স্কেচ করা দরকার হয়। একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা ছিলো, তখন চরিত্রগুলোর কয়েকটি স্কেচ করেছিলাম। তার কোনো কোনোটি রাখার মতো মনে হয়েছিলো'। এও উল্লেখ করার প্রয়োজন 'গড় শ্রীখণ্ড'র রচনাপ্রসঙ্গে 'উদ্বাস্তু' উপন্যাসটির সম্পূর্ণ পাঠ এখানে দেওয়া আছে। ফলে, 'গড় শ্রীখণ্ড' যা-কিনা ১৩৬০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পূর্বাশায় ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়, তার আগেই দুটি খসড়া-পাঠ অমিয়ভূষণ লিখেছিলেন। অবশ্যই 'গড় শ্রীখণ্ড'-এর উত্তর-পাঠ 'সান্যালদের কাহিনী'।

ইতিহাস। পূর্বাশা, ১০ বর্ষ : ৮ সংখ্যা ; অগ্রহায়ণ ১৩৫৪। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'র অন্তর্ভুক্ত।
গারদ। পূর্বাশা, ১২ বর্ষ : ৫ সংখ্যা ; ভাদ্র ১৩৫৬। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র অন্তর্ভুক্ত।
সুনীতি। পূর্বাশা, ১২ বর্ষ ৮ সংখ্যা ; অগ্রহায়ণ ১৩৫৪। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'র অন্তর্ভুক্ত।

নাটক

'আমার লেখক জীবনের একেবারে প্রথমদিকে আমার দু-তিনটি একাঙ্ক নাটক প্রমথ বিশী মশায়েব কাছে আমার এক আত্মীয় নিয়ে গিয়েছিলেন। আত্মীয়মুখে শুনেছি নাটকগুলি নাকি বিশীমশায়ের 'মন্দ লাগেনি'। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে আমাকে অনুরূপ বলেছিলেন বলে আমার মনে পড়ছে।...আমার নাটকগুলির একটি 'মন্দিরা' কাগজের দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। কী করে তারা পেলো আমি জানি না। আমার ছোটোভাই দিয়ে থাকবে। এসব আরম্ভের আরম্ভ বলা যায়'। সুবিমল মিশ্রের প্রশ্নাবলির উত্তরে অমিয়ভূষণ জানিয়েছিলেন।

অমিয়ভূষণের অনুজ অরুণভূষণ মজুমদাব এক প্রকাশিত-সাক্ষাৎকারে জানিযেছেন . 'বড়দা তখন একটা খামের মধ্যে দুটো গল্প ভরে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ তো কলকাতার কোন পাবলিশার নেয় কিনা। লেগে থাকতে হবে। যদি ওরা গ্রহণ করে। আমি দু'একটা পাবলিশারের কাছে গেলাম। বলল, না-না। নাম না-জানা লেখককে আমরা এভাবে ঠিক আনতে পারি না, আমাদের লেখক অনেক আছে কলকাতায়। তবে আমাদেরই এক বন্ধু ছিল কলকাতায়। আতাউর রহমান নাম। বললাম, আতাউব তোর সাথে তো হুমায়ুন কবিবের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। তুই হুমাযুন কবিবকে দিয়ে কিছু করতে পাবিস কিনা দেখ। বলল, কবিবেব সাথে তুই দেখা কর।...বললাম, আমার দাদার দুটো গল্প আপনাকে দিতে চাই। .উনি বললেন, আপনাব দাদা কী কবেন?—পোস্ট অফিসের কেরানি বলতে পারেন। লেখাপড়া?—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ইংবেজিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট। —আচ্ছা, আপনি লেখা দুটো দিন।...একটা লেখা ছিল 'রোলস অ্যান্ড ক্যাডিল্যাক', অপবটা 'দা গড অন মাউন্ট সিনাই'।...আমি তো গল্প আকারেই দিয়ে এসেছিলাম হুমায়ুন কবিবকে'।

'দা গড অন মাউন্ট সিনাই' অমিয়ভূষণেব সে-অর্থে প্রথম রচনা। নিজে নাটকটির উল্লেখ করলেও নাটক প্রসঙ্গে, সম্ভবত, কোথাও কিছু বলেননি। 'মন্দিরা' পত্রিকার যে-দুটি সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়, সে-দুটি সংখ্যাই জাতীয় গ্রন্থাগাবে নেই। কিন্তু পত্রিকার বর্ষসূচিতে 'গল্প' হিসাবে উল্লেখ আছে—এই তথ্য সরেজমিনে দেখে জানিয়েছেন অশোক উপাধ্যায়।

রচনাসমগ্রে নাটক হিসাবে গণ্য হল। পাবিবাবিক সূত্রে জীর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার কবেছেন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এবং সেই মতো সম্পাদনাও করেছেন। পরবর্তী কোনো খণ্ডে মূল প্রকাশিত-পাঠটি পেলে যথাযথ প্রকাশিত হবে। নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল কিনা সে-তথ্যও জানা নেই।

আপাতত, 'দা গড অন মাউন্ট সিনাই', মন্দিরা ১৯৪৩-৪৪ [?]—এই তথ্যটুকু থাক। তবে, অবশ্যই 'প্রমীলাব বিয়ে' গল্পের আগেই প্রকাশিত।

রচনাপ্রসঙ্গ অংশে 'বিজ্ঞাপনপর্ব', 'কবিতীর্থ', 'বোবাযুদ্ধ', 'বৈতানিক', পত্রপুট' পত্রিকা থেকে সাহায্য নিয়েছি।
এই খণ্ডের দুটি ছবি অমিয়ভূষণ মজুমদারের অঙ্কিত।